এক্ষণী

১ম বর্ষ · প্রথম সংখ্যা ১৩৬৮

১ম বর্ষ
১৩৭০-৭৫
১৫৫.৩
৩০৪/৭

সাহিত্য পত্রিকায় ও
নিরপেক্ষ আলোচনা সমৃদ্ধ
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
দ্বিমাসিক পত্রিকা

এক্ষণ । কার্ল মার্কস্ বিশেষ সংখ্যা ১৯৬৮

'মার্কস্‌বাদের জন্মের দেড়শো বছর নিশ্চয়ই এটা নয় – কমিউনিস্ট ইস্তেহারে (১৮৪৮) পূর্ণ-পরিণত মার্কস্‌বাদের প্রথম ধ্রুপদি সূত্রায়ণের একশো বিশ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু ৫ মে ১৮১৮-য় মার্কসের জন্ম থেকে দেড়শো বছর, যা আমরা উদ্‌যাপন করতে চলেছি, তাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগরূপে চিহ্নিত করা চলে এবং এই যুগ মার্কস্‌বাদের নিরিখে অনুধাবনযোগ্য। এই যুগেরই মধ্যে নেপো-লিয়নীয় যুদ্ধগুলির উপসংহার থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বের বিবর্তনকাল। মার্কস্‌বাদ এই যুগকে তার নিজস্ব তত্ত্বে প্রথম ব্যাখ্যা করেছিল এবং যতই দিন যাচ্ছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে চলেছে।

'যে-কোনো তত্ত্বকেই বাস্তব রূপায়ণের মাপকাঠিতে বিচার করতে দেড় শতাব্দী বেশ যথেষ্ট সময়। দেড় শতাব্দী – একালীন সব বিপ্লবের অগ্রদূত ইংলণ্ডের বিপ্লবের পর ; যার মধ্যে ইংলণ্ড ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবের প্রধান নায়ক ও সংগঠক হয়ে উঠল। যে বিপ্লব ইয়োরোপের নিপীড়িত জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক আশার সংকেতধ্বনি শুনিয়েছিল সেই আমেরিকান বিপ্লবের পর দেড় শতাব্দী ; যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পটভূমিতে অবাধ সঞ্চয়পন্থীদের বহু-লক্ষাধিপতির দৃঢ় দুর্গে পরিণত। ফরাসি বিপ্লবের দেড় শতাব্দী ; যে বিপ্লব সমস্ত মানবতার মর্মে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত করেছিল – সেই ফরাসি দেশ এরই মধ্যে কেমনভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগৃহীত এক উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে নিজের এবং অর্ধেক ইয়োরোপের উপর ন্যাটো-র শৃঙ্খল শক্ত করে জড়িয়ে নিয়েছিল।'

– এক্ষণ মার্কস্ সংখ্যার জন্য শ্রীরজনী পাম দত্ত -প্রেরিত রচনা (৯ এপ্রিল ১৯৬৮) থেকে।

আধুনিক পৃথিবীর এই সার্ধ শতাব্দীর সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস কথঞ্চিৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে এক্ষণ পত্রিকা -পরিকল্পিত কার্ল মার্কস্ বিশেষ সংখ্যায়। শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৬৭

ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বছর

৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

বিদেশী বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করে ১৯৬৭ সাল ভারতীয়-বাটার রপ্তানি বাণিজ্যে একটি ঐতিহাসিক বছর। এ বছর যতো জুতো তারা বিদেশের বাজারে বিক্রি করেছেন, তেমনি আর কখনো হয়নি। এবং এই রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছেন ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি।

জাপান, হংকং, ইতালি এবং আরো অনেক বড়ো বড়ো রপ্তানিকারক দেশের প্রতিযোগিতার মুখে বাটা'র এই সাফল্য। বহুমুখী প্রতিযোগিতাই বটে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মধ্য-প্রাচ্যের পরিস্থিতির জন্যে মালবাহী জাহাজের পথ-পরিবর্তন এবং সঙ্গত কারণেই সময়ের-সূচি বজায় রাখার জন্যে বৈশাখিক পরিকল্পনার পুনর্বিন্যাসের সমস্যা।

ভারতীয়-বাটার জুতো পশ্চিম ইওরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আরো বিভিন্ন দেশের বাজারে যাচ্ছে।

পৃথিবীর সর্বত্র সকলের সেবায়—ভারতীয়-বাটা।

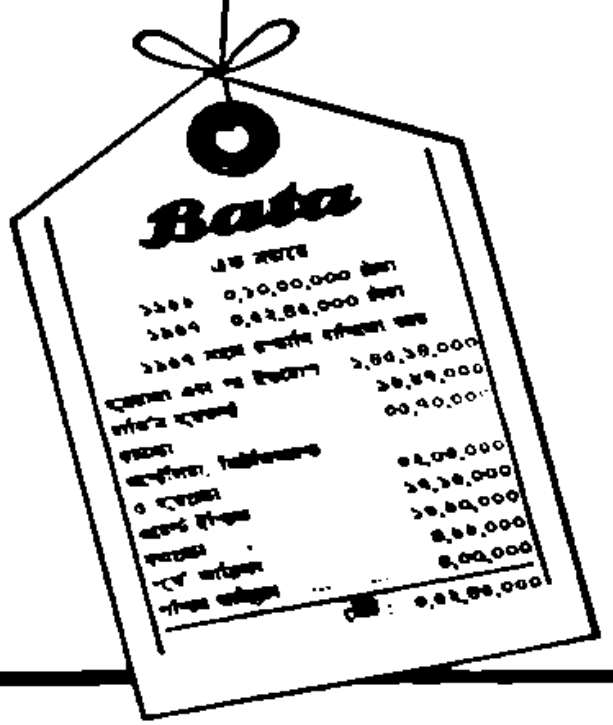

With the compliments of :

Hindustan Motors Limited

CALCUTTA

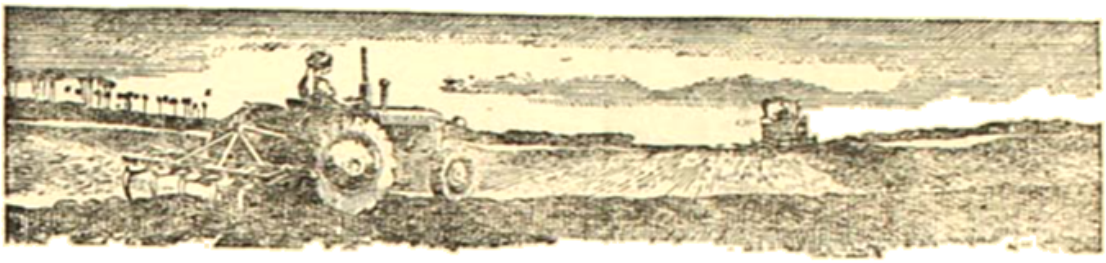

নতুনত্বের পত্তন...
আধুনিক প্রথায়
চাষবাসের মূলে ডানলপ

চাষবাসের সাবেক প্রথা যেমন যেমন বিদায় নিচ্ছে, সে জায়গায় দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন যন্ত্রসমন্বিত বৈজ্ঞানিক কৃষিকাজ। ফলে, কৃষকরা আগের চেয়ে ঢের বেশী জমি চাষ করতে পারবেন এবং একর প্রতি ঢের বেশী ফসল ফলানো সম্ভব হবে।

খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য ফসল বৃদ্ধির এই অভিযানে ডানলপ গোড়া বেঁধে সাহায্য করছে—ডানলপের তৈরী টায়ারের সাহায্যে ট্রাক্টরে চেপে তাড়াতাড়ি জমি চাষ হবে, ট্রান্সমিশন ও ভী বেল্টে সেচের জল তোলার এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রসারের সুবিধে হবে। গরুর গাড়িতে নিউম্যাটিক টায়ার লাগানোর ক্ষেত্রেও পথ দেখিয়েছিল ডানলপ। এতে গরুর গাড়ির কার্যকারিতা বহুগুণ বেড়ে গেছে—যে দেশের পরিবহন ব্যবস্থায় গরুর গাড়ির ভূমিকা এত জরুরী, সে দেশে এটা একটা কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়।

ডানলপ ইণ্ডিয়া

—ভারতের আধুনিক প্রথায় চাষবাসের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে

With Best Compliments of :

Mirpara Foundry & Engg. Works (P) Ltd.

34 STRAND ROAD

CALCUTTA 1

Phone : { 66-4615
22-6946

পয়সা উশুল করতে হলে উইল্‌স-এর সিগারেট চাই!

৪০ পয়সায় ১০টি সিগারেট

উইল্‌স ৯৯ চাই!

তাড়িবিনা তামাকে সিগারেট ভালোই হয়। তফাৎটা ধাঁড়াচ্ছ ব্লেণ্ডিং-এর কারবাতে। উইল্‌স-এর ব্লেণ্ড বলেই উইল্‌স ৯৯-এর এমন চমৎকার স্বাদ। দামেও সুবিধে— মাত্র ৪০ পয়সায় ১০টি সিগারেট।

স্বাদে দামে তুলনা নাই
তাইতো উইল্‌স ৯৯ চাই

With best compliments from

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD.

6 GHORE BIBI LANE
CALCUTTA 54

Sulekha PRODUCTS

Office, All - purpose, Liquid
PASTE, ADHESIVE, GUM.

aideeyar

SULEKHA WORKS LTD.
SULEKHA PARK. CALCUTTA - 32

দেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গ : সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা ছয় পয়সা।
ষাণ্মাসিক দেড় টাকা।
বার্ষিক তিন টাকা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল : পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যাতেই নানা তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

প্রতি সংখ্যা বারো পয়সা।
ষাণ্মাসিক তিন টাকা।
বার্ষিক ছয় টাকা।

পশ্চিম বংগাল : নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী।

ষাণ্মাসিক এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।
বার্ষিক : তিন টাকা।

- গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন।
- চাঁদার টাকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে।
- ভি. পি. পি. -তে পত্রিকা পাঠান হয় না।
- পত্রিকা বিক্রির জন্য ৩৩⅓% কমিশনে এজেন্ট চাই।

তথ্য অধিকর্তা
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা ১

ডব্লিউ. বি. (আই অ্যাণ্ড পি. আর) অ্যাড ৯২৮৬ / ৬৮

পুনশ্চ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ । প্রথম সংখ্যা
পৌষ - চৈত্র ১৩৭৪

সূচিপত্র

বাংলা গল্পে চিত্র / চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১
বাংলা গল্পের ইতিহাস প্রসঙ্গে / কুমারেশ চক্রবর্তী ১২
মেক্সিকো : বিপ্লব ও সাহিত্য / অদিতিনাথ রায় ৩৬
অবনী বাড়ি নেই / উদয়ন ঘোষ ৪৬
পরশুরামের ধর্ম / সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
মাটির সমুদ্রে / জগন্নাথ চক্রবর্তী ৬৯
প্রতারকের মুখ / সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
ভয়ংকর স্বপ্নের পর / সুবোধকুমার গুপ্ত
করতল কোথায় ঈশ্বর / কাজল ঘোষ
নিজস্ব / যোগব্রত চক্রবর্তী ৭৪
প্যাল এল্যুয়ার থেকে / অবন্তীকুমার সান্যাল ৭৫
ইতিহাসের বাবু বা বাবুর ইতিহাস / শান্তি বসু ৭৭
আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ / নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৮৫

ক্রোড়পত্র

কলিকাতা কমলালয় / ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫
পত্রিকার কথা

প্রচ্ছদপট সত্যজিৎ রায়
সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয়
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড · কলকাতা ৯

বাংলা গদ্যে চিত্র

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

7

[বাংলা ১৩৫৫ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সাহিত্যপত্রে' শ্রীকমলকুমার মজুমদারের 'জল' গল্পটি বেরোয়। কিছুকাল বাদে ঐ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩৫৮) বর্তমান আলোচনাটি প্রকাশ করেন। সে সময়ে কমলকুমারের গদ্যভাষা নিয়ে যে কিছুটা বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল তার আভাস এই রচনার শেষে আছে। বস্তুত তাঁর গদ্য নিয়ে বিতর্কের অবসান আজও হয় নি এবং সম্প্রতি এ বিষয়ে নতুন মতামত তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় চঞ্চলবাবুর রচনাটির পুনর্মুদ্রণ বোধহয় নিরর্থক নয়। কমলকুমার মজুমদারের ভাষা বিষয়ে এক্ষণের আগামী সংখ্যায় একটি আলোচনা-চক্রের সূত্রপাত করা হচ্ছে। বর্তমান রচনাটিতে তারই সূচনা হল। কমলকুমারের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত সমস্ত পাঠককেই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। পুনর্মুদ্রণের জন্য শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও 'চতুরঙ্গে'র কাছে কৃতজ্ঞ। স. এ।]

আধুনিক কাব্য চিত্রধর্মী এ কথা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত আধুনিক গদ্যও চিত্রে পরিপূর্ণ এ কথা বলা চলে। তবে চিত্র-যোজনা এক, চিত্র-রচনা আর। কাব্য অথবা গদ্যে চিত্র-যোজনা এবং চিত্র-রচনা দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রকাশ পেয়েছে। কিংবা একটু ঘুরিয়ে বলা চলে যে পদ্যে এবং গদ্যে চিত্র-যোজনা থেকে চিত্র-রচনা পর্যন্ত একটি ক্রম অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়।

চিত্র ব্যতিরেকে রসের সঞ্চার সম্ভব নয়। এবং রস ব্যতিরেকে চিত্র কেবল-মাত্র চিত্রই থাকে, সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। বিশুদ্ধ ভাবকেও কাব্যে প্রকাশ করতে হয়েছে চিত্রের সাহায্যে। যেমন—

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে।
হস্ত পদ নাই ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপন ধর্ম্ম গোসাঞি গোলোক ধেয়াইল।
গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড হৈল॥

ইত্যাদি সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা। কেবলমাত্র 'অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে' এই ধরনের পঙ্‌ক্তি থাকলে চিত্র তথা রস থাকে না। চিত্র আনবার জন্যই 'হস্ত পদ নাই ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে'-র মতো পঙ্‌ক্তি লিখতে হয়। গদ্যেও এই একই সমস্যা। তবে কাব্য থেকে তার যুক্তি বা ঔচিত্যবোধ আলাদা। রামমোহনের বেদান্ত ব্যাখ্যা এবং রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' নামক ঐ বেদ উপনিষদেরই ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। রামমোহনের গদ্য দর্শন, দর্শনের ভাষা হিসাবে চমৎকার সন্দেহ নেই; রবীন্দ্রনাথের ভাষা সেক্ষেত্রে আরও এলানো, কিন্তু চিত্রময়তা বেশি। 'শান্তিনিকেতনে'র গদ্য তাই সাহিত্যের, বিজ্ঞান বা দর্শনের নয়।

এখন কথা উঠতে পারে চিত্র-যোজনা ও চিত্র-রচনাকে পার্থক্য করে দেখা হয় কেন। বিষয়কে অবলম্বন করে বিষয়ী চিত্র-যোজনা করেন, বিষয় সেখানে গৌণ, এমন কি অনেক সময় তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যাই, বিষয়ীর কান দিয়ে শুনি, বিষয়ীর চোখ দিয়ে দেখি, বিষয়বস্তুর গুণগান করতে হলেও বিষয়ীর মুখের ঝাল না খেলে উপায় থাকে না। সাধারণ সাহিত্যপদবাচ্য গদ্য এই ধরনেরই (পদ্যও তাই)। কিন্তু চিত্র-রচনায় বিষয় এবং বিষয়ীর সমান দায়িত্ব থাকে। চকল বস্তুপ্রবাহের দিকে লক্ষ রেখে বিষয়ী সম্পূর্ণভাবে নৈর্ব্যক্তিক অথচ বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত—এ অবস্থায় চিত্র-রচনা সম্ভব। যেখানে বিষয়ীই প্রধান, বিষয়ের কয়েকটি গুণ বাছাই করে মনের মধ্যে জমা করে রাখেন আর স্মৃতির অমোঘ শক্তির বলে তাকে ভাষায় প্রকাশ করেন, সেখানেও যদিও চিত্র প্রয়োজন, কিন্তু তা যোজনা, রচনা নয়।

এই বিষয়-বিষয়ী নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে সাহিত্যরচনা আরম্ভকাল থেকেই দেখা গেছে। গদ্যে ও পদ্যে এর সমান ব্যাপ্তি। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য বাংলা গদ্যে চিত্র-রচনার ফলে সম্প্রতি যে যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা।

এতকাল বাংলা গদ্যে চিত্র-যোজনা অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু চিত্র-রচনা হয় নি। গদ্যের ক্রমবিকাশের ফলে এখন বাংলা গদ্যে চিত্র-রচনাও আর অসম্ভব নয়। এবং যতদূর জানি কমল মজুমদারের 'জল' নামক গল্পটি চিত্র-রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে অগ্রগণ্য। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য পত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকায়, কার্তিক ১৩৭৫ সালে। সমগ্র গল্পটি একটি নিখুঁত চিত্র তথা ভাব ও আবেগের নিখুঁত মূর্তি। এত ভাল গল্প বাংলায় খুব কমই দেখা

গেছে। লেখক ভাষা নিয়ে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে শিল্পশাস্ত্রের রস, ভাব কিংবা আধুনিক কালের 'রচনা' কথাটির যে সংজ্ঞা তার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নি। বরঞ্চ ঘন ঘন সপ্তমী বিভক্তি দিয়ে যাঁরা গদ্য লেখেন আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা দুঃসাহসী মনে হতে পারে (মানে বুঝতে না পারলে তো আরোই হবার কথা), কিন্তু কি ভাষা, কি রচনা কোনো হিসাবেই তা সার্থক নয়! অন্তত তাঁদের মতো কমল মজুমদার দুর্বোধ্য নন। অপর পক্ষে তিনি ভাষাকে বদলেছেন, বাক্যরচনারীতির বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন, এক কথায় তিনি একটি প্রায় স্বতন্ত্র ভাষাই তৈরি করেছেন, তবু বাংলার মন, ভাব, রস, আবেগ তথা চিত্র বিকৃত হয় নি। অবশ্য যাঁরা রূপান্তরের অর্থ বোঝেন কিংবা তার কি দায়িত্ব ভাবেন তাঁদেরই কাছে চিত্র-যোজনা আর চিত্র-রচনার পার্থক্য ধরা পড়বে।

'আনন্দমঠে'র ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনা স্মরণ করা যাক। আশ্চর্য বর্ণনা, সাবলীল ভাষা, যে চিত্র লেখক ফোটাতে চান তা পাঠকের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন, কিন্তু সে চিত্র যোজনা মাত্র, রচনা নয়। বহির্বিশ্বের রূপ বিষয়ীরই মনে, বহির্বিশ্বের যে নিজস্ব সত্তা আছে তা বিষয়ী এখানে মানতে পারেন নি। বিষয়ী তাই এখানে নৈর্ব্যক্তিক নন। চিত্র তাই কিয়দংশে বিশেষ বা ব্যক্তিগত, নির্বিশেষ বা বিশ্বজনীন নয়, বিষয়ীর বিশেষ দ্বারে না পৌঁছালে যেন সমাগরা বহির্বিশ্বের নির্বিশেষ রূপের ধারণা আসে না! কিন্তু বিষয়ীর চোখেই কি আমরা এই জগৎকে দেখিতে চাই?

অপর দিকে কমল মজুমদার গল্প শুরু করেছেন :

> 'তবু এবার একবার সে চেষ্টা করলো, ছোট টিনের ল্যাম্পের মধ্যে তেল ছিল যা। ছোট একটু আলো হোলো, তখন সে ছোট ঘরটার চারিদিকে চাইল, অন্ধকার নেই, আবছায়া হয়েছিল, তেকোনা হয়ে যাওয়া খড়ের ছাওয়া বহুখানে সরে গেছে; সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য;—যেমন আছে—এইভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল। ঠিক তেমনি ভাবেই এরপর সে বসেছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ, পদদ্বয়—তাই। এবং নিজের পরনের কাপড় নড়লে চড়লে যেমন খসে পড়বে এরূপ সে হয় রূপ, সে বাহিরের দিকে চাইলে, বাহিরে ক্রমাগত অন্ধকার, যত দেখ তখন মনে হয় ভয়ঙ্কর! নোনা জলের উপর অন্ধকার ভয়ঙ্কর, আর যদি ঝিল্লির শব্দ—তাও ছিল। ফতিমার বুক দুরুদুরু ক'রে উঠলো—এ জল কবে সরবে?'

'সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য ;—যেমন আছে—এইভাবে যন্ত্রসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল।'—সাবেকী ভাষা থেকে এ ভাষা বিশেষ তফাৎ হয় নি, শুধু 'যেমন আছে' এই দুটি কথার সাহায্যে একটি চিত্র ফুটে উঠল। 'যেমন আছে' আছে বলে 'এইভাবে' কথাটি নিতে হয়েছে। এই তিনটি কথা না থাকলে প্রচলিতভাবে লেখা হতো—যন্ত্রসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল। সমস্ত চিত্র বিষয় থেকে বিষয়ীর দিকে ফিরত—'সমস্ত ধান জলে ভিজে গিয়েছিল, তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য ; যন্ত্রসহকারে তবু সে চতুর্দিকে চেয়েছিল।' ছন্দ পর্যন্ত হ'চোট খাচ্ছে। 'যেমন আছে' এই দুটি কথা গদ্যের অন্তর্গত। এ চিত্র তাই কাব্যধর্মী নয়। তারপর, 'ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ, পদদ্বয়—তাই।' 'তার হাতটা সে দেখছিল, শীর্ণ', এ পর্যন্ত বিষয়ের অন্তর্গত। 'পদদ্বয়—তাই'—বিষয়ীর বিশেষ দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে এই বিশেষ দৃষ্টিই নির্বিশেষ চিত্র রচনা করেছে। একদিকে 'তাই' কথাটি, অন্যদিকে 'শীর্ণ' কথাটির পর গদ্যছন্দের যতি, এ দুইয়ে মিলে বিষয়ীর দৃষ্টি মিলেছে। ফতিমা যখন তার শীর্ণ হাতটি দেখে তখন আমরা তার হাতটি দেখি না, তার সমস্ত ক্রিয়াটি মেনে নিই ; কিন্তু পদদ্বয় আমরাই দেখি। এত সংক্ষেপে বর্ণনা তথা চিত্র-রচনা বিরল। ব্যাকরণ ওলট পালট হয়ে গেছে, বুঝতে তবু কষ্ট হয় না। গল্পটি কানে শুনলে চিত্রগুলি আরও সজীব হয়ে ওঠে।

নিরাসক্তভাবে 'হতোম প্যাঁচার নক্সা'ও লেখা হয়েছিল ; কিন্তু তা নক্সাই—চিত্র-যোজনা, হুবহু চিত্র মাত্র। তবে বঙ্কিমী ভাবালুতা তাতে নেই, সেইজন্য তাতে চিত্র-রচনার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। এবং এদিক থেকে বিচার করলে হতোমের ঐতিহাসিক মূল্যও বঙ্কিমের চেয়ে বেশি। হতোম না থাকলে কমল মজুমদারও এই দুঃসাহসিকতায় নামতেন কিনা সন্দেহ।

সব গল্পের মতো এই গল্পটিও দুটি ভাগে বিভক্ত—একটি বর্ণন, অপরটি কথোপ-কথন। বর্ণনা অংশেই কমল মজুমদার চিত্র-রচনার পক্ষপাতী, কারণ কথোপ-কথনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর অবিকলতা তথা যুক্তিই যথেষ্ট, যদিও তার মধ্যে ভাষার অন্যান্য প্রসাদ থাকতে পারে, থাকেও। কথোপকথনের মধ্যে পাত্রপাত্রীর স্ব স্ব ভাষা আলাদা, পাঠক বা শ্রোতা সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি, নৈর্ব্যক্তিকতা অনেকটা আপনা থেকে এসে যায়। বর্ণন অংশে পাঠক দ্বিতীয় ব্যক্তি, তাই লেখককে চিত্র-রচনার সাহায্য নিতে হয়। অর্থাৎ চিত্র-রচনার ফলে বিষয় এক, রচনা

যিনি করছেন সেই বিষয়ী দুই, এবং যিনি শুনছেন বা পড়ছেন তিনি তিন। এই তিনের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য (তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই), তৈরি হচ্ছে।

চাষীর জীবন নিয়ে গল্পটি লেখা। হয়তো অনেকের তা স্মরণে আছে। আখ্যানভাগ সামান্যই, চিত্রের সাহায্যে আখ্যানের কাজ হয়েছে। অর্থাৎ আখ্যানের বদলে চিত্র তার স্থান দখল করেছে। যে কাহিনী শোনাতে অনর্গল কথা বলতে হতো, ঘটনা দুর্ঘটনায় পরিণত হতো, কিংবা সূক্ষ্ম অন্তর্মুখীন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাতার পর পাতা চলতো, কিনা বাইরে একটা কিছু ঘটেছে তার সম্বন্ধে বলতে হবে (অথচ বিষয়ীই প্রধান বক্তা এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি, কাজেই সবটা বোঝবার জন্যে তারই দোরে ধন্না দিতে হয়), সে কাহিনী কমল মজুমদার চিত্রের সাহায্যে অনায়াসে ব্যক্ত করেছেন। সেই চিত্রের মধ্যেই ঘটনা, গল্প বলা, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। চিত্রহীন বর্ণনা প্রলাপের সামিল। আরও একটি কথা। চিত্র আনতে গেলে বাইরের সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়, সচেতন হলে যে বস্তুটির সম্বন্ধে সচেতন তার প্রতি দায়িত্ব আসে, দায়িত্ব এলে শুধু বিষয়ীর নয় বিষয়ের কথাও ভাবতে হয়, ফলে আপনা থেকে বাক্-সংযম আসে এবং একবার বাক্-সংযম করতে পারলে বিষয় বিষয়ী পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল হতে দেরি লাগে না। তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে পাঠকও নিজের আবেগ সম্বৃত করেন এবং দায়িত্বপূর্ণ হন। লেখক একা কথা বললে পাঠক হয় তাঁকে অগ্রাহ্য করেন, নতুবা তাঁর পাথায় ভর দিয়ে উড়তে থাকেন। প্রাত্যহিক জীবনেও যে ব্যক্তি নিজে যত নৈর্ব্যক্তিক, অপরের কাছে ব্যক্তি হিসাবে তার চিত্র তত স্পষ্ট। যিনি নিজেকে কেবলই জাহির করেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে, হয় তাঁকে আমরা অগ্রাহ্য করি আর নয়তো তাঁর সম্মোহনী কথাবার্তায় নিজেদেরই ব্যক্তিত্বকে হারাই। ব্যাপারটি কি দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়।

ঘরে খাবার নেই, তাই নন্দ ও ফজল বাধ্য হয়ে অসামাজিক গর্হিত কাজ করতে উদ্যত :

> 'তখনই সর্বাঙ্গে তেল মাখলো তারা দুজনেই, সেই হেতু অন্ধকার ওদের গায়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠেছিল।'

অতঃপর আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবে :

> 'ফজলকে নন্দ এইবার ঝোপের দিকে পাঠিয়ে দিলে। সামান্য পথটুকু যেতেই ফজল হয় একা। সন্নিকটের ডোবার দিকে নন্দ এগিয়ে চললো।

হঠাৎ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'দেখ্, নাম ধরে ডাকবি না, তোর নাম কানাই, আমার নামও কানাই।'…'

অপেক্ষা :

'ভয় ঠিক নয়, তবে অন্য কিছু তার মুখের চারপাশে শব্দ করছিল। নন্দ গুনগুন করে গান করে বুঝি, এখন আর নন্দকে দেখা যায় না। পা দুটো ঠাণ্ডায় কনকন করছিল। ঝোপের পাশে ফজল কেমন এক, একা এখানে। 'খুড়ো', চাপা গলায় ফজল না ডেকে পারলো না। নন্দ রাগে গিস্‌গিস্ ক'রে উঠেছিল। আলোটা যখন তিন চার রশি দূরে —এবং তার এরূপ রাগ দেখা দিয়েছিল, তাকে অধৈর্যও করেছিল—মনে করলে, যাই বেটার গলায় হেঁসোটা চালিয়ে দিগে। তারপর সে মাঠের দিকে চাইলো, কুয়াসায় উপরে অন্ধকার, আঙুলের টিপটা কাপড় দিয়ে মুছে চোখ দুটো কচলে নিয়েছিল। অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছিল এবার,—জয় মা কালী। একটা দুটো চারটে পা, ছোট বাকা আল্‌টা ঘুরুক, এক দুই তিন চার—এবার ছোট নালা খালটা পার হবে—ছাগলের মতো তখন ওরা সেটা ঠিক পার হচ্ছিলো, পার হোলো।'

ফজল :

'অতঃপর ইত্যবসরে হঠাৎ সে অধৈর্য, অস্থির যে সে কি করে, এবং হস্তধৃত দা দিয়ে ছোট একটা কোপ দিয়েছিল ঝোপের একটা ডালে, সঙ্গে সঙ্গে ডালটা মাটিতে পড়ে। এবারে সে নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করতে থাকলো, ভয় নেই।'

নন্দর সংশয় :

'অন্তপক্ষে নন্দ খাপটি মেরে আছে, বিড়ালের চোখ তেমনি আপনকার চক্ষুদ্বয়,—আশ্চর্য। সরল সরল নিঃশ্বাস এখনও যখন এমনি ধারা মুহূর্তে বয়, শুধু একটি কথা বস্তুত তাকে উচাটিত করেছিলই—সুতরাং ফজল যদি কিছু একটা বেগোড় ক'রে বসে—সত্যি এটা তার ভয়ের সত্য কারণ।'

ফজলের দ্বিধা এবং নীতিবোধ :

'না, আমি কিছুই চাই না, সব নন্দ খুড়ো নিক্। পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভাল লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা শুনে নি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটি না, আমি হই ভাল লোক, কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।'

এবং খুন করতে যাবার পূর্ব মুহূর্তেই (খুন যদিও করতে হয় নি, দরকার হলে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল) :

'সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই, তবু তবু ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।'

নন্দ ফজলকে বলেছিল যে ডাকাতি করবার সময় নিজের-নিজের নাম ধরে যেন না ডাকে, লোকে চিনতে পারবে। কাজেই ফজলের নাম দেওয়া হল কানাই, সে নিজেরও নাম রাখলে কানাই। এ সামান্য ঘটনাকে অবলম্বন করে নীতির কি গভীর তত্ত্ব ভাষার সাহায্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই, তবু তবু ফজল থতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।' অথবা, 'কিন্তু যদি সে কানাই, সে যা যা সে করে। প্রত্যেকের প্রতি ফজল কেমন ক'রে···।' প্রচলিত ভাষায় লিখলে এর কোনো ব্যঞ্জনাই আসতো না। কমল মজুমদার বস্তু ও ভাবের তাগিদেই তথাকথিত ভাষার রূপ পালটেছেন। 'তথাকথিত' – কারণ বস্তু ও ভাবের জন্য ভাষা, ভাষা একটাই যেটি ঔচিত্যবোধে ব্যবহৃত, কোনো প্রকার বিপ্লবী 'পরিবর্তনের' কথা লেখক ভাবেন না, ভাবি আমরাই যেহেতু আমরা মনে করি ভাষা আমাদের একচেটে সম্পত্তি।

আশ্চর্য এই যে বর্ণনা অত অভিনব হলেও কথোপকথন প্রচলিতভাবে লেখা, যদিও তার মধ্যে অপূর্ব সত্যতা বিরাজমান (কথোপকথন সম্বন্ধে উপরে আমার মত জানিয়েছি)। কিছু কিছু বর্ণনাও সাধাসিধে (যাকে আমরা বলি বুঝতে কষ্ট হয় না, জলের মতো সোজা, সোজা জল যেমন বেঁকিয়ে গড়ায় তেমনটি নয়), তবুও গল্পের মূল ছন্দটি ভাঙে নি। এর কারণ কি ? এই অভিনব ভাঙাগড়ার মধ্যে একটি বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ। সেটি হচ্ছে কথ্য ছন্দের রীতি। যেমন :

'যখন ভয়ে ফজল ফজলই নয়। তদ্দণ্ডে সে কি করে বসেছিল, সে হুড়মুড় ক'রে একেবারে লোকগুলোর সামনে, তার বুকের পাটা হঠাৎ হয়েছিল, তার কাঁধ যেমন ফুলে ফুলোফুলো মহিষের কাঁধ যেমন।'

অথবা, '···আর সে লোক তার পায়ের প্রায় সন্নিকটে মাথাটা রেখে কাটা ছাগলের মতো কাঁপতে কাঁপছিল।' বেশিদূর যাবার দরকার নেই, গড়িয়াহাটের বাজারে গেলেই দোকানো চাষীদের কথাবার্তা শোনা যাবে। (গল্পটি বোধ হয় ক্যানিং অঞ্চলের চাষীদের নিয়ে লেখা, নোনা জলের সমস্যা তথা মাছের কারবারীদের অত্যাচার ঐ দিকেও তো খুব)। এদের এই কথ্য রীতির মধ্যে যে অসংলগ্নতা এবং চিত্রময়তা আছে তা কমল মজুমদারকে হয়তো আকৃষ্ট করে থাকবে। তবে হুবহু তার প্রয়োগ তিনি নিশ্চয়ই করেন নি, তাহলে আর গল্পটি হতো না।

'ইতিপূর্বে সেই টাকের উপর তাদের কথোপকথন সে স্মরণ করছিল। একটার পর একটা তার স্মরণ হ'ল।—

—ঠাকুর তো গরীব।

—গরীব যেন যাত্রার পোষাক।

ফজল হাসলো।

—ও যে বার বার বললে।

—পাকে পড়লি অমন শালাকে বাপ বলবে তার কথা কি। সে দাঁড় টানলে। 'তারপর ও শালা বামুন—ও যার বাড়ী যাবে তারাই বলবে ঠাকুর কড়া চাপাও,—না হলি ফুশ মন্তর বিধান, পাঞ্জী খুলে বলবে, বেগুন পুঁতেছ তেরেওদশীর দিন—ফসল হবে কলা, বামুন বে দে চার আনার পয়সা—'

—তুমি যে খুড়ো বামুনের গায়ে হাত তুললে তোমার পাপ হবে না···

—পাপ! পুন্নি বল, কলির আবার বামুন—দুঃশালা।

—তবে যে বাবুরা ওকে ওতো দেলে···

—বাবুরা তো দেবে থোবে, শহরের জেণ্ট্ম্যানেরা দেবে···, ও শালাদ্দের বাবুরা পোষে মহালের খবরের জন্যি···শেষ কথাটা সে মাথা থেকে বলেছিল।

—তাহলি ও আমাদের মত দুখী নয়···

—আমাদের মতো দুঃখী শালা ত্রিভুবনে আছে নাকি···

আবার দাঁড়ের শব্দ—হঠাৎ ফজলের চমক ভাঙ্লো···

ও কেমন ধারা দাঁড় টানা হচ্ছে শুনি—

—'ও', বলে কবে সে দাঁড় টানতে লাগলো। টানতে টানতে বলেছিলো, 'আচ্ছা খুড়ো—'

—কি, উদগ্রীব হ'ল না।

—ধর এমনি একদিন যেমন মাঠে গেছো, দাঁড়িয়ে আছো—আর তোমাদের কেষ্ট ঠাকুর মানুষের বেশ ধরে আসে তাহলি তুমি কি কর—ফজল হয় সরল প্রকৃতির, তার একথা শুনে ঝাড়ু নন্দর হাসি পেলো, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল, কেননা সে চাষী সেই হেতু···।

—জানতি যদি পারি, বলবো, ঠাকুর···সোনাদানা চাই না ঠাকুর আমাদের বাঁদ তুমি অচল ক'রে দাও, লোহার করে দে যাও—সোনা জল যেন কখন না এর নদ্দি আসতে পারে···আর হ্যাঁ অজন্মা যেন হয় না ঠাকুর···দুর তাই কখনও হয়···তুমি যেমন; ঠাকুর যাবে বাবুদের বাড়ী খাটের যোগাড় যে খানি বারমাস অষ্টপহর, আমাদের মত দুঃক্কী কাঙালের সঙ্গী শালা দেখা হবে উঠতি বসতি ওই শালা মেড়ো ঠাকুরের···

ফজল একেবারে শেষ কথাটায় না হেসে থাকতে পারলো না। মেড়ো ঠাকুর,—চালে লাউ দেখলেই যে বলে,—বাম্‌নেমে থিলাও পুন্ হোগা।'

একটি সাধাসিধে বর্ণনা :

'দাওয়ার বাঁশের সঙ্গে নৌকার কাছি বাঁধতে বাঁধতে তার আর একটা দৃশ্য মনে হলো শরতের সকাল। তখন হাওয়া বইছিল, ছোট একটা কুঁড়ে ঘর,···দাওয়ায় বসে নিবিষ্ট মনে মৌলবী কোরাণ শরীফ পাঠ করছিল, মৌলবী হবীবর রহমান কালো, চেহারা বিশ্রী কিন্তু কেননা যখন সে পাঠ করে সে ভারী সুন্দর—সে অমায়িক, উঠানের কোণে দাঁড়িয়ে কোদালটা রেখে ফজল শুনছিল, সে একীভূত। তার ভাল লাগছিল, শুধু তার তখন মনে হয়েছিল, জগদীশ্বর এক কেননা তিনি সবার উপর দয়া রাখেন। এবম্প্রকার কথা তার মনে উদয় হয়েছিল সত্যিই। সে মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে চাইলো···নৌকার প্রতি, খড় প্রায় বোঝাই—একটা ধামা ; লণ্ঠন···প্রতিটি জিনিষ তখন পরস্পরা অন্ধকারে ঠাহর করতে পেরেওছিল। তৎপর সে নৌকার মধ্যে নেমে ধামাটা তুলে দাওয়ায় রাখলে—। লণ্ঠনটা জ্বাললো। ঘরের দাওয়াটা এবার প্রচুর বড় বলে মনে হয়েছিল··· ।'

যদি প্রচলিত ভাষাতেও তিনি লিখতেন তাহলেও অনেক বাঙালি লেখকের চেয়ে ভাল লিখতেন, কারণ বিশেষের অভিজ্ঞতা তথা কথ্যছন্দের নিদিধ্যাসন তাঁকে প্রায় অনন্যসাধারণ করে তুলেছে।

পূর্বেও বলেছি আর একবার বলা প্রয়োজন যে কমল মজুমদারের এই প্রকার গদ্যভঙ্গি কাব্যধর্মী নয়। চিত্রময় করে তোলবার জন্য তিনি গদ্যের জাত খোয়ান নি। অনেক খ্যাতনামা লেখক কাব্যধর্মী গদ্য লেখেন এবং তা আমার কাছে বিস্বাদ লাগে। অনেকের পদ্য আবার গদ্যধর্মী তাও আমি গ্রহণ করতে নারাজ। গদ্য এবং পদ্যের পার্থক্য কি, কি তাদের ধর্ম এ বিষয়ে প্রশ্ন তুললে আমি বলতে অক্ষম, কারণ গদ্য বা পদ্য চেনবার কথা (লেখবারও কথা) বলবার বা চিনিয়ে দেবার কথা নয়। কাজেই পাঠক মাত্রেই দেখবেন যে কমল মজুমদারের এই গল্পটি চিত্র হওয়া সত্ত্বেও গদ্য, পদ্যধর্মী নয়। তেমনি 'চিত্র' কথাটির কি তাৎপর্য-গত অর্থ তাও আমি জানি না, তবে এইটুকু জানি যে ছবির চিত্র এবং গদ্য বা পদ্যের চিত্র একাকার করে দেখবার নয়। বহুপূর্বে, হয়তো জগৎ সৃষ্টিরও পূর্বে সবই একাকার ছিল, সেই সময়কার লোক যাঁরা আজও বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'ফোর আর্টসের' সর্বধর্ম সমন্বয় (কিংবা একাকার) ঘটাতে

ব্যস্ত। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি চিত্রের সাহায্যে কমল মজুমদারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এসেছে কিনা অথবা সিনেমার কাট্ ডিজল্‌ব ইত্যাদি টেক্‌নিক তাঁকে বাক্যরচনা ভেঙে ফের অভিনবভাবে জুড়ে দেবার পদ্ধতি শিখিয়েছে কিনা তা আমার ধারণাতীত, অতএব আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক।

এ কথাও আগে বলেছি, আর একবার বলি, কমল মজুমদার কথ্যরীতির ছন্দই গ্রহণ করেছেন, কথ্যভঙ্গি হুবহু নকল করতে যান নি। সাহিত্য রচনা কালে তাঁর এই ঔচিত্যবোধ সম্ভ্রমের বস্তু। অনেক দুরূহ শব্দ এবং নিতান্ত হালকা কথা তিনি অক্লেশে ওজন রেখে বলতে পেরেছেন। যেমন মৌলবী সাহেবের হাল্কা ধরনের বর্ণনাটি। আবার তেমনি মাতা ফতিমার খাবারের প্রতি হ্যাংলাপনা সহ্য করতে না পেরে ফজল যখন চড়ই মেরে বসে :

'প্রচণ্ড অব্যর্থ ভয়ঙ্কর সে-চড় এবম্প্রকার।'

কিংবা :

'চড়ের শব্দ সশব্দে তদ্দণ্ডে সে চমকে উঠে থমকে স্থির। যখন তার চক্ষুদ্বয় দীপ্ত উষ্ণ ভাঁটার মত যেমন এক্ষণে। ফজল আর নেই ; আর আর দিকে সে তাকায় নি, এখনও যখন সে বেঁকে দাঁড়িয়ে, ধান কাটছে— অনেকটা অনেকটা তদ্রূপ।'

অনুপ্রাস ও গুরুচণ্ডালির সার্থক প্রয়োগ। গল্পটির মধ্যে কথার ভাবানুষঙ্গও লক্ষনীয়। এখানেও তিনি অদ্বিতীয়। যেমন—'নন্দ এতে একটা অবস্থায় পড়েছিলই···।' 'অবস্থা' কথাটির অনুষঙ্গ এখানে ভাব, দশা, দেশজ অর্থে দুর্গতি, অথবা চিত্রের দিক থেকে stasis।

একটি ছোট গল্পের মধ্যে (মাত্র ষোলপাতা) এতখানি বর্ণাঢ্য, ভাষার বৈচিত্র্য আর কোনো বাংলা গল্পে পড়েছি বলে মনে পড়ে না। অনেক গল্প আছে যার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হবে অন্য মাপকাঠিতে, যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'উদ্বাস্তু' নামক গল্পটি (চতুরঙ্গ, বৈশাখ ১৩৫৫) ; কিন্তু একদিকে কারিগরের হাত ও অন্যদিকে মহৎ শিল্পীর ব্যঞ্জনা এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেখতে পাওয়া আজকাল বিরল, যদিও একদা বাংলা তথা ভারতবর্ষে কারিগর ও শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য ছিল না বললেই চলে।

আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেত এবং তা আনন্দেরই কারণ হতো। কিন্তু স্থান নেই। গল্প-উত্তর অন্যান্য কথা তাই বাদ দিতে হল। আমার 'সাহিত্য-পত্রে'র সম্পাদক থাকাকালীন গল্পটি প্রকাশিত হয় বহু বন্ধু-বান্ধব হিতৈষীদের

কায়েম হয়ে থেকে তার মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ও সেই কাঠামোকে জোর করে সম্পূর্ণ ভেঙে না দিতে পারলে সেখানকার মানুষের প্রগতিশীল ভাব-চিন্তা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পশ্চিমে শিল্পবিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিতরটারই বিলোপ ঘটিয়ে কতকগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। লাতিন আমেরিকায় তা ঘটে নি। সেখানে আজ রাজা নেই, প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই প্রজাতন্ত্র চালু হয়েছে; কয়েকটি দেশে জমিদারি প্রথাও বিলোপ পেয়েছে। কিন্তু রাজা-প্রজার, জমিদার-রায়তের যে সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ভিত্, যা আধুনিক মনের পরিপন্থী, যা আধুনিক মানুষের আত্মিক ও পার্থিব প্রগতিকে ব্যাহত করে, তা সামন্ততন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। শিল্পায়ন সে কাঠামোকে ভেঙে না দিয়ে বরং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখছে। বিপ্লব পিছিয়ে গেছে। তাই আজ একটা আমূল ভাঙাগড়া চাই।

এই বিশ্লেষণের গুরুত্বটা, বিপ্লবের অনিবার্যতার যুক্তিটা, তার অনস্বীকার্য প্রেরণাটা সম্পূর্ণ বুঝতে হলে লাতিন আমেরিকার বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় দরকার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাগত যে সম্পর্কের কথা আগে বলেছি, ওই মহাদেশের পটভূমিকায় তার বিভেদের রূপটা জানা চাই, তার উপলব্ধিটা স্পষ্ট হওয়া চাই। এটা স্পষ্ট হলে, মেক্সিকোর সাহিত্যে বিপ্লবের যে ছবিটা ফুটেছে, তার বিশেষত্বটাও বুঝতে পারব।

ফুয়েন্‌তেসের প্রবন্ধের প্রধান মূল্য এই যে তার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে নামতে পেরেছেন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা যা তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসের সচল রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাকেই ন্যায়-শাস্ত্রের নিয়ন্ত্রিত ব্যবচ্ছেদকারী ভাষার মধ্যে দিয়ে অন্যভাবে আয়ত্তে আনতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার একটা দিকের ব্যাখ্যান সম্ভব হয়েছে, লেখক কতকগুলি সরল যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন। কিন্তু ফুয়েন্‌তেসের ও পরোক্ষভাবে মেক্সিকোর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাটা এতে ধরা পড়ে নি। ফুয়েন্‌তেসের উপন্যাসে ও সাধারণভাবে মেক্সিকোর বিপ্লবী সাহিত্যে ওই অভিজ্ঞতার রূপটা বরং কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে; বিপ্লবের অনিবার্যতার যুক্তিটা কতটা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও কতটা ঐতিহাসিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর কারণ মেক্সিকোর স্পেনীয় ঔপনিবেশিকতা, স্থানীয় 'ইণ্ডিয়ান'দের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা, কতকগুলি বহিরাগতের এদেশের

নূতন পরিস্থিতিতে আত্মপরিচয় খোঁজার চেষ্টা, সাদা-কালোর মিশ্রণের সমস্যা ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে নিয়ে একটা সমগ্র জাতীয়তাবোধ গড়ার প্রয়াস এ দেশের অভিজ্ঞতাকে জটিল করে তুলেছে, বিপ্লবের প্রকাশে বিভ্রম জাগিয়েছে।

মেক্সিকোর বাইরের চেহারায় প্রথমেই কতকগুলি বৈসাদৃশ্য ও স্ববিরোধিতা চোখে পড়ে। এ গরম উপকূলে ঘেরা একটা ঠাণ্ডা উপত্যকার দেশ। দেশের আকারটা মুষ্কংদেহিভাবে ঁাকান ষোষের শিঙের মতো। কিন্তু মেক্সিকোর স্বত্বটা যদিও প্রধানত উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে, শিঙের সূচাগ্র মুখটা দক্ষিণে ফেরান। এ দেশ কালো ও কটা মানুষের তরঙ্গমালায় ভাসিয়ে রাখা শ্বেত মানুষের একটা দ্বীপ।

বাইরের এই অমিল ও দ্বন্দ্ব অন্তরের দিকেও দেখা যায়। মেক্সিকোর মানুষের মনে বিদ্রোহের তাগিদটা প্রায়ই গভীরভাবে ফুটে উঠেছে, ও তার সঙ্কল্পটাও আপাতদৃষ্টিতে অটল বলে মনে হয়েছে, অথচ এরই মধ্যে কোথাও একটা অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। তাই স্পেনীয় শাসনের অবসান ঘটানর লড়াইয়ের থেকে শুরু করে গত দেড়শ' বছরে মেক্সিকোয় ছোট-বড় বহু বিদ্রোহ-বিপ্লব ঘটে গেলেও তার ফলটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি। বহু ভাঙাগড়ার মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটা টিকে আছে। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে একদিকে রাজতন্ত্রের বিরোধিতাটা তীব্র হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে ভেনেজুয়েলার নেতা ও চিন্তাবিদ সাইমন বলিভার (Simon Bolivar, ১৭৮৩-১৮৩০)-এর আজীবন কালের রাষ্ট্রপতি ও বংশানুক্রমিক সেনেটের ধারণাটাও মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

যে ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব বিদ্রোহের তাগিদ সৃষ্টি করে তার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখলে মেক্সিকোর অন্তরের দ্বিধা ও পরস্পরবিরোধী ভাবের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যাবে।

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভেদ অবশ্যই একদিকে বিদ্রোহের প্রেরণা যুগিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের বিদেশী-স্বদেশী, শোষক-শোষিতের বিভাগ এর মূল। মেক্সিকোয় তিনশ' বছরের (১৫১৯-১৮২১) স্পেনীয় শাসন একদল সুবিধাভোগী রাজপুরুষ ও অভিজাত জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেছিল। অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছাড়াও এরা ছিল বিদেশী। সেইটাই ছিল তাদের প্রধান স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যই 'ক্রিয়োল' (দেশী সাদা মানুষ), 'মেষ্টিজো' (সাদা-কালো মিশ্র রঙের মানুষ), 'ইণ্ডিয়ান' ও নিগ্রোদের থেকে এদের পৃথক করে রেখেছিল। এরই ফলে দ্বিতীয় দলের মধ্যে ক্রমশ একটা জাতীয়তাবোধ জেগে

ওঠা সহজ হয়, তারা সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়তে শুরু করে।

কিন্তু লাতিন আমেরিকার পরিস্থিতিতে এই এক হওয়া, মানুষের জীবনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য-অনৈক্যের প্রশ্নটা একটা জটিল আবর্তের সৃষ্টি করেছে ; যে আবর্ত ১৮২১ সালে স্বাধীনতা লাভের প্রায় দেড়শ' বছর পরেও জাতীয় জীবনকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এ কথা লাতিন আমেরিকার সব দেশ সম্বন্ধেই কমবেশি সত্য, কিন্তু বিশেষ করে সত্য মেক্সিকোর মত 'ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান' দেশগুলি সম্বন্ধে। জনসংখ্যায় ইণ্ডিয়ান বা ইয়োরোপীয়দের প্রাধান্যের হিসাবে লাতিন আমেরিকান দেশগুলিকে 'ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান' ও 'ইয়োরোপীয়-আমেরিকান' এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মেক্সিকো, গুয়েটেমালা, ইকোয়েডর ও পেরু সবিশেষ 'ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান'। এই বিভাগটা কিন্তু সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার হিসাবে করা হয় নি। সংস্কৃতির দিক থেকে আমেরিকানত্ব গড়ে তোলার প্রশ্নটা দুই শ্রেণীর দেশেই প্রায় সমান গুরুত্ব লাভ করেছে। আমেরিকানত্বের কোনো পুরান ঐতিহ্য নেই। এর মধ্যে নূতন জাতির নবচেতনা লাভ ও তার বিকাশের চেষ্টা দেখা যায়। 'ইণ্ডিয়ান-আমেরিকান' দেশগুলিতে এই সাংস্কৃতিক প্রশ্নটা শুধু আর একটা আয়তন যোগ করেছে।

আমি আগে বলেছি মেক্সিকো কালো ও ফর্সা মানুষের তরঙ্গমালায় ভাসিয়ে রাখা সাদা মানুষের একটা দ্বীপ। এই অবস্থার প্রতীক Cholula-র বিখ্যাত পিরামিডের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। প্রাক্-স্পেনীয় যুগের ইণ্ডিয়ান সভ্যতার বিভিন্ন ধারার চিহ্ন Cholula-র পিরামিডের বিভিন্ন স্তরে আঁকা হয়ে রয়েছে। আর সবার উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সভ্যতার নজির হিসেবে স্পেনীয় একটি basilica (বিচার-বানিজ্যের হল্)।

এই প্রতীকের দুটি দিক সহজেই চোখে পড়বে। এক দিকে, ইণ্ডিয়ানদের সর্বব্যাপী উপস্থিতি ; অন্য দিকে, ইয়োরোপীয় নিয়ন্ত্রণ ও পশ্চিমী ভাব-ধারণার প্রভাব। মেক্সিকোর চারজন লোকের মধ্যে তিনজনের শিরায় ইণ্ডিয়ান রক্ত বইছে। এদেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ ইণ্ডিয়ান। কোনো কোনো অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান আচার-ব্যবহার ও ভাষা এখনও প্রচলিত রয়েছে। এখানে ত্রিশ জনের মধ্যে বোধহয় একজন মাত্র খাঁটি ইয়োরোপীয় রক্তের মানুষ পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্ত ও গাত্রবর্ণটা সমস্যা নয়। কারণ লাতিন জাতির মধ্যে গাত্রবর্ণের সংস্কারটা কোনোদিনই অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মতো প্রবল ছিল না। স্পেন ও ইতালির

মানুষ লাতিন আমেরিকায় এসে সাধারণত নিজেদের দেশীয় লোকের থেকে পৃথক করে রাখে নি। রক্তের মেশামিশি সহজভাবেই ঘটেছে। দেখা গেছে একই পরিবারে কোনো ছেলের গায়ের রঙ কালো, কারও কটা, কারও সাদা। তবু এ কথাও সত্য যে দেড়শ' বছর আগে পর্যন্ত ইণ্ডিয়ানরা ছিল সাদা রাজপুরুষ ও সাদা জমিদারদের দাস। ইয়োরোপীয় শিক্ষার সুযোগ তাদের কাছে আজও বোধহয় সুলভ নয়। আর্থিক দিক থেকে তারা এখনও বঞ্চিতের দলে পড়ে আছে। আজও ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতিটা মেক্সিকোর জীবনের সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেও যেন সংজ্ঞাহীন। ইণ্ডিয়ান সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড, অনির্দিষ্ট, অন্ধ শক্তি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। এক হিসাবে, এই নিরুদ্ধ শক্তিই মেক্সিকোর জীবনে বিপ্লবের সম্ভাবনাটাকে সদা-সর্বদা জাগিয়ে রাখে।

অন্যদিকে, মেক্সিকোর আধুনিক যুগের ইতিহাসে পশ্চিমী সভ্যতার অনুপ্রবেশটা একটা বাস্তব ঘটনা। স্পেনীয় শাসনের সূত্রপাতের পরে, প্রথমে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রসার ঘটেছে, এবং পরে ক্রমশ ইয়োরোপীয় ভাব-ধারণার আমদানি হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে তার মূল প্রেরণা যুগিয়েছিল ফরাসি বিপ্লব ও সেই সময়ের ইয়োরোপীয় 'প্রাকৃতিক ন্যায় দর্শন' (Natural Law Philosophy)। এর পর ইয়োরোপীয় ভাবধারার পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় মেক্সিকোর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। রোমান্টিক উদারনীতি, উপযোগিতাভিত্তিক মূল্যবিচারের দর্শন (Utilitarianism), ইতিহাসকে বিজ্ঞানের আলোয় বিচার করার ভাবধারা, কোঁতের দৃষ্টবাদ (Positivism) ও অভিব্যক্তিবাদ (Evolutionism), ইত্যাদি, ও পরে সমাজতন্ত্র ও মার্কস্‌বাদী চিন্তা—এ সবেরই প্রভাব গত একশ-দেড়শ বছর মেক্সিকোর উপর এসে পড়েছে দেখা যায়।

কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে পশ্চিমী রীতিনীতি ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবটা প্রথমত, সব শ্রেণীর মানুষের উপর সমান নয়, দ্বিতীয়ত, এ দেশের পরিবেশ মানুষের ভাব-চিন্তায় ও আচার-ব্যবহারে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফলে শুধু যে বিদেশী শাসনব্যবস্থার প্রতিই স্থানীয় মানুষের আনুগত্য নেই তা নয়, ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিও এ দেশে সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয় নি ; তার ঐতিহ্যের প্রতিও স্থানীয় মানুষের আনুগত্যবোধটা দ্বিধাবিভক্ত, অনেকের মধ্যে

সে বোধের সম্পূর্ণ অভাব। এই আত্মগত্যের প্রশ্নটা বড়ো, কারণ তার মধ্যেই মেক্সিকোর বিদ্রোহের অন্তরের রূপটা ধরা পড়ে।

ইয়োরোপীয় রক্তের ক্রিয়োলদের মনে একদিকে তাদের ইয়োরোপমুখিতা ও অন্যদিকে তাদের আমেরিকানত্ববোধ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। মিশ্ররক্তের মেষ্টিজোদের অনুকরণপ্রবণতা তাদের চরিত্রকে দুর্বল করেছে। ইণ্ডিয়ান সমাজের একটা বড়ো অংশ পশ্চিমী সংস্কৃতি ধারার প্রায় বাইরেই পড়ে আছে।

এমন তরল অবস্থায় একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ও নীতিবোধ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সেই বোধের অভাব, তার দ্বিধাবিহ্বলতা মেক্সিকোর পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে, তার জীবনের পথটাকে লক্ষহারা করেছে। অন্যদিকে, কালো মানুষের বিপুল তরঙ্গ ভেসে যাবার আশঙ্কা সাদা মানুষের মনে সর্বক্ষণ একটা অনাস্থা ও ত্রস্ততার সৃষ্টি করে রেখেছে। এই অনবস্থিত অবস্থাই একদিকে বিপ্লবের কারণ, অন্যদিকে তারই মধ্যে বিপ্লবের, মুক্তির স্বপ্নটা রূপ ধরতে চেয়েছে। এইটাই হল মেক্সিকোর বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং এদেশের বিপ্লব-সাহিত্যে ওই অভিজ্ঞতারই বিভিন্ন প্রকাশ আমরা দেখতে পাই।

মেক্সিকোর বিপ্লবী সাহিত্যের স্রষ্টা মারিয়ানো আজুয়েলা (১৮৭৩-১৯৫২) ফরাসি এমিল জোলার মত প্রাকৃতবাদী (Naturalist)। জোলার শক্তি আজুয়েলায় নেই। কিন্তু দু'জনের অভিজ্ঞতার পার্থক্যটা তাঁদের লেখায় ধরা পড়ে। বিপ্লবের চেহারার একটা স্পষ্ট ও নগ্ন রূপ দেখা যায় জোলার *Germinal*-এ। সেখানে বিশেষ পরিস্থিতি যে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে ও সেই শক্তিগুলি বিশেষ কতকগুলি মানুষকে যে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তা নিয়ে তর্ক চলে না। ওই পরিবেশ, মানুষের আদিম প্রকৃতিগত শক্তির ওই অবাধ্য প্রবাহ এবং ওই নিদারুণ পরিণতি, সমস্তটাই একটা প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রে গাঁথা হয়ে এসেছে। এখানে বিপ্লবের যুক্তি কয়লাখনি এলাকার সমস্ত আবহাওয়ার মধ্যে মিশে রয়েছে, প্রত্যেকটি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকৃত সমস্ত কাজ ও কথা এবং প্রত্যেকটি ঘটনা বা দুর্ঘটনা সবকিছুকে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পূর্বপরিকল্পিত চিন্তা ও দর্শন এখানে বিপ্লবের মূল প্রেরণা যোগায় নি, বিপ্লবটাই বৈপ্লবিক দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছে। তাই দেখা যায় *Germinal* লেখার পর 'ভয়ঙ্কর' জোলা গোঁড়া সমালোচকদের চোখে আরও ভয়াবহ সমাজতন্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বিপ্লবের সর্বাত্মক ধ্বংসের মধ্যে তার এই আত্মসমর্থিত রূপটি মেক্সিকোর

লেখকদের উপন্যাসে দেখতে পাই না। সেখানে বিপ্লবের নিগূঢ় আবেগ একটা তাৎপর্যপূর্ণ আধার খুঁজে বেড়ায়, একটা বিশিষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর এক কারণ মেক্সিকোর বিশেষ অভিজ্ঞতা।

আজুয়েলা যে বিপ্লবের কথা লিখেছেন তা আধুনিক মেক্সিকোকে সৃষ্টি করেছে, যে সময়ের কথা লিখেছেন সেটা মেক্সিকোর ইতিহাসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। আজুয়েলার বিষয়বস্তু হল ১৯১০ সালের বিপ্লব। এই বিপ্লবের পরিণতিতে মেক্সিকোর আধুনিক সংবিধান রচিত হয়েছিল। ১৮২১ সালে মেক্সিকোয় স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের যথেচ্ছাচার শেষ হয় বটে, কিন্তু তার পরের অনবস্থিত অবস্থায় কোনো সুষ্ঠু রাজনীতি গড়ে উঠতে পারে নি। প্রথমে Iturbide নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ১৮২৪ সালে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু কোনো রাষ্ট্রপতির মেয়াদই বেশি দিনের হয় নি। ১৮৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র এদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে ও একটা বিরাট অঞ্চল অধিকার করে বসে। ১৮৬২ সালে ফরাসি ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়রা মেক্সিকোয় তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখতে শক্তি প্রয়োগ করে। ১৮৭৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত Diaz-এর একনায়ক শাসনব্যবস্থায় অভিজাত ও ধনী গোষ্ঠীর স্বার্থটা জোরাল হয়। ১৯১০ সালের বিপ্লব এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এর নায়ক ছিলেন আদর্শবাদী Madero। নিজেরই সেনাপতি Huerto-র প্রতিবিপ্লবে তিনি অন্ধকারের মধ্যে নিহত হন। অতঃপর পাঁচ বছর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে। ১৯১৮ সালের বিপ্লবের নেতা Villa ও Zapata কিছুদিনের জন্য শক্তিলাভ করেন ও পরে সেনাধিনায়ক Obregon-এর হাতে তাঁদের পতন ঘটে। Obregon যুদ্ধে জিতে Caranza-কে বিপ্লবের প্রথম অভিনায়ক ও মেক্সিকোর গভর্নর হিসাবে স্বীকৃতি দেন। আজুয়েলা ও ফুয়েন্‌তেসের গল্প-উপন্যাসে এই নামগুলির বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আদর্শের দিক থেকে মূল প্রেরণা যুগিয়েছেন Madero। কিন্তু তাঁর বিপ্লবের স্বপ্ন সফল হয় নি। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনে বিদেশী প্রভাব মেক্সিকোর পরিস্থিতির এখন এক বড় সত্য। স্পেনের জায়গায় এখন এসে দাঁড়িয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। শিল্পের মালিকানা প্রায় সবটাই তাদের হাতে ও আপন স্বার্থ রক্ষা করতে তাদের স্থানীয় জমিদার ও শিল্পপতিদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। তাই তার গল্প-উপন্যাসের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক স্থান-কালের ইঙ্গিতটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ইতিহাস-প্রবণতা ফুয়েন্‌তেসের মধ্যেও দেখা যায়। তিনি একটা সুদীর্ঘ কালের পরিপ্রেক্ষিতে, ঐতিহাসিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, তার ভাঙাগড়া, উঠানামার

মধ্যে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে ভালবাসেন, পরোক্ষভাবে যেন ইতিহাসের অমোঘ যুক্তিটাকে যাচাই করে দেখতে চান। অথচ আজুয়েলার ঘটনার বিবরণে বিপ্লবের অর্থহীন ছবিটাই বড় হয়ে ফুটে ওঠে, বিপ্লব সম্বন্ধে তা একটা বিভ্রমই জাগিয়ে তোলে, আপাতদৃষ্টিতে এ-ও মনে হয় আজুয়েলা বুঝি বিপ্লবের বিরোধী।

'মাছি' গল্পটির কথা ধরা যাক। একে গল্প না বলে আত্মঘাতী যুদ্ধের সামনে স্বার্থপর, ভীরু ও নীতিজ্ঞানহীন সামরিক ও বেসামরিক পলায়নরত একদল লোকের নক্‌শা বলা যেতে পারে। এরা খড়কুটো, কিন্তু খড়কুটোর মত অপাপবিদ্ধ নয়। বিদ্রোহের সমস্ত আবহাওয়াটাকেই এরা বিষিয়ে তুলেছে।

এখানে বিপ্লবের প্রেরণা ও লক্ষ দুটোই অস্পষ্ট। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যেও আজুয়েলা বিপ্লবের অনিবার্যতার পরিচয় পেয়েছেন। তাঁর *Underdogs* (১৯১৬) উপন্যাসের বিদ্রোহী নায়ককে তার স্ত্রী প্রশ্ন করেছে : 'এ যুদ্ধ করে চলেছ কেন?' উত্তরে Demetrio Macias প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছে। পরে একটা পাথরের নুড়ি তুলে পাহাড়ের খাদটার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে গড়িয়ে পড়া নুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে বলেছে : 'পাথরের টুকরোটাকে দেখ, ওটা থামতে পারে না।'

বাস্তববাদী ও প্রাকৃতবাদী আজুয়েলা একদিকে যেমন, বিপ্লবের বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রমটা লক্ষ করেছেন, অন্যদিকে তেমনই মেক্সিকোর পরিস্থিতিতে এমন কিছু দেখেছেন যা বিপ্লবের সম্ভাবনাকে অবিরত জাগিয়ে রাখে, তাকে অনিবার্য করে তোলে। বিদ্রোহের শুরু ও সমাপ্তিতে শেষ পর্যন্ত কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না। অন্যায়ের প্রতিরোধে ও মুক্তির স্বপ্নে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে, দুর্ঘটনা ও দুর্নীতির আবিলতায় তা লক্ষহারা হয়ে পড়ে। এরই প্রতিচ্ছবি আজুয়েলা ও ফুয়েন্‌তেসের গল্পের নায়কদের মধ্যে দেখা যাই। এইজন্যই তারা একই সঙ্গে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী।

ফুয়েন্‌তেসের 'আর্তেমিও ক্রুজের মৃত্যু'র (*The Death of Artemio Cruz*) ক্রুজ চরিত্রে এই দ্বন্দ্বের একটা নিপীড়িত ছবি দেখতে পাই। ইতিহাসকে সামনে রেখে লেখা এই উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ যে অত্যন্ত আত্মমুখী (subjective) তার কারণ ওই রচনারীতি ছাড়া আত্মদ্বন্দ্বের প্রকৃত রূপটা ফুটিয়ে তোলা বোধহয় সম্ভব ছিল না। গল্পের শুরুতেই দেখি ফুয়েন্‌তেসের নায়কের পরিণত জীবন শেষ হতে চলেছে। চেতন-অর্ধচেতনের মাঝামাঝি তার অবস্থা। আমি, তুমি,

তার – এদের মধ্যে পার্থক্যটা কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে, কখনও ভেসে উঠছে। মরণের মুখে ক্রুজের আলো অন্ধকার মেশান অবস্থিতিতে শেলির কথাটি প্রমাণিত হচ্ছে : 'আমি, তুমি, সে – এই চিহ্নের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছু নেই, একই মনের বিভিন্ন চেহারা ওই চিহ্নের মধ্যে পরিমিত হচ্ছে।'

নায়কের রোগের যন্ত্রণাকে ফুয়েন্‌তেস তলপেটে ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলক বিঁধে থাকার যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই ইস্পাতের বিঁধে থাকাটা বোধহয় মেক্সিকোর অবস্থারই একটা প্রতীক। তেমনি সুদীর্ঘ জীবনের শেষে মৃত্যুমুখে ক্রুজের আত্ম-পর জ্ঞানের মেশামিশির মধ্যে তার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ চরিত্রের, তার বিচ্ছিন্ন সত্তার নিগূঢ় পীড়নের রূপটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক্রুজ চরিত্রকে লেখক বিভিন্ন স্তর থেকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কখনও সে বাইরের মানুষ, প্রথম পুরুষ। সেখানে তার জীবনের ঘটনা, তার কর্মটাই প্রধান। এই ঘটনা ও কীর্তিকাহিনী টেপ-রেকর্ডারে সে তুলে রাখতে পেরে আত্মগরিমা বোধ করেছে। দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণাবোধ ও আত্মগত অত্যন্ত ব্যক্তিগত চিন্তার প্রকাশ অন্তর্দিকে ঘটছে 'আমি' ও 'আমার' মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে আর একটা অবিরাম প্রবহমান চেতনার বোধ আছে ; যে অবস্থায় বাইরের জগতের কাছে সে মৃত, যে দেহটা তার অত্যন্ত নিজস্ব তার যন্ত্রণাটাও তার বোধের বাইরে গিয়ে পড়ে। 'আমি' ও 'সে' এই দুয়ের মাঝামাঝি এক অবস্থায় নিজেকেই দেখতে চায়, নিজের প্রকৃত সত্তাটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু তার জীবন ও জীবনের পরিণতিটা অমোঘ। তার সকল চেষ্টাই বিফল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে স্বীকার করেছে : 'আর্তেমিও ক্রুজ··· নাম···কিছু নেই···হৃদয়ের সাড়া···কিছু নেই···তুমি তাকে এখন চিনবে না। তুমি আমারই মধ্যে আছ ও আমি যখন মরব আমার মধ্যে তুমি থাকবে। আমরা তিনজন একসঙ্গে মরব। তুমি···মরবে, মরেছ···আমি মরছি।'

কিন্তু মৃত্যুটাই শেষ কথা নয়। মৃত্যুর মধ্যেই নবজন্ম ও মুক্তির এবং নূতন কর্ম-প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আছে। মৃত্যু একটা বিশেষ অবস্থার ফল, তার পরিণতি মাত্র। মৃত্যুর এ চেহারা লেখককে নিরাশ করে না। তাই বোধ হয় বইয়ের গোড়ায় ফুয়েন্‌তেস মঁ্যতেইনের (Montaigne) এই কথা কয়টি উদ্ধৃত করেছেন : 'মৃত্যুর চিন্তার মধ্যেই মুক্তির আভাস পাওয়া যায় (the premeditation of death is the premeditation of freedom)।'

বিপ্লব সম্বন্ধে এই আশাবাদ ও সে সম্বন্ধে একটা অনিবার্যতাবোধ আজুয়েলা-

ফুয়েন্‌তেসের উপন্যাসের একটি প্রধান সত্য। দু জন লেখকের মধ্যেই বিপ্লব সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প আছে, সেটা বিপ্লবকে কাছ থেকে নয়, দূর থেকে দেখার স্বপ্ন ; উপস্থিত দুর্ঘটনাকে তা ছাপিয়ে ওঠে, ইচ্ছা ও আবেগ বাস্তব হয়ে পড়ে। এই স্বপ্ন রূপ পেয়েছে বিশেষ ধরনের একটি চরিত্রে। আজুয়েলার *Underdogs*-এ আন্তিক দিক থেকে প্রকৃত বিপ্লবী Macias নয়, Solis। বিপ্লবের অসাফল্য তাকে আশাহত করেছে, কিন্তু তাতে সে বিপ্লবে আস্থা হারায় নি। সে বিপ্লবের ধ্যানে মগ্ন হয়েছে, 'বিপ্লবীয় বর্বরতার মধ্যে তারই সুন্দর রূপে'র কল্পনা তাকে মুগ্ধ করেছে। মেক্সিকোর বিপ্লবে সাহিত্যে এই স্বপ্নালু, অসফল অথচ প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্রের বারবার আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়। আজুয়েলার 'Bosses' গল্পে কবি ও বুদ্ধিজীবী Roderiquez Solis-এরই আর এক সংস্করণ। 'আর্তেমিও ক্রুজের মৃত্যু'তে ক্রুজ-পুত্র Lorenzo-র মধ্যে অন্তরের প্রেম দিয়ে আঁকা, ট্রাজিক সুন্দর বিপ্লবী মূর্তিটি স্পষ্ট দেখা যায়।

এই কল্পনা বিপ্লবের সর্বব্যাপী অশান্ত দুর্বার একটি কোণমাত্র জুড়ে রয়েছে, তার তিক্ততাকে কিছুটা লাঘব করছে। কিন্তু মেক্সিকোর যেটা বাস্তব পরিস্থিতি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐক্য ও নীতিবোধে যে দ্বন্দ্ব ও বিক্ষুব্ধতা, বিপ্লবের সদাজাগ্রত সম্ভাবনা ও তার বিফলতার যে সমস্যা, তার গুরুত্বটা স্বভাবতই বড়ো। এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা সচেষ্ট প্রয়াস ফুয়েন্‌তেসের লেখায় দেখতে পাই। মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাটা সত্যিই মুক্তি সম্বন্ধে সচেতন চিন্তার প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আর্তেমিও ক্রুজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে, বোধকরি সেই সঙ্গে মেক্সিকোকেই সম্পূর্ণভাবে দেখবার চেষ্টা করছে।

এই সমগ্রভাবে দেখার চেষ্টাটা আরও স্পষ্ট হয়েছে ফুয়েন্‌তেসের সর্বাধুনিক উপন্যাস *El Suens* (স্বপ্ন)-এ। Cholula-র ঐতিহাসিক পিরামিডের পটভূমিকায় একদিনের ঘটনা নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে লেখক মেক্সিকোর স্পেনীয় যুগের শুরুর আগে থেকে আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা তার পরিপ্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমী সভ্যতা ও কীর্তির মূল্যায়নে নেমেছেন। একদিনের কাহিনীর মধ্যে যুগ-যুগের ইতিহাসকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশেষ করে বিংশ শতকের বিভিন্ন পর্বের ঘটনা এতে তুলে ধরা হয়েছে। এবং সবের মধ্যে মেক্সিকোর অন্তরাত্মার পরিচয় ও মুক্তির পথ খোঁজার তাগিদটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অবনী বাড়ি নেই

উদয়ন ঘোষ

ভেবেছিল বাড়ির সামনের মাঠটায় সে ঘুরবে। হাত দুটি পিছনে যুক্ত করে সে মাঠে এল। একটা তেরছা মাঠ, ঘাস নেই, নোংরা, কোনায় ছাইও জমেছে, বাদামের খোসা, কাগজের টুকরো, ছেঁড়া অব্যবহার্য ঠোঙা, প্যাকেট ; তার বেশিক্ষণ পা রাখতে ইচ্ছা গেল না, অবনী পথে উঠল। আসলে ওটা মাঠ নয়, এক ছটাক কি দেড় ছটাক জমি, হয়তো একটা প্লট ছিল কোনোদিন, তিনপাশের প্লটগুলো একটু একটু খেয়ে নিতে এবং আরও খানিকটা, গলির মোড় ঘুরতে গিয়ে, হাত করেছে ; পড়ে রইল ছটাক, বেওয়ারিশ ; বড় গাড়ি এ গলিতে ঢুকলে ওখানে দাঁড়িয়ে যায় মাত্র, তবে অঘ্রান মাস থেকে ঐটুকু জমিতেই রোদ হয়, দুপুর একটা অব্দি থাকে, অবনী নিজে এর নাম মাঠ রেখেছে, আর কেউ একে মাঠ বলে কিনা সে জানে না, আগে কখনো এ মাঠে পাও দেয় নি। তার ঘরের জানলা দিয়ে মাঠটা ভাল দেখা যায়, মনে হয় ঘাসও আছে। এ গলিরই একটি যুবককে একদিন দুপুরে সে এই মাঠে আনমনা দেখেছিল, ছোট্ট জায়গাতে বেশ ঘুরছিল যুবক, মুখ নিচু করে, সব সময়েই তার ঠোঁটে সিগারেট ছিল, যেন সে বড়ো মাঠে ঘোরার আরাম পাচ্ছে, এমন পায়ে চলা ভাবটা তার ছিল। সেইদিন থেকে সে, ওখানে একদিন ঐরকম ঘুরবে, ভেবেছিল। অবনী সেই যে পথে উঠেছিল, উঠেইছিল মাত্র, এক ফোঁটাও হাঁটে নি, থেমেই আছে, তার বাড়ির দরজাটা সটান খোলা, সে মেশিনের অটোমেশনের ন্যায় ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে, কী যেন সে করে যাচ্ছে, ভালো লাগছে না, এমন সম্বিতে সে, অবনী, সিগারেটটা দেখল নিজের নাকের নিচে। সিগারেট না খেলেই খারাপ লাগে, খেলে ভাল লাগে না, সিগারেটটা শেষমেষ দেখতে পারল না, তাই উল্টে সে দেখল তার বাড়ির খোলা দরজাটার দিকে কে যেন তাকিয়ে আছে, এবং তার দিকেও তাকাচ্ছে, নিজেকে তার বোকা লাগল। সে

একটু এগুতে যাবে, এমন সময় সেই লোকটা তড়িঘড়ি করে তার দিকে এগিয়ে এল। 'অবনী দত্তের বাড়ি কোন্‌টা বলতে পারেন?' 'কোন্ অবনী দত্ত?' বলতে গিয়ে সে, অবনী দত্ত, বোকা বনে গেল। 'ব্যাংকে কাজ করেন, ইউনাইটেড ব্যাংকে!' 'ব্যাংকে?' অবনী বিস্ফারিত হল। 'হাঁ, আমি এসেছি একবার, কিন্তু দরজাটা অচেনা লাগছে, ঐ বাড়িটা না?' 'কোন্ বাড়ির কথা বলছেন?' অবনীর রোমাঞ্চ এল। 'ঐ যে পেরেক বসানো দরজা, খোলা আছে, আমি এসেছি একবার, কিন্তু ঠিক এই রকম দরজা···।' 'আপনি চেনেন তাকে?' 'না মানে ঐ একদিনই এসেছিলাম···।' 'কী রকম দেখতে বলুন তো?' অবনী চোখ বুজে সিগারেটে আনাড়ির মতো টান দিল। 'এই আপনার মত লম্বা, বয়স আপনার থেকে কমই হবে, চোখে চশমা আছে, বেশ স্মার্ট ভদ্রলোক, আপনি এ পাড়াতেই থাকেন না?' অবনী শাকের ব্রিজে আঙুল রাখল, ভাবে, না চশমা নেই, চশমা ফেলে এসেছে। 'না আমি নতুন এসেছি।' 'ঐ বাড়িটা কি হবে?' 'দেখুন না খোঁজ করে।' বলেই অবনী ধরাকে সরা জ্ঞান করে চলতে লাগল।

চলতে চলতে তার মজা লাগছিল খুব। আজ ব্যাংকে না গেলে লোকটা বেশ জব্দ হয়, তবু ব্যাংকে যেয়ে লোকটাকে আরও জব্দ করবে ভাবল, এবং সে ঠিক করে ফেল প্রায় আজ সহসা ব্যাংকে যাবে না। কিন্তু লোকটা তাকে চিনতেই পারল না! এই তো মাস তিনেক হবে, বেলা আড়াইটের পর ওর সেভিংস্ থেকে টাকা তুলে দিয়েছে নিজের গুডউইলের রিস্কে। তার পর-পরই বাড়িতে এসেছিল মিনিমাম লিমিটটাও বিনা জরিমানায় তুলে নিতে, অবনী ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আজ একদম চিনতেই পারল না। পেরেক বসানো দরজা, সত্যি নজর আছে লোকটার, অবনীর কখনো 'পেরেক বসানো দরজা' কথাটা মনে হয় নি, এমনকি তার বাড়ির দরজায় পেরেক বসানো আছে, এটা আদৌ সে ভাবে নি। প্রথম বাড়িটা নেবার সময়, আজ ন বছরের ব্যাপার, দরজাটাকে খুবই শক্ত মনে হয়ে তার সিকিউরিটির কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে ওগুলি যে পেরেক, তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি, তার তো মনে হতো লোহার চাকতি বসানো, এবং এক ধরনের দরজা, যা অনেককাল আগে আকছার তৈরি হতো। লোকটার এক দেখাতেই পেরেকের কথা মনে ধরেছে, অথচ তাকে সে ধরতে পারল না; কিন্তু আজ আবার কী প্রয়োজন ছিল? লোকটা খুবই দুঃস্থ মনে হয়, টাকাকড়ির জন্য না হলেও অন্য কারণে, মুখের রেখাগুলি পর্যন্ত সর্বদা 'আমি কোথায় যেন হেরে যাব' ভাব। লোকটার কাছে ধরা দিলে কী এসে

যেত! তার কী দোষ, লোকটা নিজেই ধরতে পারল না, শেষপর্যন্ত ধরতে পারলেও সে এক গাল হেসে দিত। চশমার মধ্যে তাহলে অবনী দত্তের বারো আনা ধরাটা আছে, চশমা থাকলেও লোকটা ধরতে পারতো কিনা কে জানে, যাই হোক অবনীর প্রথমে বেশ মজাই লাগছিল, পরে একটি পালানো-পালানো ভাব এসে গিয়েছিল, মানে তার এই সকালে লোকটার সঙ্গে বসবার ইচ্ছা ছিল না, কেননা দুবারই দেখেছে অবনী লোকটি সাতকাণ্ড রামায়ণ খুলে বসে। একবার পিছন ফিরে দেখল অবনী, না লোকটার সাড় হয় নি, তবু হন হন করে এগুতে লাগল; বড় রাস্তা, সার্কুলার রোড চোখে পড়াতে সে আরও দ্রুত এগুতে লাগল। সার্কুলার রোডে পড়েই অবনী বাঁ দিকে ঘুরে গেল। মৌলালির কাছাকাছি অতর্কিতে সে গা ছাড়া দিল। না, আর কোনো সম্ভাবনা নেই, এখন দোরে মাথা খুঁড়ে মরলেও অবনীকে পাওয়া যাবে না, অবনী এখন হাওয়া, প্রকারান্তরে হাওয়াও দিচ্ছে খুব, রোদ তাড়িয়ে দেবার মতো হাওয়া, কেমন একটা গা-সওয়া হাঁটা এসে যাচ্ছে অবনীর, যেন তার আপিশ-টাপিশ নেই, কেন যেন একটা বানানো অসুখের ভান আনতে গিয়ে তার শীত-শীত লাগছে, আজ কিছুতেই আর ব্যাংকে যাওয়া চলে না, কেননা লোকটা নিশ্চয় আজ ব্যাংকে যাবে, লোকটার মুখোমুখি সে বোধহয় আর কখনো হতে পারবে না, এত অসহ্য লোকটাকে আগে কখনো লাগে নি, অবনী গভীরভাবে কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ব্যাংকে না যাবার আলস্য দখল করল, দখল করতে গিয়ে হাই-ওঠার মতো ভীষণ সংক্রামক নাই-কাজে তার চোখ বুজে এল। অবনী সত্যিই হাই তুলল। এই একটি কাজ সে চিন্তা করলেই অনায়াসে করতে পারে। কিন্তু লোকটা আজ ব্যাংকে কার কাছে দ্বিজ বংশীদাস হবে? তার বুকের মধ্যে বার বারই 'অবনী-বাবু বাড়ি আছেন, অবনীবাবু!' ঘুরে-ফিরে আসতে লাগল, পেরেক মারার আওয়াজের মতোই কানে ও বুকে লাগছে, অবনীবাবু! যেন সব শব্দ ছাপিয়ে গলিটা চুরমার হয়ে যাচ্ছে, এবং আরেকবার 'অবনীবাবু' উচ্চারিত হবার আগেই মাছির শব্দ শোনা যাচ্ছে, মানে 'অবনীবাবুর' পেরেকমারা খানিক থামলে পাড়া জুড়ায়, মৃত্যুর আগে নাকি মাছির শব্দ শোনা যায়, পাড়াটা জুড়িয়ে যাচ্ছে সেই মাছির শব্দে; ··· লোকটা সোজা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল হসপিট্যাল (কলেজ) থেকে ব্যাংকে গিয়েছিল, ···'অবনীবাবু!'···তখন আড়াইটে বেজে গেছে,··· মাছির শব্দ,··· লোকটার স্ত্রীকে অসময়ে হাসপাতালে রেখে, কিছুই রেডি ছিল না, টাকাটা তিনটের মধ্যে জমা না দিলে ফ্রি-বেডে যেতে হতো,

অর্থাৎ মেঝেতে, টাকাটা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত অনর্গল বলে গিয়েছিল লোকটা, ছোট মেয়ে এবং চার বছরের বড়ো ছেলেকে ঘরে তালা দিয়ে এসেছে, ফিরে গিয়ে তাদের ছাড়াতে হবে,··· 'অবনীবাবু !'···আজ কাকে তালা দিয়ে এসেছেন সিক্স টু জিরো নাইন ?··· অবনীর কানে ঝিন্ নামল,··· মাছির শব্দ,··· জোড়া গির্জার মাথার উপর আকাশটা বড় নীল চোখে পড়ল, আজ আবার বউকে তালা দিয়ে আসে নি তো, হাসতে গিয়ে অবনী বুকে চোট পেল ; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল লোকটার সেভিংস্ আকাউন্টস্ নাম্বারটা তার হুবহু মনে আছে, সিক্স টু জিরো নাইন, অ্যাকাউন্টেন্ট সাহাচৌধুরী বলেছেন, তার মেমারির জন্যই চীফ ক্যাশিয়ারের প্রমোশনটা হয়ে যাবে, রামলাল আগরওয়াল। থ্রি এইট নাইন ওয়ান, মিসেস হেমলতা ঘোষ ফাইভ ফাইভ জিরো ওয়ান, আর সেই লম্বা নস্যি নেয়া কনট্রাকটর, যে আমি টাকা গুণবার সময়ই টাকা গুণে ফেলে, পরে আর গোণে না, দ্রুত বেরিয়ে যায়, তার ফাইভ ফোর সেভেন সিক্স, আর যে স্কুল টিচারটি সারাক্ষণ টোকেনটা হাতেই রাখে, কদাচ পকেটে রাখবে না, টোকেনটা নেবার সময় কেমন ঘেন্না লাগে, তার নাইন নাইন সেভেন জিরো 'এ্যাণ্ড ইটস্ নট্ লিগ্যাল দত্ত, মুখ দেখেই এ্যাকাউন্টস্ নাম্বার মনে এসে গেলে পার্টি অবজেকশন দিতে পারে,' সাহাচৌধুরী বাঁ চোখ ছোট করে ; কিন্তু সিক্স টু জিরো নাইন আজ কী জন্য এসেছিল, এ ধরনের পার্টি বিপদে পড়লে তবে ব্যাংকে আসে, এবং এরা অধিকাংশই ক্রস-চেকের পার্টি, জমা ক্রস-চেক, ড্র করে ক্যাশ, বলতে গেলে ক্রস-চেক ভাঙাবার জন্যই এ্যাকাউন্ট খোলে সেভিংসে ; সিক্স টু জিরো নাইনের সব চেকই এল আই সি-র, কী জানি বীমার দালাল কিনা, বীমার কত-গুলি দালাল আছে, যারা সিরিয়াস্লি দালালি করে না, হয়তো আসলে মাস্টারি করে, কিংবা কোনো সরকারি কেরানী, বউএর নামে এজেন্সি নেয়, নিজের নামেও নেয়, তবে কি তার ক্রস-চেকের ব্যাপার ছিল আজ ? অবনীর মনে পড়ল এক স্কুল টিচারের কথা, বোর্ড থেকে খাতা দেখার টাকা পেয়েছে ক্রস-চেকে, অথচ টাকাটা সেদিনই দরকার, হু হু করে মনে পড়ে গেল অবনীর, গ্রেভইয়ার্ডের উল্টো দিকের নোংরা বাজারগুলোর কাছাকাছি এসে, 'কোনোমতেই কি আজ টাকাটা মেলে না' ; 'কী করে সম্ভব, স্টেট ব্যাংকের চেক, ক্লিয়ারেন্স-ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার আছে, সাতদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন, তবে আমি দুদিনেই ব্যবস্থা করে দিতে পারি' ; 'তাহলে ব্যবস্থাটা আজই করে দিন না, আজ বাজার হয় নি, কালকের বাজার দুয়ের কথা, ট্রাম-বাসের পয়সা পর্যন্ত নেই, ঘরে গ্রসারি পর্যন্ত

নিল্, দেখুন না দাদা, আপনারা ইচ্ছে করলে সব পারেন, আজ কত তারিখ মনে আছে তো, হরিণঘাটার কার্ড বাতিল হয়ে যাবে কাল টাকা জমা না দিলে, সাত-সকালেই দিতে হবে, আমার মাইনের কথা ভাবছেন, পাঁচ তারিখেই শেষ, মনে হয় যেন পকেটমার হয়ে গেছে, চার তারিখে অবশ্য পকেটমারই হয়ে গেছে মশাই, শালীর বিয়ে ছিল'; কেমন মরা ইলিশের চোখ, তেলতেলে কপাল, মুখটা দাড়িতে অশৌচ, কেমন একটা মা-মরা ভাব; অবনী ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, উইথড্রয়াল-স্লিপে তারিখ না বসিয়ে টাকার অঙ্ক ও সই নিয়ে সে পাশবুক সমেত স্লিপটা রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে, তারপর নিজের এ্যাকাউণ্ট থেকে টাকাটা দিয়েছিল, লোকটাকে জানতে দেয় নি, চেকটা ক্যাশ হয়ে এলে নিজের এ্যাকাউণ্টে তুলে নিয়েছিল টাকা, ব্যাপারটায় কোনো রিস্ক নেই, কিন্তু উপকার করা হয়ে গেল, পরে একদিন রাস্তায় দেখা হতে সে কী কৃতজ্ঞতা, স্কুল মাস্টার বলেই; অবনী সহসা নিজেকে 'বাস ধরব' ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হল, সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল সে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে, না পেরে, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, এবং রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবার পরও দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলতে দুলতে রাস্তা পার হতে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে সহসা টলে পড়ে যাবার মতো ভয় পেয়ে, পরক্ষণেই একটা দুরন্ত ট্রামের দুই দোলানো চোখ দেখে আলগোছে রাস্তা পার হয়ে গেল, প্রায় লাফ মেরে ফুটপাথে উঠবার সময় হোচট খেতে খেতে সে কবরখানার কাঠের এনট্রান্সটার সামনে এসে গেল। কোনো রকম প্ল্যান ছাড়াই অবনী কবরখানায় ঢুকে পড়ল। এর আগেও এসেছে বারকয়েক। মধুসূদনের কবর দেখতে। কবরের মাথায় যে দাঁড়ানো ফলকটায় একটা পদ্য লেখা আছে, সেটা দেখে প্রথমবার তার ইতিহাস দেখার আনন্দ হয়েছিল। আরও অনেককে দেখতে নিয়ে এসেছে সে। আজ আরেকবার দেখবার সাধ নিয়ে সে বাঁ দিকে গেল, কেননা তার মনে হল বাঁ দিকেই কবরটা আছে, কিন্তু অবনী আজ খুঁজে পেল না, বরং একটা কুঁড়েঘর, একটি বাঁধানো বেমক্কা চৌবাচ্চা দেখতে পেল, যা আগে কখনো দেখে নি, আরেকটা জিনিসও সে দেখতে পেল, সে হল একটি সরু পাইপ লাইন, এবং একটি বড় গাছ, গাছতলায় একটি ছোটখাট ফাঁকা মাঠ, সহসাই অবনীর হুহু করে সকালের মাঠ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া, এবং লোকটার হাত থেকে বাঁচবার জন্য দ্রুত সার্কুলার রোডে পড়া ইত্যাদি সব মনে পড়ে গেল। সে গাছতলায় বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ম্যাচবাক্স মাঠের উপর রাখল। তার এই বসে পড়াটা বসে পড়ার মতোই, এলিয়ে পড়ার

নতোও অনেকটা, কেননা একটু বসেই উঠে যাব এমন বুড়ি ছোঁয়া ভাব তার নেই, বরং ছুটি-ছুটি ভাব তার এসে যাচ্ছে, অভ্যাসবশত সে শেষবার চারপাশ তাকাল, ঘড়ি দেখার জন্য হাত তুলতেই তার মনে পড়ল ঘড়িটা সে আজ চাবিও দেয় নি, ওমনি পড়ে আছে ড্রয়ারে, তবু এখন কটা আর হবে, বড় জোর আটটা, এখনও সময় আছে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে, দড়াম করে দরজা খুলে, ছপছপ করে স্নান করে, একেক থাবায় ভাত গিলে, আরেক ছুটে ব্যাংকে পৌছানো যায়, মিনিট দশেক দেরি হলে সাহাচৌধুরী রসিকতা করবে মাত্র, 'জানলা বন্ধ করে ঘুমিয়েছিলেন বুঝি ?' যদিও মাত্র একদিন বলেছিল সাহাচৌধুরী, এবং তাও বেমক্কা পায়খানা পেয়ে যাওয়ার জন্য দেরি, সাজগোজ করে বেরুবার মুখে কী বিপত্তি ! কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে নি, আর্ধেক পোষাক ছেড়ে ঝড়ের মতো ফিরে গেলেও ঝড়ের মতো বেড়িয়ে আসতে পারে নি, পাক্কা বারো মিনিট লেট, আর তাতেই সাহাচৌধুরী···, কিন্তু আর কখনো হয় নি, অবনী দত্ত এই ব্র্যাঞ্চের একমাত্র 'ক্যাশ' যার কখনো দেরি হয় না, টাকা গুণতে দেরি হয় না, উইনডো ডেলিভারিতে টেনার তো দূরের কথা একটি টাকাও কম বা বেশি যায় না ; সাহা-চৌধুরী নিজের টেবিলে চা খাইয়ে কনফিডেনশিয়াল রেকমেণ্ডেশান নিচুগলায় তার কাছে কবুল করেছে, 'আপনি তো চীফ হয়ে যাচ্ছেন, আই উইশ ইওর গুড লাক, হেয়ার ইজ ইওর এনভেলাপ', একটি বাদামি খামের উপর আঙুলের টোকা মেরে বলেছেন , যদিও তাদের ব্র্যাঞ্চের ইউনিয়ন সেক্রেটারি স্পষ্টত বলেছিলেন, 'আপনি ট্র্যাপে পড়ছেন অবনীবাবু, আপনাকে ভাল কাজ করার লোভ দেখাচ্ছে, ম্যানেজমেণ্টের ধারণা বোঝেন তো, আরও বেশি কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে, এবং মাঝে মাঝে কাজের দাম দিলে, আপনি আর ইউনিয়ন-ফিউনিয়নে যাবেন না ; দেখুন না, আপনার রেকর্ড ভালো, লেট নেই, প্রিভিলেজ লিভে হাত দেন নি, আপনার ক্যাশ মিলে যায়, পার্টি আসে আপনার দৌলতে, কাস্টমার ভালো ব্যবহার পায় আপনার কাছে, আপনি ইউনিয়নে মাতলে, বুঝলেন না, সাহেব-মোসাহেবরা বিপদে পড়ে, আপনি ভেবে দেখবেন, সাহাচৌধুরী শুনেছি আপনার বাড়িতে বেড়াতেও যায়, আপনি মোসাহেবি পারেন না বলেই আপনাকে অ্যালার্ট করছি, আসলে আপনার গুডনেসে···ওরা আপনার সোস্যাল গুডউইলকে এক্সপ্লয়েট করছে, অবনীবাবু !' অবনীবাবু সে সব কথা বোঝে, অবনীবাবুর মাথাটা পরিষ্কার, সে আরও বোঝে ইউনিয়নের যে কোনো লোককে অ্যাকাউণ্টেণ্ট করে দিলে রাতারাতি তারা দালাল বনে যাবে, মোসাহেবও হয়ে যাবে ম্যানেজ-

মেণ্টের, আমরা সবাই বর্ডারের লোক মশাই, ঐ যে আপনাদের প্রভাত কর বলে 'মধ্যবিত্তদের নিয়ে কাজ !', ঠিক বলে, বোধহয় প্রভাত করের থেকেও সে আরও আল্‌টিমেটাম দিতে পারে, আমরা সবাই জংশন স্টেশনে কোন গাড়িতে যে উঠব, মুখ দেখে বুঝবার জো নেই, ডিলুক্সেও উঠতে পারি, প্যাসেঞ্জারেও উঠতে পারি, লোক্যালেও উঠতে পারি, বুক-পকেটে টিকিট আছে, কেউ তা বার করে না : এ সব বুঝে-সুঝে সে পরিষ্কার আছে, ব্যাংকের দরজার সামনে পিকেটিং হোক, দেখুন না, দিনের পর দিন ধর্মঘট করে যাচ্ছি, সুতরাং আমি ঠিক আছি, ডিসিপ্লিন নাও, পেন-ডাউন করব, পিকেট কর, সিক্স ওয়ার্ক করব, সাহাচৌধুরী যা বলবে, শুনে যাব, আহ্লাদিত হব না, সন্দেহও করব না, উনি চা খাওয়াতে চাইলে চা খাব, উনি কি আমার শত্রু যে শুধু পাঞ্জা লড়ব, এইতো ইউনিয়নে কতো লোকের বোন আছে, মেয়েও আছে, সাহাচৌধুরী ব্যাচিলার, বলুক না, আপনার বোনকে আমি বিয়ে করতে চাই, আপনার মেয়েকে আমার মা পছন্দ করেছেন, তখন কোথায় বা প্রভাত কর, আর কোথায় বা ক্লাস-কনশাসনেস বা জ্যোতি বসু, ওসব আমার দেখা আছে, বলছেন বলুন, শুনে যাচ্ছি, আমি সবার কথাই শুনি, কারুকে ফেরাই না ; আর গুডনেস, শুনতে আজকাল ক্লান্ত লাগে অবনীর, কারুকে ফেরাতে পারি না বলেই তো গুডনেস হয়ে যায় ; পর কাছে এসে যায়, অনুনয়-বিনয় করে, বেশিক্ষণ শুনতে ভালো লাগে না, উপকার করে দি', পর ঠাণ্ডা হয়ে চলে যায়, তখন যে ফাঁকা-ফাঁকা ভাব থাকে, তা তার ভালো লাগে, ঐ ফাঁকা ভাবটার জন্যই অপরকে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা অবনীর স্বভাব ; ডিটেইলে এসব বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, লোকে বলবে, বিনয় হচ্ছে, আড়ালে বলবে, নদীয়ার ধুলো ; কিন্তু অবনী অনেকবার দেখেছে, লোকে তলব না করলে সে গা ঢাকা দিতে পারে, এই যেমন আজ, লোকটা চিনতে পারল না, হয়তো পরোপকারী অবনী দত্তের কাছে বিপদে পড়েই এসেছিল, কিন্তু অবনী দত্তকে যখন চিনতে পার নি, যখন সে বাড়ি নেই, তখন তোমার বিপদ শিকেয় তুলে রাখ ··· সহসা অবনীর বুকটা শুক্ল শীতের মত শিরশির করে উঠল, কেননা তার বুকের অতো পাটা নেই যে মানুষের বিপদ দেখলে মুখ ফিরিয়ে থাকবে, কারো কাছে জবাবদিহি করার নেই, তবুও ; যেন একবার স্টার্ট নিয়েছে, ব্রেক কষতে হবে কোথায় জানা নেই ; সত্যিই তার মাঝে মাঝে থামতে ইচ্ছে করে, সে অনেকবার দেখেছে বিপন্ন মানুষের কাঁধে হাত রাখলে একসময় আর কেউ তো দূরের কথা বিপন্ন মানুষটাও কাছে থাকে না, সে যার কাজ করে দিচ্ছে, সে তখন হাওয়া খাচ্ছে, তখন কেমন

একা-একা হাঁপ ধরে যায়। তবু আজকের মতো সে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেয় নি। আসলে কাল তার ভাত খেয়েই রাত্রে ঘুম পেয়েছিল, কখন সদর এবং ঘরের দরজা বন্ধ হয়েছে সে টের পায় নি, সকালে উঠেছে ভোর ছটায়, উঠে চা খেতে খেতে তার মনে পড়েছে, আজ তার বাজার না করলেও চলে, সুতরাং চা সে রসিয়ে রসিয়ে খেয়েছে, তারপর কেমন হাই-তোলা হাই-তোলা ভাব, সামনের একখণ্ড মাঠটার কথা মনে হয়েছে, সে ভাবে নি মাঠটা অতো নোংরা হবে, তারপর সেই সিক্স টু জিরো নাইন, প্রথমে মজাই লাগছিল, অবশেষে একরকমের বিড়বিড়ানি এল, লোকটা তাকে চিনতেই পারল না, এবং রাস্তায় ঊর্ধ্বশ্বাসে চলতে তার পালানো-পালানো রকম এসে গিয়েছিল, খানিকটা দূরে এসে কেমন যেন শান্ত ভাব, হালকা, হাওয়ার মতো শোঁ-শোঁ মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, ভেসে পড়ি ; মানুষকে উপকার করার হাত থেকে বাঁচতে এমন যে আরাম, এক ঘুম ঘুমানোর ভাব আছে, অবনী আগে কখনো টের পায় নি। তবু তার মনটা আবার খচ্ খচ্ করে উঠল, সত্যিই লোকটার যদি বিপদ এসে থাকে, এরপর ব্যাংকে হয়তো যাবে, মিনমিন করে কাউকে হয়তো বলবে, অবনীবাবুকে বাড়িতে পেলাম না, আমার ট্রাব্‌লটা দয়া করে···হয়তো কারুর ভাব এসে যাবে, ট্রাব্‌ল দূর হয়ে যাবে, অবনী দত্তকে কদাচ চিনবে না ; আজকের ব্যাংকের চেহারা কেমন হবে, একা সন্তোষ পোদ্দার দুই কাউন্টার চালাবে, না অনিমেষ এসে বসবে, সাহাচৌধুরী তার এরানা থেকে বার বার তাকাবে সেভিংস্ কাউন্টারে, তার সঙ্গে আজ আড়াইটেয় রিজার্ভ ব্যাংকে রিপোর্ট পাঠাবার ব্যাপারে খানিক সাহায্য করার ইনফর্মাল রিকোয়েস্ট আছে, অবনীর মাজায় খিল ধরল আচমকা, সে একটু আধশোয়া ভাব নিতেই কেমন করে যেন সে সেই মাঠের উপর শুয়ে পড়ার জায়গা পেয়ে গেল, আকাশে চোখ যেতেই জ্বালা ধরল, অবনী চোখ বুজে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচ বাক্স হাতের কাছে আনল, সিগারেটের প্যাকেটটা যেন সজীব, কারুর ঘাড়ে হাত রেখে চলার মত সুখে সে সিগারেটের প্যাকেটের উপর হাত রেখে শুয়ে থাকার সবরকম আরামগুলো পেতে লাগল। ওভাবেই সে বার বার 'উঠে যাই,' 'এই উঠব' ইত্যাদি কর্তব্যগুলি ভাবতে ভাবতে শুয়ে থাকল, তার শুয়ে থাকাটা ক্রমেই লজ্জা সঙ্কোচ কাটিয়ে ভাল-ভাত হয়ে যাচ্ছে, সে টের পেল কারা যেন ইতস্তত পা ফেলে চলে যাচ্ছে, যেনবা তার কানের পাশ দিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, এভাবে চলে যাচ্ছে, অবনী নড়ল না, মড়ার মতো পড়ে রইল, তার এই ভান বারান্তরে সিরিয়াস

হতেই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তন্দ্রা এসে আবার আচমকা তার তন্দ্রা ভেঙে গেল, গলগল করে কারা যেন অবনীর শিয়রের কাছে কথা বলে যাচ্ছে, সবাই কথা বলছে, কেউ শুনছে না, যেন সে একটা ট্রেনের কামরায় বাংকের উপর শুয়ে আছে, ঘুলুনি লাগছে, কামরায় নানারকম পার্টি, সবাই কথা বলছে, তার উপর ট্রেনের চাকা লাইনের সঙ্গে কথা বলছে, ঢাকা থেকে টাকা এনে কোলকাতা নিয়ে চল্, ঢাকা থেকে টাকা এনে কোলকাতা নিয়ে চল্, আর জোর দেড়কোশ, জোর দেড়ঘণ্টা, টানভাইসব, নেই উৎকণ্ঠা, আর জোর দেড়কোশ জোর দেড়ঘণ্টা চলভাইসব নেই উৎকণ্ঠা, কারেণ্ট এইট থ্রি এইট নাইন, ফোর সিক্স, কারেণ্ট ফোর সিক্স, ফোর সিক্স, সেভিংস্ টোকেন নাম্বার ফাইভ টু ফোর নাইন, সিক্স টু জিরো নাইন, সিক্স টু জিরো নাইন, জিরো নাইন, জি-রো-না-ই-ন, আপনার ক্রস-চেক ক্যাশ হয়ে গেছে, নিয়ে যান, অবনীবাবু! ও অবনীবাবু বাড়ি আছেন, আপনার পার্টি দাঁড়িয়ে আছে··· ; উনি বাড়ি নেই, আপনি বসবেন, আসবেন এখুনি ;···ব্যাংকের পিওন? কৈ আগে কখনো দেখিনি তো, কার মেসেজ দেখি ; অ্যাকাউণ্টেণ্ট সাবের ; তা তিনি রোববারেও সেলাম জানাবেন ; অরজেণ্ট আছে ; ও, কিন্তু তিনি তো ঘুমুচ্ছেন, উঠলে পাঠিয়ে দেব ;···না তিনি এখনো ওঠেন নি, আরে আপনি, একেবারে স্বয়ং এসে হাজির ; কী করি বলুন, দত্তকে ছাড়া রিজার্ভ ব্যাংকে রিপোর্ট পাঠানো যায়, আই. জে. এম. এ-র গোডাউন ক্রাইসিসের আইটেম পাচ্ছি না, দয়া করে যদি ; কিন্তু তিনি তা ঘুমিয়ে ; ঘুমিয়ে? আচ্ছা তাহলে···, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি উঠলেই পাঠিয়ে দেব ;···অবনী বাড়ি আছ? সে কী কাকাবাবু, আপনি? না বসতে আসি নি, অবনী বলেছিল মিনুর বিয়ের বাজেটটা করে দেবে, দিবাকরবাবুর মেজ মেয়ের বাজেট ও ষোলশ' টাকায় করেছিল, আমি তা দু হাজার খরচ করতে রাজি, এ নিয়ে তিনবার এলাম, এমন তো কখনো করে না, একবার ডাক দিলে নিজে চলে আসে ; অবনীবাবু-উ! ও অবনীবাবু!···এটা কি অবনী দত্তের বাড়ি? ···জানেন প্রভাত কর ডি. আই. কলে অ্যারেস্ট হয়েছেন! আমরা নন্দাজীর সঙ্গে মিট্ করতে চাই, আপনি লিড করবেন।···আপনি একটু সরে শোবেন, আমার হাতে লাগছে, এই হাত ভেঙে যাওয়াতেই আমার মৃত্যু হয়েছিল, আরেকটু সরে, কী বাবু সরছেন না কেন? বাবু কি ঘুমিয়ে?···মাপ করবেন, আমি বুঝতে পারি নি, আমার নিচেও যে কবর আছে জানতাম না, আচ্ছা সরছি··· ; এ কী করছেন আমার বুকের উপর এসে গেলেন দেখছি, চাপ লাগছে

যে··· ; মাপ করবেন, উনি সরতে বল্লেন তাই, বিশ্বাস করুন, আমি বুঝতেই পারি নি, এখানেও আমার নিচে আবার কবর থাকবে, কিন্তু দেখুন, আমি তো নিচের ব্যাপার-স্যাপার জানি না, আপনি বলে দিন না, কোথায় গুঁলে কবর থাকবে না নিচে··· ; আমি কী করে বলব, আমি কি চোখে দেখতে পাই, না আমার হাত আছে, আপনি বরং আমার হাঁটুর উপর বসুন, ওখানে আমার ব্যাত ছিল, আরাম লাগবে, সরুন, আরেকটু, পায়ের পাতাটাকে উল্টে নিন, কী আশ্চর্য আপনি যে বুক থেকে নামছেন না এক দণ্ডও, একটু সরুন, আর পারছি না যে, দম ফেটে যাচ্ছে, বলছি না পায়ের পাতাটা উল্টে নিন, আরও আটানব্বই বছর যান, সোজা আটানব্বই বছর যাবেন,··· ; আমায় মাপ করুন, আমি যেতে পারছি না, আমি আটানব্বই বছর কোনদিকে যাব, কী করে যাব, বছর শুনে আমি দিক বুঝব কী করে, আমি পারব না যেতে, আমাকে মাপ করুন, আমার উপায় নেই, আমি আপনার বুক থেকে এক দণ্ডও সরতে পারছি না :···ঠিক আছে থাকুন, আমি ইউ. এন. ও-র সিকিউরিটি কাউন্সিলে আপনাদের সকলের নামে নালিশ করব, জানেন আজ আটানব্বই বছর আমি ঘুমাই নি, শুধু আপনাদের জন্যে, কেউ পা মাড়াচ্ছে, কেউ হাত মাড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ বুকে চেপে বসছে, কেউ চোখের উপর জলন্ত সিগারেট টিপে নিভাচ্ছে, কতো ঠাণ্ডা হয়ে ঘুমায় উত্তরমেরুর আত্মারা··· : অবনী ধাঁ করে তলিয়ে যেতে থাকলে উঠে বসতে গেল ; সে চোখ মেলে সাদা সাদা পাথর দেখল শুধু, কেমন নিঝুম, ঘেমে গেছে, উঠে বসতে গিয়ে মাথা ভার লাগল ; আশ্চর্য এখানেই সে বেমালুম ঘুমিয়ে পড়েছিল, স্বপ্নটা মাথার ভিতর ঘন হয়ে আছে, অবনীকে বিষাদে পেল, এরকম স্বপ্ন দেখল কেন সে, কোনোদিন তো এসব ভাবে নি, এমনকি এখানে এসেও ভাবে নি ; তার খুব অস্বস্তি লাগল, সত্যিই কি সে কবরের উপর শুয়ে ছিল, কে বলতে পারে ? তার চোখ ঝাপসা, কেমন ভোর ভোর লাগছে, কটা বাজছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, আকাশটা পায়রার পেটের মতো লাগছে, অবনী চশমা আর ঘড়ি উভয়েরই অভাব বোধ করল, তার নাকের ব্রিজটা শিরশির করছে, চোখের কোণগুলি জ্বলছে, তাকাতে গেলে বমি আসছে, মাথার পিছনটা ইট-ইট লাগছে, ইটের গন্ধও আসছে নাকে।

অবনী উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে সিগারেটের প্যাকেট ও ম্যাচবাক্স তুলে নিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে একটা সিগারেট ধরাল। প্রথম ধোঁয়া টেনে গিলতে গিয়ে পেটে মোচড় পেল, খিদে পেয়েছে। অবনী হাঁটতে লাগল। রাস্তায় এসে রোদ চড়া লাগল, রাস্তা খুব পরিষ্কার ও নীলচে লাগছে, সে পকেটে হাত দিয়ে,

পয়সা দেখবার কারণে, এ পকেট সে পকেট হাতড়াতে লাগল, কোনোখানেই পয়সা নেই, পয়সা নিয়ে বের হয় নি অবনী। চকিতে তার ঘরের টেবিল, ড্রয়ার ইত্যাদি মনে পড়তে, তার খাটের গদির আরাম কোমরে নেবার সাধ যেতে সে ঘুরে বাড়ি ফিরবার কথা ভাবল, সঙ্গে সঙ্গে সে অপর ফুটপাথে শঙ্করকে দেখতে পেল, মনে পড়ল শঙ্করের কাছে পনেরটা টাকা পাওয়া যায়, সে শঙ্করকে জোরে ডাকল, অনেকক্ষণ কথা না বলার দরুন তার গলা ফেঁসে গেল, তবু তাতেই শঙ্কর ফিরল, অবনীর দিকে তাকাল, দুটি চোখ নাকের দিকে জড় করে, কপাল কুঁচকে শঙ্কর তার দিকে তাকিয়ে পুনরায় চলতে লাগল, অবনী মরিয়া হয়ে ডাকল আবার, হুশ করে একটা ট্রামে বেয়াড়াভাবে হেলতে দুলতে প্রায় হোঁচোট খাবার মতো থেমে গেল, অবনী পিছিয়ে আবার ডাকল, কিন্তু শঙ্কর তখন একমনে চলছে। তাকে কি চিনতে পারল না? সহসা অবনীর ভয় করতে লাগল, তার চোখের মণি দুটো ব্যথা করে উঠল, তাকে আজ কেউ চিনতে পারছে না কেন? এতকাল তো তাকেই সবাই চিনে ডেকে নেয়, ভীড়ে বাসে ট্রামে, এমনকি চলন্ত ট্যাকসির জানলায় কনুই দেখেও অনেকে চিনে নেয় তাকে, আর আজ তার কী হল? সে কি অন্যরকম হয়ে গেছে? অবনী আনমনা লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে তার বাড়ির উল্টোদিকে, যে দিকে পার্কসার্কাস, এগোতে লাগল। কোকাকোলা-বাড়িটার কাছে এসে সে থমকে গেল, বিরাট ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে তাকাতে তার আবার বমি-বমি ভাব এল। এখানে দোতলায় শরৎবাবু থাকেন, কর্পোরেশনের ব্যাপার, বারোটার আগে অফিস যায় না শরৎবাবু, তাকে নিশ্চয় পাওয়া যাবে, যদি আজ খেতে বলে খেয়ে নেবে, কতদিন খেতে বলেছে, খায় নি অবনী, শরৎবাবুর স্ত্রী একদিন তো প্রায় ঝুলেই পড়েছিলেন খাওয়ানোর জন্য, ভারি মিষ্টকে, একদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাজির হয়েছিল অবনী, শরৎবাবুর জামা-কাপড় দিয়ে, পাক্কা দু ঘণ্টা একথা-সেকথায় আটকে রেখেছিলেন, বৃষ্টি কমে গেলেও যেতে দেন নি, শরৎবাবু না থাকলেও খুব সহজ, বুঝিবা খানিক প্রগল্‌ভও ছিলেন, এ সব ভাবতে ভাবতে অবনী নিজেকে শরৎবাবুর ফ্ল্যাটের দরজার কাছে পেল, এবং বিনা কারণে তাতেই চমকে গেল সে, নক্ করার জন্য জোড়া আঙুল দরজায় রাখতেই সহসা ভিতর থেকে কে যেন সশব্দে দরজার ছিটকানি তুলে দিল, এবং খিল খিল চাপা হাসিতে হাঁপ ছাড়ার মতো নারীকণ্ঠ শুনল অবনী, 'এবার শাস্তি তো?' অবনী আশ্বস্ত হল, যাক তাহলে শরৎবাবু···, সে দরজায় সশব্দে কিল মারল, ঝন ঝন করে উঠল ওপাশের ছিটকানি, একরকমের

ময়ূরকণ্ঠ শুনল সে, 'কে ?' 'আমি অবনী দত্ত।' দরজা খোলার জন্ত ওপাশে হাত রাখা বুঝল অবনী, একটু ফাঁক হল দরজা, একটা ভিন্নরকমের রমণীমুখ, কপাল অক্ষত ; অবনী বুঝল শরৎবাবুর স্ত্রী, সে হাসি আনতে গেল ঠোঁটে, বেশ শুষ্ক লাগল সামনের দাঁত, 'উনি তো বাড়ি নেই,' 'সে কি ?' 'এসময় তো উনি থাকেন না ?' 'ও আচ্ছা,' অবনী দেখল দরজা আর বেশি ফাঁক হচ্ছে না, বরং দরজার ফাঁক কমে আসছে, 'আপনি রাত সাতটায় আসুন, দেখা পাবেন, কিন্তু কি দরকার ছিল ?' 'না, দরকার তেমন···আমাকে আপনি···' অবনী দরজার লম্বা ফাঁকটার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চোখ দিল, সাদাটা বেরিয়ে আছে, 'বল্লাম তো রাত সাতটায় আসুন, দেখা পাবেন,' অবনী আরেকবার বলতে গেল, 'আমাকে আপনি···' চিনতে পারছেন না বলবার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তবু অবনী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার যেন ধুম জ্বর আসছে, আবার বমি-বমি লাগছে, অবনী চোখে আঙুল রাখল, আঙুল ছুটি ঠাণ্ডা, চোখে জ্বর লাগল, 'কে এসেছিল ?'··· 'কী জানি।'···'শরৎদার চেনা লোক নয়তো ?'···'কোনোদিন দেখি নি আসতে — বাব্বা কী ভাবে তাকাচ্ছিল পেটের দিকে···যেন একটা···' অবনী সরে গিয়ে সিঁড়ি নিল নিচে নামবার। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে অনেকবার ঝুঁকে পড়ে যাবার মতো হল, এতটা অসহায়, সর্বস্বান্ত তার কোনোদিন লাগে নি। তাকে কেউ আজ চিনতে পারছে না কেন ? এই মেয়েটাকেই কিনা একদিন সাতভোরে উঠে সে বৈঠকখানা বাজার থেকে চড়া দামে পদ্মার ইলিশ এনে খাইয়েছিল, বহুকাল ইলিশ খায় না শুনে সে সারারাত প্রায় না ঘুমিয়ে আলো ফুটতেই দীর্ঘ-শ্বাসে ছুটেছিল বাজারে ;···খিদেয় তার নাভিতে টান পড়ছে, কান ছুটো গরম, বুকের ভিতর থেকে হুহু করে অকস্মাৎ বালক বয়সের কান্না এল অবনীর, তার গলা ফুলে গেল। রাস্তায় নেমে আসায় তার চোখ ঝলসে যাচ্ছে, সে দাঁত কিড়মিড় করল, দু হাতের মুঠো শক্ত করে অবনী আরও গলা উঁচু করতে গেল, পেট ঠেলে তার বমি পেল আবার। দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সুবেশধারী যুবক তার গা ঘেঁষে চলে যেতে যুবার হাতঘড়ির ঠিকরানো আলো তার চোখে লাগল, 'কটা বাজে ?···' যুবকটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকে একবার দেখে দাঁড়িয়ে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বিড় বিড় করে বল্ল, 'ফাইব টু টু···' বলে আর দাঁড়াল না, ছিমছাম চলে গেল। যুবকটির পিছন খুবই ঋজু, প্রস্তরের মতো, সে কখন ঘড়ি দেখল, ঠিক বল্ল কি না, বড় নিষ্ঠুর মনে হল অবনীর, কেননা ঘড়ির সময়টা কেমন নির্মম, এখন বেলা ছুটো, অবনীর কাছে একটি অ্যাবসার্ড সময়, সে সকাল সাতটায় বাড়ি থেকে

বেরিয়েছে, একটি কাজও করে নি, ব্যাংকে যায় নি, স্নান করে নি, ভাত খায় নি, আজ সকাল থেকে উঠে সে একবারের বেশি প্রস্রাব করে নি, খিদে ছাড়া, স্নান করার বা প্রাকৃতিক কোনোরকম বেগ বুঝছে না, আর এরই মধ্যে বেলা দুটো হয়ে গেল? এই সব কাজগুলি তার মধ্যে থেকে না সমাধা করে ঘড়ির কাটা যথারীতি ঘুরে গেল? সে টের পেল না। অবনী ভাবেই নি, এত বেলা হয়ে গেছে, তার ধারণায় এখন সকাল দশটা-টশটা ছিল। তাহলে সে কবরখানায় অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে, তাহলে তার স্বপ্নটা দীর্ঘ ছিল, অথচ মনে হচ্ছিল যেন দু মিনিটের ব্যাপার, সে তাহলে অতোক্ষণ ধরে ঘুমের ঘোরে একটার পর একটা কবরে শোয়া মানুষগুলির উপর চেপে শুচ্ছিল, কী সাংঘাতিক নালিশ ছিল মরা মানুষটার, আটানব্বই বছর ধরে কবরে আছে, ঘুমায় নি! খুক খুক করে হাসতে গিয়ে অবনীর সহসা শরীরটা হালকা লাগল, তার চলায় বেশ গতি এসে গেছে, সে দূরে সার্কুলার রোডের ঘুরে যাওয়া চওড়া যায়গাটা দেখতে পাচ্ছে, কেমন ফাঁকা, ছিমছাম, সাহেব-সাহেব লাগছে জায়গাটা। অবনী ঐ জায়গাটায় পা দেবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল, ঐখানে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট খাবে। পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করল, খুলে দেখল দুটো মাত্র সিগারেট আছে, তার কিছুক্ষণ আগেকার হালকা হওয়া ভাবটা খানিক মিইয়ে গেল, দুটো সিগারেট মাত্র, অথচ পকেটে পয়সা নেই একটাও, তবু দুটো সিগারেট সম্বল করে অবনী ঐ জায়গাটায় পৌছাবার জন্য দ্রুত হাঁটতে লাগল, একটি ছায়া ছায়া বাস-স্টপ অপর ফুটপাথে দেখে সে রাস্তা ক্রস করল, বাস-স্টপের কাছে এসে ছায়ার ভিতর তার একটু শীত বোধ হল, খেয়াল করে নি আগে, দেখল স্টপে একজন লোক দাঁড়িয়ে। কোথায় যেন দেখেছি, কিছুতেই মনে আসছে না, এমন একটা চেনা-চেনা মুখ, যদি তাকে চেনে, এই ভেবে সে লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যেন সেও বাস ধরবে, এরকমভাবে লোকটার পাশে, লোকটার সঙ্গে সম্পর্কিত নই এমনভাবে হাত দুটি পিছনে যুক্ত করে সে মুখ যতোটা তার চেয়েও চোখ দুটো উপরে তুল, কিছুক্ষণ প্রতীক্ষার পরও লোকটা যখন কোনো কথাই বলছে না, তখন চোখ নামিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে বল, 'কতোক্ষণ অপেক্ষা করছেন?' লোকটা খুব ধীরে তার দিকে ফিরে 'আমি কানে শুনি না' এমন ধমকে বল, 'মিনিট পাঁচেক হবে', বলেই অযথা ঘড়ি দেখল। সঙ্গে সঙ্গে অবনী 'আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?' বলতে গিয়ে যেন সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ঘড়ি, ভিন্ন ভিন্ন সময় দিচ্ছে, এটা যেন জানাজানি হয়ে গেছে, রাষ্ট্র হয়ে গেছে সর্বত্র, কিন্তু অবনী কিছু বল না,

তার চোখে পড়ে গেল ঘড়িটা, দুটো কুড়ি, আবার দেখল, সে কী, চারটে দশ! সহসা ঘড়িটাকে খুবই ইনডিভিজুয়াল লাগল, বন্ধু-টন্ধুর মতো না, এমন বেসিক ইনডিভিজুয়াল আর কেউ না, সে ভয়ে থতমত খেয়ে বলল, 'আপনার ঘড়িটা ঠিক আছে?' 'হ্যাঁ,' লোকটা পাষাণের মতো কথাটা বলল: 'দেখুন না কটা বাজে? আমার চশমাটা···;' 'দুটো কুড়ি।' লোকটা ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই বলল; অবনী কাছে সরে এসে ভালো করে চোখ দিয়ে ঘড়িটা দেখল, হ্যাঁ দুটো কুড়ি, দেখেই তার কান দুটো ভোঁ ভোঁ করে উঠল, এতক্ষণ আশা ছিল, যুবকটির ঘড়ি ভুল, কিংবা সে শুনেছে ভুল, অথবা যুবা বলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে যা আর সংশোধন করে নি; 'আপনার যদি বিশেষ কোনো কাজ থাকে তাহলে অন্য চেষ্টা করুন, এ সময় এ রুটে বাস কম যায়;' লোকটির গলা এতক্ষণে খানিক ভেজা লাগল; 'আমার ঘড়িটা ঠিকই আছে,' এমন দৃঢ়তা আনল গলায় যে লোকটাকে সহসা শ্রদ্ধা করে বসল সে; 'আপনাকে যেন কোথায় আমি দেখেছি;' খুব ছোট ছেলের মতো অবনী বলল; 'আমাকে?' লোকটা অবনীর দিকে ফিরল, কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল, তারপর সহসা অনেক কথা বলার শেষ বাক্যটার মতো লোকটি একটু মুখ নিচু করে বলল, 'স্টেজে দেখতে পারেন, মুভিতেও;' 'মানে আপনি···?' কোনো থিয়েটার বা সিনেমা হলে দেখা হয়েছে কিনা ভাবতে ভাবতে অবনী আচমকা লোকটার দুই গালে কান্নার ভাঁজ দেখতে পেল, লোকটির চোখ দুটি সহসাই খুব রক্তাভ ঠেকতে সে জানতে চাইল, আমাকে চেনেন; কিন্তু তার আগেই লোকটি পুনরায় তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি···,' ইতিমধ্যেই অবনীর গলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, 'চেনেন···,' লোকটি কী যেন বলল, ভালো করে বুঝতে তার দিকে তাকাতেই অবনীর মনে পড়ল লোকটির একটি দুঃস্থ মুখ, বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়, অবনী একটি ট্রাক যাওয়ার টিপিক্যাল শব্দের বদলে শুনল 'দুর্গা- আ-আ-য়া;' 'আপনি পথের পাচালী···মানে আপনার নাম কানু বন্দ্যোপাধ্যায়,' উত্তেজনায় অবনীর শরীর ঝাঁ ঝাঁ করল, 'আশ্চর্য, জানেন, আপনাকে আমি···,' অবনী বলতে চায় 'সবচেয়ে বড়ো অভিনেতা বলে মনে করি,' 'আপনি একেবারে চরিত্রের ভিতর ঢুকে পড়েন,' কিন্তু কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা নাড়ার মধ্যে, নিজেকে স্বীকার করার মধ্যে কী যে শব্দ ছিল, তিনি 'হ্যাঁ' করলেন কী, 'ঠিকই ধরেছেন' বললেন, এসবে মন না দিতে পারায়, তাকে বরফের মতো স্বচ্ছ অথচ শক্ত লাগল, হাত দেয়া যায় না, এমন ঠাণ্ডা তার চাহনি যে, অবনী থেমে গেল; একটা নিথর ছায়া আগেই ছিল,

এখন চতুর্দিকেই যেন স্বপ্নের নদীতীরের ন্যায় আবছা ভয়, ইতিমধ্যে দোতলা বাস এসে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (!)-কে নিয়ে যেন চুপিসারেই চলে গেল কেননা অবনীর কানে কোনো শব্দ ঢুকল না, বাস চলে যেতে যেন দ্রুত রোদ মুছে যাচ্ছে, সে শীতকাতর বিড়ালের মতো নির্লোভ, ক্লান্ত, গুটিসুটি হয়ে গেল। তার যেন মনে হল সে এখানেই পাষাণ হয়ে যেতে পারে, তার দেহে কোথাও আর সাড় নেই, জ্বালা যন্ত্রণা নেই, স্মৃতি নেই, শ্রুতি নেই, একটিও আপশোস মাথায় জ্বলছে না, সে কেমন পাষাণ যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াগুলিও আর গায়ে ঠেকছে না, শেষ তার মনে হল, কেউ যদি তাকে বাড়ি নিয়ে যেত, তাহলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ত খাটে, সে যেন পিঠের মেরুদণ্ডের উপর শুয়ে পড়ছে, এভাবেই সে শুয়ে পড়ার আরাম আনতে গিয়ে বিনা চেষ্টায় দু-এক পা পিছিয়ে যেতেই 'আরে মানস না ?' বরাভয়ের মতো একটি বন্ধুমুখ, ডাক্তার নাড়ি টিপলে যেমন ডাক্তারের টিপে ধরা আঙুলের মধ্যে নিজের রোগগ্রস্ত দেহটাকে সঁপে দিতে সাধ হয়, সেভাবেই অবনী আগন্তুকের হাত ধরে বসল, কিন্তু তার হাত যেন বিদ্যুৎ, সহসা ছিটকে আগন্তুক সরে 'মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে, আমি মনে করেছিলাম···' বলেই আগন্তুক যেন আততায়ী, কেমন গা ঢাকা দেবার মতো রাস্তা পার হয়ে ওপাশে চলে গেল। অবনীর মাথায় রক্ত উঠে গেল, তার ঘোর লাগল, সে টাল-মাটাল হয়ে সহসা রাস্তা পার হবার ঝোঁক নিল, স্বপ্নে যেমন অবনী টাকা গুণতে পারে না, নোটের তাড়াগুলো ভারি, পরস্পর আটকে থাকে, তেমনি অবনীর পা, অমন বন্ধুর মুখ সে যেন আর কখনো দেখে নি, কেন উধাও হল, জীবনে যেন এই প্রথম ঈশ্বর, কারুর ঘাড় ধরার সাধ আসতে নিমেষেই অবসান···সে যেন ঝুঁকে নিজের মজার মতো ভাবলেশহীন মুখ দেখছে···একটি ঝকঝকে ফালি রৌদ্রে তার মাথা পড়তে অবনী, 'সামাল,' বাস এসে গেল আরেকটা, ঝমঝম করে আচমকা বৃষ্টি নামার মতো, অবনী সরে এল, বাস থেকে কেউ নামল না, কেউ উঠল না, কণ্ডাকটার ঘন্টি দিল শেষবারের মতো 'এইট বি' বলে, তারপর হুস্ করে বাসটা চলে গেল। তাকে নেবার জন্যই থেমেছিল কিনা বুঝবার আগে বাস খেয়ে গেল, অবনী দু-চার পা দ্রুত এগোল, কিন্তু ইউ. বি. আই ছাপ মারা একটি পিওনকে থপ্ থপ্ করে এগিয়ে আসতে দেখে তার বুক কেঁপে উঠল, সে ঘুরে দ্রুত ফিরিঙ্গি-স্কুলের দিকে চলতে থাকল, ফুটপাথ বাঁক নিতেই পথটার আগাগোড়া সে দেখতে পেল, যেন কোনো অরণ্যে পথটা মিশে গেছে, তার মনে পড়ল না এ পথে আগে কখনো হেঁটেছে

কিনা, গাড়িগুলো দ্রুত যাচ্ছে, যেন এখুনি গ্যারেজ করতে হবে, দুপাশের বাড়ি-গুলোয় যেন অন্দর নেই, কেমন বসতিশূন্য শহর, চারপাশে তাকিয়ে সে কোথাও কোনো জনমানব দেখল না, সে যত এগোচ্ছে ফালি ফালি রোদগুলি তার আগে আগে সরে যাচ্ছে, ঝপ করে সহসা সন্ধ্যা নামল, চারিদিকে মুহুর্মুহু জানলা-দরজা বন্ধের শব্দ, গাড়ি কমে আসছে, সর্বশেষ একটি ফিটন গাড়ি পাগলা-ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল, আর কেউ নেই, কিছু নেই অবনী ছাড়া, অনেকটা তাল-গাছের মত একটি ট্রাফিক-সিগন্যাল লাল দুনয়ন নিয়ে শোয়া থেকে অবনীর গা বরাবর উঠে দাঁড়াতেই একসঙ্গে অনেকগুলি বুট-জুতো হন্ট করে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'আপনাকে আমরা চিনেছি,' সঙ্গে সঙ্গেই তার চারদিকে চারজন দীর্ঘকায়া রমণী, তার জামার সেলাইগুলো খুলে ফেলতে লাগল, শরৎবাবুর স্ত্রীকে দূরে তার চশমা নিয়ে দাঁড়ানো দেখা গেল, শংকর তার হাত ঘড়িটা পেণ্ডুলামের মতো দোলাচ্ছে শরৎবাবুর স্ত্রীর কোমরে অন্য হাতটি ঘনিষ্ঠ ক'রে, অবনীর জামা-পায়জামার সেলাইগুলো সম্পূর্ণ খুলে গেলে অবনী টুপ করে গলা মোমবাতির মতো ছড়িয়ে বসে পড়ল, অনেকগুলি মুখ তার দিক ঝুঁকে পড়ছে ক্রমশ, সব আগে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ, যেন স্পষ্টই 'আপনাকে দেখেছি 'বীণা' সিনেমা-হলের 'এম ফোরটিন' সীট নাম্বারে তেইশে অক্টোবর উনিশশ' পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দে, রাত্রি দশটা উনষাটে, তখন থেকেই আপনাকে আমি চিনি···' আরেকটি মরা মুখ একেবারে তার নাকের ডগায় ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, ফরগিভ দেম, দে নোএথ নট হোয়াট দে ডুয়েথ, আরো যে কী কী বলল, অবনী শুনতে পেল না, কেননা ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, যে যার বাড়ি পালাচ্ছে, শুধু ধুপধাপ পায়ের শব্দ, অবনী ফাঁক পেয়ে ছুটতে লাগল, বাড়ির দিকে, একেক নিমেষে সে রাস্তা পার হতে লাগল, সমস্ত কোলকাতা শ্মশান, যে যার বাড়িতে পালাচ্ছে, অবনীও বাড়ির রাস্তা নিল, কিন্তু কোলকাতায় এত রাস্তা কিলবিল করছে, তখন অবনী দিশাহারা হয়ে গেল, কোনটা রেখে কোনটা ধরবে বুঝতে না পেরে অবনী একটি বিশাল ডিজায়ার ছাপ মারা দোতলা বাস দেখে ছুটতে ছুটতে তাতেই উঠে গেল, বাসে বেজায় ভীড়, সবাই ভীত চকিত, 'এমার্জেন্সির সময় এমন গোরুর মতো চলা কি ঠিক হচ্ছে সর্দারজী,' তাতেই বাসটা হুহু করে চলতে লাগল, ক্রমে বাসটা উড়ে যাবার মতো হয়ে গেল, সহসা 'প্রাচী' সিনেমা হলের জলন্ত নিয়ন অক্ষরে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে থেমে গেল। অবনী ছিটকে ফুটপাথে পড়তেই তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়াতেই বাঁদিকে তার আবহমানকালের গলি, সে জান-

প্রাণ সেই গলির ভিতর ঢুকে পড়তে গলিটা ক্রমে বুজে যেতে লাগল, অবশেষে সার্পেনটাইন লেনের চতুর্থ টার্নে তার পেরেকবসানো দরজা বরাবর সে, অবনী, সারা গায়ে না ঢুকতে পেরে শুধু আঙুল বাড়িয়ে একটি পেরেক স্পর্শ করল, মাত্র নখাগ্রের অবলম্বনে পেরেকটাকে ধরে গলির ক্রমশ চাপা খড়খড়ে দেয়াল গলিয়ে সে তার বাড়িতে ঢুকতেই তার স্ত্রী ময়ূরের মতো ভয়ার্ত চীৎকারে চৌচির হয়ে গেল, 'কে ?'

পরশুরামের ধর্ম

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রগতির জন্য স্থিতাবস্থার বিলোপসাধন আবশ্যক। এ সাধনক্রিয়া প্রায়শই নির্মম হতে বাধ্য। এবং এই অপরিহার্য ক্ষমাহীন বিনাশের কাজে সংহারকের অস্তিত্বও বিপন্ন। কারণ, যে অবস্থাকে সে ধ্বংস করতে উদ্যত, সে নিজেই সে অবস্থার সন্তান, তার আবহাওয়ায় লালিত। সুতরাং তার জন্মদাতা পরিমণ্ডলকে অস্বীকার করে ভাঙতে গিয়ে সে তার নিজের অনেকখানিকেও হত্যা করে।

অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিলোপের এই বিষয়টিই সমাজপরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, যার বক্তব্য—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো চূর্ণ করে শ্রেণীবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে শ্রমজীবীরা তাদের নিজেদের শ্রেণীগত অস্তিত্ব ঘুচিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব-আচ্ছন্ন সমাজ ধ্বংস করতে করতে স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে শ্রমজীবীর সত্তাও অবলুপ্ত হয়। পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত রূপান্তরের পথে নিরাকরণের নিরাকরণ বা negation of negation তাই অবশ্যম্ভাবী।

পরিবেশ খণ্ডন করতে করতে আত্মক্ষয়ের এই ক্রমাত্মিক যাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধহয় আমাদের পৌরাণিক যুগের পরশুরামের পরাজয়ের কাহিনী। ব্রাহ্মণ সন্তান, জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে স্বধর্ম ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ ক'রে যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ ক'রে নিজের চরিত্রকে পালটাতে হয়েছিল ক্ষত্রিয় সংহার করবার উদ্দেশ্যে। তাঁর চরিত্রের নির্মমতায় দীক্ষা পিতার আদেশে স্বহস্তে স্বৈরিণী মাতার শিরশ্ছেদের ঘটনা থেকে। তারপর একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়করণের রক্তাক্ত ইতিহাস। ক্ষত্রিয় রূপধারী রাজ্যশাসকের বিরুদ্ধে পরশুরামের আক্রোশ, রাষ্ট্রশক্তির (State) বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীর (Anarchist) চিরকালীন বিদ্রোহ, দমননীতির বিরুদ্ধে অবাধ স্বাধীনতার প্রতিবাদ।

রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্বের অর্থই যেহেতু দমনের প্রয়োজনের স্বীকৃতি, ভবিষ্যতের

শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে সেই হেতু রাষ্ট্র থাকবে না—এই আদর্শের জন্য একদা সাম্যবাদীরা লড়াই করেছিলেন। সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের দিকে যাত্রার পথে 'রাষ্ট্রের ক্রমবিলয়ন'-এর তত্ত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অথচ দেখা গেল, সমাজতান্ত্রিক দেশে, রাষ্ট্রশক্তির দমনমূলক চরিত্র ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠল—ধনতান্ত্রিক শত্রুদের পরিবেষ্টন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, অল্প সময়ের মধ্যে দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতি বিকাশের জন্য কেন্দ্রীকরণ—ইত্যাদি নানা কারণের ফলে। এবং পুরাণের ক্ষত্রিয়দের মতো, প্রাযুক্তিক-তন্ত্র বা technocracy আজকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নতুন শ্রেণী হিসেবে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত বলে সন্দেহ হয়।

সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি সম্ভব কিনা জানি না। হয়তো দমনমূলক প্রবণতা মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির মতনই অন্তর্নিহিত, তার বিলোপসাধন প্রায় অসম্ভব। এই কারণেই, পরশুরাম পরাজিত নায়ক। একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-নিধনের পর, মহাভারতে দেখতে পাই, পরশুরামের পূর্বপুরুষ মহাত্মা ঋচীক তাঁকে অধিকতর সংহার থেকে নিবৃত্ত করার জন্য রাজর্ষি অলর্কের উপাখ্যান শোনাচ্ছেন। মহাতপস্বী অলর্ক, ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুরা তাঁকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করছে—এই চিন্তায় ক্রুদ্ধ হয়ে একে একে মন, বুদ্ধি ও পঞ্চেন্দ্রিয় ধ্বংস করতে উদ্যত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে নিজের মর্মভেদ ও মৃত্যু না ঘটিয়ে, এই কারণগুলির ধ্বংস সম্ভব নয়। অর্থাৎ, অন্যায়ের বিলোপসাধন করতে গিয়ে বিদ্রোহীর নিজের অস্তিত্বকেও ধ্বংস করতে হয়; কারণ, অন্যায়ের উৎস তার নিজের মধ্যেও উপস্থিত, সর্বব্যাপী অন্যায়ের আওতায় সে নিজেও মানুষ হয়েছে।

কিন্তু পরশুরামের ক্ষত্রিয়নিধন ব্যর্থ হলেও, একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-ধ্বংসের পরও ক্ষত্রিয়শক্তির পুনরাবির্ভাব ঘটলেও, প্রতি যুগেই পরশুরামের আগমনের প্রয়োজন আছে, হয়তো তা অবধারিত। এক যুগের নিশ্চল, শ্বাস-রুদ্ধকারী সমাজ-ব্যবস্থাই তার ধ্বংসের জন্য ঝড়কে ডেকে আনে, পরশুরামদের জন্ম দেয়। এবং সাময়িক সাফল্য ও ব্যর্থতার দীর্ঘ ক্লান্তিকর ইতিহাসের শেষে এই কালাপাহাড়দের হয় এসে থামতে হয় পুরাণের ঋচীকের উপদেশ শুনে, নয় বাইবলের স্যামসনের মতো অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে স্বয়ংশুদ্ধ সবাইকে ধ্বংস করতে হয়।

অচলায়তনের ধ্বংসের পরবর্তী সমাজব্যবস্থার রূপ কি হবে, তা নির্ধারণে এই সমাজবিধ্বংসীরা অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ। প্রায় প্রতিটি বিপ্লবেরই পূর্বকালীন ও পরবর্তী চিন্তাধারা ও ঘটনাবলি তুলনা করলে দেখা যাবে পরশুরামদের কল্পনায়

যা ছিল, ভাঙনের পর নতুন সমাজ গঠনের কাজে তা বাঁকাচোরা রূপ নিল। ভবিষ্যৎ বর্তমানকে বরাবরই প্রতারণা করে।

তাই, প্রাচীনের ধ্বংসতেই পরশুরামদের কর্তব্য ইতি হওয়া উচিত। নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির গঠনমূলক দায়িত্বপালনে তারা স্বভাবতই অপারগ। এটা স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ দেবতা নয়। নটরাজের মতো এক হাতে ধ্বংস ও অপর হাতে সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এর অন্যথায়, অর্থাৎ বিনাশকর্তাই যখন মনুষ্যসমাজে পুনর্গঠনপ্রয়াসী হয়ে ওঠেন, তখন সেই বিরাট নির্মাণযজ্ঞে নানা ব্যাঘাত ও বিশৃঙ্খলা আসতে বাধ্য। স্বভাবতই, একই মানুষের পক্ষে দুই পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির দায়িত্ব-পালনের পথে নিজের মানসিকতাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে এর নজির বিরল নয়।

স্তালিনের শাসনকাল স্মরণীয়। বিপ্লবকালীন সন্দেহবাতিকতা ও নির্মমতায় দীক্ষিত তাঁর চিন্তাপ্রণালী নতুন সমাজব্যবস্থার স্বচ্ছন্দ গতিপথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্দেহ হয় বর্তমান চীনের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মূলেও অনুরূপ কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা। বহুদিনব্যাপী বিপ্লবপ্রসূত কঠোর ও উগ্র মানসিকতা, পুরনো যুগের নেতাদের সদাসন্ত্রস্ত মনোভাব ও তার রক্ষণশীল প্রভাব যে গুমোট আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, তা নতুন সমাজ প্রস্ফুটনের উপযুক্ত নাও হতে পারে।

তাই প্রলয়ঙ্করের পর ধ্বংসাবশেষের উত্তরাধিকারী পরবর্তী বংশধর। মহা-প্লাবনের পর সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অতীতের সমাজের মোহবন্ধন থেকে মুক্ত তাদের তাজা মন নিজেদের প্রয়োজনীয় নতুন রাস্তা তৈরি করে নেবে। সে নির্মাণকার্যে পূর্ববর্তী যুগের পরশুরামদের স্থান না থাকাই বাঞ্ছনীয়। এক যুগের অচলায়তন উচ্ছেদ করে ভবিষ্যতের নতুন সমাজব্যবস্থার জন্মের পথ উন্মুক্ত করার প্রত্যয়ই সংহারক কালাপাহাড়দের একমাত্র সান্ত্বনা।

প্রতি যুগেই সমাজসংহর্তা কালাপাহাড়দের সঙ্গী হিসেবে যোগ দেন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিবিদ্‌রা। এর কারণটা সহজেই অনুমেয়। শিল্পী তাঁর নিজের জগতে নৈরাজ্যবাদী, ধ্বংসকারী, স্থিতাবস্থার বিলোপসাধক।

অতীতের শিল্পরীতি ভেঙে শিল্পীকে এগোতে হয়। পরিচিত, পুরনো, গতানু-গতিক ঢঙ পালটে নতুনভাবে কথা বলার তাগিদ থেকেই চিত্রকলায়, কবিতায়, গানে আধুনিক কর্মের জন্ম। পরিচিত ছাঁচ ভাঙার জন্য যে সাহস প্রয়োজন তা

শিল্পীমাত্রেই অনুভব করবেন। কারণ যে ফর্ম তাঁরা ভাঙতে প্রয়াসী, তাঁরা নিজেরাই সেই ফর্মে শিক্ষিত।

পিকাসো-মাতিস্ প্রমুখ আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পরীতির প্রবর্তকেরা প্রত্যেকেই বহুযুগব্যাপী প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিক' বা কেতাবি রীতিতে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় দীক্ষিত। এই প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে অন্য কায়দায় ছবি আঁকতে গিয়ে তাই এঁরা নিজেদের অতীতের অনেকখানি, নিজেদের প্রাপ্ত শিক্ষার বহুলাংশ ভাঙতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরশুরামের মতো এইভাবে স্বধর্ম পরিবর্তন, অভ্যস্ত যাত্রাপথ থেকে অপরিচিত রাস্তায় মোড় ফেরা যেমন দুঃসাহসিক তেমনই বেদনাদায়ক। নিজের ধর্মের বৈশিষ্ট্য নির্মমভাবে ত্যাগ করে, নিজের স্নেহ-ভালবাসা মুছে ফেলে পরশুরাম যুদ্ধে নেমেছিলেন। শিল্পীও তাঁর কল্পনাশক্তিকে নিংড়িয়ে, নিজেকে নিঃস্ব করে অতীতের শিল্পরীতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন।

কিন্তু ভাঙনের এই দীর্ঘ যাত্রার শেষে এসে শিল্পী কী দেখেন? একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়নিধনের পর যে হতাশা পেয়ে বসেছিল, সৃষ্টির শেষ ধাপে এসে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে শিল্পীও কি তাই অনুভব করেন না? সারা জীবন ফর্ম ভেঙেও শিল্পীর যা বলবার ছিল তা সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা গেল না। অন্তরের গভীর চিন্তা, কল্পনায় যে ভাবমূর্তি থাকে তার যথার্থ রূপায়ণ প্রায় অসাধ্য। হাজার ভাঙাচোরা ক'রে নিত্য নতুন আকার আবিষ্কার করেও মনের চির-আকাঙ্ক্ষিত ফর্ম খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণা শিল্পীকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অস্থির করে তোলে।

এই ব্যর্থতায় অভিশপ্ত হয়েও শিল্পীকে অতীতের রীতি ধ্বংস ক'রে আত্মদ্রোহী হতে হয়, পরশুরামকে বারম্বার ক্ষত্রিয়নিধন ক'রে নিজেকে ক্ষয় করতে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে এই নিষ্ঠুর কর্তব্যপালন কেবলমাত্র নতুনের আগমনের পথ প্রশস্ত করে। আগামী যুগের জন্য আগের যুগের মানুষকে বলি হতে হয়। প্রাচীন সমাজ ধ্বংসের সংগ্রাম আত্মবিনশনের ক্রমাগ্রসরণও বটে।

এই কারণেই বহুদিনব্যাপী পরিবৃত্তিকালের কোনো এক বিশেষ পর্বে কিছু মানুষের ভূমিকা নেতিবাচক হতে বাধ্য। এর জন্য সংকোচের কোনো কারণ নেই। আনুগত্য ও প্রতিবাদের পরম্পরায় মানবসমাজ এগিয়েছে। কোনো কোনো অবস্থায় অস্বীকারমূলক আচরণের প্রয়োজন থাকে। যেমন আমাদের দেশে গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমস্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল প্রত্যাখ্যানের প্রবণতার উপর, বিদেশী শাসনের সহজলভ্য সুবিধা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার

সাহসের উপর। তাই তাঁর আন্দোলনের মূল চরিত্র নেতিবাচক ; তার রূপ—অসহযোগ, আইন লঙ্ঘন, বর্জন ও আত্মক্ষয়িষ্ণু অনশন ধর্মঘট।

নাৎসি অধিকৃত ফ্রান্সে, অস্তিত্ববাদী সার্ত্র-র প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদানের একমাত্র যুক্তি ছিল : 'না—এই কথা বলার ক্ষমতার প্রয়োগ।' সেদিন সারা ফ্রান্সের চাপা বিক্ষোভ এক ব্যাপক নির্বাকতার রূপ নিয়েছিল। এই মৌনাবলম্বনের মতো নেতিবাচক আচরণও কেমন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হতে পারে তার স্মরণীয় উপাখ্যান ভের্কোরের 'সাইলেনস্ অভ্ দি সীজ' বা 'সমুদ্রের মৌন'।

এই অনানুগত্য বা অসহযোগের চূড়ান্ত রূপ হতে পারে আত্মহত্যা। ভিয়েৎনামে যুদ্ধের প্রতিবাদে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অগ্নিতে আত্মাহুতি এবং পৃথিবীর অন্যদেশে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ব্যাপক প্রবণতাকে পলায়নী প্রবৃত্তির প্রকাশ বলব না, বরং প্রচণ্ড সাহসিকতা বলেই গ্রহণ করব। কারণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহসবিচারের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি প্রতিবাদকারীর নিজের প্রতি নির্মম হবার ক্ষমতা। বিপ্লবকালীন পরিবেশে তাই বিলাসবর্জন বা কঠোর আত্মসংযম নিছক আত্মপীড়নের বিকৃত আনন্দের তাগিদে নয়, নিজেকে উপযুক্ত যোদ্ধা রূপে গড়ে তুলবার জন্যই নিজের মনকে নির্মম করতে হয়।

আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ বা শহীদ হবার ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। তবুও সাম্প্রতিক কালে চে গুয়েভারার মৃত্যু বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুনভাবে বিচার্য। এই আধুনিক জামদগ্ন্য সাম্রাজ্যবাদ নিধনের নেশায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে অশান্ত হৃদয়ে লড়াই করেছিলেন। এ লড়াইতে মৃত্যুর ভূমিকা কি সে সম্বন্ধে মৃত্যুর কিছু পূর্বে লিখিত একটি দলিলে তাঁর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'যে কোনো স্থানেই মৃত্যু অতর্কিতে আমাদের গ্রাস করতে এলে আমরা সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করব। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধনাদ যেন কোনো ভাবগ্রাহীর কর্ণকুহরে গিয়ে বাজে, আমাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র ধরবার জন্য যেন অন্য কোনো হাত প্রসারিত হয়ে ওঠে, আমাদের শবানুগমনের স্তোত্র যেন কামানের টুকরো টুকরো গর্জনে ও নিত্যনতুন যুদ্ধ ও জয়যাত্রার গানে মুখর হয়ে ওঠে।' [বিশ্বের কাছে বার্তা, এপ্রিল ১৯৬৭।]

এই প্রসঙ্গে, চে-র মৃত্যুর পর শোকসভায় কাস্ত্রোর প্রদত্ত বক্তৃতাটিও উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়টিই কাস্ত্রো আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তির জীবনের আপেক্ষিক মূল্য এবং আদর্শস্থাপনের দীর্ঘকালীন মূল্য—এই দুটি প্রশ্নকে মুখোমুখি রেখে কাস্ত্রো বলেন যে চে-র বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসে একক মানুষের ব্যক্তিগত

মূল্য নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু কোনো আদর্শের জন্য ঐ মানুষেরই মৃত্যু ভবিষ্যতের মানুষের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রূপে বহুকাল স্থায়ী থাকবে। 'শিল্পীর মৃত্যু হতে পারে, বিশেষত সে শিল্প যদি বিপ্লবী যুদ্ধবিগ্রহের মতো বিপজ্জনক হয়। কিন্তু যা অমর থাকবে তা তার শিল্প যার জন্য সে তার জীবন ও বুদ্ধিবৃত্তি উৎসর্গ করেছে।'

এ বক্তব্যে হয়তো নতুনত্ব বিশেষ কিছুই নেই। মানুষের দৈহিক অবলুপ্তির পরও তার সৃষ্টি বেঁচে থাকবে—এ কথা অতীতে বহুজনে বহুভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই বিশেষ প্রসঙ্গে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা আধুনিক মানুষের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা এবং ব্যক্তির আত্মবিলোপের মাধ্যমেও এই ভূমিকাকে প্রসারিত করার তত্ত্ব।

নিষ্ফল শ্বাসরুদ্ধকারী পরিমণ্ডলে মানুষের একমাত্র ভূমিকা হতে পারে ধ্বংসাত্মক। তবে এ বিনাশক চরিত্র সাধারণ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকের থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ যোদ্ধার কাছে মৃত্যু আকস্মিক। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যদিও সে ভয় পায় না, বেঁচে থেকে যুদ্ধজয়ের ফলাহরণে সে স্বভাবতই অধিক উৎসাহী।

কিন্তু আধুনিক সমাজের পরশুরামদের ধ্বংসাত্মক চরিত্র আত্মঘাতী। প্রথমত, তারা জানে যে এই সমাজের ধ্বংসের দীর্ঘপ্রলম্বিত যন্ত্রণাদায়ক কর্মসূচিকে লালন করতে গেলে কোনো কোনো অবস্থায় নিজেদের মৃত্যুবরণ করতে হবে অনুগামীদের চেতনায় বিদ্যুৎ সঞ্চারণের জন্য। পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েৎনামে যুদ্ধের প্রতিবাদে অগ্নিতে আত্মাহুতি বোধগম্য।

আর শেষ কথা, তারা সচেতন যে এই সমাজের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভূমিকারও ইতি ঘটবে; অতএব কর্তব্য পালনান্তে নিজেদের অস্তিত্বের বিলোপ বাঞ্ছনীয়।

মাটির সমুদ্রে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মাটির সমুদ্রে কে যেন আমায় ডুবিয়ে রেখে গেছে
আমার হাতে পায়ে পশমের মতো কাদা, মুখে চোখে
বর্ষার চোঁয়ানো জল,
শরীরের সমস্ত জ্বালা সাপের খোলসের মতো শীতল, মসৃণ, নির্ভাজ।

মাটির সমুদ্রে অনেক শঙ্খচিলের স্বর মৃত্তিকার মতোই
স্তরে স্তরে বিস্তৃত
অনেক ছাইরঙের ভিজে আকাশ, পালতোলা বোট এবং চতুষ্কোণ জাল
শাদা কালো হলুদ তরঙ্গে বিম্বিত, এবং আমি নিমজ্জমান।

আমার পাতাললোকের নিকটতম আত্মীয়, যাদের হাত আমার হাতে
এবং যাদের আঙুল আমার আঙুলের মধ্যে
তারা কীট, না পতঙ্গ, না সরীসৃপ, না শুধু বিমূর্ত ভয় জিজ্ঞাসা করি নি ;
চোখে দেখি নি কিন্তু তাদের পৃথক পৃথক স্পর্শের নাম মনে রেখেছি।

মৃত্যুর প্রবাহ আমার চতুর্দিকে লাভাস্রোতের মতো প্রবাহিত,
আমি একঝুড়ি বালির নিচে মাথা গুঁজে সেই ভয়ঙ্করকে দেখেছি,
চিনে রেখেছি।
আমার উর্ধ্বে—হয়তো সামান্য কয়েক হাত ভেসে উঠলেই—
অগাধ স্বর্ণশিষ ধান
যার অফুরন্ত বাসমতী-ঘ্রাণে বিভোর হতে চেয়েছি কতদিন !
এখন শুয়ে শুয়ে ভাবি, এই মাটির অরণ্যে সাবিত্রী-সত্যবান রাত
কি কখনো পোহাবে না ?
এই মৃত্যু-নেই সমাধির কি কোনো পুনরুত্থান নেই ?

দীর্ঘদিনের একটি কঙ্কাল বন্ধুর মতো আমাকে ছুঁয়ে আছে

/ এক্ষণ পৌষ - চৈত্র ১৩৭৪

আমার এই নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি পিঞ্জর, নৈনং দহতি পাবকঃ করোটি
এই আমার জীবন্মুক্ত দেহচ্ছায়া এখন মাটির সমুদ্রে বালির ঘূর্ণাবর্তে একাকার ;
আমার জীবন ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গি, একান্ত – সিক্ত অঙ্গার ।

লতানো বুনো গোলাপ থেকে দীর্ঘাঙ্গি জাকারান্দা
পৃথিবীর ত্বকে চৈত্রে বৈশাখে ফুটছে
জীবনের তলদেশে বসে আমি সব অনুভব করছি,
আমি সব টের পাচ্ছি – আহ্নিক ও বার্ষিক গতির দোলা,
ঋতুচক্র, অদৃশ্য সময়-ঘড়ি, যেমন ক'রে টের পায় পাখি
মহাদেশ থেকে মহাদেশে হাওয়া-বদলের লগ্ন,
যেমন ক'রে নিশ্চোখ সমুদ্রে মাছ মাছকে চেনে, ভালোবাসে, ভয় পায় ;
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়বান আমি তাদেরই মতো ।

পৃথিবীর নিচে আরেক পৃথিবী
শাখা প্রশাখায় সংসার থেকে তলিয়ে শিকড় প্রশিকড়ের
আরো জটিল এক সংসার –
মাটির নিচে মাটি, বাতাসের নিচে বাতাস
জীবনের পাদদেশে জীবন ।

মাটি যেখানে সমুদ্র আমি এখন সেখানে
অন্ধকার যেখানে রামধনু আমি এখন সেখানে
আত্মার হিমঘরে রাখা দেহ যেখানে বল্মীককূট
আমি এখন সেখানে ।
আমি এখন আলো থেকে
অন্ধকার থেকে আলো থেকে ।

প্রতারকের মুখ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এখন সবই বিশ্বাস হয় যেহেতু এই প্রতারকের মুখ আমি চিনি সে হয় সময় সেই গুপ্তচর তারই চোয়াড়ে মুখে তবু কি বিস্তৃত চম্পক স্মৃতি অতএব সময় তোমাকে চিনি।

এখন খবরের কাগজে শরতের গুজব তারই মধ্যে হৃতপুত্তলিকার শোক তুলতে সময় আমাকে প্ররোচনা করে আমি এক প্রাণের পুতুলের কথাই বলি কখনো কখনো সময়কে দেখি মগ্ন প্রজাপতির মতো স্থির বহুবর্ণ মৃত্যুকে চোখে পড়ে।

এক সময় যাবতীয় মৃত্যুশুভ্র আর্তনাদগুলি দেখতে দেখতে আমি ঠিক করে ফেলি সময়ের সামনে আপস চলবে না যদিও এ বিষয়ে আমি কি ভাবি সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তবু এখনও সে, ছদ্মবেশী, পৃথিবীকে আলোকের চারপাশে প্রদক্ষিণ করায় ফলে এখনো এই দিনরাত্রি। আমি যখনই আশ্বিনে নিশ্চিন্তে মুখ গুঁজি তখন নির্ভরতা এবং সেজন্য বিশ্বাস তথা ভ্রম জন্ম নেয় এখন ভাবি আমার বেহুইন আনন্দ তেজোরাশি অথবা বালুরাশি যা নাকি সময় অন্য নাম মৃত্যু তাকে দুরন্ত পায়ে পেরিয়ে যাবে।

অথচ উষাকালে পরাজিত নক্ষত্রের মতো ম্লান এক বালকের মুখ আমার কেবলই মনে পড়তে থাকে এবং আশ্বিনের ভোর খড়খড়ি ভেঙে আমার দেওয়ালে মূর্ছিত আলোকে শুইয়ে রাখে সেখানে আমি হৃত-পুত্তলিকার অভিমানই দেখি কোথাও-বা পথপ্রান্তে শীতে বাণবিদ্ধ পাখির ভঙ্গিতে লুণ্ঠিত আলো এ-সমস্তই আমাকে অনিবার্যকেই যে নাকি প্রতারক যে হয় সময় তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়

এখন সবই বিশ্বাস হয় যেহেতু প্রতারকের মুখ আমি চিনি।

ভয়ংকর স্বপ্নের পর

সুবোধকুমার গুপ্ত

কী ভীষণ রাত্রি গেল !
…বৃক্ষের ছায়া চাই। তুমি কী ধূসর ধূ-ধূ ?
কিছু ফুল পড়ুক এখন – শিউলি আঁচল ঝুরঝুর্ ;
স্বপ্ন দেখেছি কাল
সরীসৃপ ফণা তুলে অতিকায় অন্ধকারে এবং বৃষ্টি
শ্রাবণের, সত্তার সমস্ত জুড়ে ঝড় ও বিদ্যুৎ।
তুমি এসো
তুমি এসো নদীর জীবন – স্রোতের মতন মোহানায় –
ঝরনার ঢল হয়ে মৌন রুদ্র শীতল সংগীতে।
গতকাল যদিও ভয়ংকর…
বনে এসো, পাগপাখালির মাঠে, ভাইন ফড়িং
দেখ না কেমন করজোড়ে প্রতীক্ষিত, – বিস্তৃত ঘাসের মাঠ
যদিও স্বপ্নের কাল সরীসৃপ ঘুমের অতলে কিলবিল।

কালো চুলে কোমলতা গর্জে ওঠে – আরেক বিষের ফণা !
দৃপ্ত এসো কুমারী সিংহীর মতো পা-ফেলে পা-ফেলে
সিংহের গুহায়, কেননা যৌবন
অরণ্য নিয়মে আগ্নেয়, এ হৃদয় দ্যুতির ঐশ্বর্য নিয়ে অন্ধকার !
এসো এসো, ছবি ছায়া ফুল নিয়ে এবং একটি ঘুম
তেমনি সর্পিল স্বপ্নে, – বৃষ্টির তাবৎ গর্জন পরিবেশে ;
যা দেখেছি কাল, কী ভীষণ, ভয়ংকর তৃপ্ত যৌবনের !
মহীয়সী সরীসৃপ – তালে তালে, – তা তা থৈ থৈ
সময় দেখুক দ্বন্দ্ব কোলাহল অন্ধকারে ;
অন্ধকার ? – এ আঁধার ভয়াবহ অপূর্ব সুন্দর !

করতল কোথায় ঈশ্বর

কাজল ঘোষ

হে ঈশ্বর করজোড়ে বলি
ওকে তুমি ভুলতে দিও না—সময়ের
সামান্ত অর্থ ব্যয় করে এই প্রতিদান
ওকে তুমি মরতেও দিও না কখনো।
সমস্ত ক্লান্তির মালা হাতে শেষরাত্রে
এসেছিল নিথর চরণে, কাঁপা কণ্ঠ
রুদ্ধশ্বাসে কত সুর শোনাল সে বসে,
মুহূর্তে জোনাকি-ছায়া স্খলিতবসন
হে বিধাতা মনে হল সব পাপ
সব জ্যোতি কে কোথায় হারাল সবুজ।
অথচ পঞ্চাশ জন বসে যখন বাজাল
সুর, কেঁপে উঠে ভূমিতলে পড়ে
হঠাৎ আহত বিন্দু; করতল কোথায় ঈশ্বর
নাকি তুমি মোহ-শরে বন্দী হয়ে আছো,
ভেঙে দেবো জোড়াতালি চাঁদের দোতারা
উঠে এসো হাত ধরে এ লীলায় যবনিকা টানি॥

নিজস্ব

যোগব্রত চক্রবর্তী

সেই রকম আর কোনো দুঃখ নেই
যা নিয়ে দু-চার লাইন পদ্য লিখে ফেলা যায়
সে-রকম গাঢ় কোনো রক্ত নেই যা দিয়ে
কপালে স্বাক্ষর এঁকে বলা যায়
একমাত্র তুমিই আমার—
সে-রকম নিজস্ব কোনো শোক নেই
যা নিয়ে বুক ফেটে খানিকটা কেঁদে নেওয়া যায়—

অথচ আশ্চর্য এক নিরালম্ব ভাব
কিসের অভাব—
কিসের অসুখ
জানি নাই মনে হয় একান্তই সুখ

পাল এলুয়ারের 'লু ফেনিকস্' থেকে

অনুবাদ : অবন্তীকুমার সান্যাল

১

রাত্রি কখনো পূর্ণ হয় না
তাইতো একথা বলি
তাইতো হলফ করি
উন্মুক্ত গবাক্ষ থাকে চিরদিন বেদনার শেষে
আলোকিত একটি গবাক্ষ
চিরদিন এক স্বপ্ন থাকে যার চোখে ঘুম নেই
বাহু থাকে পুরাবার ক্ষুধা থাকে মেটাবার
থাকে এক উদারহৃদয়
দুটি চোখ মনোযোগ-ভরা
একটি জীবন থাকে যে জীবন অংশভাক্ হয়।

২

আমরা দুজনে দুজনের হাত-ধরা
যেখানেই হোক দোঁহে বিশ্বাস রাখি
স্নিগ্ধ গাছের কালো আকাশের নিচে
আগুনের কোণে যেখানে যে-কোনো ঘরে
ফাঁকা রাজপথে প্রখর সূর্যালোকে
নিবিড় ভিড়ের নিশানাবিহীন চোখে
প্রাজ্ঞের পাশে প্রজ্ঞাহীনের পাশে
শিশুদের মাঝে বয়স্কদের মাঝে
প্রেমের কিছুই বিস্ময়কর নেই
আমরা প্রমাণ দুইজনে আছি তার
ভালো যারা বাসে বিশ্বাস রাখে দোঁহে

৩

সমুদ্রের তটে কয়েকটি জলের ডোবা
বনে বনে পাখিতে পাগল-করা গাছ
বরফ গলছে পাহাড়ে
ফুলে ফুলে ঝকমক করে আপেলের ডাল
ফ্যাকাশে সূর্য কেমন পিছু হটছে

বড়ো কঠিন এক জগতে সে-এক শীতের সন্ধ্যায়
দেখেছি এই বসন্ত নিষ্কলঙ্ক তোমার সান্নিধ্যে
আমাদের কোনো রাত্রি নেই
ক্ষয় যার আছে তার কোনো দখল নেই তোমাতে
আর তুমিও চাও না শীতার্ত হতে

আমাদের বসন্ত এক বসন্ত যে সুসংগত।

ইতিহাসের বাবু বা বাবুর ইতিহাস

শান্তি বসু

ডিওজেনিস, রুসোর ভাষ্যে জানি, সর্বত্র খুঁজতেন একটি মানুষ যেহেতু তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ধ্রুপদি একটি মানুষকে তিনি পেতে চেয়েছিলেন ; স্থান-কালের তাৎকালো ইতিহাসের প্রগতি যতোই সিদ্ধ হোক পুরাণের আশ্রিত সেই মানুষটিতে ধ্রুব একমাত্র মনুষ্যত্বের নিশ্চিত স্থির রূপের কেন্দ্রটি। পুরাণ ও ইতিহাসের নিহিত দ্বন্দ্বে সভ্যতার ক্রমবিবর্তিত চরিত্র স্থানকালমাহাত্ম্যে সময়ের যে রেখায় সরলীকৃত সেখানে যদিচ মানুষের পরিমাপ প্রায় খ্রীষ্টীয় তাৎপর্যে স্বীকৃত, তবু ইয়োরোপীয় খ্রীষ্টানের মানসে বর্তমান আধুনিকতার প্রাসঙ্গিকতায় ব্যক্তি-ব্যক্তি, সমাজ ও ব্যক্তির[*] নানাভঙ্গে ভয়াবহ। কারণ মহাকাল পুরাণের উপজীব্য এবং ভারতীয় মাত্রই জানেন যে বিশ্ববিধানে মনুষ্যত্ব মন্বন্তরেরই নিয়মে বর্তমানের বিপর্যয়ে মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য, এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্মাবর্তনের পরেই আবার সত্য ও ঐশ জীবনের প্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যে কার্তেজীয় প্রশ্নে ('আমি তাহলে কী ? বলা হয়েছে চিন্তারত বস্তু। কিন্তু চিন্তারত বস্তুটিই বা কী ?') 'কসমস' ও 'কেওসে'র গ্রীক সমস্যাটির আধুনিক প্রত্যাবর্তন একদিকে যেমন যান্ত্রিক, সমানুপাতিক খেরো-বাঁধা সময় ও ব্যক্তির উপলব্ধ সময়ের দ্বন্দ্ব (বের্গসনীয় যন্ত্রণা) তৈরি করে, তেমনি সমাজব্যবস্থার নিদানে হিউমের নৈরাত্ম্যবাদ ('There is no *simplicity* in it at one time, nor *identity* in different') কাণ্টীয় তাত্ত্বিক জবাবের সূত্রে স্বাভাবিকভাবেই আত্মহীন বঞ্চনায় মানুষকে সময়ের দাসে পরিণত করে যেহেতু এই সময় শ্রমকালের সংখ্যানুপাতিক হিসেব অর্থাৎ মজুরি। মানুষ এবং মজুরি

---

[*] Nirod C. Choudhuri *The Continent of Circe* (Chatto & Windus, London, 1965) ; *The Intellectual in India* (Vir Publishing House, New Delhi, 1967).

তুল্যমূল্য হয়েই যন্ত্রযুগের অগ্রগতি অর্থাৎ ইতিহাস এবং ইতিহাস-পরিচালকদের 'গ্রেস' আসে অর্থনীতির ভারসাম্যে, যে-ভারসাম্যের যুক্তিতে তাঁরা আবার শান্তির স্থায়ী পথ খোঁজেন বিশ্বের সঙ্গে ব্যতিরেকী অন্বয়ে। এই অন্বয়ে হাহাকারটাই তখন প্রকট যেহেতু কলিতে বিশ্বের নৈয়ায়িক মহাসূত্রটি ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হয়ে মানবতাবাদের সরল ছকে আত্মসিদ্ধির পথ খোঁজে,—পুরাণহীন ইয়োরোপীয় সভ্যতা বা জাগতিক ঐতিহ্যবিচ্যুতির আধুনিকতা যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

গণিতজ্ঞ দার্শনিক হ্বাইটহেড তাই সভ্যতার মূলসূত্র নির্দেশ করেন 'মেটা-ফিজিক্যাল' তত্ত্বে, রনে গেনোর পরাক্রান্ত বিশ্লেষণের সাহায্য ছাড়াই যদিচ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী প্রবীণ নীরদ সি. চৌধুরী ভারতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসার মূল কেন্দ্রটিকে হারান নিছক খেয়ালি কিন্তু আজগুবি প্রশ্নে এবং ততোধিক স্বকপোলকল্পিত সমাধানে। আত্মাভিমানে তিনি চারজন অ।ত খ্যাত ঐতি-হাসিকের পাশে নিজেকে বসাতে চেয়েছেন এবং সে-তালিকায় ডিলথী ও টএনবি-র নাম বাদ পড়লেও অভিজ্ঞ পাঠক জানেন শ্রীচৌধুরী কখনো টএনবি-র অন্ধ অনুকরণ করেছেন এবং কখনো 'হারমেন্যুটিক্সে'র বিকৃত অনুসরণে নিছক ব্যক্তিগত কাহিনীকে চাবি করেছেন তাৎপর্যবিচারে। কখনো অবশ্য তিনি সমসাময়িকতার সূত্র আনতে চেয়েছেন কিন্তু সেক্ষেত্রেও নীৎশে বা নীৎশে-শিষ্য স্পেঙ্গলারের সমসাময়িকতার সূত্রটি দখলে না-থাকায় অযথা বিপথে ঘোরেন। ভারতজিজ্ঞাসার কেন্দ্র ওঁর কাছে 'Hindus of the Anglicized upper-middle class', ফলে ইয়োরোপীয় প্রভুদের পদাঙ্কে লেখেন : 'The tragedy of all the systems of Hindu philosophy is that they confront man with only one choice : Remain corruptible and corrupt flesh, or become incorruptible and incorrupt stone।' কারণ, 'Not only Sankara, but all the revealed scriptures on whose interpretation by himself he based the authority of his personal philosophy, failed to define the Universal Soul as anything but a negation of all that was accessible to the senses, to thought, and to feelings even।' এই অজ্ঞানের ভিত্তি ইয়োরোপীয় তত্ত্ব বিষয়ে একটি মৌল ভ্রান্তি থেকে আসে। শ্রীচৌধুরী সম্ভবত ইয়োরোপীয় 'negation'-এর সংবাদ রাখেন না, তাই পাঠকের বিবেচনার্থে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা যুক্তিসংগত। খ্রীষ্টানের ঈশ্বর মূলতই নামহীন ঈশ্বর। ইহুদি ঐতিহ্য অনুসারে

টেট্রাগ্র্যামাটন (যা তৈরি হয়েছে চারটি ব্যঞ্জনবর্ণে এবং যার মধ্যেই গুপ্ত আছে ঈশ্বরের অনুচ্চারিত নাম) জানে একমাত্র পূজারি ব্রাহ্মণ, বংশপরম্পরায় এই জ্ঞানের চাবি তাদেরই হাতে। কিন্তু কালক্রমে সেই উচ্চারণবিধিটিও হারিয়ে গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মাইমোনাইডিস সে-কথা জানান, বলেন : কেউই আর সে-নাম উচ্চারণ করতে পারে না। খ্রীষ্টানেরা অবশ্য নানা নামে ঈশ্বরকে বোঝাতে চেয়েছে, কিন্তু তারাও সত্যের নির্দিষ্টতা দাবি করে নি। এ-বিষয়ে সমস্ত সমস্যার কেন্দ্র 'এক্সোডস' ৩ ১৩-১৪-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটি। মোজেস ঈশ্বরের নাম জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সূত্রাকারে একটি বাক্যই মাত্র উচ্চারণ করেন, ইংরেজিতে যা হল 'I Am Who Am' ও 'He Who Is'। এই সূত্রটির প্রাচীনতম ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আমি যা আমি তাই এবং তোমার সে-কথা জানবার দরকার নেই। পরবর্তীকালে গ্রীকদর্শন-জারিত তাত্ত্বিকরা 'সত্তা'র সূত্রে বাক্যটির ব্যাখ্যা করেন যদিচ কিন্তু স্বয়ং এরিস্টটল্ লিখেছেন, 'সত্তার স্বরূপ সর্বদাই সংশয়ের বিষয়'। ঈশ্বরের এই অজ্ঞেয়তা গ্রীক গির্জার পিতারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। নবম শতাব্দীতে রহস্যজনক দেনিস দ্য অ্যারিওপ্যাগাইটের মূল্যবান গ্রন্থে বিভ্রান্তিকর একটি প্রশ্ন তোলা হয় : 'ঈশ্বরকে আমরা কেমন করে জানব ? তিনি তো ইন্দ্রিয়গোচর নন, তিনি তো জ্ঞানে প্রকাশিত নন, বা তিনি এমন বস্তুও নন যাকে আমরা বলি জীব।' এ-প্রশ্নের জবাব মেলে না কারণ ঈশ্বর সংজ্ঞার বাইরে, আমরা তাঁর সত্তায় বিশেষণ বা উপাধি বা নামরূপ জুড়তে পারি না। খ্রীষ্টতত্ত্বে বা খ্রীষ্টানের ঈশ্বরতত্ত্বে তাই সর্বত্র এই নঞর্থকতা। প্রথমে যদি বলি ঈশ্বর এই, ঈশ্বর ওই, তবে পরমুহূর্তেই বলতে হবে তিনি এই নন, তিনি ওই নন, তিনি কোনো কিছুই নন যেহেতু তিনি সবকিছুর উপরে। স্বয়ং অ্যাকুইনসের দর্শনে ঈশ্বর যদিও আছেন এবং তিনি সত্তার শুদ্ধ ক্রিয়ায় স্থিত তবু আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যবহৃত 'হয়' ক্রিয়াটির অর্থ জানি না এবং জানতে পারি না। তিনি অন্তত রূঢ়ভাবে বলেন : 'neither the Catholic nor the Pagan knows the very nature of God as it is in itself'। এনাক্সিমেণ্ডার যে-সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে বীজাকারে লেখেন, 'the first principle of all things is infinite', তাকেই অ-খ্রীষ্টান স্পিনোজা বলেন, 'is a being absolutely indefinite, that is a substance consisting of infinite attributes, each of which expresses eternal and infinite essence'। ফলে এই অনন্তকে আমরা কেমন করে বুঝব ? শংকর বলেন 'নেতি' 'নেতি' করে।

এই নেতি কি জীবন অস্বীকারে? শংকর অন্তত সে-কথা যে বলেন না তা ভারতীয় হিন্দুর সংস্কৃতির সাক্ষ্যে প্রমাণিত।

তবু ভারতীয় হিন্দুর প্রাচীন কিছু গৌরব ছিল যদিও উত্তরাধিকারে তারা বর্তমানে 'have also become the sons of Moloch, in addtion to being sons of Mammon? মণ্টেস্থ-র সরল আবহ-তত্ত্বের স্বকীয় সংস্করণে শ্রী চৌধুরী সিদ্ধান্ত করেন, ভারতীয় হিন্দুর চরিত্রে আছে 'streak of insanity', কারণ, 'the interaction of the climate and the human mind generated two special attitudes towards material squalor in Hindu society; first, the abnormal sensitiveness to it, leading to the washing mania; and the second, the philosophical or mystical indifference, parading philosophy and mysticism to the point of coprophagy and beating Diogenes hollow'। বর্তমান উদ্ধৃতিতে উপস্থিত হাস্যকরতা অজ্ঞতা 'ইকোলজি' ও 'হিউম্যান জ্যোওগ্রাফি'র যে কোনো ছাত্রকেই বিমূঢ় করবে, এমন কি মনস্তত্ত্বের সুলভ ব্যবহারে (যেহেতু হিন্দুর 'dementia praecox' ও 'paranoia' তিনি নিশ্চিত) এমন সন্দেহ অস্বাভাবিক নয় যে শ্রী চৌধুরী বক্ষ্যমাণ শাস্ত্রাদিতে হংসবৎ নন, নিছক আধুনিক ভারতীয় মাত্র। শ্রী চৌধুরী বলতে চাচ্ছেন ইয়োরোপীয় আর্যরা গরমদেশে (ভারতবর্ষে) এসে অচিরেই চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে এবং বর্তমান হিন্দুরা সেই ভ্রষ্টতার ঐতিহাসিক প্রমাণ মাত্র।

যদি প্রশ্ন হয়, এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রমাণ কি, তবে তিনি বলবেন আধুনিক ভারতীয় ইংরেজদের দিকে তাকিয়ে দেখ: 'the advent of a people of temperate lands in a tropical country; its unfamiliar and uncongenial climate and weather; the presence of an overwhelming member of natives unreconciled to foreign rule; and an ever present threar of submergence in a lower culture··· The position of the Aryan, who afterwards became Hindu, was identical'। প্রভু ইংরেজদের দুর্দশার কারণগুলোতেই শ্রী চৌধুরীর কৃতকার্যতার বীজ নিহিত। কারণ, আদি সভ্যতায় মধ্যপ্রাচ্যের দান ইতিহাস-বিদিত অথচ সে অঞ্চলের জলবায়ু সেকালে যে ইয়োরোপীয় শীতলতা নিয়ে বর্তমান ছিল না, এ কথা কি শিশুরও অবিদিত? বা পক্ষান্তরে, সাহেব ইয়োরোপীয়

আর্যরা গোড়ায় চরিত্রভ্রষ্ট না হয়ে (ইংরেজদের মতো হওয়া উচিত ছিল) ভারতীয় সভ্যতার পত্তন করল কী ভাবে? উত্তাপে অর্ধমৃত ইয়োরোপীয় আর্যদের ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন ওঠে অন্যত্র উত্তপ্ত অঞ্চলে মানুষ বাঁচে এবং ভালভাবে বাঁচে কেন, কেন তারা ভারতীয় হিন্দুর মতো অসৎ, নচ্ছারে পরিণত হয় না? তবে তিনি জবাব দেবেন, আদিবাসীরা সবই পারে। কাজেই আফ্রিকা মহাদেশে উত্তাপ সত্ত্বেও সভ্যতা গড়ল আদিবাসীরা। কিন্তু ভারতবর্ষে, প্রকৃতিকে জয় করেও, আদিবাসীরা, আর্যদের তুল্য সভ্যতা গড়তে পারল না কেন? শ্রী চৌধুরী মজাদার একটি গল্পে জানান কেমনভাবে ভারতীয় হিন্দুরা অসামান্য লোভে তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের দিকে ছোটে এবং এ কথাই প্রমাণ করে, এ দেশের উত্তাপে লোভ কাম মোহের বীজ কেমন ছড়িয়ে থাকে। এই গল্পের আরো একটি প্রামাণ্য যে সাহেব আর্যের রক্তে শীতলতার আকর্ষণ অদম্য। কিন্তু মজাদার কাহিনীর ঐতিহাসিকতায় শ্রী চৌধুরী ভুলে যান আর্য ইংরেজরা ঠাণ্ডায় কেন্দ্রীয় তাপ-নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবে, ঘরে ঘরে জ্বালানি পোড়ায়। তাছাড়া শ্রী চৌধুরীর দেশটা নিশ্চয়ই দিল্লীর কিছু বাবু ভদ্রলোকেই শেষ নয়, ছোটলোক চাষাভুষোরা খোলা সূর্যের তলাতেই ভদ্রলোকদের দানাপানি জোগাড় করে। পরাণ মণ্ডল, পাঁচু শেখের কথা শ্রী চৌধুরী আলোচ্য মনে করেন না, ইংরেজের কাছে শেখা আদিবাসীর প্রতি মমতায় দ্রব হন যেহেতু বাবুর মনে শিকড়ের টানের পরিবর্তে দূরবর্তী করুণাই আসে ভালো।

ভারতীয়ের ভারতীয়ত্ব হরণে শ্রী চৌধুরী এতোই ব্যস্ত যে মহেনজোদড়ো ও আর্যভারতের সামগ্রিক ঐক্যের সূত্রটি নজরে আনেন না যদিচ মূলতানি গাইয়ের প্রামাণ্যে বলতে চান যে তারাও ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে যেহেতু আর্যরাও বাইরে থেকে এসেছে (এবং গোরু ছাড়া আর্যদের আর কি রইলো!)। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার বলিবর্দটি এলো কোথা থেকে। শ্রী চৌধুরী মেসোপটেমিয়ার কুয়ালাও-জারমোর একটি প্রাচীন কৃষিভিত্তিক উপনিবেশের ছবি দেখে বুঝে ফেলেছেন যে কেন উত্তরভারতের আর্যরা মধ্যপ্রাচ্যের মতো কুটীর বেঁধেছে যদিও কিন্তু তারা অধুনা মৌসুমি বৃষ্টির অঞ্চলে বসবাস করছে। 'There huts are still made of sunbaked clay, with a stiffening of lath'। মাটির ঘরের সূত্রে তিনি বোঝাতে চাইছেন যে বহিরাগত ভারতীয়রা এদেশের জলবায়ুকে ধাতস্থ করতে পারে নি যেহেতু মেসোপটেমিয়ার নকল 'sunbaked clay'-র ঘর বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী চৌধুরীর এই অত্যাশ্চর্য

আবিষ্কারে বড়ো জোর প্রাচীন 'ডিফিউশনে'র গন্ধ থাকে, কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে, এমন সব হঠকারি উক্তিতে সভ্যতার ব্যাখ্যা হয় না। তাছাড়া উত্তরভারতের আর্যরা যদিবা শীতল অঞ্চল থেকে এসে থাকে, অন্ত্যজ বঙ্গভাষীরা এলো কোথা থেকে? অথচ বাঙালি চাষীর ঘরের দেয়াল মাটিলেপা নয়? সবচেয়ে বড়ো কথা, জীবনযাত্রার উপকরণ আসে উপস্থিত সাজসরঞ্জাম থেকে, তার জন্যে পুরাতত্ত্বের আকস্মিক ছবির দরকার করে না।

ফলত, উত্তাপে ভ্রষ্ট আর্যদের উত্তরাধিকারী হিন্দুরা দর্শনে শরীরকে প্রধান স্থান দেয় ('The Hindu never represented human suffering as anything but the ills flesh is heir to'), তারা জীবনের লক্ষ তৈরি করে 'the sensuous and sensual' এবং 'could not transform it (sexual life) by infusing into it love in the western sense, because they were quite incapable of taking any view of the sexual activity which was not physical'। রতিক্রীড়া শরীর ব্যতিরেকে অন্য কিছু হয় কিনা আমার জানা নেই তবে 'ইরস'-তত্ত্ব, আমরা জানি, একমাত্র ভারতীয়েরই আছে, ইয়োরোপের নেই। একদিকে দর্শনের নেতি আবার অন্যদিকে শরীরসর্বস্বতার বক্তব্যে শ্রী চৌধুরীর যুক্তি যদিও হতচকিত, আমরা জানি, খ্রীষ্টান সন্তদের সাক্ষ্যে যে, ইয়োরোপীয় মন কীভাবে শরীরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। এবংবিধ আলোচনায় শ্রীচৌধুরীর প্রথম গ্রন্থটি নিতান্তই গৌণ, অকিঞ্চিৎকর, এবং ভ্রান্ত লেখকের কুরুচির পরিচয় সর্বত্র বহন করে।

দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রী চৌধুরী প্রথম গ্রন্থের সমস্ত ভ্রান্তিকেই সমাদর করেন যেহেতু হিন্দুর 'narrowness and xenophobia'-য় তিনি বিরক্ত এবং অল-বিরুনির গ্রন্থে তিনি ভারতীয়ের চরিত্র সমস্তই সমধিক জ্ঞাত হয়েছেন। এই আদি জ্ঞানের পর অতি-প্রচলিত সেই উনিশশতকী নবজাগরণের ইংরেজি দিক্‌দর্শনে শ্রী চৌধুরী হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান উলেমার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা বিষয়ে মতামত দেন যে, 'No Hindu conservative approved the introduction of monotheism or disputed its superiority to image worship···' এবং 'the establishment of British rule brought modern means of earning'। শ্রী চৌধুরী অবশ্য দ্বিতীয় উদ্ধৃতির রহস্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন না, যদি করতেন তবে আধুনিক ভারতীয়ের, বিশেষত বাবু

বুদ্ধিজীবীর কাছে এটাই একমাত্র লক্ষ, বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনের পথে চলার দায় আমাদের নেই ; জীবিকাই মূল এবং তার মূল্য পেশার মৌল দেশগত সাংস্কৃতিক সংগঠনে নয়, নিছক বাঁচার তাৎকালো নিবদ্ধ। সেখানে ছোট-লোকদের চাইতে বাবু ভদ্রলোকদের প্রয়োজন ও কৃতকার্যতাই প্রধান। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর দায় বিষয়ে সচেতন হলেই জানা যায় জীবনের মূল থাকে দেশের ও দশের গভীরে ; এই দশ কেবলমাত্র মানবতাবাদের দশ নয় (যদিও তাকে বাদ দিয়েও নয়), নিজের আত্মজ্ঞানের পথে ঐতিহ্যের পরম্পরাগত সত্যকেই উজ্জীবিত করা, খুঁজে আনা 'মেটাফিজিক্যাল প্রিন্সিপল্'টিকে, যা জীবনের প্রবহমানতায় সঞ্জীবনী মন্ত্র। শ্রী চৌধুরী বুদ্ধিজীবীর চরিত্র বিষয়ে যে-কথা লেখেন তা থেকেই পরিস্ফুট হয় যে তাঁর দেশ ও দশ ইংরেজের পদাঙ্কে বাবুর পরমার্থে ঘোরে। ১. 'he applies his intellectual faculties to understand and interpret the world around him' ; ২. 'as a result of study, observation, and experiments he formulates conclusions which he believes to be true or, at all events truer than those which are current before' ; ৩. 'he communicates his ideas to fellowmen with a view to influencing their mind, life and action ;' – এই তিনটি উদ্ধৃতির অতি সাধারণ বক্তব্য প্রমাণ করে লেখক ভারতীয় মনের মৌল আলোচনায় প্রস্তুত নন যদিচ কিন্তু এই তিনটি সূত্রের ব্যবহারে তিনি বুঝেছেন, 'under the influence of dogma' ভারতবর্ষে কোনো 'intellectual inquiry' ঘটতে দেয় নি, এমন কি 'growth of intellectual aptitudes'-ই ঘটে নি এখানে। ফলে সর্বত্র 'an air of secrecy and esotericism never left the Hindu pursuit of knowledge and at times this became grotesque. Secondly, it became intuitional'। এবং তৃতীয়ত 'it became the monopoly of a spacial class'। এই অপপ্রচারের আনন্দে তিনি তখন বলতে পারেন ভারতবর্ষে প্লেটো ও দেকার্তের চর্চা সম্ভব নয়, কারণ প্লেটোর সিদ্ধান্ত ('un-criticized life is not worth living') ভারতীয় হিন্দুর আয়ত্তে নেই, দেকার্তের 'সংশয়' ভারতীয় মনে সুদূরপরাহত।

শ্রী চৌধুরীর এবংবিধ সমস্ত বক্তব্যই শিশুর সারল্যে উপস্থিত। শিশুর যেহেতু বিশ্বাসই প্রধান, সমালোচকের তথ্যনজিরে প্রতিবাদী বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করবার

দায় থাকে না। জটিল ভারতবর্ষের জটিলতর সংস্কৃতি এবং ততোধিক অধঃপতনের কার্যকারণ শ্রী চৌধুরীর কুহকিনী রহস্যে অনুপস্থিত যেহেতু তিনি সমস্যাটির চরিত্র বিষয়েই অনবহিত। নইলে, ভারতীয় হিন্দু চুলোয় যাক, বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে মুসলমান সমস্যা বিষয়ে, মুসলমানের প্রারব্ধ ও কর্ম বিষয়ে একটি বাক্যও ব্যয় করতে পারেন না। অবশ্য একমাত্র সন্তান ভারতীয় হিন্দু হিসেবে আছেন তিনি, শ্রীনীরদ সি. চৌধুরী, তাঁর অমৃতময় বালভাষণে।

আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রাষ্ট্রপতি জনসন কিছুকাল আগে যখন কেরনার কমিশনকে নিযুক্ত করেন, আমেরিকা মহাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক সাদা-কালোর দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধান করার জন্য, অনেকের তখন সেই কমিশনকে নিতান্ত অবান্তর মনে হয়েছিল। আমেরিকার কালো অধিবাসীদের অর্থনৈতিক ক্লেশ, রাজনৈতিক হতাশা, সাংস্কৃতিক গ্লানি নিয়ে মার্কিন সাংবাদিকদের অজস্র আলোচনা এবং তথ্যবহুল বিশ্লেষণ জগতের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে, সে বিষয়ে নতুন করে বলার জন্য 'দি ইউ. এস. ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কমিশন অন্ সিভিল্ ডিস্‌অর্ডার'-এর প্রয়োজন ছিল না। তবুও অনেকে আশা করেছিলেন, হয়তো এই কমিশন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই ধরনের দাঙ্গা থামানর জন্য কী কী দরকার সেগুলো বলবেন। কেরনার কমিশন সে বিষয়ে অবশ্যই নীরব থাকেন নি। কিন্তু যা বলেছেন, তার সার্থকতা কতখানি, তিনটি উদাহরণ নিলে স্পষ্ট হবে।

প্রথমত, কমিশনের ভাষায়, আজ আমেরিকার প্রধানতম সমস্যা বর্ণসমস্যা। বর্ণবিদ্বেষ যে আমেরিকার এক গুরুতর সমস্যা, সে কথা গত পাঁচ-ছ বছরের গ্রীষ্মকালীন হাঙ্গামাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ কি আমেরিকার প্রধানতম সমস্যা? যে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকা তলিয়ে যাচ্ছে, যে যুদ্ধের ফলে ডলারের স্থিতিশীলতা টলমল করছে, গত চার বছরের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধবিৎ সেনাপতিকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে এবং নভেম্বরের ইলেকশনের ফলাফল সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নন, সেই যুদ্ধকে বাদ দিয়ে বর্ণসমস্যাকে প্রধানতম সমস্যা বলা বাড়াবাড়ি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে সেই ভিয়েতনামের জন্যই বর্ণসমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠছে যখন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণসমস্যাকে আমেরিকার প্রধানতম সমস্যা বলা অর্থ নিগ্রোদের নিয়ে বাক্‌সর্বস্ব সাহিত্য রচনা করা।

কেরনার রিপোর্টটি যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ মনে হয় না, মনে হয় সাহিত্য রচনা, তার দ্বিতীয় কারণ, কেরনার কমিশন নিগ্রোদের দারিদ্র্যমোচন করবার জন্য যে সব সংস্কার আশু প্রয়োজনীয় মনে করেন, সেই সব সংস্কারসাধনে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সে সম্বন্ধে বিস্ময়করভাবে নীরব। অর্থাৎ, কেরনার কমিশন সম্ভবত জানতেন, আমেরিকার স্বাধীন স্বচ্ছল উদারনৈতিক শ্বেতকায় অধিবাসীদের কেউ কেউ হয়তো নিগ্রোদের দুঃখে হা-হুতাশ করতে পারেন, কিন্তু ট্যাক্সের বোঝা বহন করতে তাঁরা রাজী নন।

তাহলে কেরনার কমিশন, তথা রাষ্ট্রপতি জনসন, তথা আমেরিকার উদার-নৈতিকেরা কীভাবে বর্ণসমস্যা দূর করতে চেষ্টা করবেন? কমিশনের ভাষায়, নিগ্রোদের দারিদ্র্যমোচন হতে পারে অব্যবস্থার মূল কারণগুলির বিরুদ্ধে একটা সহানুভূতিপূর্ণ, ব্যাপক ও অবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের ('a compassionate, massive, sustained attack on the root causes of disorder') সাহায্যে অর্থাৎ একমাত্র ভরসা শ্বেতকায়দের অনুকম্পা।

যথার্থ কারণেই ওয়াল্টার লিপম্যান কেরনার কমিশনের রিপোর্টটিকে একটি 'ইউটোপিয়া' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। যে নতুন ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারের আশু প্রয়োজন ('major need to generate a new will') কমিশন ব্যাকুলভাবে বোধ করেছেন সেই নতুন ইচ্ছাশক্তির জন্ম মনে হয় না আমেরিকায় সম্ভব। তার কারণ, আমেরিকার সাদা-কালো বর্ণবৈষম্যের ইতিহাস। 'নিউজউইকে' প্রকাশিত একটি চুটকি থেকে সে ইতিহাসের ফলশ্রুতি উপলব্ধি করা যেতে পারে।

কয়েকদিন আগে নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস্ নিউ অর্লিয়ান্সে একটি পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পার্টির ভীড়ে উইলিয়ামসের অস্বস্তি ঘটায় তিনি ঠিক করলেন, লোকজন সরান প্রয়োজন। তিনি আর কিছুই করলেন না, শুধু দুঃখের সঙ্গে জানালেন তাঁর পাশের লোককে, আপনারা বোধ হয় জানেন না, আমি একজন অক্টোরুন। মিনিট কয়েকের মধ্যে ঘর একেবারে শূন্য হয়ে গেল। যাঁরা 'অক্টোরুন' কী জানেন না, অভিধান খুললে দেখবেন, অক্টোরুন অর্থ সেই শ্বেতকায় যাঁর রক্তে ⅛ ভাগ নিগ্রো রক্ত আছে।

আমেরিকায় নিগ্রো দাসের আমদানির ইতিহাস আমাদের দেশে সুবিদিত। এবং ১৮৬৩ সালে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের মহানুভবতার কথা আমরা শিশুবৃদ্ধেরা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। লিঙ্কনের গল্প আমরা সবাই জেনেছি অবশ্য

অ্যাংলো-স্যাক্সন সাদাদের মুখ থেকে। ছোটদের জন্য লেখা গল্পে, এবং অধুনা কলেজপাঠ্য ড্রিঙ্কওয়াটারের নাটকে যে-কথা অবশ্য উহ্য থেকে গেছে, তা হল নিগ্রোদের জন্য লিঙ্কনের দরদের উৎস যতোটা না তাঁর নিগ্রোপ্রীতি, তা থেকে বেশি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতকায়দের বাঁচানর তাগিদ। দাসত্বপ্রথা রহিত করে লিঙ্কন মহানুভব হয়েছেন, কিন্তু নিগ্রোদের আমেরিকায় বসতি তিনি সুচক্ষে দেখেন নি। নিগ্রোদের আমেরিকা থেকে দূর করে দেওয়া, অন্তত তৎকালীন মধ্য এবং পশ্চিম আমেরিকায় তাদের নির্বাসন দিতে তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। আফ্রিকার লাইবেরিয়ায় নিগ্রোদের চালান করে দেওয়া তারই ফল। যে সাদা-কালোর বৈষম্য আজ আমেরিকার অন্যতম প্রধান কলঙ্ক, মহানুভব অ্যাবে লিঙ্কন তা থেকে বিন্দুমাত্র মুক্ত ছিলেন না।

নিগ্রোদের আমদানি হয়েছিল নেহাৎই অর্থনৈতিক তাগিদে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম-বিশ্বাসী সাদারা নিগ্রো দাসদের তাঁদের জীবনে অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নানা রূপকথার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের ধর্ম বাঁচিয়েছিলেন, এর ইতিহাস কপট ধার্মিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন। সভ্য মার্কিনরা প্রথমে নিজেদের বোঝালেন, সভ্য জীবনের জন্য দাসত্বপ্রথা নিতান্তই প্রয়োজন। রোমের ইতিহাস, গ্রীসের ইতিহাস তাঁদের সাহায্যে এলো।

দ্বিতীয় কপটতা হল নিগ্রোদের ইতিহাসকে বিকৃত করা। নিগ্রোদের প্রচার করা হল বর্বর অসভ্য আদিম অবমানুষ বলে। এদের আশ্রয় দিয়ে, এদের খ্রীষ্টান করে মার্কিন জনসাধারণ বলতে চাইলেন, অসভ্যদের সভ্য করে তুলছি, কিন্তু এরা এতোই অসভ্য যে শৃঙ্খলমুক্ত হলে এরা আবার বনেবাদাড়ে পালিয়ে যাবে।

তৃতীয় কপটতা হল, দাসত্বপ্রথাকে রাজনৈতিক মুক্তি হিসেবে প্রচার করা। নিগ্রোরা তো যুদ্ধবন্দী। কোন্ যুদ্ধ, কীসের যুদ্ধ, কোথায় যুদ্ধ, এবং যুদ্ধের কারণ কী, সে সব চেপে দিয়ে তাঁরা জানালেন যে নিগ্রোবন্দীদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে দাসে পরিণত করে তাঁরা মানবিক আচরণে মহৎ হয়েছেন।

সবচাইতে বিস্ময়কর হল চার্চের আচরণ। ক্যালভিনিস্ট ধর্মের দোহাই পেড়ে নিগ্রোদের নিম্নতর মানুষ বলে তাঁরা গণ্য করলেন এবং তাদের উন্নত করা ধর্মেরই অঙ্গ বলে প্রচার করলেন। দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রো দাসের সর্ববৃহৎ প্রভু হয়ে উঠলেন চার্চ স্বয়ং। ক্যালভিনিস্টরা জন্মফলে বিশ্বাস করেন। তাঁরা বললেন, সাদা চামড়া ভগবান দিয়েছেন উন্নততর জীব বোঝানর জন্য, কালো

চামড়া নিম্নতর। ভগবানই ওদের আলাদা করে দিয়েছেন, সুতরাং ওদের আশ্রয় দেওয়া উচিত বটে, তবে ওদের সমস্তরের মানুষ বলে গণ্য করা ভুল হবে।

আফ্রিকার ইতিহাস অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন সাক্ষ্য বহন করছে। আদিম বর্বর আফ্রিকানদের ইতিহাস অসভ্যতার ইতিহাস তো নয়ই, বরং মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের তুলনায় সভ্যতরও বটে। গানার নতুন ঐতিহাসিকেরা যখন গানার বিকৃত ইতিহাস নতুন করে রচনা শুরু করেন তখন শ্বেতকায় বুদ্ধিজীবীরা কৌতুক অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তাতে সত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি। নীল উপত্যকার সভ্যতা কৃষ্ণ আফ্রিকানদেরই সভ্যতা। পিরামিড তৈরি করেছিলেন আফ্রিকার কৃষ্ণ অধিবাসীরা, শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা নন। অবশ্য প্রাচীন মিশরের সভ্যতা শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন শ্বেতাঙ্গ সভ্যতা। সেই সঙ্গে বর্তমান মিশরকে মনে করেন বর্বর আফ্রিকান মিশর। কপটতার চূড়ান্ত নিদর্শন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বর্ষ পর মিশরীয় সভ্যতার পতন শুরু হলে আর এক সভ্যতা গড়ে ওঠে বর্তমান সুদানের কুশ রাজ্যকে ঘিরে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই সভ্যতার নিদর্শন বিরাট লৌহশিল্প। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুশ রাজ্যের পতন হতে শুরু হলে বর্তমান ইথিওপিয়ার উত্তরে আকসুমকে ঘিরে আর এক সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। এর পরেকার ইতিহাস একের পর এক রাজ্যের—তাদের কোনোটাই বর্বর অসভ্যদের কাহিনী নয়। অষ্টম শতাব্দীর আরব ঐতিহাসিক আল ফজরির সাক্ষ্যে গানার স্বর্ণসমৃদ্ধ বাণিজ্য, দশম শতাব্দীর বাগদাদের পরিব্রাজক আল মাসুদির সাক্ষ্যে রোডেশিয়ার কাহিনী ইয়োরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেছে আফ্রিকায়—সে সব ক্যালভিনিস্টদের ধর্মে ঠিক খাপ খায় না।

আমাদের দেশের ধারণা, আফ্রিকা 'ডার্ক কন্টিনেন্ট'। ছায়াবৃত আফ্রিকা কিন্তু নেহাৎই সূর্যহারা অরণ্য তখন ছিল না, এবং আফ্রিকানেরাও ঠিক চেতনাতীত মন নিয়ে প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাদুতে সমাহিত ছিল না। অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাপ্পায় রোম্যান্টিক কবি ভুলেছিলেন, এবং আফ্রিকার ইতিহাসকে উদ্‌ভ্রান্ত আদিম যুগ বলে ভুল করেছিলেন। আফ্রিকার দৈন্যদশা ঘটে মাত্র এক হাজার বছর আগে, তার আগেকার ইতিহাস ইয়োরোপীয় সভ্যতা থেকে হীন নয়।

যে ঘৃণা অনুকম্পা করুণার দাক্ষিণ্যে আমেরিকার নিগ্রোরা বেড়ে উঠেছেন, আজ স্বাভাবিক কারণে তা-ই বিদ্রোহের ভূমিকা নিয়েছে। সাদারা কালোদের যে গর্বমিশ্রিত অনুকম্পা দিয়ে দেখতেন আজ তরুণ নিগ্রোসমাজ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। নিউইয়র্ক ইত্যাদির মেটোতে সাদারা আজ প্রবেশ

অধিকার পায় না, শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিকরা সেখানে যান নিগ্রোদের করুণার দাস হয়ে। ঘেটোগুলো নিগ্রোরা সাদার ছায়া থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং যে দেয়াল তাঁদের ঘিরে রেখেছে তা হল 'ওয়াল অফ রেসপেক্ট'। তাঁদের গর্বের স্থান হল চার্লস ও মার্গারেট বারোর মিউজিয়াম অফ অ্যাফ্রো-আমেরিকান হিস্ট্রি। তরুণ নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা 'অ্যাফ্রো-আমেরিকান' রচনাবলি প্রকাশে তৎপর হয়েছেন। তাঁদের জীবনের সন্ধ্যাতারা হলেন বিদ্রোহী নিগ্রোদাস তুস্যাঁ লুভারচুর (Toussaint L'Ouverture), যিনি স্বাধীনতাদাবীর অপরাধে স্বয়ংকথিত মুক্তিযোদ্ধা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কারাগারে নিহত হন। তাঁদের জীবনের আদর্শ মার্টিনিকের বীর যোদ্ধা ফ্রান্জ ফানন, যাঁর 'পৃথিবীর নিপীড়িত সমাজ' তাঁদের কাছে বেদ-বাইবেল। এই নিগ্রো সমাজের প্রিয় মিলনকেন্দ্র হল ঘেটোর ছুটো একটা বইয়ের দোকান, যেখানে কিশোরকিশোরীরা এসে মগ্ন হয়ে যান ম্যালকম এক্স-এর আত্মজীবনীতে, স্টোকলে কারমাইকেলের 'কৃষ্ণশক্তি'তে, ল্যাঙস্টন হিউজেসের উপন্যাসে, পিকিড নিউজের সংখ্যাগুলোতে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রেসের প্রকাশিত গ্রন্থে, প্যামফ্লেটে। তাঁদের কাছে মহার্ঘ বস্তু হল গানায় তৈরি পুতুল। তাঁদের ফ্যাশন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে, কালোই সুন্দর। কোঁকড়ানো চুল সুন্দর, ঢিলে জোব্বা সুন্দর, বড়ো বড়ো কানবালা সুন্দর। নিউ-ইয়র্ক ঘেটোর এক বিরাট বাড়িতে ফ্রেসকো মিউর‍্যালে আঁকা হয়েছে আফ্রিকান মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি, ছ্য বয়েস থেকে ম্যালকম এক্স পর্যন্ত, সেখানে আছেন জ্যাজশিল্পী চার্লি পার্কার, মুষ্টিযোদ্ধা কেসিয়াস ক্লে, জ্যামাইকার মারকাস গ্যারভে, স্টোকলে কারমাইকেল, র‍্যাপ ব্রাউন।

আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষ ভবিষ্যৎ রূপ তাহলে কী হতে পারে? এ দেশের নিগ্রো জনসাধারণ বর্তমানে উপেক্ষার বস্তু হতে পারে না, কুড়ি কোটি মার্কিন লোকসংখ্যার আড়াই কোটি নিগ্রো। এঁদের আন্দোলন ক্রমশ সংহত আকার নিচ্ছে। নিগ্রো বস্তিগুলোতে যে কৃষ্ণশক্তির জন্ম হয়েছে, সেই শক্তির স্বরূপ সুতরাং চেনা দরকার।

আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল মূলত নিগ্রোদের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে শতকরা ৭৭ ভাগ নিগ্রো দক্ষিণেই বাস করতেন। কিন্তু দারিদ্র্যমোচনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁরা এখন শিল্পোন্নত উত্তরাঞ্চলে আসতে শুরু করেছেন। এখন প্রত্যেক মাসে কুড়ি হাজার নিগ্রো উত্তরে আসছেন যার ফলে নিগ্রোদের সংখ্যা

দক্ষিণে এখন শতকরা ৫৫। ১৯৪০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাইত্রিশ লক্ষ নিগ্রো উত্তরে আস্তানা নিয়েছেন।

কেন তাঁরা যাচ্ছেন, কীসের আশায়, এটা সহজেই অনুমেয়। কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলে সারা দিন কাজ করে তাঁরা পেতেন তিন থেকে চার ডলার। উত্তরাঞ্চলে তাঁরা পাবেন ঘণ্টায় ১½ ডলার। কিন্তু যে স্বাচ্ছন্দ্যের মরীচিকার পেছনে তাঁরা ছুটে এসেছেন তার বাস্তব রূপায়ণ কি সম্ভব হয়েছে?

কয়েকটি ছোট হিসেব নিলে ছবিটা পরিষ্কার হবে। মার্কিন সরকারের হিসেব মতো একটি পরিবারের আয় বছরে ৩৩০০ ডলার হলে তাকে মার্কিন জীবন-যাত্রার মান অনুযায়ী দরিদ্র বলে গণ্য করতে হবে। এই আয়ে অবশ্য না খেয়ে মরতে হয় না। তবে এমন অবস্থাও হতে পারে, একটি পরিবার না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছেন, তাঁদের রাষ্ট্র থেকে সাহায্য দেওয়া হবে। এই হিসেবের আলোয় নিগ্রোদের অবস্থা কেমন? আমেরিকার নিগ্রো পরিবারগুলোর গড় বার্ষিক আয় ৪৪৬৩ ডলার। দারিদ্র্যরেখার সামান্য উপরেই। শ্বেতকায় পরিবারের গড় আয়ের এটা প্রায় শতকরা ৫৮। এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে একটি শ্বেতকায় পরিবারের পোষ্যসংখ্যা কৃষ্ণ পরিবারের অর্ধেক। কৃষ্ণ পরিবারগুলোর শতকরা ৪১ দারিদ্র্যরেখার নিম্নে অবস্থান করছেন এবং শতকরা ১৪-এর জীবনযাত্রা নির্ভর করে রাষ্ট্র থেকে পাওয়া সাহায্যের উপর।

নিগ্রো বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ। শতকরা ৭·৩-এর চাকরি নেই। শ্বেতকায় বেকারের সংখ্যা এর অর্ধেক। এই সব নিগ্রো বেকারদের শতকরা ২৬·৫-এর বয়স পঁচিশের নিচে। পরিবারে পুরুষ অভিভাবক নেই এমন নিগ্রো পরিবারের সংখ্যা শতকরা ২৩। অনুরূপ শ্বেত পরিবার শতকরা ৯।

যে অর্থনৈতিক উন্নতির আশায় নিগ্রোরা দক্ষিণের বাসস্থান ত্যাগ করে উত্তরাঞ্চলে এলেন, সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা উপরের হিসেব থেকেই অনুমেয়। দিনে দিনে অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে। ১৯৬০ সালে নিগ্রো পরিবারের আয় যা ছিল, ১৯৬৫ সালে তা থেকে ক্রমে কমে এসেছে। ক্লীভল্যাণ্ডের হাণ্ড বস্তিতে এবং লস এ্যাঞ্জেলিসের ওয়াট্স বস্তিতে ১৯৬০ সালে একটি পরিবারের আয় ছিল বার্ষিক ৪৭৩২। ১৯৬৫ সালে ৩৯৬৬।

স্বভাবতই অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কোনো না কোনোভাবে আত্মপ্রকাশ করবেই। গত চার বছরে গ্রীষ্মকালে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে গেছে, এ বছরও মেম্ফিসে যার সূচনা এবং মার্টিন লুথার

কিংয়ের হত্যাকাণ্ডের পর পুনরায় বীভৎস আকার ধারণ করতে যাচ্ছে, তার জন্য কে দায়ী, শ্বেতকায়রা বা কৃষ্ণকায়রা, সেই নিরর্থক তর্কে গিয়ে লাভ নেই। মূল কথা এই, নতুন নেতৃত্ব কৃষ্ণশক্তি ক্রমশই প্রবল আকার নিচ্ছে এবং এই আন্দোলন নিছক ধর্ম বা ভাবাবেগ অতিক্রম করে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হয়ে উঠছে।

নিগ্রোদের মধ্যে নতুন জাত্যভিমান জন্ম নিচ্ছে, অভিমানে তাঁরা নিজেদের ভদ্র অ্যাফ্রো-অ্যামেরিকান বা নিগ্রো বলা ছেড়ে কালোরঙের আদমি বলে পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের মন্ত্রগুরু গ্যারভে বললেন, বর্ণমিশ্রণ থামাতে হবে, কৃষ্ণরক্তের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে। তাঁর ইউনিভারসাল নিগ্রো ইমপ্রুভমেণ্ট এ্যাসোসিয়েশনের পতাকা হল, কালো-সবুজ-লাল : নিগ্রো চামড়ার কালো, নিগ্রো আশার সবুজ, নিগ্রো রক্তের লাল।

কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহ শুধু কি বৎসরের গ্রীষ্মকালেই সীমাবদ্ধ থাকবে? মার্কিন জনসাধারণের নয় ভাগের এক ভাগ যে নিগ্রোজাতি, তাঁদের লোকসংখ্যাকে রাজনৈতিক শক্তির হাতিয়ার করে কোন্ পথে তাঁরা এগুবেন? এই প্রশ্নের উপর নির্ভর করছে নিগ্রো আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপ। আমেরিকার নাগরিক অধিকার আন্দোলন নতুন পথে চলবে অথবা যে পথে চলছে সেই পথেই এগুবে?

নাগরিক অধিকার আন্দোলনের উদ্‌গাতা এ. ফিলিপ র‍্যানডলফ এবং মার্টিন লুথার কিঙের সহকর্মী বেয়ার্ড রাস্টিনের 'From Protest to Politics,' (*Commentary* ফেব্রুয়ারি '৬৫) থেকে নিগ্রোদের এক অংশের, যে অংশই এতদিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের পুরোধা ছিল, বক্তব্য মিলবে। ১৯৬৩ সালে ওয়াশিংটন যাত্রা এবং ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কের বিদ্যালয়বর্জন আন্দোলনের নেতা বেয়ার্ড রাস্টিন বিশ্বাস করেন, নিগ্রোদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে শ্বেতকায়দের সঙ্গে সহযাত্রা করে। নিগ্রো, ট্রেড ইউনিয়ন দল, লিবারেল এবং যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের ঐক্যই নির্দেশ করবে নিগ্রোমুক্তি। বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো মেনে নিয়ে তারই মধ্যে থেকে একে পরিবর্তন করতে হবে।

স্টুডেণ্টস ননভায়োলেণ্ট কোঅর্ডিনেটিঙ্ কমিটি এবং স্টুডেণ্টস ফর এ ডেমক্র্যাটিক সোসাইটির উগ্রপন্থীরা এবং কৃষ্ণ জাতীয়তাবাদীরা বেয়ার্ড রাস্টিনের এই কোয়ালিশনপন্থী আন্দোলন একেবারে বর্জন করেছেন। তাঁদের মতে বেয়ার্ড রাস্টিন উদারনৈতিক সাদাদের চিনতে পারেন নি। মুখে যাই বলুন না কেন, জনসন-রবার্ট কেনেডি-ইউজিন ম্যাকার্থির দৌড় নাগরিক অধিকার আইন পর্যন্ত, সেই আইন কার্যকর করার শক্তিও তাঁদের নেই, বর্তমান কাঠামোর আমূল

পরিবর্তন তো দূরের কথা। বেয়ার্ড রাস্টিনের ধারণা, জনসন যে বৃহৎ বণিক-গোষ্ঠীকে তোষণ করছেন, সেটা সাময়িক রাজনৈতিক কারণে, আসলে ডেমক্র্যাটিক পার্টিতে বৃহৎ বণিকগোষ্ঠীর স্থান নেই। এই ধারণা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চনা। কোয়ালিশনের সাহায্যে নিগ্রোমুক্তি অসম্ভব। নিগ্রোমুক্তি সম্ভব দেশময় অহিংস আন্দোলন গড়ে তুলে এবং সর্বপ্রকারে বর্তমান শাসনযন্ত্রকে অচল করে দিয়ে। হিংস আন্দোলন রাষ্ট্রশক্তি হিংসা দিয়ে স্তব্ধ করে দেবে এবং আমেরিকার শাসন-যন্ত্র তুচ্ছ নয়।

কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণ জাতীয়তা আন্দোলনের যাঁরা মুখপাত্র সেই স্টোকলে কার-মাইকেল, র‍্যাপ ব্রাউন অবশ্য এ দুই দলের কাউকেই পাত্তা দিচ্ছে না। বাজে বুকনির সময় এ নয়, এখন দরকার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আরো বন্দুক, আরো গেরিলা ঘোদ্ধা। গত চার বছরের মার্কিন শহরে শহরে নিগ্রো ঘেটোগুলো ঘিরে যে সংগ্রাম বিশ্ববাসীর টনক নড়িয়েছেন, তার প্রকৃতি লক্ষ করলে সহজেই অনুমান করা যায় আজকের আন্দোলনের সঙ্গে ১৯৫৫ সালের মণ্টোগোমারির আন্দোলনের আকাশপাতাল ফারাক। সেদিন আলাবামার ওই শহরে মিসেস রোজা পার্ক বাসে আসন ছেড়ে সাদাকে বসতে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর সেই বিদ্রোহ, তথা তাঁর রাজনৈতিক দল দ্য ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভানসমেণ্ট অব কালারড পিপলের বিদ্রোহ, তখনকার দিনে উগ্রপন্থী মনে হয়েছিল। সেদিন মণ্টোগোমারির ১৭০০০ নিগ্রো বাসে চড়তে অস্বীকার করে বাসের ব্যবসাকেই লাটে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অসহযোগিতা লক্ষে পৌছানর প্রথম দিকের ধাপমাত্র। আসল লক্ষে পৌছাতে হলে সরাসরি যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। মার্টিন লুথার কিং অসহযোগ আন্দোলন করে মণ্টো-গোমারিকে বিখ্যাত করেছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের নতুন পর্যায়ে সেই স্ট্র্যাটেজির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। ফলে একদা অহিংস কংগ্রেস অব রেশিয়াল ইকুয়ালিটির তরুণ সভ্যেরাও আজ হিংসার পথে নেমেছেন। এসএনসিসি এবং এসডিএসদের তো বটেই। এঁদের চালনা করছে ব্ল্যাক মুসলিম আন্দোলনের নতুন জাতীয়তাবাদ, এলিজা মহম্মদ, ম্যালকম এক্সের স্মৃতি।

আমেরিকার অভ্যন্তরেই যে আর একটি কৃষ্ণকায় দেশ গড়ে উঠতে পারে, তা নিতান্ত ছেলেখেলার কথা নয়। বড়ো বড়ো শহরে নিগ্রো ঘেটোগুলোর চেহারা দেখলে তা অনুমান করা সহজ। দক্ষিণের বিস্তীর্ণ কৃষিভূমি ছেড়ে নিগ্রোরা সংঘবদ্ধভাবে শহর দখল করছেন। ১৯৫০ সালে শিকাগো শহরে নিগ্রো জনসংখ্যা

ছিল ৪,৯১,০০০। ১৯৬০ সালে ৮,১৩,০০০ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিকাগো শহরের শ্বেতকায়দের সংখ্যা এই দশ বছরে আনুপাতিকভাবে তো নয়ই, একেবারেই বাড়ে নি, উল্টে কমেছে ৪০,০০০। অর্থাৎ এইভাবে কৃষ্ণ আগমন এবং শ্বেত নির্গমন চললে ১৯৮০ সালে শিকাগো পুরোপুরি কৃষ্ণ শহরে পরিণত হবে। ঠিক এইভাবেই হবে ফিলাডেলফিয়া, কলম্বাস, ডেটন, ক্যামডেন। তার বহু আগেই ১৯৭০ সালে কৃষ্ণ শহরে রূপ নেবে ডেট্রয়েট, বাল্টিমোর, সেণ্ট লুইস, নিউইয়ার্ক এবং ক্লীভল্যাণ্ড। অবশ্য এসব হিসেবই অ্যামেরিকান সেন্সাস ব্যুরোর ১৯৬০ সালের হিসেব, যে হিসেবে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে নিগ্রোদের সংখ্যা শতকরা দশ কম দেখান হয়েছে।

বর্তমান নিগ্রো আন্দোলনের নেতারা মনে করছেন, নিগ্রোদের সঙ্গে আমেরিকার শাসকগোষ্ঠীর কোন আত্মিক যোগ নেই। নিগ্রোদের হাত মেলাতে হবে 'তৃতীয় জগৎ' আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার অগণিত ক্ষুধার্ত অশ্বেতকায় অধিবাসীদের সঙ্গে। মার্টিন লুথার কিঙের হত্যার রাত্রে মিসিসিপির জ্যাকসন শহরে বসে কিঙের সহচর চার্লস এ্যাভারস্ যে সারারাত টেলিফোনে অট্টহাস্য শোনেন, সেই অট্টহাস্য শুধু কু ক্লুক্স ক্লান বা ডিক্সিক্র্যাটদের উন্মাদ শ্বেতকায় অট্টহাস্য নয়, সেই অট্টহাস্য আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো তাবৎ উদারনেতা মার্কিনীদের বংশধরদেরই।

ম্যালকম এক্সের কৃষ্ণ জাতীয়তাবাদের মধ্যে, তাঁর অগ্নিস্রাবী সহচর লিরয় জোন্সের মতবাদের মধ্যে, বিপথগামিতার চিহ্ন অনেকেই লক্ষ করেছেন। তাঁদের মধ্যে যে ক্ষোভ, ক্রোধ, ফুটে উঠেছে, তা হয়তো এই আন্দোলনে তাৎক্ষণিক গতি সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত কর্মসূচি না থাকলে তা হয়তো অন্ধ-গলিতে হারিয়ে যাবে। লিরয় জোন্স আন্তর্জাতিক বর্ণযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তিনি শ্বেত উদারনৈতিকদের আমলই দেন নি। নাগরিক অধিকার আন্দোলনের শরিক হয়ে যে সব শ্বেতাঙ্গরা মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের জন্য লিরয় জোন্সের দরদ কণামাত্র নেই। তাঁর ভাষায় 'Those boys were just artifacts. articrafts, man. They weren't real. If they want to assuage their leaking consciences, that's their business. I won't mourn for them. I have my own dead to mourn for.'

এই ক্রোধবহ্নি নিগ্রো আন্দোলনকে তীব্র করে তুলেছে, কিন্তু তার সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে, বর্ণবিদ্বেষ ঠিক পথে চালিত না হলে হয়তো বিশ্বব্যাপী

নিপীড়িত জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে এর সংযুক্তি ঘটবে না। আমেরিকার বর্তমান নাটকে খলচরিত্রের অভিনয় করছেন যাঁরা তাঁদের গায়ের রঙ সাদা হলেও তাঁদের মূল শক্তির আধার হল তাঁদের সম্পত্তি এবং সম্পত্তির ঔদ্ধত্য। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষী নিগ্রোরা যদি রাষ্ট্রশক্তির এই রূপ চিনে উঠে তৃতীয় জগতের সংগ্রামী-দের সঙ্গে হাত মেলান, তবেই এর সার্থক পরিণতি ঘটবে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে রাশিয়ার বিপ্লবীরা তাঁদের দেশের সমস্ত মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে ধ্বংসের পথে নেমেছিলেন। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল নতুন সমাজ। আমেরিকার বর্তমান ঘেটো আন্দোলনের মধ্যে সেই ধ্বংস-উন্মাদনা প্রকট। হয়তো আমেরিকায় এ থেকেই জন্ম নেবে আগামী দিনের নতুন সমাজ।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা কমলালয়

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ

পুনর্মুদ্রণ

এক্ষণ ষষ্ঠ বর্ষ - প্রথম সংখ্যা বিশেষ ক্রোড়পত্র

['কলিকাতা কমলালয়' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এর লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) ছিলেন সেকালের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতৃস্থানীয়। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল না বলে হয়তো আজ তিনি অনেকখানি বিস্মৃত। কিন্তু একসময়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনীষায় তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষও শ্রদ্ধাশীল ছিল। প্রথমে 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও পরে 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২)—এই দুখানি সংবাদপত্র তিনি প্রকাশ করেছিলেন। সাংবাদিক ও সুলেখকরূপে তাঁর খ্যাতি সে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধানত ব্যঙ্গরচনাকার হিসাবেই তাঁর স্থান হয়েছে। এর মূলে 'সমাচারদর্পণ' পত্রে বেনামায় প্রকাশিত তাঁর 'বাবু' বিষয়ক রচনাগুলি ও তাঁর বিখ্যাত নববাবুবিলাস, দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস গ্রন্থগুলি। এ ছাড়াও ভবানীচরণের রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত গ্রন্থাবলিতে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান ও ঐতিহ্যচেতনার পরিচয় যথেষ্ট আছে। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা ও ঊনবিংশ সংহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কৃতিত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচনায়, তথা সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে। তৎকালীন কলকাতাকেন্দ্রিক নব্য-নাগরিক জীবনের নানা অসংগতি, বিশেষত 'বাবু'-সমাজের কেচ্ছাই ভবানীচরণের লেখায় সজীব হয়ে উঠেছে। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের পটভূমি এ সব রচনায় প্রস্তুত হতে পেরেছিল সে কথাও উল্লেখযোগ্য। এমন কি বিষয়বস্তু ও রচনারীতিতে তিনি টেকচাঁদ ও হুতোমের পূর্বসূরি, তাতে সন্দেহ নেই। অন্তপক্ষে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যরীতি গঠনের সেটা ছিল আদিপর্ব। এদিকেও ভবানীচরণের কৃতিত্ব অন্যান্য দিক্‌পালের অবদানে অনেকখানি আড়াল পড়ে গেছে। অথচ তিনি অনেকের পূর্বেই বাংলা গদ্যে একটি নিজস্ব রীতির সন্ধান করছিলেন। গদ্যভাষা সম্পর্কে তাঁর সেই মনোযোগের প্রয়াস কলিকাতা কমলালয়-এ পাওয়া যাবে। প্রশ্নোত্তর-ছলে কলকাতার রীতি বর্ণনাই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু, সে কথা ভূমিকায় বলা হয়েছে। এতে কলকাতার সমাজের হালচাল ও ক্ষেত্রবিশেষে কথ্য শব্দাদির রূপ প্রায় একটা প্রামাণিক দলিলের মতো গচ্ছিত আছে।

বর্তমান পুনর্মুদ্রণকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পাদক, এ ক ণ।]

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥—

অথ নির্ঘণ্ট :

—•—

কলিকাতা কমলালয় ভূমিকা

কলিকাতা কমলালয়

কলিকাতা কমলালয় প্রথম তরঙ্গে এই মহানগরের
বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার বাসনায় কোন বিদেশির
জিজ্ঞাসার উপক্রম

জিজ্ঞাসার উপক্রমে দোষ বিবেচনার উল্লেখ

বিদেশির দোষ জিজ্ঞাসা

নগরবাসির দোষোল্লেখ

বিদেশির প্রত্যুত্তর

আচারভ্রষ্ট বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন

নগরবাসির উত্তর

বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা

মধ্যবিত ভদ্রলোকের ধারা

অসাধারণ ভাগ্যবান্ লোকের ধারা

বিষ্ণুপরায়ণ বিষয়ে ত্রিপদি

কর্ম্মকাণ্ড সন্ধ্যাবন্দনাদি বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন

নগরবাসির উত্তর

শাস্ত্রাধ্যয়নাদি ত্যাগ বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন

নগরবাসির উত্তর

ভদ্রলোকের স্বজাতীয় ভাষায় অন্যজাতীয় ভাষা
মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করেন, এতদ্বিষয়ে
বিদেশির প্রশ্ন

ভাষাকথা যাবনিক ভাষা ও সাধুভাষার বিবরণ

নগরবাসির উত্তর

যাহার বাঙ্গালা নাই এমন ভাষার বিবরণ

ভদ্রলোক আপনার প্রশংসা শ্রবণ করেন,
এতৎ বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
দলাদল বিষয়ে বিদেশির একাদশ প্রশ্ন
নগরবাসির একাদশ উত্তর
শূদ্র দলপতি বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
ব্রাহ্মণ দলপতি বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
দলাদলিতে অধ্যাপকদিগের লাভ ক্ষতি,
এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
দলপতিরা আপন দলপুষ্টির কারণ কর্জ্জ দিয়া থাকেন,
এতদ্বিষয়ক বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
বিদ্যা বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
কেতাব ক্রয় করিয়া কেন সাজাইয়া রাখেন
এতৎ বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
পুস্তকের সবিস্কৃপসন্ না করণ বিষয়ে
বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
কলিকাতায় এবং ইতস্ততো গ্রামে পাঠশালা
বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
বাঙ্গালি বালকদিগের প্রতি সাহেব লোকেরদিগের
বিদ্যা বিষয়ে মনোযোগ করণের
কারণ জিজ্ঞাসা
নগরবাসির উত্তর

কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের কি হেতু
পাঠশালায় মনোযোগ নাই এতদ্বিষয়ে
বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
কলিকাতাবাসি কয়েক জন ব্যতিরেকে আর কাহারো
বিদ্যা বিষয়ে মনোযোগ নাই ইহার কারণ কি,
এতদ্বিষয়ে বিদেশির জিজ্ঞাসা
নগরবাসির উত্তর
বিদ্যা বিষয়ে নগরবাসির উত্তর শ্রবণে বিদেশির সন্দেহ
নগরবাসির উত্তর
গীত বাদ্যাদি বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট অনেক লোক যাতায়াত
বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট অনেক লোক যাতায়াত
বিষয়ের উত্তর শ্রবণে বিদেশির অধিক সন্দেহ
নগরবাসির উত্তর
ভাগ্যবান্ লোক কন্যা ভগিনীর বিবাহের ভারগ্রস্ত
ব্যক্তিদিগ্যে নিয়ত যাতায়াত করান
এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
বাবুর মোসাহেবদিগের কি প্রকারে দিন নির্ব্বাহ হয়
এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর
বাবুর নিকটে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুনেন
এতদ্বিষয়ে বিদেশির প্রশ্ন
নগরবাসির উত্তর

শ্রীশ্রীহরিঃ ॥

কলিকাতা কমলালয়

ভূমিকা

—•—

পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত শঙ্কাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যস্থায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার এ কথায় প্রয়োজন নাঞি এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন, অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় হইতে বৃত্তান্তরূপ অনেক রত্নলাভ হইতে পারিবেক ইহাতে এক সন্দেহ আছে যে দোষদর্শী মূর্খরূপ কুম্ভীর ও নিন্দকরূপী সর্প ইহারা এ কমলালয় হইতে রত্নলাভের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাবদ্বারা অনেক বস্তু পাইবেক অর্থাৎ এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণে বা পাঠে অনেক বাধা জন্মাইবেক তাহাতে বুঝি বিজ্ঞেরা এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণ না করেন কিন্তু এই স্থির করিয়াছি যে বিজ্ঞেরদিগের বিজ্ঞতারূপ ঔষধিদ্বারা তাহারা ভর্ৎসিত ও তাড়িত হইয়া অবশ্যই নিবারিত হইবেক অতএব কলিকাতা কমলালয় সমাদৃত হইয়া সভেরদিগের সর্ব্বদা বৃত্তান্ত ও বাক্‌কৌশলাদি রূপ রত্ন প্রদান করিবেন।

এই গ্রন্থে চারি তরঙ্গ হইবেক আমার প্রার্থনা যদি গ্রন্থমধ্যে বর্ণভ্রম ও আসক্তিদোষ থাকে তবে সাধু মহাশয়রা স্বীয় সাধুস্বভাবপ্রযুক্ত তাহা গ্রহণ না করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে আমার শ্রমসার্থক্য হইবেক গ্রন্থমধ্যে বিদেশির প্রশ্ন ও নগরবাসির উত্তরদ্বারা নানাবিধ বিষয়বৃত্তান্ত প্রকাশ হইবেক বিদেশির সঙ্কেত বি, নগরবাসির সঙ্কেত ন, প্রশ্নের সঙ্কেত প্র, উত্তরের সঙ্কেত উ, এই সঙ্কেতদ্বারা বিদেশির প্রশ্ন ও নগরবাসির উত্তর বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিবেন ইতি ॥০॥০॥

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং

—•—

॥ কলিকাতা কমলালয় ॥

কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।

অথ সাগরের বিবরণ

সাগরে অপেয় অগাধ জল, বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশ যাইতেছে ও নানা নদীর সমাগম সাগরে হইতেছে এবং সাগর নানাবিধ রত্নের আকর হইয়াছেন ও দেবাসুর সংগ্রামে সাগর মন্থন হইয়াছিল তাহাতে হালাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল এবং সাগর অনুপম ও সর্ব্ব দেশ খ্যাত হইয়াছেন সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস করিতেছে ভগবান্ নারায়ণ সাগরবাসী হইয়াছেন ও তথায় লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন সাগরে সর্ব্বদা তরঙ্গ ও কল্লোল হইতেছে ইত্যাদি।

কলিকাতার বিবরণ

কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানাদিগদেশগামি হইতেছে নানাবিধা মুদ্রানদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে বিবিধ বিদ্যা ও বিদ্বানরূপ বহু রত্ন আছে ইংরাজ নবাব সংগ্রাম কালে কলিকাতা মন্থন হইয়াছিল তাহাতে বিষাদরূপ হালাহল ও হর্ষরূপ অমৃত উঠাইয়াছিল কলিকাতা নিরুপমা ও সর্ব্ব দেশ খ্যাতা হইয়াছে পরনিন্দা-পরায়ণ অনেক জন হাঁগর কলিকাতা বাস করিতেছে ও মূর্খরূপ ভয়ানক কুম্ভীর অনেক ব্যাড়াইতেছে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন তদ্দর্শনে ভগবান্ নারায়ণও বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন সর্ব্বদা তুরঙ্গাদি বাহন ও ধনমত্ততাদি তরঙ্গ হইতেছে এবং ঐ তরঙ্গে কোলাহলেরো বাহুল্য হইয়াছে ইত্যাদি অতএব উভয়ের ধর্ম্ম সাম্যে সমান সংজ্ঞা হইল ইতি।

কলিকাতা কমলালয়

প্রথম তরঙ্গ

কোন বিদেশী এই মহানগর কলিকাতায় আসিয়া এতন্নগরস্থ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এতন্নগরের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়ার বাসনায় প্রশ্ন করিতেছেন, মহাশয় আমি কলিকাতার রীতিজ্ঞ নহি, আপনি তাবদ্বিষয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, যেসকল প্রশ্ন করি কৃপাপূর্ব্বক সদুত্তর প্রদান দ্বারা আমার অজ্ঞতা অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে কলঙ্ক ভঞ্জন করিলে অন্যদ্বারে মহাশয়কে সাধু২ পরম সাধু ও ধন্যবাদ করত চিরকাল উপকৃত হইয়া থাকিব।

এতৎ শ্রবণানন্তর নগরবাসী মহাশয় উত্তর করিতেছেন, যে শুন ভাই তোমাকে কলিকাতার রীতি ব্যবহার অবগত করাইতে পারি কিন্তু ইহাতে কয়েক দোষ বিবেচনা করিতেছি।

বিদেশী কহিতেছেন মহাশয় কি২ দোষ আজ্ঞা করুন।

ন, উ, প্রথমত এই যে পল্লিগ্রাম নিবাসি লোকেরা এই কলিকাতায় আসিয়া কোন এক সোপাধি সংগ্রহ করিয়া কাহার বাটীতে কিম্বা বাসাতে বাস করেন পরে নানা প্রকার লোকের সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বত্র গমনাগমন করেন ইহাতে কোন স্থানে ইংরাজী কোন স্থানে পারসী কোন স্থানে হিন্দি ইত্যাদি নানা বিদ্যার আলোচনা দেখিয়া অতিশয় পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক ভাগ্যবান্ লোকেরদিগের উপাসনা করিয়া বিনাব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং এখানকার আহার ব্যবহার বাক্য বিষয়ে নিপুণ হইয়া অনেকের নিকট মান্যও হয়েন অপর কোন২ লোকের নিকট নিরন্তর যাতায়াত দ্বারা উপাসনা করিয়া কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া কিঞ্চিদ্ধন সঞ্চয় হইলেই এখানকার লোকের বাক্য ব্যবহার রীতি প্রভৃতির উপর দোষোল্লাস করিয়া হেয় জ্ঞান করেন, দ্বিতীয়, এখানকার লোকেরা যে কর্ম্ম স্বীকার না করেন পল্লিগ্রাম নিবাসিরা তাহা অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন মনে করেন যে আমার এখানে জ্ঞাতি কুটুম্ব কেহ নাই আমি নিন্দিত বা অনিন্দিত কর্ম্ম করিলে আমাকে কেহ কিছুই কহিবেক না।

তৃতীয়, যেসকল কর্ম্মে দুই শত টাকা বেতন লভ্য হয় সে কর্ম্ম তাঁহারা অত্যল্প বেতনে অঙ্গীকার করেন এবং দিবা আট ঘণ্টা অবধি রাত্রি ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মুনিবের নিকট কর্ম্ম করিয়া প্রতিপন্ন হয়েন ইহাতে এতন্নগরবাসি অনেক লোকের অনেক ক্ষতি বোধ হইতেছে কারণ তাঁহারা তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারেন না চতুর্থ, এতন্নগরবাসি ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে সরকার বা মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন বাটীর কেহ বহুশ্রমসাধ্য অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেও তাহা স্বীকার করিয়া তৎক্ষণে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন দ্বারা তাঁহাকে সন্তোষ করিয়া থাকেন

ইহাতে সকলের প্রিয় ও বিশ্বস্তপাত্র হয়েন পরে সে বাটীর কর্ত্তা পরলোক প্রাপ্ত হইলে সন্তানেরদিগ্যে নানা প্রকার মনোনীত উপদেশ দিয়া বিবাদ উপস্থিত করান এবং তৎকালে নাবালক কিম্বা বিধবা স্ত্রীলোক ধনাধিকারী থাকিলে তৎপক্ষেই পক্ষপাত করেন পরে আদালতে প্রবর্ত্ত করাইয়া সে সংসার ছারপার করিয়া আপনিই ধনাঢ্য হয়েন।

পঞ্চম, যদি অধিকতর ধনাঢ্য হয়েন তবে এ স্থানে বাসাবাটী করিয়া পরিবার সহিত বাস করেন কিন্তু বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ড উপস্থিত হইলে পৈতৃকস্থলে গমন করেন তাহাতে প্রতিবাসী বা আত্মীয় লোক জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি এ স্থানে নিরন্তর পরিবার লইয়া বসতি করেন এবং ভাগ্যবান্‌ও হইয়াছেন কিন্তু এখানে কোন ক্রিয়াকলাপ করেন না ইহার কারণ কি, তাহাতে উত্তর করিয়া থাকেন যে আমারদিগের নিয়ম আছে পৈতৃক স্থানে কর্ম্ম করিতে হয় আর সেখানে জমিদারি প্রভৃতি অনেক বিষয় আছে সেই জমিদারির উপস্বত্ব হইতেই তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এই রীতিক্রমে পিতামহঠাকুর বহুকাল কর্ম্ম করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন তাহা আমরা এক্ষণে কি প্রকারে অন্যথা করিব আর কলিকাতায় কোন কর্ম্মও হইতে পারে না দেখ এ স্থানে যে সকল লোক দুর্গোৎসব করেন তাহাকে ঝাড় উৎসব, বাতি উৎসব, কবি উৎসব, বাই উৎসব, কিম্বা স্ত্রীর গহনা উৎসব, ও বস্ত্রোৎসব বলিলেও বলা যায় ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

অতএব ভাই তোমারদিগ্যে রীতিজ্ঞ করিলে আমারদিগ্যের শ্রেয় নাই যদি বল আমি এখানে বাস করিয়া ক্রমে কাল বিলম্বে রীতিজ্ঞ হইব তাহাও আমার ভাল বোধ হয় না কেন না যদি আশু এখানকার রীতিজ্ঞ না হইতে পার তবে এখানে বাস করাই ভার হইবেক যেহেতুক এ স্থানের রীতির অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবা।

বি, উ, মহাশয় যেসকল কথা কহিলেন ইহা যথার্থ হইতে পারে কিন্তু তাবৎ লোকেরি কি এতাদৃশ স্বভাব এমত নহে, আরো বলি নগরবাসি লোকের মধ্যে যাঁহারা এরূপ দায়গ্রস্ত হইয়াছেন বুঝি তাঁহারা হিতোপদেশাদি গ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিবেন কিম্বা তাহার দুই চারি শ্লোকও তাঁহারদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবে তাহা হইলে অবশ্যই ঐ গ্রন্থের শ্লোকার্থ স্মরণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক চলিতেন, শ্লোকো যথা, সর্ব্বস্য হি পরীক্ষন্তে স্বভাবা নেতরে গুণাঃ। অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে॥ অর্থাৎ আদৌ সকলেরি স্বভাব বিবেচনা করিবেক অন্য গুণ বিবেচনা করিবেক না যেহেতু সকল গুণকে অতিক্রম করিয়া স্বভাব মস্তকাশ্রিত হইয়াছে অতএব নিবেদন আপনি যেসকল ধারাবাহিক দোষ কহিলেন তাহাতে কেবল নগরবাসি লোকেরদিগের অজ্ঞতা প্রকাশ হইতেছে, অপর স্থানের গুণে লোকের স্বভাব ভাল হয় এমত নহে, সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা

উত্তমাধমমধ্যমাঃ। অর্থাৎ উত্তম অধম মধ্যম এই ত্রিবিধ প্রকার লোক সর্ব্বত্রই আছে মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দেখুন এই সহর মধ্যে কত প্রকার পাইবেন বরঞ্চ পল্লিগ্রাম ভাল সেস্থানে লোকের প্রায় একই স্বভাব, এ সহরে নানা দেশীয় নানা লোক বাস করিতেছে তাহার মধ্যে পাপিষ্ঠ নরাধম ধর্ম্মিষ্ঠ শিষ্ট শান্ত অজ্ঞ বিজ্ঞ বিবিধ প্রকার লোক আছে আপনি তাহা অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন অতএব অন্যান্য নগরবাসী বা পল্লিগ্রাম নিবাসী তাবৎ লোক কি প্রকারে দোষী হইতে পারে।

অনন্তর নগরবাসী কহিতেছেন শুন ভাই বিবেচনায় বুঝিলাম তুমি লোক ভাল রীতি উপদেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র বট বিজ্ঞেরদিগের এই রীতি যে পাত্র বিবেচনা না করিয়া বিজ্ঞ লোক দ্রব্যাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবেক না অতএব যেমন দ্রব্য তেমন পাত্র না হইলে অর্পিত দ্রব্যাদির হানি হয় দেখ এই বিবেচনায় লোক তৈল প্রভৃতি জলীয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে বা কাঁচপাত্রে স্থাপিত করে লৌহপাত্র ব্যতিরেকে অন্য পাত্রে পারা প্রভৃতি দ্রব্যাদি স্থাপন করে না অতএব তুমি সুপাত্র তোমার প্রশ্নের উত্তর দ্বারা অবশ্যই যথার্থোপদেশ করিব ।।।।।

বি, প্র, শুনিতে পাই কলিকাতার অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন ইঁহারা অতি প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করেন তাবৎ দিবস সেই স্থানেই কাল যাপন হয় কেহ রাত্রি দুই দণ্ড বা চারি দণ্ড কেহবা এক প্রহর সময়ে গৃহে আসিয়া পুনর্ব্বার আহারাদি করিয়া শয়ন করেন মাত্র।

ন, উ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে কিন্তু এতাদৃশী রীতি হিন্দু মাত্রের প্রায় নাই তবে যদি কাহার থাকে সে কেবল হিন্দুবেশধারী হইবেক তাহার বিশেষ আমি বলিতে সমর্থ নহি কিন্তু ভদ্রলোকেরদিগের যে ধারা জ্ঞাত আছি তাহা শুন।

বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা

যাঁহারা প্রধান২ কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকেন নানা প্রকার তৈল যাঁহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানক্রিয়া সমাপনানন্তর পূজাহোমদান বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাযোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুযায়ি কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া সেসকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপাদাদি প্রক্ষালনানন্তর গঙ্গোদকস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে কেহ কোন

কর্ম্মোপলক্ষে কেহবা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন তাঁহাদিগের প্রায় ঐ রীতি কেবল দান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।

দরিদ্র অথচ ভদ্র লোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার ও দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহরি কেহ মেট কেহবা বাজারসরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয়২ করিতে হয় না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা।

এই সকল কর্ম্মকারি বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা কহিলাম এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান্ লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্বে আপন বিষয়ে দৃষ্টি করেন কেহবা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন।

ত্রিপদী॥

হয়ে বিষ্ণুপরায়ণ, সবে করি একমন, পুরাণ শ্রবণে করেন স্থিরতর মতি। ভারতাদি ইতিহাস, শ্রবণেতে অভিলাষ, সদাঅনুরক্ত তাহে একান্ত ভকতি॥ পণ্ডিতমণ্ডলী করি, সকলেতে হরি২, এই বাণী বলিতে২ অশ্রুপাত। ধীর কিবা মূঢ়মতি, ভারত শ্রবণে অতি, শ্রদ্ধযুত হইয়া করে নিতি যাতায়াত॥ এইরূপ শত২, স্থানেতে কহিব কত, হইতেছে পুরাণাদি পাঠ নিরন্তর। পাঠাপাঠ বিবেচনা, করি অর্থ আলোচনা, সদস্য হইয়া বসি বিজ্ঞ বহুতর॥ নৃসিংহ বরাহ কূর্ম্ম, আদি পুরাণের মর্ম্ম, বেত্তাসকল বসিয়াছেন হইয়া পাঠক। পাঠকের যদি ভ্রম, হয় তবে উপশম, কারণ পুস্তক লয়ে আছেন ধারক॥ শ্রোতাগণে একমনে, বসিয়া পুরাণ শুনে, সম্মুখে বসিয়া আছেন প্রভু জনার্দ্দন। শালগ্রাম শিলাবেশে, সকলে করুণা রসে, ভাসিতেছেন হইতেছে দুই অশ্রুপতন, ইত্যাদি॥

বি, প্র, আপনি যেসকল ভদ্রলোকের কথা কহিলেন ইহাতে আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতু পূর্ব্বে শ্রুত ছিলাম যে কলিকাতার অধিক লোক কর্ম্মকাণ্ড ও সন্ধ্যা বন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আহার ও পরিচ্ছদেরও বিবেচনা নাই যাহাতে সুখানুভব হয় তাহাই করেন।

ন, উ, আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত এমত কথাও কর্ণকুহরে প্রবেশ হইতে দেও যেহেতু এ দেশের কেবল কর্ম্মকাণ্ডেরি বাহুল্য এবং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য

মহাশয়রা জাজ্বল্যমান বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের ব্যবস্থানুসারে ভাগ্যবান্ লোকেরা সর্ব্বদাই দেব প্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দোল দুর্গোৎসব রথ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতেছেন বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ধনী লোকসকল স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধুবান্ধব পুরোহিত অধ্যাপকাদি নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য্য সভা শোভা করেন।

ঐ সভামধ্যে কেহ সোনার কেহ রূপার দুই চারি দানসাগর করিয়া থাকেন তাহাতে অপূর্ব্ব২ পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগি দ্রব্য সকল উৎসর্গ করিয়া পাত্রবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক দানাদি করেন আর অধ্যাপক বিদায়ের যেরূপ ধারা এমত কেহ শুনেন নাই, নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বিদায় ১০০।৮০। ঘড়া গাড়ু, স্মার্ত্ত পণ্ডিত বিদায় ৫০।৩০। গাড়ু থাল বাটা ইত্যাদি।

আর শ্রাদ্ধ দিবসে বা রাত্রে কাঙ্গালিবিদায়, প্রত্যেক কাঙ্গালি ২, কেহ ১, ॥০ ।০ ৵০ /০ কিন্তু যতলোক আইসে সকলকেই দিয়া থাকেন আপন বিভব বুঝিয়া দানের নিয়ম করিয়া দেন তোমাকে আর আমি কত কহিব।

বি, প্র, ভাল যদি এমন ধারা তবে কলিকাতার এমত অখ্যাতি কেন হইল যে আপনারদিগের শাস্ত্রের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল পারসী ও ইংরাজী পড়েন বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র হেয় জ্ঞান করিয়া শিক্ষা করেন না আর শ্রাদ্ধশান্তির বিষয়, যখন পিতা মাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে কুৎসিত কর্ম্ম বোধ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা দাহ করিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন সেই সময় এক অঞ্জলি জল অধিক করিয়া প্রদান করেন অর্থাৎ এক কালেই জলাঞ্জলি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি উদ্‌যাপন করিয়া আইসেন এবং অশৌচের চিহ্নার্থে কেবল চুল ধারণমাত্র করেন কেহবা কেবল মস্তকের কেশ রাখিয়া কুটী যাইবার অনুরোধে দাড়ির ক্ষৌর করান, আর অত্যন্ত অপূর্ব্ব শিষ্ট শান্ত মহাশয়রা অশৌচ সময়ে শুদ্ধাচারার্থে কেবল ব্রাণ্ডি মাত্র পান করেন অন্য সময়ে আহার বাজারের পাককরা মাংস মিঠাই ও মুছলমানকৃত পাওরুটী এবং নানা প্রকার সরাপ ইত্যাদি দ্রব্য সকল ভোজন করেন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক ধুতি প্রভৃতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইজার জামাজোড়া ইত্যাদি পরেন কালাচর্ম্মের পাদুকা ফিতেবান্ধা গোড়তোলা মাথানেড়া বোঁচা সকল পায়ে দেন আর কোন বিদেশী উদাসীন লোক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাটীর অন্তঃপুরে পাক করেন কাহার বাটীতে একজন কাহার বাটীতে দুইজন স্ত্রীলোকমাত্র থাকেন অন্য পুরুষ কেহ থাকেন না নিরুদ্বেগে সেই সকল ব্রাহ্মণেরদিগ্যের বাটীর ভিতরে যাইতে দেন তাহারা অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া দিলে সকলে ভোজন করেন এই সকল ধারা কাহারদিগের, তাহা শুনিতে বাঞ্ছা করি।

ন, উ, আপনি যাহা কহিলেন এ তাবৎ সত্য বটে কিন্তু ভদ্রলোকের এমত ব্যবহার নহে ভাই তোমাকে সকলি কহিতে হয় ইহার মধ্যে কোন২ ভদ্রলোকের

সন্তানেরা তোমার উক্ত পাদুকা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কোন মজ্‌লিশ অথবা দরবার যাইবার নিমিত্ত হিন্দুস্থানি পোষাকও ব্যবহার করেন তাহাতে ফলের হানি নাই কেবল কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগৌরব মাত্র আর শাস্ত্র অধ্যয়ন বিষয় যাহা কহিলে তাহার উত্তর করিতে পারিলাম না তুমি আগে কিছু কাল বাস কর তবে ক্রমে সকলি দেখিতে পাইবা কেহ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না তুমি ইহাই শুনিয়াছ কিন্তু সে ভ্রান্তিমাত্র দেখ অমুক২ বাবু কতপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতানুযায়ি বাঙ্গালা ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও পার্সি বিদ্যা শিক্ষা করেন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যথা অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ। বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্‌জীবলোকেষু সুখানি রাজন্‌ ॥

অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধি বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাঁহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না ॥৩॥

বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং অভ্যাসে হেয়জ্ঞান করেন ও তর্পণের সহিত শ্রাদ্ধের বিসর্জ্জন ইহার উত্তর হইবেক এবং অশৌচের চিহ্নার্থে কেবল চুলধারণ, কাহারবা কেবল মস্তকে কেশধারণ, পাচক ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত মাংসাদি আহার ইত্যাদির উত্তর ক্রমে করিব এ তরঙ্গে কেবল ভদ্রলোকের ধারা বিবরণ হইতেছে যদি ভদ্রলোকের ব্যবহারে তোমার কোন সন্দেহ থাকে তাহার প্রশ্ন কর উত্তর করিব।

বি, প্র, ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ্জ, কযাকষি, কাজিয়া, ইত্যাদি ককার অবধি ষকার পর্য্যন্ত, ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না। যথা।

যাবনিক ভাষা	সাধুভাষা
কমিনে	অন্ত্যজ, ক্ষুদ্র, সামান্য, নীচ
কল	যন্ত্র
কলম	লেখনী
কসম	শপথ, দিব্য
কসাই	গোঘ্ন
কসুর	অপরাধ, ত্রুটি
কড়া	শক্ত, কঠিন

কম		অল্প, ন্যূন
কবুল		স্বীকার, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুত
কসবি		বেশ্যা, গণিকা, বারাঙ্গনা, কুলটা
কামড়ায়		দংশন, দন্তাঘাত
কাজিয়া		কলহ, বিবাদ, বিসম্বাদ, বিরোধ
কামাল		বলবৎ, অসাধারণ
কায়দা		রীতি, ধারা
কাঁচা		অপক্ক, আম
কেল্লা		ব্যূহ, দুর্গ
কেতাব		পুস্তক, গ্রন্থ
কিনারা		উপান্ত, তীর
কিস্মত		মূল্য
খয়রাৎ		বিতরণ, দান
খরচ		ব্যয়
খাটী		নিশ্চয়, অকৃত্রিম
খাড়া		দণ্ডায়মান
খাড়া২		শীঘ্র, দ্রুত, ত্রস্ত
খারাব		মন্দ, কদর্য্য, কুৎসিত, নিন্দিত
খালাস		মুক্ত, মোচন, উদ্ধার
খামকা		হঠাৎ, অকস্মাৎ, দৈবাৎ
খাসা	১	উত্তম, ভদ্র, পরিপাটী
খাজনা	১	কর, উপস্বত্ব, রাজস্ব
খুন	১	বিনাশ, হত্যা, ঘাত
খুব	১	উত্তম, উৎকৃষ্ট, ভদ্র
খুসি	১	আনন্দ, আহ্লাদ, পরিতোষ, সন্তোষ
খোলাসা	১	পরিষ্কার
খোসামোদ	১	উপাসনা
খোস	১	উত্তম, হর্ষ
খোদ	১	স্বয়ং
গরম	১	উত্তপ্ত, উষ্ণ
গরমী	১	গ্রীষ্ম, নিদাঘ
গর্জী	১	স্বার্থী, স্বার্থপর
গরজ	১	আবশ্যক, প্রয়োজন
গওর	১	মনোযোগ, অভিনিবেশ, অবধান

গমি	শোক, সন্তাপ
ঘুম	নিদ্রা
ঘুস	উৎকোচ
জঙ্গল	বন, অরণ্য
জড়	মূল
জবর	বড়, সবল, বলবান
জবানী	প্রমুখাৎ
জবাব	উত্তর
জায়দাদ	সম্পত্তি, সর্ব্বস্ব, স্থাবরাদি
জাচাই	পরীক্ষা, বিবেচনা
জায়গা	স্থান
জান	প্রাণ
জেহেল	কারাগার, কারাগৃহ
জৌলসী	উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্য
ঝাঁক	সমূহ, বিস্তর
ঝুঁটা	মিথ্যা, অসত্য
টুক্‌রা	কিঞ্চিৎ
টেড়া	বাঁকা, বঙ্ক, বক্র
ঠগ	চৌর
ঠাগায়	চুরি করে
ঠাওর	বিবেচনা
ঠাট্টা	উপহাস, শ্লেষ
ঠাণ্ডা	স্নিগ্ধ, শীতল, হিম
ঠাঠ	কপট, কাপ
ঠিক	নিশ্চিত, নির্ধারিত, যথার্থ
ডর	ভয়, শঙ্কা, ত্রাস
ডাকাইত	দস্যু
ডালি	উপঢৌকন
ডৌল	প্রকার, ধারা, গঠন
ঢাকা	আচ্ছাদন, আবরণ
ঢিল	শ্লথ
ঢুকায়	প্রবেশ করায়
তরফ	স্বরূপ
তুফান	তরঙ্গ

তাগাদা	শীঘ্র, দ্রুত
তামাসা	কৌতুক, কাব্য, রহস্য
তাজ্জব	চমৎকার, বিস্ময়
তগির	কর্মচ্যুত
দর	মূল্য
দাঙ্গা	কলহ, দ্বন্দ্ব
দাবি	প্রাপ্য
দেক	বিরক্ত
দেরি	বিলম্ব, গৌণ
দেল	অন্তঃকরণ, মন
দখল	অধীন
দৌলত	সম্পত্তি
দাখিল	উপনীত
ধুম	তুমুল
ধোকা	সন্দেহ
নমুদ	অঙ্কুর, আরম্ভ, প্রথম
নেক	উত্তম
পসম	লোম, রোম
পাজি	অন্ত্যজ, সামান্য, ক্ষুদ্র
ফরসা	শুভ্র, পরিষ্কার
ফসাদ	মিথ্যা, কাল্পনিক
ফের	বেষ্টন
বহল	নিযুক্ত, স্থাপিত
বদল	বিনিময়, পরিবর্ত্ত
বরাত	প্রতিনিধি
বদ	মন্দ
বরামদ	অপবাদ
বাকি	অবশিষ্ট
বাগান	উদ্যান, উপবন
বেয়াজ	বৃদ্ধি
বক্ত	অদৃষ্ট, ভাগ্য
বদজাত	দুষ্ট, অসৎ
বনিয়াদ	মূল
ভাজ	মিশ্রিত

ভাগড়া		পলায়িত
ভিতর		মধ্য, মধ্যস্থল
ভোর		প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল
মঞ্জুর		স্বীকার
মস্করা		ভাঁড়, ভণ্ড
মরদ		পুরুষ
মজলিস্		সভা
মরজী		মনস্থ
মজাক		শ্লেষ
মতলব্		অভিপ্রায়, মনস্থ
মকরর	১	নিযুক্ত, প্রবর্ত্ত
মস্‌লৎ	১	পরামর্শ
মাফ	১	মার্জ্জনা, ক্ষমা
মাপা	১	পরিমাণ
মাফিক	১	মত, ধারা
মাফিক	১	প্রণয়, আত্মীয়তা
মোনাসব	১	রীতি
মুস্কিল	১	ক্লেশ, আপদ
মফস্‌সল	১	গোপন, অপ্রকাশ
মুদ্দই	১	বাদী, বিবাদি, প্রতিবাদী
রদ	১	অন্যথা, রহিত
রকম	১	প্রকার, মত
রফা	১	পরিষ্কার
রেয়াইত	১	মার্জ্জনা
রোসনাই	১	উজ্জ্বল
লড়াই	১	যুদ্ধ
লাল	১	রক্ত
সহর	১	নগর
সহজ	১	অবলীলা, অবহেলা, অনায়াস
সওয়ারী	১	যান
সহি	১	স্বাক্ষর
সমুজ	১	বিবেচনা
সাঁচা	১	সত্য
সাজা	১	দণ্ড

সাপ	১	পরিষ্কার
সিদা	১	সরল
সুম	১	কৃপণ
সগুণ	১	দিব্য, শপথ
সেওয়ায়	১	ব্যতিরেক
সুজী	১	নির্ঘণ্টন
সেপাহি	১	সৈন্য
সোর	১	চিৎকার
হঙ্গাম	১	কলহ
হট	১	ইতর
হক	১	সত্য, যথার্থ
হলপ	১	শপথ
হাওয়া	১	বায়ু, পবন
হামেসা	১	সর্ব্বদা
হাজির	১	উপস্থিত
হামাল	১	গর্ভ
হাজার	১	সহস্র
হুকুম	১	আজ্ঞা, অনুমতি
ক্ষতরা	১	ক্ষতি
আসল	১	প্রকৃত
আইন	১	রীতি, ধারা
আন্দেসা	১	সন্দেহ
আন্দাজ	১	অনুমান
আজব	১	আশ্চর্য্য
আমল	১	অধিকার
আপশোস	১	খেদ
আসমান	১	আকাশ
আচ্ছা	১	উত্তম, বিলক্ষণ, ভাল
আসান	১	শৈথিল্য
ইয়াদ	১	স্মরণ
ইৎফাক	১	প্রণয়, বিবেচনা
ইসাদী	১	সাক্ষী
উঠাও	১	উত্তোলন
এমারত	১	অট্টালিকা

এসারা ১ সঙ্কেত
ওজর ১ অপেক্ষা, প্রতিবন্ধকতা
ওমর ১ বয়ঃক্রম
ওসোয়াস ১ সন্দেহ
ওজন ১ তুলা

ইত্যাদি কত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহার গোটাকত শব্দ তোমাকে শুনাইলাম অতএব বুঝা যায় পণ্ডিতের সহিত সহবাসও নাই।

ন॰ উ॰

আপনি যে সকল শব্দ সংগ্রহ করিয়া কহিলেন তাহা ভদ্রলোকে ব্যবহার করিয়া থাকেন সেকথা সত্য বটে কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যেসকল শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় হয় না অথবা সেইমত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা তদনুযায়ি শব্দেও নাই তাহার কি কর্ত্তব্য যদি বল এমত কোন শব্দ নাই যে যাহা বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় নাই সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থে কএকটী শব্দ কহি শুন।

কাছারি	কোরক
কামান	খত
কুস্তি	খাজাঞ্চী
খাতা	খুম
খানসামা	খাঁক
খুস্‌কী	খের
খেলাৎ	খগম
গঞ্জ	জবানবন্দী
গলি	ঝামা
গুনাগার	ঝকমারি
গুদাম	টাঁকা
গুজরত	টালমটাল
গমস্থা	টাঙ্গান
চড়ন্দার	ঠিকা
চকট	ঠিকানা
চাঁদা	ঠিকদেওন
চালাক	তহবিলদার
চুকলী	তরজমা
চৌকীদার	থোকথাক
ছাড়	থাবা
ছাপা	থানা

ছানি
ছুটী
জমীদার
জমাদার
জামিন
জেলা
দাখিলা
দেওড়
ধমক
ধরাট
ধাক্কা
নামঞ্জুর
নালিস
নিলাম
নগদ
নকসা
নকল
নাজির
ফাঁকা
ফতুয়া
ফতো
ফাঁদ
ফেরাফেরি
ফেতরাজি
ফরাগদ
ফাঁসি
ফুট
বাহাদর
বেগার
বেচারা
আদালত
উকিল
এত্তেহার
হাল্লা
খান
দোকর
দোকান
দলিল
দফরা
দাওয়া
বাজি
বাজার
বাজে
ভাও
ভাড়াট্যা
মজুর
মুল্কত
যড়াও
রওনা
রহ
রসদ
লাগাও
সওদা
সরকার
হরকরা
হারামজাদা
হট্‌কো
হুণ্ডি
হাকিম
হাজা
হামরাও
হজুর
আসামী
আদত
আদাব্
উমী
ওগরন্না

ইংরাজী শব্দ

ননসুট	সরিপ
সমন	কালেক্টর
কামান্‌লা	কাপ্তান
কোম্পানি	জজ
কোর্ট	সপিনা
টচমেণ্ট	ওয়ারিন
ডবল	এজেণ্ট
ডিক্রি	ত্রেজরি
ডিস্‌মিস্‌	বিল
ডিউ	সারজন
প্রিমিয়ম	ডিস্‌কৌণ্ট ইত্যাদি

ইহার কতক কতক ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতেও বড় দোষ স্পর্শ হয় না যেহেতু সন্ধ্যাপুজা ও দৈবকর্ম্মে পিতৃকর্ম্মে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিলেই দোষ হইতে পারে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কিম্বা হাস্য পরীহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে কি দোষ আর অন্য জাতীয় ভাষা না কহিলে পরে সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা ব্যবহার করিলে অনেকে বুঝিতে পারে না তবে কিরূপে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, আরো বলি যখন যে জাতি রাজা হয়েন তখন তজ্জাতীয় অনেক বাক্য চলিত হইয়া থাকে বিশেষতো রাজবিচার সম্পর্কীয় ব্যাপারের কথাসকল ব্যবহার না করিলে উপায় নাই ।

অপর কহিয়াছ পণ্ডিত লইয়া আলাপ সহবাস নাস্তি এ তোমার প্রলাপবাক্য যেহেতু কলিকাতা নিবাসি ভাগ্যবান্‌ লোকেদিগের নিকটে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সর্ব্বদা গমনাগমন আছে এবং ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি সকল পণ্ডিতেদিগের নানা প্রকার গৌরব করিয়া নিয়ত প্রতিপালন করিতেছেন তাহা শ্রবণ কর পল্লিগ্রাম হইতে কেহ ছাত্র কেহ কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকেন কোন যোগে কাহার দ্বারা কোন ভদ্রতর ভাগ্যবান্‌ লোকের সহিত আলাপ করেন পরে সর্ব্বদা যাতায়াতের দ্বারা আত্মীয়তা হয় যদি আপনার বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপত্তি হয় শেষে তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ঐ দয়াশীল ধার্ম্মিক বাবু করিয়া দেন এবং যাহাতে তিনি সর্ব্বত্র খ্যাত হইয়া অধিক লাভ করিতে পারেন তাহার যতপরত চেষ্টা করেন এই প্রকারে অনেক টোল চৌবাড়ী হইয়াছে এবং এইক্ষণেও হইতেছে ইহাতেই বিবেচনা কর পণ্ডিত সহিত আলাপ কৌশল আছে কিনা ।

বি, প্র, আপনি যেসকল কথা কহিতেছেন ইহাতে আমার অনেক সন্দেহ নিরাস হইতেছে কিন্তু মহাশয় এক আশ্চর্য্য বোধ করি যে এমত সদ্ব্যবহারান্বিত

ভদ্রলোকেরদিগের এক২ বিষয়ে কেন নিন্দা হয় বলিতে পারি না, দেখ প্রায় সর্ব্বদা শুনিতে পাই যে প্রায় অনেক ভদ্রলোক আপন প্রশংসা শুনিতে মহা সন্তোষ হয়েন ইহাতে কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেই কহিয়া থাকেন যে মহাশয়ের তুল্য গুণবান্ ও গুণবোদ্ধা আর দেখি না ইত্যাদি আর দানও দম্ভ যুক্ত হইয়া করেন যথা অমুক পিতার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেরদিগ্যে দশ টাকা দিয়াছে আমি ২০ টাকা দিব আর অত্যন্ত অহঙ্কারান্বিত এবং বিজাতীয় অভিমানী যথা আমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ধনবান্ রূপবান্ ইত্যাদি এ প্রকার হইলে ভদ্রলোকের ভদ্রত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে।

ন, উ, ওহে ভাই শুন এ বাঙ্গালা দেশ এস্থান বড় কঠিন তাহার মধ্যে বিশেষত কলিকাতা এখানে কোন অংশে লোকের অনুরাগ পাওয়া ভার যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি অধিক দান করেন তবে তাঁহাকে কহে অমুক খয়াইয়া গেল ঐহার কি বিষয় হইবেক, এপ্রকার দান করিয়া কত লোক দরিদ্র হইয়াছে তাহার সাক্ষী অমুক হালদার প্রভৃতি গিয়াছেন যদি কেহ দান না করেন তবে তাঁহাকে বড়মানুষ যদি কেহ বলে তবে অন্য ব্যক্তি কহে রাম২ বল তাহার নাম মুখাগ্রেও আনিয়ো না সেটা কৃপণের শেষ কৃতঘ্ন তাহার নাম করিলে সেদিন ভাল যায় না, তার অন্য লোককে দেওয়া দূরে থাকুক আপনি খায় না পরে না আর যদি কোন লোক উত্তম আহার করেন ও উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করেন তবে বলে ও পিতা মাতা পুত্র পৌত্র কলত্র গুরু পুরোহিত কাহার নহে যে কিছু ব্যয় দেখিতে পাও সে কেবল আপন শরীর শুশ্রূষার্থ মাত্র অন্য লোকের উপকার করা দূরে থাকুক আপন স্ত্রী যাহাকে শাস্ত্রে শরীরের অর্দ্ধেক কহে।

যথা

বেদে স্মৃতৌ চ তন্ত্রে চ লৌকিকাচার এব চ। শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য-ফলে সমা॥ ইতি। তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাঞি এত বিষয় আছে তবু তাহার ভাল বস্ত্র কি আভরণ কদাচ কিছুই দেয় না যদি কেহ আপনি ভাল খায় ও ভাল পরে ও স্ত্রীকেও তেমনি করে তবে কেহ ওটা অত্যন্ত স্ত্রৈণ ওহার যে কিছু দেখিতে পাও কেবল দেবা আর দেবী দুইজন মাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাঞি যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ে আপন আপন বিভবানুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করেন এবং স্বজাতি জ্ঞাতিকুটম্ব দায়গ্রস্ত হইয়া ধরিলে কিঞ্চিৎ২ দিয়া থাকেন এমত জানিলে অনেকে আগমন করেন কোন দিবস এক ব্যক্তি আগত হইলেন আপন বিষয় অবগত করাইলেন পরে সেই ব্যক্তিকে একটী কি দুইটী টাকা দিলেন কিন্তু সাবকাশের অল্পতাই হউক কিম্বা অধিক স্তবলৌকিকতা বাক্য কহিতে যদি অক্ষম হয়েন তবে ঐ আগত বক্তি সেই দুটী টাকা লইয়া বাহিরে আসিয়া কহে কি কহিব আমার কপাল মন্দ নতুবা এমত লোকের নিকটে কখন আসিতাম না ওহে মহাশয় শুনিবা দুটী টাকা আমাকে দিলেক এই অহঙ্কারে আমার সহিত কথা

কহিলেক না পাৎসাহার মোহর মাথায় রাখি নতুবা ওহার টাকায় প্রস্রাব করিয়া দিতাম, যাহার সাক্ষাতে কহে তিনি কহেন তুমি ভাল কর নাঞি এমত লোকের কাছে ভালমানুষে যাইবেক না তাহা কথিত আছে।

যথা

বরমপিভিক্ষা বরমুপবাসঃ, বরমসিধারা তরুতলবাসঃ। বরমপি ঘোরে নরকে মরণং ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণং॥ অতএব বলি ভাই লোকের এস্থানে অনুরাগ পাওয়া বড় ভার, বিশেষতো ভিক্ষুক নিন্দক ও শত্রু ইহারদিগের নিকট কখনই অনুরাগ পাওয়া যায় না।

যথা

ভিক্ষুকেনানুরাগোঽস্তি নানুরাগোঽস্তি নিন্দকে। কীর্ত্যাং দানে চ শৌর্য্যে চ শত্রুলোকস্য কা কথা॥ অতএব ভিক্ষুককে কে পরিতোষ করিতে পারেন অতিশয় বিনয়ি পুরুষকে নিন্দকভক্ত বিটল বলে সুন্দর সুপুরুষকে তাহার শত্রুরা শত্রুতা করিয়া কহে ওহার গায়ে কটা চামড়া মাত্র সেসকল নিন্দার কথা গ্রহণ করিবা না আর ভদ্রলোকের উচিত নহে যে অনুসন্ধান করিয়া কাহার দোষ গ্রহণ করেন তাহাতে যেসকল গুণ থাকে তাহাই গ্রাহ্য।

যথা, গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জনমুখে গুণা দোষায়ান্তে কিমপি পরমং বিস্ময়তরম্। যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্ব্বারি মধুরং ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্।

অস্যার্থঃ

দোষকে বলিয়া গুণ সুজনেতে কয়, দুর্জ্জন মুখেতে ইহার বিপরীত হয়, অপেয়, জলধি জল মেঘে করি পান, বর্ষণ করয়ে দেখ অমৃত সমান, ক্ষীরপানে সর্প বিষ করয়ে বমন, দুর্জ্জনেরো এই মত জান আচরণ।

বি, প্র, ভাল মহাশয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি এই কলিকাতার মধ্যে ভদ্রলোকেরদিগের চারি পাঁচ দল আছে ইহাতে আমার অনেক সন্দেহ হইয়াছে। ১ প্র,। এই যে অনৈক্য না হইলে দল হয় না ইহাতে ভদ্রলোকের অনৈক্যতার কারণ কি,। ২ প্র,। দলপতি মহাশয়েরা চেষ্টা করিয়া কি দল করেন,। ৩ প্র,। দলপতির ইহাতে লভ্য কি,। ৪ প্র,। দলপতিরদিগের দলস্থ সকলকে বশীভূত রাখিতে কিছু ব্যয় হয় কি না,। ৫ প্র,। দলস্থ সকলে দলপতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন,। ৬ প্র,। দল করিবার ফল কি,। ৭ প্র,। কোন লোক যদি কাহার দলাক্রান্ত না হয় তাহাতে ক্ষতি কি,। ৮ প্র,। এক ব্যক্তি কোন দলভুক্ত আছে সে ব্যক্তি সে দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যাইতে পারে কিনা,। ৯ প্র,। দলপতিরা আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও ত্যাগ করেন কিনা,। ১০ প্র,। এক২ জাতির কি এক২ দল,। ১১ প্র,। ব্রাহ্মণেরা কি দলপতি কি ধনীলোক, বা রাজদত্ত সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন এই দলের বিষয়ে মহাশয়কে

বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক উত্তর করিতে হইবেক ইহার অনেক ঘোঁট হইয়া থাকে এবং হইবেক ॥

ন, উ, রাম, একি বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছ দলাদলির উত্তরে বুঝি অনেক গালাগালি খাইতে হইবেক কারণ দলপতিদিগের নিগূঢ়াভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া বলিতে হইবেক ইহাতে কে তুষ্ট কে রুষ্ট হইবেন বলা যায় না।

১ দলপতিত্ব সম্মান অমৃতাভিরিক্ত আছে তাহা প্রাপ্তি নিমিত্ত অনেকেরি বাঞ্ছা সুতরাং অনেকে এক দ্রব্যাভিলাষী হইলেই পরস্পর অনৈক্য হইয়া উঠে।

২ কেবল দলপতির চেষ্টায় দল হয় এমত নহে গণেরদিগের অনেক আকিঞ্চন হয় এবং ভদ্রতর লোকেরা যাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্ব্বত্র মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন তাঁহাকেই দলপতি করিতে যত্ন পান।

৩ দল করিতে দলপতির লভ্য এই, আপন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বাটীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম অর্থাৎ পুরাণ আরম্ভ সমাপন দিবসে এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি দলপতির নিকটে আসিয়া আপন বিষয় অবগত করান এবং আপন বিভবানুসারে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও জানান তিনি সেই ব্যয়োপযুক্ত লোক নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ্দ করিয়া দেন আপন দলের নৈকষ্যভাবাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ এত, ভঙ্গ কুলীন এত, অধ্যাপক এত, সেই ফর্দ্দ প্রমাণ নিমন্ত্রণ হয় পরে সিধা ও পত্র দেওয়ান তৎপরে কর্ম্ম দিবসে নির্ণয় সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিসকলে দলপতির অনুমতি লইয়া কর্ম্মকর্ত্তার বাটীতে আগমন করেন দলপতি প্রায় সর্ব্বত্রই কিঞ্চিৎ-কাল বিলম্ব করিয়া গমন করিয়া থাকেন সকল লোক তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া সভায় বসিয়া কাল যাপন করেন অধ্যাপকেরা সভাস্থ হইয়া পরস্পর নানা শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন কুলজ্ঞ কুলীন মহাশয়সকল এবং কুলাচার্য্যসকল কুলজীয় ব্যাখ্যা করিতেছেন গোষ্ঠীপতিকে বেষ্টিত করিয়া কুলীনসকল বসিয়াছেন ভট্টেরা কর্ম্মকর্ত্তার বংশাবলি ও পূর্ব্বপুরুষের এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে ঐ সভাবাটীর দ্বারে দ্বারপালেরা হস্তপদাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত ভিন্ন অন্য লোকের গমন বারণ করিতেছে এমত সময়ে অতি আত্মীয়বন্ধুবান্ধবসমভিব্যাহারে ভূপতিতুল্যমর্য্যাদ দলপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তৎকালে সভাস্থ সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসিতে আজ্ঞা হয়২ ইত্যাদি পূজ্যতাবোধক সম্বোধন বাক্যোচ্চারণ পুরঃসর অভ্যর্থনা করেন তৎপরে দলপতি তন্মধ্যবর্ত্তি স্থানে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে জিজ্ঞাসা করেন অমুক২ আসিয়াছেন ইত্যাদি, পরে কর্ম্মকর্ত্তা দলপতির নিকট আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া নিবেদন করেন বেলা বা রাত্রি অধিক হইয়াছে অনুমতি হইলে সভাস্থ মহাশয়দিগ্যে মাল্য চন্দন অর্পণ করা যায় দলপতি অনুমতি করেন গোষ্ঠীপতি অমুকের নিকট যাও, তাঁহার অনুমতি হয় পরে কুলীন ও অধ্যাপক মহাশয়সকলেও অনুমতি করেন পরে পরিচারক ব্রাহ্মণেরা চন্দনের বাটী ও পুষ্পমাল্য আনিয়া কহে অগ্রে চন্দন কাহাকে দেওয়া যাইবেক সে সময় প্রায়

অনেক স্থানে বিরোধ হইয়া থাকে যেহেতু চন্দনের পাত্র গোষ্ঠীপতি হয়েন সে সভায় দুই তিন জন থাকিলেই সুতরাং বিরোধ হয় পরে দলপতি বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেন অগ্রে গোষ্ঠীপতির চন্দন হইলে সভাস্থ ব্রাহ্মণের হয় তৎপরে দলপতির চন্দন হয়।

তৎপরে অগ্রপশ্চাদ্বিবেচনা থাকে না একাদিক্রমেই মাল্যচন্দন হইয়া থাকে পরে সকলেই আপন২ স্থানে প্রস্থান করেন অনন্তর যাঁহার সহিত যাঁহার আহার ব্যবহার থাকে তাঁহারা আহার করিয়া থাকেন পরে দলপতি মহাশয় উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদায়ের অঙ্কপাত করিয়া দেন কর্ম্মকর্ত্তা তদনুসারে সম্মান পূর্ব্বক সকলকে দানাদি প্রদান করেন ইহাতে দলপতির যে লভ্য হয় তাহা আমি আর অধিক কি কহিব আপনিই বিবেচনা করুন।

৪ উত্তর, দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগ্যে আপন বাটীর কর্ম্মোপলক্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই একবার কিঞ্চিৎ২ দিতে হয় এবং দুর্গোৎসব সময়ে পাত্রবিশেষে পূজার পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তিকেও পূজার সময়ে ভগবতীর প্রসাদি দ্রব্য নৈবেদ্য তৈজস বস্ত্র ইত্যাদি দিতে হয় অন্য২ লোকের পূজাদিতে যে ব্যয় হয়, তাহা হইতে দলপতির অধিক ব্যয় হইয়া থাকে আর দলপতিকে অধিক বাক্য ব্যয়ও করিতে হয় তাহার কারণ দলের ঘোঁট প্রায় সর্ব্বদাই আছে।

৫ উত্তর, এক প্রকার ৩ ধারাতে কহিয়াছি যে দলপতির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থানে গমন করা যায় না এবং কাহাকেও বলা যায় না পুনশ্চ বলি, যখন যিনি দলভুক্ত হয়েন তখন দলপতির ফর্দ্দে তাঁহাকে নিজ নাম লেখাইতে হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদগ্রস্ত হয় তবে দলপতি দলস্থ সকলকে ডাকাইলে তাঁহার নিকট যাইতে হয় সকলের পরামর্শ যাহা স্থির হয় তাহা দলপতি আজ্ঞা করিলেই করিতে হয়।

৬ উত্তর, দলের ফল শুন দল থাকিলে লোকের জাতি ও ধর্ম্ম থাকে যেহেতু কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিলে তাহার বাটীতে কেহ জলস্পর্শ করে না এবং পদার্পণও করে না তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা কুটম্বতা কিম্বা আত্মীয়তা থাকিলেও দলস্থ লোকের ও দলপতির অনুমতি না হইলে যাইতে পারেন না ইহাতে শঙ্কান্বিত হইয়া লোক আহার ব্যবহার করেন তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় আর কেহ যদি মিথ্যাপবাদে পতিত হয় তবে দলপতি আপন গণকে বলে তাহাকে উদ্ধার করেন ইহাতে তাহার জাতি রক্ষা পায়, অতএব দলাদলের ফল আপনি বিবেচনা কর।

৭ উত্তর, এই স্থানে বসতি করিয়া কেহ যদি দলভুক্ত না হয়েন তবে তাঁহার অনেক ক্ষতি হয় যেহেতু তিনি কোন কর্ম্ম করিলে তাঁহার বাটীতে কেহ যায় না এবং তিনিও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন না যদ্যপি তাঁহার কর্ম্ম আটক হয় না যেহেতু নানা দেশনিবাসি অর্থাৎ বিষ্ণুপুর কাশীযোড়া প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ

কলিকাতায় অনেক পাওয়া যায় তথাচ গ্রামস্থ লোক তাঁহার বাটীতে গমন না করিলে কেবল তাঁহাকে একাকী থাকিতে হয় তাহাতে লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহা বিবেচনা কর।

৮ উত্তর, দলপতি ত্যাগ করিতে পারে কি না, এ প্রশ্ন তুমি অতি বালকের ন্যায় করিয়াছ যেহেতু দলপতির অধিকারে কেহ বাদ করে না কেবল লৌকিক ব্যবহারানুরোধে এক ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছেন মাত্র অতএব ঐ মানদাতা ব্যক্তি যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাঁহার কে কি করিতে পারে সুতরাং সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে দলপতিকে অবজ্ঞা করিয়া আপন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করিতে পারে।

৯ উ০ দলপতি আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও বিনা কারণে পরিত্যাগ করেন না করিলেও করিতে পারেন কিন্তু তাহার নিমিত্ত বহু বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার কারণ দলস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করেন যে মহাশয় আপনি অমুককে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিলেন তাহার কারণ দর্শাইতে না পারিলে বরঞ্চ দল ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে ইহাতেই বোধ হয় যে দলপতি ত্যাগ করিলেই করিতে পারেন এমত নহে।

১০ উ০ জাতি মাত্রেরি এক২ দল এমত নহে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ইঁহারদিগেরি দলভুক্ত কামার কুমার তিলি মালি শাঁকারি কাঁশারি গন্ধবনিক তন্ত্রবায় প্রভৃতি জাতি আছেন কিন্তু ইঁহারদিগের স্বস্বজাতীয় আহার ব্যবহার বিষয়ে ভিন্ন২ দল আছে এক জাতিতে দল কেবল সুবর্ণবণিকেরদিগের দেখিতেছি।

১১ উত্তর, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবসাক সম্বলিত যত দল দেখিতে পাও ইহার দলপতি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ ব্যতিরেকে অন্য জাতি নহে আর ধনবান্ ও রাজদত্ত মানে মান্যমান লোক দলপতি হয়েন এমত নহে ধনবান্ বিবেচক মর্য্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।

বি, প্র, আপনকার অনুগ্রহেতে দলাদলের বিষয় তাবৎ অবগত হইলাম কিন্তু শূদ্রে ব্রাহ্মণের দলপতি হইয়া থাকেন ইহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি তাহাতে ব্রাহ্মণঠাকুর মহাশয়রা কি আপন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহারদিগের দলভুক্ত থাকেন কি তাঁহারা ভয় কিম্বা লোভ দর্শাইয়া আপন দলভুক্ত করেন, বিবেচনা করুন ইহাতে উভয়েরি মন্দ হইতে পারে যেহেতু আপনকার প্রমুখাৎ যে প্রকার দলপতির প্রাধান্য শুনিলাম তদনুরূপ প্রধানত্ব ব্রাহ্মণের উপর প্রকাশ হইলে ভূদেবদিগ্যের মানের লাঘব হয় তৎপ্রযুক্ত দলপতিরো পাপ হইতে পারে।

ন, উ, তুমি অবিবেচনায় যদি প্রশ্ন কর তবে তোমার কথায় আমি নিরুত্তর হইব দলপতির প্রধানত্ব দ্বারা ভূদেবদিগ্যের অপমান হয় এ তোমার বুঝিবার ত্রুটি যেহেতু আমি তোমাকে অবগত করিয়াছি যে দলপতির মান দশজনে দিয়াছেন এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের মানের ও লাভের আধিক্য হয় তাহাই দলপতি

চেষ্টা করেন যদি বল যে তাঁহার অনুমতি লইয়া কর্ম্ম করিতে হয় সে যেমন এক ব্যক্তি বিবেচক লোকের স্থানে পরামর্শ লওয়া এতাবন্মাত্র আর যদি বল যে সভামধ্যে চন্দন তাঁহাকে দিতে হয় তাহাও বিবেচনা করিতে পারো নাই, অগ্রে গোষ্ঠীপতিকে চন্দন দিয়া থাকে, মাল্যচন্দন কুলীন মহাশয়দিগ্যে দিতে হয় কারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ অতএব সকল কুলীনের পুজ্জক অর্থাৎ চারি মেলের কুলীনকে যিনি কন্যা দান করেন তাঁহাকে গোষ্ঠীপতি বলে দেবতারা তুষ্ট হইলে যেমন বর প্রদান করেন তেমনি কুলীন দেবতারা গোষ্ঠীপতিকে চন্দন প্রদান করিয়াছেন গোষ্ঠীপতির চন্দন হইলে সকলকে দেওয়া সিদ্ধ হয় তৎপরে দলপতি দেবনিবেদিত প্রসাদ গহণ করিয়া থাকেন ইহাতে তাঁহারদিগের অপমান কি প্রকারে হয়।

বি, প্র, শুনিয়াছি কলিকাতায় যত দল আছে সকল দলেরি কায়স্থ জাতি দলপতি, ব্রাহ্মণ দলপতি এক জনও নাই কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ দলপতি এক জনও না থাকেন তবে বড় খেদের বিষয়, যেহেতু আপনি দলপতির যে লক্ষণ কহিয়াছেন সে লক্ষণাক্রান্ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারদিগের দল না হয় কেন।

ন, উত্তর, তোমার কথার উত্তর পশ্চাৎ করিব সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি তোমার নিবাস বুঝি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে হইবেক যেহেতু শুনিয়াছি যে তাঁহার অধিকারে ব্রাহ্মণসকল শূদ্রের বাটীতে আহার করা দূরে থাকুক মাল্যচন্দনার্থেও পদার্পণ করেন না ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে শূদ্র দলপতির প্রতি তোমার প্রীতি নাই ব্রাহ্মণ দলপতি হইলে আপনি কিছু তুষ্ট হও ভাল তোমাকে সন্তুষ্ট করি।

এই কলিকাতায় ব্রাহ্মণ দলপতিও আছেন তাঁহারদিগের দলে কেবলই ব্রাহ্মণ ইহাতে কুলীন ও শ্রোত্রিয় ও বংশজ সকলেই আছেন। আর কোন জাতি নাই।

বি, প্র, দল বিষয়ক অনেক প্রশ্ন করিয়াছি আর এক প্রশ্ন করিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইব আপনি কহিয়াছেন যে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়রাও দলভুক্ত আছেন ইহাতে তাঁহারদিগ্যের ক্ষতি হইতেছে কি, না, আমার বোধ হয় যে অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং তাঁহারাও একদলভুক্ত থাকিতে বড় সন্তুষ্ট নহেন যেহেতু তাঁহারা আপন২ পরিবার পরিত্যাগ করিয়া মানের লাঘবতা স্বীকার পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অর্থ লাভের নিমিত্ত কলিকাতায় টোল চৌবাড়ী করিয়া কষ্টে কাল যাপন করিতেছেন যদি বলেন মানের লাঘবতা কি, তাহা আপনারা কলিকাতায় বসিয়া জানিতে পারিবেন না পল্লিগ্রাম নিবাসি অধ্যাপক মহাশয়রা কহিয়া থাকেন যে কলিকাতায় যেসকল অধ্যাপকেরা ব্যবসায় করিতেছেন সে কেবল নাম মাত্র তাঁহারদিগের প্রায় কাহারো প্রকৃত রূপ ব্যবসায় হয় না ইত্যাদি দোষ, আর যে সকল সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন তাহারো অনুরাগ পান না সে যাহা হউক এ সকল দোষ স্বীকার করিয়াও যদি কিঞ্চিৎ লাভ হয় তবে ক্ষতি নাই কিন্তু সে লাভের সম্ভাবনাও নাই

যেহেতু দলাদল তাহার মহৎ প্রতিবন্ধক হইয়াছে তন্নিমিত্ত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন না সুতরাং লাভ হইতে পারে না অতএব আমি বলি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগোর সহিত দল না করিলে ভাল হয় আর তাহা না হয় দলপতিরা এমত বিবেচনা করেন যে কলিকাতার মধ্যে যে কয়েক দল আছে সকল দলে সংবৎসরে যাহা দিয়া থাকেন তাঁহারা স্বতঃপরতঃ তাহাই দেন নতুবা দল করিয়া কেবল নিমন্ত্রণোপভোগি ব্রাহ্মণদিগো ক্লেশ দেওয়া হয় কি না ইহা বিবেচনা করুন।

ন, উ, দল অনেক হওয়াতে কেবল অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরদিগেরি লাভাধিক্য হইতেছে যেহেতু পূর্ব্বে কখন শুনিয়াছেন যে অধ্যাপক বিদায় ১০০।৮০।৬০।৫০। ৩০। টাকা, ইদানী অনেক দল হওয়াতে রূপাসোনার দানসাগর এবং অধিক টাকা বিদায় দেওয়া কেবল দ্বেষাদ্বেষি প্রযুক্ত করিতেছেন যদি সকলে ঐক্য হইতেন তবে কি তাঁহারা এত টাকা বিদায় পাইতেন। ১০।১৫।২০। বিদায়ের হার হইত, এক স্থানে ১০০ টাকা আর রূপার ঘড়া গাড়ু ইত্যাদি বিদায় পাওয়া যায়।

অতএব এক২ দলস্থ হওয়াতে তাঁহারদিগের বড় সুখ হইয়াছে অন্যান্য লোকের বরঞ্চ কোন লাভ নাই আর এক্ষণে যেব্যক্তি কোন কর্ম্ম করে সে অগ্রে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে পূর্ব্বে কেবল আদ্যশ্রাদ্ধাদিতেই নিমন্ত্রণ হইত অন্য মাঙ্গলিক কর্ম্মে তাহার নামও করিত না এক্ষণে দলপতিরা সচেষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণ করান কর্ম্মকর্ত্তারা দলপতির অনুরোধে এবং আপন ধর্ম্ম ও সুখ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ-করণার্থে পূর্ব্বসংস্কার মাঙ্গলিক কর্ম্মে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করা রীতি ছিল না তাহা অন্যথা করিয়াও সংপ্রতি নিমন্ত্রণ করিয়া বহু দান বিতরণ করিতেছেন দলাদলি না থাকিলে কি এমত হইত।

বি, প্র, আমি শুনিয়াছি দলপতিরা আপন২ দল পুষ্টির কারণ ৫।৭।১০।২০।২৫। হাজার টাকা কর্জ্জ দিয়া দোকান কিম্বা অন্য ব্যবসায় করান তৎপরে তাহাকে আপন দলভুক্ত করেন অন্য আর এক জন তাহা হইতে অধিক দিয়া আপন দলে লইয়া যায় এ কথার আপনি কি জানেন।

ন, উ, এ হইতে পারে অমূলক কথা কখন হয় না আমি ইহার বিশেষ জানি না কোন জাতি বিশেষের হইবেক কিন্তু কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের দলের মধ্যে এমত শুনা যায় নাই।

বি, প্র, শুন মহাশয় তোমার প্রসাদাৎ অনেক বিষয় অবগত হইলাম সম্প্রতি বিদ্যাবিষয়ক কতকগুলিন ব্যবহারের প্রশ্ন করি মহাশয় গুণসাগর তাহার সদুত্তর করিয়া আমাকে বিজ্ঞ করুন ইহাতে কিছু মনে করিবেন না যেহেতু পাড়াগেঁয়ে বালাই বড়, ইহা আপনি কহিয়াছেন, আর শাস্ত্রেও এমত কথিত আছে যে প্রাজ্ঞ লোক অজ্ঞ লোকের সন্দেহ ভঞ্জন অবশ্যই করিবেন।

যথা সংশয়োৎপন্নদুঃখং হি পণ্ডিতেভ্যো নিবেদয়েৎ। পণ্ডিতস্তৎপ্রযত্নেন

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা নিবারয়েৎ। অন্যার্থঃ, পুরুষ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইলে তন্নিবারণার্থ পণ্ডিত-দিগ্যে জিজ্ঞাসা করিবেক পণ্ডিতেরা শাস্ত্রানুসারে তাহার সন্দেহ দূর করিবেন, মহাশয় বিজ্ঞ আমি অবিজ্ঞ অতএব আমার সন্দেহ নিবারণ আপনাকে অবশ্যই করিতে হইবেক আমার বাসস্থান পল্লিগ্রাম সেই নিবিড় বনমধ্যে বসিয়া শুনিয়াছি সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন যে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোক আপন সন্তান-দিগ্যে অপূর্ব্ব আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাদি কর্ম্মে কেহ এক লক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাই আপন সন্তানদিগ্যের বিদ্যা বিষয়ে মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে এক জন ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না রাখিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনা শূন্য কেবল অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাহাই শিক্ষা করান ইহাতে কিপ্রকারে সেই সন্তানদিগ্যের উত্তম বিদ্যা হইতে পারে আর যদি স্বজাতীয় বিদ্যায় অপকৃতা রহিল তবে অন্যান্য জাতীয় বিদ্যাতেই বা কিপ্রকারে পারদর্শী হইবেন এবং এক জন ভাল বিদ্বান্ লোকের স্থানে বালককে বিদ্যা শিক্ষা না করানর কারণ কি তাহাও কিছু বিবেচনায় স্থির করিতে পারিলাম না যদি ধনব্যয় বিবেচনা করি তবে আভরণাদি ও সূতিকা ষষ্ঠী পূজা অবধি বিবাহ পর্য্যন্ত ব্যয়ের খাতা দেখিলে বা শুনিলে আক্কেল গুড়ুম হয়, অর্থাৎ বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় অতএব করুণাময় আমার এই ভাবনানল উত্তর জলে নিবারণ করিতে হইবেক।

ন, উ, এ বিষয় অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতে হইবেক যেহেতু আমার দৃষ্টচর প্রায় অনেক ধনিলোকের সন্তান অপূর্ব্ব২ গুণবান্ তবে দুই চারিজন নির্গুণ এ সহরের মধ্যে থাকিতে পারেন সে যাহা হউক আমাকে তোমার কথার উত্তর করিতে হইবেক, পিতা মাতার মনোযোগের অল্পতা আছে বটে, কিন্তু সকলের নহে তাহার কারণ যাঁহারদিগের পিতা পিতামহ বিদ্যার দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মান্যও হইয়াছেন তাঁহারাই বিদ্যার মর্ম্ম জানেন এবং সন্তানদিগ্যেরো মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করান আর যাঁহারা বিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন কারণে ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাঁহারা জানেন কেবল জমা খরচ জানিলেই কর্ম্ম চলে বিদ্যা বিষয়ে বৃথা টাকা ব্যয় করিবার আবশ্যক নাই আর আভরণ ও সূতিকা পূজাদি কর্ম্মে অধিক ধন ব্যয় করণের কারণ শুন সেই সন্তানের জননীর প্রীত্যর্থ এবং সর্ব্বত্র আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশার্থ, কেহ২ লোকো-পকারার্থ এক কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া অধিক ব্যয় করেন তদ্দ্বারা অনেক লোক কিঞ্চিৎ২ পায়, কেহ বা রাগদ্বেষ প্রযুক্ত ব্যয় করে, অমুক আপন সন্তানের বিবাহে এই২ করিয়াছে আমি তাহার আটগুণ করিব যেন এমন বিবাহ আর কেহ না দিতে পারে ইত্যাদি।

বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের

দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহবা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্‌গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি এক প্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না।

দ্বিতীয় প্রকার এই বুঝি যেমন পুণ্যসঞ্চয় হেতুক ও কেহবা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হেতুক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকেন ঐ বিগ্রহের সেবার পরিপাটী ও সুরীতি এবং নানা প্রকার আভরণ ও অপূর্ব্ব২ মন্দির করিয়া দেন কিন্তু আপনাকে সে বাটীতে একবার প্রণাম করিতেও যাইতে হয় না এওবা সেইরূপ হয় বিদ্যা সংস্থান হেতুক এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কারণ কতকগুলিন পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন এবং জেলদ্‌গর ও দপ্তরি নিযুক্ত আছে তাহারাই সর্ব্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে বাবুকে ঐ কেতাব কখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতেও হয় না, আপনি গুণনিধি অতএব এ অবোধকে ঐ বিষয়ের বোধ জন্মাও।

না, উ, অহে তুমি কি অবোধ তোমার জ্বালায় আমি জ্বলিত হইলাম এমত২ প্রশ্ন কর যাহা অতি সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও বুঝা যায় ইহাতে বাহা হয় না যে তোমার বাক্যের আর উত্তর করি তবে কি করিব স্বীকার করিয়াছি না করিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় কিন্তু পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিলাম যেপর্য্যন্ত তুমি কি তোমার দেশের লোক না বুঝিবেন তাবৎ আমি বুঝাইব সে যাহা হউক এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর করি, পুস্তক প্রস্তুত করিবার কারণ বুঝিতে পারো নাই, অতএব নানা তর্ক করিতেছ, পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই ভাগ্যবান্ লোকের সংসারে তাবৎ দ্রব্যই থাকে তাবৎ বস্তু যত্ন করিয়া রাখেন কিন্তু সর্ব্বদা সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয় না যখন যাহার আবশ্যক হয় তখনি তাহা ব্যবহার করেন যাঁহারদিগের সকল পুস্তক ব্যবহার করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না তাঁহারা কি এমত দায়গ্রস্ত হইয়াছেন যে ঐ কেতাবগুলিন অর্থ ব্যয় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার [না] করিলে দিনযাপন

হয় না এমত নহে আর যাঁহারদিগের কেতাব ব্যবহার না করিলে দিন চলে না তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন এখন বুঝিলা কেমন মনের মত উত্তর হইয়াছে।

বি, প্র, মহাশয়কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও ভয় করি যেহেতু এক্ষণে কটুকাটব্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে যাহা হউক ভালই বল আর মন্দই বল আমার মনে যতগুলিন কথা আছে তাহা না কহিয়া ক্ষান্ত হইব না, সম্প্রতি শুনিয়াছি যে কলিকাতায় নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া অতি কোমল ভাষায় এবং সংস্কৃত মূল রাখিয়া তাহার অর্থ অতি সুগম সাধু ভাষাতে নানা প্রকার গ্রন্থ হইতেছে ঐ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সবিস্ক্রুপ্ সিয়ান না, কি, বলিয়া থাকে কে জানে পাড়াগেঁয়ে মানুষ সকল বুঝি না অর্থাৎ চাঁদা করে কোন গ্রন্থের মূল্য ।৪।২।৩ ইত্যাদি স্থির করিয়া ধনি লোকের নিকট লইয়া যায় তাহাতে কেহ কহেন আমার বাঙ্গালা গ্রন্থে কিছু প্রয়োজন নাই কেহ বলেন এ সকল বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত হইতেছে আমারদিগের ইহাতে আবশ্যক কি কেহ বলেন এই ছাপাওয়ালাদিগের জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না সর্ব্বদাই আইসে মহাশয় হিতোপদেশ পুথি হইতেছে সহি করুন কেহ বলে দায়ভাগার্থদীপিকা হইতেছে নাম সহি করিয়া দিউন কেহ বলেন কল্য আইসহ কিন্তু আমিও সেই পাত্র অদ্যাবধি এক অক্ষরও লই নাই যদি আমার কাছে আসে তবে কহি কল্য আসিবা অথবা রবিবারে, শর্ম্মা সেই রবিবারে বাগানে প্রস্থান করেন তাহারা ঘুরে ব্যাড়ায় ইত্যাদি ব্যবহার ইহার কারণ কি কহ দেখি শুনি।

ন, উ, হায়২ পরমেশ্বর তোমাকে কিবা বুদ্ধি দিয়াছেন, ও পল্লিগ্রামস্থ মহাশয়, যে অঞ্চলে বুদ্ধিমান লোক আছে সেদিগ দিয়াও বুঝি তোমার কখন গমন হয় নাই যেহেতু তুমি ইহা বুঝিতে পার না যে এই কলিকাতায় যত ছাপাখানা আছে তাহাতে যেসকল পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোথায় যায়, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এই নগরবাসী লোকেই প্রায় তাবৎ লইয়া থাকেন তোমার পাড়াগেঁয়ে লোক কয়খানা পুস্তক লয়, আমি মনে করি অনেক স্থানের লোক অদ্যাপি জানেও না যে ছাপাখানা কি প্রকার, তবে যে কহিতেছ পুস্তক গ্রহণ নিমিত্ত অনেকে স্বাক্ষর করেন না তাহার কারণ শ্রবণ কর, তুমি ভাই পাড়াগেঁয়ে মানুষ ঘড়ী কাহাকে বলে তাহা জান না যদি এক শত টাকা মূল্যের একটি ঘড়ী তোমাকে পাঁচ টাকা মূল্যে দেওয়া যায় তুমি কি তাহা গ্রহণ করিয়া থাক তেমনি এক ব্যক্তি কোন ভাগ্যবান্ লোকের বাটীর পাচক ব্রাহ্মণ, দিব্য কপাল যুড়ে ফোটা করিয়া শুভ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গমন করিতেছে তাহাকে যদি কেহ বলে মহাশয় ন্যায়দর্শন প্রভৃতি সকল দর্শন টীকা সহিত অল্পমূল্যে পাওয়া যায় আপনি লইবেন সে কি তাহা লয়, আর এক জন মুদী কায়স্থ, মুদীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে বাটী ঘর দরজাও পাকা বটে তাহাকে দেখিয়া তুমি যদি তাহাকে বল মহাশয় সংপ্রতি কলিকাতায় জমীদারি কাগজের এক আশ্চর্য্য পুস্তক হইয়াছে

আপনি লইবেন সে তাহার মর্ম্ম কি জানে, আর এক জন চিকিৎসকবেশধারী, হস্তে একটা ঔষধের ডিপা আছে হাড়ি ডোম ইত্যাদি লোকের জড়ি বড়ি লতা পাতা দ্বারা চিকিৎসা করে তাহাকে যদি বল, যে ভরত মল্লিকের টীকা সমেত বৈদ্যক গ্রন্থসকল ছাপা হইতেছে মহাশয় লইবেন, সে তাহা লইয়া কি করিবে, এক ব্যক্তি তাঁত বোনা তাঁতি, চিরকাল তাঁত বুনিয়া অপূর্ব্ব অট্টালিকা করিয়াছে তাহাতে তুমি তাহাকে সল্লোক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে হিতোপদেশ গ্রন্থ ছাপা হইতেছে লইবেন, তবে সে তোমাকে কি বলে, আর এক জন কড়ি কিংবা পয়সা ব্যাচা বেণে কতকগুলিন চাবি হাতে করিয়া ভাল মানুষের মত বস্ত্রাদি পরিয়া চিনাবাজারমুখ যাইতেছে তুমি তাহাকে বড় লোক জ্ঞান করিয়া যদি বল মহাশয় এক আশ্চর্য্য বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী গ্রন্থ ছাপা হইতেছে আপনি লইবেন তবে কি সে তাহাতে ব্যগ্র হয়, এক জন তেলি, কেবল দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া তূলা বিক্রয় করে তাহাতে ধনোপার্জ্জন দ্বারা সঙ্গতি করিয়া নানা প্রকার ঐশ্বর্য্য করিয়াছে তাহার দ্বারে দ্বারি ব্রজবাসি দেখিয়া বড় মানুষ বোধ করিয়া যদি বল মহাশয় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ এবং তাহার ভাষায় টীকা করিয়া ছাপা হইতেছে অতি অল্প মূল্যেই পাওয়া যায় আপনি লইবেন, তবে সে তৎকালে এমত কথা বলে কি না যে তাহার নামে এক খারা, এক জন মালি, প্রতিদিন প্রাতঃকালে ফুল বিল্বপত্র লইয়া লোকের বাটীতে২ দিয়ে বেড়ায়, তাহার পর দোকানে বসিয়া নগদ বিক্রয় করে দুই চারি দণ্ড বেলা থাকিতে দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাস্তায়২ বলিয়া বেড়ায় চাই বেলফুল, এমত লোককে যদি তুমি বল যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ভাষা হইতেছে লইবেন, সে তোমাকে অবোধজ্ঞান করিয়া অবশ্যই বলে তাহার মূল্য একটা কলিকার তুল্যও নয়, এক ব্যক্তি কামার কেবল লোহা পীটাইত, পরে কলিকাতায় জিউলরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছে ভাল২ কাপড় পরে তাহাই দেখিয়া তুমি তাহাকে যদি বল সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে আপনি লইবেন, তবে সে কি তাহাতে সমাদর করে, আর এক জন কাঁসারি নূতনবাজারের অঞ্চলে বসিয়া কেবল রাঙ্গ তামা দস্তা সীসা পিত্তল গলাইয়া বাসন বানাইতেছে কলঙ্ক হইলে শুরকির গুঁড়া দিয়া পরিষ্কার করে, তাহাকে তুমি কহিলে যে দায়ভাগার্থদীপিকা গ্রন্থ লইবা সে তৎকালে তোমাকে এমত কথা বলে কি না যে পুরানা পিত্তল কি দরে বিক্রয় কর, এক ব্যক্তি শাঁখারি শোভা-বাজারে বসিয়া শাঁখের করাত লইয়া কর্ম্ম করিতেছে, তাহার দোকানে অনেক লক্ষ দেখিয়া যদি বল যে অঙ্কশাস্ত্রের দর্পণ পুস্তক লইবা তবে সে তোমাকে কেননা বলিবেক হাতের শাঁখা দর্পণে দেখিবার কি কায, এক ব্যক্তি নাপিত বাজারে ক্ষুরিকর্ম্ম করিয়া বেড়ায়, কোন ভাগ্যবানের সন্তান হইয়াছিল তাহার সংবাদ কোন স্থানে দিয়া দিব্য বস্ত্র পাইয়াছে তাহা পরিধান করিয়া গমন করিতেছে এবং

হস্তেতে ক্ষুরের ভাঁড়ি থেকয়া কাপড় মোড়া আছে তুমি ঐ নাপিতকে তাহাতে গ্রন্থপাঠক জ্ঞান করিয়া যদি বল যে রাসপঞ্চাধ্যায় অমুক কর্ত্তৃক ভাষায় প্রস্তুত হইতেছে লইবা, সে অবশ্যই বলিবেক ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি, একজন সদ্গোপ কৃষিকর্ম্মে পারগ বড়, কেবল তাহাই বুঝিতে দক্ষ, তাহার অট্টালিকা বাটী দেখিয়া যদি বল, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ গ্রন্থ হইতেছে আপনি লইবা, তাহাতে জিজ্ঞাসা করে কি না যে অমাবস্যা কবে তাহার কারণ অমাবস্যার দিবস কৃষিকর্ম্ম নিষেধ আছে, তাহার গ্রন্থে কি প্রয়োজন, একজন ছুতার কেবল ঢেঁকি পীঁড়ি খড়ম গড়িয়া থাকে ইদানী আলমারি ডেস্ক প্রভৃতি কাষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গতাপন্ন হইয়াছে দিব্য ঢাকাই ধুতি জামদানের একলাই পরিধান করিয়া অসময়ের ইলিস মৎস্য ১ একটা ২ দুই টাকায় ক্রয় করিয়া হস্তে লইয়া যাইতেছে তাহাকে যদি বল, ইংরাজী বাঙ্গালা ডেক্সনরি হইতেছে লইবা সে তখন একথা অবশ্যই বলিবে যে মহাশয় করাতি পাওয়া যায় না কাঠচেরা মস্কিল হইয়াছে আমি কি করিব ইত্যাদি অতএব ধনী লোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম্ম বুঝে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে ঐ সকল জাতির মধ্যে যাঁহারদিগের বিদ্যা বিষয়ে অধিক আলোচনা আছে তাঁহারদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অনুষ্ঠান পত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন।

বি, প্র, শুন কৃপানিধান মহাশয়, পুস্তক বিষয়ের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমি নিরুত্তর হইলাম সংপ্রতি আর এক প্রশ্ন করি এই কলিকাতা মহানগর মধ্যে এবং ইতস্ততো গ্রামে ধর্ম্মার্থে অনেক পাঠশালা কলিকাতানগরস্থ ভাগ্যবান্ মহাশয়রা করিয়া দিয়াছেন ইহা শুনিয়া আমি মহা আহ্লাদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ঐ সকল ধর্ম্মশীল দয়াময় মহাশয়দিগকে আপনি অবগত আছেন কি না আর ঐ সকল পাঠশালাতে বালকেরা কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন আপনি যদি এই পাঠশালা বিষয়ের বিশেষ অবগত করান তবে না করেন কি।

ন,"উ, শুন ভাই পাঠশালা বিষয়ের সকল বিশেষ বৃত্তান্ত আমি বলিতে পারি না কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা অবগত করাই যত উত্তম২ পাঠশালা দেখিতে পাও এ প্রায় তাবতি পাদারি সাহেবেরা করিয়া দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে দরিদ্র-লোকের বালকেরা এবং ধনিলোকের বালকেরাও বিনা ব্যয়ে বাঙ্গালা লেখা পড়ায় উত্তম রূপে সুশিক্ষিত হইতেছে এবং ঐ সাহেবেরা বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগ করিয়া থাকেন সেই মনোযোগের বিবরণ কিঞ্চিৎ বলি, বালকদিগের পড়িবার নিমিত্ত উত্তম২ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রস্তুত করিবার কারণ স্কুলবুক সোসাইটি অর্থাৎ পাঠশালার পুস্তক প্রস্তুত করণ কারণ এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন তদ্দ্বারা নানাবিধ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ঐ বালকদিগের প্রদান করিয়া থাকেন এবং বালকদিগের কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহার পরীক্ষা লইয়া থাকেন অপর শ্রীযুত ডেবিড হেয়র নামক এক সাহেব নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া

পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে এক পাঠশালা করিয়া দিয়াছেন এবং আপনিও মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার অনুসন্ধান করেন পাঠশালার বিবরণ এই তোমাকে কহিলাম।

বি, প্র, শুন করুণাময় ঐ পাঠশালার বিষয়ে আমি আর এক প্রশ্ন করি সাহেবেরা বাঙ্গালি বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত এতাদৃশ মনোযোগ করণের কারণ কি ইহার উত্তর প্রদানে তোমার নিকট অত্যন্ত বাধিত হইব।

ন, উ, সাহেবেরদিগের অভিপ্রায় আমি কি প্রকারে বলিতে পারি আমার বিবেচনা দ্বারা এই হয় যে তাঁহারা ধর্ম্মার্থে পাঠশালা করিতেছেন যেহেতু তাঁহারা অত্যন্ত ধর্ম্মশীল এবং সুবিচারক এদেশে আসিয়া দেখিলেন যে দরিদ্রলোকের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের কোন পন্থা নাই তাহাতেই দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া পাঠশালা বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন।

বি, প্র, আমি এ সকল পাঠশালার মর্ম্ম বুঝিলাম, সংপ্রতি জিজ্ঞাসা করি এতন্নগরবাসি ভাগ্যবান্ বাঙ্গালি লোকেরা কি কোন পাঠশালা করিয়া দেন নাঞি এবং তাঁহাদিগের কি এবিষয়ে মনোযোগ নাই।

ন, উ, মনোযোগ তাবতেরি নাই এমত নহে যাঁহাদিগের ইহাতে মনোযোগ আছে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট আদালতের প্রধান জজ শ্রীযুত স্যার ইড্ওয়ার্ড ইএষ্ট সাহেব হিন্দু বালকদিগের নিমিত্ত হিন্দু কালেজ নামক এক বিদ্যালয় স্থাপিত করণের সময়ে অনেক ধনিলোককে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীল শ্রীযুত মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদর এবং শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর প্রভৃতি অনেকের মনোযোগ দ্বারা ঐ কালেজ স্থাপিত হইয়াছে সেই কালেজে অনেক বালক নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং কহিতেছে ঐ কালেজের আর বিশেষ বৃত্তান্ত যদি জানিবার বাঞ্ছা হয় তবে কালেজের রিগুলেসন অর্থাৎ বিদ্যালয়ের ধারা সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ আছে তাহা পাঠ করিলেই জানিতে পারিবা।

বি, প্র, ভাল বিদ্যা বিষয়ে এই নগর নিবাসী এত ধনিলোকের মধ্যে কেবল এই কয়েক জন ব্যতিরেকে আর কাহারো মনোযোগ না হওনের কারণ শুনিতে অত্যন্ত বাঞ্ছিত হইয়াছি তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু আমার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ন, উ, যত প্রশ্ন করিয়াছ তাহার যেমন হউক এক প্রকার আপন বুদ্ধ্যনুসারে উত্তর করিয়াছি কিন্তু তোমার এ প্রশ্নের উত্তর করিতে অক্ষম হইলাম ইহার কারণ তুমি এক্ষণে যে বিবেচনা কর তাহাই হইতে পারে।

বি, প্র, মহাশয়কে অনেক প্রশ্ন করিয়াছি তাহার উত্তর প্রদানে আমার সন্দেহ নিবারণ করিয়াছেন সংপ্রতি আরো কতকগুলিন বিষয়ে সন্দিগ্ধ আছি যদি বিরক্ত না হইয়া উত্তর করেন তবে কৃতার্থ হই।

ন, উ, আপনি বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, ইহাই কহিয়াছিলেন তাহা ভিন্ন অন্য প্রশ্ন করিতেও প্রবর্ত্ত হইলেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

বি, প্র, বিদ্যা ভিন্ন অন্য প্রশ্ন করিবো না কিন্তু অন্য২ বিদ্যা বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করি, শ্রুত আছি যে এতন্নগরে অনেক নববাবু ও বাঙ্গালি বারাঙ্গনাগকল গীত বাদ্যাদি বিদ্যায় নিপুণতর, তুম্বুরুতুল্য কালোওয়াত্ গায়ক বাদক হইয়াছে ইহার আপনি কি জানেন।

ন, উ, গান বাজনাসকল ভালমতে বুঝি না কিন্তু ঐহারা কি প্রকার কালোয়াত্ হইয়াছেন তাহা আপন বুদ্ধ্যনুসারে বলি যেমন কাঠালের আমসত্ত্ব ইহাই বিবেচনা করিবা।

বি, প্র, মহাশয় আমি শুনিয়াছি যে অনেক ভাগ্যবান্ লোকের নিকট কতকগুলিন লোক নিয়ত যাতায়াত করে প্রতিদিনি প্রাতঃকালে যায় বেলা দশ এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে এবং বৈকালে যায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তথায় কালযাপন করে আর ইহাদিগের কেবল এই কর্ম্ম যে অনবরত বাবুর হাঁই উঠিলে তুড়ি দেয় এবং আজ্ঞা যেআজ্ঞা মহাশয়২ করে, ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ সকল লোক কোন কর্ম্মে পারগ কি, না, আর কোন শাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে কি, না, আর ইহারা যে যেখানে গিয়া থাকে সে নিয়ত তাহারি নিকট গমনাগমন করে, কি, সর্ব্বত্রই যায় এই তাহাদিগের কর্ম্ম, আমি ঐ সকল ব্যক্তির বিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত অন্তঃকরণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।

ন, উ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে অনেকের নিকটে লোক নিয়ত যাতায়াত করে বটে, যে সকল লোক গমনাগমন করে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার লোক আছে কেহ২ বাঙ্গালা পারসি ইংরাজী শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন হইয়া ঐ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তাঁহার গুরু পুরোহিত প্রভৃতির সুপারিস আনিয়া দেয়, কোন বিষয়কর্ম্মের আশায় যাতায়াত করে, কেহ ভিক্ষা করিতে অতি নিপুণ কন্যা ভগিনীর বিবাহের ভারাক্রান্ত হইয়া তদুদ্ধার উপলক্ষে যাতায়াত করিতেছে, কেহ বাবুর সহিত আলাপ কৌশল করিবার নিমিত্ত নিয়ত যাইতেছে মনোনীত কথা কহিতে ও কর্ম্ম করিতে তাহারা বিলক্ষণ পারগ, তাহারদিগের সঙ্গে লইয়া বাবু স্থান বিশেষে গমন করেন, লোকে তাহাদিগের কহে ইহারা অমুক বাবুর মোসাহেব ইহাতে তাহারা মহা আনন্দিত থাকে এবং তাহার মধ্যে দুই চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন তাঁহারা কখন শাস্ত্রবিচার করেন, কখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যও শুনেন, ইহাতে বোধ হয় যে তাঁহারাও উপাসনার পারদর্শী হইবেন, কোন২ ব্যক্তির গান বাদ্যাদি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে, বাবুর যখন তদ্বিষয়ে বাঞ্ছা হয় তখন তাহারা তদ্দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করেন কতকগুলিন লোক আছে তাহারা মিথ্যা গল্প করিতে ও লোকের কুৎসা প্রকাশ করিতে বিলক্ষণ নিপুণ তাহারা সময়ানুসারে বক্তৃতা করে, আর এসকল লোক একজনার নিকট নিয়ত যাতায়াত করে এমত নহে পাত্র বিশেষে অনেকের নিকট যায়, এক্ষণে আপনকার ব্যাকুলচিত্তকে সুস্থ করিয়া আমাকে অনুকূল হও।

বি, প্র, আপনকার স্থানে বাবুর নিকট লোক যাতায়াতের বিষয়ের উত্তর শুনিয়া নিঃসন্দিগ্ধ না হইয়া বরং অধিকতর সন্দিগ্ধ হইলাম যেহেতু আপনি কহিলেন যে কতকগুলিন লোক কর্ম্মের উমেদার আছে ইহাতে বোধ হইল যে তাহারা চিরকাল কেবল ওমেদার রূপেই কালযাপন করিতেছে ভাল আপনকাকে জিজ্ঞাসা করি বাবু তাহারদিগের কোন কর্ম্ম করিয়া না দেওনের কারণ কি আর যদ্যপি তাঁহার হস্তে কোন কর্ম্ম না থাকে তবে তাহারদিগ্যে কেন মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে যাতায়াত করাইয়া ক্লেশ দেন ইহার উত্তর করুন পশ্চাৎ আর কয়েক বিষয়ের বিশেষ জিজ্ঞাসা করিব।

ন, উ, তুমি অপূর্ব্ব বিবেচনা করিয়াছ আমি কি এমত কথা বলিয়াছি যে কতকগুলিন লোক আছে তাহারাই চিরকাল ওমেদারি করিয়া থাকে শুন বলি যে সকল লোক কর্ম্মের ওমেদে থাকে তাহার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে উপস্থিত মতে কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত করিয়া থাকেন আর যদি কাহার হস্তে কোন কর্ম্ম না থাকে তবে ঐ ওমেদার ব্যক্তি সুপারিস আনিবা মাত্র তাহাকে কহেন এক্ষণে কোন কর্ম্ম নাই আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন তাহা সে ব্যক্তি না শুনিয়া বলে ভাল, মহাশয়ের নিকট যাতায়াত করি কর্ম্ম উপস্থিত মতে করিয়া দিবেন, ইহাতে বাবু কি তাহাকে কহিবেন তুমি আমার বাটীতে আসিতে পাইবে না।

বি, প্র, কন্যা ভগিনী ইত্যাদি বিবাহের ভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগ্যে কেন যাতায়াত করান আপন শক্ত্যনুসারে যাহা হয় তাহা তৎক্ষণাৎ দিয়া বিদায় না করেন কেন।

ন, উ, আমি তোমাকে এমত কথা বলি নাই যে দুই চারি ব্যক্তি এক বাবুর নিকট যাবজ্জীবন ঐ দায় উদ্ধার আশয় যাতায়াত করিতেছে, শুন কত২ লোক আসিতেছে উপায় করিয়া যাইতেছে।

বি, প্র, আপনি কহিলেন যে কতকগুলিন লোক আছে তাহাদিগের লোকে বাবুর মোসাহেব বলিলে এবং স্থান বিশেষে বাবুর সঙ্গে গেলে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, ভাল বুঝিলাম তাহারা আহ্লাদে লোক, ধর্ম্মতো বিরুদ্ধ লোকতো নিন্দা এমত বিষয় যাহা হয় তাহা মনে করে না কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাহারদিগের কি প্রকারে দিন নির্ব্বাহ হয়।

ন, উ, শুন যাহারা বাবুর মোসাহেব রূপে খ্যাত হয় তাহারদিগের বিষয় তোমাকে কি বলিব আমার বোধ হয় বুঝি ঐ নরাধমেরদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই, তবে দিনপাতের বিষয়, তাহা বাবুর প্রসাদে আপন২ উদর পুরণ হয়, যদি কাহার পরিবার থাকে তবে তাহারদিগের পরমেশ্বর দিন চালাইবেন ইহাই ভাবে, আর কখন২ বাবু কিছু২ দিয়া থাকেন তাহা বুঝি কেহ২ পরিবারেরদিগকে দেয়, প্রায় অনেকেই তাহারদিগের ইহকাল নিস্তার কর্ত্রীকেই দিয়া থাকে বাটীর পরিবারেরা কোন উপায় করিয়া লয়।

বি, প্র, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিষয়ে আপনি কহিলেন যে তাঁহারা বাবুর নিকট

শাস্ত্রের তাৎপর্য্য শুনেন ইহাতে চমৎকৃত হইলাম যেহেতু তাঁহারা পণ্ডিত, বহুকালাবধি অনেক পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রে অন্ধ অর্থাৎ সংস্কৃত এক অক্ষরও পড়ে নাই সে তাহার তাৎপর্য্য বলিয়া দেয় তাহা তাঁহারা শ্রবণ করেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

ন, উ, আপনি বিবেচনা করুন, ঐ দীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক শ্রমে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পরিবারেরদিগের উদর ভরণ পোষণার্থে কিঞ্চিৎ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন অন্যান্য ব্যবসায় কিছুই জানেন না কেবল বাবু-লোকের নিকট নিয়ত যাতায়াত করেন দুই বেলা গিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তাহাতে কোন বাবুর কিছুই মনোযোগ হয় না তবে কি করিবেন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে বাবু নিতান্ত বিজ্ঞাভিমানী অতএব ইঁহাকে বিজ্ঞ বলিলে অধিক সন্তুষ্ট থাকেন এইহেতু কেহ২ চতুরতা করিয়া দুই জনে ঐক্য হইয়া ন্যায়দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোটি করিয়া বাবুকে মধ্যস্থ মানেন, কেহ স্মৃতিশাস্ত্রের কোন বচনের উপর দোষ দিয়া তদুদ্ধার নিমিত্ত বাবুকে তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করেন সেই বাবু তাঁহারদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া আপন বুদ্ধ্যনুসারে একটা কোন কথা কহেন, পণ্ডিত মহাশয়েরা সেই কথায় তাঁহাকে সাধুবাদ করত অনেক প্রশংসা করেন বাবুজী তাহাতেই তুষ্ট হইয়া কিছু২ দেন ইহাতেই কালযাপন করিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের উপর কোন দোষ হইতে পারে না।

ইতি শ্রীভবানীচরণশর্ম্মকৃত কলিকাতা কমলালয়ে প্রথম তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥০॥

পত্রিকার কথা

এক্ষণ ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই নতুন বর্ষ আরম্ভ উপলক্ষে পত্রিকার সকল শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা আশা করছি এক্ষণের পরবর্তী সংখ্যা কার্ল মার্কসের জন্মের দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হবে।

এক্ষণ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১. প্রকাশের স্থান	৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯	
২. প্রকাশের কালানুক্রম	দ্বিমাসিক (বছরে ছয়টি সংখ্যা)	
৩. মুদ্রাকরের নাম	প্রবীর ঘোষ	
জাতীয়তা	ভারতীয়	
ঠিকানা	১ কবীর রোড, কলিকাতা ২৬	
৪. প্রকাশকের নাম	প্রবীর ঘোষ	
জাতীয়তা	ভারতীয়	
ঠিকানা	১ কবীর রোড, কলিকাতা ২৬	
৫. সম্পাদকের নাম	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্মাল্য আচার্য
জাতীয়তা	ভারতীয়	ভারতীয়
ঠিকানা	অন / এক্ষণ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯	২ বি নবীন কুণ্ডু লেন কলিকাতা ৯
৬. স্বত্বাধিকারী	নির্মাল্য আচার্য / ২ বি নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা ৯	

আমি, প্রবীর ঘোষ, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ ১৫. ৪. ৬৮ (স্বাঃ) প্রবীর ঘোষ

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত।

কার্ল মার্কস
বিশেষ সংখ্যা
১৯৬৮

চতুষ্কোণ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক দ্বিমাসি

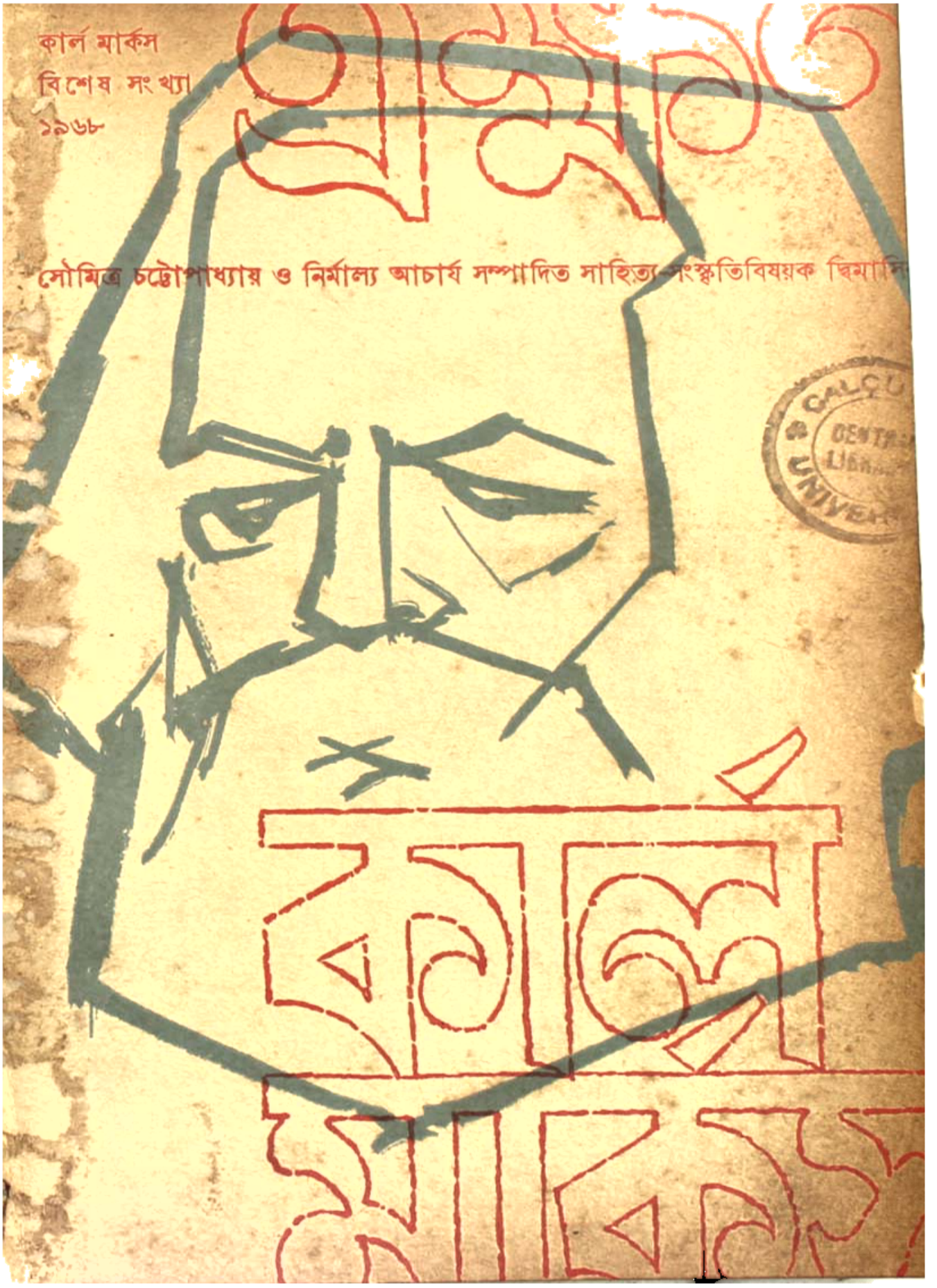

CALCU
CENTR
LIBR
UNIVER

একটি বরণীয় গ্রন্থ প্রকাশ

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর যে কোনো রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা আছে এবং সে-রাষ্ট্রচিন্তার যে কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে – এতদিন পর্যন্ত প্রধানত প্রতীচ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠকেরা সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মননসাধনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে-সব স্মরণীয় বাঙালী, তাঁদের চিন্তাধারার এমন বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় এর আগে হয় নি। এই বৃহদায়তন গ্রন্থে লেখক দীর্ঘকালের সযত্ন পরিশ্রমে যাবতীয় দুর্লভ পুথিপত্র ও দলিল অনুসন্ধান ক'রে ভারতের আধুনিক রাষ্ট্র-চিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁকেই প্রথম যথার্থ বাঙালী ঐতিহাসিকের গৌরব দেওয়া যায়।

। যে দ্বাদশ মনীষীর প্রসঙ্গ এতে আলোচিত ।

রামমোহন রায় অক্ষয়কুমার দত্ত কেশবচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্জন দাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্র বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায়।

সুমুদ্রিত পাঁচ শত পৃষ্ঠার গ্রন্থ
শোভন প্রচ্ছদ। মজবুত বাঁধাই
মূল্য ১৮·· টাকা মাত্র।

সুবর্ণরেখা
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯

With

Compliments

From

KITAB MAHAL

DR D. N. ROAD

BOMBAY 1

Compliments from

Hindustan Motors Limited / Calcutta

His Master's Voice

Puts Quality First

IOL

এদেশে যাবতীয় গ্যাস ও ঝালাই সরঞ্জামের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস, অক্সি-আসিটিলিন; ঝালাই ও কাটাই সরঞ্জাম, যাবতীয় আনুষঙ্গিক, ঝালাইয়ের রড আর ফ্লাক্স ইত্যাদি

●

ইলেকট্রিক আর্ক (হস্তচালিত আধা-হস্তচালিত এবং স্বয়ংক্রিয়) ঝালাইয়ের উপকরণ, আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জাম এবং ইলেক্ট্রোড ইত্যাদি

●

মেডিকাল গ্যাস, অ্যানেস্থেটিক, অক্সিজেন চিকিৎসা এবং শ্বাসক্রিয়া পুনরায় চালু করার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যাবতীয় আনুষঙ্গিক

●

তরল অক্সিজেন বিস্ফোরক

তাড়াতাড়ি আমাদের শাখা অফিসে খোঁজ নিলে সমস্ত খবর পাবেন।

ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড

IOC.150 BEN

ধোবার কোন সাহায্য ছাড়াই আপনার বাচ্চাদের জামাকাপড় দেখতে দেখতে ছোট হয়ে যায়...

কি ভিন আপনার ধোবার হাতে ফেলে বিদেশী জামাকাপড়ের বিশেষ আদর। তাই বাচ্চাদের জামাকাপড়ের জন্য সুতো-সুতোটুকু বেছেই সুতী আর সুতী-ঘেঁষা কাপড় ব্যবহার করুন।

ব্যবহার করলে স্যানফোরাইজড্ ছাপ মারা কাপড় কিনুন। দুনিয়াতে এই ট্রেডমার্ক লাগানিয়েই সুনিশ্চিত। এই আন্তর্জাতিক সুরক্ষার প্রমাণের বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থা করছে। এই ট্রেডমার্ক আসল খাটি। কাপড়ের ধোলাইয়ে নিশ্চিত আশ্বাসের প্রতীক। এর জন্য নির্ভর করুন। স্যানফোরাইজড্ ছাপ মারা কাপড় ধোলাইয়ের আগে কিনিয়ে নেবার দরকার হয় না। তাই বরাবই সুতীবস্ত্র কিনবেন এই ছাপটি দেখে নেবেন।

P.P.C. ট্রেন্ড এক আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক (বিশ্বের সমস্ত দেশেই যা রক্ষিত) ইন্ডিয়ান্সেন্সিয়া (রেজিস্টার্ড) ট্রেডমার্ক ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স। বর্তমান এই ট্রেডমার্ক ব্যবহার করছে আমাদের ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের এই ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে ভারতের সেরা সানফোরাইজড্ মিল-গুলির একটি। এ ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য ভারতের সুতীবস্ত্র প্রস্তুতকারক মিলগুলি এখানে সুবিধামূলক অনুমতি করছে।

উপহার সম্বন্ধে সমস্যা ?

বিবাহ, জন্মদিন, নববর্ষ, দুর্গোৎসব, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ—উপলক্ষ্য যাই হোক, দেওয়া চলবে। দেখলে পছন্দ হবে আপনার — সুন্দর চেক, সুন্দর ফোল্ডার। আর নাই থাকল অ্যাকাউন্ট, আপনিই চেক সই করবেন।

ব্যাঙ্কের যে-কোন শাখা অফিসেই কিনতে পারেন।

ইউবিআই

গিফ্‌ট চেক

দেখুন না...

ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট গিফট চেক ইউবিআই ইউবিআই গিফট চেক চেক ইউবিআই গিফট গিফট চেক ইউবিআই ইউবিআই গিফট চেক চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই

ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফ চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই। ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফ চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই। ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফ চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই। ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফ চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

৫৪৯/UBI

INDIA PAKISTAN-U.K. CONTINENT

Calling at Aden, Port Sudan, Port Said, London, Hull, Middlesbrough, Dundee, Avonmouth, Cardiff, Swansea, Liverpool, Manchester, Glasgow, Belfast, Dublin, Gonoa, Marseilles, Le Havre, Boulogne, Dunkirk, Antwerp, Rotterdam, Bremen, Hamburg, Stettin, Gdynia Gdansk, Helsinki, Kotka, Oslo, Gothenburg, Copenhagen, Stockholm and other ports according to inducement.

INDIA-U.S.A. (ATLANTIC & GULF PORTS)

Ports of Call Calcutta, Trincomalee, Colombo, Alleppey, Cochin, Aden, Port Said New York, Philadelphia, Baltimore, Norfolk, Savannah, New Orleans, Mobile, Galveston, Houston, Beirut, Alexandria, D'Jeddah and other Ports according to demands

GREAT LAKES EASTERN CANADA-INDIA SERVICE

Subject to inducement, the vessels load at Chicago, Milwaukee, Green Bay, Bay City, Sarnia, Detroit, Toledo, Cleveland, Erie, Buffalo, Toronto, Rochester, Montreal, Quebec for Bombay, Cochin, Madras & Calcutta.

INDIA-U.S.S.R.

Calling at : Black Sea Ports, Latrakia, Beirut, Istanbul and other Eastern Mediterranean Ports.

INDIA-U.A.R.

Calling at: Port Suez, Port Said and Alexandria

COASTAL SERVICES

Ceylon-India-Pakistan-Burma-Ceylon Cargo-cum-Passenger: Bombay-Kutch-Karachi Bombay-Saurashtra Bombay-Marmagoa-Mangalore ports-Cochin.

OVER THE SEAS TO DISTANT LANDS SPEED

SCINDIA CARGO SERVICES

THE SCINDIA STEAM NAVIGATION COMPANY LTD., Scindia House, Ballard Estate, Bombay 1

Telephone 260161 (12 Lines) Grams JALANATH (Coastal) SAMUDRAPAR (Overseas)

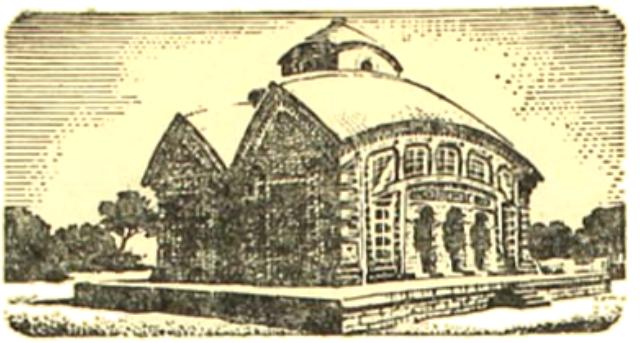

জানি জানাই

কতটুকু জানি তাকে ?
কতটুকু চিনি ? স্বদেশকে জানা,
দেশকে আপন করার সাধনা।

শুধু মানচিত্র বা পণ্ডিতের
পুঁথি থেকে দেশকে জানা
সম্পূর্ণ হয় না। দিনে দিনে
প্রত্যক্ষ পরিচয়ে সেই জ্ঞান
পূর্ণতা পায় বাংলা দেশের পরিচয়
মূর্ত হয়ে আছে তার অগণ্য
মন্দিরে মসজিদে, পোড়ামাটির কাজে,
ইতিহাসের নানা কীর্তিস্তম্ভে,
শান্তিনিকেতনে। ভবিষ্যৎ গড়ছে যে
মানুষ তার বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডে।

ICP/TB 15

ট্যুরিষ্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ঈস্ট
কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮৯৭১

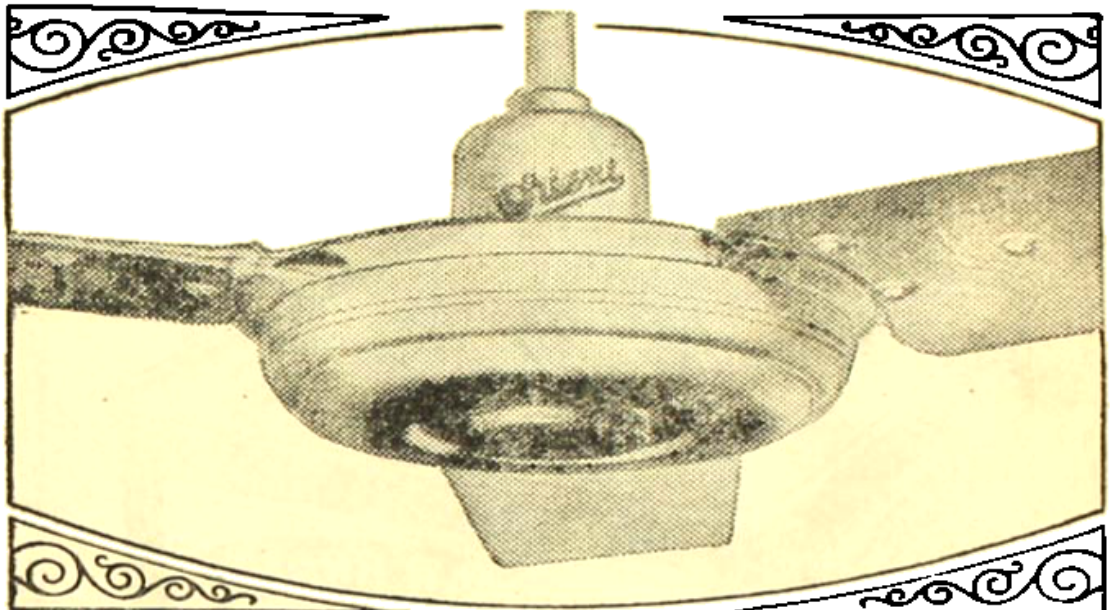

ENGINEERED TO OUTLAST MANY MANY SUMMERS

Orient

CEILING FAN

GUARANTEED FOR TWO YEARS

ORIENT GENERAL INDUSTRIES LTD
CALCUTTA-54

ASP/OGI-2/66

স্বাস্থ্যকর
খাবারের অভ্যাস
শুরু করে

পোস্টম্যান

পোস্টম্যান, শোধন করা চিনাবাদামের তেল.
পুষ্টিকর সহজপাচ্য রান্নার উপকরণ।
পোস্টম্যানে আছে শতকরা ৫০% ভাগ
অপরিপূর্ণ স্নেহযুক্ত অ্যাসিড, যা আপনার খাবার
আরো স্বাস্থ্যকর করে তোলে।
আজ থেকেই পোস্টম্যান ব্যবহার করুন।
এটি স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস।
সব সাইজে পাওয়া যায়
আহমেদ মিল্‌স, বোম্বাই-৮

MAR. AHM. SAIT BEN

প্রাপ্তিস্থান

খিমজি হনসরাজ

১৬৫ লোয়ার চিৎপুর রোড। কলকাতা ১

টেলিফোন ৩৪৩০-৪৭ টেলিগ্রাম 'কোকোনাট'

excitingly—
exclusively—
exquisitely—

Khatau
voiles

Ask for 'Cum-Cum' and a matching 'Kashmira' Blouse.

THE KHATAU MAKANJI SPG. & WVG. CO. LTD.,
Head Office: Laxmi Building, Ballard Estate, Bombay 1
Mills: Haines Road, Byculla, Bombay 27
Wholesale Clothshop: Govind Chowk, Mulji Jetha Market, Bombay 2

Retail Show Rooms
18-L Park Street, Entrance Middleton Row, Calcutta 16
149 Mahatma Gandhi Road Calcutta 7

SISTA S KKTS-374 A

আজ আমি বড়লোক!

আমি প্রতি মাসে সামান্য কিছু টাকা ইউকোব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে জমাতাম—আর আজ একসঙ্গে এত টাকা আমার!

মাসে ন্যূনতম দশ টাকা দিলেই রেকারিং ডিপোজিট স্কীমে টাকা জমানো যায়। প্রতি মাসে উচ্চতম জমার হার ৪৫০ টাকা। এই এ্যাকাউন্ট খোলা যায় একক এবং যৌথ ভাবে।

আপনি সঞ্চয় করতে পারেন—
ইউকোব্যাঙ্ক
আপনাকে সাহায্য করবে

দি ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কলিকাতা

G.E.C.
আপনার
গ্যারান্টি

অসরাম দিলভার লাইট ল্যাম্প সমান ও স্নিগ্ধ আলোর প্রভাবে আপনার গৃহকে অত্যন্ত আরামদায়ক করে তোলে। অসরাম দিলভার লাইট-এ চোখে জোর পড়ে না। অসরাম ল্যাম্প আলোক সমস্যার সমাধান করে আপনাকে চোখ-ধাঁধানো স্নিগ্ধ আলোর আরামে কাজ করতে সাহায্য করে।

G.E.C.
Osram একটি আশ্চর্য ল্যাম্প

G.E.C. আপনার গ্যারান্টি

THE BENGAL WATERPROOF
WORKS (1940) LIMITED

Dealers all over India

Calcutta 16

Polystyrene and you!

A modern reception room—and POLYSTYRENE is much in evidence. Polystyrene is used for laminated table tops, desk calendars, pen holders, airconditioner fronts, light fittings, to mention just a few.

POLYSTYRENE has become so much a part of daily life that we tend to take it for granted. But it's difficult to imagine a modern reception room, showroom or office without POLYSTYRENE – the versatile plastics material we depend on so much.

POLYSTYRENE – for better and modern living !

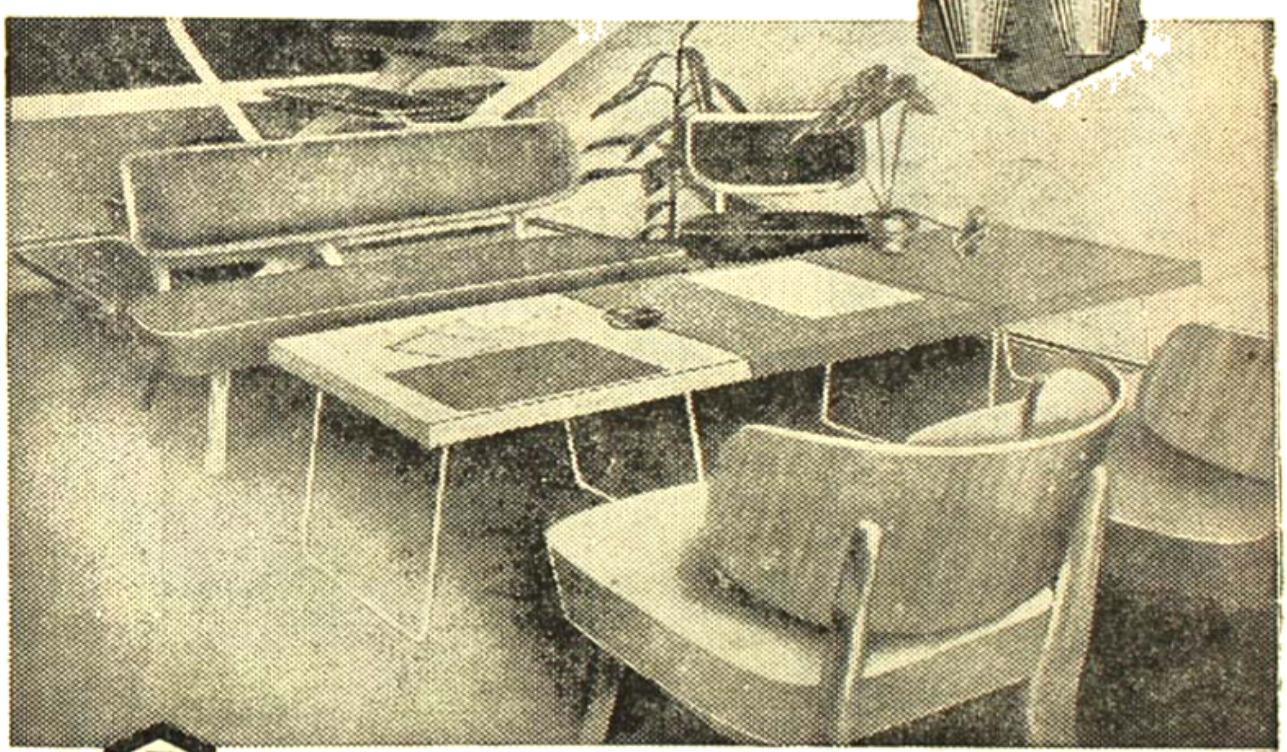

POLYCHEM LIMITED

Regd Office: 7, Jamshedji Tata Road, Churchgate Reclamation, Bombay 1. Telephone No: 241778, 241665

আন্তরিক অভিনন্দন

দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড

লক্ষ্মেডস্ প্রতিষ্ঠান

Office, PASTE, All purpose, ADHESIVE, Liquid GUM.

ardeeyar

SULEKHA WORKS LTD.

SULEKHA PARK. CALCUTTA - 32

আমাদের শক্তি শুধু ইস্পাতেই নয়,
মানুষেও। মানুষ শুধু খেয়েই বাঁচতে পারে না।
বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে চাই সঙ্গীত, নৃত্য,
আরো পাঁচ রকম আনন্দের খোরাক। আনন্দের
পুরো মনের সব রসই সযত্নে যোগানো হয়।

টাটা স্টীল

আনন্দোৎসবে ও নিত্য ব্যবহারে

বাংলার তাঁতের কাপড় কিনুন

বর্ণে, নকশায় ও বুননে বিচিত্র
সুলভ টেকসই এবং আভিজাত্যসূচক
বাংলার সকল অঞ্চলের বাছাইকরা কাপড় পাবেন
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এইসব বিপণন কেন্দ্রে

কলকাতা ও হাওড়ায়

৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা ;
১২৮/১, বিধান সরণী, কলকাতা ;
১৫৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ;
১৮/এ, গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড (দক্ষিণ) হাওড়া

এ ছাড়াও যে কোন বড় দোকানে পাওয়া যায়

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ১৪৮০৮ / ৬৮

এক্ষণ-এর
লেখক ও পাঠকবর্গকে
আমাদের অভিনন্দন

মার্কারি ট্র্যাভেলস
গ্র্যাণ্ড হোটেল কলকাতা তেরো

When
Buy A Torch
Buy The Best
Buy
EVEREADY Torch

Distributor :
B. G. Patel / 167 Old Chinabazar Street, Calcutta 1

১৩৭৪ সালের উল্টোরথ পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থ

সাত মহাল

সুনীলচন্দ্র সরকার

"বেশ কয় বছর আগে সুনীলচন্দ্র সরকার 'মিলিতা' নামে একটি ক্ষীণ-কলেবর কবিতার বই নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময়ের মুগ্ধতার কথা এখনও মনে আছে। 'জামতলা' কবিতাটি তখন মুখে মুখে ফিরেছিল, এখন এটি বাঙলা কবিতার অ্যানথলজির অবশ্যস্থাবী অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর নানা জায়গায় যদিও কখনও কখনও তাঁর কবিতা চোখে পড়েছে, কিন্তু অনেকদিন তাঁর কোনও সংগ্রহ বেরোয় নি। কবিতাপ্রেমিকের পক্ষে সেটি ক্ষোভের ব্যাপার ছিল। এতদিনে 'সাত মহালে' অনেকগুলি কবিতা পেয়ে পাঠক অভাবনীয় সৌভাগ্যে কৃতজ্ঞ বোধ করে। 'সাত মহালে'র প্রথম মহালে দুর্লভ 'মিলিতা' পুনর্মুদ্রিত ক'রে প্রকাশক উচিত কাজ করেছেন।..." (পরিচয়, পৌষ-মাঘ ১৩৭৪)।

মূল্য চার টাকা

সিগনেট বুকশপ ॥ কলকাতা ১২

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায় কাজে বেরোতে হয়—কিন্তু চুল আমার এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার চুল পরিপাটি থাকে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল...চাহা চহিতি হাসার জন্য

কে'ও কেমিক্যাল কোং (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটী, পাটনা, কানপুর, কানপুর সেন্ট্রাল, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ

মনীষার কয়েকটি প্রকাশন

মার্ক্সের স্মৃতি ॥ পল লাফার্গ ০·২৫

ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ॥ ও. ইয়াখৎ

সমাজবিকাশের রূপরেখা ॥ মিত্রপলস্কি ও অন্যান্য
দুই খণ্ড ; প্রতিখণ্ড ২·৫০

ভারতবর্ষ ও রুশবিপ্লব ॥ শ্রীনিবাস সরদেশাই

রুশবিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন ॥ গৌতম চট্টোপাধ্যায়

চীন কোন পথে ? ॥ রজনী পাম দত্ত

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ১২

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

কবির ভণিতা

রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গ্রন্থের সূচনা-রূপে যেসকল মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্ররচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত সেই রচনাগুলি পাঠকের ব্যবহারসৌকর্যার্থ এই গ্রন্থে একত্র সংকলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

চিঠিপত্র ১

সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্রের সংকলন।
পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ। গ্রন্থশেষে মৃণালিনী-প্রসঙ্গ এই সংস্করণে নূতন সংযোজন। চিত্র-সংবলিত। মূল্য ৩.০০ টাকা।

চিঠিপত্র ১০

দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত পত্রের সংকলন। দীনেশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে লিখিত দীনেশচন্দ্রের পত্র চিঠিপত্রের এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় সংবলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

সংগীত-চিন্তা

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এবং সংগীত সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত। এর অনেকগুলি রচনাই ইতিপূর্বে গ্রন্থভুক্ত হয় নি। মূল্য ৭·০০ টাকা।

সচিত্র চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা প্রথম-প্রকাশ-কালে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সুষমামণ্ডিত যে চিত্রাবলী এই অপূর্ব কাব্যগ্রন্থখানিকে অলংকৃত করেছিল, সেই চিত্রগুলি-সহ একটি স্বতন্ত্র শোভন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি ভিন্ন রঙে মুদ্রিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

চতুষ্কোণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়-শ্রাবণ
১৩৭৫
ষষ্ঠ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা

সূচিপত্র

কার্ল হাইনরিখ মার্কস / মুরারি ঘোষ ১০
কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা / সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৯
কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব / হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৪৪
ভারত প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস / সুনীল সেন ৫৮
অপরিচিত মার্কস / জন লুইস ৬৬
মার্কস ও একালের মানবতাবাদ / অ্যাডাম শাফ ৭৪
মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী / শ্যামল চক্রবর্তী ৮৬
মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান / প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪
মার্কস এবং সর্বহারা শ্রেণী / পল সুইজি ১০৪
দাস কাপিটাল ও আমি / ক্রিস্টোফার হিল ১১৬
মার্কস ও মানবসত্তা / গৌতম সান্যাল ১২৪
কার্ল মার্কস ও অ্যালিয়েনেশন / সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৩৪
মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে / ব্যারোজ ডানহ্যাম ১৪৯
মার্কসবাদের সমালোচনা / দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫৫
মার্কসবাদ ও বিপ্লব / অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী ১৭১

মার্কস ও আধুনিক অর্থনীতি / অমিয় দাশগুপ্ত ১৯৪
'বুর্জোয়া' অর্থশাস্ত্রে মার্কসীয় প্রভাব / মার্টিন ব্রনফেনব্রেনার ২০২
মার্কসের ক্যাপিটাল / মরিস ডব ২১৭
কার্ল মার্কস ও নির্গমতত্ত্ব / অমলেন্দু গুহ ২৩০
সুন্দর ও কার্ল মার্কস / অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৪৭
কার্ল মার্কসের কবিতা / সমর সেন-অনূদিত ২৫৬ ক
মার্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী / রজনী পাম দত্ত ২৫৭
'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে / দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৯
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ / জোসেফ নীডহ্যাম ৩০০
কার্ল মার্কসের জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি ৩২৪
কার্ল মার্কসের রচনাবলি ৩৩২
বাংলায় মার্কস-চর্চার দিক্‌নির্ণয় ৩৪৮
সম্পাদকের কথা ৩৫৭

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সম্পাদক
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয়
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯

এক্ষণ

কার্ল মার্কস

সংখ্যা

১৯৬৮

মুরারি ঘোষ

কার্ল হাইনরিখ মার্কস

রাইন উপত্যকায় মোজেল নদের দক্ষিণ তীরে প্রাশিয়ার এক প্রাচীন শহর ট্রিয়ের। এই শহরে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ৫ মে কার্লের জন্ম ; পুরো নাম কার্ল হাইনরিখ মার্কস। কার্লের বয়স যখন ছয় তখন এই ইহুদি পরিবার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে। কার্লের পিতা হার্শেল লেভি নতুন নাম গ্রহণ করলেন হাইনরিখ মার্কস। তখনকার ইহুদি সমাজের নানা গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাই এই ধর্মত্যাগের কারণ। কার্লের মায়ের নাম হেনরিয়েটা, তাঁর আটটি সন্তান। কিন্তু শেষপর্যন্ত জীবিত ছিলেন কার্ল ও তাঁর তিন বোন : সোফি, এমিলি ও লুইজি। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে মার্কসের লেখাপড়া শুরু হয়। তাঁর বাল্য-জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গণিত, ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রবন্ধ রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন কিশোর বয়সেই। ছাত্রজীবনে তাঁর ভ্রমণশীলতা ছিল উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা সুবিদিত। এ-ব্যাপারে কার্লের পিতা, ও বিশেষত, তাঁর পিতৃবন্ধু লুডভিক্ ফন্ ভেস্টফালেনের প্রভাব স্মরণীয়। উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী ভেস্টফালেন ছিলেন শিক্ষায় ও মতামতের ঔদার্যে সেই

শ্রেণীর প্রতিনিধি যাঁরা উনিশ শতকের প্রথম দিকে জার্মানির সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন : গ্যয়টে, শিলার ও হোল্ডারলিনের প্রত্যক্ষ প্রভাব যাঁদের জীবনে, যাঁরা দান্তে-হোমার-শেক্সপিয়র ও তৎসহ গ্রীক নাট্যকারদের সৃষ্টিতে আকণ্ঠ আপ্লুত। এই ভেস্টফালেনের কাছেই ঈসকাইলাস, শেক্সপিয়র ও সার্ভেন্টিসের সঙ্গে কার্লের প্রথম পরিচয়। বিদ্যালয়ের শেষ কয়েক বছর মার্কস এইভাবে মূল্যবান ও মনোরম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজের রুচি ও মানসিকতা গঠন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মার্কস তাঁর

ডক্টরেট থিসিস্ ভেস্টফালেনকেই উৎসর্গ করেন। আর ভেস্টফালেনের কন্যা—ট্রিয়েরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী—জেনি-কে পরবর্তী জীবনে মার্কস বিবাহ করেছিলেন।

সতেরো বছর বয়সে মার্কস বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। আঠারো বছর বয়সে মার্কসকে কিছুটা অস্থিরচিত্ত ও সাময়িক দোদুল্যমান মনের অধিকারী মনে হয়, কিছুটা বহির্মুখীও। একদিকে গ্লেগেলের কাছে হোমারের পাঠ, গ্রীক ও লাতিন কবিতার আস্বাদ গ্রহণ, জুরিসপ্রুডেন্স ও পলিটিকাল ইকোনমি অধ্যয়ন, অন্যদিকে জেনির প্রতি নবোন্মেষিত অনুরাগ।

মার্কসের চেয়ে জেনি চার বছরের বড়—তার দিদি সোফিয়ার সখী। জেনির পিতা বিত্তশালী, সে-তুলনায় মার্কস দরিদ্রসন্তান। তাই প্রেমের পথ মসৃণ ছিল না। অবশ্য কঠিন আদর্শবাদী ও পরিশীলিত মননের অধিকারী ছিলেন মার্কস সেই কৈশোর থেকেই। আর জেনি ছিলেন চিরদিন তাঁর প্রেরণাদাত্রী।

পিতার পরামর্শে বন্ থেকে মার্কস যোগদান করলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে তখন দার্শনিক হেগেলের রাজত্ব। তাঁর পদতলে বসে যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লুডভিগ ফয়েরবাখ, ডেভিড স্ট্রাউস্, ব্রুনো বাউয়ের। পিতার ইচ্ছা মার্কস আইনশাস্ত্রে পারঙ্গম হবেন। আইন তখন জার্মানির ছাত্রদের কাছে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার রাস্তা খুলে দিয়েছে। সরকারি কাজে কর্মে আইনজ্ঞ ছাত্রদের বড় চাকরি বাঁধা থাকত।

মার্কস আইন পাঠে মন দিলেন, কিন্তু মন পড়ে রইল দর্শনে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পাঠ্যবস্তুতে। বার্লিনে মার্কসের শিক্ষাজীবন এমন কিছু উজ্জ্বলতর হল না। এখানেই পরিচয় হল তরুণ হেগেলপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে। হেগেলপন্থী তরুণ বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন ছিল DOKTOR KLUB। র‍্যাডিকাল চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তরুণ বুদ্ধিজীবীরা মিলিত হতেন এখানে। হেগেলের শিষ্য বলেই নিজেদের তাঁরা পরিচয় দিতেন।

শুধু এই তরুণ বুদ্ধিজীবীরাই নয়, প্রায় সমস্ত জার্মানিই তখন হেগেলীয় দর্শনে প্রভাবিত। হেগেলের দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। হেগেলের দার্শনিক অনুজ্ঞার অংশবিশেষ সরকারি কার্যাবলির সমর্থনে সুযোগমতো লাগিয়ে জার্মান রাজতন্ত্রের সমর্থক জমিদারতন্ত্র ও সেনেট সরকারের দমননীতির একটা স্থায়ী ব্যাখ্যা তৈরি রেখেছিলেন।

প্রচলিত অবস্থাকে দর্শনের পদ্ধতি দিয়ে সমর্থন করে হেগেল জার্মান রাজতন্ত্রকে বাঁচবার হাতিয়ার যুগিয়েছেন। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনের গতিময়তার দিকটি রক্ষণশীলদের কাছে পরিত্যক্ত ছিল। কেননা হেগেল বলেছিলেন যে-কোনো এক সময়ে বাস্তব অবস্থা অবাস্তব হয়ে যেতে পারে, তখন তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। এমনিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে ফরাসি রাজতন্ত্র। ফরাসি রাজতন্ত্রের যতদিন অস্তিত্ব ছিল ততদিন সেই অস্তিত্বের পেছনে যুক্তি ছিল।

হেগেলের দর্শনের মধ্যে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখা যায়। একটি ধারায় দেখি বাস্তব অবস্থা যে-কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। অপরদিকে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে জগৎসংসারের গতিময়তার ব্যাখ্যা স্বীকার করা। শেষোক্ত বৈপ্লবিক দিক তরুণ হেগেলপন্থীদের আকর্ষণ করেছিল। বার্লিনে এঁদেরই নেতা ব্রুনো বাউয়ের, কোপ্পেন, স্ট্রাউস্, ফয়েরবাখ। জার্মান রক্ষণশীলতার যথাযথ বিরোধিতা এল এঁদের কাছ থেকেই।

প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বিরোধিতায় যখন তরুণ হেগেলপন্থীরা তাঁদের বক্তব্যে শান দিচ্ছেন তখনই মার্কস এসে পড়লেন তরুণ হেগেলীয়দের সংগঠনে। আর্নল্ড রুগ-র সম্পাদনায় তরুণ হেগেলীয়দের মুখপত্র 'হ্যালে বার্ষিকী' (*Hallische Jahrbücher*) প্রকাশিত হল (১৮৩৮)। পত্রিকাটি জন্মমাত্রেই প্রচলিত রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরোধিতা শুরু করল। বাউয়ের ও কোপ্পেনের সঙ্গে মার্কসও সংকলনে লেখা শুরু করলেন। পরিচয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বাউয়ের মার্কসের মনীষার যথাযথ পরিচয় পেলেন। বিশ বছরের এই ছাত্রটিকে তখনি দলের নেতৃত্বের মর্যাদা দিতে হল। আর সে-মর্যাদার মূল্য দিতে মার্কস দ্বিধা করলেন না।

খ্রীস্টান গস্‌পেলের প্রথম সমালোচনা করেছিলেন স্ট্রাউস্। পরে আরো কঠিন সমালোচনায় বাউয়ের তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। বাউয়ের বললেন বাইবেলীয় গল্প-গাথার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তিই নেই। ওগুলি নিছক গল্প – খ্রীস্টধর্মের উৎপত্তি ঈশ্বরের বা যিশুর কোনো লোকোত্তর মহিমায় নয়। বাউয়ের তখন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। স্বভাবতই তিনি কর্তৃপক্ষের বিষনজরে পড়লেন। কিন্তু মার্কসের সঙ্গে বিচ্ছেদ বাউয়ের চান না, বাউয়ের পরামর্শ দিলেন মার্কস পড়াশুনা শেষ করে 'ডক্টরেট' ডিগ্রি নিয়ে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি গ্রহণ করুন, বন্ থেকে দুজনে র‍্যাডিকাল মতামতের এক সাময়িকপত্র বার করবেন।

এদিকে মার্কসও বিদ্রোহী হেগেলপন্থী রূপে র‍্যাডিকাল মতামত ও নাস্তিকবাদে দীক্ষা নিয়েছেন। গবেষণাগ্রন্থে দার্শনিক মতামতে মার্কস নিজস্ব প্রত্যয় থেকে এক তিলও নেমে আসতে রাজী নন। অথচ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের গবেষণাকর্মের পরীক্ষক হবেন তাঁর মতামতের চূড়ান্ত বিরোধীরাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় বদল করে ১৮৪১ সালে মার্কস জেনা থেকে স্নাতকোত্তর গবেষণার ডিপ্লোমা পেলেন।

মার্কসের বিষয় ছিল ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য। মূলত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মের সামাজিক ভূমিকা নব্য-হেগেলবাদী মার্কসকে বস্তুবাদী গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করে। হেগেল-পন্থী দার্শনিক অদ্বৈতভাবনা ও ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে নব্য-হেগেল-

পন্থীদের সেকালে তাই ছিল বিতর্কের বিষয়। সম্পূর্ণ বস্তুগত ধারণায় ঈশ্বরকে নামিয়ে আনার চেষ্টা ইয়োরোপে প্রথম দেখা যায় ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের চিন্তায়।

নব্য-হেগেলবাদীরা যখন নিছক ধর্মতত্ত্বের মধ্যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগে মগ্ন রয়েছেন মার্কস তখন চূড়ান্ত বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের সংযোগ ও বিরোধিতার ব্যাখ্যা রচনায় মন দিলেন। আর, স্বাভাবিক কারণেই মৌলিক স্রষ্টাদের দিকে মার্কসের দৃষ্টি পড়ল – গ্রীক বস্তুবাদের দুই উদ্ভাবক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনে।

ডিমোক্রিটাস বলেছেন শূন্য থেকে কোনো কিছুর উৎপত্তি হতে পারে না – কোনো কিছুই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় না, এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় রূপান্তর ঘটে এবং বিনা কারণে ও বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছু ঘটে না। জগতের আদিতে রয়েছে পরমাণু, পরমাণু থেকেই জগতের সবকিছুর উৎপত্তি। পরমাণু সকল সময়ে গতিশীল। তবে পরমাণুর গতির পেছনে প্রকৃতিগত কারণ রয়েছে। পরমাণুর সবকিছুই প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। যেহেতু পরমাণু দ্বারা মানুষের জীবন গঠিত, মানুষের জীবনও প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত। পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছা নেই, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

এপিকিউরাস এই পরমাণুবাদ গ্রহণ করলেও বিপরীতভাবে পরমাণুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বীকৃতি দিয়েছেন। আরো দেখিয়েছেন যে মানুষের জীবন স্বাধীন ও স্ব-ইচ্ছায় চালিত। প্রকৃতির অনড় ও অবিচল নিয়মের অসহায় ক্রীড়নক হিসেবে তিনি মানুষকে দেখেন নি। মানুষ আপন ইচ্ছায় জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে। পরমাণু দিয়ে গঠিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে ডিমোক্রিটাস ধর্মতত্ত্বের লোকোত্তর মহিমা স্বীকার করেন না। ডিমোক্রিটাসের এই ব্যাখ্যা এপিকিউরাস গ্রহণ করেছেন। এপিকিউরাস আরো এগিয়ে এসে বলতে চেয়েছেন মানুষের কোনো ব্যাপারে দেবতারা হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের ইচ্ছা ভগবানের দ্বারা পরিচালিত নয়। ডিমোক্রিটাসের প্রত্যয় থেকে মুক্ত করে এপিকিউরাস মানুষকে স্বাধীন ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিলেন।

মানুষের ইচ্ছার পরবশ্যতা বা জড়ত্ব মার্কসের কাছে স্বীকৃত তথ্য নয়। মার্কসের কাছে মানুষ চিরকালই আপন ভাগ্যবিধাতা। এই কারণেই নানা প্রসঙ্গে ডিমোক্রিটাসের প্রতি বিরূপ মন্তব্যে মার্কসের উৎসাহ দেখা গেছে। তুলনায় এপিকিউরাস মার্কসের প্রত্যয়ে আরো গ্রহণযোগ্য। যে-সময়ে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেবতা বা ঈশ্বর মানুষের ভাগ্যের সিঁড়ি তৈরি করে দেয়, সেই কালে মার্কস প্রচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে বলছেন 'যত দেবদেবী আছে সকলকেই আমি ঘৃণা করি।' গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকার একাংশে মার্কসের এই উক্তি।

ধর্মতত্ত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা থেকে মার্কস সরাসরি চলে এসেছেন বস্তুজগতের

প্রগতিবাদে, যেখানে মানুষ স্বয়ং আপন ভাগ্যনির্মাতা। এ ব্যাপারে মার্কস কিন্তু হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্সের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। মোটামুটি বস্তুবাদী ডায়ালেকটিক্সের রীতিনীতি মার্কসের আপন ব্যাখ্যায় যুক্তি যুগিয়েছে। একেবারে নিজস্ব পন্থায় মার্কস বলতে চেয়েছেন : ধর্ম নয়, ঈশ্বর নয়, দর্শন থেকেই মানুষ আপন ভাগ্যপরিবর্তনের রসদ জোগাড় করে নেবে। দর্শন থেকেই আসবে বাস্তব জগৎ সম্পর্কিত ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি – যার শক্তিতে মানুষ জীবন ও জগৎকে প্রয়োজনমতো বদলে নিতে পারবে। মনোগত চেতনা থেকে জন্ম নেবে জাগতিক বিদ্রোহ। দর্শন যেন পুরাণের প্রমিথিয়ুস – স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে মানুষের জীবনে বিপ্লব এনে দেবে। গবেষণা গ্রন্থের মুখবন্ধে মার্কস বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের এই উল্লেখ রেখেছেন। কিন্তু তখন কে জানত, মার্কস নিজেই আধুনিক কালের প্রমিথিয়ুস, যিনি একদিন পুরাণের দুরন্ত প্রমিথিয়ুসের মতো ভাগ্য জয় করার চিরকালীন হাতিয়ার মানুষের হাতে তুলে দেবেন!

মার্কসের পি. এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ হল। কিন্তু কতকগুলো ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গেল যা প্রত্যাশিত ছিল না। খ্রীস্টধর্মের সমালোচনা করে বাউয়ের-এর দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হলে লেখকের উপর শিক্ষাজগতের রোষ বেড়ে গেল। বন্ থেকে বাউয়ের-এর চাকরি গেল। এমন কি বাউয়ের-এর শিক্ষকতার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল। ফলে, শুধু বাউয়ের নন, মার্কসও চোখে অন্ধকার দেখলেন।

মার্কসের সামনে একটাই পথ খোলা রইল – সাংবাদিকতা। ছাত্রজীবনেই সাংবাদিকতায় মার্কসের দীক্ষা হয়েছিল। রুগে-র সম্পাদনায় তরুণ হেগেল-পন্থীদের মুখপত্র 'হ্যালে বার্ষিকী'তে। রুগে-র পত্রিকা জন্মের আড়াই বছর বাদে বন্ধ হয়ে যায়। রুগে ড্রেসডেনে গিয়ে নতুন সাময়িক পত্রের জন্ম দিলেন – 'ডয়েশ্চে ইয়ারবুখের'। মার্কসের একাধিক আলোচনা 'ডয়েশ্চে ইয়ারবুখের'-এ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু বছর না ঘুরতেই প্রাশিয়ান সরকার পত্রিকার কণ্ঠরোধ করলেন।

একটি কি দুটি পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে নতুন যুগের চিন্তাধারা রোধ করা যায় না। নব্য-হেগেলবাদীদের রাজনৈতিক মতামত ততদিনে পরিণত আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকায় নব্য-হেগেলবাদীরা এসে জড়ো হলেন। এলেন মার্কস, বাউয়ের, কোগেন, ম্যাক্স স্টার্নার, হেস, হারক্সেগ। পত্রিকা আরম্ভের দশমাস পর 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন মার্কস।

দায়িত্ব পেয়ে মার্কসের কলম আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তাঁর চিন্তা তখন প্রখর রাজনীতির দিকে ঝাঁক নিয়েছে। এই রাজনীতি প্রতিবাদমুখর ছিল সরকারি অব্যবস্থা, নিপীড়ন আর দমননীতির বিরুদ্ধে। মার্কসের হাতে পড়ে পত্রিকার সরকারবিরোধী রূপ আরো তীব্র হয়ে উঠল। সরকারি সেন্সরশিপের বিরোধিতা,

ভায়েটের রাজনীতির সমালোচনা, মোজেলের আঙুরচাষীদের সমস্যা, দরিদ্র অরণ্যবাসীদের কাষ্ঠসংগ্রহের অধিকার ইত্যাদি মার্কসের লেখনীতে তীব্রভাষায় মুখর হয়ে উঠল। ১৮৪৩-এর মার্চে পত্রিকার কণ্ঠরোধ করা হল, মার্কসের চাকরি গেল। মনে রাখতে হবে, নিষ্কলুষ মানবতার প্রেরণাই তখন মার্কসকে চালিত করেছিল—তখনো কোনো তত্ত্ব বা বিশেষ কোনো দার্শনিক চিন্তার প্রেরণায় মার্ক্স উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন নি, শুধু সাধারণ নীতিবোধের ভিত্তিতে দুস্থ সাধারণ মানুষের প্রতি সমবেদনায় সরকারি দমননীতির সমালোচনা করে এসেছেন।

এইবার নতুন উদ্যমে পড়াশুনা করতে গিয়ে মার্কস সাক্ষাৎ পেলেন সাঁ সিমঁ-র, প্রুধোঁ-র। ফরাসি সমাজতান্ত্রিকদের চিন্তার বিশেষত্ব তাঁর চোখে পড়ল। এরই মধ্যে এক সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের নাতিস্পষ্ট আভাস তিনি পেলেন।

ইতিমধ্যে জেনির পিতৃদেব ব্যারন ভেস্টফালেন পরলোকগমন করেছেন। তাঁর অবর্তমানে অনেক বাধা অতিক্রম করে মার্কস জেনিকে বিবাহ করলেন। এর পর দুজনে চলে গেলেন ফরাসি দেশে—পারিতে।

পারিতে তখন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মেলা বসেছে। বার্লিনে বা বনে যা সম্ভব নয়—পারিতে তা সম্ভব। মার্কস ও রুগে দুজনই পরিকল্পনমতো পারিতে গিয়ে হাজির হলেন। হাইনে, বাকুনিন, প্রুধোঁ, কাবে-র মতো তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তখন ফ্রান্সের চিন্তাজগৎ উজ্জ্বল করে রয়েছেন। পত্রিকা বেরুল—নামকরণ হল, 'ডয়েশ্চে ফ্রান্ৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের'। লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অনেককেই পাওয়া গেল—মার্কস, রুগে, হাইনে, বাকুনিন, হারন্সেগ, ফয়েরবাখ। আর একটি নতুন শক্তিশালী লেখকের সাক্ষাৎ মিললো—ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস।

পত্রিকাটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। কারণ, প্রথমত, আর্থিক সংগতি ছিল না। দ্বিতীয়ত, সম্পাদক দুজনের মতের অমিল দেখা গেল। মার্কস যখন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হতে চলেছেন, রুগে উল্টোপথ নিলেন, ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের শত্রুপক্ষের দর্শনে আকৃষ্ট হতে শুরু করলেন। শেষপর্যন্ত রুগেই সম্পর্ক ছিন্ন করতে আগ্রহী হলেন।

'ডয়েশ্চে ফ্রান্ৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় মার্কসের দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। একটি, 'হেগেলীয় অধিকার দর্শনের আলোচনা', দ্বিতীয়টি, তৎকালীন 'ইহুদি জীবনের সমস্যা' সম্পর্কে। আপাতদৃষ্টিতে রচনা দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে বোধ হবে না। কিন্তু বিষয়বস্তু আলাদা হলেও রচনা দুটির বক্তব্যে আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রচণ্ড মিল রয়েছে। মার্কসের মানসিক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট স্তর রচনা দুটির মধ্যে লক্ষণীয়। এই দুটি রচনা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাবে সমাজ-সম্পর্কিত কোন্ ধ্যানধারণায় মার্কসের মনের গতি পরিণতি লাভ করতে চলেছে। প্রথম প্রবন্ধ থেকে মার্কসের ধারণামতো নিবিত্ত মানুষদের শ্রেণীসংগ্রামের কথা মোটামুটি জানা যাবে। দ্বিতীয় রচনায় সমাজ-

তান্ত্রিক সমাজের অস্পষ্ট কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায়। এই দুটি রচনাই আমাদের চোখ তুলে ধরবে ভবিষ্যতের কার্ল মার্কসের পরিণত চিন্তার আভাস।

প্রথম রচনায় মার্কস দেখিয়েছেন ধর্মের সমালোচনা নিছক ধর্মের ব্যাপার নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনার মধ্য দিয়ে ধর্মের যথার্থ সমালোচনা সম্ভব। ফয়ের বাখের প্রভাব এখানে লক্ষ করার মতো। এই রচনাতেই প্রথম দেখা গেল মার্কসের আলোচনা আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে চাইছে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার এই প্রথম প্রয়োগ মার্কস নিজের রচনাতে দেখাতে চাইলেন। মার্কস বললেন শ্রমশিল্প ও পার্থিব সম্পত্তির সঙ্গে রাজনীতির যোগ রয়েছে ; আর, তার থেকেই আধুনিক কালের প্রধান প্রধান সমস্যার জন্ম হচ্ছে।

দ্বিতীয় রচনাটি মূলত বাউয়ের-এর এক নিবন্ধের সমালোচনা। ইহুদিদের সামাজিক মুক্তির উপায় হিসেবে বাউয়ের বলেছিলেন, জাতীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে ইহুদিদের পরিত্রাণ নেই। মার্কস কিন্তু ধর্মীয় সমাধানের পথে গেলেন না। মার্কস বললেন সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। ধর্মের প্রভাবের থেকেও ইহুদি সমাজের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে সমাজের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্ম। ইহুদিদের সামাজিক মুক্তি এই সব ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে। নতুন ধরনের সামাজিক শক্তির জন্ম দিয়ে নতুন সমাজ সংগঠনের সাফল্যে ইহুদি সমাজের মুক্তি। এই মুক্তির চেষ্টা মানুষের হাতেই রয়েছে। মোটামুটি একটা অতিস্পষ্ট বিশ্লেষণে এই প্রথম কার্ল মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কথা বলেছেন।

ফ্রান্স ইয়োরোপের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গ। এখানে থাকার সুযোগ মার্কস হেলায় হারালেন না। হেলভেশিয়াস ও হলবাখের বস্তুবাদ, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি, জোসেফ প্রুধোঁ-র নৈরাজ্যবাদ, ফুরিয়ের ও বাবুফের ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, গিজো-র ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি মার্কসের দিনরাতের অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠল। গভীরভাবে পড়াশুনায় ডুবে গেলেন মার্কস। পারি-র আকাশ-বাতাস সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় মুখর। সমাজতন্ত্রের নব নব তত্ত্বে ও ব্যাখ্যায় চিন্তাশীল লেখকদের অভাব ছিল না। ফ্রান্সের চিন্তার জগৎ ভরে রেখেছিলেন অনেকেই। ছিলেন সাঁ সিমঁ-র শিষ্যেরা, ফুরিয়ের গোষ্ঠী, লেরু, ক্যাথলিক পুরোহিত ল্যামেনে, সিসমণ্ডি। শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রও বাদ ছিল না। বেরেঙ্গার-এর গীতি আর জর্জ সাঁ-র চমকপ্রদ উপন্যাস থেকেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারিত হতো।

সমাজতন্ত্রের এই সব ধারণার মধ্যে কোনোরকম সংগ্রামের কথা খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রায় প্রত্যেক তত্ত্বেই বিত্তবান শ্রেণীর মর্জির পরিবর্তনের প্রত্যাশা ছিল। আশা ছিল সমাজসংস্কারের চাপে বিত্তবান মানুষেরা একদিন-না-একদিন নিজেদের সম্পদ বণ্টনে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন।

সম্পদ বণ্টনের এই সরল যুক্তির ফাঁকিতে মার্কসের মন সাড়া দেয় নি। সমাজতন্ত্রের প্রচলিত তত্ত্বের সঙ্গে মার্কস সাঁ সিমঁ আর বাবুফের অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। মার্কসের সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কয়েকটি মৌল উপাদান সাঁ সিমঁ আর বাবুফের চিন্তার মধ্যে ছিল, মার্কস তা স্বীকার করেছেন। ফরাসি বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্রের কথা সাঁ সিমঁ বলেছেন। আরো বলেছেন যে মানুষের সমগ্র ইতিহাস খুঁজলে শ্রেণীসংগ্রামের নানা কাহিনী পাওয়া যাবে। পণ্য উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতি জড়িত থাকার কথাও সাঁ সিমঁ জানিয়েছেন। রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের তত্ত্ব সাঁ সিমঁ বিস্তারিত করেন নি, কিন্তু আভাস দিতে পেরেছেন। সাঁ সিমঁ-র ভাবনা থেকে মোটামুটি দুটি মৌল উপাদান মার্কস গ্রহণ করেছেন: ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় মার্কসীয় চিন্তার দুটি উপাদান – প্রথমটি, মানব-ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস এবং দ্বিতীয়টি, পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের গভীরতা। হলবাখ্ ও হেলভেশিয়াসের বস্তুবাদী দর্শন, বাবুফের বিপ্লব চিন্তা, সাঁ সিমঁ-র অর্থনীতি ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন ইউটোপিয়ান চিন্তাধারা, মার্কসীয় দর্শনের প্রাথমিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির সন্ধান দিয়েছে, যা একান্তভাবেই মার্কসীয়।

ইতিমধ্যে বিত্তহীন শ্রেণীর ভেতর থেকেও এমন মানুষদের আবির্ভাব হল যাঁরা নিজেদের সামাজিক মুক্তির চেষ্টায় তত্ত্ব ও নেতৃত্ব দুই-ই যুগিয়েছেন। লেরু, প্রুধোঁ – দুই চিন্তাবিদই শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তত্ত্বগত চিন্তায় সমমতাবলম্বী না হলেও দুজনের প্রতিই মার্কস শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এঁদের তাত্ত্বিক উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা মার্কস নেন নি। মার্কস ক্রমশ এক সামগ্রিক প্রকল্পের প্রান্তদেশে এসে পৌছালেন, যার মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতন্ত্রবাদ, সর্বহারা শ্রেণীর ভূমিকা ও পরিশেষে শ্রেণীহীন সাম্যবাদের ধারণা এক সমন্বয়ের মধ্যে থাকছে। সামাজিক মানুষের মুক্তির চেষ্টায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মার্কস ঐ সামগ্রিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

মার্কসের এই তাত্ত্বিক উপলব্ধির মৌলিকত্ব হল এর সামগ্রিকতায় – মৌলিকত্ব শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের ভবিষ্যৎ রূপকর্মকে এক প্রতীতির মধ্যে সমন্বিত করার চেষ্টায়। এই প্রতীতি এক নিবিড় দর্শন-চিন্তার হাতিয়ারে সমৃদ্ধ – হেগেল থেকে যার শুরু এবং পরিণতি ফয়েরবাখে। বিদ্রোহী হেগেলীয়দের তিনটি শাখার একটির প্রেরণা ফয়েরবাখ। স্ট্রাউস, বাউয়ের হেগেলীয় ভাববাদ থেকে সরে এসে যেখানে থেমে গিয়েছিলেন ফয়েরবাখের আরম্ভ সেখান থেকে। হেগেলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের নিত্যতায় বা নির্বুঢ় সত্তায় (Absolute Reality) প্রথম আঘাত দিয়েছিলেন স্ট্রাউস্। স্ট্রাউস্‌কে অতিক্রম করে গেলেন বাউয়ের। বাউয়ের হেগেলের পরমভাবের

(Absolute Idea) কোনো স্বীকৃতি দিলেন না, বরঞ্চ বাইবেল ও ঈশ্বরকে নেহাৎ লৌকিক পর্যায়ে টেনে নামালেন। আরো এগিয়ে এসে ফয়েরবাখ বললেন: 'ধর্মের জগৎ আসলে কোনো জগৎই নয়, নিছক কল্পনা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাবগত ও আদর্শগত পরিপূরক।'

ফয়েরবাখকে বলা হল হেগেলের নিয়তি। হেগেল বলেছেন বিশুদ্ধ ভাবের বিকাশ থেকে বিশ্বের জন্ম। বিশ্ব হল পরমভাবের প্রকাশ। কিন্তু ফয়েরবাখ বললেন, প্রাথমিক সত্য হল মানুষ ও মানুষের জগৎ। জাগতিক বিকৃতি ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ধর্মের উৎপত্তি। ধর্মের ধারণা ও তত্ত্ব মানুষেরই তৈরি। মানুষ তার আদর্শ সত্তাকে ধর্মের প্রতিচ্ছায়ায় স্থাপন করে দেখে। ধর্ম কোনো প্রকৃত সত্তাকে উন্মুক্ত করে না। আসলে হেগেলের পরমভাবের নিত্যতায় বিশ্বাস রাখলে ইতিহাসের গতিশীলতায় আস্থা হারাতে হয়। হেগেলকে অনুসরণ করলে মানুষের ভাগ্য পরমভাবের ইচ্ছার সঙ্গে বাঁধা রাখতে হয়—মানুষের ভাগ্য জয় করার চেষ্টায় তখন ইতি পড়ে, চরম নিয়তিবাদে শেষ হয় সমাজ ও সভ্যতার প্রগতি।

হেগেলের সংঘাতের পদ্ধতি ব্যবহার করেই ফয়েরবাখ খ্রীস্টধর্মের অবাস্তবতা দেখিয়েছেন। ফয়েরবাখ দেখালেন, হেগেলের দর্শনকে সঠিক ব্যাখ্যা করলে হেগেলের নিজস্ব যা প্রতিপাদ্য, পরমভাব, তা আর ধোপে টেকে না—অথচ হেগেল নিজস্ব যুক্তির ফাঁক দিয়েই পরমভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন। হেগেলের চিন্তায় পরস্পরবিরোধী প্রত্যয়গুলি ফয়েরবাখ উন্মুক্ত করে দিলেন হেগেলীয় বিচারপদ্ধতির রীতি মেনেই। তবু মার্কস দেখলেন ফয়েরবাখ এক জায়গায় এসে থেমে গেছেন। সেটা তাঁর প্রধান ত্রুটি তা হল ফয়েরবাখ বস্তুকে কেবল বস্তু হিসেবেই বিচার করেছেন—মানুষকে নিছক বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসেবে।

ফয়েরবাখের সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির অমিলটুকু বুঝতে পারলে মার্কসের মৌল প্রত্যয়গুলি ধরতে কষ্ট হয় না। মানুষকে সম্পূর্ণ বিমূর্ত বা ভাবমূলক পরিবেশে না দেখলেও ফয়েরবাখ মানুষকে জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন—জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বের ধারণা হিসেবে। কিন্তু মার্কস দেখতে চাইলেন বাস্তব মানুষকে, মনুষ্যত্বের ধারণাকে নয়, যে মানুষের সত্তা পরিবেশ-প্রভাবের চাপে বিমূর্ত থাকে না, ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে—বিশেষ করে আর্থিক ক্রিয়াকলাপের পরিবেশে অবস্থিত মানুষকে, আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের পরিণতি স্বরূপ মানুষকে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানবদর্শনের বিচারে মার্কসকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে। এই উত্তর খোঁজার তাগিদে মার্কসের কাছে সমাজকাঠামোর ছবি পরিষ্কার ধরা পড়ে। দর্শনবিচারের সঙ্গে আর্থিক ক্রিয়া-কলাপের এই নিবিড় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়াই মার্কসের মৌলিকত্ব। বিচ্ছিন্নভাবে

মনুষ্যসত্তাকে খোঁজার প্রবণতা ছিল না বলেই মার্কস সামাজিক সম্পর্কের রূঢ়তা থেকে, অন্যায় থেকে মানবমুক্তির প্রশ্ন তুলতে পেরেছিলেন। দর্শনের ভাবমূলক পথ থেকে বাস্তব ক্রিয়াকলাপের পথে—বাস্তব কার্যক্রমের সঠিক রাস্তায় দর্শনকে নামিয়ে এনেছিলেন। মার্কস বললেন মানুষকে বিচার করতে গেলে দর্শন আর নির্লিপ্ত চিন্তাসমষ্টিরূপে প্রকাশ পায় না—দর্শন হয় তখন 'প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন'।

প্রসঙ্গত দর্শনের আলোচনা থেকে মার্কস যুক্তিসংগতভাবে চলে এলেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিবিধ প্রশ্নে। মার্কস তাঁর প্রথম অর্থনৈতিক বক্তব্য রাখলেন '১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'-তে। এই অর্থনৈতিক আলোচনাতেও মার্কস ফয়েরবাখের প্রভাব এড়াতে পারেন নি। ফয়েরবাখের কতকগুলি দার্শনিক প্রত্যয়ও [প্রাকৃতিকতা (Naturalism), মানবতাবোধ (Humanism), বিযুক্তি (Alienation)—অবশ্য এই সব প্রত্যয়গুলি যথাসাধ্য পরিবর্তিত অর্থে নিজস্ব মতে মার্কস ব্যবহার করেছেন] মার্কস অর্থনীতির আলোচনাতে ব্যবহার করেছেন। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য 'বিযুক্তি' প্রত্যয়টি। অবশ্য হেগেলীয় দর্শনেই প্রত্যয়টির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। মার্কস কিন্তু প্রত্যয়টিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আলোচনায় সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছেন।

মার্কস বিযুক্তির প্রশ্নকে শ্রেণীসমস্যা রূপে দেখিয়েছেন। তিনি দেখালেন, শ্রমিক আপন শ্রমের পূর্ণ মূল্য পায় না, অর্থাৎ নিজের শ্রম থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে। এই বিযুক্ত শ্রমের দখল পায় পুঁজিপতি। শ্রমিকের বিযুক্ত শ্রম পুঁজিপতির সম্পদ স্ফীততর করে তোলে। শুধু তাই নয় উৎপাদনব্যবস্থার উপর শ্রমিকের দখল না থাকায় শ্রমিকও উৎপাদনব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত থাকে। এই বিযুক্ত শ্রমের প্রশ্ন থেকেই মার্কস বুর্জোয়া সমাজের অর্থশাস্ত্র ও ধনতন্ত্রব্যবস্থার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন।

অর্থনীতির আলোচনায় এইবারে মার্কস একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করলেন—সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এতদিনের পুঁথিগত শিক্ষায় মার্কস যা জেনেছিলেন তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রবাদ। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা রচিত হয় নি, মার্কসের মন তাতে সায় দেয় নি। সমকালীন আর্থিক পরিমণ্ডল বলতে তৎকালীন পণ্য উৎপাদনপ্রণালী, শ্রমের মূল্য, মুনাফা, সঞ্চিত পুঁজির ভূমিকা, ব্যক্তিগত মালিকানা—এই সবের সঙ্গে সমাজের যোগ বোঝায়। সমাজ অর্থে সামাজিক মানুষের উপর এদের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রচলিত আর্থিক পরিমণ্ডলের প্রথম বিশ্লেষণ করেছিলেন এঙ্গেলস।

এঙ্গেলসের 'আউটলাইন্‌স অফ এ ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি' ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাধারণ সমালোচনার এক কাঠামো মাত্র, তবু এই রচনা

মার্কসের কাছে অনেকটা পথনির্দেশকারী ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানায় ও পুঁজির শাসনে সমাজের সঠিক চেহারা এঙ্গেলসই প্রথম তুলে ধরতে পেরেছিলেন। এঙ্গেলসই মার্কসকে বৃটিশ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও রিকার্ডোর অর্থনীতির দিকে আকৃষ্ট করেছেন। এই সূত্রে স্মরণীয়, রিকার্ডোই প্রথম বলেছিলেন যে, পণ্যের মূল্যকে দুভাগে ভাগ করা যায়, শ্রমিকের শ্রমের মূল্য ও মুনাফা। এই তত্ত্বকে মার্কস আরো বিস্তৃত করেছিলেন। ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিতে মার্কস যথার্থই ইঙ্গিত দিতে পেরেছিলেন যে প্রচলিত পণ্য উৎপাদনপ্রণালীর পরিবেশে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজির দুষ্ট প্রভাবে একদিন বিপ্লব জন্ম নেবে—আর এই বিপ্লবই ধনতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে।

১৮৪৫-এর জানুয়ারিতে মার্কস পারি থেকে বিদায় নিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল 'পবিত্র পরিবার'—মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ রচনা। পারি-র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশের মধ্যে লেখা এই রচনাটি মূলত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা।

বাউয়ের একদা বামপন্থী হেগেল-শিষ্যদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। হেগেলীয় বামপন্থার সঙ্গে বাউয়ের-এর যোগাযোগ শেষপর্যন্ত টিকে রইল না। যদিও বাউয়ের পরমভাবের সনাতন ঐতিহ্যে বিশ্বাস না রেখে পরিবর্তন বা বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু বাউয়ের-কথিত বিপ্লব জনগণের নেতৃত্বে সম্পন্ন হবে না। বাউয়ের-এর মতে শুদ্ধ বুদ্ধি বা চেতনার জাগরণ সমাজে এই বিপ্লব আনবে, এর জন্য কোনো কার্যক্রমের, প্রচারের বা সচেতন চেষ্টার প্রয়োজন নেই। শুদ্ধ চেতনার প্রভাব যেদিন মানুষের উপলব্ধিতে আসবে, সেই দিনই মানুষের মনের অন্ধকার দূর হয়ে সত্যিকার বিপ্লবের জন্ম হবে।

বাউয়ের-এর সহযোগী ছিলেন তাঁর ভাইয়েরা—এডগার বাউয়ের ও এগবার্ট বাউয়ের। এর পর কয়েকটি নিবন্ধে বাউয়ের মার্কসকে কঠিন সমালোচনা করেন। মার্কস জবাব দিলেন 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থে। ভ্রাতাসহ বাউয়ের-পরিবারকে মার্কস ও এঙ্গেলস আখ্যা দিলেন : 'পবিত্র পরিবার'। বাউয়ের-এর পুরো নাম ব্রুনো বাউয়ের—তাঁকে আখ্যা দিলেন : 'সেণ্ট ব্রুনো'।

হেগেলের দর্শনে ভাবের প্রাধান্য থাকলেও ভাবের সঙ্গে জগৎ অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। বাউয়ের ভাব-কে বস্তু বা জগৎ থেকে আলাদা করে দেখালেন। বাউয়ের বললেন, ভাবনা বা চিন্তার প্রবাহ ইতিহাসের রূপান্তর ঘটায়—এ ক্ষেত্রে মানুষের সচেতন কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নেই, এ প্রসঙ্গে শ্রেণীভেদের তত্ত্ব কেবল গোলমালই বাড়াবে। মার্কস দেখালেন বাউয়ের-এর চিন্তায় গোড়াতেই গলদ। বস্তু বা জগৎ থেকে ভাব-কে আলাদা করা যায় না। ভাব-কে আলাদা করে দেখার অর্থ হল ভাববাদে ফিরে যাওয়া—পক্ষান্তরে নতুন ধর্মতত্ত্বের উদ্ভাবনায় সাহায্য করা। এই সূত্রে বাউয়ের গোষ্ঠী 'পবিত্র পরিবার' আখ্যায় ভূষিত হতে পারে।

দুটি প্রধান মূল বিষয় 'পবিত্র পরিবার' থেকে পাওয়া যায়। প্রথম, হেগেলীয় ভাববাদের সুনিপুণ সমালোচনা। দ্বিতীয়, মার্কস-কথিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। বলা চলে, 'পবিত্র পরিবার' রচনা থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিণত চিন্তার অগ্রগতি লক্ষণীয়।

মার্কসের সাংবাদিকতা জার্মান সরকারকে উত্যক্ত করে তুলেছিল, তাই জার্মান সরকারের চাপে ফরাসি সরকার মার্কসকে ফ্রান্স পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছিলেন। মার্কস এসে পৌছালেন ব্রুসেল্‌সে। কিছুদিন বাদে এঙ্গেলসও মিলিত হলেন মার্কসের সঙ্গে। দুজনে একসঙ্গে একটা বড় কাজে হাত দিলেন – 'জার্মান চিন্তাধারা' রচনায়। এ-প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন, তৎকালীন জার্মান চিন্তাধারার আলোচনার ফলে এঙ্গেলস ও তিনি নিজেদের ভাববৈশিষ্ট্য ও চিন্তা-সমষ্টি সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক বিন্যাসে স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এই সূত্রে ফয়েরবাখ, বাউয়ের, ম্যাক্স স্টার্নার ও জার্মান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের আলোচনা প্রসঙ্গে জাগতিক নিয়মের জটিলতায় ইতিহাসের প্রগতি ও আর্থিক বিকাশের যে বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে লেখকদ্বয় দিয়েছেন তাকে বলা চলে মার্কসীয় চিন্তার প্রথম সামগ্রিক বিন্যাস।

'জার্মান চিন্তাধারা'র প্রথম ভাগে রয়েছে ফয়েরবাখ-সম্পর্কিত আলোচনা। মানব ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা শুরু। এখানে দেখানো হয়েছে যে প্রকৃতি বা পরিবেশের প্রভাব যেমন মানুষের উপর সক্রিয় মানুষও পক্ষান্তরে প্রকৃতি বা পরিবেশকে বদল করে নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা সংগ্রহ করে। এই সংগ্রহের কাজে মানুষকে বিশেষ বিশেষ কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। মানুষের মুখের সামনে প্রকৃতি প্রতি-নিয়ত তার প্রয়োজনীয় বস্তু যুগিয়ে দেয় না। এক-এক যুগের এক-এক ধরনের কলাকৌশলের প্রয়োগে বা বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞানে মানুষ জীবিকানির্বাহ করে থাকে – যথা, পাথরের ধারলো হাতিয়ার, লাঙল, কাঠের বা ধাতুর তাঁতযন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র। প্রত্যেকটিরই বিশেষ প্রযুক্তিজ্ঞান ও তৎসহ সামাজিক পরি-প্রেক্ষিত রয়েছে। এগুলির ব্যবহারে মানুষ যেমন প্রকৃতি বা পরিবেশকে আয়ত্ত করতে পারে তেমনি পরিবেশের প্রভাবও মানুষকে গড়ে তোলে। পরিবেশ মানুষকে ক্রমাগত উন্নত কলাকৌশলের সন্ধানে প্রেরণা দেয় – পরিবেশ ও মানুষ উভয়তই সক্রিয়। ফলে দেখা যায় প্রযুক্তিজ্ঞানের ক্রমাগত পরিবর্তন ও উন্নতির সঙ্গে মানুষ ক্রমশ নতুন শক্তি ও পণ্য উৎপাদনের হাতিয়ারের সন্ধান পাচ্ছে। এ দুয়ের যোগাযোগে সামাজিক বিন্যাসেরও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। পণ্য উৎপাদনপ্রণালীর বদল হলে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের চেহারাও বদল হয়, নতুন শ্রম সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয় – ফলেই সামাজিক বিন্যাসের পরিবর্তন এসে পড়ে। ফয়েরবাখের নিষ্ক্রিয় অমূর্ত মানুষের ধারণা মার্কসের হাতে পড়ে সক্রিয় সামাজিক মানুষের ধারণায় পরিণতি পেয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের শেষার্ধে মার্কস বিস্তৃত করেছেন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সমাজসম্পর্কের স্বরূপ। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সামাজিক বিন্যাসের কারণ হল যুগোপযোগী উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সমাজসম্পর্কের অটুট বন্ধন। উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের যে প্রাথমিক সম্পর্ক তাকেই মূলত সমাজের আর্থিক কাঠামো বলা চলে। পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিনিময় ও বণ্টনব্যবস্থার ত্রিমাত্রিক বনিয়াদে রচিত সমাজের আর্থিক কাঠামো। এই আর্থিক কাঠামোর উপরেই সামাজিক সংবিধান, আইন ও রাজনৈতিক সংগঠন নির্ভরশীল এবং এ-সব কিছুর ভেতর দিয়েই যুগোপযোগী বিচ্ছিন্ন বা সম্পূর্ণ সামাজিক চেতনার উদ্ভব ঘটে। গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণে নেমেছেন। কার্ল গ্রুন, অটো লুনিং, হারমান পুটম্যান, মোজেস হেস, ম্যাক্স স্টার্নার—এইসব চিন্তাবিদদের চিন্তার অসংগতি তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

দুটি খণ্ড মিলিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের 'জার্মান ভাবধারা' মার্কসীয় তত্ত্বের এক সম্পূর্ণ চিত্র উদ্ঘাটন করেছে। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে মার্কসের প্রথম প্রতিষ্ঠা পারি-তে। ব্রুসেল্‌সে এসে মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই একসঙ্গে সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার সমস্ত সূত্রের সন্ধান পেলেন—'জার্মান চিন্তাধারা'য় তার সব কটিই বিধৃত হয়েছে।

ব্রুসেল্‌সে মার্কসের অবস্থিতি ছিল শর্তাধীন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শর্ত ছিল মার্কস বেলজিয়ান রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাবেন না। কিন্তু ব্রুসেল্‌সে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সুযোগ গড়ে উঠল। লণ্ডন, পারি ও বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগের ভৌগোলিক সুবিধা থাকায় বহু পলাতক বিপ্লবী ব্রুসেল্‌সে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের অধিকাংশই সাম্যবাদী চিন্তায় দীক্ষিত। লণ্ডনে, পারিতে ও ব্রুসেল্‌সে বিপ্লবী শ্রমিকদের কোনো-কোনো সংগঠন তৈরি হয়েছিল। মার্কস ও এঙ্গেলসের সাম্যবাদী চিন্তার সমস্ত সূত্র আর মৌলিক তত্ত্বগুলি ততদিনে পরিণতি লাভ করেছে। ইতিমধ্যে বাস্তব অবস্থার এই যোগাযোগ মার্কসের কাছে পরম কাম্য হয়ে উঠল—এর থেকেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সংগঠনের চিন্তার উদয়।

মার্কসের কাজ হল বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সংগঠনগুলোকে একটা সংযোগে মিলিত করা। বিশেষ করে লণ্ডনের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মার্কস যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। তাঁর নিজের উপলব্ধিগত তত্ত্বের বিস্তর আলোচনা নানান সমালোচনা প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করে লণ্ডনে পাঠাতে লাগলেন। লণ্ডনের সংগঠন সুষ্ঠু রূপ নিল 'দি কম্যুনিস্ট লীগ' নামে। মার্কসের একান্ত চেষ্টা সফল হল। কম্যুনিস্ট লীগের প্রথম কংগ্রেস আহূত হল লণ্ডনে ১৮৪৭ সালের জুনে। দ্বিতীয় কংগ্রেস নভেম্বরে। সম্মেলনে মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। তখনই মতবাদগত একটা তাত্ত্বিক খসড়ার প্রয়োজন

অন্তর্ভূত হল – যার ভিত্তিতে সংগঠনের আন্দোলন শুরু হতে পারে। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' (১৮৪৮) রচনার এটাই হল পশ্চাৎপট।

বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার বাস্তব চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস তাত্ত্বিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও দেখলেন। কেবলমাত্র কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে নয়, আন্দোলন গড়ে তোলার বিভিন্ন চেষ্টার মধ্যেও অনেক ভুলচুক বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছিল, অথচ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ইয়োরোপের দেশে দেশে নিবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর আগ্রহ ক্রমাগত প্রকাশ পাচ্ছে, শ্রমিক-সংগঠনও তৈরি হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকেই নেতৃত্ব দেবার মতো ব্যক্তিদের আবির্ভাব শুরু হয়েছে – যাঁরা সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব ও সংগঠন দুই-ই গড়ে তুলতে সক্রিয়, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে কোনো তত্ত্বই শেষপর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর যথাযথ হাতিয়ারে পরিণত হবে না। মার্কস দেখলেন এই সব বিচ্যুতি সম্পর্কে গোড়া থেকেই কঠোর মনোভাব না নিলে কোনোদিনই সমাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে না।

এই ধরনের বিচ্যুতি সম্পর্কে মার্কসের সঙ্গে প্রথম বিরোধ বাধলো প্রুধোঁর। প্রুধোঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হল 'দারিদ্র্যের দর্শন'। তিনি সম্পত্তি ও দারিদ্র্যের বিরোধের মধ্যেই সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্বের কথা তুললেন সম্পত্তি আসলে চৌর্যবৃত্তি। সামাজিক শ্রমবিভাগই শ্রমিকশ্রেণীকে ক্রমশ নিঃস্ব করে তুলছে। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সৎ ও অসৎ দুটি দিকই আছে – এই দুটি দিকের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব। আসলে এই বিরোধের অবসান হবে সমন্বয়ের মধ্যে – এর ফলশ্রুতি হল বস্তু বা ঘটনার মধ্যে অসততার অবসান এবং সততা ও ন্যায়ের জোরালো প্রতিষ্ঠা। অতএব প্রুধোঁর আবেদন ন্যায়পরতন্ত্রতায় – ভ্রাতৃত্বের আদর্শে। যেন কোনো-এক শুভ মুহূর্তে সামাজিক শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে, এবং ফলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনস্ফীতি ঘটবে না।

প্রুধোঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্কসের রচনা 'দর্শনের দারিদ্র্য' (১৮৪৭)। সম্পত্তি অনুসারে সমাজকাঠামোর গঠন প্রুধোঁ যেভাবে দেখিয়েছেন মার্কসের কাছে তা স্বীকৃত তত্ত্ব। কিন্তু বিরোধী চেতনার সমন্বয় থেকে প্রগতির নিরঙ্কুশ ধারণায় মার্কস নির্ভরশীল নন। ইতিহাসের বিশেষ স্তরে সমাজবিন্যাসের পরিণতি থেকে সামাজিক সৎ ও অসতের উদ্ভব। যতক্ষণ না সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ এক বিশেষ সামাজিক বিন্যাসের অন্তর্গত সৎ ও অসতের বিলোপ হতে পারে না। ধনতন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সমাজের নিকৃষ্ট দিকের পরিচয় বহন করে। শোষণ ও দারিদ্র্য যত বাড়তে থাকে, মুক্তি-আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব ও কর্মক্রম প্রখরতর হয়ে ওঠে। ফলে এই মধ্যবর্তী স্তরে সামাজিক বিরোধ তীক্ষ্ণ ও তীব্রতর হয়ে সামাজিক সংকটের জন্ম দেয়। প্রুধোঁ যা ধরতে পারেন নি তা হল এই যে, ক্রমবর্ধিত সামাজিক বিরোধে

শ্রমিকশ্রেণীই ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। ফলে, শ্রমিকশ্রেণীর উপরেই সমাজপরিবর্তনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়—যে পরিবর্তনে পূর্বেকার বিরোধগুলি আর থাকে না—পুরাতন সামাজিক সৎ ও অসতের বিলুপ্তি ঘটে।

সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ জুড়ে শুরু হয়েছিল বিপ্লবের তাণ্ডব। জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, ইটালির রাষ্ট্রাধিনায়কদের চরম একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ গণসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের বিপ্লব প্রায় সফলতার দুয়ারে, সিংহাসন ত্যাগ করে লুই ফিলিপের পলায়ন, জনবিক্ষোভের চাপে কিছুকালের জন্য জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সরকার টেকে নি—নতুন নির্বাচনে যারা ন্যাশন্যাল এসেম্‌ব্লির সদস্য হয়ে এলেন তাঁরা আগের সরকারের শ্রমিক-সহানুভূতি বজায় রাখতে পারলেন না। ফ্রান্সে অবশ্য একটা ব্যাপার ঘটল, তা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের সম্পূর্ণতা। এতকাল রাজতন্ত্র ও সামরিক তন্ত্রের চাপে ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ ছিল; ১৮৪৮-এর বিপ্লব ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিকাশের সব বাধা দূর করে দিল। বিপ্লবকালীন সময়ের কিছুদিন মার্কস পারিতে কাটালেন। এই সময়ে মার্চে মার্কস কম্যুনিস্ট লিগের সভাপতি (১৮৪৮) নির্বাচিত হলেন। জার্মানিতে তখন গণবিক্ষোভ বিপ্লবের আকার নিচ্ছে—মার্কসের পক্ষে জার্মানিতে প্রত্যাবর্তনের সুষ্ঠু সময়। কোলোন থেকে মার্কসের সম্পাদনায় 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ্' সাময়িক পত্র প্রকাশ পেল। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে এই নতুন পত্রিকা সমস্ত ইয়োরোপের গণ আন্দোলন পরিচালনার যোগ্য হয়ে উঠল। স্বভাবতই পত্রিকার আয়ুষ্কাল বেশিদিন হয় নি। জার্মানি থেকে মার্কস বিতাড়িত হলেন। এবার লণ্ডন প্রবাস। ফ্রান্সের বিপ্লবচেষ্টা নষ্ট হয়ে যাবার পর সমস্ত ইয়োরোপে চকিতে নেমে এল বিপ্লব-ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া।

এই ব্যর্থতার বিশ্লেষণ দিলেন মার্কস তাঁর 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' (১৮৫০) রচনায়। মার্কস বললেন ধনতন্ত্রের চরম বিকাশের আগে সামাজিক শ্রেণীযুদ্ধের কালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সাফল্যলাভ করে না। অবশ্য শ্রেণী হিসেবে, স্বাধীন সামাজিক শক্তির অধিকারী হিসেবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে এই প্রথম শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটল। এর প্রাথমিক লাভ শ্রেণীসমাবেশের সক্রিয় চেষ্টা। দেখা গেল ফ্রান্সে একদা যারা বিপ্লবের অগ্রগামী স্তরে ছিল সেই মধ্যবিত্ত, ছোট-খাট পুঁজিপতি, বিত্তবান কারিগর শ্রেণী বুর্জোয়াপক্ষে সামিল হয়ে যায় বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে। শ্রেণীসমাবেশের ('পোলারাইজেশন') এই চরিত্র ও প্রক্রিয়া ফরাসি বিপ্লবের পর পরিষ্কার ধরা পড়ে। 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' রচনায় শ্রেণীসমাবেশের ও শ্রেণীবিভাগের তত্ত্বগত দিক মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

পুরোপুরি অর্থনীতি সংক্রান্ত মার্কসের প্রথম রচনা '১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি'। কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগসূত্রে ও সামগ্রিক ব্যাখ্যায় সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের বাস্তব সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। এ-

সম্পর্কের মৌল রহস্য খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে — মূলত প্রচলিত পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই মধ্যে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে সমাজে উৎপাদনশক্তির ক্রিয়াকলাপের সংগত প্রশ্নও বিবেচ্য। সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সঙ্গে উৎপাদনক্রিয়ার যে-সম্পর্ক মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতিবিচার তারই পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। প্রসঙ্গত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মৌল প্রস্তাবগুলির বিশ্লেষণ কারণে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদনক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মার্কসের অর্থনীতি চর্চায় একাগ্র মনোনিবেশ। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত মার্কস একনাগাড়ে অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক পড়ে নিলেন — মন্তব্যসহ প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে রাখলেন। তৎকালীন আর্থিক জগতের কাঠামো ও তার ইতিহাস, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ক্রিয়াকলাপ ও সমাজ-সম্পর্ক, সভ্যতার উষাকাল থেকে অর্থনীতির গতিপথ — সব কিছুই মার্কস আয়ত্ত করে নিলেন। এর ফল পরের বছর মে মাসে বারশো পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি তৈরি হল — মার্কসের ভবিষ্যৎ মহাগ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া। এই খসড়াতেই মার্কসীয় অর্থনীতির সবচেয়ে মূল্যবান তত্ত্ব — মূল্যমানের নিয়ম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব — ব্যাখ্যাত হল। পরের বছর (১৮৫৯) তাঁর গবেষণার কিছু অংশ প্রকাশ করলেন — প্রাথমিক অংশটুকু — 'এ কন্ট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক্ অফ পলিটিক্যাল ইকোনমি'। এই গ্রন্থেই প্রথম মার্কস তাঁর উপলব্ধিগত মূল্যমানের নিয়মের ব্যাখ্যা দিলেন।

আর এ-গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের জন্য কাজ শুরু করলেন বছর দুই বাদে। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ দু-বছরে ৪৮০০ পৃষ্ঠায় তিন খণ্ডের 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের মোটামুটি এক পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল। মূল্যমান ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানও মার্কস নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগে বের করে আনলেন — যথা, গড়পড়তা লাভের নিয়ম, উৎপাদনের মূল্য-নির্ণয়, ভূমিকর তত্ত্ব। এই সব তাত্ত্বিক প্রশ্নের সমাধানের ফলে মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্যমানের মতবাদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা পেল।

মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড বেরোয় ১৮৬৭ সালে। বাকি দুটো খণ্ডের প্রকাশনার কাজ মার্কস সুষ্ঠুভাবে করে যেতে পারেন নি। ইতিমধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক আন্দোলনের নেতার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে থাকায় এবং অত্যধিক খাটুনির ফলে শারীরিক অসুস্থতার জন্যও 'দাস্ কাপিটালে'র বাকি দুটি খণ্ডের প্রকাশনা মার্কসের জীবিত কালে সম্ভব হয় নি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ মার্কসের মৃত্যুর দুবছর পরে এঙ্গেলসের চেষ্টায় ও উৎসাহে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ১৮৯৪-এ তৃতীয় খণ্ড।

বিক্রয়যোগ্য পণ্যের অতুল সঞ্চয় থেকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উদ্ভব —

এরই বিশ্লেষণ ও সামাজিক সম্পর্ক ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের প্রতিপাদ্য। পণ্যের সামাজিক সম্পর্কের স্বরূপ – বিশেষ করে একাধিক পণ্যের বিনিময়যোগ্য তুলনাত্মক সম্পর্ক যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশেষ ব্যবস্থার ফলেই গড়ে ওঠে – তারই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা জানতে পারি যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে বিক্রয়যোগ্য পণ্য আসলে উদ্বৃত্ত মূল্যের বস্তুগত রূপ বা অর্থকর রূপ (যেখানে মূল্যের জন্য অর্থও বিশেষরূপে পণ্য হিসেবে পরিগণিত), সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের উৎপাদনকারী শ্রম ও পণ্যরূপে পরিণত হয়। উৎপাদনকারী শ্রম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সহযোগে বিনিময়ের মাধ্যমে যে-মুনাফা বা বাড়তি আয় ঘটে তার ক্রম-বিনিয়োগে ক্রমশ বর্ধিত হারে মুনাফারও স্ফীতি ঘটে। একটা 'স্পাইরাল'-ধর্মী চক্রাবর্তনে, যথা, শ্রম – উৎপাদন – বাড়তি মূল্য – বিনিয়োগ – শ্রম – উৎপাদন – এইভাবে বর্ধিত পুঁজির সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগব্যবস্থার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম।

ক্যাপিটালের প্রথম ভাগে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও প্রগতির ইতিহাস বর্ণিত আছে। সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের বদল ও নতুন আর্থিক ব্যবস্থার প্রচলনে নতুন সম্পর্কের জন্মের কথাও আমরা জানতে পারি। এই নতুন সমাজসম্পর্কের সামগ্রিক চিত্র থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নিঃস্ব শ্রমিকশ্রেণী উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, আর পুঁজির মালিক উদ্বৃত্ত আয়কে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজিতে পরিণত করার যন্ত্রস্বরূপ।

কিন্তু এই অমানবিক সম্পর্কের অস্তিত্ব পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে চিরস্থায়ী নয় – নিঃস্ব শ্রমিকশ্রেণী ইতিহাসের হাতিয়ার হিসেবে এই অমানবিক সমাজ-সম্পর্কের বদল ঘটাবে। সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার পরিবেশে এই বদল সম্ভব। সমাজদেহের এই মৌল পরিবর্তনের যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়া মার্কসই বিবৃত করেছেন। অবশ্য মার্কসের আগে বিভিন্ন কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ আশ্রয় ক'রে সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন স্বর্গ গড়ে উঠেছিল। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড সমাজতান্ত্রিক ধারণাকে সমাজবিজ্ঞানের যুক্তিগ্রাহ্য প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা দেয়।

ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের উপ-নাম : পুঁজির সঞ্চালনপ্রক্রিয়া – দি প্রসেস্ অফ সার্কুলেশন অফ ক্যাপিটাল। এ ক্ষেত্রে মার্কস ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজির গতিবিধি – যথা, পুঁজির চক্রবৎ গতি বা আবর্তন, নিয়োজিত পুঁজির পণ্যে রূপান্তর ও পরিশেষে বাজারপদ্ধতির মধ্যে বিনিময়ব্যবস্থায় বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও মূল্যমানের মধ্যেকার ভারসাম্যের অবস্থায় সরল পুনরুৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটের প্রশ্নও দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থায়িত্ব নেই। ভার-সাম্যের অবস্থা থেকে তার নিয়মিত বিচ্যুতি, কেননা ক্রমাগত উদ্বৃত্ত মূল্য

আকর্ষণের পরিণামে উৎপাদনশক্তি একসময়ে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, তখনই অর্থনৈতিক সংকটের অবস্থা। আর সব সংকটই একটি মাত্র পরিণতির প্রতি দিকনির্দেশ করে—ধনতন্ত্রের যা নিয়তি।

ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের উপ-নাম : পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র। এখানে মার্কস প্রসঙ্গত বিশেষ বিশেষ মূল্যমানের প্রশ্ন, পুঁজির মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিভাজন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার কথা তুলেছেন এবং সুদ ও খাজনার প্রশ্নে আগের দুখণ্ডের আলোচনা থেকে আরো বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় এসেছেন। প্রথম খণ্ডে আলোচনার প্রাধান্য ছিল উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের উপর—মার্কস যার গাণিতিক রূপ দিয়েছেন উদ্বৃত্ত মূল্য ও মজুরি ব্যয়ের অনুপাত হিসেবে। তৃতীয় খণ্ডে এই প্রাধান্য এসেছে মুনাফার হারের উপর।

যে সময়ে মার্কস 'ক্যাপিটালে'র জন্য তথ্যসংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন মোটামুটি সেই কালে ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত তিনি 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন'-এ নিয়মিত লেখক ছিলেন। সমকালীন রাজনীতি ও অর্থনীতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে যথার্থ মার্কসীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য তাতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ, চীন, স্পেন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশগুলির প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ এইসব লেখায় লক্ষ করা যায়। এ সময়ে ব্রিটেনে 'চার্টিস্ট' আন্দোলনে তাঁর সমর্থন ছিল—আর ফ্রান্সের লুই বোনাপার্টের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি বেশ সচেষ্ট ছিলেন।

শুধু প্রবন্ধ রচনায় নয়, মার্কস সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ও সংগঠনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 'আন্তর্জাতিকে'র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মার্কসই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সংগঠক। আন্তর্জাতিকের সমস্ত দলিল ও ইস্তাহার মার্কসেরই রচনা।

১৮৭১-এর ১৮ মার্চ পারি শহরে কমিউনের জন্ম—বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর এই অভিনব ভূমিকায় পৃথিবী চমকিত হল। মার্কস লণ্ডনে বসে এই কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন এবং নেতাদের সঙ্গে তাঁর গুপ্ত যোগাযোগ গড়ে উঠল। মার্কসের নির্দেশাদি যথাস্থানে পৌঁছাতে লাগল। তবু কমিউনের পতন রোধ করা গেল না। এইসব ইতিহাস বিন্নিবিত হল ১৮৭১-এ রচিত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে। মার্কস জানালেন এই প্রথম বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় চেষ্টায় ও নেতৃত্বে 'নির্বিত্তের রাষ্ট্র' পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেল। অবশ্য এক পূর্ববর্তী গ্রন্থে—'এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট' (১৮৫২)-এ পুরনো শাসনযন্ত্র ধ্বংস করে শ্রমিকরাষ্ট্রে নতুন শাসনব্যবস্থার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা মার্কস দিয়েছিলেন।

কমিউনের অভিজ্ঞতায় মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগমূল্য যাচাই হয়ে গেল। আরো নতুন তাত্ত্বিক আলোকে এবার মার্কস 'প্রলেতারীয় ডিক্টেটরশিপে'র চরিত্র বিশ্লেষণে তৎপর হলেন। তাঁর বক্তব্য হল, একমাত্র কমিউনের রাষ্ট্রিক কাঠামোয় শ্রমিকশ্রেণীর আর্থিক মুক্তি সম্ভব।

'আন্তর্জাতিকে'র ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে দেশে দেশে নির্বিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব পার্টির ভূমিকা বা সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপে জোর পড়ল। পারি কমিউনের ব্যর্থতায় মার্কস এই শিক্ষা নিলেন : ফ্রান্সে শ্রমিক শ্রেণীর সাংগঠনিক ও নেতৃত্বের দুর্বলতাই শত্রুপক্ষকে সবল করেছিল। জার্মানিতে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব সংগঠনে প্রধান বাধা লাসালীয় রাজনীতি। শ্রমিক রাজনীতির বিভিন্ন বিচ্যুতি লাসালীয় তত্ত্বের ছত্রছায়ায় সম্মিলিত হল। গোথা অঞ্চলে তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রস্তুতির সম্মেলন মার্কসের 'গোথা কার্যক্রমের সমালোচনা' (১৮৭৫)-য় সমালোচিত। লাসালের ধারণায় শ্রেণীযুদ্ধ, ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবান্তর, বরং রাজশক্তির সহানুভূতির সহায়তায় শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সম্ভব। এই অবৈজ্ঞানিক ও সুবিধাবাদী রাজনীতির চেহারা মার্কস এখানে উন্মোচিত করলেন—দূরায়ত ভবিষ্যতের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে তিনি সাম্যবাদী সমাজের খুঁটিনাটির বর্ণনা দিলেন।

নিদারুণ কায়িক ও মানসিক শ্রমের আধিক্যে মার্কসের দেহ ভেঙে পড়ে, ১৮৭৪ থেকে তা প্রায় চরম অবস্থায় পৌছায়। মাঝে মাঝে স্থানপরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠত। জেনি মার্কসের মৃত্যুতে (১৮৮১) প্রবল আঘাত এল। শেষপর্যন্ত ১৮৮৩-র ৪ মার্চ 'একালের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কের চিন্তা রুদ্ধ হল'।

সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা

'ধর্ম মানুষকে আফিমের মতো নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে' সাধারণত এই উক্তিটি উদ্ধৃত করেই ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসের মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। বস্তুত যদিও এই উক্তিটি থেকেই সাধারণভাবে মার্কসের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ সূচিত হয়, পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই উদ্ধৃতিটি ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করে না। মার্কস বলেছেন : মানুষ তার কল্পনার স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের সন্ধান করতে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই পায় নি। ভবিষ্যতে সে তার প্রকৃত সত্তা অন্বেষণের জন্য আর আত্মসদৃশ অ-মানবীয় সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না। মানুষই ধর্মের স্রষ্টা, ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করে নি। যেসব মানুষ তাদের স্বরূপ উদ্ভাবন করতে গিয়ে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, অথবা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে, ধর্ম তাদেরই এক আত্ম-সংবিৎ, আত্ম-অনুভূতি। মানবজাতি জগৎ-বহির্ভূত কোনো অমূর্ত সত্তা নয়। তার নিজের জগৎ, রাষ্ট্র ও সমাজকে নিয়েই তার অস্তিত্ব, তার জীবন। আর, যেহেতু এই রাষ্ট্র ও এই সমাজই সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অধিষ্ঠিত, এদেরই সৃষ্ট এক বিপরীত বিশ্বচেতনা হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম এই জগতের এক সাধারণ তত্ত্ব, তার জ্ঞানভাণ্ডারের মর্মবস্তু, তার নৈতিক অনুমোদন, বিবেকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও ভাবগম্ভীর পরিণতি, তার সান্ত্বনা ও সমর্থনের এক বিশ্বজনীন ক্ষেত্রবিশেষ। ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবের এক অতি-কাল্পনিক উপলব্ধি মাত্র, যেহেতু এই নিহিত ভাবের কোনো প্রকৃত সত্তাই নেই। সুতরাং ধর্মের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন তা পরোক্ষভাবে সেই 'অন্য জগতের' বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ – ধর্ম যে-জগতের আধ্যাত্মিক সৌরভ। ধর্মীয় দুঃখকষ্ট একাধারে বাস্তব দুঃখকষ্টের প্রকাশ ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম নিপীড়িত জীবের

দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর সহৃদয়তার কাহিনী, যেন ভৌতিক জীবনের আত্মা। মানুষের জীবনে ধর্ম হচ্ছে আফিম। ধর্মের নেশায় সে আচ্ছন্ন।

প্রকৃত সুখস্থাপনের জন্য ভ্রান্ত ধর্মসুখের অবসান প্রয়োজন; আর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তির উপায়, যে-অবস্থাসাপেক্ষে এ-জাতীয় ভ্রান্তির উৎপত্তি সেই অবস্থার অপসারণ। তাই ধর্মের সমালোচনা প্রাথমিকভাবে যে-সব দুঃখদুর্দশার দিব্যজ্যোতি ধর্ম তারই সমালোচনা। ধর্মের সমালোচনা মানুষকে অধ্যাসমুক্ত ক'রে চিন্তা করার, কাজ করার ও বাস্তব অবস্থাকে নির্দিষ্টভাবে গঠন করার সুযোগ দেবে, যার ফলে সে তার নিজের ও প্রকৃত সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনে সক্ষম হবে। যতদিন পর্যন্ত মানুষ আত্মপরিক্রমণে অসমর্থ থাকবে, ধর্ম এক অলীক সূর্যের মতো তার চতুর্দিকে আবর্তিত হবে।

লোকোত্তর জগতের অবসানের পর প্রকৃত জগৎ-সত্য প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ইতিহাসের। আর দর্শনের কাজ, মানুষের বিশুদ্ধ আত্ম-বিযুক্তির মুখোস খুলে যাবার পর তার বিভিন্ন অশুচি রূপের আবরণ উন্মোচন করা। এইভাবেই স্বর্গের সমালোচনা হবে বাস্তব জগতের সমালোচনা, আর ধর্মের সমালোচনা অধিকারের, এবং ঈশ্বরবাদের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায় পরিণত হবে।

ধর্মের বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে গিয়ে মার্কস কিন্তু ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রে নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন নি; কারণ সমাজবিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তরে ধর্ম এক বিশেষ চেতনার ও মানসিকতার রূপ। ইতিহাসের প্রতি যুগের অর্থ-নৈতিক উৎপাদন ও তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে গড়ে-ওঠা সমাজ-সংগঠন মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক বৃত্তি, চেতনা এবং জীবনপ্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। মানবজীবনের সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে মানুষ কয়েকটি অনিবার্য ও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট সম্পর্কে জড়িত হয়। এই সম্পর্ক মানুষের বৈষয়িক উৎপাদন-শক্তির বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অনুরূপ। আর, বিভিন্ন উৎপাদন-সম্পর্কের সমষ্টি হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা মূল বনিয়াদ। এই বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক ইমারৎ বা উপরিতল, এবং সামাজিক চেতনা ও ভাবাদর্শের নির্দিষ্ট রূপগুলিও হয় তদনুরূপ। মানুষের সত্তা তার চেতনা দ্বারা নির্ধারিত নয়, তার সামাজিক সত্তাই তার চেতনাকে নির্ধারণ করে। সমাজের বৈষয়িক উৎপাদনশক্তি বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে তার সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের। প্রচলিত যে-সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্য থেকে উৎপাদনশক্তি সক্রিয় ছিল, সংঘাতটা তারই সঙ্গে। এই সম্পর্ক উৎপাদনশক্তির বিকাশের রূপ থেকে উৎপাদনশক্তির শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তারপরই আরম্ভ হয় সামাজিক বিপ্লবের এক যুগ। আর, অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপরিতলও রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরগুলি বিচার করতে হলে, উৎপাদনের অর্থনৈতিক যে-পরিস্থিতির বৈষয়িক

রূপান্তরগুলি বিজ্ঞানসুলভ সূক্ষ্মতার সঙ্গে নিরূপণ করা যায় সেগুলি থেকে ভাবাদর্শগত রূপগুলিকে – অর্থাৎ রাজনীতিগত, আইনগত, ধর্মগত বা দর্শনগত রূপগুলিকে – পৃথক করে দেখতে হবে। এই ভাবাদর্শগত রূপগুলির মাধ্যমেই মানুষ সংঘাত-সচেতন হয়ে ওঠে ও শক্তিপরীক্ষায় তার নিষ্পত্তি করে। কোনো ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে কী ভাবে তার উপর যেমন সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে অন্যের ধারণা নির্ভর করে না, তেমনি কোনো রূপান্তরের সময়-সীমাকে সে-যুগের স্বকীয় চেতনা দিয়েও বিচার করা যায় না। সেই চেতনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে বৈষয়িক জীবনের বিরোধিতা দিয়ে, সামাজিক উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের সংঘর্ষ দিয়ে। নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদনশক্তির স্থান হতে পারে তার সম্পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত সেই সামাজিক ব্যবস্থার কখনো অবসান হয় না। পুরনো সমাজে বিদ্যমান বৈষয়িক শর্ত যতক্ষণ পরিপক্ক হয়ে না ওঠে, উন্নততর উৎপাদন-সম্পর্কের আবির্ভাবও সম্ভব নয়। এই অধিকতর উন্নত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপরিতলও অনিবার্যভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এবং সেই সঙ্গে উপরিতলের অন্যতম উপাদান বা অংশ হিসাবে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরও পরিবর্তন হয়। নতুন ধর্মচিন্তা পুরনো ধর্মের স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস – এক কথায় চেতনা – পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন অনিবার্য এবং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভাবাদর্শের মূল নিয়ামকশক্তিও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত। যে-নির্দিষ্ট উৎপাদনব্যবস্থায় নিহিত উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ককে কেন্দ্র ক'রে মানব-সমাজে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণী-সম্পর্ক এবং তদনুযায়ী বিশেষ ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিকাশ ও অস্তিত্ব, সেই উৎপাদনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে এবং শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মেরও অবসান হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিবর্তন কেবলমাত্র বস্তুজগতের ক্রমাগত পরিবর্তনসাধনেই সম্ভব ; এবং এই পরিবর্তনসাধন ক'রে চলাই মানুষের ধর্ম। এই পরিবর্তন আবার কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ ক'রে সাধিত হয়। বস্তু, চিন্তা বা মানুষের লব্ধ জ্ঞান সবকিছুই আপেক্ষিকভাবে পরিবর্তনশীলতার পথ ধরে চলেছে আদিমতম যুগ থেকে। এই আপেক্ষিক পরিবর্তনপ্রবাহে যে-সত্য পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়েছে একমাত্র সেই সত্যগুলিই সনাতন ও চরম সত্যরূপে গ্রাহ্য এবং প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি নিয়মের আকারে সেগুলিই বস্তুজগতে কার্যকর। এই নিয়মসমূহই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির সারার্থ।

ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা ও এই দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে ধর্মের যে নব নব রূপান্তর তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দরকার যে, যে-বস্তুজগতে বা চিন্তার রাজ্যে – এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবাদর্শের জগতে – এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয় তার প্রকৃত স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি কী ; তার মধ্যে কোনো চিরন্তন সত্য আছে কি না, যার ফলে তা সমাজে সর্ব

অবস্থাতেই একই রূপে বিদ্যমান থাকতে পারে অথবা উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা দরকার যে, বিবর্তনের কোন্ স্তরে বা অর্থনৈতিক বিকাশের কোন্ পর্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বা ধর্মীয় চিন্তার উদ্ভব, উৎপাদনব্যবস্থাভিত্তিক বনিয়াদের পরিবর্তনে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরই বা ভূমিকা কতটুকু, বা আদৌ কোনো ভূমিকা আছে কি না।

মানব জীবন ও ভৌতিক জগৎ-সংক্রান্ত সমস্ত জিজ্ঞাসা বিভিন্ন দশা অতিক্রম করার পর একটি প্রশ্নের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় : বস্তুজগৎ কোনো আদি অকৃত্রিম শাশ্বত চৈতন্য থেকে উদ্ভূত, না মানুষের চিন্তাধারা বা চৈতন্য বস্তুজগৎ থেকে জন্মলাভ করে ; অর্থাৎ চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোন্‌টি আদি ? চিন্তা ও সত্তার আন্তঃসম্পর্কের এই প্রশ্নের যে যেমন উত্তর দিয়েছেন সেই অনুসারে দার্শনিকরা দুটি বৃহৎ শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন : যাঁরা প্রকৃতির তুলনায় চৈতন্যকে আদি বলেছেন, অতএব কোনো-না-কোনোভাবে শেষপর্যন্ত জগৎসৃষ্টির কথা মেনেছেন, তাঁরা গঠন করেছেন ভাববাদীর শিবির। আর যাঁরা প্রকৃতিকে আদি মনে করেছেন তাঁরা হলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বস্তুবাদী। ধর্মের প্রসঙ্গে চিন্তা ও সত্তা সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্যরূপে দেখা দিয়েছে ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, না চিরকালই জগতের অস্তিত্ব ছিল ? বস্তুবাদ বা জড়বাদ, তা সে যে-সম্প্রদায়েরই হোক, ব্যতীত যে-কোনো দর্শনেই জীব ও জগৎকে ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান ঐশ শক্তিরই সৃষ্টি বা প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বহু আদিকাল থেকে, মানুষ যখন নিজের দেহগঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, মানুষের বিশ্বাস হয়েছে যে তার চিন্তা ও সংবেদন তার নিজস্ব দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, অন্য কোনো বিশিষ্ট আত্মার কাজ, যে-আত্মা দেহে বাস করে এবং মৃত্যুর সময় দেহ পরিত্যাগ করে। সেই যুগ থেকেই এই আত্মার সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক নিয়ে মানুষকে চিন্তা করতে হয়েছে। এই আত্মা যদি দেহ পরিত্যাগের পর বেঁচে থাকে, তাহলে তার আর স্বতন্ত্র মৃত্যুসম্ভাবনা আবিষ্কার করার কোনো কারণ নেই। এইভাবেই ধারণা জন্মাল যে, আত্মা অমর। বিকাশের সে-পর্যায়ে অবশ্য এই অমরত্বের কথাটা মোটেই সান্ত্বনা নয়, এক নিয়তি, আর এই নিয়তির বিরোধিতা করার চেষ্টা বৃথা। ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, বরং আত্মার অস্তিত্ব একবার মেনে নেওয়ার পর দেহাবসানে সেই আত্মা নিয়ে কী করা যাবে সে-বিষয়ে সাধারণ অজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হল ব্যক্তির অমরত্বের ধারণা। এইভাবেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে প্রথম দেবতাদের উদ্ভব। ধর্মের আরও বিকাশের পর্যায়ে এই দেবতারা ক্রমেই অপ্রাকৃত রূপ লাভ করে, এবং শেষপর্যন্ত মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অমূর্তায়ন-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বহু অল্পবিস্তর সীমিত এবং পরস্পরকে

সীমাবদ্ধকারী দেবতাদের মধ্য থেকে মানুষের মনে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা জন্মায়। মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, ঈশ্বরবিশ্বাসে জীবনের সব সংকট ও ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তিই জীব ও জগৎকে পরিচালনা করে। সুতরাং এই শক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বা বলিদান করে একে সন্তুষ্ট করতে হয়। এই শক্তিকে বিশ্বাসের দ্বারা জানা যায়, জ্ঞানের দ্বারা নয়। ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস ও তার সন্তোষবিধানের যে-প্রক্রিয়া, সামগ্রিকভাবে তা-ই ধর্ম। আধুনিকযুগে ধর্ম এক উচ্চপর্যায়ের মতাদর্শগত ক্ষেত্রে পরিণত হলেও তার একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তর্বস্তু আছে। সমাজবিকাশের পরবর্তীকালে যাকে আজগুবি বলা হয়ে থাকে, ঐতিহাসিক যুগ তাকে বিদ্যমান অবস্থায় পায়, এবং আত্মসাৎ করে। প্রকৃতি ও মানুষের স্বীয় অস্তিত্বের বিষয়ে ভূতপ্রেত, জাদুশক্তি ইত্যাদি নানাপ্রকার আদিম ও মিথ্যা ধারণার অর্থনৈতিক ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। প্রকৃতিবিষয়ক মিথ্যা ধারণাই বরং অনেকাংশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিম্ন-অর্থনৈতিক বিকাশের কারণ ও পরিপূরক শর্ত হিসাবে কাজ করেছে। এবং যদিও অর্থনৈতিক প্রয়োজন প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল, এইসব আদিম আজগুবি ধারণার মূলে অর্থনৈতিক কারণ খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক।

মানবসমাজের ক্রমবিবর্তন যতটা অগ্রসর হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখেই বিভিন্ন যুগের বিকাশ হয়েছে। শ্রেণী-পূর্ব বা আদি-সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের মান এত নিচে ছিল যে সর্বনিম্ন জীবিকা-নির্বাহের পরিমাণ বজায় রাখতে হলে সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হতো। তখন কারও কারও নিজের বিশেষ গুণের দ্বারা অর্জিত বেশি সম্মান ছাড়া কোনো রকম আর্থিক বা সামাজিক অসমতা ছিল না। যেহেতু সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন বলে কিছু থাকত না, একজনের শ্রমের উপর আর-একজন বসে খেতে পারত না। উৎপাদনপদ্ধতি যখন উন্নত হল, এবং যার ফলে সমাজের আশু প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত হতে শুরু করল, তখন এক-এক গোষ্ঠীর লোকেরা এক-একটি শিল্পদক্ষ হয়ে উঠল। এদের আহার জোগাতে লাগল সমাজের বাকি লোকেরা। এইভাবে শ্রমবিভাগ শুরু হল, যার ফলে উৎপাদনকৌশলে আরও উন্নতি হতে লাগল এবং পরিশেষে গুণগতভাবে নতুন এক শ্রমবিভাগের উৎপত্তি হল—উৎপাদনকারী এবং উৎপাদন-সংগঠনকারী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা হলেন প্রধান বা পুরোহিত, যাঁরা কৃষির উন্নতির জন্য যে-অঙ্কবিদ্যা ও জ্যোতি-বিদ্যার প্রয়োজন হতো তার অধিকারী। কালক্রমে এইসব উৎপাদন-সংগঠনকারী বা তত্ত্বাবধায়করা নিজেদের মালিকে পরিণত করলেন। এইভাবে সমাজ দুভাগে বিভক্ত হয়—শ্রমিকশ্রেণী ও মালিক বা শাসকশ্রেণী। অতএব, শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব হল উৎপাদনপদ্ধতিতে উন্নতির ফলে।

শ্রেণী-পূর্ব মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও উৎপাদনশক্তি ছিল অপরিণত. উৎপাদনকৌশলও ছিল দুর্বল। এই কৌশলের দুর্বলতা তারা পুরণ করতে চায় ইন্দ্রজালের দ্বারা। ইন্দ্রজাল এক মায়াবী শক্তি যার দ্বারা মানুষের ইচ্ছাশক্তির বলে প্রকৃতিকে বশীভূত করার চেষ্টা চলে। শ্রেণীসমাজে মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার ফলে ক্রমশ প্রকৃতিকে বুঝতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের বশে আনতে শুরু করে। কিন্তু যেহেতু সমাজ তখন বিভক্ত হয়ে পড়েছে, মালিক বা শাসকগোষ্ঠী নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলিকে, ঐশ্বরিক অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে, বেশি করে কায়েম করার জন্য ইন্দ্রজালকৌশলের আশ্রয় নেয়। এইভাবে শ্রমিকগোষ্ঠী বা উৎপাদনকারীরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে ইন্দ্রজালকৌশলের অধিকারীদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের ভাগ্য মেনে নিতে বাধ্য হয়। শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি, এরই এক রূপান্তর হল ধর্ম। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আদিম মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ইন্দ্রজালে, আর সমাজে উন্নত উৎপাদনশক্তির সামনে সভ্য মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ধর্মবিশ্বাসে।

ধর্মের মতো বিজ্ঞানেরও উৎপত্তি এই ইন্দ্রজাল থেকে। কিন্তু ধর্ম বাড়িয়ে তুলল নেতিবাচক দিকটা, আর বিজ্ঞান তুলে ধরল ইতিবাচক দিক। অজ্ঞাতের সামনে অক্ষমতার প্রকাশ ধর্মে, আর জ্ঞাত বিষয়ের উপর ক্ষমতার প্রকাশ বিজ্ঞানে। ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই ধারণাই অবশ্য দীর্ঘদিন অভিন্ন ছিল। আদি বিজ্ঞানীরা ছিলেন ধর্মযাজক, যাঁরা ইন্দ্রজালের অধিকারী হিসাবে ক্ষমতা দখল করে রাখতেন, সাধারণ অধিবাসীদের দ্বারা পূজিত হতেন। প্রথম যুগে পুরোহিত বা ধর্মযাজক ও ঈশ্বরকে অভিন্ন ভাবা হতো; পরবর্তীকালে পুরোহিতরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা অবতার রূপে পূজিত হতেন। যেভাবে পুরোহিতের কাছে আবেদন করা হতো, নানা উপকরণ দিয়ে তাঁদের সম্মান দেখানো হতো, সেইভাবেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও বলিদানের ব্যবস্থা শুরু হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণার উৎপত্তি হয় গোষ্ঠীপতি সম্বন্ধে কল্পনা থেকে।

আদিম জীবন থেকে সভ্যজীবনে উৎক্রান্তির চূড়ান্ত পদক্ষেপ কৃষিবিদ্যা আবিষ্কার। কিন্তু কৃষিকার্য অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ ছিল বলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ইন্দ্রজালের প্রভাব আরও বিস্তৃত হয়। প্রথম যুগে জমিচাষের কাজটা প্রধানত মেয়েরাই করত, আর পুরুষরা করত শিকার ও পশুপালন। অর্থনৈতিক জীবনে স্ত্রীজাতির স্থান অনুসারেই সমাজে তাদের স্থান নির্ণীত হতো। স্ত্রী-প্রধানেরাই সমাজ শাসন করত, ধর্মতন্ত্রও ছিল মাতৃপ্রধান। কালক্রমে স্ত্রীজাতির প্রাধান্য কমে যায়, কারণ যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমেই বেড়ে গেল এবং এগুলি প্রধানত পুরুষদের কাজ ছিল বলে ধনসম্পত্তিও তাদের হাতে চলে গেল। এইভাবে ধর্মজগতেও পুরুষদের প্রাধান্য বাড়ল এবং স্ত্রীজাতি পিছনে পড়ে গেল। পুরাকালীন চিন্তায় জন্ম ও

মৃত্যু ছিল পরিবর্তনের এবং শাশ্বত ধারার এক অবিচ্ছেদ্য দৈত প্রকাশ। শিশু যৌবনপ্রাপ্ত হওয়ার পর দীক্ষাকাণ্ডের মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক স্তরে উন্নীত হতো। – ধারণা ছিল যে, দীক্ষাগ্রহণকারীর শিশু হিসাবে মৃত্যু হল। আদিম সমাজে দীক্ষানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল নব যুবককে শরীর, মন ও সামাজিক দিক দিয়ে পূর্ণবয়স্কের জীবনের বাস্তব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া। পরবর্তীকালে, উন্নত ধর্মীয় ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে আদিম দীক্ষাদানপদ্ধতি পুরোপুরি গৃহীত হল, কিন্তু তাতে কিছু নতুন উপাদান সংযোজিত হয়। এই উন্নত দীক্ষাদানপদ্ধতির উদ্দেশ্য হল, দীক্ষাগ্রহণকারীকে এ পৃথিবীর জন্য নয়, পরলোকের জন্য প্রস্তুত করা। এইভাবে শ্রেণীসংগ্রামে নিপীড়িতদের আর্ত ও ভারাক্রান্ত জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তব পৃথিবী থেকে সরিয়ে এক কাল্পনিক পরজগতে হারানো-অধিকার ফিরে পাবার আশ্বাস দেওয়া হয় এবং প্রত্যক্ষ সমাজসংগ্রামে তাদের দুর্বলতা রূপ পায় ধর্মে।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে মানুষের জীবন-যাত্রার মান তথা উৎপাদনপদ্ধতি যত উন্নত হয়েছে, মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে যত বেশি বশীভূত করতে পেরেছে, তাদের সমাজের উপরিতলও তত উন্নত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আর এই উপরিতলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ধর্মীয় ভাবাদর্শেরও জটিল ও নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই ভাবাদর্শ পরবর্তী যুগে প্রচলিত ধারণাসমূহের সঙ্গে সংগতি রেখে বিকশিত হয়েছে এবং সেগুলিকেও আরও বিকশিত করেছে। যাদের মনে এই চিন্তাপদ্ধতি ক্রিয়াশীল থেকেছে যে, চিন্তা নিজস্ব নিয়মাধীন এবং স্বাধীন সত্তা, তাদের বৈষয়িক জীবনের অবস্থাই যে শেষপর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, সেকথা অনিবার্যভাবেই তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকেছে, কারণ তা না হলে সমগ্র ভাবাদর্শেরই মৃত্যু হয়। মানুষের নিজের প্রকৃতি ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি সেই আদিম ধারণাগুলি প্রতিটি জ্ঞাতিসম্পর্কমূলক জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই মোটের উপর সাধারণ। কিন্তু গোষ্ঠীগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর ভাগ্যে জীবনধারণের যে অবস্থা ঘটে সেই অবস্থা অনুসারে বিশেষ গোষ্ঠীগত ধরনে তা বিকশিত হতে থাকে। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় ভাবাদর্শ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। আবার এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-গুলির সঙ্গে সেই সমাজের বনিয়াদের উপর গড়ে-ওঠা বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রযন্ত্রের বা শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যদিকে আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় যারা অসহায় ও জীবন-নির্ধারক বহিঃশক্তির কাছে নিপীড়িত, তারাও আত্মরক্ষা ও সান্ত্বনার জন্য ধর্ম বা ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর দুজন : একজন শোষিতের ঈশ্বর, যে-ঈশ্বর দুঃখবেদনার প্রতিমূর্তি এবং মুক্তির, আশার প্রতীক হিসাবে পূজিত ; আর অপরজন শাসকশ্রেণীর ঈশ্বর, যাঁকে

বিত্তবানরা ব্যবহার করে নিপীড়িতদের মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক শোষণকে মানিয়ে নেবার জন্য।

বিভিন্ন দেশে গোষ্ঠীগত ধরন অনুসারে যে-যে ধর্মের বিকাশ ও প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তদনুযায়ী সমগ্র পৃথিবী মোটামুটি পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল : ইয়োরোপ ও আমেরিকায় খ্রীস্টধর্ম ; পশ্চিম এশিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলাম ধর্ম ; চীন ও সুদূর পূর্বাঞ্চলে কনফুসিয়ান ও তাওবাদ ; ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ; দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম। এ ছাড়া ইহুদি ধর্ম ও জরথুস্ত্রবাদও যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। সবদেশেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, প্রধানত পুরোহিত বা ধর্মযাজকেরা, সংগঠিতভাবে সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবধায়কের স্থান অধিকার করেন। প্রচলিত ধর্মীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও বাধ্যতামূলক আচরণবিধি রচিত হয়। এবং সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় যে এইসব শাস্ত্র ও আচরণবিধি অভ্রান্ত।

প্রতিটি জাতির মধ্যে যে-দেবতারা আধিপত্য করেছেন, তাঁরা জাতীয় দেবতা ; এবং যে জাতীয় সীমানা রক্ষা করা তাঁদের দায়িত্ব, তাঁদের প্রভাব তার বাইরে যায় নি। যতদিন পর্যন্ত একটি জাতির সত্তা বর্তমান শুধুমাত্র ততদিনই লোকেদের কল্পনায় এই দেবতাদেরও অস্তিত্ব ; জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও পতন হয়। যে-কোনো ধর্ম একবার গড়ে ওঠার পর তার মধ্যে একটা ঐতিহ্যগত উপাদান কিন্তু বর্তমান থেকেই যায়, কারণ ভাবাদর্শের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐতিহ্য হল একটা মস্ত রক্ষণশীল শক্তি। কিন্তু সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই উপাদানের যে-গুণগত রূপান্তর ঘটে তা আসে শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে, অর্থাৎ যে-মানুষেরা এই রূপান্তর ঘটায় তাদের বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হয় প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, যেটা মূলত নির্ভর করে প্রাকৃতিক শক্তিকে কতটা বশীভূত করা গেছে তার উপর। প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করার কাজ বিজ্ঞানের, সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মূলে আছে এই চিন্তা যে, এই জগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত বস্তুগত বিকাশপদ্ধতি, এবং মানুষ যে-পরিমাণে এই বিকাশপদ্ধতিকে জানতে পারে সেই পরিমাণে সে তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যে-ঘটনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে হয়, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে তাকেই বস্তুগতভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে, বিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা বলে বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে-পরিমাণে বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে সেই পরিমাণে ধর্মও লোপ পায়।

মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্বতত্ত্বের যেসব নিয়মের দ্বারা প্রকৃতি ও সমাজের বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় তার বিজ্ঞান হিসাবে, বিশ্বের বিপ্লবী রূপান্তরের বিজ্ঞান হিসাবে, মার্কসবাদ সামগ্রিকভাবে

ভাববাদ দর্শনবিরোধী। যেহেতু বিজ্ঞান-নিরূপিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্যই এ-মতবাদ মৌলিকভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরবিরোধী।

মার্কস তাঁর ধর্মীয় ভাবাদর্শ সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রথমেই বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে ধর্মের বিসংবাদী সম্পর্কটি তুলে ধরেছেন। দর্শনের বিশ্ববিজয়ী মুক্ত হৃদয়ে যতক্ষণ বিন্দুমাত্র রক্ত প্রবাহিত হবে দর্শন ততক্ষণ এপিকিউরাসের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে যাবে জনগণের ঈশ্বরকে যে পরিত্যাগ করে সে নয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে জনগণের অভিমতে যে নিবিষ্ট হয় সে-ই অধর্মাচারী। ঈশ্বরকুলের বিরুদ্ধে প্রমিথিউসের ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ঘোষণা প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্যের সমস্ত দেবতাদের বিরুদ্ধে দর্শনেরই জেহাদ ঘোষণা, কারণ এই দেবতারা মানুষের সচেতনতার কোনো মূল্য দেয় নি। এ জন্য যদি কেউ সামাজিক স্তরে দর্শনের আপাত অধঃপতনের কথা বলে, তাহলে দর্শন প্রমিথিউসের মতোই জবাব দেবে দাসত্বসুলভ হীনতার চেয়ে, জিউসের গোলামি করার চেয়ে, পর্বতে শৃঙ্খলিত হয়ে থাকা অনেক ভাল। ককেসাসের পর্বতে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস মানুষকে মুক্তির আলো দেখায়, যার ফলে প্রাচীন গ্রীক দেবকুলের পতন শুরু হয়; তাই মার্কস দর্শনের কালপঞ্জিতে প্রমিথিউসকে মহত্তম শহীদ বলে বর্ণনা করেছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ইতিহাস থেকে নজির দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বরে অনাস্থা বা নিরীশ্বরবাদ প্রগতির অন্যতম লক্ষণ। গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্মগুলিও বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। এ জন্য অনেকাংশেই বিদ্যমান ধর্মগুলির নৈতিক অবক্ষয় দায়ী, যদিও মূলত ধর্মগুলির পতনের কারণ ছিল বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতি। সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদ, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সংশয়বাদও, প্রাধান্য লাভ করে; প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিই ঐশ্বরিক ক্ষমতা, দৈবজ্ঞ বাণী বা অলৌকিক ব্যাপারকে মূল্য দিতে অস্বীকার করে। গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে সম্ভ্রান্তগোষ্ঠীর শাসন ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ধর্মীয় আনুগত্যের অবসান দেখা দেয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় খ্রীস্টধর্মের উৎপত্তি ও সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই ধর্মের পরিবর্তনের যে-বিশ্লেষণ করেছেন তার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের মূল বক্তব্য স্পষ্ট বোঝা যাবে: রোমের অধীনে গ্রীসের এবং নিকট-প্রাচ্যের প্রাচীন রাজ্যগুলি ও তার সঙ্গে গল ও স্পেনের অনগ্রসর গোষ্ঠীগুলি একটি সম্রাট-শাসিত রাষ্ট্রে সংহত হয়। ফলে, দাস অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ সমস্ত স্ব-বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে। উৎপাদনের তখন যা স্তর ছিল তাতে ক্রীতদাসের শ্রম অধিক লাভজনক ছিল এবং নতুন কোনো আবিষ্কারেরও বিশেষ সুযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে দাস-শ্রমপ্রথায় লাভের অঙ্ক যখন ফুরিয়ে আসে তখন নতুন কোনো শ্রমপ্রথা প্রবর্তন করা কঠিন হয়ে ওঠে। এইভাবে রোম সাম্রাজ্য এমন একটা যুগে এসে প্রবেশ করে

যখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ধীরে ধীরে তার ভাঙন শুরু হয়; সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক দিয়েও রোম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি আরম্ভ হয়। ক্রমে ম্লান হয়ে যায় পুরনো জাতীয় দেবতাগুলি, এমন কি রোমের সংকীর্ণ পরিধির পক্ষে উপযোগী স্থানীয় দেবতারাও লুপ্ত হয়। সাম্রাজ্য যখন ভেঙে পড়তে শুরু করে, সীমান্তের দেশগুলি যখন প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে তখন রোমের শোষিত শ্রেণী তাদের অভ্যর্থনা জানায়, যার ফলে ভাঙন দ্রুততর হয়—তখন তার অভ্যন্তরে সমস্ত শ্রেণীই, শোষক ও শোষিত নির্বিশেষে এক হতাশায় মগ্ন হয়ে পড়ে। এই অবস্থা ধর্মবিশ্বাস, ধর্মোন্মত্ততা ও নানা ধরনের অজ্ঞতাবাদ বিস্তারের এক সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া, তখন একটা বিশ্বধর্মেরও যে প্রয়োজন ছিল, রোমে স্থানীয় দেবতাদের সঙ্গে যে-সব বিদেশী দেবতাদের সামান্যমাত্র সম্মান ছিল তাদের জন্য স্বীকৃতি ও বেদী জোগানোর প্রচেষ্টায় তা স্পষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই নিঃশব্দে সাধারণীকৃত প্রাচ্য এবং ইহুদি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে স্থূল গ্রীক, বিশেষত স্টোইক দর্শনের মিশ্রণ থেকে নতুন বিশ্বধর্মের (রোমক বিশ্ব সাম্রাজ্যে) অর্থাৎ খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাব হয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস রোমক সাম্রাজ্যের পতনের সময় যে-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলে খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাব সেগুলির ঐতিহাসিক কারণ কী, তা পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। ক্রীতদাস, সাধারণ দরিদ্র মানুষ ও দাসত্বে আবদ্ধ জাতিগুলির অসংখ্য বিদ্রোহের পর রোম যখন রক্তাপ্লুত তখন সাম্রাজ্যের সমস্ত মানুষের বর্তমান জীবন সম্বন্ধে হতাশা ও কাল্পনিক পরজগতে মুক্তির আশা খ্রীস্টধর্মের জন্ম দেয়। এবং প্রথম যারা এই ধর্মমত গ্রহণ করে তারা ছিল প্রধানত দাসত্বমুক্ত, দরিদ্র স্বাধীন মানুষ ও ক্রীতদাস। পরবর্তী যুগে এই ধর্মটি যে-সরকারি চেহারায় পরিণত হয় সেটি হল তার রাষ্ট্রধর্মের চেহারা। এশিয়া মাইনরের নিকাই নগরে রোমের সম্রাট প্রথম কনস্টান্টিনের আদেশে আহূত তাঁর সাম্রাজ্যের খ্রীস্টান ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ও বিশপদের প্রথম বিশ্ব-সভায় খ্রীস্টধর্মকে এই চেহারা দেওয়া হয়। এই সভা সমস্ত খ্রীস্টানের পক্ষে বিশ্বাসের বাধ্যতামূলক কতকগুলি প্রতীক রচনা করে, যেগুলি অগ্রাহ্য করলে রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে গণ্য হতো। মধ্যযুগে যে-পরিমাণে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটে, সেই পরিমাণেই তার ধর্মগত পরিপূরক হিসাবে, সামন্ততান্ত্রিক সোপানসহ, খ্রীস্টধর্মও বিকশিত হয়। এবং 'বার্গার'রা সজীব হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্ট ধর্মদ্রোহ বেড়ে ওঠে। আলবিগেঁসরা (১২শ ও ১৩শ শতকে দক্ষিণ-ফ্রান্স ও উত্তর-ইতালির শহরগুলিতে প্রচলিত ধর্মসম্প্রদায়) প্রথম ক্যাথলিকদের সাড়ম্বর উপাসনাপদ্ধতি ও গির্জার সোপানতন্ত্রের বিরোধিতা ক'রে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নগরের ব্যবসায়ী-কারুজীবীদের প্রতিবাদকে ধর্মগত রূপ দেয়। গির্জার ভূসম্পত্তি লোকায়তকরণের প্রচেষ্টায় তাদের সঙ্গে অভিজাতদের একাংশ

যোগ দেয়। এ-জাতীয় আন্দোলন প্রমাণ করে যে, শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতির শক্তি, অর্থাৎ উন্নত উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্ক, পোপ বা গির্জার নির্দেশের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কালক্রমে স্বাধীন চিন্তাশীলদের অধিকার ও প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম তার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এবং ক্রমেই এ-ধর্ম শুধুমাত্র উৎপাদনব্যবস্থায় যারা আধিপত্য করে তাদের অথবা শাসকশ্রেণীগুলির সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়; কেবলমাত্র শাসনের উপায় বা অস্ত্র হিসাবে, নিম্নতর শ্রেণী-গুলিকে বন্ধনে রাখার উদ্দেশ্যে এ ধর্ম ব্যবহৃত হয়।

সমাজবিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে উন্নত ধরনের (অর্থাৎ বৈষয়িক অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ের) যে-ভাবাদর্শ ধর্মের রূপ গ্রহণ করে কালক্রমে তা নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ও শাসনের উপায়ে পরিণত হয়। এ ক্ষেত্রে ধ্যানধারণার সঙ্গে বৈষয়িক অস্তিত্বের আন্তঃসম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে, এবং মধ্যবর্তী যোগসূত্রগুলির জন্য তাদের অস্পষ্টতাও বৃদ্ধি পায়। অথচ এই আন্তঃ-সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু ভাবাদর্শের সবকিছুই আবার যেহেতু সমাজের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এসে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়, সমস্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন এবং প্রতিবাদও ধর্মতত্ত্বমূলক রূপ গ্রহণ করে।

'খ্রীস্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর আমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তবু আমাদের উপর এমন পশুর মতো ব্যবহার করা হয় কেন?' – এই প্রতিবাদ তুলেই সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ইংরাজ কৃষকরা বিদ্রোহ করে। এই প্রতিবাদেরই মর্মবাণী ধ্বনিত হয় লেভেলার, ডিগার ও লুডাইটদের বিদ্রোহে। এইসব বিদ্রোহ দমনও করা হয় ধর্মের নামে। ধর্ম একদিকে সনাতন সমাজব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হয়: 'ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর, যেন রাজার প্রতি ভক্তি রেখে, আইনের প্রতি আনুগত্য রেখে, পরস্পর সোদরপ্রতিম হয়ে, আমরা সকলে তোমার সেবা করতে পারি।' আবার অন্যদিকে, দুঃখভারাক্রান্ত নিপীড়িত শ্রেণীকে মৃত্যুংতীর্ণ জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কথা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হয় ধর্মেরই নামে: 'এ কথা ভুলো না, এবং একথা বলেই পরস্পরকে সান্ত্বনা দিও যে, স্বর্গে তোমাদের জন্য স্থায়ী আনন্দের জীবন অপেক্ষা করছে।' এইভাবেই সমস্ত সামাজিক অবিচারকে ধর্মের নামাবলি পরিহিত একটি সুকুমার চেহারায় উপস্থিত করা হয়; আর সাধারণ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয় ধর্মীয় ভাবাদর্শের মোহে। 'ধর্ম মানুষকে আফিমের মত নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখে' বলে মার্কস এই কথাই বোঝাতে চান।

ধর্ম এক বিশেষ ধরনের সমাজসচেতনতা, শ্রেণীসমাজে উপরিতলের এক বিশেষ উপাদান। সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের উপর, সমাজের শ্রেণীকাঠামোর উপর ধর্মের অস্তিত্ব। মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখান যে, শোষকশ্রেণীর স্বার্থে, সাধারণ মানুষকে অন্ধ ও খর্ব করার উপায় বা অস্ত্র হিসাবে

ধর্মের পরিপুষ্টি। এবং একথা বুঝতে কোনো গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না যে, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্যানধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এককথায় তার চেতনা, পরিবর্তিত হয়। চিন্তার ইতিহাস প্রমাণ করে যে, বৈষয়িক উৎপাদন পরিবর্তনের সঙ্গে আনুপাতিকভাবে মানসিক সৃষ্টির প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আসে। প্রতি যুগেই যে-সব ধারণা আধিপত্য করে তা মূলত ও প্রধানত সমসাময়িক শাসকশ্রেণীরই ধারণা। জমিদারের সঙ্গে পুরোহিত যেমন সর্বদাই হাত মিলিয়েছে, সামন্ত সমাজতন্ত্রের সঙ্গেও তেমনি ধর্মগত পরিপূরক হিসাবে এসে জুটেছে পাদরিদের সমাজতন্ত্র। প্রাচীন জগৎ যখন তার শেষ পাদে এসে পৌছায়, তখন প্রাচীন ধর্মব্যবস্থাও খ্রীস্টধর্মের কাছে পরাস্ত হয়। খ্রীস্টান ধারণা যখন অষ্টাদশ শতকে যুক্তিবাদী ধারণার কাছে পরাজিত হয় তখন সামন্তসমাজেরও সংগ্রাম চলে সেদিনের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে। ধর্মমতের স্বাধীনতা, বিবেকের মুক্তি কেবলমাত্র জ্ঞানের রাজ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার আধিপত্যকেই রূপ দেয়। ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাদর্শের পরিবর্তন হয়েছে, ধর্ম বিলুপ্ত হয় নি। মার্কসবাদ নতুন ভিত্তিতে ধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে, ধর্মের বিলোপ-সাধনেরই পক্ষপাতী। এবং চিরপরিবর্তনশীল জগৎ ও সমাজে চিরন্তন সত্য বলে কিছু আছে একথাও অস্বীকার করে। সমস্ত অতীত সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-বিরোধের বিকাশমাত্র, বিভিন্ন যুগে এই বিরোধ বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত। কিন্তু যে-কোনো রূপেই এই বিরোধ প্রকাশিত হোক না কেন, একটা ব্যাপার সব যুগেই বর্তমান – যথা, সমাজের এক অংশ কর্তৃক আর-এক অংশের শোষণ। সেজন্যই অতীতে সামাজিক চেতনায় বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সাধারণ ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে ; শ্রেণীবিরোধের অবলুপ্তির পূর্বে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হতে পারে না।

নতুন ভাবাদর্শে পুরনো ভাবাদর্শের ঐতিহ্যগত যে-উপাদানটি থেকেই যায় মার্কস ও এঙ্গেলস সমাজবিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, এই উপাদানের রূপান্তর শ্রেণী-সম্পর্ক তথা অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আসে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভাবাদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলি, একবার সংস্থাপিত হবার পর, অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম পরিবর্তনশীল থাকে ; পরিবর্তন-প্রতিরোধক এক ক্ষমতার বলে প্রকৃত বৈষয়িক অবস্থার অনুপাতে ধর্মীয় উপাদানসহ সমগ্র উপরিতলই পিছনে পড়ে থাকে।

মার্কস ধর্মের অবসান চান, ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চান না। ধর্ম যে-পরিমাণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রূপে বর্তমান, যে-পরিমাণে জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য শাসকশ্রেণীর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত, যে-পরিমাণে বহিঃশক্তি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়তার ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধিতা করেই তার স্থায়িত্ব, মার্কসবাদ সেই পরিমাণেই ধর্মবিরোধী। ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে ধর্মীয় অন্ধতা আরও দৃঢ় হবে, তাই মার্কস ধর্মের ক্রমশ অপসারণ চান। তাছাড়া, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সমাজের ভিত্তি হলেও, উপরিতলের বিভিন্ন বস্তু, যথা, শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপগুলি এবং তার ফলাফল—সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধানাদি, সংগ্রামে যোগদানকারীদের মনে বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক তত্ত্বাবলি, ধর্মীয় মতামত ইত্যাদি—ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে প্রধান হয়ে ওঠে। মার্কস বা এঙ্গেলস কখনো বলেন নি যে, অর্থনৈতিক ব্যাপারই 'একমাত্র' নির্ধারক বস্তু, তাঁদের মতে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুসারে বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনই হচ্ছে 'শেষপর্যন্ত' নির্ধারক বস্তু। মানবমনকে আচ্ছন্ন করে রাখে যে ঐতিহ্য ও ভাবাদর্শ তাও একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, যদিও সে-ভূমিকা শেষপর্যন্ত আবশ্যিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, এবং নির্ধারকও নয়।

যে-কোনো প্রগতিশীল শ্রেণীর অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধর্ম ও ঈশ্বরে অনাস্থা। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ও ধর্মীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বস্তুবাদী নাস্তিকদের (যারা উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর আদর্শগত গুরু ছিলেন) ভূমিকা যেমন উল্লেখ-যোগ্য, বস্তুবাদী দর্শন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে নিরীশ্বরবাদ প্রচারের মূল্যও তেমনি অনস্বীকার্য। অবশ্য প্রগতিশীল বুর্জোয়াশ্রেণী যখন ক্ষমতা হাতে পায়, এবং বুর্জোয়া-প্রলেতারিয়েত শ্রেণীবিদ্বেষ আরও তীব্র রূপ ধারণ করে, তখন তারা সমস্ত মুক্ত চিন্তা পরিত্যাগ ক'রে ধর্মকে সাধারণ মানুষের জন্য এক মাদকদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। মার্কসবাদ-প্রবর্তকরা তাঁদের প্রাক্তন বস্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদীদের অবদান অস্বীকার করেন নি; কিন্তু তাঁরা এও দেখান যে, বুর্জোয়া নিরীশ্বরবাদের শ্রেণী-সীমাবদ্ধতা, অসামঞ্জস্য ও আধাআধি মনোভাব, তার অনুধ্যান ও নিষ্ক্রিয়তা ধর্মের সামাজিক উৎস সন্ধানে সম্পূর্ণ অক্ষম। মার্কসের মতে, পূর্ববর্তী সমস্ত বস্তুবাদের ত্রুটি এই যে, তাতে বস্তু ও সংবেদ্যতাকে কেবল বিষয় বা ধ্যান রূপে ধরা হয়েছে, মানবিক সংবেদনগত ক্রিয়া হিসাবে, ব্যাবহারিক কর্ম হিসাবে দেখা হয় নি। ফলে, বস্তুবাদের বিপরীতে সক্রিয় দিকটি বিকশিত করেছে ভাববাদ, যেখানে মানবিক ক্রিয়া বস্তুগত ক্রিয়া হিসাবে ধরা পড়ে না, তাত্ত্বিক ক্রিয়াই খাঁটি মানবিক ক্রিয়া বলে গণ্য হয়। কিন্তু মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মানুষকে তার চিন্তার সত্যতাকে অর্থাৎ ইহমুখিতাকে প্রমাণ করতে হবে। মানুষ পরিবেশ ও পরিপালনের ফল; কিন্তু পূর্ববর্তী বস্তুবাদী মতবাদ ভুলে যায় যে, মানুষই পরিবেশকে পরিবর্তিত করে এবং স্বয়ং পরিপালককেই পরিপালিত করা প্রয়োজন।

এতকাল মানুষ তার নিজের সম্পর্কে, সে কী এবং তার কী হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে, কতকগুলি মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে এসেছে। ঈশ্বর এবং স্বাভাবিক মানুষ সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা অনুসারে সে এই সম্পর্কগুলিকে সাজিয়েছে। ক্রমেই স্ব-সৃষ্ট অলীক কল্পনা, অন্ধ সংস্কার ও কাল্পনিক সত্তার কাছে, অর্থাৎ চিন্তার শাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এই চিন্তার শাসন এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছায় যার ফলে ইহলৌকিক ভিত্তিটাই নিজের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক স্বাধীন এলাকা হিসাবে মেঘলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এই ঘটনার একমাত্র প্রকৃত ব্যাখ্যা : এই ইহলৌকিক ভিত্তিটারই স্ববিভাগ ও স্ববিরোধিতা। বুর্জোয়া সমাজে মানুষ এক অনাত্মভাব বা আত্ম-বিযুক্তির দ্বারা পীড়িত। বিত্তবান ও নিবিত্ত উভয় শ্রেণীই একই আত্ম-বিযুক্তির অংশভাক্। বিত্তবান শ্রেণী এই বিযুক্তির মধ্যে পায় আত্মস্বীকৃতি, আত্মকল্যাণ এবং এরই মধ্যে সে একটা মানবিক অস্তিত্বের আভাস পায়। আর নিবিত্তশ্রেণী এই আত্ম-বিযুক্তির মধ্যে অনুভব করে আত্মবিলুপ্তি, আত্মশক্তিহীনতা, এবং এক অমানবিক অস্তিত্বের বাস্তবতা। তাই মার্কস মনে করেন, প্রথমেই এই স্ববিরোধকে দূর করতে হবে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে হবে। পবিত্র পরিবারের রহস্য পার্থিব পরিবারে আবিষ্কৃত হবার পর এই পার্থিব পরিবারটিকেই ব্যাবহারিক বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। পূর্ববর্তী দার্শনিকরা জগৎকে নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মার্কসের মতে তাকে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সামাজিক জীবন মূলত ব্যাবহারিক। যে-সব রহস্য তত্ত্বকে অতীন্দ্রিয়বাদের পথে বিভ্রান্ত করে সেগুলির সমাধান মেলে মানবিক ব্যাবহারিক কর্মের মধ্যে। ধর্মীয় অনুভূতি নিজেই একটা সামাজিক সৃষ্টি এবং ঈশ্বর নামে যে অমূর্ত ব্যক্তিটি জগৎস্রষ্টা বলে অভিহিত তিনিও প্রকৃতপক্ষে কোনো-একটা নির্দিষ্ট সমাজরূপে অন্তর্ভুক্ত। যে-সমস্ত বহিঃশক্তির দ্বারা দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত, মানুষের মনে সামগ্রিকভাবে সেগুলিরই এক অদ্ভুত প্রতিফলন হল ধর্ম; পার্থিব শক্তিসমূহই এই প্রতিচ্ছবিতে অতি-প্রাকৃত শক্তিরূপে প্রতিভাত।

ধর্মের এই অস্তিত্বই তো বিজ্ঞানের, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায়; ধর্মের ইতিহাস বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অগ্রগতির বিরুদ্ধে এক সংগ্রাম। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্ধ নির্মমতার ফলে মহান বিজ্ঞানীরা পীড়িত ও দগ্ধ হয়েছেন, তাঁদের নতুন সৃষ্টি বা আবিষ্কার ও গ্রন্থাদি বর্জন করা হয়েছে, ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি একরকম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে, জগতের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। ক্রমে প্রকৃতিবিজ্ঞানের উন্নতি ধর্মীয় ও ভাববাদী মনোভাবকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সে-জন্যই মার্কসবাদ-প্রবর্তকরাও বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক প্রচারকেই ধর্মের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্র

হিসাবে তুলে ধরেন। কিন্তু যেহেতু ধর্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা বা দমন করলে ধর্মীয় অনুভূতি আরও প্রবল আকারে দেখা দেবে, সেজন্য মার্কস ও এঙ্গেলস যে-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ধর্মের জন্ম ও প্রতিপালন সেই অবস্থাগুলিরই অবসান ঘটাতে চান। মানুষ তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রামেই—এবং বিজ্ঞানসম্মত বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারেই—ধর্মীয় অনুভূতি ও অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবে।

দুর্জ্ঞেয় নৈসর্গিক শক্তিসমূহের কাছে মানুষের অসহায়তার ফলে কাল্পনিক মহামানবের, অর্থাৎ ঈশ্বরের, এবং ক্রমে ধর্মের উৎপত্তি। সভ্যতার বিকাশের পর, বহির্বিশ্বের সক্রিয় সামাজিক শক্তিসমূহের প্রভাব যতদিন মানুষের উপর বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্তই তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কাল্পনিক প্রতিফলন হিসাবে ধর্ম ও ঈশ্বর মানুষের চিন্তায় বেঁচে থাকবে। মানবমনে ধর্মীয় প্রতিফলনের প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তি—(যে উৎপাদনের উপায় মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে, বহিঃশক্তির মতো তার দ্বারাই সে পিষ্ট, নিপীড়িত হচ্ছে)—এখনও বর্তমান, তাই ধর্মের পরমায়ুও এখনও শেষ হয় নি। আজও একথা শোনা যায় যে, মানুষ একরকম চায় আর ঈশ্বর, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের বহিঃশক্তি, তার বিপরীত ব্যবস্থা করেন। কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞানের দ্বারা তো সামাজিক শক্তি-সমূহকে সমাজের অধীনে আনা যায় না, তার জন্য প্রয়োজন সামাজিক সক্রিয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সফল হলে, উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ সামগ্রিকভাবে সমাজের আয়ত্তাধীন হবে ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। তখন সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থা থেকে, যা তার কাছে দুর্জয় বহিঃশক্তির মতো, মুক্তি পাবে। সেদিন মানুষ নিজেই বহিঃশক্তির উপর আধিপত্য করবে, তার নিজের চাহিদা অনুসারে তা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে এবং বিদ্যমান বহিঃশক্তির ধর্মীয় নির্মোকও অপসারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানবচেতনায় ধর্মীয় প্রতিরূপেরও অবসান হবে, কারণ তখন আর প্রতিফলিত হবার মতো নৈসর্গিক বা সামাজিক বহিঃশক্তি বলে কিছু থাকবে না। এবং তখনই সমাজজীবনে মানুষ প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার অর্জন করতে পারবে, এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বিচ্ছিন্নতা থেকেও মুক্তি পাবে।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কার্ল মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব

সংস্কৃতে কথা আছে যে অজ্ঞানতিমিরে যে অন্ধ, জ্ঞানাঞ্জনের শলাকা দিয়ে তার চক্ষু উন্মীলিত যিনি করতে পারেন তিনিই হলেন গুরু। কার্ল মার্কসকে যদি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গুরু বলা হয় তো অত্যুক্তি ঘটে না। কারণ ইতিহাসের ধারা বুঝতে হলে, আজকের দুনিয়াকে জানতে হলে, সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হলে কার্ল মার্কস যে-শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার অঞ্জন চোখে না মাখলে বাস্তবিকই চোখ খোলে না, ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কোনো সংগতি কোনো বিধি লক্ষ করা যায় না। আমাদের দেশে গুরুবাদ আর কর্তাভজামি এমন কটু হয়ে প্রায়ই দেখা দিয়ে থাকে যে 'গুরু' শব্দটি ব্যবহার করতে সংকোচ আসে। তবে গুরুবাদ বলে যে-বস্তু এদেশে প্রচলিত, তা থেকে মার্কসবাদের প্রভেদ একেবারে চূড়ান্ত। শিষ্যদের কাণ্ডকারখানা দেখে মার্কস একবার উত্যক্ত হয়ে বলেছিলেন : 'কী বাঁচোয়া যে আমি 'মার্কসবাদী' নই।' আন্দোলনের শৃঙ্খলারক্ষার নামে (কখনও কতকটা সংগত কারণে, কখনও বা অসংগতভাবে) মার্কসবাদের বিশুদ্ধ প্রয়োগ নিয়ে গোঁড়ামির যে-আতিশয্য বহুবার দেখা দিয়েছে, তা একেবারেই মার্কসের অভিপ্রেত ছিল না। মার্কসকে গুরু বলার অর্থ তাই স্থানকালপাত্র নির্বিশেষে তাঁর চিন্তা ও কর্মের আক্ষরিক ব্যাখ্যা নয়। প্রায় যেন পাখিপড়া বুলি আউড়ে যাওয়া নয়। মার্কসের শিক্ষা চিন্তাকে মুক্ত করেছে, আপ্তবাক্যের চাপে তার শ্বাসরোধ ঘটায় নি, শ্রেণীসভ্যতার সহস্র সংস্কারের জটিল জাল থেকে নিস্তার এনে দিয়েছে। অধিকাংশ পাঠকের কাছে ইতিহাস হল ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা। রাজারাজড়ার কীর্তি-কলাপ আর যুদ্ধবিগ্রহের ফিরিস্তি, এই যেন ইতিহাসের উপজীব্য। ছাত্রদের পক্ষ থেকে সাধারণ ইতিহাসের প্রতি কর্তব্য সমাপ্ত করা হয় কোনোক্রমে কতকগুলো অবাঞ্ছিত তথ্য

কণ্ঠস্থ করে পরীক্ষার খাতায় উদ্‌গার করে দেওয়ায়। শুধু ছাত্রদের কথাই বা কেন, গিবন্‌-এর মতো ঐতিহাসিক-শিরোমণি একবার সখেদে বলেছিলেন যে ইতিহাস যেন মানুষের অপরাধ আর নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যের তালিকা! কবি শেলি বর্তমানের ক্লেদ দূর করে ভবিষ্যসমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তিনিও বলেছিলেন 'অতীতকে নিয়ে পৃথিবী ক্লান্ত; সে-অতীত হয় মরুক্‌ নয় একেবারে বিশ্রাম নিক!' আধুনিককালে মার্কিন দেশের বিখ্যাত শিল্পপতি হেন্‌রি ফোর্ড ইতিহাসকে বলেছিলেন 'বুজ্‌রুকি' ('bunk')। এ-সব কথা যে বলা হয়েছে তার মূল হেতু এই যে ইতিহাসকে ভাবা হয়ে এসেছে শুধু কতকগুলো তথ্যের সমষ্টি, যে-তথ্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজা নিরর্থক, আর যা নাকি নিছক কতগুলি ঘটনা। আবার অনেকে ভেবেছেন যে সবকিছু ঘটেছে ঈশ্বরনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, যার অর্থভেদ মানুষের অসাধ্য। কেউ কেউ বলেছেন যে মাঝে মাঝে কয়েকজন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। কিম্বা ব্যাপারটাকে শুধু আরও ধোঁয়াটে করে অনেকে গম্ভীরভাবে বলেছেন যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগধর্ম ইতিহাসকে পরিচালনা করেছে, অথচ এক যুগের 'ধর্ম' আর-এক যুগের 'ধর্ম' থেকে তফাৎ কেন তা বোঝাতে পারেন নি। এমন অবস্থায় ইতিহাসকে 'বুজরুকি' অপবাদ যে শুনতে হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

কার্ল মার্কস ইতিহাসকে এই পণ্ডিতি বিড়ম্বনা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর আজীবন সহচর ও সহকর্মী এঙ্গেলস তাঁর সমাধিকালে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে প্রকৃতিজগতে ডারউইন যেমন বিবর্তনের বিধান আবিষ্কার করেন, তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব হল কার্ল মার্কসের। তিনি এই অত্যন্ত সহজ অথচ একেবারে সার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে বাঁচতে হলে মানুষকে সবচেয়ে আগে গ্রাসাচ্ছাদন আর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করতে হয় – রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তা না হলে সম্ভব হয় না। তাই মানুষ কিভাবে উৎপাদন করছে, আর উৎপাদন করতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, এই হল এক-একটা যুগের ইতিহাসের মূল কথা। যুগে যুগে মানুষ কিভাবে কাজ করে এসেছে, বেঁচে থাকার জন্য কিভাবে উৎপাদন চালিয়ে এসেছে, তাদের পরস্পর-সম্পর্ক কিরকম ছিল, এ-সব জানলে তবেই আমরা তাদের তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজবিধি এবং চিন্তাধারা কি ছিল এবং কেন ছিল তা বোঝার সম্ভাবনা রাখব। মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব ধারাকে অনুধাবন করলে তবেই বুঝব যে বারবার কেন যুগ বদলেছে, মন্বন্তরে মনু চলে গেছে – পরিবর্তন কেন আসে এবং কেমন করে সমাজের মানুষই ঘটাতে পারে তা জানতে পারব, সমাজবিকাশের মধ্যে যে-বিধান কাজ করে চলেছে তার সন্ধান পাব।

সতত সঞ্চরমান এই বিশ্বে কিছুই অটল অচল অবস্থায় থাকে না, সর্বদাই

অদলবদল চলেছে। কয়েকশো কোটি বছর আগে পৃথিবীটা ছিল প্রকাণ্ড আগুনের গোলার মতো। জীবন বা জীবনের সম্ভাবনা পর্যন্ত তখনও দেখা দেয় নি। বহু কোটি বছর পূর্বে প্রথম পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটল। কয়েক কোটি বছর আগে এখানে প্রচুর গাছপালা আর জলেস্থলে নানারকমের প্রাণী দেখা গেল। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে সেদিনের পৃথিবীর পার্থক্য প্রচুর, কিন্তু আমাদের জানা দরকার যে বহুযুগ ধরে অবিরাম পরিবর্তনের ফলেই পৃথিবীর বর্তমান চেহারা প্রকাশ পেয়েছে।

যুগযুগব্যাপী এই পরিবর্তন আকস্মিকভাবে বা দৈবক্রমে ঘটে নি, হঠাৎ বেখাপ্পা ধরনে ঘটে নি। একটা নিয়মিত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিধান অনুসারেই তা হয়েছে। আমরা যদি শুধু আজকের জীবন নিয়েই আলোচনা করি তো সেই বিধানের খোঁজ পাব না। তাই দেখা যায় যে যতদিন পৃথিবীর আদিযুগের খবর অজানা ছিল, যতদিন কোটি কোটি বছর আগেকার প্রাণী ও গাছগাছড়ার দেহাবশেষ ভূগর্ভ থেকে বার করা হয় নি, ততদিন বিদ্বান ব্যক্তিরাও বিশ্বাস করতেন যে হঠাৎ একদিন জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল আর গোড়া থেকেই তার চেহারা ছিল মোটামুটি আজকেরই মতন।

সেদিন পর্যন্ত এ নিয়ে অনেক রূপকথা প্রচলিত ছিল। একজন মস্ত পাদরি বলেছিলেন – আর প্রায় সবাই সে-কথায় সায় দিতেন – যে, খ্রীস্টজন্মের ৪০০৪ বছর আগে হঠাৎ এক মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ সময়ে ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে বসেন! আজ যিনি সামান্য শিক্ষাও পেয়েছেন, তিনি একে আজগুবি আর গাঁজাখুরি বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন।

পণ্ডিত-অপণ্ডিত সবাই যে আগে একথা মানতেন, তার কারণ শুধু যথাযথ জ্ঞানের অভাবই নয়। সমাজে যাদের কর্তৃত্ব, তাদের পক্ষে এরূপ ধারণা খুবই মনঃপূত ছিল। জগৎ যদি নিত্য, সনাতন, শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে তাহলে মানুষের সমাজ এবং ভবিতব্য নিশ্চয়ই তাই। আজ যে-ব্যবস্থা চলছে, ধনী-নির্ধনের ভেদাভেদের মতো যেসব প্রথা প্রচলিত, তা আগেও ছিল, পরেও থাকবে, বনিয়াদি কোনো অদলবদল সংসারে ঘটে না, ঘটে নি, ঘটবে না – একথা বিশ্বাস করা এবং অপরকে বিশ্বাস করানো সমাজপতিদের পক্ষে একান্ত মূল্যবান তো বটেই।

ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির প্রসারের ফলে একদিন আকস্মিকভাবে অপরিবর্তনীয় জগৎসৃষ্টির রূপকথা ভেঙে গেছে। আর যে-রূপকথা বলে যে সমাজ আজ যেমন আছে, আগেও মোটের উপর তেমনই ছিল, সুতরাং পরেও তাই থাকবে, সেই রূপকথার বিনাশ ঘটাচ্ছে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব। মানুষ আর মানুষের সমাজ যুগযুগ ধরে বদলে আসছে, ভবিষ্যতেও বদলে চলবে – এই হল অমোঘ নিয়ম। ভাঙাগড়ার ইতিহাস হল সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস। তাই ইতিহাস দিতে পারে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বাভাস, সহায়তা

করতে পারে ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জনে। ইতিহাস বিনা তাই রাষ্ট্রনীতি পঙ্গু। ইতিহাসবোধ না থাকলে অচেতন অবস্থায় বহু সমস্যা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তাই যেন অন্ধকারে যথাসাধ্য হাতড়ে বেড়াতে হবে।

বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বলে এসেছেন এবং আজও বলেন যে ইতিহাসে বিভিন্ন ধারা, চিন্তা, নীতি প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ বিশেষ যুগে। অর্থাৎ এক-একটি নীতি বা ধারা এক-একটি যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ-বিষয়ে মার্কস লেখেন 'দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ধরা যাক যে (ইয়োরোপে) একাদশ শতাব্দীতে কর্তৃত্বের নীতি বলবৎ ছিল, ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতিকে। সুতরাং তর্কশাস্ত্রের রীতি অনুসারে বলতে হবে যে শতাব্দীকে নীতিই নির্দিষ্ট করেছিল, শতাব্দী নীতিকে নির্দিষ্ট করে নি। অর্থাৎ নীতিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাস নীতিকে সৃষ্টি করে না। তবে যদি আমরা নীতি ('principle') এবং ইতিহাস উভয়কেই বাঁচাবার জন্য প্রশ্ন করি যে একাদশ শতাব্দীতে এক নীতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীকে অন্য-এক নীতি আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন, আর উভয় নীতিই বা একই শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে নি কেন, তাহলে বাধ্য হয়ে তখনকার খুঁটিনাটি খবর আমাদের খুঁজতে হবে, জানতে হবে একাদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ কেমন ছিল, তাদের সামাজিক জীবনের চাহিদা কি কি ছিল, তাদের উৎপাদনশক্তি কেমন ছিল, উৎপাদনের পদ্ধতিই বা তাদের কিরূপ ছিল, কোন্ কোন্ কাঁচামাল নিয়ে তারা উৎপাদন চালাত, আর অবশেষে জানতে হবে তখন মানুষে মানুষে সম্পর্ক কি ছিল··· কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা এভাবে মানুষকে তার নিজস্ব ইতিহাসের স্রষ্টা এবং সেই ইতিহাসে অভিনেতা রূপে দেখি, তখনই আমরা যেন এক চক্র ঘুরে ঠিক আসল রওনা হওয়ার জায়গায় ফেরৎ পৌঁছে যাই, কারণ তখন আমরা যে-শাশ্বত নীতি নিয়ে খোঁজ আরম্ভ করেছিলাম তাকে পথে ফেলে দিয়ে এসেছি।'

এখনও শোনা যায় যে এক-একটি নীতি বা ভাবধারা বা চিন্তার প্রকাশ এক-একটি যুগকে শুধু চিহ্নিত করা নয় তাকে প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি করেছে—যেমন কোনো একটি যুগ হল ধর্মবিশ্বাসের কিম্বা যুক্তিবাদের যুগ। আমাদের দেশে সুপরিচিত ইংরেজ ঐতিহাসিক জি. এম. ট্রেভেলিয়ন একবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইয়োরোপের তিনশো বছরের ইতিহাসে মূল বৈশিষ্ট্য দেখেছিলেন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াইয়ে, এবং গর্বভরে জানিয়েছিলেন যে ঐ যুগে তাঁর স্বদেশ ইংলণ্ড চারবার ইয়োরোপকে বাঁচিয়েছে—স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই এবং নেপোলিয়ন, আর জার্মানির কাইজার উইলিয়মের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ইতিহাস আলোচনায় এ-ধরনের গুরুগম্ভীর অথচ সত্যই হাস্যকর কথা পণ্ডিতদের কাছ থেকে প্রায়ই শোনা গিয়েছে। এই অবান্তর বাক্যবিলাস থেকে আর যাই জানা যাক, ইতিহাসের মর্মবস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে যায়। তথ্য-

সংগ্রাহকদের চিন্তায় এই যে তারল্য, মার্কস তাকে কশাঘাত করেছেন। ইতিহাসের প্রকৃতি অনুধাবন করে যে-প্রতীতি তাঁর এসেছিল তা হল এই যে যুগে যুগে মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থার ছাপ পড়েছে তার চিন্তা, তার স্বপ্ন, তার আদর্শ, তার ধ্যানধারণার উপর। চিন্তা কর্মকে নির্ণীত করে না, কর্মই চিন্তাকে নির্ণীত করে ; চেতনা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রমুখ মনীষীদের প্রতি মার্কস প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, কিন্তু ইতিহাসবিষয়ে তাঁদের শৈথিল্য মার্জনা করতে পারেন নি। এঙ্গেলস একবার কৌতুক করে লেখেন যে এইসব বিরাট পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন মনে হয় যে যদি ইংলণ্ডে একাদশ শতাব্দীতে 'সিংহহৃদয়' রাজা রিচর্ড একটু অর্থনীতির খোঁজ রাখতেন তাহলে ৬০০ বছরের বিড়ম্বনা এড়ানো যেত, কারণ রিচর্ড তাহলে আর খ্রীস্টানদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ('Crusades') সময় নষ্ট না করে দেশে দেশে স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন, আর ইয়োরোপ স্বস্তিতে থাকত!

'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে 'আজ পর্যন্ত মানুষের বহুবিধ সমাজ দেখা দিয়েছে এবং তাদের সকলেরই ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।' পাদটীকায় এঙ্গেলস জানিয়েছেন যে এখানে 'ইতিহাস' বলতে বোঝাচ্ছে 'লিখিত ইতিহাস', কারণ ১৮৪৭-৪৮ সালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃত্তান্ত খুবই অস্পষ্ট ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল তখনই, যখন মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন উপভোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠল। তখনই শ্রেণীবিভাগ সমাজে প্রথম দেখা দিল, শোষক ও শোষিতের কাহিনী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের বিবরণ আরম্ভ হল। অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতোই রাষ্ট্র স্বয়ম্ভূ, সনাতন, নিত্যস্থায়ী কিছু নয়। সমাজপতিরা জেঁকে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্তৃত্ব চালু রাখার হাতিয়ার হল রাষ্ট্রব্যবস্থা। তখনই মানুষের যে-ইতিহাস আমরা মোটামুটি জানি তার সূচনা হল, আর তখন থেকেই নানা প্রকরণে শ্রেণীসংগ্রামেরও বিরতি নেই।

অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার পর মানুষকে বহু লক্ষ বৎসর ধরে জানোয়ারদের সঙ্গে লড়তে হয়েছে, প্রকৃতি-জগতের প্রতিকূলতাকে প্রশমিত করতে হয়েছে। এ-কাজ মানুষ কোনো বিশেষ অধ্যাত্মগুণের অধিকারী বলে করে নি ; নিছক বাঁচার তাগিদেই তাকে ক্রমাগত লড়াই করে যেতে হয়েছে। এই লড়াইয়ের ফলেই মানুষ উৎপাদন করতে শিখেছে – একদা যে শুধু গাছের ফল আর জানোয়ারের কাঁচা মাংস খেয়ে জীবনধারণ করত, সেই মানুষ ক্রমে ভূগর্ভ

থেকে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে, আগুনের ব্যবহার জেনেছে, শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে নিস্তার খুঁজতে গিয়ে বহু পরীক্ষার পর ঘর বানাতে পেরেছে, পরনের বস্ত্র তৈরি করেছে, সেই মানুষই শিকারের উদ্দেশ্যে পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে কয়েক লক্ষ বৎসরের চেষ্টার পর অন্য ধাতুর সন্ধান পেয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের সে-সংগ্রামের বিবরণ মনোমুগ্ধকর; তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও এখানে দেওয়ার চেষ্টা সম্ভব নয়। শুধু বলা দরকার যে বাঁচার লড়াই চালাতে গিয়েই সভ্যতার জন্ম হয়েছে আদিম শিল্পে—যেমন গুহাগাত্রে ছবি কিম্বা বহুজনের মিলিত নৃত্যে—ঠিক সেই বাস্তব জীবনেরই রূপ আমরা দেখি। 'অমৃতের পুত্র' হয়ে জন্মে মানুষ যে অকস্মাৎ ভগবৎকৃপায় সভ্যতার ইমারৎ বানাতে লেগেছিল, তা একেবারেই নয়। খ্রীস্টান ধর্মশাস্ত্রে বলে যে প্রথমে আবির্ভূত হল বাক্য ('In the beginning was the Word')—অনেকটা হিন্দু চিন্তায় 'ওঁ' শব্দেরই মতো। কিন্তু আসলে বাক্য নয় কার্য—নিছক বেঁচে থাকার তাগিদে কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের ইতিহাস শুরু হয়েছে। জীবন স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই একান্ত সংকীর্ণ ও বিশিষ্ট পরিবেশে বসবাসকারী, ক্রমশবিরল আদিম গোষ্ঠী ব্যতিরেকে সর্বত্র উৎপাদনপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উৎপাদনে উন্নতির মূল্যও মানুষকে দিতে হয়েছে প্রচণ্ড। আদিম সমাজে রাষ্ট্র ছিল না, দণ্ড ছিল না, জুলুম-জবরদস্তির অধিকার কয়েকজনের হাতে ন্যস্ত ছিল না, কতকটা অভ্যাসের বশে এবং সম্মানী ব্যক্তিদের প্রভাবে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হত। উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন একজনের পরিশ্রম-ফল অপরের পক্ষে বিনা পরিশ্রমে ভোগ করার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন সেই অতিরিক্ত উৎপাদন গ্রাস করল কিছু লোক যারা হল সমাজপতি, যারা পরশ্রমভোগী হয়ে নানাকৌশলে নিজেদের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করতে লাগল। এই সময় থেকেই দাসপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, আর তখন থেকেই চলে এসেছে শ্রেণীকর্তৃত্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব। দাসপ্রথা, ভূমিদাসপ্রথা, জায়গিরদারি, জমিদারি, পুঁজিদারি—সকল ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য হল যে সমগ্র জনতার তুলনায় নিতান্ত অল্পসংখ্যকের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা চলেছে; আধুনিক যুগে গণতন্ত্রের মুখোস এঁটেও শ্রেণী-শাসনের প্রকৃত রূপকে ঢেকে রাখা সম্ভব হয় নি।

গ্রীসের মহামনীষী প্লেটো ও অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে দাসপ্রথা একান্ত স্বাভাবিক, প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মতোই অকাট্য। তৎকালীন সভ্যতার পিলসুজ হয়ে ছিল দাসের দল, উপরে জ্বলত সভ্যতার প্রদীপ আর তারই ঠিক নিচে অন্ধকারে দাসেরা মেহনতের জোরে সেই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখত। মাঝে মাঝে ক্ষীণ কবিকণ্ঠে দাসপ্রথা নিন্দিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সংগঠনের পথে অপার বাধা সত্ত্বেও দাসেরা বারবার অভ্যুত্থান করেছিল বলেই ক্রমে তা অবলুপ্ত হয়েছিল। মহানুভবদের করুণায় তা ঘটে নি, ঘটেছে কঠোর অকরুণ শ্রেণী-

সংঘাতের ফলে। অধিকারীশ্রেণী যখন বুঝল যে আগেকার কায়দায় দাসদের পদানত রাখা আর চলে না তখনই সে-প্রথা রদ হতে লাগল। আজও এমন অঞ্চল আছে যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম ঐ পর্যায়ে উঠতে পারে নি বলে দাসপ্রথাও বহাল আছে।

দাসপ্রথা থেকে ভূমিদাসপ্রথার বিবর্তন একটা বিপ্লব বটে, কিন্তু তখনও শোষণ-ব্যবস্থার অবসান ঘটতে বহু বিলম্ব – মাত্র শোষণের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তখন সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী হল জায়গিরদার-জমিদার গোষ্ঠী ; রাজাকে পর্যন্ত তাদের সহায়তা ও সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হল ; ধর্মযাজকরা মঠ বা গির্জার সংলগ্ন জমির উপর দখল নিয়ে বসল। দেশে দেশে সামন্ততন্ত্রের চেহারা কিছুটা পৃথক হলেও সর্বত্র তখন গ্রাম্যজীবনের ছাপ ছিল বেশি, কৃষিকর্মই প্রধান বৃত্তি। মুষ্টিমেয় শহরবাসীর চাহিদার জন্য, রাজা এবং পারিষদদের বিলাস-ব্যসনের দ্রব্য উৎপাদনের জন্য, ছোট ছোট কারখানা কিছু ছিল। ক্রমশ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের গুরুত্ব বাড়তে লাগল, তবে জীবনের গ্রন্থি বাঁধা ছিল গ্রামের সঙ্গে, শহরগুলো কিছুটা যেন বেখাপ্পা অবস্থায় রয়ে গেল। সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের পূর্বেও অবশ্য দেশে দেশে বাণিজ্যের বহু দৃষ্টান্ত আছে ; প্রাচীন ভারতবর্ষ তো পশ্চিম এশিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা করত। কিন্তু 'ফিউডল' (সামন্ততান্ত্রিক) যুগের শেষ দিকে বাণিজ্যের প্রসার ইয়োরোপের শহরগুলিতে নূতন এক স্তরে উপনীত হল। অজ্ঞাতপূর্ব এক সামাজিক শ্রেণীর তখন উদ্ভব হল যারা 'বুর্জোয়া' ('নগরবাসী'), যারা জায়গিরদারি ব্যবস্থায় বাণিজ্যের ক্ষতি লক্ষ করে প্রায়ই জায়গিরদারদের ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত এবং কথঞ্চিৎ বিপন্ন রাজাকে সাহায্য করল, নিজস্ব অধিকার আদায় করল, আর চেষ্টা করল যাতে গোটা দেশে একধরনের শাসন স্থাপিত হয়, ব্যবসার মাল লেনদেন করতে গিয়ে নানান্ জমিদারের এলাকায় নানাবিধ শুল্ক না দিতে হয়, আর দরকারমতো গ্রামাঞ্চল থেকে কারিগর জোগাড় করা যায় হরেক রকম খাজনা, ভেট্, বেগারি, মাঝে মাঝে জমিদারের হুকুমে তার হয়ে যুদ্ধে যাওয়া ইত্যাদি দায় থেকে নিস্তার পাবে। শহর আর বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে আর খুব বেশিদিন সামন্ততন্ত্র টিকবে না।

মুসলমানদের দখল থেকে খ্রীস্টান তীর্থগুলোকে উদ্ধার করার যে-লড়াই বহুদিন ধরে চলেছিল ('ক্রুসেড্স') তার টান শুধু ধর্মের নয়, অর্থেরও। এর আনুষঙ্গিক ফল হল বাণিজ্যের বৃদ্ধি, এশিয়ার ঐশ্বর্য দেখে ইয়োরোপের বিস্ময়, আর কিছু পরে অগাধ দৌলতের দেশ বলে বিখ্যাত ভারতবর্ষে পৌঁছাবার জলপথ খুঁজতে গিয়ে কলম্বস করলেন আমেরিকা আবিষ্কার, আর দুশো বছর ধরে বহু নৌ-অভিযান চলল। ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপ নবাবিষ্কৃত দেশগুলোকে দুই ভক্ত দেশ স্পেন এবং পর্তুগালের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিলেই ইংলণ্ড, হলাণ্ড প্রভৃতি

খাপ্পা হয়ে ওঠে, পোপকে অমান্য ক'রে 'প্রটেস্টান্ট' হওয়ার একটা বড় কারণ হল তাই। যাই হোক, অর্থনীতির ধাত আর উৎপাদনপদ্ধতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস বদলাতে লাগল, যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলছে ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে। টিউডর শাসনের যুগে (১৪৮৫-১৬০৩) পশম আর পশমি দ্রব্যের ব্যবসা খুবই লাভজনক হওয়ায় চাষের জমি থেকে চাষীকে খেদিয়ে মেষপালনের বন্দোবস্ত হয়, মস্ত বড় এলাকা ('enclosure') ঘিরে একটা রাখাল রাখলেই কাজ চলত বলে চাষীদের উৎখাত করা হল, তারা সর্বস্বান্ত হয়ে বেকারের ভিড় বাড়ালো শহরে, সেখানে 'ভবঘুরে' অপরাধে তাদের বেত্রাঘাত ও অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হল — মানবপ্রেমিক টমাস মূর তাঁর 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে তাই লিখলেন : 'মানুষকে ভেড়ার দল গিলে খাচ্ছে!' এই ব্যবসা জাঁকিয়ে চালাবার জন্য ক্যাথলিক গির্জা আর মঠগুলোর বিপুল ভূসম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল, রাজাকে যারা এ-কাজে সাহায্য করেছিল তাদের মধ্যে এই সম্পত্তি বণ্টন করা হল, নূতন এক ধনবান সম্প্রদায় সৃষ্টি হল। টিউডরের পর স্টুয়ার্ট যুগে (১৬০৩-৮৮) বাণিজ্য এবং তৎসম্পর্কিত পেশা থেকে যাদের উপার্জন তারা রাজা এবং তাঁর অভিজাত বন্ধুদের হাত থেকে দেশশাসন এবং প্রধানত বাণিজ্যনীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে গিয়ে যে-লড়াই চালায় (১৬৪২-৬০), তাতেই রাজা প্রথম চার্লস-এর প্রাণ যায়, পার্লামেন্টের ক্ষমতা বাড়ে। মধ্যযুগে, যখন সামন্ততন্ত্র ছিল প্রধান, তখন রাষ্ট্রশাসনবিষয়ে যাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, সেই শ্রেণীই এসে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

এর চেয়ে বনিয়াদি ঘটনা হল ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯৫), যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল কিছুকাল আগে থেকে। ১৭৬০ সাল নাগাদ শিল্পে, উৎপাদনপদ্ধতিতে বাষ্পযান ইত্যাদি নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োগ আরম্ভ হল, উৎপাদনের পরিমাণ যন্ত্রের সহায়তায় পূর্বের তুলনায় অভাবনীয় ধরনে বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে পশ্চিমের বহু জাতির বণিক ও নাবিক মিলে এশিয়ায় (ভারত ও অন্যত্র) এবং আমেরিকায় হাজির হয়ে সেখানকার দৌলত লুঠ করে আনতে পেরেছিল বলে বড় বড় কারখানা ফাঁদার পক্ষে প্রয়োজনীয় টাকাও ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠীদের হাতে মজুদ ছিল। এ জন্যই যে-বাষ্পযান সম্বন্ধে দু-হাজার বৎসর পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের স্পষ্ট ধারণা সত্ত্বেও তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ ঘটে নি, সেই বাষ্প-যানের কদর হল। লোভী ধনবানেরা চাষীর জমি কেড়ে তাকে উৎখাত করার ফলে একদিকে পেটের দায়ে বহু লোক মজুরি খুঁজছিল, আর অন্য দিকে নানা দেশে বাণিজ্য করে এবং সওদাগরের ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রথম ধাপ পার হয়ে সেখানকার টাকা আর কাঁচামাল শ্রেষ্ঠীরা ইয়োরোপে চালান দিচ্ছিল বলে শিল্পবিপ্লব হল, ঘটল ধনিকের আবির্ভাব, প্রবর্তিত হল বুর্জোয়া যুগ, সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটল। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে

আছে কার্ল মার্কসের অবিস্মরণীয় উক্তি : 'টাকা দুনিয়ায় প্রথম আসে তার গালে জন্মসময়ের রক্তের ছাপ নিয়ে, কিন্তু পুঁজি যখন এসে হাজির হয় তখন তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।' সেই পুঁজির চেহারা যে কত বীভৎস আর অমানুষিক হতে পারে তা যারা আজ অ্যাটম আর হাইড্রোজেন বোমার হুমকি দিয়ে গোটা দুনিয়াটা কব্জা করে রেখে নিজের মুনাফার পাহাড়কে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে চায়, যারা ভিয়েৎনামের অকুতোভয় মুক্তিকামনাকে পরাজিত করার জন্য অমানুষিকতার চূড়ান্ত করতে পশ্চাৎপদ নয়, তাদের দিকে নজর দিলেই জানা যাবে।

'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এ ঘোষিত হয়েছিল : 'আজ পর্যন্ত মানুষের যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন মানুষ ও দাসগণ, অভিজাত ও সাধারণ লোক, মধ্যযুগের 'গিল্ড' (কারিগর-সংস্থা) প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ও তাদের মেহনতকারী কর্মচারীরা, এক কথায় প্রতি যুগের অত্যাচারী ও অত্যাচারিত শ্রেণী সর্বদা পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে আবার কখনও মুখোমুখি হয়ে।... 'ফিউডল্' সমাজের ধ্বংসাবশেষ হতে আধুনিক যে-বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিরোধ স্তব্ধ হয়ে যায় নি। নূতন সমাজ শুধু প্রতিষ্ঠা করেছে নূতন শ্রেণী, অত্যাচারের নূতন ব্যবস্থা, পুরাতনের বদলে সংগ্রামের নূতন ধরন। আমাদের যুগ অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে শ্রেণীসংগ্রাম এখন সরল হয়ে এসেছে। গোটা সমাজ ক্রমেই দুটো বিশাল শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে— বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট (সর্বহারা) এই দুই বিরাট শ্রেণী সোজাসুজি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।'

ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে মার্কসবাদ লক্ষ করেছে যে এক-একটি যুগে উৎপাদনের যে-পদ্ধতি প্রচলিত, তারই আনুষঙ্গিক রূপে উৎপাদনের ফলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মানুষের পরস্পর সম্পর্কের বিষম অসংগতি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া যুগে উৎপাদনপদ্ধতি বিজ্ঞানের কল্যাণে এমনই শক্তিশালী যে উৎপাদন-ফল সকল মানুষের জীবনে স্বস্তি আনবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বুর্জোয়া যুগে উৎপাদনসম্পর্ক এমন, অর্থাৎ বুর্জোয়া ও প্রলেটেরিয়ট, বিত্তবান ও নির্বিত্ত, মালিক ও মজুরের সম্পর্ক এমন যে যথাসম্ভব বেশি মুনাফার লোভে মালিক মজুরকে যথাসম্ভব বেশি শোষণের চেষ্টা করে এবং মজুর একজোট হয়ে শ্রেণীস্বার্থ-রক্ষার লড়াইয়ে নেমে ক্রমশ বুঝতে পারে যে বুর্জোয়া শ্রেণীরই উচ্ছেদ বিনা তার স্বস্তি বা সুখের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থে যে অবিরাম সংঘাত চলতে থাকে, তারই চরম চেহারা দেখা যায় বিপ্লবের সময়ে, যখন প্রাচীন সমাজশক্তি নবীনের কাছে পরাজিত হয়, যেমন হয়েছিল ১৯১৭ সালের সোভিয়েট

বিপ্লবে। সমাজের আভ্যন্তরীণ এই সংঘর্ষ একসময় এমনই পরিণতির পরিস্থিতিতে উপনীত হয় যে (কার্ল মার্কসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়) সামাজিক কাঠামোর ভিতরকার গ্রন্থিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয় শোষকদের অন্ত্যেষ্টির দিন এসে উপস্থিত হয়, যারা শ্রমিকদের উৎখাত করেছিল, সবদিক থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল, তারা নিজেরাই উৎখাত হয়ে যায়।

মার্কসের মতে ইতিহাসের শিক্ষা হল এই যে শ্রেণীসমাজের মধ্যে তারই দেহ-সম্ভূত অসংগতি ঠিক যেন মাতৃগর্ভে নবজাতকের আবির্ভাব ও জন্মের মতো। নূতন সমাজের আবির্ভাব ও জন্মের মধ্য দিয়ে পরিপূরিত হয় এবং তখনই সমাজের ইতিহাসের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৮৫৬ সালে মার্কস লিখেছিলেন 'আমাদের যুগে প্রত্যেক বস্তুই যেন তার বিপরীত, যা তার সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। আমরা দেখছি, যে-যন্ত্র মানুষের পরিশ্রমের লাঘব ঘটাবার এবং তাকে সুফলপ্রসূ করার আশ্চর্য শক্তি রাখে, সেই যন্ত্র মানুষকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করাচ্ছে অথচ উপবাসী রাখছে। কোন্ এক বিস্ময়কর মোহমন্ত্রে যেন সম্পদের নব রীতিসিদ্ধ উৎসগুলি অভাবের উৎসে পরিণত হচ্ছে। মানুষ যখন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারছে, তখনই সে যেন অপর মানুষের কিম্বা নিজেরই কলঙ্কের দাস হয়ে পড়ছে। তবে আমরা জানি যে সমাজে নূতন ঢঙের যে-শক্তি আজ এসেছে তাকে যদি সন্তোষজনক কাজে লাগাতে হয় তাহলে নূতন ঢঙের মানুষকে দিয়েই সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—আর এই নূতন ঢঙের মানুষ হল মেহনতি মানুষ। যন্ত্রের মতোই এই মেহনতি মানুষ হল আধুনিককালের আবিষ্কার।'

ইতিহাসের নিগূঢ় বাস্তব বিশ্লেষণ দ্বারা মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবং নিঃসংকোচে ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নিঃসংশয় ভবিষ্যদ্বাণী—উৎপাদন-পদ্ধতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন উৎপাদনসম্পর্কে যখন আর সামঞ্জস্য থাকে না তখন বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যাখ্যাতে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে মার্কসের কাছে মানুষ হল গৌণ, মুখ্য বস্তু হল ইতিহাস বলে প্রায় যেন এক মনঃসৃষ্ট ধারণা।—উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যদি যুগান্তর ঘটে তো মানুষ হল নিষ্ক্রিয়, তার নাগালের বাইরে কোনো এক গূঢ় শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। মার্কসের রচনাবলি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো-একটি বাক্য তুলে ধরে এই আপত্তিকে যুক্তিসংগত বলে প্রচার করা দুরূহ নয়। 'ক্যাপিটাল'-এ আছে এমন কথা যে ইতিহাস 'অমোঘ লৌহগতিতে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।' কিন্তু শুধু বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃতি তুলে ধরা সততার পরিচয় নয়, আর আজ একশো বছরেরও বেশিকাল মার্কসের সমালোচকরা পাণ্ডিত্য দেখালেও প্রকৃত সততা দেখিয়েছেন অতি কদাচিৎ। জনসমষ্টির সক্রিয়, সদাচলমান আন্দোলন বিনা যে যুগান্তর সম্ভব নয়, তা মার্কস বহুবার বলেছেন, বুঝিয়েছেন,

নিজের জীবনে ও কর্মে প্রমাণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অবদানকে অস্বীকার করা দূরে থাক তাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে মার্কসবাদের শিক্ষা হল এই যে ইতিহাসের বিধি যথাসম্ভব জানতে পারার উপর মানুষের স্বাধীন কর্ম-প্রচেষ্টা সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করছে। সেই বিধির পরিধি না জানা থাকলে মানুষের পক্ষে সফল কর্মে নিরত হওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র স্বাধীন চিন্তার জোরে কেউ কি প্রকৃতির বিধান অগ্রাহ্য ক'রে নিজের শরীরের দৈর্ঘ্যে একহাত বৃদ্ধি ঘটাতে পারে? পদার্থবিজ্ঞানের বিধি অনুযায়ী মানুষের পক্ষে স্বয়ং আকাশে উড়ে যাওয়া অসম্ভব জেনে তবেই মানুষ আকাশযানে বিচরণ করতে শিখেছে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মানুষকে খর্ব করে না, তার মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমির উপর।

নিকৃষ্ট স্তরের সমালোচকদের পক্ষ থেকে কুৎসা রটানো হয়েছে যে মার্কসের মতে মানুষ হল স্বার্থপর, নিছক অর্থনীতিগত উদ্দেশ্যে তারা কাজ করে, অর্থাৎ মার্কসবাদ উদার মানবতার ইতিবৃত্তকে নস্যাৎ করে দেয়। কিন্তু কখনও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঐ ধরনের নিরেশ কথা বলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফরাসি বিপ্লবকালে 'জিরন্দ্' দল সম্পর্কে মার্কসবাদী ঐতিহাসিক যখন লেখেন তারা নিজেদের শ্রেণীর কর্তৃত্ব বাকি সকলের উপর চাপাবার জন্যই ব্যস্ত ছিল, তখন হয়তো 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র বাণীতে মুগ্ধ হয়ে কেউ বলতে পারেন যে কন্দর্সের মতো দার্শনিক কখনও শুধু শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হতেন কল্পনাও করা যায় না, সুতরাং তাঁর দলের কাজকে ঐভাবে চিহ্নিত করা অপবাদ-মাত্র। কিন্তু মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের কাছে নিছক ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অনুসন্ধান করা একটা গৌণ ব্যাপার; ইতিহাসের মঞ্চে যাঁরা নেমেছেন তাঁদের বিচার হবে বাস্তব কৃতকর্মের ভিত্তিতে—এ জন্যই লেনিন একবার বলেন যে কোনো একজন ব্যক্তি খুবই 'আন্তরিক' ('sincere')-ভাবে কাজ করে থাকতে পারেন, কিন্তু আন্তরিকতার পরিমাপ করতে পারে এমন যন্ত্র ('sincerometer') যখন আমাদের নেই তখন কাজই হবে বিচারের মানদণ্ড, কারণ কাজ হল বাস্তব ব্যাপার, তার হদিস পাওয়া কঠিন নয়। ইতিহাস আলোচনায় মুখ্য কর্তব্য হল জানার চেষ্টা করা যে কেন একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ আদর্শ বহুজনের মনে স্থান পেল। মার্কসবাদ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে আদর্শ আকাশ থেকে টুপ করে পড়ে মনের ভিতর ঢোকে না, কিম্বা হঠাৎ আপনা-আপনি মাটি থেকে গজিয়ে ওঠে না—জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই তার উদ্ভব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যদি বলত যে মানুষ সর্বদা তার স্বার্থসাধনের জন্যই কাজে নামে তো নিশ্চয়ই তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াত। স্বয়ং মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড লেখা শেষ করে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'ঘাঁড় হয়ে জন্মালে' তিনি নিশ্চয়ই সব কিছু ভুলে ঐ গ্রন্থ রচনায় কায়মনোবাক্যে লাগতে পারতেন না!

মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে না ইতিহাস মানুষকে গড়ে, এ-প্রশ্নের উত্তর মার্কস-এঙ্গেলস খুবই স্পষ্টভাবে দিয়েছেন 'মানুষ ইতিহাস গড়ে, তবে যেমন খুশি তেমনভাবে নয়।' তাঁরা একবার লেখেন : 'ইতিহাস কিছু করে না ; তার 'বিপুল সম্পদ নেই' ; ইতিহাস যুদ্ধ করে না', এ-সব কাজ করে মানুষ, জীবন্ত, সক্রিয় মানুষ – তারই আছে সম্পদ, সে-ই যুদ্ধ করে। 'ইতিহাস' কোনো-একটি ব্যক্তির মতো নিজের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মানুষকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে না। নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে মানুষের কার্যকলাপ ছাড়া ইতিহাস আর কিছু নয়।' ('পবিত্র পরিবার')। মানুষের মহিমা, মানবমাহাত্ম্যের বিভূতি কার্ল মার্কসের বাক্যে ও কর্মে জাজ্বল্যমান হয়ে রয়েছে। ইতিহাস অনুধাবন করেই মার্কসবাদ একদিকে যেমন নভোচারিতাকে বর্জন করতে চেয়েছে তেমনই অপর দিকে বলেছে 'অকাট্য বিধির রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে মানুষের উত্তরণ'-এর কথা ('the ascent of man from the kingdom of necessity to the kingdom of freedom')।

অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপর সব চেয়ে বেশি জোর দিলেও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলে না যে ইতিহাসে অন্যান্য শক্তির মূল্য নেই, বলে না যে একই সোজা, বাঁধা রাস্তা দিয়ে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটবে। বরঞ্চ মার্কসের শিক্ষা হল এই যে ইতিহাস হল পরস্পরসম্বদ্ধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির জটিল সমাবেশ। ১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর এঙ্গেলস এক চিঠিতে লেখেন : 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে ইতিহাসনিয়ন্ত্রণে চরম শক্তি হল বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্কস কিম্বা আমি এর বেশি কিছু কখনও দাবি করি নি। সুতরাং যদি কেউ আমাদের কথা বিকৃত করে বলে অর্থনীতি হল ইতিহাসনিয়ন্ত্রণে একমাত্র শক্তি, তাহলে সেটা হবে অর্থহীন, অবান্তর এবং উদ্ভট। অবশ্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হল বনিয়াদি, কিন্তু সেই বনিয়াদের উপর যেসব বিভিন্ন কামরা বানানো হয় – যেমন শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক চেহারা এবং তার ফলাফল, জয়ের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংবিধান ইত্যাদি, আইন-কানুনের রকমফের, এমন কি তারপর সংগ্রামে যারা অংশ গ্রহণ করছে তাদের মস্তিষ্কে বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন, রাষ্ট্রনীতি, শাসন-বিধি, দর্শনবিষয়ক মতবাদসমূহ, ধর্মচিন্তা এবং অকাট্য সিদ্ধান্তের মধ্যে সেই চিন্তার বিকাশ – এ-সমস্ত ব্যাপারই ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতিকে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে সেই সংগ্রামের রূপকে পর্যন্ত নির্ণীত করে দেয়। এইসব ধারার মধ্যে একটা পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে।...তা না হলে ইতিহাসের যে-কোনো যুগে (মার্কসের) ঐ নীতি প্রয়োগ করা বীজগণিতের একটা সরল সমীকরণের চেয়েও সহজ হত।'

আর একটি চিঠিতে এঙ্গেলস খেদ করে বলেছিলেন যে বস্তুবাদের নামে অনেকে এতদূর যায় যে বিভিন্ন চিন্তাধারা ইতিহাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে একথাও তারা মানতে চায় না। বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তার কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই; চিন্তা কর্মের সঙ্গে, জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সর্বদাই সংলগ্ন থাকতে বাধ্য। কিন্তু চিন্তাধারা যে ইতিহাসে কোনো প্রভাব ফেলে না, একথা ভুল। আবার এক চিঠিতে তিনি অনুযোগ করেন 'এরা সবাই 'ডায়ালেক্‌টিক' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না। এরা শুধু দেখে যে একদিকে কারণ আর অন্যদিকে কার্য। এরা বোঝে না যে এভাবে বিচার করলে সিদ্ধান্ত হবে একেবারে অবাস্তব; এরা বোঝে না যে বস্তুজগতে এমন প্রখর, প্রকট, চিন্তাপ্রসূত বৈপরীত্য দেখা যায় কেবল তখনই যখন পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত সংকট উপস্থিত হয়; এরা বোঝে না যে সাধারণত (সমাজবিকাশের) সমগ্র বিরাট পদ্ধতি বিকলিত হতে থাকে বিভিন্ন ও অসমান শক্তি ও ধারার ঘাতপ্রতিঘাতে, আর তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই সব চেয়ে শক্তিশালী, সব চেয়ে প্রাথমিক এবং যুগান্তকারী হল অর্থনৈতিক অগ্রগতি।' মার্কস-এঙ্গেলসের এই শিক্ষা আত্মস্থ করে লেনিন একবার বলেন যে বিপ্লব কখনও সোজা, পাকা রাস্তা দিয়ে চলে না, সর্বদাই যে বিপ্লবের কাজ একই ঢঙে চলবে তা নয়, অনেক আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে, মাঝে মাঝে পিছু হটে পর্যন্ত, এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মূলগতভাবে সামাজিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এক-একটা যুগের চিন্তায় নয়, পাওয়া যায় তার বাস্তব উৎপাদনব্যবস্থায়। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে অন্য বহু ধারা অল্পাধিক প্রভাববিস্তার করতে পেরেছে বলে সর্বদা বহুমুখী পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ ক'রে তবেই বিপ্লবী কর্তব্যের প্রকৃত সন্ধান মিলবে। বিপ্লব নিশ্চয়ই অনিবার্য, সমাজদেহের মধ্যেই তার অঙ্কুর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু সর্বসময়ে সেই অবশ্যম্ভাবিতার কথা স্মরণ ক'রে যত্রতত্র বিপ্লবের আওয়াজ তুলে বেড়ানো একরকমের বিপজ্জনক বিলাসিতা যাকে মার্কসবাদসম্মত বলা অন্যায় হবে।

বর্তমান যুগে ধনবাদের পতন ও সমাজবাদের জয় সম্বন্ধে সর্বোপরি কার্ল মার্কস বাস্তব বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে শতাধিক বর্ষ পূর্বে সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন। সমাজতাত্ত্বিকরূপে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ তাঁর বৃত্তি ছিল না, গণৎকারের মতো দিনক্ষণ গুণে মানবসমাজের কোষ্ঠীবিচার করতে তিনি বসেন নি। বুর্জোয়া ব্যবস্থারই আত্মজ হয়ে যে অমিত-তেজ শ্রমজীবী শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, তার চেতনা আজ প্রখর, সর্বদেশে যুগান্তর সংঘটনের অনুকূল পরিস্থিতি প্রস্তুত হয়ে আসছে, জগৎ জুড়ে জনতার জয়ের আর অতিরিক্ত বিলম্ব নেই। অর্ধশতাব্দী পূর্বে সোভিয়েট বিপ্লবে যার ভাস্বর সূচনা, বর্তমানে সর্বদেশে জায়মান সেই নবসমাজ আজ সর্বদেশে মহামনীষী কার্ল মার্কসের ১৫০-তম জন্মজয়ন্তীকে অভিবাদন জানাচ্ছে। সর্বোপরি তাঁর কাছ

থেকে বিশ্বের মেহনতি মানুষের আন্দোলন শিক্ষা নিয়েছে, অনুপ্রেরণা পেয়েছে। মার্কসের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গুহ্যতত্ত্বে তাদের বিশ্বাস নেই, শুধুমাত্র আবেগ-সঞ্জাত মনোভাব তাদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়, দৈব অনুগ্রহে বা কোনো অতিমানবিক প্রক্রিয়ার ফলে স্বর্গরাজ্যের দ্বার একদিন উন্মুক্ত হবে সে-আশার কুহকে তারা মুগ্ধ নয়। মার্কসবাদী জানে যে ইতিহাসে যে-শক্তিপুঞ্জ সক্রিয় হয়ে রয়েছে, মানুষ সেখানে প্রধান। মার্কসবাদী জানে যে নিয়তির মতো অনিবার্য-ভাবে ভবিষ্যৎ সমাজ এসে উপস্থিত হয় না। সমাজের বিবর্তন অকাট্যভাবে ধনিক ব্যবস্থার পতন এবং সমাজবাদের অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করছে বটে, কিন্তু সেই শুভ ঘটনার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হয়ে নেই, মানুষের স্বকীয়, সংহত প্রচেষ্টা বিনা বিপ্লব সাঙ্গ হবে না, নব সমাজের আবির্ভাব ঘটবে না। সমাজবাদের অভ্যুদয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কল টিপে পুতুল বেরিয়ে আসার মতো একদিন নূতন ব্যবস্থার জন্ম হবে না—'জয় কখনও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এসে হাজির হয় না ; তাকে হাত ধরে টেনে আনতে হয়।'

ভারত প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস

সুনীল সেন

মার্কসের জন্মের দেড়শো বছর পূর্ণ হল। সমসাময়িক চিন্তার উপর মার্কসীয় তত্ত্বের গভীর প্রভাব আজ স্বীকৃত। দেড়শো বছরে অর্থনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা হয়েছে, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ প্রয়োজন সেইসব তথ্যের আলোকে মার্কসীয় তত্ত্বকে বোঝা এবং যাচাই করা। এঙ্গেলস স্বয়ং বলেছিলেন, মার্কসের বিশ্ববীক্ষা নিছক 'নীতি নয়, এটা একটি পদ্ধতি,' আর এই পদ্ধতি নতুন অনুসন্ধান চালানোর ভিত্তি[১]। অনুসন্ধান চালানো, তথ্যসংগ্রহ, কোনো বিশেষ পর্বের পরিস্থিতি বোঝার জন্য মার্কসীয় তত্ত্বের প্রয়োগ বড় কথা। মার্কসীয় তত্ত্ব বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান বলেই মার্কসীয় তত্ত্ব সৃজনশীল। শুধু উদ্ধৃতির সাহায্যে এই তত্ত্ব বোঝা যায় না ; প্রয়োগের মাধ্যমে এই তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়। ভারত প্রসঙ্গে মার্কসের লেখার মধ্যে একটা বিশেষ পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতের মুক্তি এবং সামাজিক প্রগতি কোন্ পথে সম্ভব তার নির্দেশ মার্কসের লেখায় প্রতিভাত। এই প্রাচীন দেশের সমাজজীবন কীভাবে এবং কেন প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল, ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল কি, মার্কসের চোখে তা ধরা পড়েছিল। মনে হয় যে মার্কসের মূল সিদ্ধান্ত (সব কটি উক্তি নয়) আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তদুপরি মার্কসের লেখা থেকে আমরা পাই একটি অন্তর্দৃষ্টি, ঐতিহাসিক বিবর্তনের সমগ্র রূপ আমাদের মনে ধরা পড়ে। ১৮৫৩ সনে (অর্থাৎ 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' প্রকাশিত হবার পাচ বছর পরে) মার্কস নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধমালা লিখেছিলেন। মার্কসের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধমালা স্থান পায়। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, এই প্রবন্ধমালার অংশবিশেষ (যেমন রেলওয়ে

প্রসঙ্গে মার্কসের উক্তি) আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচিত, কিন্তু মার্কসের পরস্পরযুক্ত মূল বক্তব্যগুলির আলোচনা অসমাপ্ত। মার্কসের মূল বক্তব্যগুলি কী?

প্রথমত, মার্কস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধ্বংসাত্মক ভূমিকা বর্ণনা করেছেন। এই একই বিষয়ে লিখেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের বিকাশের অংশ হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকার বিশ্লেষণ মার্কসের লেখার বৈশিষ্ট্য। মার্কস লিখেছিলেন, ব্রিটেনের উদীয়মান শিল্পপুঁজি ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের বিরোধী; ভারতে উদ্বৃত্ত পুঁজি রপ্তানি করবার পথে বাধা কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার; শিল্পপুঁজির আক্রমণের মুখে এই বাধা শেষপর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটিয়ে। ভারতে শোষণব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য শিল্পপুঁজি 'নতুন উৎপাদিকাশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন' ('the necessity of creating fresh productive powers') অনুভব করেছিল; এই অংশ লক্ষ করছিল, ভারতে তাদের বাণিজ্য অবনতির মুখে। দেশের উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের জন্যই রেলওয়ের সৃষ্টি, সেচ-ব্যবস্থার সূচনা[২]।

দ্বিতীয়ত, শতাব্দীর পুরনো গ্রাম-ব্যবস্থা, মার্কসের মতে, প্রতিক্রিয়াশীল; এই ব্যবস্থা মনকে সংকীর্ণ করে, কুসংস্কারের যন্ত্রে পরিণত করে হস্তশিল্প ও কৃষির মিতালি উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের পথে বাধা; এই ব্যবস্থা প্রাচ্য স্বেচ্ছাতন্ত্রের ভিত্তি। আমাদের জাতীয়তাবাদী লেখকরা গ্রাম-ব্যবস্থার ভাঙনে অনেক অশ্রুপাত করেছেন; মার্কসের মতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে গ্রাম-ব্যবস্থার ভাঙন সামাজিক প্রগতির পথ পরিষ্কার করেছিল। স্পষ্টই মার্কস ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও শিল্পায়নকে প্রগতির শর্ত মনে করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সহায়ক। গ্রাম-ব্যবস্থার ভাঙন ঘটিয়ে ব্রিটিশ (যদিও 'ঘৃণ্য উদ্দেশ্য দ্বারা' প্রণোদিত হয়ে) নতুন সমাজের বাস্তব ভিত্তি রচনা করেছিল[৩]।

তৃতীয়ত, মার্কস এই একই বক্তব্যের সূত্র ধরে ভারতে রেলওয়ে স্থাপনের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর প্রসিদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন। এদেশে রেলপথ স্থাপনে ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তুলা এবং অন্যান্য কাঁচা মাল অল্প খরচে সংগ্রহ করা। কিন্তু ভারতের মতো সুবিশাল দেশে, যেখানে কয়লা এবং লোহা পাওয়া যায়, রেলপথ স্থাপিত হলে শিল্পের বিকাশ অনিবার্য। রেলপথ স্থাপনের ফলে যে আধুনিক শিল্প গড়ে উঠবে তা জাতিভেদ-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো সমাজ ভেঙে ফেলে প্রগতির পথ খুলে দেবে। অবশ্য ভারতীয় জনসাধারণের সামাজিক অবস্থায় উন্নতি আসবে না; তার জন্য দরকার শুধু উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ নয়, উৎপাদিকাশক্তির উপর জনসাধারণের মালিকানা। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই পথ। ধনতান্ত্রিক বিকাশ সৃষ্টি করবে ভারতের সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের সম্ভাবনা—এই ছিল মার্কসের চিন্তার ধারা।

ঐ বিখ্যাত প্রবন্ধের শেষ অংশ (যার অনুবাদ বর্তমান লেখকের পক্ষে দুঃসাধ্য) উদ্ধৃত করা গেল

> 'Bourgeois industry and commerce create these material conditions of a new world in the same way as geological revolutions have created the surface of the earth. When a great social revolution shall have mastered the results of the bourgeois epoch, the market of the world and the modern powers of production and subjected them to the common contral of the most advanced peoples, then only will human progress cease to resemble that hideous pagan idol, who would not drink the nectar but from the skulls of the slain[৪] ।'

চতুর্থত, মার্কস ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। মার্কসের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এই ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত। উনিশ শতকের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের চিন্তার সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য মৌলিক। মার্কসের মতে জমিদারি ও রায়তওয়ারি প্রথা 'জমিতে দুটি বিশেষ ধরনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি' সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৭ সনে লেখা এক প্রবন্ধে ভূ-স্বত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য আরো পরিষ্কার। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তিরূপে জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি, আর সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল কায়েমি স্বার্থের পবিত্রতা এবং অভিজাত জমিদারশ্রেণীর গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী ; তাঁদের কাছে বড় শুধু জমিদার এবং খাজনা-গ্রহীতার দল, যাঁরা খাজনা দেন সেই কৃষকেরা নন। তাই তাঁরা মুষ্টিমেয় জমিদার ও তালুকদারের স্বার্থকে 'সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখেন'। অধুনা মার্কসের এই ব্যাখ্যায় দ্বিমতের অবকাশ নেই। সমগ্র ব্রিটিশ পর্বে জমিদার-তালুকদারদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল শাসকশ্রেণীর অবিচল নীতি ; সত্যিকার চাষীর স্বার্থ তখন অবহেলিত। ভূমি-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক এবং ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ভিত্তি। মার্কস এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন অযোধ্যার তালুকদারদের সম্পর্কে ক্যানিং-এর ঘোষণা প্রসঙ্গে। সম্প্রতি প্রকাশিত ডঃ জগদীশ রায়ের গবেষণা থেকে জানা যায়, সরকার শেষপর্যন্ত তালুকদারদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, যার ফলে খাজনা-দাতা প্রজাদের (rent-paying tenant) অধিকার মুছে গেল ; তারা রাতারাতি স্বত্বহীন প্রজায় পরিণত হল – ব্রিটিশ আমলে কৃষি-সম্পর্কের পরিচিত রূপরেখা ফুটে উঠল[৫]।

পঞ্চমত, মার্কস সেই যুগেই ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে মোগল যুগের তুলনায় ব্রিটিশ পর্বে রাজনৈতিক ঐক্য

অধিকতর প্রসারিত হয়েছিল, আর এই কাজে সাহায্য করেছিল রেলপথ ও তার-ব্যবস্থা[৬]। ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক ঐক্যের সমস্যাই বহু আলোচিত ; বার বার এই ঐক্য ভেঙে পড়েছে ; স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে নানা শক্তি আজ সক্রিয়। অনেকে বলতে পারেন, ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ঐক্যকে মার্কস অতিরঞ্জিত করেছিলেন। একথা ঠিক যে সে-ঐক্য ছিল কৃত্রিম, ভঙ্গুর ; মার্কসের লেখায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং রাজন্য-বর্গের ভূমিকার আলোচনা চোখে পড়ে না। সম্ভবত, মার্কস ১৮৫৩ সনে লেখা এই প্রবন্ধে শুধু রাজনৈতিক ঐক্যের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এই সমস্যার জটিলতা তাঁর আলোচ্য ছিল না। অবশ্য জাতিভেদ-প্রথার কদর্য রূপ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল ; মার্কসের একাধিক লেখায় এই প্রথা উল্লিখিত।

১৮৫৩ সনের পরে মার্কস ভারত প্রসঙ্গে আবার কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন ১৮৫৭-৫৮ সনে, দেশ যখন মহাবিদ্রোহে তোলপার। সমসাময়িক ঘটনার গতি ও চরিত্র উদ্ঘাটনে মার্কসের অসাধারণ দক্ষতা *Eighteenth Brumaire*-এ প্রতিফলিত ; সেই একই দক্ষতার পরিচয় মেলে মহাবিদ্রোহের উপর মার্কসের লেখায়। অথচ আমাদের দুজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, রমেশ মজুমদার এবং সুরেন সেন মার্কসের লেখার ব্যবহার দূরে থাক, গ্রন্থসূচিতেও এই প্রবন্ধটির উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। মনে হয় যে সাম্যবাদী মহলেও মার্কসের প্রবন্ধটি খুব পরিচিত ছিল না। রজনী পাম দত্ত এই বিদ্রোহকে সরাসরি 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া' বলে বর্ণনা করেছিলেন 'The rising of 1857 was in its essential character and dominant leadership the revolt of the old conservative and feudal forces and dethroned potentates for their rights and privileges which they saw in process of destruction. This reactionary character of the rising prevented any wide measure of popular support and doomed it to failure।'

পাম দত্তের এই পরিষ্কার বক্তব্যের সঙ্গে মার্কসের মূল বক্তব্যের কোনো মিল নেই। বিপ্লবী মার্কস অসাধারণ স্বচ্ছতার সঙ্গে এই বিদ্রোহের মধ্যে ভারতবাসীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন ; এটাই বোধহয় মহাবিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মার্কস লিখেছিলেন : 'এই প্রথম সিপাহীরা তাঁদের ইয়োরোপীয় কর্তাদের হত্যা করেছেন ; মুসলমান ও হিন্দুরা তাঁদের পারস্পরিক বিভেদ ভুলে গিয়ে একই প্রভুর বিরুদ্ধে মিলিত হয়েছেন ; গণ্ডগোল হিন্দুদের দ্বারা শুরু হলেও দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন একজন মুসলমান সম্রাট বিদ্রোহ কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি ; সবশেষে বলতে হয় যে ইং-ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ মিশে গেছে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে এশীয় জাতিদের সাধারণ বিক্ষোভের

সঙ্গে, বেঙ্গল আর্মির বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে পারসিক ও চীনা যুদ্ধগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত' (লেখকের অনুবাদ)। মার্কস আর এক জায়গায় লিখেছিলেন : 'ক্রমশ আরো ঘটনা প্রকাশিত হবে যার ফলে জন বুল্ বুঝবে যে যাকে সাময়িক বিদ্রোহ বলা হচ্ছে তা আসলে একটি জাতীয় বিদ্রোহ।' সমসাময়িক সংবাদপত্রে সিপাহীদের 'বর্বরতা'র অনেক কাহিনী যখন প্রকাশিত হচ্ছিল মার্কস তখন লিখেছিলেন : 'it would be an unmitigated mistake to suppose that all the cruelty is on the side of the sepoys, and all the milk of human kindness flows on the side of the English।' দিল্লীর পতনের পরে মার্কস বিদ্রোহীদের মধ্যে তিক্ত 'বিভেদের' উল্লেখ করেছিলেন। এঙ্গেলসের সঙ্গে পত্রালাপ এবং ১৮৭৫ সনের পরে রচিত বিদ্রোহের দিনপঞ্জি পড়ে মনে হয়, মার্কসের মনে মহাবিদ্রোহের তাৎপর্য গভীর ছাপ ফেলেছিল[৭]।

মহাবিদ্রোহ প্রসঙ্গেই মার্কস ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা (Indian finance) সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন : এই প্রসঙ্গে তিনি আবার ফিরে আসেন ক্যাপিটাল-এর তৃতীয় খণ্ডে। কয়েকটি প্রবন্ধে ছড়ানো মার্কসের বক্তব্য থেকে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত।

বিদ্রোহের ফলে আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল ; তথাকথিত জাতীয় ঋণ আরো স্ফীত হয়েছিল। সংকটমোচনের উপায় হিসাবে সরকারি ঋণ (public loan) সংগ্রহের চেষ্টা আদৌ কার্যকর হয় নি ; ভারতীয় ধনিকদের কাছ থেকে সাড়া মেলে নি। মার্কসের মন্তব্য স্মরণীয় 'the Indians, however, appear not to understand the beauty of a plan which would not only restore English supremacy at the expense of Indian capital, but at the same time, in a circuitous way, open the native hoards to British commerce।' এই অবস্থায় শাসকশ্রেণী বাধ্য হয়েছিল লণ্ডন মুদ্রা বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে[৮]।

ভারতে সরকারি ঋণসংগ্রহের এই প্রসঙ্গটি নতুন ; মার্কসের আগে আর কোনো লেখক প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন নি। এই প্রসঙ্গের গুরুত্ব আরো বেশি এই কারণে যে মহাবিদ্রোহের পরেও, উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী ভারতের মুদ্রা বাজার থেকে ঋণসংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। রেলপথ, বন্দর, সেচখাল নির্মাণের বিরাট এবং ক্রমবর্ধমান খরচ মেটাবার জন্য এই ঋণ-সংগ্রহের চেষ্টা। ভারতসচিব 'native capitalists'-দের কাছ থেকে ঋণ-সংগ্রহের জন্য বার বার বড়লাটকে তাগাদা দিতেন, আর বড়লাট লিখতেন সাড়া মিলছে না। কলকাতার মুদ্রা বাজার থেকে কিছু ঋণ সংগৃহীত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার বেশির ভাগ এসেছিল সাহেবদের কাছ থেকে। ভারতীয় ধনিকদের মনোভাব বদলাতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ; সরকারি যুদ্ধপ্রচেষ্টায় স্বয়ং

মহাত্মার সমর্থন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু কেন যুদ্ধের আগে ভারতীয় ধনিক-শ্রেণী সরকারি ঋণের ব্যাপারে সাড়া দেন নি? হাতের কাছে যে সামান্য তথ্য আছে তা থেকে মনে হয় যে ব্রিটিশ সরকারের মতিগতি সম্পর্কে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর তখন খুব আস্থা ছিল না। এর অনিবার্য ফল লণ্ডন মুদ্রা বাজার থেকে সরকারের ঋণসংগ্রহ, আর ভারতীয় রাজস্ব থেকে ক্রমবর্ধমান এই ঋণের সুদ মেটানো[৯]।

আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনায় ভারতীয় লেখকেরা 'নির্গম তত্ত্ব' ('drain theory') উপস্থিত করেছেন; দাদাভাই নৌরোজি এই তত্ত্বের বিখ্যাত প্রবক্তা। নৌরোজির সমসাময়িক মার্কস ক্যাপিটাল গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে প্রধানত সরকারি তথ্যের উপর নির্ভর করে এই তত্ত্বের সারমর্ম উপস্থিত করেছিলেন 'India alone has to pay £5 million in tribute for 'good government.' interest and dividends on British capital, etc., not counting the sums sent home annually by officials as savings from their salaries, or by English merchants as part of their profit to be invested in England[১০]।' মার্কসের চোখে ঔপনিবেশিক শোষণের সমগ্র রূপটি ধরা পড়েছিল। ভারত থেকে প্রতি বছর ব্রিটেনে চলে যেতে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড; তদুপরি ইংরাজ কর্মচারীরা পাঠাতেন তাঁদের সঞ্চয়, ইংরাজ বণিকরা তাঁদের লভ্যাংশ। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এই আর্থিক ভার যে প্রচণ্ড ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এই ভার আরো দুঃসহ ছিল এই কারণে যে উন্নয়ন খাতে সরকারি বিনিয়োগ (public investment) প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ছিল। তবু একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সুদ বাবদ যে-টাকা ইংলণ্ডে যেত তাকে কি 'নির্গমের' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? রেলপথ, সেতু, সেচখাল নির্মাণের জন্য যে-ঋণ, তার সুদ নিশ্চয়ই 'নির্গমের' মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া রেলপথ স্থাপনের গুরুত্ব মার্কস স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন।

'Taxes in India' শিরোনামায় মার্কসের একটি লেখা ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত হয়েছিল; আর্থিক ব্যবস্থার আলোচনায় এই লেখাটি প্রাসঙ্গিক। দাদাভাই নৌরোজি ও রমেশ দত্তের মতো মার্কসও করব্যবস্থাকে পীড়নমূলক মনে করতেন, যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় করের হার নিচু ছিল: 'we might heap evidence upon evidence from parliamentary documents, as well as from the writings of the greatest authorities on Indian affairs, all proving beyond doubt that this apparently light taxation crushes the mass of the Indian people to dust, and that its exaction necessitates a resort to such infamies as torture, for instance[১১]।' ভারতের দারিদ্র্যের পটভূমিতে মার্কস কর-

ব্যবস্থাকে দুঃসহ বোঝা বলেছিলেন ; এই কর আদায়ের জন্য সরকার নিপীড়নের মতো বর্বর প্রথার আশ্রয় নিতেন। প্রবন্ধের শেষ অংশে মার্কস সমালোচনা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন উন্নয়নকার্যে সরকারি বিনিয়োগের (public investment) স্বল্পতার দিকে : 'As to the application of the taxes, it will suffice to say that no part of them is returned to the people in works of public utility, more indispensable in Asiatic countries than anywhere else[১২]।' ১৮৫৮ সনের পরে সরকারি বিনিয়োগ অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ করে রেলওয়ে, সড়ক, সেতু ও গৃহনির্মাণে, কিন্তু সেচ, কৃষি ও শিল্প খাতে সরকারি বিনিয়োগ সামান্য ছিল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি যে অতি মন্থর ছিল তা কিছু দৈবাৎ ঘটনা নয়[১৩]।

করব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসের আলোচনা এখানেই থেমে গেছে ; ক্যাপিটাল-এর তৃতীয় খণ্ডে ভারত প্রসঙ্গ বহু বার উত্থাপিত হলেও এই প্রসঙ্গে মার্কস আর ফিরে আসেন নি। মার্কসের আলোচনা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। প্রত্যক্ষ কর (direct taxation) প্রবর্তনে সরকারের দ্বিধা মার্কসের আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। এই ঘটনা সুবিদিত যে জেম্‌স উইলসনের প্রবর্তিত আয়কর (income tax) ইংরাজ কর্মচারী ও ভারতীয় ধনিকদের প্রবল ও একটানা বিরোধিতার মুখে পরিত্যক্ত হয়েছিল ; আয়কর চালু রাখতে সরকার অদ্ভুত দোদুল্যমানতা দেখিয়েছিলেন ; আয়কর ভারতীয় করব্যবস্থার অঙ্গ হয়েছিল ১৮৮৬-৮৭ সনে[১৪]।

ভারতের মুক্তি কোন্ পথে ? মার্কসের লেখায় দুটি সম্ভাবনা উল্লিখিত। হয় ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীকে হটিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, অথবা ভারতের জনসাধারণ ইংরাজদের শাসন খতম করবে। প্রথম সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হয় নি (অবশ্য বিপ্লবের রূপ যাই হোক, এ-সম্ভাবনা মুছে গেছে মনে করলে গণৎকার হতে হয়)। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, যা সেদিন স্বপ্ন ছিল, আজ তা বাস্তবে পরিণত। ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশ ও জাতীয় আন্দোলনের প্রসার ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে মার্কস নতুন শক্তির উদ্বোধন দেখতে পেয়েছিলেন ; পিছনের দিকে ফিরে তাকালে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের বিস্তৃতির নিবিড় যোগ স্পষ্ট প্রতীয়মান। ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলেই শ্রমিকশ্রেণীর আত্মপ্রকাশ, এক নতুন শক্তির জন্ম, জাতীয় আন্দোলনের গতি পরিবর্তনে যে-শক্তির ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক প্রগতির পথ পরিষ্কার করতে শিল্পায়নের যে-গুরুত্ব মার্কসের চোখে ১৮৫৩ সনে ধরা পড়েছিল, ইতিহাস তা সত্য প্রমাণিত করেছে। ধনতন্ত্রের ধাপ পার হয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—এই মার্কসীয় মডেল আজকের ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না তার আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। মনে হয় এই প্রবন্ধ সেই আলোচনার সূত্রপাত।

নির্দেশিকা

১. Sombarth-কে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি : 'The whole of Marx's world outlook is not a doctrine but a method।'

২. *New York Daily Tribune*, ২৪ জুন, ১৮৫৩। K. Marx And F. Engels, '*The First Indian War of Independence, 1857-1859*' (Moscow, 1960-এ সংকলিত)।

৩. ঐ, ১০ জুন, ১৮৫৩।

৪. ঐ, ২২ জুলাই, ১৮৫৩।

৫. 'Lord Canning's Proclamation And Land Tenure in India,' ঐ, ২৫ মে, ১৮৫৮ : Jagodish Raj, *The Mutiny And British Land Policy in North India, 1856-68*, (Asia, 1965)।

৬. *New York Daily Tribune*, ২২ জুলাই, ১৮৫৩।

৭. ভারতীয় মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে মার্কসের প্রবন্ধমালা, বিদ্রোহের দিনপঞ্জি, বিদ্রোহ সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর লেখার সংকলন-গ্রন্থ, *The First Indian War of Independence, 1857-58*, (Moscow, 1960)।

৮. 'The Approaching Indian Loan', ঐ, ২২ জানুয়ারি, ১৮৫৮।

৯. বর্তমান লেখক বিষয়টি আলোচনা করেছেন তাঁর বইতে। S. K. Sen, *Studies In Economic Policy And Development of India, 1848-1926*, (Calcutta, 1965)।

১০. *Capital*, vol. III (Moscow) ; অর্থনীতিবিদ ডঃ বি. এন. গাঙ্গুলি বিষয়টি আলোচনা করেছেন, *Dadabhai Naoroji And the Drain Theory* (Asia, 1965)।

১১. 'Taxes in India', *New York Daily Tribune*, ২৯ জুন, ১৮৫৮।

১২. ঐ।

১৩. M. J. T. Thavaraj, *Rate of Public Investment in India, 1898-1938*।

১৪. বর্তমান লেখকের বই, *Studies in Economic Policy And Development of India, 1848-1926*, pp. 142-146।

জন লুইস

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কপাল এমনই যে তাঁদের ধ্যান-ধারণাকে তাঁদেরই অনুগামীরা বিকৃত করেন, গোলো করে ফেলেন, এমন কি অনেক সময় উল্টেপাল্টে ফেলেন। প্রসঙ্গত গৌতম বুদ্ধ, খ্রীস্ট বা মোহম্মদের কথা স্মরণীয়। কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রেও এই দুঃখজনক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এজন্য একথা ভাবা যথেষ্ট সংগত যে মার্কসের দেড়-শততম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন একটি অতিকথার পুজানুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত হবে না, এ অনুষ্ঠান হবে প্রকৃত মার্কসের মর্মোদ্ঘাটন – তিনি কী ধরনের মানুষ ছিলেন, প্রকৃতই তিনি কী বলেছেন এবং সত্যিই তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। একদিকে অনুগামীদের ভালবাসা, উদ্দীপনা এবং বীরপুজা, অন্যদিকে বিরোধীদের অপপ্রচার এবং অন্ধতা—এ দুইএর জন্যই মার্কস আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিরোধীদের কাণ্ডটা তবু প্রত্যাশিত, কিন্তু অনুগামীরাই বেশি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে-যুগে বাস করি তা মার্কসীয় যুগ, এই জন্যই ব্যাপারটি বিশেষভাবে দুর্ভাগ্যজনক। অন্য সব তত্ত্বের, বিশেষভাবে অ-মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীদের স্ববিরোধ, নোংরামি ও বিরাট ব্যর্থতা একযোগে আমাদের

অপরিচিত মার্কস

চিন্তারাশিকে আমাদের শেষ নির্ভরস্থল মার্কসের অভিমুখী করে দিয়েছে। সত্যিসত্যি ব্যাপারটা এ-ই ; তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানেন না এমন সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত শিষ্যদের, অথবা তাঁকে জানতেই চান না এমন বিরোধীদের মার্কসকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন প্রকৃত মার্কসের।

মার্কস কি বস্তুবাদী ছিলেন?

চারদিক থেকে সোচ্চার ঘোষণা করা হয় যে মার্কস বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন। এ-ব্যাপারে তিনি কদাপি কোনো বিবৃতি দেন

নি, অথবা তাঁর তত্ত্বগত বক্তব্যকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে অভিহিতও করেন নি। তাঁর দর্শনে এ-অভিধাটি রুশদেশীয় প্রেপানভের সংযোজনা। তিনি সবকিছুকেই চৈতন্যের (মনের) গণ্ডিতে সীমিত করেছেন, এমন কোনো অর্থে মার্কস অবশ্যই ভাববাদী ছিলেন না ; মন (চৈতন্য) এবং বস্তু (জড়)-কে সমান্তরাল পরস্পর-ক্রিয়াশীল স্বতন্ত্র বাস্তব হিসেবে গ্রহণকারী দ্বৈতবাদীও তিনি ছিলেন না এবং নিশ্চয়ই তিনি অতিলৌকিকবাদীও ছিলেন না—বস্তুর উপরে বা অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল অ-ভৌতিক, আত্মিক অথবা ঐশ শক্তির অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাহলে কি তিনি বস্তুবাদী ছিলেন? আগে শব্দটির সংজ্ঞানির্ধারণের উপর ব্যাপারটি নির্ভর করছে। সভ্যজগতের দর্শনশাস্ত্র অনুযায়ী শব্দটির অর্থ হল, সমগ্র বাস্তবতাকে জড়ম পরাণু (atoms in motion) ও তার ভৌতিক উপাদানসমূহে সীমিত করে আনা। এক্ষেত্রে মনকে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রতিভাস (illusion)-স্বরূপ, অধিপ্রপঞ্চ (epiphenomenon)-স্বরূপ, মনের কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা নেই, তা নিতান্তই গৌণ। মার্কসের বক্তব্য আদৌ এ-পর্যায়ের নয়। এ ধরনের দার্শনিক বস্তুবাদের (metaphysical materialism) আলোচনায় তিনি কদাপি রত হন নি। প্রথমত পরিস্থিতির ক্রমবিকাশ অনুধাবনের জন্য, তারপর এই অনুধাবনের ভিত্তিতে পরিকল্পনার, পন্থা নির্ধারণের, সংগঠনের এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বসমূহের মোড় ফেরানোর ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের জন্য চৈতন্যের বাস্তবতায় ও গুরুত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

দর্শনগত দিক থেকে আজ মার্কসবাদীরা নিজেদের বিবর্তনভিত্তিক প্রকৃতিবাদী হিসেবে অথবা আকস্মিক বিবর্তনবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, কিম্বা আরও ভালো হয় যদি তারা নিজেদের কোনোভাবেই চিহ্নিত না করে, তাহলে তাদের অতিলৌকিকবাদকে অস্বীকারের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। নিঃসন্দেহে মার্কসও নিজেকে চিহ্নিত করেন নি। সামাজিক অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবশ্যই বলেছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণত ভিন্ন ব্যাপার।

মার্কস কি নির্দেশবাদী ছিলেন?

না, মার্কস কোনোভাবেই নির্দেশবাদী (determinist) ছিলেন না, এমন কি অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদীও (economic determinist) না। এটি আবার সম্পূর্ণভাবে একটি বিশিষ্ট দর্শনগত ব্যাপার এবং অভিধাটিকে আপন স্বার্থে ব্যবহার করার, নিজের মতো অর্থ করার কোনো অধিকার আমাদের নেই, অভিধাটিকে খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার ক'রে নিজেদের নির্দেশবাদী বলার অধিকারও আমাদের নেই। আমরা চাই হাজার হাজার বুদ্ধিমান মানুষ আমাদের বুঝুন, কিন্তু এ-অভিধা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করলে আমরা তাঁদের বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবো, কারণ এ-অভিধা থেকে তাঁরা বুঝবেন সেই অর্থই যা

পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগ (অবশ্য আমাদের কমিউনিস্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি বাদে) বুঝেছিল। নির্দেশ্যবাদ বলতে এই বোঝায় যে প্রত্যেক আচরণ ও চিন্তা তার পূর্ববর্তী ঘটনার যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম। অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ বলতে বোঝায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যান্ত্রিক অগ্রগতি অবশ্যই পুঁজিবাদের ধ্বংসের ও সমাজবাদের অনিবার্য আগমনের দিকে এগিয়ে চলে। এ-বিষয়ে যদি আমরা সক্রিয়ও হই, তা-ও এমন প্রয়োজনীয় যা আমরা এড়াতে পারি না ও যার জন্য আমরা দায়ীও নই। সমাজতন্ত্র এসে হাজির হয় মানুষের বুদ্ধি, ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত বা কার্যকর ধারণানিরপেক্ষ হয়ে।

মার্কস যা শিখিয়েছেন ও যা বিশ্বাস করতেন এ-ব্যাপারটি সে-সমস্তেরই পরিপন্থী। যখন পুঁজিবাদের সংকট উপস্থিত হবে, এমন কি তখনও সংগ্রাম গিয়ে পৌছাবে 'হয় সামগ্রিকভাবে সমাজের বৈপ্লবিক পুনর্গঠনে অথবা বিবদমান শ্রেণী-সমূহের (যারা যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল) সামগ্রিক ধ্বংসে'। যুক্তিসম্মত প্রয়োগের এবং মানুষের স্বাধীনতার এই অস্বীকৃতিকে জয় করার জন্য কেবল চেতনার পরিবর্তন হলেই চলবে না, তার জন্য চাই সেই মানুষ যে যন্ত্র তৈরি ক'রে তার উপর অধিকার স্থাপন করেছে এবং এইভাবে অস্বীকৃতিকে অস্বীকার ক'রে (negating the negation) নিজের জন্য তা ব্যবহার করছে।

মার্কস ও 'বিমুক্তি' প্রত্যয়

আধুনিক অস্তিত্ববাদীদের ব্যবহৃত একটি শব্দ ছাড়া 'বিমুক্তি'র কথা কয়েক বছর আগেও কেউ কখনও শোনেন নি। অথচ এটি সর্বদাই মার্কসের একটি মৌলিক প্রত্যয় হিসেবে ছিল। যখন মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রই তার প্রভু হয়েছে তার তখনকার অধঃপতন, অপমান ও শোষণের একটা অবস্থা হিসেবেই তাঁর কাছে এই প্রত্যয়টি দেখা দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মার্কস কি বলেছেন তা স্মরণ করা যাক : 'মানুষের শ্রম কিনতে গিয়ে আমরা শ্রমসহ মানুষটাকে কিনি এবং সে আমাদের উদ্দেশ্যের নিছক হাতিয়ার বা যন্ত্রে—একটি পণ্যে, একটি বস্তুতে—পরিণত হয়। যে-মানুষ মজুর হয় শেষপর্যন্ত সে দেখে যে তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তার নিজের কাছেও টিকে থাকে না।...এইভাবে শ্রমের যন্ত্রপাতি নিছক যান্ত্রিক পদ্ধতিরূপেই শ্রমিকের কাছে হাজির হয়, এই যান্ত্রিক পদ্ধতি তাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার জীবন্ত শ্রম-শক্তিকে নিঃশেষে শুকিয়ে দেয়। কারণ অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কসমূহ ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিধি থেকে নৈর্ব্যক্তিক বাজার-নিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একমাত্র মানবিক বন্ধন হল বিনিময়মূল্য, যা একই মূল্য আদায় করতে পারে এমন পণ্যসমূহকে সমপর্যায়ভুক্ত করে। গোষ্ঠীস্বার্থের থেকে ব্যক্তি-স্বার্থের বিভেদের ক্ষেত্রেও আমরা মানুষের এই পণ্যিত রূপ লক্ষ করি। এই অবস্থাটি সৃষ্টি করে সেই মানুষ যে অনুন্নত, কল্পনাশক্তিশূন্য, সংবেদনশীলতাহীন ও

উদ্ভাবনাশক্তি-বিচ্যুত। এইভাবে পুঁজিবাদের সামাজিক রূপ একটি সত্যিকার সমাজের এবং ব্যক্তির আত্মবিকাশের পরিপন্থী হয়েছে।' অন্যভাবে বললে, সে বিযুক্ত হয়েছে (দ্র. মার্কস : ১৮৪৪-এর পারি পাণ্ডুলিপি)।

দুই মার্কসবাদ, অথবা এক?

যাঁরা মার্কসের শেষের দিককার লেখার সঙ্গে গোড়ায় পরিচিত ছিলেন না তাঁরা এই সমস্ত প্রথম দিককার লেখার যখন অনুশীলন করছিলেন তখন মাঝে মধ্যেই তাঁদের মনে হয়েছিল যে শেষের দিককার লেখাগুলি বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে এই দৃষ্টি-ভঙ্গির বিরোধী। এর চেয়ে মিথ্যে আর কিছু নেই। সমগ্র 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থখানি এই দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্ধন ও ব্যাখ্যান ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই গ্রন্থ ব্যতীত সামাজিক ইতিহাসমূলক আর কোনো রচনার কোথাও পুঁজিবাদের আওতায় মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে এতটা প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, এতখানি তীব্র ঘৃণার সঙ্গে দেখানো হয় নি। অবশ্য মার্কস যা পরিস্ফুট করেছেন তা পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ কলাকৌশল—একচেটিয়া রূপ লাভের পথে কোন্ কোন্ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ অতিক্রান্ত হয় এবং কি কি সংকটের মধ্যে তা জড়িয়ে পড়ে। ১৮৭৮ থেকে পরবর্তী সবটা সময় মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা, শ্রমিক সংগঠন ও বিশেষত যার সাহায্যে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবে শ্রমিকশ্রেণীর সেই রাজ-নৈতিক কর্তৃত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন।

মার্কসবাদ এক মানবতাবাদ

এমন কি ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দেই মার্কস মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, 'সেই সমাজই প্রকৃত যৌথ মানবিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা ব্যক্তিগত নয়, সম্প্রদায়গত। কেবল-মাত্র এই সমাজেই মানুষ দেখতে পাবে যে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত সত্তা অবিকৃত রয়েছে। ব্যক্তির পটভূমিতে যে-সমাজ একটি অমূর্ত রূপ নয়, যে-সমাজ ব্যক্তির পরিপূর্ণতার সহায়ক, মানবসমাজের সেই উন্নত স্তরে মানুষ নিজেকে আবার ফিরে পাবে (অর্থাৎ তার বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠবে)।'

এ থেকেই অনুসৃত হয় মার্কসের মানবতার মৌলিক নীতি (এটি তাঁর নিজেরই কথা), যা তাঁর সমগ্র জীবনের প্রেরণা ও পরিচালিকা শক্তি। 'যে-অবস্থায় মানুষ নিন্দিত, অবহেলিত, ঘৃণ্য জীব, স্পষ্ট নির্দেশনার দ্বারা সেই অবস্থার অপসারণে এর সমাপ্তি।' (দ্র. ভূমিকা, হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনা)।

মার্কস ও ধর্ম

প্রায়শ মনে করা হয় যে মার্কস প্রচণ্ডভাবে তাঁর নাস্তিক্যবাদকে তুলে ধরেছেন

এবং তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছেন ধর্মের উপর আক্রমণ চালাতে। ব্যাপারটা তা নয়। বার্লিনে তাঁর বন্ধুরা যখন এই পদ্ধতিতে সমাজসংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন তখন তিনি তাঁদের 'নাস্তিক্যবাদে'র তকমা নিয়ে ছেলেখেলা বন্ধ করতে বলেছিলেন: 'এটা শিশুর মতো আচরণ, যে-সব শিশু সবাইকে বলে যে তারা জুজুর ভয়ে ভীত নয়।' কয়েক বছর পরে আমরা তাঁকে যুক্তি দিতে দেখি যে ধর্মের সমালোচনা করতে হলে তা করা উচিত সামাজিক অবস্থার সমালোচনা করেই, রাজনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মের বিরুদ্ধে চালিত ক'রে নয়। 'ধর্ম – যা নিজেই অন্তঃসারশূন্য – পৃথিবীতেই উদ্ভূত, স্বর্গ থেকে আমদানি নয়, এবং তা যে-বিপর্যস্ত বাস্তবতার তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে তা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও বিদায় নেবে।' (রুগে-কে লেখা চিঠি, নভেম্বর, ১৮৪২)। তিনি ব্যাপারটির ব্যাখ্যায় আরও অগ্রসর হয়েছেন, 'নাস্তিক্যবাদ যদি মানুষের অনাবশ্যক সত্তার অস্বীকৃতি হয় তাহলে তার কোনো অর্থই থাকে না, কারণ নাস্তিক্যবাদ হচ্ছে ঈশ্বরকে অস্বীকার এবং ঈশ্বর মানুষের শুদ্ধ সত্তার প্রতিনিধি – যে-সত্তা থেকে পুঁজিবাদ তাকে বঞ্চিত রেখেছে। সম্ভবত একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পক্ষান্তরে আমাদের তা বুঝতে হবে মানুষের বিচ্ছিন্নতাকে জয় ক'রে, আর তারপর ঈশ্বরের কথা বলার কিম্বা ঈশ্বরের স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগই হবে না। ততক্ষণ ধর্ম মানুষের আশা ও কল্পনার ছবি তুলে ধরবে যা তাকে চরম হতাশায় মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করবে। এই পর্যায়ে ধর্ম অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য।' 'তা নিপীড়িত মানুষের কাছে আশার প্রতীক, নিষ্করুণ বিশ্বে করুণাস্বরূপ, ক্ষয়িষ্ণু জীবনে উজ্জীবনের মন্ত্র।' 'বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে মানুষ তার সব অলীক ধারণাগুলি পরিহার করুক, এমন দাবির অর্থ হচ্ছে যে-সব অবস্থায় সেই অলীক ধারণাগুলি গড়ে ওঠে তাকে পরিহার।' (দ্র. 'হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনা')।

মা র্ক স এ বং ই তি হা স

ধীরে ধীরে পুঁজিবাদের উদ্ভব, তার ক্রমবিকাশ, সংকট, একচেটিয়া কারবারের অগ্রগতি এবং শেষপর্যন্ত তাকে পার হয়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব – সবই এক ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রসদ কিভাবে সংগ্রহ করে তার স্তরপরম্পরার উপরই সব ইতিহাস নির্ভরশীল। অর্থাৎ তার খাদ্য, আচ্ছাদন ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা। প্রযুক্তিবিদ্যার বিশিষ্ট স্তর – প্রস্তর নির্মিত কুঠার, কৃষি, হস্তচালিত তাঁত, যন্ত্র, বাষ্পীয় শক্তি ইত্যাদি সবকিছুরই উপযুক্ত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ছক আছে – প্রাচীন খাদ্যসংগ্রহ ও কৃষিপদ্ধতি, দাস সমাজ, কারু সংঘ, বাণিজ্য, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র। সব সমাজেরই নিজস্ব শ্রেণীকাঠামো আছে – একবার আদিম উৎপাদন-ব্যবস্থা দাসপ্রথার জন্ম দেওয়া থেকে শ্রেণীসমাজ সমাজতন্ত্রে পরিণত হওয়া পর্যন্ত।

শ্রেণীসমাজের চরিত্রই প্রত্যেকটি সংস্কৃতির সমগ্র উপাদানগুলির জন্ম দেয় – তার নীতি, আইন, সরকারের সংগঠন, দর্শন, ধর্ম ও শিল্পকলা। এ সমস্তই যেমন একাধারে ঐ শ্রেণীসমাজের প্রতিফলন, তেমনি এগুলি তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত রাখে। যতই অর্থনৈতিক রূপ, অর্থাৎ মানবসম্পর্কের পদ্ধতি (যেমন এ যুগের মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক) পরিণত অর্থনৈতিক কাঠামোয় ক্রমশ অযোগ্য হয়ে পড়ে, ততই আরো উপযুক্ত সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। পুরনো শ্রেণীস্বার্থ যদি প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় লাভবান হতে থাকে তাহলে তা যে-কোনো পরিবর্তনকেই বাধা দেয়। অবশ্য এই পরিবর্তন সাধিত হবে এক নতুন শ্রেণীর দ্বারা। সে-শ্রেণী পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তন থেকেই উদ্ভূত এবং নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকে উপজাত দ্রুত অধিক অগ্রগতিতে হয়তো লাভবান। এইভাবেই পুঁজিবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, আবার এইভাবেই জন্ম-গ্রহণ করছে সমাজতন্ত্র। মানুষ যে-সব অর্থনৈতিক স্তরপরম্পরায় তার বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে তার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা ; এবং এই হচ্ছে ইতিহাসের বস্তুবাদী তত্ত্ব।

মার্কস এবং দর্শন

মার্কস মনে করতেন মানুষের কাছে এখন পর্যন্ত যা-কিছু অজ্ঞাত তারই এক নির্মূত বিমূর্ত রূপ হচ্ছে দর্শন, এবং ধর্মের মতোই দর্শন এক আদর্শ রূপ। যতদিন শ্রেণীসমাজের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ চলতে থাকবে ততদিন আদর্শ (অলীক সমাজ-তন্ত্রবাদ), ধর্ম (মানুষের বিশুদ্ধ সত্তা) ও দর্শন (ভাব) মানুষের উর্ধ্বে অবস্থান করবে। কিন্তু যখন শ্রেণী তার সমাজের শ্রেণীচরিত্রকে অতিক্রম ক'রে, মানুষকে বন্ধনমুক্ত ক'রে, বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটায় ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেই পরিণত ও উপযুক্ত সময়ে ভাবই তাকে পরিচালিত করে। এটা তখনই ঘটে যখন শ্রমিক-শ্রেণী তার যথার্থ ভূমিকা, ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ও দায়িত্ব বিষয়ে সচেতন হয়। এটা যখন সম্ভব হয় তখন ইতিহাস দর্শনমণ্ডিত হয়ে ওঠে, কারণ তখন বিমূর্ত তত্ত্বকথা সামাজিক বাস্তবতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায়। এটা অবশ্য ততক্ষণ সম্ভব হবে না যতক্ষণ 'চিন্তার আলোক জনগণের অকর্ষিত চিত্তভূমিতে প্রবেশ লাভ না করে,' এবং তারা নিজেদের যতক্ষণ না মুক্ত করতে ও সত্যকার মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যে-দর্শনের কোনো বাস্তব রূপায়ণ নেই, অতঃপর সেই দর্শনের শুধুমাত্র আর দর্শন হিসেবে অস্তিত্ব থাকে না। সেই একই ব্যাপার ঘটে ধর্মীয় স্বপ্নরাজ্য ও সমাজতান্ত্রিক কল্পরাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই – 'সর্বহারা শ্রেণী বিলুপ্ত হলেই একমাত্র দর্শন রূপায়িত হয় এবং দর্শনের সত্তা রূপায়ণের দ্বারাই একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী বিলুপ্ত হতে পারে' ('হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনা', ভূমিকা)। মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ বলতে ঠিক এইটেই বোঝায়। অর্থনৈতিক বিকাশ

সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য অনুকূল অবস্থাগুলির পথ প্রস্তুত করে, কিন্তু তা আপনা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসবে না, কিন্তু আসবে, যদি শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রপক্ষ সঠিক পরিস্থিতি বুঝতে পারে, যথার্থ বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দেয় — যেমন বুদ্ধিমান ও বৈজ্ঞানিকরা ঠিক কী করতে হবে ও যথেষ্ট লোককে কীভাবে নিজের মতে নিয়ে আসা যায় এ-বিষয়ে গভীর চিন্তা করেন ও তা ক'রে থাকেন। মানুষের প্রবণতাগুলির মধ্যে এমন কোনো অন্ধ প্রয়োজনবোধ থাকতে পারে না যা এক স্বাধীন ও আত্মসচেতন সমাজে গিয়ে পরিণতি পায়। এ সব প্রবণতা তখনই একমাত্র বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে যদি তাকে মানুষ ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ ক'রে সচেতন কর্মের দ্বারা সমাজতন্ত্রের পথ প্রদর্শন করে ও সেখানে পৌঁছানোর যথার্থ উপায় নির্ধারণ করে। বিন্দুমাত্র স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা অথবা সহজ অনিবার্যতাই পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না।

মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ

মার্কসের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যানকালে প্রায়ই বলা হয় যে দ্বন্দ্ববাদ বলতে লোকে বোঝে সেই জাতের দ্বন্দ্ববাদ যা এঙ্গেলস পরে বিস্তারিত করেছেন এবং যা লেনিন তাঁর নোটবুকে সংক্ষেপে আলোচনা (যা কখনও প্রকাশিত হয় নি) করেছেন। এ সব ধারণা সত্য হতেও পারে, কিন্তু এগুলি মার্কসের শিক্ষায় কিছুই প্রমাণ করে না। তিনি সম্পূর্ণ এক অন্য অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

মার্কস কখনো পক্ষ (thesis), বিপক্ষ (antithesis) ও উভপক্ষ (synthesis)-এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলেন নি, বিপরীত সত্তাসমূহের পারস্পরিক অনুপ্রবেশের তত্ত্বও প্রচার করেন নি, বা পরিমাণের গুণে রূপান্তরের তত্ত্বও না। আমি এ সব তত্ত্বকে অস্বীকার করতে চাইছি না, যদিও এগুলি কখনো প্রমাণিত হতে দেখি নি। আমি শুধু দেখাতে চাইছি যে মার্কসে এ সব কিছুই নেই। কেবল এক জায়গায় তিনি দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (এবং তা 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় নয়) — যেখানে তিনি তাঁর পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন 'ত্রিশ বৎসর পূর্বে' এর বিশ্লেষণের প্রতি — তা হচ্ছে তেত্রিশ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ নিবন্ধ : 'Critique of the Hegelian Dialectics as a Whole'। খুব কম মার্কসবাদীই তা পড়েছেন মনে হয়। (লেখাটি পড়েছেন এমন কাউকে জানি না!)

সেখানে মার্কস যা বলেছেন তা হল, মানুষ তার মালিকের জন্য উৎপাদনযন্ত্র তৈরি ক'রে এমন একটা ব্যবস্থার জন্ম দেয় যাতে সে নিজের কল্যাণে সেই যন্ত্রকে কখনো ব্যবহারের সুযোগ পায় না, কারণ তার মালিক তার নিয়োগকর্তা, যে তাকে তারই সৃষ্ট যন্ত্রের গোলামে পরিণত করে। এইভাবে মানুষ যন্ত্রকে ব্যবহার করার পরিবর্তে যন্ত্রই মানুষকে ব্যবহার ক'রে থাকে।

মানুষ নিজেকেই তৈরি করে

প্রাণীজগতের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে মানুষ কোনো নির্দিষ্ট স্বভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে নি, অথবা এই স্বভাব ঈশ্বর বা প্রকৃতি তাকে দান করে নি। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে যে-সামাজিক সম্পর্কসমূহের ছক সে প্রতিষ্ঠা করে তার দ্বারাই তার চরিত্র, নীতিবোধ, ও অভ্যাসগুলি নির্ধারিত হয়। এই ছকটি যেভাবে সে পরিবর্তিত করে সেইভাবে সে নিজেও পরিবর্তিত হয়—তার ধ্যানধারণা, নৈতিকতা, আইনজ্ঞান, অভ্যাস, এমন কি তার চরিত্র পরিবর্তিত হয়। এইভাবেই সে নিজেকে প্রতিযোগিতাপরায়ণ, আত্মকেন্দ্রিক, মালিকানার মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুঁজিবাদী মানুষে পরিণত করে। অথবা নতুন নিয়মপ্রণালী, নতুন সমাজপদ্ধতি, নতুন সমাজকাঠামো প্রতিষ্ঠার দ্বারা সে নিজেকে সমাজ-তান্ত্রিক মানুষেও পরিণত করে—তাতে নতুন অভ্যাস, নতুন নৈতিকতা, যৌথ মানসিকতা, অধিকতর মূল্যবোধ ও আরো মানবিকতার বিকাশ ঘটতে পারে। সমাজতন্ত্রের জয় হলেই তা অবশ্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এসে পড়ে না। নতুন সমাজপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বা সফলতায় কোনো কিছুই স্বয়ংক্রিয় নয়। 'কেবল বহু বছরের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই প্রত্যেক শ্রেণী তার পূর্ববর্তী পুরনো সমাজের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে নতুন সমাজগঠনে সক্ষম হয়', মার্কস ১৮৪৬-এ বলেছেন। 'এজন্য পনেরো, কুড়ি, হয়তো বা পঞ্চাশ বছরের একটানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতেই হবে, শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য নয়, নিজেদের পরিবর্তিত করার জন্যও, যাতে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হতে পারা যায়,' ১৮৫৯-খ্রীস্টাব্দে মার্কস একথা বলেছেন। এবং লেনিন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন যে-মানব উপাদান, যা নিয়ে আমরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছি, শত সহস্র বছরের গোলামির জন্য, ভূমিদাসত্বের, পুঁজিবাদের ও প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

আমরা স্মরণ রাখতে পারি: 'সমগ্র মানব ইতিহাস মানবপ্রকৃতির ক্রম-বিবর্তিত রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নয়। কর্মের দ্বারা ও জগৎ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ তার নিজ প্রকৃতিকেই বদলায়।'

আজ যে-যুগে আমরা বাস করছি সে-যুগে এই গ্রহে প্রথম সম্পূর্ণ মানবিক ও মানবতাসম্পন্ন সমাজের নতুন চৈতন্য ও নতুন মানুষ সৃষ্টির পালা চলেছে।

DR. JOHN LEWIS এক্সণের এই বিশেষ সংখ্যার জন্য লিখেছেন *The Unknown Marx* প্রবন্ধটি। তাঁর প্রেরিত পাণ্ডুলিপির টাইপ-রাইটার কপি তৈরি করে দিয়েছেন: ইন্দ্র সেন। অনুবাদ করেছেন: অরবিন্দ ভট্টাচার্য।

অ্যাডাম শাফ

মার্কস ও একালের মানবতাবাদ

ইতিহাস কেন ফিরে ফিরে নতুন ক'রে লেখা হয় তার আলোচনা ইতিহাসের তত্ত্ব আলোচনায় এক বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক অংশ। দুর্ভাগ্যক্রমে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ইতিহাসে যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্পর্কে ধারণা বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে করতে পারেন, একই যুগে বাস করেও। তার কারণ তাঁদের সামাজিক পরিবেশ, বিশ্বাস ইত্যাদির বিভিন্নতা। বিভিন্ন যুগে বাস করলে তো এটা আরও বেশি হতে পারে। ঘটনার বিশ্লেষণ, ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাখ্যা যুগে যুগে পালটে যায়। বিশেষ করে মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্রব্যাখ্যা। কেন এমন হয় ভাবতে গিয়ে আমার নানা ধরনের কারণ মনে আসছে। কয়েকটি অবশ্য সর্বস্বীকৃত মামুলি কারণ, আবার কয়েকটি জটিল ও তর্কসাপেক্ষ। মামুলি কারণগুলি এই ১. কোনো ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন তথ্যের আবিষ্কার। ২. ঘটনাটি পরবর্তীকালে যখন সুষ্ঠু আকার পায় তখন সে-সম্পর্কে ধারণাও সুষ্ঠু আকার পায় (শাস্ত্রে আছে, ফলেন পরিচীয়তে ; মার্কসও বলেছিলেন, মানুষের শারীরগঠন দেখে বনমানুষের শারীরগঠন সম্পর্কে অনুমান সম্ভব)। ৩. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ, বিশেষত রীতিপদ্ধতির ('মেথডলজি'র), যার সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা, ঘটনার যোগাযোগ নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়, ফলে ঘটনাগুলো যে পরস্পর সংযুক্ত সে-সম্পর্কেও ধারণা জন্মায়। ৪. সামাজিক অনুজ্ঞা। এরই প্রভাবে তথ্যানুসন্ধানী ব্যক্তি একটি ঘটনার এমন সব অংশ বেছে নেন যা তাঁর সামাজিক অনুজ্ঞাকে লঙ্ঘন করে না। যে-জন্য, একটিই ঘটনা, কিন্তু বিভিন্ন যুগে তো বটেই, একই যুগে সমাজের বিভিন্ন অংশে, তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা। এই অনুজ্ঞা তৈরি হয় অনুসন্ধানীর যুগের এবং সমাজব্যবস্থার প্রভাবে। মার্কস যে ইতিহাসের অন্যতম যুগন্ধর পুরুষ, সে-বিষয়ে দ্বিমত

নেই। তাঁর জীবনকালে যেমন, তাঁর মৃত্যুর পরেও তেমনি, কেউ তাঁকে পূজা করেছে, কেউ তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে। ইতিহাসের ও ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাখ্যা নতুন নতুন কেন হয় তার চারটি যে-কারণ এইমাত্র বলা হল, সেই কারণেই ইতিহাসে মার্কসের অবদান সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

এমন কি মার্কসের যাঁরা অনুগামী তাঁদের লক্ষ করলেও মনে হবে যে মার্কস একজন ছিলেন না, মার্কস নামে বহু লোক ছিলেন। তা না হলে কী ক'রে এইসব প্রায় ভিন্ন চরিত্রের লোক, কখনো কখনো মনে হয় সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী লোক একই মার্কসের অনুগামী হলেন? বহুদিন ধরে আলোচনা চলেছে মার্কসের অর্থনীতি নিয়ে, কখনো কখনো তাঁর সমাজ সম্পর্কে বক্তব্য নিয়ে। আজকের দিনে সবিস্ময়ে লক্ষ করতে হয়, হঠাৎ মার্কস সম্পর্কে প্রায় যাবতীয় আলোচনা হচ্ছে তাঁর মানবতাবাদ নিয়ে। ঘটনাটি অবশ্য সরল। বর্তমান যুগে, সমাজপ্রকৃতি এবং মানুষের মনের গতি এমন সব প্রেরণায় প্রভাবিত হচ্ছে যে, মানবতার প্রয়োজনীয়তা আবার নতুনভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে মার্কসের মানবতাবাদের দিকেও নজর পড়ছে এবং মার্কসের আলোচনায় আজ নতুন একটা দিক খুলেছে। মোট কথাটা হচ্ছে, এযুগে এই দিকেই ঝোঁক। শুধু এই নয় যে, এই যুগেই কেবল মার্কসের মানবতাবাদ কাজে লাগছে। বর্তমান মার্কস-তত্ত্বের ছাত্ররা অতীতের ইতিহাসেও মার্কসীয় মানবতাবাদ কীভাবে কাজ করেছে সে-বিষয়ে ভাবছেন, ব্যাখ্যা করছেন। এটা পূর্ববর্তী ছাত্ররা করেন নি। মার্কসের মানবতাবাদ নিয়ে যে-আলোচনা শুরু হয়েছে, তার বাস্তব কারণ, মার্কসের কিছু লেখা যা আগে অপ্রকাশিত ছিল; আর ভাবগত কারণ, বর্তমান কালের মানুষ মানবতাবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। ফলে মার্কসের সমস্ত রচনাই এক নতুন দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। বস্তুত মানবতাবোধ থেকেই মার্কসবাদের জন্ম – এই চেতনারও জন্ম হয়েছে এবং মানবপূজারী মার্কসের চরিত্র 'আবিষ্কারে'র চেষ্টাই চারদারে আজকাল হচ্ছে।

মানবতাবিরোধী যতরকম অপরাধ, যত পৈশাচিক ধ্বংসলীলা সম্ভব, তা আমাদের যুগ থেকে বেশি অন্য কোনো যুগে হয় নি। ডেমোক্লিসের খড়্গের নিচে আমরা বেঁচে আছি, যে-কোনোদিন হয়তো সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের যুগেই আবার মানবতার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে বেশি। আজকাল যত মারামারি তা এই মানবতাবোধ কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়েই। হঠাৎ শুনলে পরস্পরবিরোধী মনে হয়, কিন্তু এটা সত্য। ইতিহাসে দেখা গেছে মানবতাবোধ যখন চরম সংকটাপন্ন, যা-কিছু মানুষের পক্ষে মঙ্গলের তাদের ধ্বংস যখন আসন্ন, তখনই মানবতার জন্য বিপ্লব শুরু হয়েছে।

প্রকৃতিকে আয়ত্ত রাখার জ্ঞান ও সামর্থ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও

মানুষ তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্পর্কেই আজ শঙ্কিত। এ জন্যই আবার সে নতুন সামর্থ্যের সাহায্যে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ অনুভব করছে। এর কারণ আছে।

প্রথমত, মানুষ আজ নিজেকে দেখতে পাচ্ছে দুই বিভিন্ন সামাজিক-অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণে। এর ফলে যত শঙ্কা ও আশা। এবিষয়ে তর্ক করে লাভ নেই, তা আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি বা না করি। ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি, এই দুই ব্যবস্থার সন্ধিক্ষণে নানা ধরনের ভূমিকম্প ঘটছে। তাদের প্রধান হচ্ছে মূল্য-বোধ সম্পর্কে সাবেকি চেতনায় সংকট। সাবেকি আমলের উৎপাদনব্যবস্থা যত-দিন সমাজে পরস্পরের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করবে ততদিন মানুষও সেই সমাজব্যবস্থায় আস্থা নিয়েই বাঁচবে, সেই সামাজিক সম্বন্ধগুলোকেই স্বাভাবিক মনে করবে, কারণ সেই সম্বন্ধগুলোই তখন মোটামুটি দৃঢ় ও সামাজিক মূল্যবোধ অনুযায়ী তৈরি। আবার উল্টোভাবে দেখলে, সেই মূল্যবোধগুলোই 'স্বাভাবিক' মনে হবে, কারণ সেগুলো তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্বন্ধের সঙ্গে খাপ খায় এবং মানুষের প্রয়োজনেও কাজে লাগে। অর্থাৎ, সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধের জন্মই সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে এবং তা-ই আবার সামাজিক সম্বন্ধকে দৃঢ় ক'রে তোলার মূলে। এজন্যই, যখন উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে তখন সমাজের স্বীকৃত মূল্যবোধও শিথিল হয়ে যায়। আবার বিপরীতভাবে, সামাজিক মূল্যবোধে পরিবর্তন সমস্ত সমাজব্যবস্থাই পাল্টে দিতে পারে: অসুখ হলেই দেহের অস্তিত্ব এবং কার্যপ্রণালী সম্পর্কে চেতনা জাগে, যা সুস্থ অবস্থায় থাকে না। সেরকমই সমাজব্যবস্থায় 'অসুখ' দেখা দিলে, অর্থাৎ যুগধর্ম অনুযায়ী যা উৎপাদনব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং যা প্রচলিত তার মধ্যে বিভেদ দেখা দিলেই, মানুষ পরস্পর সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, বিশ্লিষ্ট হয়ে ওঠে। পুরনো মূল্যবোধ যখন প্রায় শিথিল হয়ে ওঠে, অথচ নতুন মূল্যবোধও সৃষ্টি হয় না, অন্তত সমাজে স্বীকৃত হয় নি, বা 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য হয় নি, এমন অবস্থায়ই এই বিদ্বেষ বেড়ে ওঠে। এমন অবস্থা ঘটেছিল সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পরিবর্তনের সময়, আজকে ঘটছে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবর্তনের সময়। অবশ্য বর্তমান যে-পরিবর্তন তা বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে, বিভিন্ন নামে আখ্যাত হচ্ছে ও হবে। সেইজন্যই, প্রথম পরিবর্তন সম্পর্কে তরুণ মার্কসের রচনা আজ এই দ্বিতীয় পরিবর্তনের যুগে এত আলোচনার বস্তু হয়ে উঠছে। এই দুই পরিবর্তন চরিত্রে বিভিন্ন হলেও, তাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ আছে যেগুলো আবার দুটোকে সংযুক্ত করছে।

মানুষের সমস্যা সম্পর্কে, মানবতাবোধ সম্পর্কে এই সচেতনতা গড়ে ওঠার মূলে আছে শুধু যুগপরিবর্তনজনিত মূল্যবোধের ক্ষয়প্রাপ্তিই নয়, এই চেতনার আরো বড়ো কারণ যুদ্ধ—যে-যুদ্ধের ফলে সমস্ত পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, সেই যুদ্ধের আশঙ্কা। এক জন্মে দুটো ভয়াবহ যুদ্ধ ও হিরোশিমা থেকে এই শঙ্কার

জন্ম। সমস্ত সমাজে যে-নতুন উদ্বেগের জন্ম হয়েছে, আজ পর্যন্ত তার সম্যক আলোচনা হয় নি, হয়তো রাজনীতির কারণেই। আলোচনার অভাব থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে, মানুষের চেতনায় এই উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া কী! আমাদের যুগে মানবতাবোধ, মানুষের জীবনের প্রাথমিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতার মূলে আছে এইসব উদ্বেগজনিত প্রতিক্রিয়া।

মানুষের মন ক্রমশ মানবতাবোধের দিকে ফিরছে, তার কারণ আধুনিক যুদ্ধ-যন্ত্রের ভয়াবহ উন্নতি এবং তার ফলে মানুষের অস্তিত্বের বিপদ। তাছাড়া বর্তমান সভ্যতার ধাক্কায় মানুষের প্রাথমিক মূল্যবোধগুলোও শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

এখানে এক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হবে। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর দিয়েছেন অস্তিত্ববাদীদের মতো দার্শনিকেরা, কিন্তু সেই উত্তর অস্পষ্ট ভাসাভাসা আত্মমুখ দূরকল্পনা-দোষে দুষ্ট। আবার অস্তিত্ববাদী (existentialist) বা ব্যক্তিত্ববাদী (personalist) ভাববাদ একেবারে উড়িয়ে দিলে, আধুনিক জীবনের অন্যতম তাৎপর্যময় সমস্যাকেও অস্বীকার করা হবে, বর্তমান জীবনকে বোঝার অন্যতম এক দার্শনিক অস্ত্রের সাহায্য থেকেও আমরা বঞ্চিত হব। ফলে বাধ্য হয়েই, এ-রকম বাধ্যতা দার্শনিকদের জীবনে প্রায়ই ঘটে, আমাদের এই দুই বিপরীতের মধ্য দিয়ে চলতে হবে—একদিকে ভাববাদের ফাঁদ, অন্যদিকে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষতি।

বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে বৃহৎ জনমণ্ডলীর সভ্যতা। এর ব্যাবহারিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের, বিশেষত শহরে নগরে, কাজের ও জীবনের মধ্য দিয়ে, জনসংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, সংস্কৃতির নানারকম প্রকাশের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার ভিত্তির এইসব উপকরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার স্থান এটা নয়, এইসব উপকরণের সামাজিক কারণ সম্পর্কে আলোচনাও আমি এখন করছি না। শুধু এটুকু বলাই বোধহয় যথেষ্ট, আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে-বিকাশ বর্তমান সভ্যতার ভিত্তিভূমি, সেই বিকাশের ফলে মানুষের সমাজজীবনে ব্যাবহারিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে অসম্ভব সুযোগসুবিধা এসেছে। মানুষ আজ সমাজে যেভাবে জীবন কাটায় তাতে সমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগের সূত্র সংখ্যায় যেমন বেড়েছে তেমনই দৃঢ়তর হয়েছে। আবার এই গ্রন্থিসূত্রগুলোই সাবেকি বন্ধনগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে—প্রতিবেশিদের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে, জীবিকার সঙ্গে বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। সমাজজীবনের নানা দিকেই ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে এসেছে। ভালোই হোক মন্দই হোক, সমাজজীবনের এই দিকটি অস্বীকার করার উপায় নেই। যুগপরিবর্তনের ধাক্কায় ব্যক্তির নানা সমস্যার উদ্ভব, আর একদিকে জীবনে ব্যক্তিসত্তার বিলোপ, এই দুটো দিক একসঙ্গে মনে রাখলে বর্তমান মানুষের 'বিচ্ছিন্নতাবোধে'র জন্মের কারণ নিয়ে দার্শনিকেরা কেন নানা কল্পনাপ্রবণ আলোচনা করছেন, কেন তাঁরা 'অস্তিত্ববাদী হতাশা'র কথা বলেন তা

বোঝা সহজ হবে। এর চরম ভাষ্য বা সমাধান স্বীকার করি না বলে এর সমস্যা-গুলোও উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এই সমস্যার আলোচনা করলে আমরা বর্তমান মানুষের জীবনে মানবতাবোধে আকর্ষণ কেন জন্মাচ্ছে তার একটা উৎসের সন্ধান পাব। ব্যক্তির সামাজিক ও তাত্ত্বিক স্থান, সমাজে তার নিজের স্থান এবং তার ভবিষ্যৎ—এইসব নিয়ে আলোচনাই (আজ সমগ্র পশ্চিমি সভ্যতায় থাকে বলা হয় 'মানবতাবোধ সম্পর্কে আকর্ষণ') বর্তমান দার্শনিক চিন্তায় প্রধান অংশ নিচ্ছে।

অন্য ধরনের হলেও আর-একটি কারণ পূর্ববর্তী কারণগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবতাবোধ সম্পর্কে আজকের দিনের বৈশিষ্ট্য আমাদের উৎসুক ক'রে তুলেছে। আধুনিক দর্শনচিন্তার বিকাশে, বিশেষ ক'রে এর জ্ঞানতত্ত্ব বিভাগে, একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞানের আত্মমুখিন আলোচনা। এই ধরনের আলোচনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্মে : মনোবিদ্যা, বিশেষত মনোবিকলন, ভাষাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করা ব্যাপারে ভাষার স্থান নির্ণয় করে যে-তর্ক-শাস্ত্র, মানুষের জ্ঞানের বিকাশে সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে যে-বিজ্ঞান, সেই-সব বিজ্ঞানের জন্মে। এইসব বিশেষজ্ঞ গবেষণার ফলে, সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে মানুষের মনের যে-বিশেষ স্থান আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি আত্মমুখী ভাববাদে বিলীন হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ঘটে নি। নতুন চিন্তার প্রসার সম্ভব অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু ভাববাদের নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠার কারণ নেই। পুরনো সাবেকি সমস্যাগুলোও, যথা কাণ্টের *a priori* জ্ঞান, নতুনভাবে ভাবা যেতে পারে। আধুনিক দর্শনের এই নতুন চিন্তার বিকাশ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিশেষ ক'রে লোকহিতকর জ্ঞানের ক্ষেত্রে নানারকম প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের সমস্যা সম্পর্কে, মানবতাবোধ সম্পর্কে নতুন ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয়েছে।

বর্তমান জীবনে মানবতা সম্পর্কে ঔৎসুক্যের মূলে আছে এইসব কারণ। এদেরই প্রভাবে, আমাদের যুগ সমস্ত ঘটনা ও ব্যক্তিকে দেখে মানবতাবোধের চশমার মধ্য দিয়ে। এদেরই প্রভাবে, মার্কসের যে-মানবতাবাদ এতদিন পর্যন্ত মার্কস-ভক্তদের মধ্যেও কোনো কৌতূহল জাগায় নি, সেই মানবতাবাদ আজ মার্কসীয় দর্শনের মূল আলোচ্য হয়ে উঠেছে এবং মার্কসবাদের ছাত্রদের মধ্যে নতুন উৎসাহী আলোচনার সৃষ্টি করেছে। আমরা যে-রীতিতে ইতিহাসকে দেখি বা ব্যাখ্যা করি, বর্তমান জগৎ আমাদের সেই রীতিকে সাহায্যই করছে—ইতিহাসের এই দর্শন ও ব্যাখ্যা ইতিহাসে বর্তমানবাদ (presentism) প্রতিষ্ঠা করছে। এই তত্ত্বের চরম রূপটি সবসময়ে ঠিক না হলেও, মোটামুটি এর চিন্তাভাবনাগুলো ইতিহাসকে বুঝতে সাহায্য করছে।

বর্তমান জীবনে বিভিন্নসূত্রে মানবতাবাদ সম্পর্কে আকর্ষণের মূলে তাহলে

আছে এইসব কারণ। মানবতাবাদ বলতে আমরা যদি সেই তত্ত্বসংগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যাবহারিক ধারণা বোঝাই যা 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই কথাটা মেনে নেয়, তাহলে স্বভাবতই মানুষ বলতে কী বুঝি এই ধারণার উপর মানবতাবাদের নানা ভাষ্য হবে। তাছাড়া, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে যে মূল্য-বোধগুলো সেই মূল্যবোধগুলো কীভাবে ভাবা হচ্ছে এবং সেই মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনের লক্ষ কী ও সেখানে কীভাবে পৌছানো যায় সেই ধারণা সম্পর্কেও নানা ভাষ্য ও তাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানবতাবাদের জন্ম হতে পারে। প্রত্যেকটিরই উত্তর নির্ভর করবে, যে-তত্ত্বগত এবং বিশেষ ক'রে যে-দার্শনিক দৃষ্টির সাহায্যে এগুলোর উত্তর দেওয়া হবে, তার উপর। যে-জন্যই জন্ম হয়েছে ক্যাথলিক মানবতাবাদ, আর মার্কসীয়, অস্তিত্ববাদী, প্রকৃতিবাদী ইত্যাদি মানবতাবাদ।

স্বভাবতই বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদের জন্ম হয়েছে, একই জিনিসকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার বিভিন্ন ভাষ্যের জন্য। সে-জন্যই বোঝা যায় কেন বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদের মধ্যে শুধু প্রতিযোগিতাই নয় বিরোধও দেখা দিচ্ছে। কথাটা হল এই : মানবতাবাদ নির্ভর করে কর্মের পরিকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। সেজন্য একটি মতবাদ অন্য মতবাদের চাইতে বেশি অনুগামী সৃষ্টি করতে পারলে তা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন মানবতাবাদের মধ্যে কেন এত প্রতিযোগিতা ও বিরোধ।

মার্কসীয় মানবতাবাদের অনুগামীদের যুক্তিগুলো কী, যার সাহায্যে তাঁরা এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের আশা করেন? তাঁদের বিরোধী বা প্রতিযোগীদের চাইতে তাঁরা যে উন্নত যুক্তির অধিকারী, সেই বিশ্বাসের ভিত্তি কী? বহু দশকের অবহেলা সত্ত্বেও আজ মার্কসীয় মানবতাবাদের এত আকর্ষণের উৎস কোথায়?

উৎস হল, মার্কসীয় মানবতাবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারে বিজ্ঞানবিরোধী না হলেও বিজ্ঞান-নিলিপ্ত ধর্মীয় মানবতাবাদের অতীন্দ্রিয় ও অকিঞ্চিৎকর ব্যাখ্যার সংঘর্ষ। মানবতাবাদের এই দুই ধারাই, মার্কসীয় মানবতাবাদ ও খ্রীস্টান মানবতাবাদ অধুনা প্রচলিত মতবাদগুলোর মধ্যে সব-চাইতে প্রবল ও বিস্তৃত। এদের বিরোধের কারণ, জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তিবিরোধী অতীন্দ্রিয় ধর্মপ্রবণ দৃষ্টির বিরোধ। মানবতাবাদে বিরোধ এই বৃহৎ বিরোধেরই সামান্য অংশ। আমার মতে, এই বিরোধের ফল সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকা উচিত নয়, যদিও যাঁরা উগ্র নিরীশ্বরবাদীর মতো অতিরিক্ত আশাবাদী আমি তাঁদের দলে নই। আজকের পরিস্থিতি এমন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বর্তমান বিকাশ ক্রমশই পুরনো দিনের সাবেকি ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে উঠছে। অবশ্য এই বিকাশ এর নিজেরই অন্তর্তর প্রকাশের কিংবা ভবিষ্যতে সাবেকি ধর্মে বিশ্বাসের অন্তরায় নয়। তবুও, সাধারণ লোকের জীবনে

সাবেকি ধর্মীয় বিশ্বাস ক্রমশই, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির বিকাশের ফলে, অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস যদি করতেই হয় তাহলে লোকের শুধু ইচ্ছাই নয়, সামর্থ্যও থাকতে হবে ; অর্থাৎ বিশ্বাস তখনই সম্ভব যদি তার ভিত্তিগুলো, *credo quia absurdum* ইত্যাদি, শিথিল না হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতি এইসব ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। সত্যের দ্বৈতবাদী তত্ত্ব অবশ্য এখনও আছে, তবুও এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতে হলে, সব কথা স্বীকার করেও, চিত্তভ্রংশী ব্যক্তিত্বের (schizophrenic personality) প্রয়োজন হয়, যা থেকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুক্ত। এই কারণেই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার কৃষ্টিনির্ভর বর্তমান যুগ বিজ্ঞাননির্ভর মানবতাবাদের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এটাই শেষপর্যন্ত মার্কসীয় মানবতাবাদকে জয়যুক্ত করবে, অবশ্য এই মতবাদকে যদি ঠিকভাবে বিকশিত করা যায়। তাহলেই ধর্মীয় বা ব্যক্তিবাদী মানবতাবাদকে দূর করে মার্কসীয় মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মার্কসীয় মানবতাবাদ এবং জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কী ? সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যাবে, মার্কসবাদে ব্যক্তিকে কীভাবে দেখা হয়েছে তার মধ্যে। এটাই দার্শনিক নৃতত্ত্বের মূলসূত্র।

খ্রীস্টান ব্যক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মস্বীকৃত অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিকে ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখার উপর নির্ভর করে। খ্রীস্টান ব্যক্তিবাদে মানুষকে দেখা হয় *personal spiritualis* হিসেবে, অস্তিত্ববাদে তাকে দেখা হয় স্বাধীন ইচ্ছার অণু হিসেবে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষকে এইভাবে ভাবা হয় যাতে এর দর্শনচিন্তার সঙ্গে তা খাপ খায়, যাতে কতগুলো সূত্র তৈরি করা যায়, যার উপর ভিত্তি ক'রে তার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে আসা যায়, স্পষ্টতই মানুষ সম্পর্কে ভাববাদী ধারণা ভাববাদী দর্শনতন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায় (বিশেষ ক'রে ব্যক্তিত্ববাদী মতবাদের সঙ্গে)। এই ধারণা অনেক সুবিধার সৃষ্টিও ক'রে দেয় : সূত্র হিসেবে এটা এমন সব বক্তব্য উপস্থাপিত করে যে-সূত্রগুলোই প্রমাণসাপেক্ষ। এই ধরনের দর্শনের একটা অসুবিধা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে এ খাপ খায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রমাণসাপেক্ষ সূত্রের দুর্বলতা সহজেই ধরা পড়ে যায় এবং যাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরা হয়েছে তার আত্মিকবাদমূলক চরিত্রটি উন্মোচিত হয়। এটা তথ্যনির্ভর তর্কে স্বীকৃত না-ও হতে পারে।

ব্যক্তি সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে এই ধরনের বিরোধ নেই এবং বস্তুতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে এর যথাযথ সামঞ্জস্য আছে। ব্যক্তিবাদী দর্শনের মতো নিজের সুবিধেমতো সূত্রও এ তৈরি করে নেয় না, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ ক'রে চলে দুর্বলতার সব বাধা থেকে এ মুক্ত। তথ্যনির্ভর পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি ক'রে এর কাঠামো, যাকে তিনটি সূত্রে বিবৃত করা যায় :

ক. ব্যক্তি প্রকৃতিরই অঙ্গ, প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্যে তার জন্ম এবং তাই যাবতীয় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত ;

খ. ব্যক্তি সেই সঙ্গে সমাজের অঙ্গ, সমাজের বিকাশের সঙ্গে তার বিকাশ, সামাজিক নিয়ম দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত ; এবং

গ. ব্যক্তি আবার নিজের আত্মবিকাশের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। ইতিহাসের স্রষ্টা ব্যক্তি নিজেই তার অস্তিত্বের ভিত্তি তৈরি করে, পরিবর্তিত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে, পরিবর্তিত করে। প্রকৃতি এবং সমাজের বিকাশের দ্বারাও আবার সে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত হয়।

জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি সম্পর্কে এই ধারণা খাপ খায়। মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরি করে, এই দর্শন তা স্বীকার করে, তাই এই দর্শন আশাবাদী। অস্তিত্ববাদী দর্শন, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ কল্পনা করে বলে তা 'হতাশার দর্শন'। মার্কসীয় দর্শন সেক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করে—তাই তা 'আশাবাদের দর্শন'।

ইতিহাসের এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির এই যে ব্যাখ্যা, যাতে ব্যক্তির আত্ম-বিকাশের ধারণা স্বীকৃত হয়েছে, এর ফলে মার্কসীয় মানবতাবাদ অন্যান্য মানবতাবাদের চাইতে, বিশেষ ক'রে ধর্মীয় মানবতাবাদের চাইতে, অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। স্পষ্টতই, আত্মবিকাশের এই স্বীকৃতিই অন্যান্য মানবতা-বাদ থেকে মার্কসীয় মানবতাবাদকে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত করেছে।

মার্কসীয় মানবতাবাদ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ এই দর্শনে ব্যক্তি শুধুমাত্র পরম শ্রেয় এবং যাবতীয় ক্রিয়ার লক্ষ মাত্রই নয়, নিজের বিকাশের কর্তাও সে নিজে। তার নিজের জগতে যে-সব মূল্যবোধ তা অন্য কোনো জগৎ থেকে আহৃত নয়, তার নিজেরই তৈরি, সামাজিক ব্যক্তির তৈরি। এই মূল্যবোধ অনুযায়ী কাজ করাও তার কর্তৃত্বাধীন। ব্যক্তি তার নিজের ইতিহাস নিজেই তৈরি করে এবং সেজন্য সর্বতোভাবে দায়ী সে নিজেই। এই মানবতাবাদে কোনো অন্তর্বিরোধ নেই, কারণ ব্যক্তিকে উপলক্ষ করেই এর উদ্ভব মানুষ পরম শ্রেয়, চরম লক্ষ, সমাজবিকাশের চরম স্রষ্টা। এই দর্শন আশাবাদী, কারণ এর ক্রমাগত বিকাশের ধারায় কোনো বাধা এ স্বীকার করে না।

ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কীয় যাবতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে জড়িত মানবতাবাদের ক্ষেত্র অন্যরকম। এখানে মূল্যবোধ তৈরি করে ব্যক্তি নিজে নয়, বাইরে থেকে তা আরোপিত হয়। ইতিহাসও, অর্থাৎ ব্যক্তির লক্ষে পৌঁছানর জন্য যে-যাত্রা তা-ও, মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় ; হয় অদৃষ্টবাদীরা যেমন মনে করেন, কোনো অতিমানব ইচ্ছার দ্বারা তা পূর্ব থেকেই চালিত অথবা নিয়ন্ত্রিত। এই মানবতা-বাদ স্বভাবতই ভেজাল-দেওয়া এবং অন্তর্বিরোধে ও অসামঞ্জস্যে দুষ্ট। এই দর্শন আশাবাদীও হতে পারে না, কারণ ব্যক্তি এই দর্শনে তার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

এই দুই ধরনের মানবতাবাদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিচ্ছে আমাদের যুগে।

এই সংঘাতের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ক্রমাগত প্রভাবে, মার্কসীয় মানবতাবাদই মানুষের মন বেশি অধিকার করছে।

জনগণের মধ্যে মার্কসীয় মানবতাবাদের আকর্ষণের কারণ অবশ্য এই নয় যে মুখ্যত তত্ত্বগতভাবে এই দর্শন অধিকতর গ্রাহ্য। এটা বলা বাড়াবাড়ি হবে যে যুক্তিগ্রাহ্য মানবতাবাদের জন্যই দক্ষিণ আমেরিকা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যুনিস্টরা বা ফ্রান্স-ইতালির কম্যুনিস্ট সংস্থাগুলো মার্কসীয় মানবতাবাদ গ্রহণ করেছে। বরং এটা ভাবাই সংগত যে অধিকাংশ লোকই এইসব যুক্তিতর্ক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত এবং এর কঠিন শব্দ-সংজ্ঞা ইত্যাদি বুঝতেই পারবে না। তাহলেও কিন্তু, তাদের অজ্ঞাতসারেই, তাদের সংগ্রামের সঙ্গে এই তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।

কর্মের ক্ষেত্রে, অন্যান্য সোস্যালিজ্‌মের মতো কম্যুনিজ্‌মও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ, কারণ এ মনে করে মানুষের মঙ্গলই মানুষের চরম লক্ষ। জনগণের কাছে এই দর্শন আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ মানুষের মঙ্গলের কথাই এতে সুসংবদ্ধভাবে বলা হয়। এবং যেভাবে বলা হয় তা শুধু শূন্যে কথা ছোঁড়া নয়, জীবনের সংগ্রামে তা যাতে কার্যকর হয় সেইভাবেই বলা হয়। সেইজন্যই মার্কসীয় মানবতাবাদের আরো দুর্বার আকর্ষণ, এই মানবতাবাদ জঙ্গীবাদী (militant)।

এই লক্ষণকে কোনোমতেই বিচ্ছিন্ন, পাপছাড়া বা শুধু আরো-একটা লক্ষণ বলে গণ্য করা উচিত হবে না। অন্যান্য যে-সব লক্ষণের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এই লক্ষণটি তাদেরই অঙ্গ এবং তাদেরই পরিণতি। মানুষ তার ভাগ্য নিজেই তৈরি করে, তার ভবিষ্যতের রূপের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার জীবন তার নিজের আত্মবিকাশের উপর নির্ভর করে ইত্যাদি স্বীকার করার অর্থ তাকে তার মূল্যবোধ অনুযায়ী তার নিজের ইতিহাস তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা। শুধু চেষ্টাই নয়, সে এটাকে তার নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করে, কারণ চেষ্টা বা চেষ্টার অভাবের ফল তাকে নিজেকেই ভোগ করতে হবে।

মার্কসীয় মানবতাবাদের এই দিকটি বহুদিন থেকে সুপরিজ্ঞাত। শুধু মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে ভুল ধারণার ফলে, যে-জন্য মার্কসের অনুগামীরাই দায়ী, এই সংগ্রামের দিক, তত্ত্বগতভাবে ব্যাবহারিকভাবে, মানবতাবাদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে গ্রথিত হয় নি, বরং অনেক সময় একে মানবতাবোধের বিরোধীই মনে হয়েছে। সংগ্রামকে কেবলই শারীরিক সংগ্রাম বলে গণ্য করা হয়েছে, সংগ্রাম যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও, সহিষ্ণুতার সঙ্গেও হতে পারে, তা মার্কসীয় ছাত্ররা সঠিক-ভাবে ব্যক্ত করেন নি। আমার বক্তব্যের উপসংহারে আমি এই দিকটি আলোচনা করব, না হলে মার্কসীয় মানবতাবাদের যে ভুল ব্যাখ্যা আছে সে-সম্পর্কে স্থির ধারণা হবে না।

আমি শুধু এই সাদা কথাটা বলেই ক্ষান্ত হব যে মার্কসীয় দর্শনে সংগ্রাম শুধু

শারীরিকই (physical) নয়, আত্মিক (spiritual) ও আদর্শগতও (ideological) বটে। তবের এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য বিরুদ্ধপক্ষকে নিজ মতের অনুকূলে আনা। বর্তমান আলোচনায় বিষয়টির এই দিকটি আমাদের নজরে আনা উচিত।

এই সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হল একপক্ষের মূল্যবোধের সঙ্গে প্রতিপক্ষের মূল্যবোধের সংগ্রাম, প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন ক'রে আপন যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই অহিংস (bloodless) সংগ্রামের উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের মন ও হৃদয় জয় করা এবং নিজের চিন্তাধারায় তাকে প্রভাবান্বিত করা।

সংগ্রাম শব্দেই প্রকাশ, দুপক্ষই পরস্পরের বিরোধী যুক্তির যাথার্থ্যও প্রমাণ করতে চাইছেন। এই বিরোধে কি চিন্তার আদানপ্রদানের কোনো স্থান নেই? ঘুরিয়ে বললে, দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু কি বিরোধই আছে, সাদৃশ্য কি একেবারেই নেই?

এই প্রশ্নের উত্তর অনেক হতে পারে, অনেক সময় সাদৃশ্য থাকে, অনেক সময় থাকে না। অনেক সময় দুপক্ষের ধারণা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী হয়। যেখানে সংগ্রাম শুধুই নেতিবাচক, সেখানে আদানপ্রদানের প্রশ্নই ওঠে না। যথা কম্যুনিজ্‌ম এবং ফ্যাসিজ্‌মে বিরোধ। আবার অনেক সময় দু পক্ষের ধারণায় বিরোধ থাকে, দু পক্ষের মধ্যে সংঘাতও অনিবার্য, কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে দু পক্ষের মধ্যে মিলও থাকে। যথা, আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের মানবতাবাদ। এই মন্তব্যে সেই ধরনের বিরোধই আলোচিত হচ্ছে।

চিন্তার জগতে সংগ্রাম এবং ভাববিনিময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ ক'রে আজকাল যখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা উঠেছে। এ কথা উঠছে, তার কারণ, রাজনৈতিক এবং চিন্তাগত বিরোধের ফলে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংসের মুখে। তাছাড়া, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বা অন্যান্য বিরোধ মেটানোর ক্ষেত্রেও এই বলপ্রয়োগের নীতি সরিয়ে রাখার চেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সুতরাং এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে উগ্র (militant) মার্কসীয় মানবতাবাদ কি অন্যান্য মানবতাবাদের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদান করতে (conducting a dialogue) একেবারেই অসম্মত?

আমার মতে এর উত্তর না। অন্যান্য মানবতাবাদের সঙ্গে মার্কসীয় মানবতাবাদের সংগ্রামে চিন্তার আদানপ্রদান শুধু থাকতে পারে নয়, এই আদানপ্রদান মার্কসীয় মানবতাবাদেরই অঙ্গ। তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্যান্য মানবতাবাদকে একেবারে সমূলে বিসর্জন দিতে হবে, বরং ওইসব মতের যে সব অংশ গ্রহণযোগ্য নয় তাদের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে মানবতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। এর একমাত্র উপায় চিন্তার আদানপ্রদান।

চিন্তার আদানপ্রদানও একধরনের সংগ্রাম, বিভিন্ন বিরোধী যুক্তি না থাকলে

আদানপ্রদান হতে পারে না, বা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। তবে, এই আদানপ্রদান কার্যকর হয়ে ওঠে তখনই যখন দু পক্ষের মধ্যে কোথাও না কোথাও মিল থাকে, যখন তারা একই ভাষায় কথা বলে, না হলে আদানপ্রদান অসম্ভব ও নিষ্ফল হয়ে ওঠে। তাই, আলাপ-আলোচনাও এক ধরনের সংগ্রাম, যদিও পুরো যুদ্ধ এটা নয়, এবং এই যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে খানিকটা আত্মীয়তা আছে। এই সংগ্রামে কিছুটা সহিষ্ণুতা দরকার, অন্যের যুক্তিতে কিছু পদার্থ আছে এটা স্বীকার করা আবশ্যক, এবং আমার মতই একমাত্র খাঁটি এই উগ্রভাবটাও ত্যাগ করা প্রয়োজন। অবশ্য সহিষ্ণুতার অর্থ দৌর্বল্য নয় বা বিশ্বাসের অভাবও নয়, নিজের যুক্তিকে সমর্থন করার অসামর্থ্যও নয়। অন্যের সম্বন্ধে নিজের যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও, তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করা ব্যাপারে একনিষ্ঠ হলেও, অপরের যুক্তি সম্পর্কে সহিষ্ণু হওয়া সম্ভবপর। সহিষ্ণু একমাত্র প্রবলেরই হওয়া সাজে, এটা আত্মবিসর্জন বা দ্বিধাগ্রস্ততার চিহ্ন নয়। প্রবল ও নিঃসন্দিগ্ধ ব্যক্তি সহিষ্ণু হলে নিজেকে দুর্বল না ক'রে বরং প্রবলতরই হয়ে ওঠেন। কারণ প্রতিপক্ষের যুক্তির কিছুমাত্র যাথার্থ্যও আছে কি না জানার তিনি সুযোগ পান, ফলে নিজের যুক্তিকে আরো বিশ্লেষণ ক'রে প্রবলতর করে তুলতে পারেন।

মার্কসীয় মানবতাবাদ উগ্র দর্শন হলেও তার মধ্যে কি অনুরূপ চিন্তার আদানপ্রদান, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির সুযোগ আছে? নিশ্চয়ই। মার্কসের ছাত্রদের পুরোধা যাঁরা তাঁরা কখনই মার্কসের দর্শনকে একটা বাঁধাধরা ছকে ফেলতে চান নি, তাঁরা অন্যদের মতের কথা সব সময় শুনতে, অন্যের চিন্তাধারা আত্মস্থ ক'রে নতুন ক'রে প্রকাশ করতে প্রস্তুত। মার্কস তাঁর রীতিপদ্ধতি (methodology) হিসেবে কার্তেসীয় সন্দেহবাদকে অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে নিয়েছিলেন। মার্কসের এই উদার দর্শন, যা আদানপ্রদানকে, সহিষ্ণুতাকে স্বীকার করে, তা কিন্তু বহু কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বিকৃত অবস্থায় নেওয়া হয়েছে, যথা চীনে। অবশ্য এই বিকৃতিকে শিশুকালে দাঁত ওঠার ব্যথা ('teething pains of leftism') বলেই গণ্য করা উচিত, কোনো কোনো দেশের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতার চিহ্ন। এটা সবারই জানা কথা, আত্মবিশ্বাস এবং তার ফলে সহিষ্ণুতা প্রবলেরই গুণ, বহু বছরের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এটা যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তেমনি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সে যাই হোক, মার্কসীয় মানবতাবাদের বর্তমান বিকাশ, অথবা বলা সংগত পুনর্জীবন, আজ যেভাবে হচ্ছে তাতে চিন্তার আদানপ্রদান এবং সহিষ্ণুতা অনেকাংশে স্থান নিয়েছে। বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসের আবেদন তাই আজ অনেক বেশি। মার্কসীয় মানবতাবাদ আজ এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, জনগণের মুক্তিযুদ্ধের হাতিয়ার হয়ে উঠছে, এর জঙ্গীবাদী রূপের সঙ্গে চিন্তার আদানপ্রদানের ক্ষমতাও যুক্ত হচ্ছে। এই মাটিতেই আমরা দেখব নানা মানবতাবাদের ঐক্য

ঘটবে, তাতে তাদের স্বরূপ নষ্ট হবে না, সত্যের বিকৃতি ঘটবে না, বরং মানুষের লক্ষ্যপথে যাত্রা আরো সুদৃঢ় হবে। এইভাবেই বিভিন্ন মানবতাবাদের মধ্যে আদানপ্রদান ঘটবে, তাতে তাদের দর্শন আরো সারবান হয়ে উঠবে। এইভাবেই মার্কসীয় মানবতাবাদের প্রভাব পুনরুজ্জীবিত হবে, কার্ল মার্কসের দর্শন যে আজও সজীব, আজও প্রয়োজ্য, তার প্রমাণ হবে।

DR. ADAM SCHAFF কার্ল মার্কস সংখ্যার জন্য পাঠিয়েছেন এই লেখাটি। নাম : *Marx and Contemporary Humanism*। অনুবাদ : প্রিয়ব্রত ঘোষ।

শ্যামল চক্রবর্তী

মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী

যা সত্য, সঠিক ও ন্যায্য, তাকে স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে ধারণ ক'রে রাখা এবং বিকল্প অসত্য, ভ্রান্ত ও অন্যায় পথ বা লক্ষকে অনুরূপভাবে বর্জন করা – তার জন্য যে মূল্যই দিতে হোক বা যত যন্ত্রণাই সহ্য করতে হোক না কেন – এই যদি নীতিসম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয় হয়, তাহলে কার্ল মার্কসকে 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতিনিষ্ঠ' বলে অভিহিত করা[১] নিশ্চয়ই সঠিক হয়েছে। মার্কসের জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করলেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে। সতেরো বছর বয়সের ছাত্র-জীবনেই প্রচলিত ভাববাদী চিন্তাধারার বিপরীত পথে তিনি নিজেকে 'বস্তুবাদী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তরুণ হেগেলপন্থীদের মধ্যে এসে তিনি নিজের চিন্তাভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বেশ সমর্থ হয়েছিলেন। ফয়েরবাখের মধ্যে ভাব-বাদের জের ও দৃষ্টিভঙ্গির অনড়তাকে অস্বীকার ক'রে তিনি উদ্ঘাটন করলেন বস্তুজগতে ও ভাবজগতে দ্বন্দ্বমূলক গতিবাদের সত্যকে। হেগেল ছিলেন ভূঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে শূন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে, তাঁকে শক্ত মাটিতে দাঁড় করালেন[২]। তরুণ বয়সে তাঁর বিভিন্ন রচনায় বা 'রাইনিশে সাৎটুঙ্' পত্রিকার সম্পাদনা উপলক্ষে লিখিত অনেক রচনায় ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শোষণের মূল রূপটি অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন। শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বাস্তব কর্মসূচি তথা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকায়। ব্যক্তিগত জীবনে ও আদর্শের ক্ষেত্রে কখনোই তিনি মাথা নুইয়ে আপসের পথে যেতে পারেন নি। 'বুর্জোয়া ফিলিস্টাইনদের'[৩] প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন ক'রে নিজের বিচার, বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার প্রতি সত্য থেকেছেন মার্কস। সত্যনিষ্ঠার জন্য কম মূল্য তাঁকে দিতে হয় নি – নির্বাসন, পুলিশি অত্যাচার, গ্রেপ্তার, আজীবন

দারিদ্র্য, বন্ধুবিচ্ছেদ সমস্ত কিছুই বরণ করেছেন; এবং লড়াই করেছেন। সে-লড়াই এমন কি সহকর্মী বা সহযাত্রীদের সঙ্গেও করতে হয়েছে। লাসালের সুবিধাবাদ বা বাকুনিনের নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ অতিপরিচিত। কিন্তু বিস্তৃত জীবনী আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আপাতত প্রাসঙ্গিক হচ্ছে: মার্কস জন্মাবার দেড়শো বছর পরে আমরা ব্যক্তি মানুষ হিসাবে কী পেলাম, কী ধরবো প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যে, কোন্ সত্যকে আমরা আঁকড়ে ধরে থাকবো?

মানবমুক্তা অনেকই প্রাচীন। মার্কস জন্মাবার বহু আগে বুদ্ধ এসেছেন, খ্রীস্ট এসেছেন, মোহম্মদ এসেছেন এবং শ্রীমদ্ভগবতগীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণ। বুদ্ধ বললেন: রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুময় এই জীবনযন্ত্রণার চক্র থেকে মোক্ষ চাও তো, আমি বলে যাচ্ছি, এই শীল অনুসরণ কর। খ্রীস্ট বললেন আমি যে-পথ বলে গেলাম সেই কর্ম অনুসরণ কর, ঈশ্বর তোমার প্রতি করুণা করবেন এই ক্ষণিকের জীবনবন্ধন উত্তরণ করতে পারলে আখেরি বিচারে স্বর্গের রায় তোমার সপক্ষে। গীতায় কথিত হল: যে মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করেছে, যার মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও যার কর্মপ্রেরক বুদ্ধি সর্বস্বই ঈশ্বরে অর্পিত, সে-ই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত। মোহম্মদ বললেন ঈশ্বরের নির্দেশ আছে কোরাণে, হদিসে; অনুসরণ কর; বেহেস্ত্ মিলবে।

মার্কস কিন্তু এই ধর্ম বস্তুটার উপরেই আঘাত হানলেন। চব্বিশ বছর বয়সে ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-'থিসিস' তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, তার ভূমিকাতে ঈসকিলাসের প্রমিথিউসের সঙ্গে তিনি কণ্ঠ মেলালেন: প্রকৃতই সকল দেবতা আমার ঘৃণার পাত্র[৪]। তিনি ঘোষণা করলেন: মানুষের প্রকৃত সত্তা বাস্তব রূপ পাচ্ছে না বলে সেই সত্তার কল্পনায় রূপায়ণ ঘটছে ধর্মে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, ফলে, অপর যে-জগতের আত্মিক সুবাস হল ধর্ম, সেই জগতের বিরুদ্ধেই সংগ্রামের মাধ্যম মাত্র। ধর্মীয় যাতনা প্রকৃত যাতনার প্রকাশ এবং সেই বাস্তব যাতনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ধর্ম হল নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস,...জনতার আফিম। ধর্মের মধ্যে আনন্দের মোহ বিনাশ করবার প্রয়োজন রয়েছে, প্রকৃত আনন্দ যাতে সর্ব-লভ্য হয়। যে-পরিবেশ বজায় রাখবার জন্য মোহের প্রয়োজন হয় তার উচ্ছেদের জন্যই মায়াজাল ছিন্ন করা আবশ্যক[৫]।

ধর্ম যে সর্বদাই দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ, নীতিবোধ, মূল্যবোধকে ঠেকা দিয়ে এসেছে, এ আজকে সমাজতত্ত্বের যে-কোনো পাঠ্যপুস্তকেই স্বীকৃত[৬]। মার্কসবাদীর কাছে ধর্ম গেল; কিন্তু তাহলে রইল কী?

মার্কস বললেন: ধর্মের সমালোচনা এই বলে শেষ হচ্ছে যে সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। সেই জন্য চরম দায়িত্ব হল সমূলে উৎপাটিত ক'রে ফেলা সেই সমস্ত সম্পর্ক যাতে মানুষ অবনত, অবহেলিত, ঘৃণিত দাস-সত্তায় পরিণত হচ্ছে[৭]।

মার্কসবাদীর কাছে তাহলে পরকাল আসল সত্য নয় ; এই পৃথিবী, এই মানব-জীবন, আসল সত্য। এই জীবনের মূল কর্তব্য হল যে-সমাজব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বকে বিনাশ করছে সেই সমাজব্যবস্থাকে মূলগতভাবে পরিবর্তিত করা, যাতে মানুষ তার প্রকৃত সত্তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই মনুষ্যত্বের বিনাশ ঘটাচ্ছে কে বা কারা ? এদের অবলোপই বা ঘটবে কোন্ পন্থায় ?

তার জবাব মার্কস-এঙ্গেলস দিয়েছেন মানুষের অদ্যাবধি লিখিত ইতিহাস হল তীব্র তীক্ষ্ণ শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। কর্ম-বিভাজনের ভিতর দিয়ে এসেছে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ; উদ্বৃত্তকে অসমানরূপে আত্মসাতের মারফতে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শ্রেণী ; উৎপাদনের উপাদান কিছু অংশের করায়ত্ত থাকার মারফৎ শ্রম-সৃষ্ট বস্তু শ্রমিকের শোষণের উপাদানে পরিণত হয়েছে। সামগ্রিক উৎপাদনসম্পর্ক হল ভিত্তি, যার উপরে গড়ে ওঠে সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং মানুষের ভাব-জগৎ। সুতরাং তার সত্য, ন্যায়, নীতি সম্পর্কে ধারণাও মূলত নির্ধারিত হবে তার শ্রেণীগত অবস্থানের উপর।

প্রশ্ন উঠতে পারে : শ্রেণীভেদে সত্যেরও রূপভেদ হয় কেমনভাবে ? মনুষ্য-নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফলাফল শ্রেণীনিরপেক্ষ হতে পারে, যদিও ব্যাবহারিক প্রয়োগ স্বতন্ত্র বিষয় ; কিন্তু যেখানেই মানুষের ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত আছে, যেখানেই ব্যক্তিমানস প্রতিফলিত হচ্ছে, সে-সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই শ্রেণীরূপ ধারণ করবে। বস্তুত ন্যায়নীতি, শুভাশুভ সম্পর্কে মানুষের চেতনা এতো পৃথক যে এ-সম্বন্ধে আপেক্ষিকতার স্বীকৃতির জন্য মার্কসপন্থী হতে হয় না[৮]। এঙ্গেলস খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন : জাতিগত পার্থক্য ও ইতিহাসের উপরে নীতির জগতে অপরিবর্তনীয় আইনসমূহ আছে এই অজুহাতে চিরন্তন, চরম ও চিরকালীন অপরিবর্তনীয় নীতির বিধান আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার সকল চেষ্টাকে আমরা অগ্রাহ্য করি।...সমাজও যেমন এতকাল শ্রেণীদ্বন্দ্বের মারফৎ এগিয়েছে, নৈতিক চেতনাও তেমনি বরাবরই হয়ে এসেছে শ্রেণীগত নীতিবোধ[৯]।

তাহলে মার্কসবাদী কোন্ নীতিবোধকে সচেতনভাবে গ্রহণ করবে ?

স্বভাবতই অতিজাগতিক কোনো চেতনার আশ্রয় যখন নেই, শ্রেণী-নিরপেক্ষ মানবিকতা যখন অবান্তর, তখন তাকে গ্রহণ করতে হবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নীতিবোধকে। তা গ্রহণ করবে এই জন্যই যে সমস্ত মানুষের মুক্তির অগ্রগামী পথিক হল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী। মার্কস ও এঙ্গেলস বলছেন : বর্তমান সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, তার উপরে চেপে বসে থাকা প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে নড়তে পারে না, নিজেকে টেনে তুলতে পারে না[১০]। আরও বলেছেন : এ শ্রেণী নিজেকে মুক্ত করতে পারে না, সমাজের অন্য সমস্ত ক্ষেত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি না নিয়ে এবং তার মধ্য দিয়ে আর

সকল ক্ষেত্রকে বন্ধনমুক্ত না ক'রে[১১]... । বলেছেন : শ্রমিকের মুক্তির মধ্যে নিহিত আছে বিশ্বজনীন মানবমুক্তি[১২]... ।

এখন শ্রমিকশ্রেণীর নীতিবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বুঝি ?

সমস্যা কিন্তু একটা আছে । বর্তমানের শ্রমিককে শোষণব্যবস্থা অনিবার্যভাবেই বিপ্লবী চেতনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ; কিন্তু এই শ্রমিক শোষণের ফলস্বরূপই জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, শিল্প ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠ অবদানের সঙ্গে অপরিচিত থাকছে । অশিক্ষা ও বঞ্চনার প্রভাবে তার উপরও ধর্মীয়, গোষ্ঠীগত, জাতিগত সংকীর্ণতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ কাজ ক'রে থাকে । সুতরাং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রকাশমান মনোভাবমাত্রেই মানবমুক্তির নিয়ামক চেতনা বলা কি যায় ?

এর জবাব দিয়েছেন মার্কস চিন্তা রূপায়িত হবার চেষ্টা করবে এই যথেষ্ট নয়, বাস্তবকেও চেতনার জগতে পৌঁছাবার চেষ্টা করতে হবে ।...দর্শন যেমন তার শারীরী অস্ত্র পায় সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীতে, সর্বহারাও তার চৈতন্যজগতের অস্ত্র খুঁজে পায় দর্শনে[১৩] । আর লেনিন বলেছেন বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সৃষ্টি-গুলিকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা, দু হাজার বছরেরও বেশি কাল জুড়ে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে যা কিছু ভালো তাকেই আত্মীকরণ করেছে ও নবরূপে গড়েছে বলেই মার্কসবাদ বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ হিসেবে ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে[১৪] ।

অর্থাৎ, বিশ্ব-সংস্কৃতির সেরা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী যে-শ্রমিকশ্রেণী তার সারিতে দাঁড়াতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে মানবমুক্তির দর্শনের সংযোগ ঘটাতে হবে মার্কসবাদীকে । জীবনের সর্বত্র এই চেতনাকে প্রতিফলিত করতে হবে নিরন্তর । শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লড়াই করা নয়, বিশ্বসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদানকে আত্মস্থ করতে হবে ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তাকে সঞ্চারিত করতে হবে ।

'লড়াই' শব্দে অনেকের দ্বিধা হতে পারে ; মনে হতে পারে, চিন্তা, চেতনা, মনোভাব গ্রহণ করা কি যথেষ্ট নয় ? শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম বোধ করাই কি পর্যাপ্ত নয় ? কিন্তু মনে রাখতে হবে, মানুষের চেতনার পথ হল কর্মের পথ, অভিজ্ঞতার পথ । শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া মানে তার মুক্তির জন্য, অর্থাৎ মানবমুক্তির জন্য সচেষ্ট হওয়া । সংগ্রাম ছাড়া তো মুক্তি আসে না । মার্কস বললেন : দার্শনিকরা নানাভাবে দুনিয়াটার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন ; আসল কথা হল একে বদলানো[১৫] । তাঁর মেয়েদের সঙ্গে খেলার মাধ্যমে মার্কসের স্বীকারোক্তির কিয়দংশ এখানে হাজির করছি :

সুখ বলতে আপনি কি বোঝেন ? — লড়াই করা ।
আপনার প্রিয় নায়ক কে ? — স্পার্টাকাস, কেপলার ।
আপনার কাছে প্রিয় বাণীটি কি ? — মানব-সম্পর্কিত কোনো-কিছুই আমার পর নয় ।

আপনার প্রিয় মূলনীতিটি কি ?—সব কিছুকেই সন্দেহ দিয়ে পরখ করা[১৬]।

লক্ষ করার বিষয় মানবপ্রেমিক কার্ল মার্কস সংশয়ের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সন্দেহ উত্তরণের মধ্যেই সত্যে উপনীত হবার পথ বেছে নিয়েছিলেন ; সংগ্রামেই তাঁর সুখ, তা সমাজ-জীবনকে পরিবর্তনের জন্যই হোক আর চেতনার পরিবর্তনের জন্যই হোক। আর নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন এমন দু জন লোককে, যার একজন স্পার্টাকাস, রোমের বৃহত্তম ও দীর্ঘকালব্যাপী দাস-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন ; অপরজন কেপলার, বিজ্ঞানের যে-তথ্যকে সত্য বলে বুঝেছিলেন তাকে অস্বীকার করতে রাজী হন নি, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের চরম নিপীড়ন সত্ত্বেও। এই সূত্রে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে মার্কস অন্যত্র বলেছেন : দর্শনের দিনপঞ্জিতে প্রমিথিউসের নাম থাকবে শ্রেষ্ঠ সন্ত ও শহীদ হিসাবে[১৭]। এ সেই গ্রীক পুরানের প্রমিথিউস। দেবতারা আলো ও আগুন থেকে মানুষকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলেন : প্রমিথিউস সূর্যের কাছ থেকে সেই আগুন চুরি ক'রে নিয়ে এসে মানুষের অন্ধকার দূর করেন। কঠিন শাস্তি দেন দেবরাজ তাঁকে : পাথরের সঙ্গে শেকলে বাঁধা প্রমিথিউসের দেহ ঠুকরে ঠুকরে খেত প্রতিদিন এক শকুনি। তিরিশ হাজার বছর চলবার কথা এ-শাস্তির। মানবসন্তান হারকিউলিস এই শকুনিকে হত্যা ক'রে প্রমিথিউসকে মুক্ত করেন তিরিশ বছর পর।

প্রতিটি নায়কের চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে : প্রত্যেকেই মানুষের সেরা পাওনা, তার জীবন, স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করছে সত্যের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, মানবমুক্তির জন্য।

দার্শনিক প্রশ্ন তুলতে পারেন : মার্কসবাদী ঈশ্বর মানে না, ধর্ম মানে না, অতীন্দ্রিয় জগৎকে স্বীকার করে না। মূঢ় ভোগবাদী তারা, স্থূল পার্থিব জান্তব আমোদ-আহ্লাদে নিজেদের ব্যাপৃত রাখার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতা তাদের কোথায় ?

এ-পর্যন্ত যে-সংগ্রামী জীবনের কথা বলা হল, তা কি ভোগবাদীর জীবনের বর্ণনা ? উপরন্তু মার্কস বলছেন : সচেতন জীবন-সাধনাই মানুষকে জান্তব জীবন থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছে[১৮]। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ, দুনিয়ার সঙ্গে তার মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে দাও ; তখনই ভালোবাসার বদলে মিলবে ভালোবাসা, বিশ্বাসের বদলে বিশ্বাস[১৯]। টাকা দিয়ে সমস্ত মানব-সম্পর্কের মূল্যায়ন সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন 'সাম্যবাদী ইস্তাহারে'র ছত্রে ছত্রে।

নীতিবাগীশগণ এখনও ধিক্কার দিয়ে উঠতে পারেন : মার্কসবাদী-মানুষে মানুষে সংঘাত সৃষ্টি করতে চায়, তারা সঙ্ঘবদ্ধে বিশ্বাস করে, মিলনে নয়, প্রেমে নয়।

মার্কসবাদী জবাব দেবেন : মিথ্যা কথা। মার্কস বা তাঁর কোনো অনুচর শ্রেণী এ-শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি করেন নি। অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মে শ্রেণীর উদ্ভব ;

পরস্পরবিরোধী শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতের পরিণতি শ্রেণীসংগ্রাম। মার্কস জন্মাবার কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই শ্রেণীসংগ্রাম চলে আসবার সাক্ষ্য ইতিহাস বহন করছে। আমরা চাই যে-অবস্থা শ্রেণীশোষণ ও শ্রেণীসংগ্রাম বজায় রাখছে, সেই অবস্থারই অবসান ঘটানো। সেই অবসানের জন্যই চাই বিপ্লব।

এবার দার্শনিক সোল্লাসে বলে বসতে পারেন: এই তো মার্কসবাদীদের দোষ। লক্ষে পৌছাবার জন্য পন্থা সম্পর্কে কোনোরকম বিচার করতে তারা নারাজ। তারা এটা বোঝে না যে অন্যায় পন্থা গ্রহণ করলে তা লক্ষবস্তুকেও বিকৃত করে। কৌটিল্য ও মেকিয়াভেলি তাদের গুরু। অসৎ, অনৃত, হিংসাত্মক কার্যকলাপের মারফৎ লক্ষে পৌছানো যায় না, তা অবাস্তব।

জবাবে মার্কসবাদী বলবেন: কোনো পন্থার রূপ যতো মনোরমই হোক না কেন, তা যদি লক্ষে নিয়ে না যায়, তবে সে মনোহর গোলোকধাঁধা তাঁদের কাছে পরিত্যাজ্য। বস্তুত, পন্থার সত্যতা নিয়ে বিতর্ক অবান্তর। সেই পন্থাই গ্রহণীয় যা লক্ষে পৌছাতে সক্ষম হবে, সবচেয়ে কম বিলম্বে, সব চেয়ে কম ক্ষয়ক্ষতির মারফৎ। বিনামূল্যে মহৎ লভ্য অর্জন করা যায় না।

তবু মনে রাখতে হবে, এমন কতকগুলো অভ্যাস গজিয়ে না যায় যা লক্ষে উপনীত হবার সময়ে যতো প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা অবান্তর ও হানিকর। যুদ্ধের সময় সৈনিক অপরপক্ষের হত্যা ও ধ্বংসের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়; যুদ্ধান্তে হত্যা হত্যাই, প্রাপ্য শাস্তি। অনুরূপ সমস্যা বিপ্লবের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। সাধারণ নির্বাচনে জাল ভোট সংগঠিত করলে, দলীয় নির্বাচনেও জালিয়াতির অভ্যাসটা সংক্রামিত হতে পারে। ডাকাতি ক'রে যে-সব স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দল অর্থসংগ্রহ করেছে, সেইসব দল ভাঙবার সময়ে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ অন্যতম প্রধান হিসাবে দেখা দিয়েছে।

আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণীর নেতা। শ্রমিকশ্রেণীর পুরোধা ও মুখপাত্রের কাজের দিকে সমস্ত মানুষই তাকিয়ে রয়েছে—শুধু ছিদ্রান্বেষী শত্রুপক্ষই নয়, সম্ভাব্য মিত্রপক্ষও—অনেকখানি আশা নিয়ে, ভরসা নিয়ে। সুতরাং মার্কসবাদীর আচরণে এমন কোনো-কিছু প্রকাশ পাওয়া 'ন্যায্য' হবে না, যাতে শ্রমিকশ্রেণীর নিজের আভ্যন্তরীণ ঐক্য বা আন্দোলনের পরবর্তী ধাপে বা পর্যায়ে অন্যান্য মিত্রশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী ব্যাহত হতে পারে।

উপরোক্ত প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বিশদতর ব্যাখ্যা সূত্রে বলা যায় যে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে স্তালিন-শাসনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের উপরেই যে-সন্ত্রাস বিস্তারিত হয়েছিল তাকে শুধু ব্যক্তিপূজার পরিণতি বলা যথেষ্ট নয়। সমাজতন্ত্র গঠনের সাফল্যে ব্যক্তিপূজা দৃঢ়ভিত্তিক হতে পেরেছিল, এ ব্যাখ্যাও আশ্বাস দেয় না। স্বর্গে সাফল্য লাভ করার প্রয়োজনে পার্টির অভ্যন্তরীণ লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলা নিশ্চয়ই

প্রয়োজন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরোধিতা করার সুযোগ থাকবে না কেন? সফল নেতা যখন ব্যক্তিগত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন, তখন তাঁকে ঠেকাবার ব্যবস্থা থাকবে না কেন?

অথবা, সত্যই নেতৃত্বের বিরোধিতার অধিকার মার্কসবাদীকে অর্জন করতে হবে প্রমিথিউসের মূল্য দিয়ে? পোল্যাণ্ড থেকে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন পর্যন্ত বহু অসম্মানিত শাস্তিপ্রাপ্ত সাম্যবাদী নেতারই তো পুনর্বাসন ঘটলো। পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গোমুল্‌কাকেও তো সাম্যবাদী শাসনাধীনে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছে। আসলে দ্বন্দ্ব তো শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সাথে সাথেই শেষ হয় না; সমাজতান্ত্রিক গঠনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেও নয়; এ দ্বন্দ্বে সরকারবিরোধী পক্ষ, প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরোধী পক্ষই যে সবসময়ে সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণী-স্বার্থের প্রতিভূ, তা নয়। সর্বদাই তারাই ঠিক বলছে, তাও নয়। মার্কসবাদ ধর্ম নয়। ঝাণ্ডার রং দেখে, মার্কস-লেনিনের উদ্ধৃতি দেখে, মার্কসবাদীর যাচাই হবে না। বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তার কাজ দিয়েই তার চরিত্র বিচার হবে।

মার্কসের জন্মের দেড়শো বছর পরে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের এতখানি সাফল্যের পরেও, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আজ দ্বিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনও ত্রিধাবিভক্ত; কমিউনিস্ট নাম গ্রহণ না করেও মার্কস ও লেনিনের প্রতি বিশ্বস্ততা ঘোষণা করে অল্পবিস্তর প্রভাবশালী এমন একাধিক দল বিদ্যমান। পরস্পরের প্রতি গালিমন্দ নিক্ষেপ করা স্বাভাবিক হলেও, ইতিহাসের চোখে তাৎপর্যহীন। যে-কোনো নামেই উপস্থিত থাক না কেন, এ-অবস্থাটা প্রতিটি মার্কসবাদীর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবাদের একত্ব স্থাপন করতে হবে, ভাবে, বাক্যে ও কর্মে সর্বহারা-বিপ্লবী রূপটি অর্জন করতে হবে ও প্রকাশ করতে হবে। মার্কসবাদের শক্তির বিকাশ ঘটবে এই মার্কসবাদীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, জয় তারই, যে যত শীঘ্র প্রকৃত মার্কসবাদী রূপকে প্রকাশ করতে পারে। অবশ্য বিনাশ হওয়াও সম্ভব, যদি একচেটিয়া পুঁজিপতির মনোভাবই গ্রাস ক'রে বসে, যদি অপরের বিনাশের মধ্যে নিজের স্ফীতির মোহ প্রাধান্য পায়।

বিপদ তো এই। কোনো সোজা 'ফর্মুলা' পাচ্ছি না। মার্কসবাদ আমাকে প্রকৃত মার্কসবাদী, অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানুষ হতে আহ্বান করছে। আমার খণ্ডিত সত্তা নিয়ে আমি সচেতন যে আমি তা নই। কিন্তু মার্কসবাদই আমাকে চলমান বিকাশমান জীবন সম্বন্ধে আস্থা এনে দিয়েছে। মার্কস জন্মাবার দেড়শো বছর পরে সমস্ত মার্কসবাদী এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি কি রাখে না?

নির্দেশিকা

১. Abu Syed Ayub: Marxism. *History of Philosophy: Eastern and Western*, vol. II, p. 394।

২. Marx, K : *Capital*, vol. I. Afterward to the second German edition. Moscow, p. 20।

৩. 'ফিলিস্টাইন' – Philister থেকে উদ্ধৃত ; আচারপোরে, ভেতরে, অমার্জিত ব্যক্তি।

৪. Marx, K & Engles, F : *On Religion*. Moscow, p. 13।

৫. Marx, K : 'Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right'. *Ibid.*, pp. 37-38।

৬. Davis, K : *Human Society*, p. 74।

৭. Marx, K : 'Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right'. *On Religion*, p. 45।

৮. Kallen, H. M : On 'Morals', *Encyclopedia of Social Sciences*, vols. IX & X, pp. 643-645।

৯. Engels, F : *Anti-Dühring*. Moscow, p. 132।

Marx, K & Engels, F : *Manifesto of the Communist Party*. Moscow, p. 64।

১২. Marx, K : 'Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right'. *On Religion*, p. 51।

১৩. Marx, K : *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. Moscow, p. 82।

১৫. Marx, K : 'Contribution to Critique of Hegel's Philosophy of Right'. *On Religion*, p. 51।

১৪. Lenin, V. I : *On Culture and Cultural Revolution*, Moscow, p. 153।

১৫. Marx, K : 'Theses on Feuerbach'. *On Religion*, p. 64।

১৬. *Reminiscences of Marx and Engels*, Moscow, p. 266।

১৭. Marx, K : *On Religion*, p. 14।

১৮. Marx, K : *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Moscow, p. 74।

১৯. Marx, K : *Ibid.*, p. 141।

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান

যে-কোনো মহৎ দার্শনিক চিন্তাভাবনার মূলে বোধহয় কাজ করে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলি বিচারের জন্য একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টিকোণ নির্দেশিত করার প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, কার্ল মার্কসের দর্শন, যা আজ মার্কসবাদ নামে খ্যাত, সে-বিচারের নিরিখে এক অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক স্থান পেয়েছে, মার্কসের পূর্বসূরি দার্শনিকগণ শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাবলি বিচারের কয়েকটি সূত্র নির্দেশেই সচেষ্ট ছিলেন – কিন্তু মার্কসই প্রথম প্রাকৃতিক এবং সামাজিক নিয়মাবলি বিচারের এক সাধারণ সূত্রের নির্দেশ দিলেন। মার্কসের এ-প্রচেষ্টার মূলে স্বভাবতই কাজ করেছে উনিশ শতকীয় ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন ; আবার অন্যদিকে এই বৈজ্ঞানিক সমাজবিশ্লেষণ-পটভূমিকায় তিনি দার্শনিক ধ্যানধারণায় এমন বিশেষত্ব আনলেন, যা বস্তুজগতের নিয়মাবলির বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতেও এক নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং যেহেতু মার্কস বস্তু ও সমাজনিরীক্ষা একই দৃষ্টিকোণ থেকে করতে চেয়েছিলেন – তাঁর সমাজদর্শন ছিল যে-পরিমাণে বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধ্যানধারণাও ছিল সেই অনুপাতে যান্ত্রিকতাবর্জিত এবং 'মানবিক'। ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের চিন্তাধারায় এই বিশ্ব এক অমোঘ নিয়মের রাজত্বের অধীন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই পর্যালোচিত হল নির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব (determinism) – যার মূলকথা হল কোনো-এক বিশেষ সময়ে কোনো-এক বস্তুর গতিধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতের কোনো-এক নির্দিষ্ট সময়ে বস্তুটির গতিধর্ম কীরূপ হবে তা বলা সম্ভবপর। নিউটনীয় বিজ্ঞান-দর্শনের এই অমোঘ বিধানেই যন্ত্রবিজ্ঞানের

অনন্যসাধারণ উন্নতির পথ প্রশস্ত হল এবং শিল্পবিপ্লবের পটভূমি রচিত হল। উপরন্তু দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এই নির্দেশ্যবাদের তত্ত্ব এমন এক যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দিয়েছিল যার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছিল যান্ত্রিক বস্তুবাদের তত্ত্ব। নিউটনীয় গতিবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকীয় বিজ্ঞানের মূল কর্মধারা ছিল যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জৈবিক এবং সামাজিক কার্যাবলিকেও একটি যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। এমন মনোভাবেরও সৃষ্টি হয়েছিল যে মানুষ একটি যন্ত্রবিশেষ—তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যন্ত্রাংশ মাত্র। সামাজিক পরিবর্তনকেও তাই ভাবা হল কেবলমাত্র জ্ঞানের উত্তরণ হিসেবে—অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি থেকেই আসে আদর্শ এবং মতবাদের পরিবর্তন এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক পরিবর্তন। এই চিন্তাধারার সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল ফ্রান্সিস বেকনের বিখ্যাত উক্তিতে 'জ্ঞানই শক্তি'।

বেকনের উপরোক্ত উপলব্ধি একদিকে যেমন মানুষকে প্রকৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল – যার ফলে উনিশ শতকের ক্লাসিকাল বিজ্ঞান এক পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় – অপরদিকে এই যান্ত্রিক দর্শনের বিপরীত কোণে এক আদর্শবাদী দর্শনেরও প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য অনেক চিন্তাবিদই উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের পরেও মানুষ নিরীশ্বরবাদী হয়ে ওঠে নি এবং ঈশ্বরচিন্তা অষ্টাদশ ও উনিশ শতকীয় বিজ্ঞানীদের মনে ব্যাপক প্রাধান্য না পেলেও কেউ সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে সক্ষম হন নি। অবশ্য এর প্রধান কারণ হিসেবে ছিল মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সংস্কারের প্রাধান্য – যারই পরিণতি ঘটেছিল গ্যালিলিও-র বিচারে। এমন কি ক্লাসিকাল গতিবিজ্ঞানের পুরোধা নিউটনেরও ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। একবার তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহনক্ষত্র সব মাধ্যাকর্ষণের শক্তির ফলেই আবর্তিত হচ্ছে বটে, কিন্তু এমন একজন কেউ আছেন, যিনি এদের প্রাথমিক গতি দিতে সাহায্য করেছিলেন। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সংস্কারমুক্তি তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি। বোধহয় কারো পক্ষেই সে-সময়ে সম্ভব ছিল না। একদিকে যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি ও এরই পাশাপাশি ঈশ্বরচিন্তার স্বাভাবিক পরিবেশ এবং অন্যদিকে কেবলমাত্র যান্ত্রিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক ও সামাজিক সমস্যাবলির সমাধানে অসাফল্য – এ সবের ফলস্বরূপ আদর্শবাদী দর্শনের এক নয়া ঢেউ অনেক চিন্তাবিদকেই আচ্ছন্ন করেছিল। কান্ট তাই বিজ্ঞানের দেশ এবং কালকে আমাদের চৈতন্যেরই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখলেন। প্লেটোর দর্শনের সূত্র ধরে লাইব্‌নিজ বস্তুর অন্তিমসত্তা হিসেবে 'আধ্যাত্মিক একক' (monads)-এর পরিচয় পেলেন। এবং হেগেলও বস্তুর প্রাথমিক সত্তা হিসেবে 'ভাব' (Idea)-এর সন্ধান পেলেন। বার্কলে তো সরাসরি বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার ক'রে বসলেন—প্রচার করলেন, বস্তু আসলে আমাদের চেতনা ও উপলব্ধিরই

এক সামগ্রিক রূপমাত্র—এবং এই বোধ থেকেই তিনি সোচ্চারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন।

বস্তুতন্ত্রবাদ এবং আদর্শবাদের এই বিরোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আর-একটি মতবাদ যা 'পজিটিভিজম' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পজিটিভিজমের সূত্রপাত এবং বর্তমানে অনেক চিন্তাবিদই এর সপক্ষে সোচ্চার। এই মতবাদ অনুযায়ী অভিজ্ঞতাই হচ্ছে সত্যনিরূপণের একমাত্র কষ্টি-পাথর—এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাই তথ্য ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা বা ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন। এই পজিটিভিজম-এর সূত্র থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল আনস্ট মাকের দর্শন, যা Empirio-Criticism নামে অভিহিত। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Materialism and Empirio-Criticism*-এ মাক এবং তাঁর শিষ্য বগদানভকে কীরূপ সমালোচনা ক'রে বস্তুতন্ত্র-বাদের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন।

যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং আদর্শবাদের বিরোধ একদিকে যেমন পজিটিভিস্ট মত-বাদের উদ্ভবে সাহায্য করেছিল, অন্যদিকে চিন্তাপ্রকরণে ও পরিবর্তনে যে দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব এক বিশেষ ভূমিকা নেয়, তাও স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা কেউ কেউ উপলব্ধি করেছিলেন। আদর্শবাদী চিন্তানায়ক হেগেলই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে আমাদের চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ বিভিন্ন বিপরীতমুখী চিন্তাধারার দ্বন্দ্বেরই পরিণতি। এবং আমরা সবাই জানি, মার্কস ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস হেগেলের এই দ্বন্দ্বের তত্ত্বকে বস্তুতন্ত্রবাদের আলোতে রূপান্তরিত ক'রে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের উপলব্ধিতে এসেছিলেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক ঘটনাবলির এক সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুত হেগেলের চিন্তার সমস্তাকে মার্কস সর্বস্তরের অস্তিত্ব এবং বিকাশের সমস্যা হিসেবেই দেখেছিলেন, এবং তাই কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি সামাজিক বিজ্ঞান, সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন ও বিকাশের বিচারে তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব এক অভাবনীয় সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছিল। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ তাই একটি তত্ত্বমাত্র নয়—তা হয়ে উঠেছিল কর্ম ও অগ্রগতির বীজমন্ত্র এবং তা বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নির্দেশিত করল এক বিশিষ্ট পদ্ধতি।

মার্কসবাদের পটভূমি রচনায় ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের যে-সব সূত্রাবলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা হচ্ছে কার্যকারণবাদের সূত্র এবং বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্যে একটি যোগসূত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। কার্যকারণবাদের সূত্রকে ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অবদান বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ঘটনারই একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটিকে বিচার করতে হবে—এ-শিক্ষা নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের নিয়মাবলি থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্বে একথা অতি সাধারণভাবেই স্বীকৃত।

বস্তুত মার্কসীয় তত্ত্বে অস্তিত্ব ও বিকাশের সম্যক উপলব্ধিতে অতীত ইতিহাসের বিচার-বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বিজ্ঞানের এই কার্যকারণবাদের শিক্ষাকে মার্কসই প্রথম সমাজবিজ্ঞানে ও ইতিহাসে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিহাসের কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্ন ও একক নয়। তার মূলে রয়েছে প্রাক্তন ঘটনাবলির সুনির্দিষ্ট ভূমিকা—এ ধারণা মার্কসীয় তত্ত্বে একটি সুস্পষ্ট রূপ পায়। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের ঘটনাবলির বিচারে ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্ণয় সম্ভব এমন ইঙ্গিত বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এযুগে কার্ল পপার প্রমুখ দার্শনিকরা মার্কসেই এই ইতিহাসবিচারের সারবত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সন্দেহের কারণ মূলত দুটি ১. আধুনিক বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের তত্ত্ব অস্বীকৃত এবং ২. মানুষের সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কগুলি অনেক জটিল, এবং এক্ষেত্রে বস্তু-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণপদ্ধতি অনেকাংশেই অচল। আধুনিক বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের তত্ত্ব অস্বীকৃত বলে তাঁরা যে-প্রচার করেছেন সে-সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে তাঁদের এ-ধারণা এসেছে আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রাবলি ও বিশ্লেষণপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক পরিচয়ের অভাব থেকে। আধুনিক বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের তত্ত্ব অস্বীকৃত—একথা আদৌ সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে কার্যকারণবাদ সম্পর্কে যে একটি যান্ত্রিক ধারণা ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের আওতায় গড়ে উঠেছিল, আধুনিক বিজ্ঞান তা থেকে মুক্ত। হাইজেনবার্গের অনির্দেশ্যবাদ মূলত কার্যকারণবাদের অস্বীকৃতি নয়—বরং নিউটনীয় ধ্যানধারণায় বস্তুজগতের বিভিন্ন সম্পর্কের যে-সব জটিলতার প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপিত হয় নি অনির্দেশ্যবাদ সেই সব জটিলতার বিচার-বিশ্লেষণের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্দেশ করে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকারণবাদ একটি বিশেষ রূপ নেয়। অনির্দেশ্যবাদের মূল সূত্র অনুযায়ী কোনো বস্তুকণার অবস্থিতি সম্পর্কে আমরা যতটা জানতে পারব, বস্তুকণাটির গতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হবে সেই অনুপাতে সীমিত। তার অর্থ এই নয় যে বস্তুকণাটির গতিপ্রকৃতি সমস্ত নিয়মের অতীত এবং সে-সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারব না। বস্তুত আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তু এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (Interaction)-র বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে নিউটনীয় ধ্যানধারণা থেকে কার্যকারণবাদের রূপান্তর বিচার্য। আর একটু বিশদভাবে বিষয়টিকে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, আমরা কোনো এক বিশেষ শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ইলেকট্রন বা অনুরূপ ক্ষুদ্র বস্তুকণার গতিপ্রকৃতি দেখতে চাই। আসলে বস্তুকণাটি আমরা তখনই দেখতে পারব যখন তার থেকে আলোর কণা এসে আমাদের চোখে পড়বে। কিন্তু আলোর একটি নির্দিষ্ট গতিবেগ আছে এবং বস্তুকণাটি থেকে বিচ্ছুরিত আলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির মাধ্যমে আমাদের চোখে এসে পড়তে কিছু সময় নেবে। ফলে

বস্তুকণাটির যে-অবস্থান থেকে আলোকণাটি বিচ্ছুরিত হয়েছিল এবং যে-সময়ে আলোকণাটি আমাদের চোখে প্রবেশ করেছে সেই সময়ের ব্যবধানে বস্তুকণাটির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ বস্তুকণাটির গতিশীলতার জন্য আমরা তার অবস্থান কখনোই পুরোপুরিভাবে অনুবীক্ষণে ধরতে পারব না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বস্তুকণাটির গতিপ্রকৃতি কোনো নিয়মের অনুশাসন মানে না এবং তা নিজের ইচ্ছানুযায়ী চলে। আসলে আমরা যা জানতে পারি তা হল বস্তু-কণাটির অবস্থিতি সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য পরিচয়। অবশ্য এখানে লক্ষণীয় যে যদি উপরোক্ত প্রসঙ্গটি পর্যবেক্ষকের প্রশ্নটি বাদ দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে তা অন্যরূপ অভিব্যক্তি পায়।

আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুকণার গতিপ্রকৃতি বিচারে দর্শক এবং দৃষ্টের মিথস্ক্রিয়া মৌলভাবে স্বীকৃত এবং তারই পটভূমিকায় অনির্দেশ্যবাদের সূত্রপাত। কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে অনির্দেশ্যবাদ বস্তু-জগতের নিয়মের রাজত্বের পতন ঘটায় নি, বরং নিয়মশৃঙ্খলার প্রসঙ্গটিকে অনেক যুক্তিবাদী এবং যান্ত্রিকতামুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তন্ময় ও মন্ময় জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি বিশেষ অর্থ পায় এবং বিজ্ঞানের তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক জগতের ধারণাকে পরিবর্তিত ক'রে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির বিচারে মন্ময় জগতের ভূমিকাকে গ্রহণ করে। ম্যাক্স বর্ন তাই একবার রসিয়ে বলেছিলেন এতকাল আমাদের ধারণা ছিল বিজ্ঞানীরা যেন একটি থিয়েটারের দর্শকমাত্র — মঞ্চে প্রকৃতির ঘটনাবলি একটি নাটকের মতো ঘটে যাচ্ছে আর বিজ্ঞানীরা তা দেখে চলেছেন। কিন্তু এখন বলা যেতে পারে বিজ্ঞানীর ভূমিকাকে তুলনা করা উচিত থিয়েটারের দর্শকের সঙ্গে নয় — বরং ফুটবল খেলার সঙ্গে, যার হাততালির উপর খেলাটা অনেকখানি নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে অনির্দেশ্যবাদের পটভূমিকায় মন্ময় ও তন্ময় জগতের আন্তঃসম্পর্ক কি মার্কসীয় তত্ত্বসম্মত? এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ একদিকে যেমন মন্ময়তাবাদ (subjectivism)-কে স্বীকৃতি দেয় না, তেমনি কোনোরূপ একদেশদর্শিতা বা সংকীর্ণতার স্থানও তাতে নেই। প্রকৃতপক্ষে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়, এবং বর্জন করে অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে আত্মতুষ্টির মনোভাব। আর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যেহেতু বাস্তবতার সুদৃঢ়ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণেই কোনোরূপ যান্ত্রিকতা বা dogma-র তা সম্পূর্ণ বিরোধী। এ-প্রসঙ্গে লেনিনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হল একটি সজীব বহুমুখী জ্ঞান, যার শাখা-প্রশাখা প্রতিনিয়তই বর্ধমান এবং যা বাস্তবতার সান্নিধ্যে আসার জন্য সমস্তপ্রকার পথকেই গ্রহণ করে।' তাই আধুনিক বিজ্ঞান যখন ক্ষুদ্র বস্তুকণার জগতের (micro-world) মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানে প্রয়াসী এবং

তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতার অন্য পর্যায়ে উত্তরণের আশ্বাস জানায়—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের নিয়মানুযায়ী তাকে স্বাগত না জানিয়ে উপায় নেই। এবং এটা খুবই আক্ষেপের বিষয় যে আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি সূত্রাবলির ব্যাখ্যায় অতি-সরলীকরণের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষিত সমাজে একটি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা থেকে মার্কসীয় তত্ত্বের অপব্যাখ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়।

এখানে বলা প্রয়োজন যে আমাদের এই বস্তুজগতে বাস্তবতার প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরভেদ আছে। ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমস্যা দেখা দেয় নি এবং এই চোখে-দেখা বিশ্বের ব্যাখ্যা ও বিচারে নিউটনীয় কার্যকারণবাদ সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু চোখে দেখা বস্তুসামগ্রীর অন্তরালে ক্ষুদ্র বস্তুকণার জগত ও সেই জগতে বাস্তবতার প্রকৃতি ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের নীতিসম্মত বাস্তবতার প্রকৃতি থেকে ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুত বিভিন্ন পর্যায়ভেদে বাস্তবতার বিভিন্ন প্রকৃতি ও অনুরূপ পর্যায়ক্রমে বাস্তবতার অনুধাবনই তো যুগপৎ বিজ্ঞানের ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের শিক্ষা। ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ধারণা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্যানধারণায় রূপান্তর ঘটল বলেই যদি কেউ সোচ্চারে ঘোষণা করেন আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছে, তা যেমন অর্থহীন (এবং হয়তো বা উদ্দেশ্যমূলক), তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাক্ষ্য মেলে না, এ ঘোষণাও তেমনি অপ-প্রচারমাত্র।

এ-প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে মানুষের সমাজের বিভিন্ন সম্পর্কগুলি অনেক বেশি জটিল এবং সমাজ-বিশ্লেষণে বস্তুবিজ্ঞানের বিশ্লেষণপদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ অনেকক্ষেত্রেই হয়তো সম্ভবপর নয়। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে ইতিহাস কোনো নিয়ম মানে না বা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আসলে মানুষের সমাজবিকাশ যেহেতু নির্ভর করে অনেক জটিল আন্তঃসম্পর্কের উপর, বাস্তবতার এই বিশেষ স্তরের প্রকৃতি ও নিয়মাবলির সঙ্গে বস্তুজগতের গতিপ্রকৃতির অনুরূপ সামঞ্জস্য খোঁজা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু একথা মনে রাখতেই হবে যে বাস্তবতার যে-বিশেষ স্তরে সমাজবিকাশের ধারা প্রবাহিত, তারও ব্যাখ্যা মেলে একমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপদ্ধতিতেই। ক্ষুদ্রবস্তুকণার জগত ও আমাদের চোখে-দেখা বিশ্বের বাস্তবতার স্তরভেদের ফলে আধুনিক বিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের অর্থ যেমন ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের কার্যকারণবাদের অর্থ থেকে ভিন্ন, তেমনি বস্তুজগত ও মানুষের সমাজের বাস্তবতার বিরাট স্তরভেদের ফলে সমাজবিজ্ঞানে কার্যকারণবাদের অর্থ অনেক বেশি ব্যাপক ও বহুমাত্রায় প্রসারিত। বাস্তবতার এই বিভিন্ন স্তরভেদ মার্কসীয় তত্ত্বে অবশ্যই স্বীকৃত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতেই তো লেনিন মন্তব্য করেছিলেন: 'কার্যকারণবাদের যোগাযোগ···

আসলে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আন্তঃসম্পর্কের এক ক্ষুদ্র অংশমাত্র।' এবং 'কার্য ও কারণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকক্ষেত্রেই এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলির অন্তর্লীন যোগাযোগকে অতি-সরলীকরণ করে এবং এভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার ফলে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে এক কৃত্রিম ও আপাত পরিচয় গ্রহণ করে মাত্র।'

মার্কসীয় তত্ত্বে জ্ঞান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। মার্কসের মতে জ্ঞান হল মানুষের মনে বাস্তবতার প্রতিফলন। আসলে বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা তখনই জানতে পারি যখন তা আমাদের চৈতন্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই চৈতন্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বস্তুর অস্তিত্বের প্রসঙ্গ অর্থহীন। তাই মার্কসীয় জ্ঞানের তত্ত্বে অভিজ্ঞতার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারি। বলা বাহুল্য, অনেক আদর্শবাদীই মার্কসের এই জ্ঞানের তত্ত্বে সায় দিতে পারেন নি। কারণ তাঁদের মতে বিশ্বপ্রকৃতির আইনকানুন (Laws of Nature) মানুষের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ এবং তাই আমরা সত্য বলতে যা জানি তা চৈতন্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। সত্য সম্পর্কে এই আদর্শবাদী ধারণা স্বভাবতই ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতায় অনেকখানি পুষ্ট হয়েছে। অবশ্য তারও বহুপূর্বে সভ্যতার আদিযুগে যেহেতু ঈশ্বরকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক বলে ভাবা হতো, তখনো সত্যকে মানুষের চৈতন্য-নিরপেক্ষ ভাবা হতো। প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক ক্ষেত্রে মার্কসই প্রথম জ্ঞান ও সত্যের ধারণা সম্পর্কে আমাদের চৈতন্যের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। এবং মার্কসবাদ যেহেতু জীবন ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, তাই মানুষের কার্যকলাপও বিশ্বপ্রকৃতির বিচারে এক বিশেষ অর্থ পায়। কারণ 'মানুষের চৈতন্য তো শুধু বাস্তবজগতকে প্রতিফলিত করে না, তাকে সৃষ্টিও করে (লেনিন)।' এবং তাই বলা সম্ভব হয় : 'দার্শনিকরা এতকাল শুধু বিশ্বকে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন প্রয়োজন বিশ্বকে পরিবর্তন করার।'

মার্কসের পূর্ববর্তী যুগে নিট্‌শে প্রমুখ দার্শনিকরা রটিয়েছিলেন যে এই বিশ্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান আমাদের আয়ত্তে আসা আদৌ সম্ভবপর নয়। এই অজ্ঞাবাদ (Agnosticism)-এর অন্যতম প্রধান হোতা ছিলেন ডেভিড হিউম। তাঁর মতে একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি আমাদের আয়ত্তাধীন, তার বাইরে কোনো-কিছুই আমরা জানতে পারি না, এবং বিজ্ঞানের দায়িত্ব হল এই ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই একটি নিয়মশৃঙ্খলায় আনা। তাঁরই সমসাময়িককালে জার্মান দার্শনিক কান্টও ঘোষণা করেছিলেন যে মানুষের যুক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই সত্যসন্ধানে একটি অবৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি এমন কথাও স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর দার্শনিক চিন্তাপ্রক্রিয়ায় 'বিশ্বাসকে স্থান দেওয়ার জন্য জ্ঞানকে ত্যাগ করতে হয়েছে' ('give up knowledge, in order to make room for faith')।

এই অজ্ঞাবাদের জন্মের উৎস অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য এ-ও স্মরণীয় যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে এই ঈশ্বরবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্ব সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক তথ্যাবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। যেমন প্লেটো ঘোষণা করেছিলেন যে গ্রহগুলো নিশ্চয়ই বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘোরে। কারণ বৃত্তেই সবচেয়ে বেশি সৌসাদৃশ্য (symmetry) পরিলক্ষিত হয় এবং ঈশ্বরের বিশ্বে নিশ্চয়ই সৌসাদৃশ্য থাকবে। যদিও আজকে আমরা জেনেছি যে গ্রহগুলো ঠিক বৃত্তাকারে ঘোরে না, বরং তাদের পথ হল এলিপ্টিক (elliptic), তবুও স্বীকার করতেই হবে যে ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস থেকে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকরা যে-সিদ্ধান্তে এসেছিলেন তা সত্যের অনেক কাছাকাছি।

আসল কথা, ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের বিরাট সাফল্যের ফলে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে যে-যান্ত্রিকতা স্থান ক'রে নিয়েছিল, তাতে মনে করা হতো কোনোরূপ বিশ্বাস বা পূর্বভাবনার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এবং এই পূর্বভাবনা বা বিশ্বাসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পূর্ণবিচ্ছেদ যাঁরা মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছিলেন অথচ বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতায় আস্থা রাখতে পারেন নি, তাঁরাই অজ্ঞাবাদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। মার্কসীয় জ্ঞানের তত্ত্বেই সুস্পষ্টভাবে মানুষের চৈতন্য, পূর্ব-ভাবনা ও জ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল এবং সত্য সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা গ্রহণ করা হল। বস্তুত মার্কসীয় তত্ত্বানুযায়ী 'বিমূর্ত (abstract) চিন্তা এবং তার থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় উত্তরণের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতেই সত্য ও বস্তুজগতকে জানা সম্ভবপর' (লেনিন)। তাই জানার পদ্ধতিতে পূর্বভাবনা এবং উপলব্ধিই হল প্রাথমিক পর্যায়। এবং বস্তুজগত সম্পর্কে মানুষের পূর্বভাবনা ও চিন্তাপ্রকরণ যেহেতু বিভিন্ন যুগে পরিবর্তনসাপেক্ষ, তাই যুগবিশেষে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে যে-জ্ঞান আহরণ করি তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের প্রগতি মূলত আমাদের এই জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং কোনো বিশেষ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান পূর্ণতার আরও কাছাকাছি পৌছায়। মানুষের অর্জিত জ্ঞানের এই অসম্পূর্ণতাকেই জ্ঞানের আপেক্ষিকতা বলা হয়ে থাকে।

বলা প্রয়োজন, জ্ঞানের এই আপেক্ষিক তত্ত্ব আদৌ অজ্ঞাবাদের রকমফের নয়। অজ্ঞাবাদের মূল বক্তব্য, আমরা কখনোই সত্যের সন্ধান পাবো না। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্বে জ্ঞানের বিকাশ একটি ক্রমিক পদ্ধতি, যুগে যুগে চিন্তাপ্রকরণের উৎকর্ষসাধনের মাধ্যমে আমরা ক্রমশ জ্ঞানের সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হই। এবং এই অগ্রসরের পরিমাপ তাই ইতিহাসের শর্তসাপেক্ষ। এই প্রসঙ্গে লেনিনের বক্তব্য স্মরণীয় : 'মানুষের চিন্তাপ্রকরণ তার প্রকৃতি অনুযায়ীই আমাদের পূর্ণসত্যের সন্ধান দিতে সক্ষম। এবং এই পূর্ণসত্য হল মূলত বিভিন্নযুগে অর্জিত আপেক্ষিক সত্যের যোগফল। বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায় এই পূর্ণসত্যের

যোগফলে নতুন কিছু সংযোগ করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলি হল আপেক্ষিক সত্য, যা সময়ে সময়ে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়ে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠে।'

এখানে নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে মার্কসবাদ সম্বন্ধেও তো তাহলে একথা প্রযোজ্য এবং ভবিষ্যতে মার্কসবাদও নিশ্চয়ই পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। অবশ্যই, কেননা মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান এবং তাই তার সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। নতুন অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের আলোকে মার্কসবাদ নিশ্চয়ই আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই লেনিনেরও বক্তব্য : 'আমরা মনে করি না মার্কসবাদ সম্পূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয়। বরং আমরা বিশ্বাস রাখি মার্কসবাদ বিজ্ঞানের কয়েকটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে যা সমাজতন্ত্রবাদীরা জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার তাগিদেই বিভিন্ন দিকে অবশ্যই প্রসারিত করে চলবে।' এখানে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে মার্কসবাদ শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্পর্কেও তা একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। তাই পরবর্তীকালে মার্কসবাদের সমৃদ্ধিও মার্কসীয় বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ীই সম্ভব হবে।

প্রশ্ন উঠবে, জ্ঞান এবং সত্য সম্পর্কে এই মার্কসীয় ধারণার সাক্ষ্য কি প্রকৃতি-বিজ্ঞানে মেলে? প্রথমত বিচার করা যাক পূর্বভাবনার প্রসঙ্গ। ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতার মোহে অনেক মনীষীই পূর্বভাবনার প্রকল্পকে বিজ্ঞান-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের ব্যাপক কর্মকাণ্ডও পূর্বভাবনা-বর্জিত নয়। কারণ নিউটনীয় গতিসূত্র যে-পূর্বভাবনার উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়েছিল তা হল, এই বিশ্বপ্রকৃতি এক অমোঘ নিয়মের অধীন। তেমনি প্রাচীন গ্রীকযুগে বিশ্বাস করা হল ঈশ্বরের দেশে সর্বত্রই সৌসাদৃশ্য বর্তমান এবং এই পূর্বভাবনার ভিত্তিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল্যবান তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আসলে মানুষের চিন্তাপ্রকরণের ভিত্তিই হল পূর্বভাবনা এবং জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিতে তা-ই হল প্রাথমিক পর্যায়।

মার্কসীয় তত্ত্বে সত্যের আপেক্ষিকতা সম্পর্কে যে-আলোচনা করা হয়েছে তাও পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। হয়তো আপাতদৃষ্টিতে তা বিজ্ঞানবিরোধী বলে মনে হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সত্যের আপেক্ষিকতাবাদের পুরোপুরি সমর্থন মেলে। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ত্রিশ বৎসর আগেও আমাদের ধারণা ছিল যে মৌলিক বস্তুকণার সংখ্যা তিনটি ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। সে-সময়ে তারই ভিত্তিতে বিজ্ঞানের অনেক শাখায় অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত করা হয়েছে। সে-সময়ে তাই ছিল সত্য। কিন্তু অতি আধুনিক যুগে আমরা জানতে পেরেছি আরো অনেক মৌলিক বস্তুকণার পরিচয় এবং এও আজ জানা গেছে যে প্রোটন ও নিউট্রনও

পুরোপুরি মৌলিক নয় – তাও অন্য মৌলিক বস্তুকণা সহযোগে তৈরি। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কীভাবে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণতার দিকে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে এগিয়ে চলেছি। একদিন গাছ থেকে আপেল-পড়া দেখে নিউটন যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছিলেন, পরবর্তীকালে আইনস্টাইন এই মাধ্যাকর্ষণের অন্য ব্যাখ্যা করেন এবং আইনস্টাইনের এই নতুন ব্যাখ্যায় আমরা মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে আরো অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। কিন্তু আইনস্টাইনের এই নতুন তত্ত্বের ফলে নিউটন বরবাদ হয়ে যান নি, বরং নিউটনীয় তত্ত্বে যে-অসম্পূর্ণতা ছিল, আইনস্টাইনীয় তত্ত্বে তার অনেকখানি নিরসন করা হয়েছে। হয়তো বা পরবর্তীকালে অন্য কোনো বিজ্ঞানী আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে আইনস্টাইনীয় তত্ত্বে যেটুকু অসম্পূর্ণতা রয়েছে তাকেও নিরসন করার চেষ্টা করবেন। এবং এভাবেই যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলে বিজ্ঞানের প্রগতির ধারা। বিজ্ঞানের ইতিহাস তাই মূলত সত্যের এক স্তর থেকে অন্য এক স্তরে উত্তরণের ইতিহাস।

এখানে অবশ্য বলা প্রয়োজন যে বিজ্ঞান কখনো অজ্ঞাবাদকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ অজ্ঞাবাদের বিচারে বৈজ্ঞানিক গবেষণামাত্রই অর্থহীন। যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের অন্তিম সত্য কখনোই জানা সম্ভব নয়, তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টামাত্রই প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী যখন গবেষণার পর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তাঁর সিদ্ধান্তই সত্য। বস্তুত ইতিহাসের সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে পরিপূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করতেই হবে। পরবর্তীকালে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে, একথা তিনি অবচেতন মানসে গ্রহণ করলেও সচেতনভাবে তখন এই চিন্তায় তিনি উৎসাহিত বোধ করবেন না। আর এখানেই রয়েছে বিজ্ঞানের শিল্পশৈলীর সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞান। মার্কসই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের এই শিল্পশৈলীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং তাই মার্কসবাদকে বলা যেতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিচারের বিজ্ঞান।

পল সুইজি

মার্কস এবং সর্বহারা শ্রেণী

পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য মোটামুটি সাধারণভাবে উপস্থাপিত হয় 'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এ। পরে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডে। একশো বছর আগেকার এই আলোচনায় এই তত্ত্ব বিবৃত হয় যে, ধনতন্ত্রের চরিত্রের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত। ধনতন্ত্র যতোই শক্তিমান হয়ে ওঠে ততোই এর সমস্যা ও সংকট বেড়ে ওঠে। অবশ্য এটাই সব কথা নয়। পুঁজিবাদ শুধু নিজের সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি করে না, এর কবর খোঁড়ে যে-সর্বহারার দল তারও জন্ম দেয় পুঁজিবাদ নিজেই। অবশ্য এমন সমাজ-ব্যবস্থাও সম্ভব যেখানে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, অথচ সে-ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ যে-নতুন শ্রেণী সেই শ্রেণীর জন্ম সেই ব্যবস্থা দেয় না। ইতিহাসে এর অনেক নজির আছে, যখন একটা স্রোতোহীন বদ্ধাবস্থা গজিয়ে উঠল, দুর্ভিক্ষ-দুর্দশার অন্ত থাকল না, এবং তার চেয়েও কোনো-এক প্রবলতর সমাজ-ব্যবস্থার কবলে গিয়ে পড়ল। মার্কস দেখিয়েছেন পুঁজিবাদ সে-রকম সমাজব্যবস্থা নয়: এর পরিণতি তিলে তিলে মৃত্যু নয়, অন্যের করায়ত্ত হওয়াও নয়, এর ধ্বংস সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, আনুপুর্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। তার কারণ, সমাজগঠনের জন্য পুঁজিবাদ এমন এক শ্রেণীর জন্ম দিতে বাধ্য যে-শ্রেণী বিপ্লবী হবেই। মার্কসীয় তত্ত্বে সর্বহারার দল সেই বিপ্লবী শ্রেণী। অনেকের ধারণা, আর তাঁদের মধ্যে অনেক মার্কসপন্থীও আছেন, যে সর্বহারা শ্রেণীর এই বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যই মার্কসীয় তত্ত্বের দুর্বলতম অংশ। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা দেখান, ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিম ইয়োরোপের নানা দেশে মার্কস-কথিত আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদের মূল চরিত্র মেনে নিয়ে সংস্কারবাদী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে

এবং পুঁজিবাদীকে ক্ষমতাশালী ক'রে তুলেছে। সবচাইতে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণী কখনই বিপ্লবী হয় নি, কখনও যে হবে তার আশাও ক্ষীণ।

আমি মনে করি না মার্কসীয় তত্ত্বের এই তথ্যনির্ভর (empirical) সমালোচনা একেবারে ভুল। আবার তাই বলে এক ধাক্কায় মার্কসের এই তত্ত্বকে ফেলে দিতেও আমি রাজী নই। আমার মতে যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হল, মার্কস সর্বহারা শ্রেণীকে কেন বিপ্লবী মনে করেছিলেন, তার যুক্তিপারম্পর্য বিচার করা। তাহলেই আমরা দেখতে পাব, মূল তত্ত্বটি ভ্রান্ত নয়, তার কিছু ব্যাখ্যা ও প্রয়োগই বরং ভ্রান্ত।

প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল, সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবী মনে করার কারণ শুধু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি মার্কসের অন্ধ আবেগ বা বিশ্বাস নয়। তাঁর দৃষ্টিতে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিপ্লবী শ্রেণী গড়ে তোলে, যার পক্ষে পুঁজিবাদী অবস্থা পরিবর্তিত করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা কোনোটাই কষ্টকল্পিত নয়। সামর্থ্য আছে এই জন্য, এই শ্রেণীই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পুঁজিবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। ইচ্ছার জন্ম হয়, তার কারণ, এই শ্রেণী জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, মনুষ্যত্ববোধ থেকে বঞ্চিত। মার্কস তাঁর 'পবিত্র পরিবার' (*Holy Family*) গ্রন্থে বলেছেন : সমাজবাদী তাত্ত্বিকেরা যে সর্বহারাদের মধ্যে যুগান্তকারীর সন্ধান পেয়েছেন তার কারণ এই নয় যে তাঁরা সর্বহারাকে দেবতা ভাবেন। বরং তার উল্টোটাই। মানুষ বলতে যা বোঝায়, এমন কি মনুষ্যত্ববোধ পর্যন্ত সর্বহারাদের মধ্য থেকে লুপ্ত হয়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সর্বহারারা মানুষেতর জীব। তার পরিবর্তে অবশ্য তার চেতনা জাগ্রত হয়েছে, এই অমানুষ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শক্তি পেয়েছে।...এই শক্তির জন্যই সর্বহারারা নিজেদের মুক্ত করতে পারবে।...

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সর্বহারারা কোন্ প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী হয়ে ওঠে? অনেক মার্কসবাদীর মতে, পুঁজিবাদের মধ্যেই বিপ্লবী শ্রেণী নিহিত, যে-প্রক্রিয়া পুঁজিবাদের সৃষ্টি ও গঠন করে সেই প্রক্রিয়াই সর্বহারার জন্ম দেয়। এঁদের মতে, এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ—যাকে মার্কস বলেছেন মূলধন গড়ে তোলার আদিম পর্যায় (primitive accumulation)—যখন উৎপাদনের হাতিয়ার শ্রমিকের হাত থেকে জোর ক'রে রক্তপাত ঘটিয়ে, ছিনিয়ে আনা হয়। পুঁজিবাদের সম্প্রসারিত উৎপাদনক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে থাকার ফলে সর্বহারার সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তারাই সংখ্যায় প্রবল হয়ে ওঠে, আধিপত্য বিস্তার করে। এই সম্প্রসারিত উৎপাদনক্ষমতার মূল কারণ, আপনারা জানেন, মজুরি শ্রমিকের সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিরা সঞ্চয় করতে থাকেন এবং এই সঞ্চয় ক্রমশই বাড়িয়ে আরো পুঁজি গড়ে তোলেন।

মার্কসীয় তত্ত্বের এই ব্যাখ্যা, সর্বহারার জন্ম এবং সংখ্যাগত (quantitative) আধিপত্য সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এই ব্যাখ্যা কি সে-

বিষয়ে কোনো আলোকপাত করে যে পুঁজিবাদ ধ্বংস করার বৈপ্লবিক ভূমিকা সর্বহারাদের মধ্যে কী ক'রে এল ? এই ব্যাখ্যা যদি সে-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করে তাহলে বুঝতে হবে, সর্বহারারা জন্মমুহূর্ত থেকেই বিপ্লবী, বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রয়োজন শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কারণ উৎপাদনক্ষমতা সম্প্রসারণের মধ্যে এমন কিছু নেই যা সর্বহারাদের মধ্যে গুণগত (qualitative) পরিবর্তন আনতে পারে। এখানে বোঝা প্রয়োজন, মার্কসীয় দর্শনে সর্বহারা জন্মমুহূর্ত থেকেই বিপ্লবী নয়, পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই গুণ ক্রমশ তার আয়ত্তে আসে।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্যের একটা দিক, যা অনেকেই জানেন, তবু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজনীয়। মার্কস বলেছেন : পুঁজিবাদ বিকাশের দুটি যুগ। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম ইংরাজি সংস্করণে সম্পাদকীয় ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেছেন : অর্থনীতির ইতিহাসে দুটো বিরাট ও বিভিন্ন যুগ আছে : উৎপাদনের (Manufacture) যুগ, যখন কায়িক পরিশ্রম প্রধান ; আর আধুনিক যন্ত্রশিল্পের (Modern Industry) যুগ, যখন যন্ত্রই প্রধান। দুই যুগকে আলাদা ক'রে আছে শিল্পবিপ্লব—যে-শিল্পবিপ্লবের কথা মার্কস বারবার বলেছেন—তার শুরু ১৭৩৫ সালে উইয়াটের সুতোকাটা যন্ত্রের উদ্ভাবনের সময় থেকে এবং যা ১৮২৫ সাল থেকে শিল্পজগতে বিরাট পরিবর্তন আনতে শুরু করে। এই ১৮২৫ সালে শিল্পের সংকট দেখা দেয় যাতে 'আধুনিক যন্ত্রশিল্প···এই প্রথম তার আধুনিক জীবন-চক্র শুরু করল।' (কের-সম্পাদিত 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড, পৃ ১৮)।

পুঁজিবাদের বিকাশে এই দুই যুগের মূলগত পার্থক্য আমাদের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমটির বৈশিষ্ট্য উৎপাদনপ্রক্রিয়ার নিজস্ব স্বরূপ, দ্বিতীয়টির বৈশিষ্ট্য একযুগ থেকে আর-এক যুগে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারার চরিত্রের পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে, মার্কসীয় অর্থনীতি-তত্ত্বের স্থূল প্রত্যয়গুলো (formal conceptions), যথা, স্থির ও পরিবর্তনশীল মূলধন, উদ্বৃত্ত মূল্য, সম্প্রসারিত উৎপাদনক্ষমতা ইত্যাদি দুই যুগেই প্রযোজ্য। তত্ত্বের বিচারে দুই যুগে কোনো পার্থক্য নেই, সে-জন্যই বোধহয় দুই যুগের পৃথকীকরণ সম্পর্কে মার্কসবাদী অর্থনীতিকেরা উদাসীন থেকে গেছেন।

উৎপাদনের যুগ প্রাচীন কারিগরি শিল্পেরই উন্নত রূপ। এর লক্ষণ হল, বহু দক্ষ শিল্পী একই সংস্থানে জড়ো হন, এবং সেই সংস্থানে এমন সব বৃত্তিবিষয়ক উন্নত ব্যবস্থা চালু করেন যা 'গিল্ডে'র যুগে অকল্পনীয় ছিল। উৎপাদন যুগের সবচাইতে বড়ো তাত্ত্বিক অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেছেন শিল্পের বিশেষায়িত দক্ষতা (specialization of crafts) বা শ্রমবিভাগ—শিল্পের পৃথক পৃথক অংশ পৃথক পৃথকভাবে উৎপন্ন করা। এই ব্যবস্থা শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিল এবং সভ্যতার ইতিহাসে এটা একটা বিশিষ্ট ধাপ। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে, উৎপাদনপদ্ধতিতে প্রযুক্তিবিদ্যা (technology) ব্যবহারের ব্যাপারে

উৎপাদনের যুগ কিন্তু রক্ষণশীল ছিল। তৎকালে চালু প্রযুক্তিবিদ্যার অধিকতর কুশলী ব্যবহারেই উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছিল, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্টিতে নয়। যাকে আমরা প্রায়ই বলি উদ্ভাবনা, সেই নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার উৎপাদন যুগের সৃষ্টি নয়। তাই মার্কসের কথায়, 'ইতিহাসে দেখি, শ্রমবণ্টন হচ্ছে উৎপাদনের যুগের বৈশিষ্ট্য, যা অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিক ব্যবহারে সার্থক হয়ে ওঠে। অনেকটা যেন অভিনেতার অজান্তেই ঘটনাটা ঘটে গেল। যদিও গিল্ডের কারিগরেরা সেই ব্যবহারকে আঁকড়ে ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়ে দিলেন। (ঐ, পৃ ৩৯৯)। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, উৎপাদন যুগে উদ্ভাবনা মোটেই হয় নি, অথবা এ-যুগের সংস্কৃতি বা চিন্তাধারা নতুন উদ্ভাবনার উপযোগী ছিল না। যদি তা সত্য হতো, তাহলে যেখানে যে-সময়ে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল তা কখনই হতো না। এর অর্থ শুধু এই, নতুন উদ্ভাবনা উৎপাদনপদ্ধতি থেকে অনিবার্যভাবে আসে নি, বরং পুরনো পদ্ধতির ভক্তদের কাছ থেকে নতুন উদ্ভাবনার বিরুদ্ধে প্রবল বাধাই এসেছে। আবিষ্কারের গতিতে এই অনুকূল ও প্রতিকূল আবহাওয়া থেকেই অ্যাডাম স্মিথের এই ধারণা জন্মায়, যেটা ন্যাথান রোজেনবার্গ (Nathan Rosenberg, 'Adam Smith on the Division of Labour', *Economica*, May 1965) দেখিয়েছেন, তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভাবনা শ্রমিক বা পুঁজিপতির অবদান নয়, এ হল সেই 'দার্শনিকদের' অবদান যাঁরা উৎপাদনপদ্ধতি থেকে বহুদূরে অবস্থিত।

উৎপাদন যুগের শ্রমিকেরা এই যুগের বিশেষ উৎপাদনক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। নানা ধরনের কারিগরি জ্ঞান এঁদের ছিল, বহুসংখ্যায় জড়ো হয়ে এঁরা এক সংস্থানে কাজ করতেন, পিতা থেকে পুত্রের মধ্যে এই জ্ঞান সঞ্চারিত হতো। এ-যুগের সর্বহারার বৈশিষ্ট্য হল তার শ্রেণী সম্পর্কে চেতনা নয়, বরং কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে চেতনা। এই কুশলী কারিগরেরা প্রায়ই সংস্কারাচ্ছন্ন, উদ্ধত, অসংযত, দাম্ভিক হতেন, পুঁজিবাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। তাঁদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, উৎপাদনব্যবস্থার পুরো চিত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না, সেখানে তাঁদের স্থান কোথায় সে-বিষয়েও কোনো বোধ ছিল না। সুতরাং এর পরিবর্তন সাধনের জন্য যে অবিরাম যুদ্ধের প্রয়োজন তা করার যোগ্যতাও তাঁদের ছিল না। উৎপাদন যুগে পুঁজিবাদ উৎপাদনপদ্ধতির ব্যাপারে রক্ষণশীল এবং রাজনীতিক ও সামাজিক পরিবর্তনবিরোধী ছিল।

মার্কসের মতে, যন্ত্রপাতির নিয়োগ শুরু হয় তখনই যখন যন্ত্র মানুষের হাত থেকে বিযুক্ত হয়ে একটা যান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয় (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪০৮)। এই যন্ত্র সবকিছুই পাল্টে দিল। শিল্পের এক শাখায় যন্ত্রের আমদানি হলে, অন্যান্য শাখায়ও তা ক্রমশ যুক্ত হতে থাকল এবং শেষের দিকে যন্ত্রই উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। এই সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য : শিল্পের

এক অংশে উৎপাদনপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এলে অন্যান্য অংশেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। এটা প্রথম ঘটে শিল্পের সেইসব অংশে যেসব অংশে, শ্রমবণ্টনের ফলে, একই ক্রিয়ার বিভিন্ন ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পরস্পরের সঙ্গে সংযোগবিহীন উপক্রিয়া আছে। প্রত্যেকটি উপক্রিয়া আলাদাভাবে পণ্যের অংশগুলো উৎপাদন করে। যেমন যন্ত্রে সুতোকাটা হলে সুতোবোনাও শেষপর্যন্ত যন্ত্রে হতে বাধ্য। সুতো বোনায় যন্ত্র এলে কাপড় সাদা করায়, ছাপায়, রঙ করায়ও আমূল যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন আসে। সুতোকাটায় পরিবর্তন আসার ফলে জিন আবিষ্কারে উৎসাহ এল—জিন দিয়ে তুলো থেকে বীজ আলাদা করা সুসাধ্য হল, সুতোর উৎপাদন বর্ধিত পরিমাণে করা সম্ভব হল। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হলো, শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদনপদ্ধতিতে এই বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের অন্যান্য অঙ্গে, যাতায়াতের পথে, যোগাযোগসূত্রেও আমূল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। জাহাজ ইত্যাদি তৈরিতে পরিবর্তন এল, বার্তাপ্রেরণ, যাতায়াতে এই নতুন যান্ত্রিক কৌশল যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গড়ে উঠল, যথা ষ্টিমার, রেল, জাহাজ, টেলিগ্রাফ। কিন্তু বৃহৎ পরিমাণে লোহা তৈরি করতে হলে, তাকে পিটিয়ে, কেটে, ছেনে, নতুন আকারে গড়তে হলে যে বড়ো বড়ো যন্ত্রের দরকার উৎপাদন যুগের কারিগরিবিদ্যা সে-সব বিষয়ে অচল।

আধুনিক শিল্পে সে-জন্য দরকার যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরি করার যন্ত্র—যা পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার হাতিয়ার। যতদিন এটা আসে নি, ততদিন যন্ত্রশিল্পের—প্রযুক্তি-বিদ্যার দিক দিয়ে—ভিত্ তৈরি হয় নি, স্বাবলম্বন ঘটে নি। ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যন্ত্র এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে অন্যান্য যন্ত্রের উদ্ভাবনায় সাহায্য করল। বিশেষ করে রেল এবং সমুদ্রগামী জাহাজে বিরাট উন্নতির ফলে, ১৮৬৬ সালের পূর্ববর্তী দশকে, দানবাকৃতি যন্ত্র (cyclopean machines) অপরিহার্য হয়ে উঠল। এই যন্ত্রপাতি হয়ে উঠল নতুন যুগের দিকনির্দেশক। (দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪১৯-৪২০)।

প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে পুঁজিবাদ উৎপাদন যুগে ছিল সংরক্ষণশীল এবং বিপ্লবের পরিপন্থী। আধুনিক যন্ত্রশিল্প এই দুয়েরই বিপরীত। দক্ষ কারিগরের কৌশল বা কোনো উদ্ভাবকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর না ক'রে প্রযুক্তিবিদ্যা এসে গেল নতুন বৈজ্ঞানিকের অধিকারে। মার্কসের পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'যন্ত্র ও আধুনিক শিল্প' অধ্যায়ে এটাই মূল বিষয়বস্তু এবং এই অধ্যায়টিই 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডকে যুগান্তকারী আখ্যা দিতে যথেষ্ট ছিল: কারখানায় অনুসৃত এই পদ্ধতি, যে-পদ্ধতি উৎপাদন-পদ্ধতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে—এবং তজ্জনিত সমস্যা জন্মালে তার সমাধান করে যান্ত্রিক রাসায়নিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নতুন নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে—সেই পদ্ধতিই যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। (দ্র. ঐ, পৃ ৫০৪)।

যে-পর্দা উৎপাদনব্যবস্থার সামাজিক পদ্ধতিকে, শুধু বাইরের মানুষের কাছ

থেকে নয়, শ্রমিকের কাছ থেকেও আড়াল ক'রে রাখে, যার ফলে উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশকে আপাতদৃষ্টিতে ধাঁধা মনে হয়, যন্ত্রশিল্প সেই পর্দাকে ছিঁড়ে ফেলল। প্রতিটি ধাঁধা সমস্যার পথ হল, সেটা মানুষের হাতে কীভাবে তৈরি হবে সে-বিষয়ে নির্ভর না ক'রে উৎপাদনের বিভিন্ন ভাগগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তৈরি করা। ফলে জন্ম হল নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার। এই বিচিত্র, আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগবিহীন, নিষ্প্রাণ উৎপাদনপদ্ধতির লক্ষ হল, সচেতনভাবে, পরিকল্পিতভাবে, কীভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে মানুষের কাজে লাগান যায়। (দ্র. ঐ, পৃ ৫৩২)।

এর থেকে সিদ্ধান্ত হল : আধুনিক শিল্প কোনো চলতি পদ্ধতিকে চরম বলে গণ্য করে না, স্বীকার করে না। সুতরাং এই শিল্পের প্রকরণগত (technical) ভিত্তি বিপ্লবাত্মক আর পূর্ব-অনুসৃত পদ্ধতি ছিল রক্ষণশীল। (দ্র. ঐ, পৃ ৫৩২)।

এই উৎপাদনপদ্ধতির সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে মার্কস মনে করতেন, আধুনিক যন্ত্রনির্ভর পুঁজিবাদী সমাজও কম বিপ্লবী নয় – উৎপাদন যুগের পুঁজিবাদী শিল্প-ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত। উৎপাদন যুগের ভিত্তি যে-কারিগরি শিল্প তা উৎখাত করে দিল এই যন্ত্র, ফলে কারিগরদের নানাবিধ দক্ষতাও অকেজো হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল কারিগরি শিক্ষাও প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল, বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের শ্রমমূল্য সস্তা হয়ে পড়ল। অন্যদিকে, দ্রুত কাজ করার ক্ষমতার, যন্ত্রের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার মূল্য বাড়ল – মেয়েদের এবং শিশুদের পক্ষেও কাজ পাওয়া সহজ হয়ে উঠল। শ্রমিকসংখ্যা অগণিত হয়ে উঠল। এটা আরও বাড়ল, তার কারণ : ১. শিল্পসংস্থায় যন্ত্রের ভিত্ পাকা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির নতুন শাখাপ্রশাখা বাড়ল, পুরনো শ্রমিকেরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল, এবং তারা বেকারদের বাজারে মিশে গেল ; এবং ২. শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চালু চাকরির সংখ্যা কমতে লাগল। মূলধন যদি বাড়তে না থাকে তাহলে সম্ভাব্য চাকরির হারও কমতে থাকল।

সংক্ষেপে, যন্ত্রপাতির ফলে একদিকে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বর্ধিত, সম-শ্রেণীভুক্ত (homogenized) ও উৎপাদনে ব্যয়হ্রাস ঘটল, অন্যদিকে শ্রমিকের শ্রমের চাহিদার হার কমে গেল। ফলে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন এল, পুঁজির তাতে সুবিধাই হল। মজুরির হার কমতে কমতে যা নেহাৎ না হলেই নয় বা তারও নিচে নেমে এল, কাজের সময় অভাবনীয়রূপে বাড়তে লাগল ; যন্ত্রের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে শ্রমিক বাধ্য হয়ে উঠল। এইভাবে পুঁজির আদিম সংগঠন (primitive accumulation) দিয়ে যে-বলিদান শুরু হয়েছিল, পুঁজির চাপে যন্ত্র এসে শ্রমের সেই বলিদান সম্পন্ন করল। শুধু মার্কসের চিন্তা অনুযায়ী সর্বহারার জন্মদাতা পুঁজিবাদই নয়, একে বলা চলে পুঁজিপতি কর্তৃক যন্ত্রের ব্যবহার।

অবশ্য এর দুটো দিক আছে। পূর্ববর্তী উৎপাদনের যুগের চাইতে যন্ত্রশিল্পের যুগে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, সর্বহারার শক্তি খর্বতর হল। কিন্তু রাজনৈতিক দিকে তার ক্ষমতার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে বাড়ল। পুরনো জ্ঞানের দাম, ভৌগোলিক সীমা, কারিগরি জ্ঞানে ঈর্ষা সবই কমে এল। আধুনিক শিল্পে কাজের ধরন এমনই হল যে সঙ্ঘবদ্ধতা এবং নিয়মানুবর্তিতা না হলেই নয়, ফলে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা সঙ্ঘবদ্ধ এবং নিয়মানুগ হল। শোষণনীতি চরমে ওঠায়, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থায় তাদের আকর্ষণ কমতে লাগল, তাদের জীবনযাত্রায় মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে উঠতে লাগল, পরিবার জীবন অসম্ভব হয়ে উঠল এবং শেষে তাদের কাজ থেকে, কাজের ফল থেকে, সমাজ থেকে, এমন কি নিজেদের থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। উৎপাদনের যুগে দক্ষ কারিগরেরা যা করে নি, এই যুগে তারা সেটা করল—তাদের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীচেতনা জাগ্রত হয়ে উঠল। এই চেতনার ফলে তারা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে শুধু আগ্রহী নয়, ক্ষমতালাভও করতে লাগল। এদের সম্পর্কেই মার্কস ও এঙ্গেলস 'সাম্যবাদী ইস্তাহারে' বলেছিলেন : 'সর্বহারাদের হারানোর কিছু নেই, শৃঙ্খল ছাড়া। কিন্তু জয় করতে পারে তারা সমস্ত পৃথিবী।' ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডে এই সিদ্ধান্তের পিছনে আছে শিল্পবিপ্লব-উদ্ভূত যন্ত্রশিল্পের অন্তর্নিহিত স্পষ্ট লক্ষণগুলোর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ।

আমি এতক্ষণ দেখানোর চেষ্টা করেছি, মার্কসের পুঁজিবাদ তত্ত্বে যে-দুটি বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোচনা আছে—যাদের আলাদা করেছে শিল্পবিপ্লব—তার বৈশিষ্ট্য হল এই :

১. উৎপাদনের যুগ (Manufacture)

প্রযুক্তিবিদ্যা	রক্ষণশীল
সর্বহারাশ্রেণী	বিপ্লবী নয়

২. আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগ (Modern Industry)

প্রযুক্তিবিদ্যা	বিপ্লবী
সর্বহারাশ্রেণী	বিপ্লবী

এখানে এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তিবিদ্যায় বিপ্লব আর সর্বহারার বিপ্লব একার্থক নয়। বিপ্লবী প্রযুক্তিবিদ্যার অর্থ সেই জ্ঞান যা নিজের প্রকৃতির জন্যই সর্বদা ও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বিপ্লবী সর্বহারা হল সেই শ্রেণী যে-শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা আছে, তবে সেই বিপ্লব সম্ভব একবারই, যদি চতুষ্পার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকে, অর্থাৎ অবস্থাও বিপ্লবী হয়। এখানেই প্রশ্ন ওঠে : যদি কোনো কারণে বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা আসতে দেরি হয় তাহলে বর্তমান যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবী প্রয়োগবিদ্যার প্রভাব সর্বহারাদের শ্রেণীচরিত্রের এবং ক্ষমতার উপর কীভাবে আসবে ?

মার্কস এ-বিষয়ে নীরব। বিপ্লব ঘটতে দেরি হবে—এই চিন্তা হয়তো তিনি

করেন নি। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী এই প্রশ্ন স্বতঃই আসে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন: 'আধুনিক শিল্প ক্রমশই পালটাচ্ছে, শুধু উৎপাদনের প্রয়োগগত ভিত্তেই নয়, শ্রমিকের শ্রমচরিত্রে, শ্রমপদ্ধতিতে।' (ঐ, পৃ ৫৩৩)। তাঁর থেকে কেউ বেশি জানত না যে শ্রমিকের শ্রমচরিত্র এবং শ্রমপদ্ধতিই সর্বহারার চরিত্র তৈরি করে। বিপ্লবাত্মক অবস্থা না থাকলে সর্বহারা কি বিপ্লবী হতে পারে? 'ক্যাপিটাল' লেখার সময় মার্কসের মনে এ-প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল। একশো বছর পর এই প্রশ্নের জবাব ছাড়া মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের চলার উপায় নেই।

এর পুরো উত্তর দেওয়া এই প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। প্রযুক্তিবিদ্যা ও শ্রমপদ্ধতির সম্পর্ক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ জ্ঞান থাকায় আমি এর সদুত্তর দিতেও পারব না। আমি শুধু চেষ্টা করব সাধারণভাবে এটাই দেখাতে, কেন আমার মনে হয় যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলেই মোটের উপর বিপ্লবী এক সর্বহারা শ্রেণী তৈরি হচ্ছে, অন্তত গত শতাব্দীর মধ্যভাগের শিল্পবিপ্লবের সময়কার সর্বহারার চাইতে বেশি বিপ্লবী সম্ভাবনা এর মধ্যে আছে।

যে-সব শ্রমিক যন্ত্র চালান অথবা এমন সব কাজ করেন, যা মার্কস ভাবতেও পারতেন না—যথা, এ্যাসেম্বলি লাইনে কাজ করা—তাঁদের উপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব কী সে-বিষয়ে আমি জোর দিচ্ছি না। এগুলো চালাতে দক্ষতা দূরে থাক মানুষেরও দরকার হয় না; যন্ত্রের সাহায্যের ফলে, কাজের চাপ বাড়ার ফলে, এ-সব কাজ সহ্য করাও কঠিন, আকর্ষণীয় তো নয়ই। এই ধরনের কাজ-করা শ্রমিক যে-সর্বহারাদের মধ্যে প্রধান, তার মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা গত শতাব্দীর সর্বহারাদের মতোই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, প্রচলিত কাজের মধ্যে এই ধরনের কাজের সংখ্যা আগের তুলনায় নগণ্য। কাজের পদ্ধতিতে ক্রমশই যন্ত্রের আমদানি হওয়াতে, অটোমেশন আধা বা পুরো চালু হওয়াতে, উৎপাদন যুগের দাম্ভিক দক্ষ কারিগরদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এখন আর নেই, বরং তারা এখন সংখ্যায় নগণ্য। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এদের উৎপাদনক্ষমতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে—অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রশিল্পে শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা এবং সমাজের অধিকারে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বহুগুণে বেড়েছে।

এই অগ্রগতির আর একটি দিক হল: নতুন জাতের নানান কাজের সৃষ্টি। নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ—যেমন, বিজ্ঞানী, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান, নানা ধরনের মেরামতি কাজ-জানা লোক ইত্যাদি। এর থেকেও বেশি জন্ম নিয়েছে সেই ধরনের লোক, শ্রমিকের উন্নত ক্ষমতার ফলে সঞ্চিত উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে যারা নানা কর্মে নিযুক্ত। এই ধরনের কাজের লোকের উদাহরণ: সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ে নিযুক্ত ও জনসংযোগরক্ষায় ব্যাপৃত ব্যক্তি, অর্থদপ্তরে, ইনসিওরেন্সে, ভূসম্পত্তি ব্যাপারে এবং নানা ধরনের ব্যক্তিগত সেবায় যুক্ত ব্যক্তি। শেষোক্ত ধরনের কাজ সৌন্দর্যচর্চার সরঞ্জাম

প্রস্তুতিও হতে পারে, আবার খেলাধুলোর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতিও হতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অ-কৃষি শ্রমিকের তিন-চতুর্থাংশই হচ্ছে এই ধরনের কর্মী।

শ্রমচরিত্র বিচারে, যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবী প্রযুক্তিবিদ্যার দুটো ফল। এক, উৎপাদন ও শ্রমিকের অনুপাতহারে বিরাট অবনতি। দুই, অর্থনীতির বিতরণ এবং সেবা অংশে কাজের সংখ্যাবৃদ্ধি। উৎপাদনব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মীর যেমন, অন্যান্য কর্মীরও তেমন আসল মজুরি বেড়েছে। তার আংশিক কারণ, নতুন চাকরিতে শিক্ষণের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি। তাছাড়া উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকেরা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ক্ষমতার জন্য, বিপ্লব না ক'রেও, পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কিছু-কিছু দাবি আদায় করতে সমর্থ হয়েছেন।

সংক্ষেপে তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে: যন্ত্রশিল্পে বিপ্লবী আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহারে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা বহুগুণে বেড়েছে। মার্কস এর সঠিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বস্তুত, শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে মার্কস যা একশো বছর আগে বলেছিলেন, আজই তা বহুগুণ বেশি সত্য। উৎ-পাদনক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে, উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় শ্রমিকের গুরুত্ব কমেছে, নতুন কাজের জন্ম হয়েছে এবং শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। শ্রমক্ষমতার সম্প্রসারণ, সমশ্রেণী হওয়া (homogenization), উৎপাদনব্যয়ে হ্রাস ও সে-জন্যই শ্রমমর্যাদার হ্রাস—এই যে যন্ত্রের আমদানির প্রথম ফল, তা আর এখন খাটে না। উৎপাদন যুগেও যেমন ছিল, যন্ত্রযুগেও সর্বহারা শ্রেণী নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং পুনরায় বৃত্তিগত ও মর্যাদাগত সচেতনতায় শ্রেণীচেতনাও কিছু লুপ্ত হতে থাকে।

এটা মনে করা যেতে পারত যে এই সমস্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ও 'অভিজাত' সর্বহারারা মোটের উপর বিপ্লবী থাকবে। এর সম্ভাবনা ছিল, সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে অন্যান্য শ্রমিক থেকে এদের আলাদা ক'রে ভাবা অযৌক্তিক। জেমস বগস বলেছেন: আজকের শ্রমিকশ্রেণীর অনেকেই অর্থাৎ এই 'অভিজাত' শ্রমিকেরা (blue-collar workers) উচ্চ বিদ্যালয়ে, কেউ কেউ কলেজেও গেছেন। তাঁদের অনেকেই নিজেদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠানোর ইচ্ছা রাখেন, যাতে তাদের ছেলেদের কারখানায় কাজ করতে না হয়, বাজে গতর-খাটা কাজে তাদের জীবন যেন নষ্ট না হয়, আর মেয়েদের ছন্নছাড়া লোককে বিয়ে করতে বাধ্য না হতে হয়, আদৌ বিয়ে করবে কি না সে-বিষয়ে যেন নিজেদের চিন্তা করার শক্তি থাকে। (*The American Revolution*, পৃ ১৪)। অন্য কথায়, শ্রমিকশ্রেণীতে সংখ্যালঘু এই সব মর্যাদাপূর্ণ শ্রমিকেরা কখনই নিজেদের বর্তমান অবস্থায় বদ্ধ বলে মনে করেন না। যতদিন এই ভাবে চলবে, তাঁদের জীবন সম্পর্কে ধ্যানধারণা তাঁদের চতুষ্পার্শ্বের অ-বিপ্লবী শ্রমিকদের চাইতে সম্ভবত খুব বেশি পৃথক হবে না।

শ্রমিকশ্রেণীর গঠন এবং চরিত্রের উপর আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ফল সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণযোগ্য হলে, সর্বহারা শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব কি ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে? আমার তা মনে হয় না। তাঁর বক্তব্য ছিল, সর্বহারা শ্রেণীর উপর যন্ত্রের প্রথম দিককার প্রভাব সম্পর্কে, পরবর্তী যুগের যন্ত্রগত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব সম্পর্কে নয়। অনেকেই আপত্তি তুলবেন, মার্কস সব দিক নিয়ে আলোচনা করেন নি। হয়তো যুক্তিসংগতভাবেই তাঁরা আরো বলবেন, যে তাঁর সেটা করা উচিত ছিল। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রথম যুগে পুঁজিবাদ যদি বিপ্লবের হাত থেকে অব্যাহতি পায় তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর ভবিষ্যৎ কী, তাঁর রচনায় ইতস্তত যা বলা হয়েছে, তা থেকে মার্কসের ছাত্রদের পক্ষে এ-সম্বন্ধে একটা ধারণায় আসা সম্ভব। তবে এই রচনায় সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। আর মার্কস যেহেতু এ-বিষয়ে আলোচনা করেন নি, সুতরাং তাঁর অন্য বক্তব্যও বাতিল হয়ে গেল, এটা ভাবাও অনুচিত। তাঁর সীমার মধ্যে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত খাঁটি।

এই প্রসঙ্গে, আমি আরও সামান্য এগিয়ে গিয়ে এটা বলতে চাই যে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব মার্কসের বক্তব্যের যথেষ্ট প্রমাণসিদ্ধ সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক যন্ত্রশিল্প সবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে এমন এক পুঁজিবাদী দেশে এই বিপ্লব ঘটে—সে দেশে তখন বৃহৎ ও অত্যন্ত বিপ্লবী নাগরিক সর্বহারার জন্ম হয়েছে। এই অবস্থায় যখন বিপ্লবাত্মক অবস্থা তৈরি হল (যা পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশে তৈরি হয় নি, যদিও সেখানে পুঁজিবাদ প্রায় রাশিয়ার অবস্থায়ই ছিল), মার্কসীয় পথেই সর্বহারা শ্রেণী তার কাজ করল। সমাজবিজ্ঞানে এর চাইতে দৃঢ় সমর্থন আর পাওয়া যায় না।

এখানে অবশ্য বৃহত্তর প্রশ্ন জাগে: পশ্চিম ইয়োরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় পুঁজিবাদ আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রথম যুগ পেরিয়ে এসেছে এবং এর নতুন প্রয়োগ-বিদ্যা ক্রমশই সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী ধার ভোঁতা করে দিচ্ছে—এতে কি এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে সর্বহারাদের ক্ষমতা সম্পর্কে মার্কসীয় বক্তব্য অচল? আমার তা মনে হয় না।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একমাত্র শ্রমিক সর্বহারার দলই বিপ্লব আনতে পারে, এই বিশ্বাসের মূলে আছে শুধু উন্নত পুঁজিবাদী দেশের দিকেই বড়ো বেশি নজর দেওয়া—যেসব দেশে আধুনিক যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রয়োগবিদ্যার উন্নতি হয়েছে অজস্র সুবিধার মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধু শিল্পোন্নত দেশের মধ্যেই পুঁজিবাদ সীমাবদ্ধ নয়। আসলে, মার্কস যা পরিষ্কার বলেছেন, একটা দেশের শিল্পে উন্নতির মূলে আছে অন্যতর দেশের শিল্পে অনগ্রসরতা—দুটো দেশ মিলেই পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা।

মার্কসের বক্তব্য: আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ধারা অনুযায়ী যখনই উৎপাদনব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই এর মধ্যে একটা স্থিতিস্থাপকতা জন্মায়, লাফিয়ে লাফিয়ে সম্প্রসারণক্ষমতা বাড়ে, একমাত্র কাঁচা মালের সরবরাহ এবং বিতরণব্যবস্থার গণ্ডগোল ছাড়া অন্য কোনো অসুবিধা একে ভোগ করতে হয় না। একদিকে যন্ত্র কাঁচা মালের সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়, যথা জিনের আবিষ্কারে তুলোর সরবরাহ বাড়ল। অপর দিকে, যন্ত্রজাত দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় ও যোগাযোগ রক্ষায় উন্নতি হওয়াতে বিদেশি বাজার আয়ত্তে আনা সুবিধেজনক হয়ে ওঠে। বিদেশি কুটিরশিল্প ধ্বংস ক'রে যন্ত্রশিল্প সে-সব দেশকে শুধু কাঁচামাল রপ্তানি করাতে বাধ্য করল। এইভাবে পূর্ব-ভারত গ্রেট ব্রিটেনের জন্য তুলো, পশম, শণ, পাট এবং নীল উৎপাদন করতে বাধ্য হল। শ্রমের বণ্টন হল নতুন-ভাবে দেশের ভিত্তিতে। যাতে শিল্পোন্নত দেশগুলিই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। পৃথিবীর একভাগ হয়ে দাঁড়াল শিল্পের দেশ। অন্য ভাগ হল তার চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষির দেশ। ('ক্যাপিটাল', প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৯২-৯৩)।

পুঁজিবাদ যে শুধু একটি শিল্পোন্নত দেশের মধ্যে আটকে থাকে না, বরং গুটিকয়েক শিল্পোন্নত দেশ এবং তাদের বহু তাঁবেদার দেশকে মিলেই হয়—এই উপলব্ধি জন্মালেই পরিষ্কার বোঝা যায় একটা দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেই পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ বোঝা যাবে না, পুরো পৃথিবীর অবস্থাটা বিবেচনা করতে হবে।

মার্কসের এই ভাষ্য লেনিন প্রথমেই বুঝেছিলেন এবং এরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে-ছিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র বই *Imperialism : the Highest State of Capitalism*-এ (১৯১৭ সালে প্রকাশিত), বয়সে 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের অর্ধেক, কিন্তু অতীব মূল্যবান। এখানে তিনি বলেছেন স্বল্পসংখ্যক শিল্পোন্নত দেশের হাতে পৃথিবীর বৃহৎ জনসমাজ ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক চাপে ক্লিষ্ট এবং তা থেকেই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের জন্ম। আপাদমস্তক সশস্ত্র মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী দস্যু পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভোগ করছে। লেনিন আরও বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিবাদীরা এই লুঠের মালের কিছু অংশ কিছু শ্রমিককে ঘুষ দিয়ে তাঁদের স্বচ্ছল শ্রমিক বানিয়ে রেখেছে। এই যুক্তিই আরও একটু অগ্রসর করিয়ে, শিল্পোন্নত দেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীকেই এই আখ্যা দেওয়া যায়। যাই হোক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই আন্তর্জাতিক চরিত্র উপলব্ধি করলে বোঝা যায় যে পুঁজিবাদের অগ্রসরতা সর্বহারাদের আরও বিপ্লবী ক'রে তুলবেই।

অবশ্য এই চিত্রেরও দুটো দিক আছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থা যেমন শিল্পোন্নত দেশের ঐশ্বর্য বাড়ায় এবং তাদের শ্রমিকদের জীবন-মান উন্নত করে, তেমন অনগ্রসর দেশের অগণিত কৃষি ও শিল্প শ্রমিককে দারিদ্র্যের দুর্দশায় নিক্ষেপ করে, পরমুখাপেক্ষী ক'রে তোলে। মার্কসের ধারণায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্বহারারা যেমন বিপ্লবাত্মক ছিল, আজকের এই সর্বহারারাও সে-রকম বিপ্লবাত্মক। 'পবিত্র পরিবার' থেকে উদ্ধার করছি :

'একেবারে সর্বহারাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব, এমন কি মনুষ্যত্বের চেহারাও অবলুপ্ত হয়, কারণ তাদের জীবনপ্রণালী বর্তমান সমাজব্যবস্থার শোচনীয় অমানুষিক চেহারার কেন্দ্রবিন্দু – সর্বহারারা আর মানুষ থাকে না। তার পরিবর্তে তারা কিন্তু মনুষ্যত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এই মনুষ্যত্বের অভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য না হয়ে তাদের উপায় থাকে না, সর্বহারাদের নিজেদের মুক্তিলাভের চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিকশ্রেণী সম্পর্কে একথা অবশ্যই খাটে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের অপরিহার্য অঙ্গ অন্যান্য অনগ্রসর দেশের অগণিত জনক্ষীত পরমুখাপেক্ষী শ্রমিকদের সম্পর্কে আজ বেশি খাটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থকভাবে সংঘটিত হয়েছে – ভিয়েতনাম, চীন, কিউবায় যার উজ্জ্বল নিদর্শন – সে-সব দেশের বিপ্লবী জনসাধারণ কি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সার্থক বিদ্রোহ ক'রে নিজেদের বিপ্লবী বলে প্রমাণিত করেন নি?

আমার বক্তব্যের সারাংশ তাহলে এই পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কসের ভাষ্যে সর্বহারারা সবসময়েই বিপ্লবী না-ও হতে পারে। উৎপাদনের যুগে তারা বিপ্লবী ছিল না, শিল্পবিপ্লবের পর যন্ত্রের আমদানি হলে তারা বিপ্লবাত্মক হয়। যন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল আর দূরপ্রসারী ফল এক নয়। যদি যন্ত্রযুগের প্রথম দিককার বিপ্লবের সম্ভাবনা গ্রহণ না করা হয়, শিল্পোন্নত দেশের সর্বহারাদের বিপ্লবের সম্ভাবনা কমতে থাকে। তাই বলে মার্কস যে বলেছেন, পুঁজিবাদ তার সমাধি রচনাকারী-দের নিজেই তৈরি করেছে, তা ভুল নয়। পুঁজিবাদকে দেখতে হবে তার আন্তর্জাতিক চরিত্রের মাধ্যমে: পুঁজিবাদ দুভাগে বিভক্ত; একটা শোষণকারী দেশসমূহ, আর এক জনক্ষীত শোষিত দেশগুলি। এই দ্বিতীয় দেশগুলি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরমুখাপেক্ষী এবং তারাই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপ্লবী অংশ – সেইসব কারণে, যে-সব কারণে মার্কস আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রথম দিকের সর্বহারাদের বিপ্লবী মনে করেছিলেন। সবশেষে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাস দেখাচ্ছে যে এই বিপ্লবী সর্বহারারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সার্থক লড়াই করতে সমর্থ।

DR. PAUL M. SWEEZY-প্রেরিত প্রবন্ধ *Marx and the Proletariat*। এই প্রসঙ্গে MR. LEO HUBERMAN-এর সহযোগিতা স্মরণীয়। উভয়ের সম্পাদিত *Monthly Review* পত্রিকায় (December 1967) প্রবন্ধটি প্রকাশিত। অনুবাদ: নিত্যপ্রিয় ঘোষ।

দাস কাপিটাল ও আমি

ক্রিস্টোফার হিল

উনিশশো তিরিশের যুগে আমার প্রাক-স্নাতক জীবনে আমি 'ক্যাপিটাল' প্রথম পড়ি এবং গ্রন্থখানি তখন বেশ দুরূহ বলে মনে হয়। কিন্তু তৎপরবর্তী তিন-চার বছরে মার্কসের অনেক ইতিহাসবিষয়ক রচনা আমার মনে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে। উদ্দীপনার মাত্রা এতখানি হয়েছিল যে পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখার সময় আমাকে বেশ সচেতন থাকতে হতো, কেননা সে-যুগের সনাতনপন্থী অক্স-ফোর্ডে মার্কসবাদ একটা নোংরা শব্দ বলে বিবেচিত হতো। তাই আমি আমার মতামত আড়াল করার জন্য প্রথমে যা সত্যিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম সেটা লিখতাম, তারপরই একটু থেমে জুড়ে দিতাম : 'এটা হল একটা মত, কিন্তু সেই সাথে আমরা অবশ্যই বিস্মৃত হবো না যে…,' এইভাবে লিখে পরীক্ষকের কাছে প্রমাণ করতে চাইতাম যে আমি মামুলি উত্তরটাও জানি, যদিও তা আমি স্বীকার করি না। অনুরূপ অবস্থায় এই কৌশল ব্যবহার করতে আমি আমার ছাত্রদের প্রায়ই উপদেশ দিতাম। তারপর থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস বিষয়ে আমার আগ্রহ রয়ে গেছে প্রধানত সপ্তদশ শতকের বিপ্লবকে সঠিক অনুধাবনের চেষ্টায়; কারণ এই বিপ্লবকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক সন্ধিক্ষণ বলে সর্বদাই আমার মনে হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে আমার প্রথম কৌতূহল জাগ্রত হয়েছিল 'মেটাফিজিকাল' কবিতা সম্পর্কে আমার প্রাক-স্নাতক পর্বের তীব্র ভাবাবেগ থেকে। সেই কবিদের মধ্যে ছিলেন জন ডান্, জর্জ হার্বার্ট, ক্রশ, ভন্, মার্ভেল, ট্রেহার্ন। তিরিশের যুগে এই দার্শনিক কবিগোষ্ঠীর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের অন্যতম কারণ হল বিরোধ ও সংঘাত সম্পর্কে এই কবিদের বোধ ও তাঁদের কবিতায় আপাত-সংগতিহীন ভাবধারার পাশাপাশি সন্নিধান

Here is dust and dirt, oh here
The lilies of his love appear. (Vaughan)
O who shall from this dungeon raise
A soul enslaved so many ways ?···
A soul hung up, as 't were in chains
Of nerves and arteries and veins,
Tortured, besides each other part,
In a vain head and double heart ? (Marvell)

যে-যুগের তীব্র সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত উদ্ধৃত অংশে প্রতিধ্বনিত তার সঙ্গে আমরা যে-যুগে বাস করছি তার যথেষ্টই সাদৃশ্য রয়েছে। যে-কালে পাঠ্যপুস্তকে 'অর্থ নৈতিক কারণ,' 'ধর্মীয় কারণ' ইত্যাদিকে সত্যিকার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও গৌণ বলে মনে করা হতো তখনই আমার ধারণা তৈরি হয়েছিল যে ইতিহাসের মার্কসীয় বিচারের মূল শক্তি নিহিত আছে এর দৃষ্টিভঙ্গিতে, পদ্ধতিতে – যে-পদ্ধতিতে সমাজকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা হয়, দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে তার সামাজিক উৎসের নিরিখে বিচার করা হয়। বা উদ্ধৃত কাব্যাংশে বর্ণিত যে 'দ্বৈত হৃদয়' ('double heart') সম্পর্কে দার্শনিক কবিরা তীব্র সচেতন ছিলেন এবং যে-গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে ১৬৪২ সালে ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধের উদ্ভব হয় – এ দুয়ের মধ্যে আন্তর্নিহিত যোগসূত্র নির্ণয় করাই হল প্রকৃত মার্কসবাদী বিচারপদ্ধতি – এ ধারণা আমার হয়েছিল।

মার্কস সম্পর্কে আমার কৌতূহলের প্রথম কারণ, তাঁর ভাবধারা আমায় 'দার্শনিক' কবিতাবলি বুঝতে সাহায্য করেছিল এবং একথা আমি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই, কেননা মার্কসের এই বিশেষ গুণটির যথোচিত সমাদর আজও হয় নি। যাঁরা কখনও তাঁর কোনো লেখা পড়েন নি, তাঁরা মার্কসকে একজন অর্থ নৈতিক নির্ধারণবাদী (economic determinist) হিসেবে জানেন, যিনি মানুষকে অর্থনীতির অন্ধ শক্তির ক্রীড়নক হিসেবে দেখেছিলেন। যাঁরা মার্কসের লেখা পড়ে তার মর্মার্থ উপলব্ধি করেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি ঠিক এ-রকম কিছু ছিলেন না। তিনি ছিলেন (অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে) একজন প্রতিভাধর ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও মননসাধনার ইতিহাস সম্পর্কে যাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর অর্থ নৈতিক ইতিহাসের চাইতে কোনো অংশে কম উজ্জ্বল ছিল না। তিনি লিখেছেন : 'মানব ইতিহাসের মূল সূত্র হল জীবন্ত ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব।' 'সক্রিয় মানুষের কর্ম-শক্তির পরিণামই হল উৎপাদনশক্তি।'

দর্শন ও মননের ক্ষেত্রে মার্কসীয় চিন্তায় প্রভাবিত কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। জর্জ টমসন, বেঞ্জামিন ফ্যারিংটন, যোসেফ নিডহাম, এরিখ হব্‌সবম, আইজাক ডয়েৎচার, ই এইচ কার, এডওয়ার্ড টমসন, সি বি ম্যাক-

ফারসন, ফ্রেডরিক আনটাল ও অন্যান্য অনেকের কথা স্মরণ রেখেই একথা বলছি। এবং মার্কস নিজেই তার সূত্রপাত ক'রে গেছেন। ১৮৫৯ সালে তিনি লিখেছেন: 'সমস্ত পুরাণকাহিনীই (mythology) কল্পনার সহায়তায় প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনে ও আকার দেয়; এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকলেই পুরাণের অবলোপ ঘটে। মুদ্রণশালার বিকাশে যশো-দেবীর অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে! গ্রীক শিল্প যে কতকগুলি সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত, এ-ধারণা অর্জনে কোনো অসুবিধা হয় না। বরং কেমন ক'রে আজও তা একটা সৌন্দর্য উপভোগের উৎস ও কোনো কোনো দিক থেকে দুরায়ত্তসাধ্য শিল্পাদর্শ রূপে বিরাজ করছে সেটা বুঝতে পারাই কঠিন।' 'ক্যাপিটাল' বইটিতে মার্কস লিখেছেন: 'নিকৃষ্টতম স্থপতির থেকে উৎকৃষ্টতম মৌমাছির পার্থক্য এই যে স্থপতি বাস্তবে রূপায়ণের আগে তার ঈপ্সিত কাঠামোটির রূপ কল্পনায় ঠিক ক'রে নেয়।'

মার্কস ছিলেন একজন বস্তুবাদী। ধর্মতাত্ত্বিক ও পেশাদার দার্শনিকেরা কোনোদিন যে-প্রশ্ন তোলেন নি মার্কস তা আগেই ধরে নিয়েছিলেন। যেমন: এই বস্তুজগতের অস্তিত্ব আছে, এবং আমাদের ভাবরাশি এই বস্তুজগৎ থেকেই উৎসারিত। তিনি যুক্তির দ্বারা বোঝালেন যে মানুষ যেভাবে তার জীবিকা উপার্জন করে, যেভাবে ধন উৎপাদন ও বণ্টন হয়, তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় সমাজের কাঠামো। 'মানুষ শুধু মাত্র সামাজিক জীব নয়, বরং এমন একটি জীব যে কেবলমাত্র সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হতে পারে।' 'মানুষ নিজেই তার নিজস্ব ইতিহাস রচনা করে', ১৮৫২ সালে মার্কস লিখেছেন, 'কিন্তু যেমন ইচ্ছে তেমন ক'রে নয়; তার পছন্দমতো অবস্থায়ও নয়, বরং অতীত থেকে প্রাপ্ত ও আগত সামাজিক পরিবেশেই তারা এটা করে। মৃত অতীত যুগের সব ঐতিহ্য দুঃস্বপ্নের মতো জীবন্ত বর্তমানের মগজে এসে ভর করে।' 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিবিধ প্রকৃতি থেকে, মানুষের সামাজিক অবস্থান থেকে স্পষ্ট ও বিশিষ্ট-ভাবে গঠিত আবেগ, অধ্যাস, চিন্তাধারা ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির একটা সম্পূর্ণ উপরিতল (superstructure) মাথা তোলে। সমগ্র শ্রেণী এর বাস্তব ভিত্তি ও অনুরূপ সামাজিক সম্পর্কের মধ্য থেকেই একে সৃষ্টি ও গঠন করে। যে-কোনো একজন ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে এগুলিকে লাভ করেন, কল্পনা করতে পারেন যে তাঁর ক্রিয়াকর্মের উৎস ও প্রকৃত অভিপ্রায় এর দ্বারাই নির্ণীত হয়।...ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ যেমন মানুষ সম্পর্কে যা ভাবে ও বলে তার সঙ্গে তার স্বভাব ও কর্মের পার্থক্য দেখতে পায়, তেমনি, বা তার চাইতেও বেশি ক'রে, কোনো ঐতিহাসিক সংগ্রামে নিযুক্ত দলগুলির সাংগঠনিক রূপ ও আদর্শকে তাদের প্রকৃত স্বার্থ ও নিজেদের সম্পর্কে ধারণা থেকে তাদের বাস্তব অবস্থাকে পৃথক ক'রে দেখতে পাওয়া দরকার।' অন্যত্রও, সমাজ-বিশ্লেষণে সচেষ্ট ঐতিহাসিক,

মার্কস একটি বিখ্যাত উক্তির দ্বারা যা বর্ণনা করেছেন, সেই 'কালের বিভ্রম' ('the illusion of the epoch')-এর শিকার হয়ে পড়বেন।

কিন্তু যদিও, 'উৎপাদনব্যবস্থার মালিকের সাথে প্রকৃত উৎপাদনকারীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক···সমগ্র সামাজিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত রহস্য ও গোপন ভিত্তিসমূহকে উদ্ঘাটিত করে', যেহেতু এই সম্পর্ক 'অসংখ্য বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ঐতিহাসিক প্রভাব প্রভৃতির দ্বারা জড়িয়ে আছে, সেজন্য এগুলিকে খুব সযত্ন বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয় করতে হবে।'

বিগত শতাব্দীতে ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদের প্রভাব যতটা লক্ষ করা যায় অন্য কোনো শাখায় ততটা নয়। অর্থনৈতিক ইতিহাসকে মার্কস প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেন। তাঁর আগে অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে এমন কোনো গ্রন্থ লেখা হয় নি যে-সম্পর্কে আজকের কোনো ছাত্র কৌতূহলী হতে পারে, অথচ, যাঁরা মার্কসের ভাবধারার সাথে একমত নন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে তিনি আজও অবশ্যপাঠ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

একশো বছর আগের পূর্বসূরিদের থেকে বর্তমানের সকল ঐতিহাসিকেরই অতীত সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে, কোনো সমাজব্যবস্থায় ধনসম্পদ যেভাবে উৎপাদন ও বণ্টন হয় তা সমাজের সর্বস্তরের কাঠামো ও জীবন-যাত্রাকে অবশ্যই প্রভাবিত করে। এই ভাষ্য শেষপর্যন্ত মার্কস থেকেই এসেছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই আমূল পরিবর্তনের জন্য দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফল হল ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির ভূমিকাকে ক্রমশই স্বীকার ক'রে নেওয়া। যদিও ঐতিহাসিকেরা ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিপ্লব সম্পর্কে তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণে একমত হবেন না, তবে তাঁরা সকলেই, একশো বছর আগের মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষের ভালো-মন্দ বুদ্ধি-নির্বুদ্ধির ভিত্তিতে এসব ঘটনাকে বিশ্লেষণ করবেন না, বরং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হবেন।

বিগত শতকের ঐতিহাসিকেরা মানুষের চিন্তার ও মতাদর্শের সামাজিক উৎস স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যে দুজন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ঐতিহাসিকের আমলে আমি বড় হয়েছি তার মধ্যে টনি (Tawney) স্পষ্টতই মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, এবং নামিয়ার (Namier) সম্পর্কে স্যার জন নীল (মার্কসবাদী নন) লিখেছেন যে ইতিহাসচর্চায় তিনি যে নতুন দিক্‌দর্শন উপস্থিত করেছেন তার মূলে কিছু পরিমাণে আছেন মার্কস। একদা স্যার ঈশাইআ বার্লিন (Sir Isaiah Berlin) মার্কসকে সমাজবিদ্যার জনক বলে অভিহিত করেছিলেন, যেমন মার্কস স্বয়ং সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ স্যার উইলিয়াম পেটিকে (Sir William Petty) রাষ্ট্রীয় অর্থশাস্ত্রের (political economy) জনক বলে আখ্যাত করেছিলেন।

এর সাথে সাথে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন আপেক্ষিকবাদের সৃষ্টি হল। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকেরা যে-নৈতিক মানকে চূড়ান্ত বলে ভাবতেন, তার নিরিখেই ইতিহাসকে বিচার করতেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন যে সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে নৈতিকতারও পরিবর্তন হয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে বোধহয় মার্কসবাদের ইতিবাচক প্রভাবের চাইতে নেতিবাচক প্রভাবের অংশই বেশি।

যে-উৎসগুলিকে ভিত্তি ক'রে ইতিহাস রচিত হয় বিগত শতাব্দীতে সেখানেও এক বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে এই উৎসাবলির প্রধান অংশ যেখানে ছিল সাহিত্য-গত – যেমন, লোকগাথা, জীবনী, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, সংবাদপত্র – এখন সে-উৎস প্রধানতই দলিল-ভিত্তিক : সরকারি নথিপত্র, ধর্মযাজকদের পাঁজিপুথি, সনদ, খোদাই-লিপি প্রভৃতি ; বা এমন কি প্রত্নতত্ত্বভিত্তিক : যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ঘরবাড়ি ও জমি। এই পরিবর্তনকে আমরা সরাসরি মার্কসের প্রভাব বলে অভিহিত করতে পারি না, যদিও তা মার্কসের ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তাঁর নিজস্ব রচনায়, বিশেষত ক্যাপিটাল গ্রন্থে, মার্কস সরকারি পুথিপত্র ও ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কার্যবিবরণীকে খুব প্রশংসনীয়ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। 'ডকুমেণ্ট' সম্পর্কে আধুনিক কালে শ্রদ্ধার যে বন্যা এসেছে তাতে তিনি অংশ নিতেন কি না সে-প্রসঙ্গ ভিন্ন, তবে সরকারি প্রকাশনা সম্পর্কে – তা সময় ও জীর্ণতার বিচারে যতই শুদ্ধিলাভ করুক না কেন – মার্কসের বরাবরই একটা সংশয় ছিল। ইতিহাস-সংক্রান্ত তাঁর সেরা লেখাগুলিতে সাহিত্যের থেকে সুনির্বাচিত উদ্ধৃতি, শ্লেষ ও বিরোধোক্তি এবং লেখার ভঙ্গিতে কল্পনাশক্তির পরিচয় থাকাতে লেখক হিসেবে তিনি আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন' ঐতিহাসিকদের (যাঁদের লেখার ধরনই এমন যেন মনে হয় সেগুলো পড়ার উদ্দেশ্যে লেখা হয় নি) থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিলেন। ক্যাপিটাল গ্রন্থে মার্কস তাঁর যুক্তিকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে সজীব ক'রে তুলেছেন। যাঁদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁরা হলেন : হোমার, সোফোক্লিস, হেরাক্লিটাস, থুসিডাইডিস, জেনোফেন, আইসো-ক্রেটস, প্লেটো, আরিস্টটল, ভিয়োডোরাস, সিকুলাস, লুক্রেসিয়াস, আপ্পিয়ান, সেল্লটাস, এম্পিরিকাস, জোসেফাস, বাইবেল গ্রন্থ, সেণ্ট জারোম, লুথার, দান্তে, শেক্সপিয়র, মিল্টন, গ্যেটে, সারভানতেস, মলিয়ের, ড্রাইডেন, বালজাক, স্যার টমাস মোর, বেকন, হব্স, স্পিনোজা, ভিকো, বার্কলে, মণ্টেস্কিউ, রুশো, বোলিংব্রোক, বার্ক, হেগেল, মমসেন, ডারউইন প্রমুখ – ডারউইনকে তো মার্কস ক্যাপিটাল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি খণ্ড উপহারই দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, যেহেতু মার্কস অর্থনৈতিক বিষয়ের উপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং যার সাথে শেষপর্যন্ত মানুষের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপকে সংযুক্ত করতে চাইতেন, সেজন্য, আধুনিক অর্থে

ইতিহাসের সামগ্রিকতা বলতে যা বোঝায়, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি, সে-সম্পর্কে মার্কসের দিকে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনও ফিরে তাকাই।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিবর্ণ উদারনীতির প্রতি-ক্রিয়ায় অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এক অন্ধ হতাশার কবলে পড়েন। প্রকৃতির উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রভুত্বের ফলে, অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে অধিকতর বিনষ্টি সাধনের অশুভ শক্তিও জুগিয়েছে। মানুষ আণবিক বোমা এবং এক জরাগ্রস্ত সভ্যতা তৈরি করেছে। যে-মানবতাবাদ মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হতে শেখায় তা হল একজাতীয় অলস আত্মপ্রবঞ্চনা। হতাশাই একমাত্র যুক্তিসংগত, ঈশ্বরই একমাত্র পরমার্থ—মানুষের অপরিবর্তনীয় দৈন্য সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু সারমর্ম তার কিছুমাত্রই নতুন নয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির নৈতিকতার অধঃপতন সূচিত হবে, রুশো-র এই ধারণাকে মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন। ইতিহাস হল, এঙ্গেলসের ভাষায়, 'নিষ্ঠুরতমা দেবী'র বিবরণী—আদিম সমাজে মানুষ যে-অধিকার ও সাম্য উপভোগ করত তা থেকে সে কেমনভাবে বিচ্যুত হল সে-কথাই এই কাহিনীতে বিবৃত। কিন্তু, এ হল ইতিহাসের দ্বৈত প্রক্রিয়ার একটি দিক। অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য মানুষকে তার সাম্যবোধ বিসর্জন দিয়ে মূল্য দিতে হয়েছিল, একথা বলে মার্কস রুশো-র অন্তর্দৃষ্টির উপর এক নতুন তাৎপর্য আরোপ করলেন। উৎপাদনব্যবস্থার উপর সমাজের অধিকাংশ লোক কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুবিধাভোগী ভাগ্যবানের হাতে সেই ক্ষমতা গিয়ে জড়ো হওয়াতে এই মত প্রচলিত হয়ে পড়ল যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের উপরই সমাজের সকলের স্বার্থ নির্ভরশীল। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, ঐতিহাসিক নিয়মে (যদি তা প্রথমেই কোনো আকস্মিক বিপর্যয় না ঘটায়) কিভাবে মানুষ এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার মধ্যে তার হৃত অধিকার শেষপর্যন্ত পুনরুদ্ধার করবে সে-কথা তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দেখিয়ে গেছেন। এই সমাজ এক উন্নততর ব্যবস্থার উপরে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে অসাম্য ও নির্যাতন চলেছে তার মধ্য থেকেই এই বিকাশ সম্ভবপর হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এই নির্যাতন ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের উৎপত্তির সাথে সাথে বেড়ে ওঠে এবং আদিম সাম্যবাদের মধ্যে লোপ পায়। লাভ ও লোকসান হল একই পদ্ধতির দুটি বিপরীত দিক : 'Fair is foul and foul is fair'।

উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়াদের স্থূল আশাবাদ থেকে সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে এই গভীর ধারণা অনেকখানি পৃথক। ইতিহাস হচ্ছে এক ট্রাজেডি, কিন্তু তার একটা অর্থহীন ট্রাজেডি হওয়ার দরকার কি? আমরাও শুধু দর্শক নই : আমাদের সক্রিয় ভূমিকা আছে সেই নাটকে। আণবিক শক্তিকে কেবলমাত্র ভালো বা মন্দ বলা চলে না : মানবজাতির উপর এর ফল কী রকম হবে সেটা নির্ভর

করে কিভাবে একে ব্যবহার করা হবে তার উপর এবং তা-ও আবার নির্ভর করে সামাজিক সংগঠনের উপর। সমাজের সংগঠন আমি, আপনি ও অন্য লক্ষ লক্ষ লোকের উপর নির্ভর করে। মার্কস আজীবন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েছেন, নির্বাসিত ও দেশান্তরিত হয়ে বিপ্লবী সংগ্রামকে সংগঠিত করেছেন এমন একটি অভীষ্ট ফললাভের আশায়, যাকে তিনি অবশ্যম্ভাবী সত্যরূপে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন—এ সমস্তই একটা বিরাট প্যারাডক্স মনে হয়। কিন্তু যখনই আমরা বুঝতে পারি যে মার্কস একজন নির্দেশ্যবাদী (determinist) ছিলেন না, তখনই আর এর মধ্যে কোনো প্যারাডক্স থাকে না।

একটি সামগ্রিক কর্মের বিচারে আমি হয়তো এতোক্ষণ একটি অংশের প্রতিই অধিকমাত্রায় মনোনিবেশ করেছি। আমারই মতো যাঁরা মার্কসের লেখা গভীর-ভাবে অধ্যয়ন করেছেন তাঁদের অধিকাংশই তাঁকে একজন সু-লেখকরূপে শুধু বিচার করেন না, বা ইতিহাসতত্ত্বে তাঁর গভীর প্রভাবই দেখেন না, সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায়ের তীব্র সমালোচক হিসেবে মার্কস তাঁর বলিষ্ঠতম আঘাত হেনেছেন, এটাই সকলে জানেন। তিরিশের যুগে যদিও তাঁরই সাহায্যে আমি 'দার্শনিক কবিতাবলি' বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম, তবুও সে-সময়ে তাঁর এই দিকটিই আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হতো।

মার্কসের আগে শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অজস্র প্রতিবাদ হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে মার্কসের নতুন অবদান হল এই যে তিনি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কার্য-বিবরণী থেকে প্রচুর তথ্য তাঁর যুক্তির সপক্ষে জোগাড় করেছিলেন এবং তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণাকে ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত করে তুলেছিলেন। এই পরি-প্রেক্ষিতে পীড়নকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের দুষ্কর্ম হিসেবে না দেখে, একটা অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার—যার কোনো আইনগত প্রতিরোধ নেই—পরিণাম হিসেবে তিনি দেখলেন। ক্যাপিটাল বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস লিখেছিলেন: 'ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নিজেকে যত বড় করেই তুলুক না কেন, সর্বদাই সে সামাজিক ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়ে থাকে বলে অন্য যে-কোনো লোকের চাইতে আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কোনো সামাজিক সম্পর্কের জন্য কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে কম দায়ী করি।' তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের যে-অবিচারগুলিকে মার্কস তাঁর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে নির্মমভাবে চিত্রিত করেছিলেন, বস্তুতপক্ষে তার অনেকগুলি—শ্রম সময়ের দীর্ঘতা, শিশু-শ্রমিকের শোষণ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা—পরবর্তীকালে ট্রেড ইউনিয়ন ও মানবহিতৈষী কার্যাবলির জন্য আইনপ্রণয়নের দ্বারা উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের জন্যই মার্কস আজীবন পরিশ্রম করেছিলেন, এবং এই পরিবর্তনকে তিনি অন্তরের সাথে স্বাগত জানাতেন। আমার মনে হয়, তিনি আরো ভাবতেন যে আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই কোনো একটা গলদ নিহিত আছে যে-জন্য একদল লোক অন্যের পরিশ্রমের দ্বারা

মুনাফা অর্জন ক'রে নিচ্ছে, যে-ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝে বেকারি বা যুদ্ধ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু মার্কস ছিলেন এমনই এক বিরাট প্রতিভা যে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে কটি দিক সম্পর্কে অপেক্ষাকৃতভাবে কম আলোচনা হয়েছে সেগুলিও স্মরণযোগ্য : যেমন, তাঁর প্রিয় আদর্শ ছিল *de omnibus dubitandum*, সব কিছুকেই আমাদের সন্দেহ করতে হবে। এবং তাঁর অদম্য বাধাহীন হাসির উচ্ছ্বাসের জন্য তাঁর কন্যা তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করতেন। এমন ক'জন আছেন, যিনি আজ থেকে একশো বছর আগেও ভাবতেন যে, সমাজে নারীর 'মর্যাদা কতখানি সেই মাপকাঠিতে সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপ করা যায়' ; যিনি মনে করতেন 'যার ভিত্তিতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা উপযুক্ত ও বিচারসহ হতে পারে এমন কোনো নীতি স্থির করা একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন' ; বা 'শিশুরাই তাদের পিতামাতাদের মূল্যবোধে শিক্ষিত করে তুলবে!' এসব কারণে তিনি আজও আমাদের অনেক রাজনীতিকের থেকেই অগ্রগামী।

এতোক্ষণ আমি প্রধানত যৌবনে আমার উপর মার্কসের প্রভাবের কথা বললাম, এখন বৃদ্ধ মার্কস সম্পর্কে একটি কাহিনী বিবৃত ক'রে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। যতোই বয়সে ও বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছি ততোই এর প্রাসঙ্গিকতা আমরা অনুভব করছি। একদা মার্কস এইচ এম হিনডম্যানের সাথে গল্প করছিলেন, সে-সময় হিনডম্যান বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের সহনশীলতা কিভাবে বেড়ে যায় পরিহাসচ্ছলে তার বর্ণনা দিচ্ছিলেন। তাঁর কথা শুনে মার্কস সবিস্ময়ে বললেন, 'সত্যিই কি তুমি সহনশীল হয়েছ? সত্যিই?' সত্যিই কি আমরা আমাদের বয়সের সাথে সাথে অসাম্য, অবিচার, দারিদ্র্য ও বোমাবর্ষণে নৃশংস গণ্যহত্যা সম্পর্কে আরো সহনশীল হয়ে পড়ছি? সত্যিই কি তাই?

DR. CHRISTOPHER HILL এক্ষণের জন্য পাঠিয়েছেন এই লেখাটি – *Das Kapital and I*।
অনুবাদ : সুনীত সেনগুপ্ত।

মার্কস ও মানবসত্তা

গৌতম সান্যাল

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাপক বক্তব্যে মানুষের ধর্ম বা লক্ষণ সম্পর্কে প্রায় সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে। সমাজস্থ ভাব-জগত মূলত সমাজের বস্তুগত অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই মূল সূত্র প্রাথমিকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ফলে মানুষের অবস্থা, লক্ষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণে আমাদের মনোযোগ স্বভাবতই সমাজের উৎপাদন-পদ্ধতি, কোনো বিশেষ উৎপাদনপদ্ধতির অন্তর্গত উৎপাদনশক্তি, উৎপাদন-সম্পর্ক প্রভৃতিতে নিবিষ্ট হয়। জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনের জন্য মানুষ যে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হয়—সেই উৎপাদনক্রিয়া এবং এই উৎপাদনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে-সমস্ত সমাজসম্পর্ক গড়ে উঠে—মানুষের সচেতনতা, সক্রিয়তা, স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক ধর্মগুলি তাদের অবলম্বন ক'রে আছে। কাজেই মানুষের সত্তা বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত মৌলিক ধর্ম-গুলি কিভাবে মানুষের উৎপাদনক্রিয়া এবং তদ্ভূত বিভিন্ন সমাজ-সম্পর্ককে অবলম্বন ক'রে আছে, তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ইতিহাস দ্বান্দ্বিক নিয়মের অধীন। কিন্তু ইতিহাসের এই দ্বান্দ্বিক বিকাশে মানুষের সচেনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতার ভূমিকা মুখ্য। কাজেই মানুষের এই ধর্মগুলির বিস্তৃততর ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রকৃত তাৎপর্যকে স্পষ্টতর করবে। এবং উভয় দিক স্পষ্টতর হলে মানুষের সত্তা সম্পর্কে মার্কসের সম্পূর্ণ বক্তব্য বোঝা যাবে। অবশ্য 'সত্তা' শব্দটি এই প্রসঙ্গে ব্যবহার করার সময়ে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভাববাদী দার্শনিকেরা যখন কোনো-কিছুর 'সত্তা' নিরূপণের চেষ্টা করেন তখন তাঁদের সেই প্রচেষ্টা অমিশ্র তাত্ত্বিক আলোচনার সংকীর্ণ গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা কোনো একটি অমূর্ত প্রত্যয়ের

অর্থ নির্ধারণের চেষ্টা করেন। মার্কসবাদের সঙ্গে অন্যান্য তত্ত্ববিদদের মৌলিক পার্থক্য এই। মার্কসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য বাস্তবানুগ ব্যাবহারিক সমাজ-ইতিহাসে। কাজেই মানুষের সত্তা নিরূপণ প্রসঙ্গে মার্কসের যে বক্তব্য তা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত, সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি-আশ্রিত এবং তার সার্থকতা ব্যাবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে এই সত্তাকে মূর্ত করে তোলা। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য আমাদের এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে মার্কসের চিন্তাধারার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের সম্পর্ক যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ। পূর্বতন চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর নিজের চিন্তাধারার যোগসূত্রগুলির কথা মার্কস স্বয়ং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দুই-এর মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সে-সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন। *Das Capital*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, *Economic and Philosophic Manuscript of 1844*, *Theses on Feuerbach*, *Critique of Modern German Philosophy* প্রভৃতি লেখায় এই উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কসের সঙ্গে হেগেল, ফয়েরবাখ প্রভৃতি পূর্বসূরিদের দৃষ্টিভঙ্গির যে মৌলিক পার্থক্য তা মার্কসের একটি মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় দার্শনিকেরা কেবল-মাত্র জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন; আসলে প্রয়োজন এর পরিবর্তনসাধন। দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্যের জন্য মার্কস মানুষের বাস্তব পরিবেশপ্রসূত সক্রিয়তার উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষের সত্তা নির্ধারণ করতে গিয়ে তথাকথিত কালাতীত কতগুলি লক্ষণের সাহায্যে 'মানুষ'—এই অমূর্ত প্রত্যয়ের বিশ্লেষণে প্রয়াসী হন নি।

সামগ্রিকভাবে জগতের পরিবর্তনসাধন করার দিকনির্দেশই মার্কসবাদের প্রধানতম উদ্দেশ্য; এই দিকনির্দেশ বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট, যেহেতু মানুষই এই পরিবর্তন-সাধনে ব্রতী এবং মানুষই জগতের কেন্দ্রবিন্দু—এ-কথা বলা যায় যে সামগ্রিকভাবে মার্কসবাদের আলোচ্য বিষয় মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে এমন কথা বাহুল্যমাত্র মনে হতে পারে। মানুষের জীবন এতো ব্যাপক যে দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে-বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হোক না কেন তা হবে মানুষ-সম্পর্কীয় আলোচনা; যে-কোনো আলোচ্য বিষয়ই কোনো না কোনোভাবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু কেবলমাত্র এই অর্থেই মার্কসবাদের আলোচ্য প্রধান বিষয় মানুষ নয়। মার্কসবাদের ব্যাপক ভাবাদর্শের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির প্রত্যেকটিতে সচেতনভাবে সম্পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা একদিকে বৈজ্ঞানিক, অপরদিকে ব্যাবহারিক তাৎপর্যপূর্ণ ধারণার পরি-প্রেক্ষিতে সাধিত। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে মার্কস যখন মানুষ সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ ধারণায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন তখন তিনি বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্যাশ্রয়ী বক্তব্যগুলির সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন যে মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণায় সমন্বিত

হওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। মানুষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণায় উপনীত হওয়ার অর্থ 'মানুষ' – এই প্রত্যয়ের অমূর্ত রূপায়ণ নয়। এই সম্পূর্ণতা ব্যাবহারিক। মানুষ সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ ধারণায় মার্কস উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই ধারণায় মানুষের মূর্তত্ব অক্ষুন্ন। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, মানুষের ক্রিয়াশীলতা ও ব্যাবহারিক পরিস্থিতির উপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি থেকে এই মন্তব্য স্পষ্ট হয়।

লৌকিক অভিজ্ঞতায় জড় এবং চেতনের পার্থক্য স্পষ্ট। ভাববাদী দর্শনে চৈতন্য একমাত্র সত্য বলে গ্রাহ্য। অন্যদিকে জড়বাদ জড়-জগৎকে প্রধান বলে স্বীকার করে। চৈতন্য জড়েরই পরিণাম বা জড়বস্তু থেকেই উৎপন্ন – মার্কসবাদ ছাড়া অন্যান্য কোনো কোনো মতবাদেও এই বক্তব্য স্বীকৃত। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও জড়জগতের প্রাথমিক প্রাধান্য স্বীকার করে (সম্ভবত মার্কস স্বয়ং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, এই অভিধা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু এঙ্গেলস এবং লেনিন প্রমুখ উত্তরকালের মার্কসবাদীরা এই অভিধা ব্যবহার করেছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বক্তব্য যে মার্কসের বক্তব্য এ-সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই)। প্রাণ এবং চৈতন্য জড়ের পরিণাম। এই অর্থে মানুষও জড়-জগৎ বা প্রকৃতির অংশ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ও জড়-জগতের সম্পর্কের দুটি দিক স্পষ্ট। দেহ ও চৈতন্য সমন্বিত মানুষ জড়-প্রকৃতির অংশ। ফলে সীমিত অর্থে মানুষ জড়-জগতের অধীন এবং জড়-জগতে যে বাস্তিক নিয়ম কার্যকর মানুষের ক্ষেত্রে তা কার্যকর। আবার বাস্তিক পরিবর্তনে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনে পর্যবসিত হয়। সুতরাং মানুষের মধ্যে এমন এক গুণ বর্তমান যা জড়-জগত এবং মানুষের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য সূচিত করে। প্রাণ এবং চৈতন্যে এই মৌলিক গুণ সূচিত হয়। মানুষ যেমন জড়-জগতের বাস্তিক নিয়মের অধীন, তেমনি প্রাণ ও চৈতন্যের মাধ্যমে বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ায় মানুষ প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও জড়-প্রকৃতির উপর তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে সক্ষম। মানুষের সক্রিয়তা প্রাথমিকভাবে এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাজাত এবং এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অনুশীলনে মানুষের স্বাধীনতার সূচনা। মানুষের এই সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতা চরিতার্থ হয় জড়-প্রকৃতিকে সে যে-ভাবে ব্যবহার করছে তার মাধ্যমে। জড়-প্রকৃতিকে মানুষ জীবনধারণের উপায়রূপে ব্যবহার করে। জড়-প্রকৃতি থেকেই মানুষ আহরণ করে তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণের উপাদান। জড়-প্রকৃতি যেন মানুষের জৈবদেহ-অতিরিক্ত আর একটি দেহ, যাকে আশ্রয় করে সে বাঁচে। ফলে মানুষ এবং জড়-প্রকৃতির মধ্যে এক অবিরাম ওতপ্রোত সম্পর্ক বর্তমান। মানুষের দৈহিক ও মানসিক জীবনের সঙ্গে জড়-প্রকৃতির যে সম্পর্ক তা আসলে প্রকৃতির এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক। জড়-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই ওতপ্রোত সম্পর্ক থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়।

প্রথমত, জড়-প্রকৃতির অংশ হিসাবে মানুষ জড়-জগতের দ্বান্দ্বিক নিয়মের অনুবর্তী। মানুষের প্রাণ এবং চৈতন্যের ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোনো অতিমানবিক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়ত, মানুষের প্রাণ এবং চৈতন্যের এ-জাতীয় ব্যাখ্যায় মানুষের সক্রিয়তা বা স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং জড়-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ওতপ্রোত সম্পর্কেই মানুষের সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতার সূচনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মানুষের এই সক্রিয়তা ও স্বাধীনতার সাহায্যে মার্কস মানুষের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব দুই-ই ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষকে সক্রিয় এবং স্বাধীন বলে স্বীকার করলে ভাববাদীরা এবং অন্যান্য ঈশ্বরবাদীরা যে-সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন তা গ্রহণ করা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের উৎপত্তি এবং তার অস্তিত্ব মানুষ-অতিরিক্ত অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না। মানুষের জন্মের ব্যাখ্যাই এর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভাববাদীরা বা ঈশ্বরবাদীরা এর পরেও একটি প্রশ্ন তোলেন। জগতের প্রথম মানুষটিকে কে সৃষ্টি করল? এই জড়-প্রকৃতি কে সৃষ্টি করল? মার্কসের মতে এই প্রশ্ন অবান্তর। কাজেই এর উত্তর নিরর্থক। প্রথমত এই প্রশ্ন তখনই প্রাসঙ্গিক হয় যখন মানুষ এবং সমগ্র প্রকৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কোনো বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করার পর যদি তার উৎপত্তি ও অস্তিত্বের ব্যাখ্যা চাওয়া হয় তবে এমন কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, যার বাস্তব ও ব্যাবহারিক তাৎপর্য থাকে। দ্বিতীয়ত, এই প্রশ্নকে যদি বাস্তব ও ব্যাবহারিক তাৎপর্যের বিচারে অবান্তর বলে মনে না করা হয় তাহলে স্বয়ং প্রশ্নকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়। যে-অবস্থায় মানুষ ও জড়-প্রকৃতির সামগ্রিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে সেই অবস্থায় এই প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, এই অবস্থায় কোনো প্রশ্নকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। ফলে এ-প্রশ্নের কোনো উত্তরের কোনো তাৎপর্য থাকে না। মানুষের সত্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানুষ ও জড়-প্রকৃতির বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার ক'রে অগ্রসর হতে হবে। এবং এই অস্তিত্ব অস্বীকার না করলে মানুষ ও জড়-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো সত্তাকে সৃষ্টিকর্তারূপে ভাবার প্রয়োজন হয় না। মানুষের সত্তার ব্যাখ্যা মানুষের বাস্তব ও ব্যাবহারিক অস্তিত্বেই নিহিত। সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা এই বাস্তব ও ব্যাবহারিক অস্তিত্বের প্রধানতম লক্ষণ। এবং এই সক্রিয়তা ও স্বাধীনতার সূচনা মানুষের সঙ্গে জড়-জগতের ওতপ্রোত সম্পর্কে। মানুষের সত্তা নির্ধারণে তার মূর্ত অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার উপরে গুরুত্ব আরোপ – এর মূল প্রধানত একটি বিষয়ে নিহিত – হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। কিয়ের্কেগর্দ মার্কসের সমসাময়িক। হেগেলীয় অমূর্ত তাত্ত্বিক বিন্যাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং মানুষকে অমূর্ত প্রত্যয়রূপে স্বীকার না করা তাঁর বক্তব্যেও স্পষ্ট। পরবর্তীকালের অস্তিত্ববাদীরাও এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। কোনো অতিমানবিক সত্তা দ্বারা মানুষের সত্তা নিয়ন্ত্রিত এ-কথা তাঁরা সকলেই

অস্বীকার করেন। এঁরা সকলেই প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন যে মানুষের সত্তা তার মূর্ত অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। মানুষের সত্তা নির্ধারিত হয় তার স্বাধীন সক্রিয় ভূমিকা দ্বারা। কিন্তু দুটি বিষয়ে মার্কসের বক্তব্যের সঙ্গে এঁদের তীব্র বিরোধ। প্রথমত, এঁরা মানুষের সঙ্গে জড়-জগতের ওতপ্রোত সম্পর্ককে স্বীকার করেন না। ফলে মানুষের স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মূর্ত অস্তিত্বের কথা বার বার ঘোষণা করলেও শেষপর্যন্ত এঁরা প্রচ্ছন্ন ভাববাদের মাধ্যমে ব্যক্তির অমূর্ত প্রত্যয়কেই আশ্রয় করেন। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা ব্যাখ্যা করার সময়ে এঁরা সমাজসম্পর্কের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। এঁদের কাছে স্বাধীনতা আর সক্রিয়তা ব্যক্তিমানুষের। মার্কস যে স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার কথা বলেছেন মূলত তা মানুষের জাতিধর্ম। মানুষের সত্তা ব্যক্তি-বিশেষের লক্ষণভিত্তিক রূপে ভাবলে তা হবে অমূর্ত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সমাজসম্পর্কের সমন্বয়সাধন করলেই মানুষের মূর্ত সত্তা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব।

চৈতন্যকে মার্কস মানুষের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেন। তবে চৈতন্য, স্বাধীনতা ও সক্রিয়তা মানুষের তিনটি পৃথক স্বতন্ত্র ধর্ম এমন কথা বলা ঠিক হবে না। এই তিনটি ধর্মের একটির সাহায্যে অপরটির ব্যাখ্যা সম্ভব। মানুষের চৈতন্য ব্যাখ্যা করতে হবে তার সক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে। আবার চৈতন্য ঠিকমতো ব্যাখ্যা না করলে স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না। চৈতন্য যে কেবলমাত্র জড়-জগত থেকে মানুষকে পৃথক করে তা নয় – জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের যে-পার্থক্য সেই পার্থক্যের সূচকও এই চৈতন্য। চৈতন্য যে মানুষের প্রধানতম বিশিষ্ট লক্ষণ একথা কোনো দর্শনই অস্বীকার করে না। কিন্তু চৈতন্য বলতে বিভিন্ন দার্শনিকেরা বিভিন্ন অর্থ বুঝিয়েছেন। অনেকে জড় এবং চৈতন্যকে ঈশ্বর-সৃষ্ট দুটি স্বতন্ত্র সত্তা রূপে ভাবেন। এঁদের কাছে মানুষের চৈতন্য ঈশ্বর-দত্ত একটি গুণ। এই গুণ লাভ করায় মানুষ যে-সমস্ত মানসিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে সেগুলির সঙ্গে জড়-জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বক্তব্যই ক্রমশ পুরোপুরি ভাববাদী বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। জড় কোনো সত্তা নয় এবং চৈতন্যও ঈশ্বর-সৃষ্ট নয়। চৈতন্যধর্ম বিশিষ্ট অথবা চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তা বা পরম চিৎ-ই একমাত্র সত্তা। মানুষের চৈতন্য এই পরম চিৎ-এর অংশ বা প্রকাশ। এই মত অনুসারে মানুষের মানসিক ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণভাবে পরম-চিৎ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রবক্তা মার্কস চৈতন্যকে মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করলেও নিশ্চয়ই চৈতন্যের এই ব্যাখ্যা দেবেন না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে যখন চৈতন্যকে জড়ের দ্বান্দ্বিক পরিণাম বলা হয় তখন তার উৎপত্তি ব্যাখ্যা হয় মাত্র। কিন্তু এই চৈতন্য মানুষের মধ্যে কিভাবে ক্রিয়াশীল তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। চৈতন্যপ্রসূত ক্রিয়াকলাপ জড়-জগত এবং অন্যান্য মানবিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে কিভাবে জড়িত তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

জড়-জগত ও অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে চৈতন্যের দ্বারা পৃথক করা গেলেও চৈতন্যপ্রসূত ক্রিয়াকলাপগুলিকে মানুষের প্রাথমিক এবং প্রধানতম ক্রিয়াকলাপ বলা যায় না। মানুষ তার জীবনধারণের উপকরণ নিজে উৎপন্ন করে। এই উৎপাদনক্রিয়াই তার প্রথম ও প্রধান মানবিক ক্রিয়া। এই উৎপাদনক্রিয়ার সাহায্যেই মানুষ নিজের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে। মানবেতর অন্যান্য প্রাণী তাদের জীবনধারণের উপকরণ প্রকৃতি থেকে আহরণ করে—উৎপাদন করে না। উৎপত্তির দিক থেকে চৈতন্য জড়ের দ্বান্দ্বিক পরিণাম। এবং মানুষ প্রতিনিয়ত যে-চিন্তাকার্যে নিযুক্ত—সেই চিন্তাকার্য প্রধানত তার উৎপাদনক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যখন বিভিন্ন বিষয় জানে তখনই তার চৈতন্যের অমিশ্র ক্রিয়া স্পষ্ট হয়। মানুষের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে দুটি দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে নিহিত—ইন্দ্রিয়-সংবেদন এবং ইন্দ্রিয়গত অভাববোধ। মানুষের ইন্দ্রিয়গত অভাববোধই তাকে জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত করে। এই ইন্দ্রিয়গত অভাববোধ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি; কাজেই মানুষের চৈতন্যপ্রসূত কোনো ক্রিয়াকলাপই তার উৎপাদনক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বোঝা যায় না। মানুষের ইন্দ্রিয়-সংবেদন, ইন্দ্রিয়গত অভাববোধ—তথা তার চৈতন্য সামগ্রিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক তারই সূচক। মানুষের পরিবেশজাত অভাববোধ তাকে তার জীবন-ধারণের উপকরণ উৎপাদনে নিযুক্ত করে। কিন্তু এই উৎপাদনক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে মানুষ জড়-প্রকৃতি এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। মানুষের চৈতন্য এই সম্পর্কগুলির, বিশেষত অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তারই সূচক। এই সম্পর্কগুলি অনিবার্য। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ কেবলমাত্র তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাছের জগত, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সীমিতসংখ্যক সম্পর্ক, স্ব-চেতন ব্যক্তির বাইরে যে-সমস্ত অচেতন বিষয় সেগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক—এই সম্বন্ধেই সচেতন হয়। এই অবস্থায় মানুষের চৈতন্য বলতে শুধুমাত্র এইটুকুই বোঝায়। কিন্তু ইতিহাস যত এগোয় মানুষের প্রয়োজন-বোধ, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক, জড়-জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এই সমস্ত ক্ষমতা জটিলতর হয়। বিষয়ের জটিলতর রূপ ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চৈতন্যও জটিলতর হয়। তখন মানুষ অধিকতর দূরদৃষ্টি লাভ করে। কেবলমাত্র বর্তমানের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে সক্রিয় হওয়ার উপায় হিসাবে সে আর চৈতন্যকে ব্যবহার করে না। অ-পরোক্ষ ইন্দ্রিয়-সংবেদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে তার চৈতন্য পরোক্ষ বিষয়গুলিকেও গ্রহণ করে। কিন্তু যে কোনো অবস্থাতেই মানুষের চৈতন্য উক্ত বিষয়গুলিকে অবলম্বন ক'রে থাকে। বিষয়গুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই চৈতন্যের রূপ বদলায় মাত্র। যে-বিষয়গুলিকে চৈতন্য অবলম্বন করে সেগুলি মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব বা সমাজ-

জীবনকে রূপ দেয় এবং সামাজিক অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কাজেই ইতিহাসের যে-কোনো পর্যায়ে মানুষের চৈতন্য তার সামাজিক অস্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে থাকে। আদিম পর্যায়েও চৈতন্য এই ছিল—এবং যতদিন মানুষ থাকবে তার চৈতন্য এইভাবেই থাকবে। মানুষের ভাবজগত তার চৈতন্যের অভিব্যক্তি। চৈতন্যর অভিব্যক্তি এই ভাবজগতের অন্তর্গত বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, ভাবাদর্শ, লক্ষ প্রভৃতি তার জীবনকে মুখ্যত রূপায়িত করছে—ভাববাদী দার্শনিকেরা এই কথা বলেন এবং ভাবজগতের মূল উৎস চৈতন্যকে জড়জগত-বহির্ভূত, বাস্তব জীবন-বহির্ভূত এক অদ্বিতীয় সত্তা রূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের চৈতন্য সে-জাতীয় কিছু নয়। মানুষের চৈতন্য (যা তার সমস্ত ভাবজগতের মূলে রয়েছে) তার সামাজিক অস্তিত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষের উৎপাদনক্রিয়া মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর পার্থক্য নির্ণয় করে, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে : মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা কি কোনো কিছু উৎপাদন করে না? অন্যান্য প্রাণীরাও উৎপাদন করে—মার্কস এ-কথা স্বীকার করেন। তবে এই দুই উৎপাদনক্রিয়ার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী উৎপাদন করে কেবলমাত্র তাদের প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজন মেটানোর জন্য। মানবেতর অন্যান্য প্রাণীরা যা উৎপাদন করে তাদের স্থূল দেহই তার অধিকারী। কিন্তু মানুষ তার জৈব প্রয়োজন-অতিরিক্তও উৎপাদন করে। প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজন না থাকলেও মানুষ উৎপাদন করে। এই উৎপাদনে তার স্বাধীনতা এবং সক্রিয়তা প্রকাশ পায়। ইতর প্রাণী যখন কোনো কিছু উৎপাদন করে তখন সে শুধু তার নিজের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন অনুসারেই উৎপাদন করে। কিন্তু মানুষ যখন কোনো কিছু উৎপাদন করে তখন সে শুধু নিজের প্রকৃতি আর প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন হয়েই উৎপাদন করে না। যে-উপাদান থেকে সে উৎপাদন করছে, সেই উপাদানের প্রকৃতি এবং ধর্ম সম্বন্ধেও সে সচেতন থাকে। মানুষের সঙ্গে ইতরপ্রাণীর এই যে পার্থক্য—এ থেকেই 'মানুষের চৈতন্য কি?'—এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়। মানুষের চৈতন্য তার উৎপাদনক্রিয়াকে অবলম্বন ক'রে থাকে। আবার, তার এই বিশেষ ধর্মের সাহায্যে সে তার উৎপাদন-ক্রিয়াকেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক'রে তুলেছে। মানুষের চৈতন্য ইতরপ্রাণীর উৎপাদন-ক্রিয়ার সঙ্গে তার নিজের উৎপাদনক্রিয়ার একটি মৌলিক পার্থক্য সূচিত করে। মাকড়সার জালবোনায় যে-দক্ষতা প্রকাশ পায়, তা তন্তুবায়ের দক্ষতার সঙ্গে তুলনীয়। মৌমাছি যখন মৌচাক তৈরি করে তখন তার স্থাপত্য-দক্ষতার কাছে অনেক স্থপতির দক্ষতা ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই দুইয়ের মধ্যে এমন এক পার্থক্য আছে যার ফলে দক্ষতম মৌমাছিও নিকৃষ্টতম স্থপতির কাছে হার মানে। স্থপতি যখন নির্মাণ করেন, তখন নির্মাণের পূর্বেই তাঁর মানসপটে ঐ বিষয় সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু মৌমাছি যখন নির্মাণকার্যে নিযুক্ত

হয় তখন সে কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত ধারণা অনুসারে নির্মাণ করে না। মানুষের উৎপাদনক্রিয়া সর্বদাই কোনো পূর্ব-পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। এই উৎপাদনের মাধ্যমে কেবল যে জড়-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত হয় বা তার প্রয়োজন সাধিত হয় তা নয়; এই উৎপাদনের মাধ্যমে তার একটি অভিপ্রায় প্রকাশিত হয় এবং চরিতার্থ হয়। মানুষের উৎপাদনক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্য তার চৈতন্যের ফল।

সচেতনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতা এই তিনটি ধর্মের সাহায্যে মানুষের সত্তা নির্ধারণের প্রচেষ্টায় মৌলিকত্ব নেই। মার্কসের মতবাদের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁরাও এই ধর্ম তিনটির সাহায্যে মানুষের সত্তা ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে একটি সংশয় দেখা দেয়, মার্কস যখন বলেন প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের মধ্যে, পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের মধ্যে মানুষের সচেতন এবং সক্রিয় স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়—সেই সচেতন সক্রিয় স্বাধীনতা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এ-বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে। বিশেষত মৌলিক পৃথক গুণের অধিকারী মানুষ জড়-জগত নিয়ন্ত্রণ করছে, তার পরিবর্তন সাধন করছে; অন্যদিকে মানুষের উৎপাদনক্রিয়াও তার ঐ তিনটি ধর্ম-নিরপেক্ষ নয়। এক্ষেত্রে বস্তুজগতের দ্বান্দ্বিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণ অথবা সমাজের বস্তুনিষ্ঠ বুনিয়াদের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে স্বীকার করা যায়? প্রথমটিকে স্বীকার করলে দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করতে হয়, এবং দ্বিতীয়টিকে গ্রহণ করলে প্রথমটিকে বর্জন করতে হয়। অনেকে এমন কথা পর্যন্ত বলেন যে মার্কস মূলত প্রথমটিকে স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতা, সক্রিয়তা এবং সচেতনতা প্রতিপাদনই মার্কসের উদ্দেশ্য ছিল। ব্যক্তির উপর বাহ্য নিয়ন্ত্রণ মার্কস স্বীকার করতে চান নি। এঙ্গেলস এবং উত্তরকালের অন্যান্য তথাকথিত মার্কসবাদীরাই এই নিয়ন্ত্রণকে বড়ো করে তুলেছেন এবং মার্কসের বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। অবশ্য এ-জাতীয় বক্তব্যের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। কাজেই এ-প্রসঙ্গে এটুকু ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট হবে যে মার্কস যে-অর্থে সচেতনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানুষকে যে-ভাবে দ্বান্দ্বিক নিয়ন্ত্রণের অধীন দেখিয়েছেন, তদনুসারে উভয় বক্তব্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রথমত, মানুষ যে মৌলিক গুণের ফলে প্রাণ ও চৈতন্যের অধিকারী এবং যার ফলে সে জড়-জগতের উপর তার সক্রিয় স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে সক্ষম সেই মৌলিক গুণ জড়-জগতের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনের পরিণাম। এই গুণের অধিকারী হওয়ায় মানুষ জড়-জগতের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়েছে এবং জড়-জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার এই সক্রিয় স্বাধীনতা নিরবলম্ব নির্বাধ স্বাধীনতা নয়। যে-জড়জগতের উপর সে তার সক্রিয় স্বাধীনতা প্রয়োগ করছে সেই সক্রিয় স্বাধীনতার উৎস দ্বান্দ্বিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন জড়-জগত। মানুষ নিজেই জড়-জগতের অংশ। দ্বিতীয়ত, মানুষের সচেতনতা এবং সক্রিয়তা

তার উৎপাদনক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে সত্তা, কিন্তু প্রাথমিকভাবে তার এই ধর্মগুলি রূপায়িত হয় উৎপাদনক্রিয়ার বস্তুগত পরিবেশ এবং উপাদান—এক কথায় বস্তুগত উৎপাদনশক্তির দ্বারা। মানুষ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে উৎপাদনে সক্ষম—প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনে সক্ষম। এর মানে এই নয় যে সে উৎপাদন ব্যাপারে বস্তুগত উৎপাদনশক্তির উপর আদৌ নির্ভর না ক'রে উৎপাদনে সক্ষম। তাছাড়া মানুষের উৎপাদনক্রিয়া তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়। উৎপাদনক্রিয়া সর্বতোভাবে সামাজিক প্রচেষ্টা। উৎপাদনক্রিয়ায় মানুষ যখন তার সচেতনতা ও সক্রিয় স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, তখন তার সচেতনতা ও সক্রিয় স্বাধীনতাকে ব্যক্তিগত ধর্ম রূপে অভিহিত করা যায় না। এগুলি তার সমাজগত ধর্ম বা জাতিধর্ম। আসলে উৎপাদনক্রিয়ার মাধ্যমে যে মৌলিক সমাজসম্পর্কগুলি সৃষ্টি হয়—তারই উপর নির্ভর করে মানুষ তার সচেতনতা বা সক্রিয় স্বাধীনতা বাস্তবে কতখানি চরিতার্থ করছে।

'সত্তা' বলতে মার্কস সেই ধর্মগুলিকেই বোঝান যা সর্বগত, মূর্ত এবং অস্তিত্বে নিহিত। সক্রিয়তা, সচেতনতা আর স্বাধীনতাকে মানুষের সত্তা-নিরূপক ধর্ম বলে তিনি যখন অভিহিত করেন তখন নিশ্চয়ই তিনি এ-গুলিকে অমূর্ত চিরায়ত ধারণা রূপে গ্রহণ করেন না। সর্বগত মূর্ত এই ধর্মগুলি স্বভাবতই সমাজসম্পর্কের উপর নির্ভর করে। সমাজসম্পর্ক স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। এ-কারণে সচেতনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতার স্বরূপও পরিবর্তনশীল। উৎপাদনক্রিয়া সমাজসম্পর্কগুলির ভিত্তি। কাজেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি উৎপাদনক্রিয়ার অনিবার্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি বিশেষ বিশেষ সমাজসম্পর্ক সৃষ্টি করে, এবং এই সমাজসম্পর্কগুলি মানুষের সচেতনতা, সক্রিয়তা আর স্বাধীনতার মূর্ত রূপকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজের শ্রেণীসম্পর্ক মানুষের সচেতনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করছে। ফলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ তার এই ধর্মগুলিকে নিজের অস্তিত্বের মধ্যে যথাযথ চরিতার্থ করতে পারছে না; তার অস্তিত্ব আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতায় বিপন্ন। মানুষের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব তাকে অমানুষ ক'রে তুলেছে। মানুষ তার ধর্মগুলিকে চরিতার্থ করে জড়-প্রকৃতির সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক তার মাধ্যমে, তার সমাজজীবন বা জাতিজীবনের মাধ্যমে, এবং এইভাবে সে যখন তার ধর্মগুলি চরিতার্থ করতে পারে তখনই সে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করে। মানুষের অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার ফলে মানুষের সঙ্গে জড়-প্রকৃতির সম্পর্কও যথাযথ নয়। প্রাণ এবং চৈতন্যের অধিকারী মানুষ তার মৌলিক গুণের সাহায্যে জড়-প্রকৃতিকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি যেখানে এমন যে যারা প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে নিযুক্ত এবং যারা নিজেদের শ্রমের সাহায্যে উৎপাদন করছে তারা উৎপন্ন ফলের অধিকারী নয়—সেখানে তাদের সক্রিয়তা যান্ত্রিক দক্ষতায় পর্যবসিত হয়। উৎপাদনের উপকরণের অধিকারী

তারা নয়—উৎপাদনের ফলের অধিকারী তারা নয়, অর্থাৎ উৎপাদনকারী আর উৎপাদনের উপকরণ দুই-ই উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর সক্রিয়তাকে মানবিক সক্রিয়তা বলা যায় না। অর্থাৎ জড়-জগতের সঙ্গে মানুষের যে-সক্রিয় সম্পর্ক মানুষের সত্তার অংশ, তা বিঘ্নিত। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন কিংবা প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যে-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব আছে এবং শ্রমবিভাগ নীতি কার্যকর সেখানে শ্রমিকশ্রেণী পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন করছে এমন কথা বলা যায় না। খুব দক্ষ শ্রমিকও এই অবস্থায় কাজ করে মানবেতর প্রাণীর যান্ত্রিক দক্ষতায়। সমগ্র উৎপাদন নিশ্চয়ই কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে হচ্ছে—কিন্তু সেখানে শ্রমিক সে-পরিকল্পনার অংশীদার নয়। তার নিজের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় সেই পরিকল্পনায় সমন্বিত হয় নি। কাজেই তার সচেতনতা এবং সক্রিয় স্বাধীনতা বাস্তবে চরিতার্থ হচ্ছে না। এই উৎপাদনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী বস্তুত তার প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজনের জন্য উৎপাদনে নিযুক্ত। শ্রমিকশ্রেণী যা উৎপাদন করে তা তাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ জৈব প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট অতিরিক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা উৎপন্ন ফলের অংশীদার নয়। তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণের উপকরণটুকু লাভ করে মাত্র। কাজেই এক্ষেত্রেও তারা মানবেতর প্রাণীর পর্যায়ভুক্ত। জৈব প্রয়োজনের তাগিদেই তারা উৎপাদনে নিযুক্ত। তাদের পক্ষে এই উৎপাদনে অংশগ্রহণ করায় তারা সক্রিয় নয়—স্বাধীন নয়। মানুষের সচেতনতা, সক্রিয়তা ও স্বাধীনতা তাদের অস্তিত্বে বিঘ্নিত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমবিভাগের ফলে মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন সামঞ্জস্যহীন হয়েছে ; ব্যক্তিস্বার্থ গোষ্ঠীস্বার্থ বা সমষ্টি-স্বার্থের বিরোধী হয়েছে। অথচ মানুষের মৌলিক ধর্মগুলি—যেগুলির সাহায্যে সে নিজের ব্যক্তিত্বও উপলব্ধি করে—সেগুলি সর্বতোভাবে সমাজসম্পর্কেই নিহিত। ফলে মানুষের অস্তিত্বের আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা তীব্রতর হয়েছে। এই অবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ইতিহাস মানুষকে কিভাবে তার স্বীয় ধর্মগুলিকে চরিতার্থ করার পথে নিয়ে যায়—কিভাবে তার খণ্ডিত অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ অর্জনের ফলে যে-উৎপাদনব্যবস্থা দেখা দেবে, উৎপাদনসম্পর্ক তথা সামগ্রিক সমাজসম্পর্ক এমন আকার পাবে যেখানে মানুষ তার সচেতনতা, সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতাকে পূর্ণতররূপে চরিতার্থ করবে।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কার্ল মার্কস ও অ্যালিয়েনেশন

যোসেফ শুমপিটার এক জায়গায় মহৎ সৃষ্টির লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি অথবা কল্পনার অধিকাংশ সৃষ্টিই কালোত্তীর্ণ নয়। কিছুকাল স্থায়ী হলেও অধিকাংশ সৃষ্টিই মহাকালের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করে না, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। শুমপিটার পরিহাস ক'রে বলেছেন যে এ-সব সৃষ্টি কতদিন স্থায়ী হবে — ডিনার-শেষের কয়েকটি ঘণ্টা, না একযুগ, তা নির্ভর করে এদের গুণা-গুণের উপর। এটাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এমন সৃষ্টিও আছে যারা ক্ষণস্থায়ী নয়। এদের উত্থানপতন আছে — কিন্তু বার বার এদের আবির্ভাব ঘটে নিত্যনবরূপে। আর যখন এই আবির্ভাব ঘটে তখন তাকে আমরা অন্তরঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করি। এই সব সৃষ্টি নিজের বর্ণসুষমা নিয়ে, হয়তো-বা ক্ষতচিহ্ন নিয়ে, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই প্রকাশ পায়। এবং তখন এদের আমরা 'বিশেষ বস্তু' হিসাবে গ্রহণ করি, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যেন পাই, মনে হয় : 'এরা তো আমাদের অপরিচিত নয়।' শুমপিটার বলেছেন যে, এই সব লক্ষণাক্রান্ত সৃষ্টিকে 'মহৎ' আখ্যা দেওয়া চলে এবং মার্কসের বাণীও মহৎ-সৃষ্টির মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'মহাপ্রাজ্ঞ',

ব্যাবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের 'নাইট', ইতিহাসের ক্ষেত্রে 'বস্তুবাদী' বললেই কার্ল মার্কসের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না ; ব্যক্তিমানুষের সমস্যা, মানবিকবাদী দৃষ্টি তাঁর লেখার অন্তরঙ্গ অঙ্গ। তাঁর সমালোচকরা তাঁর রচনায় একদেশদর্শিতা, অতিসরলীকরণ, বিতণ্ডা-প্রবণতার অভিযোগ এনেছেন ; তৎসত্ত্বেও তাঁর লেখা ভিন্ন মতাবলম্বীদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে। বিশেষত তাঁর তরুণ বয়সের রচনাবলি একালে অনেকেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, শ্রেণীসংগ্রামের

প্রবক্তা কার্ল মার্কস যে কবি এবং দার্শনিক, প্রবুদ্ধ মানবিকতার প্রবক্তা একথা বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই।

কার্ল মার্কস সাম্যবাদকে গ্রহণ করেছিলেন 'স্বাধীনতা'র স্বার্থে। সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের অবাধ বিকাশ সম্ভব হবে, মানুষ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হবে, এই ছিল মার্কসের বিশ্বাস। নিরাপত্তার প্রয়োজনে কিম্বা প্রাচুর্যের জন্য সাম্যবাদী সমাজ কাম্য, কিম্বা বলৈষণার স্বার্থে এই সমাজ বরণীয়, এ-বক্তব্য আর যারই হোক মার্কসের নয়। *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*-এর শেষভাগে এবং *German Ideology*-তে মার্কস ভাবীকালের সাম্যবাদী সমাজের ছবি এঁকেছেন। সে-ছবি কল্পনায় স্নিগ্ধ, সেই ছবিতে কবি মার্কসের পরিচয়ই প্রধান। সাম্যবাদী সমাজের চিত্রটি কেমন? মার্কস বলেছেন: এই সমাজ নিপীড়নহীন, স্বাধীন, প্রবুদ্ধ মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে-ওঠা অভিনব সমাজ। এই সমাজে শোষণ নেই, পরবশ্যতা নেই, শ্রমবিভাগের গ্লানি নেই, নেই লোভ ও টাকার দাসত্ব, অর্থগৃধ্নুতা। সমষ্টিতান্ত্রিকতার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষ এ-সমাজে বলিপ্রদত্ত নয়। পূর্ণতার সাধনায়, মানবধর্মের সাধনায় সকলেই এখানে আনন্দযোগে নিযুক্ত। এ-চিত্র যে শুধু তরুণ মার্কসের চিত্তপটে বিধৃত হয়েছিল তাই নয়; আজীবন মার্কস কল্পনায় স্নিগ্ধ এই চিত্রটিকে সযত্নে লালন করেছিলেন। *German Ideology*-র বহু বিক্ষিপ্ত অংশে, ১৮৫০-৫৯ এর মধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায়, ১৮৭৫-এর *Critique of the Gotha Programme*-এ এবং *Capital*-এর তিন খণ্ডের নানা অংশে মার্কসের মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। অভিজ্ঞ মার্কস-জিজ্ঞাসুরা (সমাজতান্ত্রিক দেশেরও) অনেকেই আজ স্বীকার করছেন যে মার্কস যে শুধু অর্থনীতিবিদ, শ্রমিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক তাই নন, মার্কস নীতিবিদ ও মানবিক দার্শনিকও বটে। মার্কসের দার্শনিক ও সাহিত্যশিল্পবিষয়ক রচনা পাঠ করলে স্বীকার করতে হয় যে তিনি ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের ও জার্মানির 'এনলাইটেনমেণ্টে'র উত্তরসাধক। জার্মানির ক্লাসিকাল আইডিয়ালিজমের উত্তরাধিকার বহন ক'রেই যে মার্কসীয় সাম্যবাদের বিকাশ, দর্শনের ক্ষেত্রে মার্কস যে প্রবুদ্ধ মানবিকতার সংগ্রামী দার্শনিক এ-সত্যও আজ স্ব-প্রকাশ। স্তালিন আমল পর্যন্ত শোনা গেছে যে মার্কস সামূহিকতার দার্শনিক, ব্যক্তিত্বের শিশির-বিন্দু সমাজরূপী কিম্বা রাষ্ট্ররূপী মহাসমুদ্রে বিলীন না হলেই নাকি 'মহতি বিনষ্টিঃ'। স্তালিনোত্তর যুগে মার্কস নবরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশসহ অনেক দেশের ভাবুকেরাই অধুনা বলছেন: 'মার্কস ব্যক্তিমানুষের দার্শনিক।' এই যুগে মার্কস চর্চার নতুন জোয়ারও এসেছে। জার্মানির ক্লাসিকাল দর্শন হ'তে কোন্ সূত্র অবলম্বন ক'রে মার্কসীয় সাম্যবাদের আবির্ভাব এই প্রশ্নও নতুন ক'রে আলোচিত হচ্ছে। অধুনা অনেক ভাবুক এ-ও বলেছেন যে, মার্কসবাদের মধ্যমণি

'বিযুক্তি' (alienation) তত্ত্ব। এবং এই তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিচার না হলে মার্কস-বাদ জিজ্ঞাসা অসমাপ্তই থেকে যাবে।

২

'বিযুক্তি' (alienation) এবং 'বিচ্ছিন্নতা' (estrangement)—এই দুটি পদ সমাজবিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকেরা আজকাল প্রায়শই ব্যবহার করছেন। আধুনিক সমাজে মানুষ বৃন্তচ্যুত। ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই, প্রকৃতির সঙ্গে নেই যোগাযোগ। সমাজের সঙ্গে সাধারণীকৃতিও তার নেই। সমকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্য, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা—সবেরই অন্যতম বিষয় শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যাপকভাবে বলা চলে 'alienation'।

কী সে চায়, মানুষ নিজেই তা জানে না। অথচ ক্যাপার মতো সে পরশপাথর খুঁজে বেড়াচ্ছে। জীবনবিমুখতা, অস্থিরতা, আত্মিকবোধহীনতা মানুষকে আজ নৈরাশ্যপীড়িত ক'রে তুলেছে। নীটশের ভাষায় মানুষের জগতে ঈশ্বর আজ মৃত। ফলে জগত আজ উন্মুক্ত, প্রকাশিত, ভাগবত সুষমা বঞ্চিত। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভবের দিক থেকে জগত পুরোপুরি নিরপেক্ষ। অনির্বচনীয়তার মায়াঞ্জনমুক্ত জগতের সঙ্গে মানুষ কাজের সম্পর্ক স্থাপন করেছে, প্রকৃতিকে অনাবৃত ক'রে বৈষয়িক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহারও করেছে। কিন্তু গ্রীক আমলে কিম্বা রেনেসাঁসের যুগে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে আত্মিক যোগ ছিল সেই যোগ আজ ছিন্ন। সব মিলিয়ে মানুষ যেন আজ জগতে পরবাসীর মতো। মানুষ আজ আত্মচ্যুত, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, একাকী—self-alienated। Karl Jaspers, Sartre, Merleau-Ponty, Begot, Rubel ও অন্যান্য খ্যাতিমান ইয়োরোপীয় ভাবুকেরা মানুষের 'অ্যালিয়েনেশন'-এর সমস্যাটিকে মানবজীবনের মূল সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্তালিনোত্তর যুগে সমাজতান্ত্রিক দেশে যখন নতুন জিজ্ঞাসা এবং কিঞ্চিৎ চিত্তমুক্তির সুযোগ দেখা দিয়েছিল তখন সে-সব দেশেও দেখা গিয়েছিল 'অ্যালিয়েনেশন'-সমস্যা নিয়ে মুখর বাদানুবাদ। পোলাণ্ডের দার্শনিক Adam Schaff তো নতুন আবহাওয়ায় লিখলেন '*A Philosophy of Man*', বললেন যে এতাবৎকাল মার্কসবাদ কতগুলি প্রত্যয়ের দাসত্ব করেছে, মানুষকে রেখেছে নেপথ্যে, অথচ মার্কসবাদ আসলে ব্যক্তিমানুষেরই দর্শন। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যে হাংগেরির দার্শনিক Georg Lukács ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন যে 'অ্যালিয়েনেশন' মার্কস-বাদেরও অন্তরঙ্গ অংশ। 'অ্যালিয়েনেশন'-এর মাধ্যমেই মার্কসবাদের সঙ্গে জার্মানির ক্লাসিকাল দর্শনের যোগাযোগ এবং এই তত্ত্বটির সম্যক উপলব্ধি না হলে মার্কসের পুঁজিবাদের সমালোচনার সারমর্ম অনুধাবন করা যায় না। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসের ধারণা বিশ্লেষণ করতে হলেও 'অ্যালিয়েনেশন' তত্ত্বটির বিচার প্রয়োজন।

আমাদের এই তাপ-পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক যুগে এ-বিচার নতুন দাবি নিয়ে আজ উপস্থিত। এ যুগে তাপ-পারমাণবিক প্রলয়ের বিপদ মানুষের মাথার উপর ঝুলছে। যন্ত্রনির্ভর, শিল্পায়িত গণসমাজে ব্যক্তিমানুষ ক্রমশই যাচ্ছে নেপথ্যে। রাষ্ট্রনায়কতা, পার্টি-নায়কতা, সামূহিকতা ও আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে ব্যক্তি-মানুষ আজ নিরাকার ব্রহ্মের মতো ক্রমশই হয়ে উঠছে নামগোত্রহীন, মুখাবয়ব-হীন, গাণিতিক অ্যাবস্ট্র্যাকশন। তাই এই যুগে মানুষের সমস্যা, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সভ্যতার সম্পদগুলি বাঁচান ও তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলার প্রশ্নগুলি এখন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এই প্রশ্নগুলি যে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও বর্তমান, মানুষের স্বাধিকারলাভের সমস্যা যে ঐ সমাজে এখনও প্রকট, সমকালীন ইতিহাসের ছাত্রের সে-কথা জানা আছে।

মার্কস তরুণ বয়সে মানুষের স্বাধীনতার সমস্যার মুখোমুখি হন, 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বটির স্বরূপ ও প্রকারভেদ, অ্যালিয়েনেশনের নিরাকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেই আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস রাজনীতির সমালোচনা, অর্থনীতির সমালোচনা ক'রে আত্মচ্যুতিমুক্ত দ্যুতিময় ব্যক্তিমানুষের চিন্ময় মূর্তিকে তুলে ধরেন। আজও মানুষের সমস্যা, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্নগুলি কোনো সমাজেই অপ্রাসঙ্গিক নয়, তাতে সন্দেহ নেই।

৩

তরুণ মার্কসের কিছু লেখা সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়ায় মার্কসবাদের নতুন মূল্যায়নের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য এই নতুন মূল্যায়ন দুটি বাধার সম্মুখীন। সরকারি মার্কসবাদীরা তরুণ মার্কসের লেখায় শ্রেণীসংগ্রাম ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশ্লেষণ কম থাকায় এই সব লেখাকে 'অর্বাচীন' আখ্যা দিয়ে হেয় করতে চান। তাঁদের মতে শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্ব ও আর্থনীতিক শোষণতত্ত্বই মার্কসবাদের সারাৎসার, 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্ব নয়। অন্যদিকে অনেক ভাবুক 'অ্যালিয়েনেশন'-কে মার্কসবাদের তত্ত্বচিন্তামণি আখ্যা দিয়ে শোষণতত্ত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বকে গৌণ মনে করেন। মার্কস-মানসের অখণ্ডতা ও ঐক্য স্বীকার ক'রে এ-কথা বলা চলে যে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা 'অ্যালিয়েনেশন'-তত্ত্বেরই বিস্তার শোষণতত্ত্বে এবং শোষণহীন সমাজরূপায়ণের সাধন হিসাবেই শ্রেণীসংগ্রামতত্ত্বের স্বীকৃতি।

তরুণ মার্কস একদিকে যেমন হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবাধীন ছিলেন তেমনি ফয়েরবাখের কাছেও তাঁর ঋণ সামান্য নয়। *Phenomenology*-তে হেগেল মানুষের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্পর্কে যে-ধারণা তুলে ধরেন সেই ধারণার প্রশংসা করেছেন মার্কস। হেগেল বলেছেন যে ইতিহাসের ধারাপথে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি ক'রে চলে, আর এই সৃষ্টির সঞ্চালকশক্তি হল মানুষের শ্রম। অর্থাৎ সমাজবদ্ধ

মানুষের কর্মধারা ইতিহাসের সঞ্চালকশক্তি হিসাবে কাজ করে, আর এই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে মানুষ নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়। মার্কসের ভাষায় :

> 'The outstanding thing in Hegel's phenomenology is that Hegel grasps self-creation of man as a process, regards objectification as...alienation and as transcendence of this alienation ; and that he therefore grasps the nature of *labour* and conceives the object man...as the result of his own *labour*.'

হেগেল-দর্শন সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও মার্কস বলছেন যে হেগেল 'শ্রম'-কে শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের (pure spirit) আত্মচ্যুত অবস্থা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। হেগেলের মতে ইতিহাসের প্রবাহে নির্বিশেষ প্রত্যয়েরই (abstract categories) শুধু সংঘাত। ব্যক্তিমানুষ এই প্রত্যয়ের শুধুই ছায়া। হেগেল রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনীতিক অ্যালিয়েনেশন-এর স্বরূপ বুঝেছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনের পটভূমিতে। ফলে হেগেল-দর্শনে শুদ্ধচিন্তার লোকোত্তর স্তরেই অ্যালিয়েনেশন-এর বিস্তার।

> 'The phenomenology is a concealed, unclear and mystifying criticism, but so far as it grasps the alienation of man... all the elements of criticism are contained in it, and are often presented and worked out in a manner which goes far beyond in Hegel's own point of view.'

অ্যালিয়েনেশন-এর নিবৃত্তি কেমন ক'রে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রসঙ্গে হেগেল চলে গেছেন বিমূর্ত চিন্তার স্তরে। সামাজিক সংস্থাগুলির (institutions) সঙ্গে অ্যালিয়েনেশনের যে অন্তরঙ্গ যোগ হেগেল তা স্বীকার করেন নি। ফলে হেগেলের দর্শনে পরিবার কিম্বা সমাজ, রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থাগুলি যে যেমনটি আছে ঠিক সেইভাবেই গৃহীত হয়েছে। হেগেল-দর্শনে পুনর্গঠনের (reconstruction) প্রস্তাব আছে, কিন্তু তার পরিসর কল্পলোকেই সীমিত। মার্কস বলছেন যে অ্যালিয়েনেশন-নিবৃত্তির জন্য বাস্তব পুনর্গঠন চাই। মানুষ যেহেতু বায়ুভুক, নিরালম্ব, নিরাশ্রয় নয় সমাজবদ্ধ জীব, সেজন্য সমাজ-রূপান্তর না হলে অ্যালিয়েনেশন-নিবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে না। সমাজের মানবিক পুনর্গঠন হলে তবেই মানুষের স্বকীয় গুণাবলির প্রাপ্য-প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরি হবে, সৃষ্টি হবে নতুন নৈতিকতার পরিবেশ। ফয়েরবাখের সমালোচনা ক'রে মার্কস বলেছেন যে ফয়েরবাখ শুধু ধর্মীয় চ্যুতি (alienation)-র পর্যালোচনা করেছেন। হেগেল-দর্শনে ছিল 'alienation of Idea'—অর্থাৎ ব্রহ্মের উৎসর্জনতত্ত্ব। ফয়েরবাখ নতুন পথ পরিক্রমা ক'রে উপনীত হলেন 'alienation of man'—অর্থাৎ মানুষের আত্মচ্যুতিতত্ত্বে, অবশ্য ধর্মচেতনার পরিমণ্ডলে।

কিন্তু কোন্ অবস্থায় মানুষ স্বকীয় ক্ষমতা অন্য বস্তুতে আরোপ ক'রে, মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের কামনা-বাসনা, আবেগ-আকুতিকে চরিতার্থ করবার মানসে কল্পিত ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হয়, সেই 'সামাজিক কারণানুসন্ধান' ফয়েরবাখের দর্শনে নেই। '১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপি', 'দি হোলি ফ্যামিলি' (১৮৪৫), 'দি থিসিস অন ফয়েরবাখ্' (১৮৪৫) ও 'জার্মান ইডিওলজি' (১৮৪৬)—এই চারটি পুস্তকে মার্কস ইতিহাসের দর্শন ও সমাজবিকাশের এক নতুন তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেন সমাজ-নির্ভর অ্যালিয়েনেশন-প্রত্যয়ের সাহায্যে। হেগেলের কাছ থেকে মার্কস শিখলেন যে মানুষ নিজেকে ও নিজের জগতকে সৃষ্টি করে ব্যাবহারিক ঐতিহাসিক কর্মের মাধ্যমে। এই কর্মের প্রভাবে মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, একই সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে।

> 'Since for socialist man the whole of what is called world history is nothing but the creation of man by human labour and the emergence of nature for man, he therefore has the evident and irrefutable proof of his *self-creation*, of his own origins.'

ফয়েরবাখের কাছ থেকে মার্কস শিখলেন যে নৃতত্ত্ব ইতিহাসের চাবিকাঠি। কিন্তু ফয়েরবাখের নিত্য সনাতন মনুষ্য-স্বরূপের (human essence) তত্ত্ব মার্কসের মতে ভ্রান্ত। মার্কস বললেন যে মানুষকে দেখতে হবে ইতিহাসের পটভূমিতে। মানুষ নিজেকে কিভাবে সৃষ্টি করবে তা নির্ভর করছে বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের উপর। এই শক্তিগুলির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে 'মানুষের শক্তি', অন্যদিকে তেমনি আছে মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার সমবায়ে গঠিত পরিবেশ। মার্কস যে সমাজের 'ক্রিটিক' হলেন তার হেতু এই যে, মার্কসের মতে সমাজ মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে পারে নি। সমাজজীবনেই মানুষ মনুষ্য-নামধেয় জীব হয়ে ওঠে একথা সত্য, তবুও সমাজই আবার মানুষের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, মানুষকে এমন অবস্থায় বন্দী ক'রে রাখে যা নিতান্তই অমানবিক। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যেহেতু দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধ সেই হেতু মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা সমাজ-এর রথচক্রের তলায় নিষ্পিষ্টও হতে পারে।

মার্কস মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে না রেখে মানুষকে বসালেন জগতের কেন্দ্রে, স্বীকার করলেন যে মানুষের শ্রমই জগৎ-ক্রিয়ার মূল শক্তি। ফলে ভাববাদীদের মতো তাঁকে বলতে হল না যে মানুষ কর্মের দ্বারা, সামাজিক শ্রমের দ্বারা বদ্ধ। 'মানুষের শ্রম' শুধু তো অর্থনীতির প্রত্যয় নয়, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের সচেতন কর্মধারার সঙ্গে এই শ্রমেরই আত্যন্তিক যোগাযোগ। মানুষ যে তার সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত ক'রে বিশ্বানুগ (universal)

হয়ে উঠতে পারে সে-ও এই শ্রমেরই মাধ্যমে। ফলে সামাজিক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে মানুষকে দূরে বসিয়ে তাকে কল্পলোকে খুব একটা বড়ো পদ দিয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করবার দায় অন্তত মার্কসের নেই। সামাজিক শ্রমের মধ্য দিয়েই মানুষ নিত্যনবরূপে প্রকাশ পায়, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বাধিকার লাভ করে, সমাজকে পুনর্গঠিত করে নিজের প্রয়োজন অনুসারে। এই শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ মুক্তি লাভ করে, স্বাধীনতার আস্বাদ পায়।

সংবাদপত্রের 'স্বাধীনতা'র উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে স্বাধীনতা মানুষের স্বরূপলক্ষণ, আগন্তুক ধর্ম নয় 'Freedom is so much the essence of man that its very enemies realise it in struggling against its reality. No man fights against freedom ; at most he fights against the freedom of others।' আর এই 'স্বাধীনতা' হবে খাঁটি যদি তা সর্বজনে প্রসারিত হয়, যদি মানুষ ব্যক্তিসত্তার মুকুরে মানবসত্যকে (potentialities inherent in the species) প্রতিফলিত করতে পারে। দেখা যাবে এই সব বক্তব্যে জার্মানির ক্লাসিকাল ভাববাদী দর্শনের ধারা, অন্যদিকে ফয়েরবাখের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদী চিন্তাধারা মার্কস-ভাবনায় প্রভাব রেখেছে। অবশ্য জার্মান দর্শনের ভাববস্তুকে মার্কস মর্ত্যের মাটিতে প্রোথিত করেছেন, আর ফয়েরবাখের দর্শনকে বেঁধেছেন ইতিহাসের বাঁধনে।

৪

The Shorter Oxford Dictionary 'অ্যালিয়েনেশন' পদটির অর্থ করেছে : ক. the action of estranging or state of estrangement ; খ. the action of transferring ownership to another ; গ. diversion of anything to a different purpose ; ঘ. the state of being alienated ; ঙ. loss or derangement of mental faculties ; insanity। ইয়োরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় 'অ্যালিয়েনেশন' পদটি অপ্রকৃতিস্থ কিংবা উন্মাদ ব্যক্তিকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যায়। গত শতাব্দীতে হেগেল ও মার্কস পদটি ব্যবহার করেছেন অন্য অর্থে। আত্মচ্যুত ব্যক্তি হয়তো অপ্রকৃতিস্থ নয়, ব্যাবহারিক জীবনে হয়তো সে স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে, কিন্তু নানা-ভাবে সে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশেহারা। মার্কস অ্যালিয়েনেশন-কে বোঝাতে গিয়ে বলছেন যে আত্মচ্যুতি হল মানুষের এমন অবস্থা যখন তার নিজের ক্রিয়াকলাপ অনাত্মীয় শক্তি হয়ে ওঠে, তাকে ছাপিয়ে ওঠে, মানুষের শাসনে না থেকে মানুষকেই গৌণ ক'রে ফেলে। 'অ্যালিয়েনেশন' এমন এক অবস্থা 'where his own act becomes to him an alien power, standing over and against him, instead of being ruled by him।' এই বিশেষ অর্থে যদিও অধুনা পদটির

বহুল ব্যবহার, তবুও ধর্মশাস্ত্রে পদটি বহুদিন ধরেই প্রচলিত। একেশ্বরবাদীরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন এ-জন্য নয় যে ঈশ্বর 'এক' অতএব বহুদেবতাবাদ ভ্রান্ত। তাঁদের আপত্তিটা এইখানে যে পৌত্তলিকতায় মানুষের আত্মচ্যুতি ঘটে, নিজের শক্তি ও শিল্পক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে মানুষই দেবমূর্তি গড়ে, অথচ ঐ মূর্তির পায়ে মাথা লুটিয়ে দেয় মানুষ ; এ-কথা বোঝে না যে মানুষই স্রষ্টা এবং ঐ দেবমূর্তি মানুষেরই সৃষ্ট। যেখানেই স্রষ্টা মানুষ, কর্মী মানুষ, ভাবুক মানুষ নিজের জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার কথা ভুলে নিজেকে দীনহীন বলে ভাবে, নিজেকে বিলিয়ে দেয় দেবতার পায়ে, সে-দেবতা লোকোত্তর বা লৌকিক যা-ই হোক না কেন, নিজের সৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সৃষ্টবস্তুর দাস হয়ে পড়ে, সেখানেই দেখা যায় আত্মচ্যুতির অবস্থা।

মার্কস শ্রেণীবিন্যস্ত সম্পত্তিনির্ভর সমাজে অ্যালিয়েনেশন যে সর্বব্যাপী এ-সত্যকে বুঝতে পেরেছেন, বিশেষত আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে। যাঁরা বলেন যে মার্কসের অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্ব শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রযোজ্য তাঁরা ইচ্ছা করেই মার্কসবাদকে বিকৃত করেন। কেননা মার্কসের বিশ্বদর্শনে মানুষের সমগ্র ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ইতিহাস বিধৃত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানপতন, তার অন্তর্লীন নিয়মের বিশ্লেষণে মার্কস জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন একথা সত্য। তার কারণ মার্কস পুঁজিবাদের ফলশ্রুতি প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রবহমান ইতিহাসে পুঁজিবাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্ব শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মধ্যে সীমিত নয় *Economic & Philosophic Manuscripts* ও তরুণ মার্কসের অন্যান্য লেখায় একথা স্পষ্ট। অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্ব আরও অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে এবং এই তত্ত্বটির অনুশীলন ক'রে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে সমাজের, মানুষের নিজস্ব স্ববিরোধিতা প্রসঙ্গে মার্কসের বক্তব্য তুলে ধরা সম্ভব। সরকারি মার্কসবাদীরা অধুনা বিপাকে পড়ে অ্যালিয়েনেশন-তত্ত্বটি বর্জন করতে পারছেন না। তবুও এই তত্ত্বটিকে শুধুমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ক'রে দেখিয়ে তাঁরা মার্কসবাদকে সংকুচিত ক'রে রেখেছেন।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হেগেল ও ফয়েরবাখ অ্যালিয়েনেশন-এর প্রশ্ন তুলেছেন। একজন ব্রহ্মবাদের অঙ্গ হিসাবে, অপরজন নৃতাত্ত্বিক দর্শনের পটভূমিতে। মার্কস হেগেলের 'alienation of Idea'-কে বর্জন করেছেন। ফয়েরবাখের 'alienation of man'-কে অনেক গভীরে নিয়ে গেছেন।

পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ হ'তে মানুষের পার্থক্য কোথায় ? জীবধর্মের দিক থেকে, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার ক'রে শংকরাচার্য

তো বলেছিলেন মানুষ পশুর চাইতে খুব একটা আলাদা নয় (পশ্চাদিভিঃ চ অবিশেষাৎ)। মার্কস বলছেন মানুষের বিশেষত্ব অন্যত্র। ক্রমবিকাশের ধারা-পথে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে প্রকৃতিকে পাল্টাতে। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঐক্যের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সূত্রপাত হয়, শ্রম-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতির জগতকে পরিবর্তিত করে। একদিক থেকে মানুষ শ্রমেরই ঐতিহাসিক ফল। সামাজিক উৎপাদনের ধারাপথে মানুষ প্রকৃতিকে নিত্যনবরূপে অভিষিক্ত করে এবং এই কাজে মানুষ সাহায্য পায় স্বকীয় একটি বিশেষ ক্ষমতা থেকে। এই ক্ষমতাটি হল বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি, যেটি মনুষ্যেতর প্রাণীর নেই। 'ক্যাপিটাল'-এ মার্কস তাই বলেছেন 'What distinguishes the worst architect from the best of bees is this, that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. At the end of every labour process, we get a result that already existed in the imagination of the labourer at its commencement. He not only effects a change of form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives the law to his *modus operandi*.' মানুষ যে মৌমাছি নয়, কীটপতঙ্গ নয়, অশিক্ষিতপটু জন্তু থেকেও যে মানুষ আলাদা, মানুষের যে স্বকীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা আছে, 'আছে'-র জগত থেকে 'উচিত'-এর, 'ইষ্ট'-এর জগতের দিকে অগ্রসর হবার প্রেরণা আছে, মার্কস বহু লেখায় এ-কথা বলেছেন। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অবশ্য কাজ করে অনেক সময়, সে-কাজ প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত। সে-কাজ তাই নেহাৎ-ই একপেশে, সংকীর্ণ। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী হ'তে মানুষ স্বতন্ত্র এইখানে যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি, কর্মশক্তি—যখন বাধামুক্ত হয়ে প্রয়োজনের সীমার বাইরে সৃষ্টি করে তখনই মানবসৃষ্টি সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয় (man produces universally)। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদই মানবধর্মের বৈশিষ্ট্য। চেতনার প্রাচুর্য, উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা মানুষের বেলায় অভি-ব্যক্তির পথ খোঁজে। মানুষ সুন্দরের সাধনা করে, প্রকৃতি ও জীবনকে মনের মাধুরী মিশিয়ে মনোহররূপে সৃষ্টি করে (creates according to the laws of beauty)। শিল্পে ও সাহিত্যে বিশেষ ক'রে প্রকাশ করে তার 'মানবিক' স্বরূপকে, যে-স্বরূপ স্রষ্টা এবং সুন্দর। বিষয়কে রূপকলার মাধ্যমে সুন্দর আকৃতি দেয় মানুষ এবং মানুষের সৃষ্ট কর্মই শুধু সর্বমানবে এবং সর্বকালে প্রসারিত হয়, মানুষ সেইভাবেই বিশ্বানুগ হয়ে ওঠে। মার্কস এ-সব কথাই বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন।

'To be sure animals also produce. They build nests, dwellings etc. like the bees, beavers, ants, and others. But they only produce for their own or their offsprings' immediate needs ; they produce one-sidedly, *while man produces universally* ; they produce under the domination of immediate physical needs, while man produces independently of physical needs and really produces when free of these needs. They produce only for themselves while man reprodúces all nature ; their product belongs directly to their physical body ; while man *freely* faces his product. Animals create only according to the measure and need of the species while man can produce according to the measure of every species and can everywhere supply the inherent measure of the object. *Hence man also creates* according to the laws of beauty।'

'বিষয়'-এর তথা সৃষ্টবস্তুর দাস নয় মানুষ, কেননা মানুষ বিষয়কে চেতনাসম্পদের সাহায্যে স্বাধীনভাবে রূপের বাঁধনে আনে (freely faces his product)— অপ্রয়োজনের ফসল হিসাবে 'সুন্দর'কে সৃষ্টি করে মানুষ (man creates according to the laws of beauty) – এই সব নানা ভাষায়, নানাভাবে স্রষ্টামানুষের প্রশস্তি গেয়েছেন মার্কস। মানুষ যে সামাজিক জীব, সমাজ-আশ্রয়েই যে মানুষ 'সামাজিক' ও 'মানবিক' হয়ে ওঠে একথা মার্কস অবশ্যই স্বীকার করেছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ যে শুধু অ্যাবস্ট্রাকশন, সামাজিক সম্পর্কের তন্তুজালে অবস্থিত (ensemble of social relations) মানুষই যে 'ঐতিহাসিক মানুষ', এ বক্তব্যও মার্কসের। কিন্তু মার্কসবাদ কুত্রাপি একথা বলে নি যে সমগ্রের মহাসমুদ্রে ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু শুধুই বুদ্বুদের মতো, মায়ায় ঘেরা, অযথার্থ। বলে নি যে 'মানুষ-কর্মী' মৌমাছির মতো, সমগ্রের প্রয়োজনে কাজ করা ও প্রজাতিকে (species) বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই যার চরিতার্থতা। মার্কস বরং বলেছেন যে, স্রষ্টা মানুষের কাজ শুধুই প্রয়োজনের শিকলে বাঁধা নয়। মানুষের কাজের, বিশেষত ভাবকর্মের আছে সর্বকালীন বিস্তার। প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ সুন্দরের সাধনা ক'রে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে শ্রেয়কে পাবার জন্য সচেষ্ট হয়। মানবাত্মাকে মার্কস বহুতন্ত্রী বীণা হিসাবেই দেখেছেন, আত্মার ভাস্বর সূর্যকিরণ ব্যক্তির ও বস্তুর বিচিত্র প্রকাশ-ধর্মিতায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে দেখে উৎফুল্ল হয়েছেন। যখনই দেখেছেন যে নানাভাবে এই বহুতন্ত্রী বীণাকে দীনহীন একতারায় পরিণত করবার চেষ্টার অন্ত নেই, তখনই মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

৬

মানুষের সঙ্গে মৌমাছির যে-পার্থক্য মার্কস করেছেন তার তাৎপর্য কী? মৌমাছিতন্ত্র ও মানবধর্ম যে আলাদা, মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত করতে হলে যে মানুষের উদ্দেশ্যকে, চিন্তাভাবনাকে ও শ্রেয়োবোধকে বুঝতে হবে—এ-কথাই মার্কস বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষকে যদি খণ্ডিত ক'রে দেখি, ভাবি যে মানুষ শুধুই টেকনিক্যাল মানুষ, আর্থনীতিক মানুষ, লোভী মানুষ, মানুষকে যদি মানবীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে দেখি তবে, মার্কসের মতে, মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন করা যাবে না।

মার্কস আত্মচ্যুতি ও আত্ম-আবিষ্কারের পটভূমিকায় প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের প্রশ্ন তুলেছেন। জীবনচর্চার সকল ক্ষেত্রে মানুষ যে মহিমময় হয়ে উঠতে পারে নি, আজও জ্ঞানে, কর্মে, স্নেহপ্রেমপ্রীতিতে, সুন্দরের সাধনায় সার্থকতা লাভ করতে সক্ষম হয় নি, আশু প্রয়োজনের বৃত্তে ঘুরে ঘুরেই জীবনপাত করছে, তার মূল কারণ হিসাবে অ্যালিয়েনেশন-কে চিহ্নিত করেছেন মার্কস। মার্কস দেখেছেন যে, শ্রমবিভক্ত, অর্থলোলুপ, সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজে মনুষ্যত্ব সীমা ও তুচ্ছতার বাঁধনে পীড়িত ও অবমানিত। সৌন্দর্যের প্রকাশ নেই এই সমাজে। সামাজিক কর্মে (সে-কর্ম অর্থনৈতিক উৎপাদন হোক, কিম্বা সাংস্কৃতিক সৃষ্টিই হোক) আজ যদিও বিশ্বানুগ হয়ে ওঠার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তবু এই সম্পত্তিনির্ভর সমাজে দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, অহংমমাভিমান, মালিকানা প্রভৃতির প্রভাবে জীব ব্যক্তিসীমায় সীমিত। মানবজীবনের প্রকাশধর্মিতার আসল রূপ প্রয়োজনাতীত প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে। কিন্তু সমাজে সে-রূপ নেই। আধুনিক সমাজে পুঁজি মহারাজ (My Lord Capital) লোভের মোহে বাঁধা, আর শ্রমজীবী সাধারণ শ্রমবিভাগ ও শোষণের শিকলে বাঁধা। এই অসুন্দর যন্ত্রপুরীর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস আবেগমুখর ভাষায়: 'Private property has made us so stupid and onesided that an object is only ours when we have it, when it exists for us as capital or when we possess it ditectly, eat it, drink it, wear it out on our body, live in it, in short use it···For all the physical and spiritual senses, therefore, the sense of *having*···has been substituted।'

কি দাস-সমাজে, কি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, কি পুঁজিবাদী সমাজে, সর্বত্রই মার্কস অ্যালিয়েনেশনের প্রকাশ দেখেছেন। 'পাণ্ডুলিপি'তে মার্কস সম্পত্তি-নির্ভর, পণ্য উৎপাদনকারী সমাজের বিশ্লেষণ করেছেন গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে। এ-সমাজে স্ববিরোধিতা খুবই স্পষ্ট। শ্রমিক যত বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করে ততই তার জীবনধারণের গ্লানি বৃদ্ধি পায়। পুঁজিপতিরা যতই প্রতিযোগিতার নামে

ততই বেশিসংখ্যক পুঁজিপতির বরাতে সর্বনাশ নেমে আসে। 'The more riches the worker produces, the more his production increases in power and scope, the poorer he becomes. The more commodities a worker produces, the cheaper a commodity becomes. The devaluation of the world of men proceeds in direct proportion to the exploitation of the world of things. Lobour not only produces commodities, but it turns itself and the worker into commodities and does so in proportion to the extent that is produces commodities in general।' মার্কস বলছেন যে এটাই হল অর্থনীতির সারাৎসার। আর আমরা যে অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত সেই অর্থনীতির মৌলিক বস্তুই হল অ্যালিয়েনেশন। অ্যালিয়েনেশন আছে বলেই শ্রমজীবী মানুষ যত বেশি উৎপাদন করে ততই তার নিজের উপভোগের পরিমাণ কমে, যত বেশি সে মূল্যসৃষ্টি করে ততই তার নিজের মূল্যহীনতা প্রকট হয়, তার সৃষ্টবস্তু যত সুন্দর হয়ে ওঠে, ততই সে আকার-প্রকারহীন বস্তুতে পরিণত হয়। 'The more the worker produces, the less he has to consume, the more values he creates, the less value – the less diginity – he himself has ; the better-shaped the product, the more misshapen the worker, the more civilised his product, the more barbaric the worker. Thus, labour produces wonders for the rich, but strips the worker···It produces culture, but idiocy, cretinism for the worker।'

শিল্পায়িত যন্ত্রনির্ভর শ্রমবিভক্ত সমাজের কার্য-পরিস্থিতি (work-situation) দেখে মার্কস চার প্রকারের অ্যালিয়েনেশনের কথা তুলেছেন ক. ক্রিয়াকাণ্ড থেকে অ্যালিয়েনেশন (alienation from the process of work) ; খ. সৃষ্ট বস্তু হতে অ্যালিয়েনেশন (alienation from the products of work) ; গ. নিজের মানবিক স্বরূপ হতে অ্যালিয়েনেশন (alienation of the worker from himself) এবং ঘ. অপর মানুষ হতে অ্যালিয়েনেশন (alienation of the worker from others) ।

মার্কসের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যাক

> 'What, then, constitutes the alienation of labour ? Firstly, in the fact that labour is *external* to the worker i.e., it does not belong to his essential being, in the fact that he therefore does not affirm himself in his work, but negates himself in it, that he does not feel content, but unhappy in

it.... His work, therefore, is not voluntary but coerced ; it is *forced* labour. It is therefore, not the satisfaction of a need but only a *means* for satisfying needs external to it।' ...'The relation of the worker to the *product of labour* as an alien object exercising power over him।' 'The result, therefore is that man (the worker) no longer feels himself acting freely except in his animal functions, eating, drinking and procreating, while in his human functions he feels more and more like an animal. What is animal becomes human and what is human becomes animal।' 'Alienated labour therefore turns the *generic being of man*, both Nature and the intellectual wealth of his species, into a being alien to him,... It alienates his own body from man, it alienates from him both Nature outside him and his intellectual being, his *human* nature।' 'A direct consequence of the fact that man is alienated from the product of his labour, from his life-activity, from his generic being, is the *alienation of man from man*।'

উদ্ধৃতিগুলি শ্রমসংক্রান্ত এবং মার্কস কুত্রাপি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উল্লেখ করেন নি। কেননা মার্কস অ্যালিয়েনেশন-কে ঐতিহাসিক সমাজের সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, যদিও তাঁর মতে এই সমস্যা পূর্ণতা লাভ করে পুঁজিবাদী সমাজে। অ্যালিয়েনেশন-কে মার্কস এমন সর্বব্যাপী প্রত্যয় হিসাবে দেখেছেন যে তাঁর মতে পুঁজিপতিও অ্যালিয়েনেশনের দায়ভাগ বহন করে শ্রমিকের মতোই। পার্থক্য শুধু এইখানে যে শ্রমিক অ্যালিয়েনেশন-সঞ্জাত দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত, আর পুঁজিপতি দুঃখ সম্পর্কে সচেতন নয়। 'পবিত্র পরিবার'-এ মার্কস বলছেন :

'The propertied class and the class of the proletariat present the same human self-alienation. But the former class finds in this self-alienation its confirmation and its good, its *own power* ; it has in it a *semblance* of human existence. The class of the proletariat feels annihilated in its self-alienation ; it sees in it its own powerlessness and the reality of an inhuman existence।'

'জার্মান ইডিওলজি'-তে মার্কস বলছেন যে অ্যালিয়েনেশনের উৎস শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ হতেই 'অ্যালিয়েনেশন' এবং 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' উভয়েরই

আবির্ভাব। স্থূল কমিউনিজমের সমালোচনা ক'রে মার্কস বলেছেন যে এই মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রত্যয়কে অতিক্রম ক'রে অ্যালিয়েনেশনের স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। ফলে এই মতবাদে বিভ্রম থেকে গেছে। এই মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁরা ভেবেছেন যে অর্থনীতির স্ববিরোধিতা দূর করবার উপায় শুধু একটি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাকরণ ক'রে সামাজিক সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা হলেই ইষ্টলাভ, এই অতিসরলীকৃত সূত্রের প্রভাব এই মতবাদে প্রত্যক্ষ। অথচ মার্কসের মতে অ্যালিয়েনেশনের নিবৃত্তি যদি না ঘটে এবং এই নিবৃত্তির ফলশ্রুতি হিসাবেই শুধু সম্পত্তি-প্রত্যয়ের দাসত্ব পরিহার করা যদি না যায়, তবে শ্রম স্বধর্মে সংস্থিত হবে না।

> 'On the one hand communism is so much under the sway of *material* property, that it wants to destroy everything which cannot be owned by everybody as *private property* : on the otherhand, it regards direct physical ownership as the only aim of life and existence।' 'How little this annulment of private property is really an appropriation is in fact proved by the abstract negation of the entire world of culture and civilisation, the regression to the *unnatural* simplicity of the *poor and undemanding man* who has not only failed to go beyond private property, but has not yet even attuned to it।'

মার্কস ভেবেছেন যে প্রকৃত সাম্যবাদে আত্মচ্যুতির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটবে, মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে মানবধর্মে। শ্রমবিভাগ বহাল রইল, মানুষের সত্তা খণ্ডিত হয়ে রইল মূল্যবয়বহীন গণসমাজে, রাষ্ট্রনায়কতা, ধর্মনায়কতা, আমলাতন্ত্রের শাসনাধীন হয়ে রইল মানুষ, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সাযুজ্য সংসাধিত হল না, ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে মানবিক মানুষের ব্যবধান স্থায়ী হল, এমন অবস্থায় অ্যালিয়েনেশনের নিরাকরণ হবে কেমন ক'রে? মার্কস মনে করেছেন যে এই শ্রমবিভক্ত, অসুন্দর জগতের যূপকাষ্ঠে মনুষ্যস্বরূপ বলি হয়েছে। মানবিক প্রকৃতিকে আপন ক'রে নিয়ে আনন্দ ও সৌন্দর্যোপলব্ধির পথে আজও মানুষ বিশ্বানুগ হয়ে উঠতে পারে নি। মার্কস ভেবেছেন যে শ্রমবিভাগের ও শোষণের অবসান হলে মানুষ স্বাধিকার পাবে, অধিষ্ঠিত হবে মানবধর্মে। বাহ্যজগত যে এক অর্থে মানুষেরই জগত, মানুষের জ্ঞান, কর্ম ও অনুভবশক্তির পরিসর অনুযায়ী এ-জগত যে তার বিশেষ রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে, মার্কস সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে মার্কস এ-কথাও জানতেন যে মানুষের জ্ঞান কর্ম ও অনুভব-শক্তির পরিসর আজও নেহাৎ-ই সংকীর্ণ – বিষয়বুদ্ধি, ক্ষমতালিপ্সা, লোভ ও নানাধরনের শোষণের

শৃঙ্খলে বাঁধা। আত্মচ্যুত জীবসত্তা মানবিক জীবনকর্মের মধ্য দিয়ে (human life activity) মনুষ্যত্বের আদর্শকে যতটা রূপায়িত করতে পারবে, নিজের মানবিক স্বরূপকে (individual social being) আবিষ্কার ক'রে বিশ্বজনীনতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে, ততই প্রগতির পথ হবে অবারিত। সেই বিশ্বজনীন পূর্ণতার সাধনাই মানুষের পরম ইষ্ট। মার্কস স্থূল সাম্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সামাজিক মালিকানা হলেই নতুন মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল এই শিশুভোলানো কাহিনীকে গ্রহণ করেন নি। 'পাণ্ডুলিপি'তে সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে তাই তিনি লিখেছেন যে আত্মচ্যুতির নিরাকরণ চাই, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-মানুষের প্রকাশ চাই, নচেৎ কমিউনিজম ব্যর্থ। তিনি চেয়েছেন যে-সাম্যবাদ তা মানবিকবাদের সঙ্গে অভিন্ন : 'Communism as the positive *transcendence* of private property. as human self-estrangement, and therefore as the real *appropriation of the human* essence by and for man ; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (i.e., human) being — a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development।' যতদিন শ্রমবিভাগ আছে সম্পত্তি-চেতনা আছে, স্রষ্টা মানুষের প্রকাশ নেই, যতদিন ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মে মানুষ বাঁধা থাকবে, পরবশ হয়ে থাকবে — হয় শিকারী, নয় ধীবর, নয় গোপালক, নয়তো তাত্ত্বিক সমালোচক হিসাবে খণ্ডিতভাবে যতদিন মানুষকে জীবনপাত করতে হবে, বুঝতে হবে মানুষ ততদিন স-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সাম্যবাদে স্বাভাবিক মানবিকবাদ পূর্ণতালাভ করবে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটবে : 'This communism is the consummated naturalism = humanism. the consummated humanism = naturalism, it is the genuine resolution of the conflict between man and Nature and between man and man — the true resolution of the strife between existence and true being।'

ব্যারোজ ডানহ্যাম

বস্তুতন্ত্রবাদ এমন এক তত্ত্ব যাতে দেখা ও দৃষ্ট হওয়া, জানা ও জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে অস্তিত্বকে আবশ্যিকভাবে যুক্ত ক'রে দেখা হয় না। আর দ্বন্দ্ববাদ এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে বলা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্তা-সমূহের রূপান্তর-প্রক্রিয়ার এক তন্ত্র, অংশসমূহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার এক গতিশীল অবস্থা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (মার্কসবাদ) জ্ঞানতত্ত্ব সুতরাং সেই মতবাদ যাতে বলা হয় সত্য (অর্থাৎ প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে বাক্যের সংগতি) এই নিয়মে নির্ধারিত হতে পারে 'যে-কোনো প্রস্তাবিত অবস্থাকে সমগ্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুক্ত ক'রে বা তার থেকে বিযুক্ত ক'রে পরীক্ষা করা, তা হলেই জানতে পারবে সেই বাক্য। প্রস্তাবিত অবস্থা সত্যিই সঠিক কিনা।' মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে কোনো বিশেষ শিক্ষাক্রমের প্রয়োজন নেই : একমাত্র নিয়ম হচ্ছে সততা ও স্পষ্টতার সাধারণ নিয়ম যা যে-কোনো বিষয়কেই তার যথার্থ আলোকে আমাদের চেনায়।

জ্ঞানতত্ত্বের লক্ষ একটি নিয়ম এবং সেই সূত্রে একটি পদ্ধতির উদ্ভাবন যার দ্বারা আমরা মিথ্যা থেকে সত্য বাক্যকে তফাৎ করতে পারি। তত্ত্বের সূত্রপাত হয় যেহেতু ভ্রান্তি-বিষয়ে আমরা সচেতন এবং তার গুরুত্ব আরো এই কারণে যে ভ্রান্তি বিপজ্জনক হতে পারে। মার্কসবাদ আজ পৃথিবীর একশো কোটি লোকের জীবনযাত্রার ছকটি জানায় বলেও মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) অতিরিক্ত

মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে

একটি আকর্ষণ আছে। আমার বিচারে এই নিবন্ধে আমায় দুটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে : কেউ যদি মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব পড়ায় তবে সে কী শেখাবে এবং যথাযথভাবে সেই তত্ত্ব শেখাতে সে কীভাবে এগোবে ? যেহেতু আমরা সবাই দার্শনিক এবং সে-কারণেই ভাষা বিষয়ে খুঁতখুঁতে, 'শিক্ষ' (to teach) ধাতুটির কিঞ্চিৎ ব্যর্থকতা নজরে রাখা ভালই হবে। একটি অর্থে লোকেদের প্রকরণ ও সংবাদাদি বিষয়ে অবহিত করা : এই অর্থে পদার্থবিদ্যা শেখানো হয়। অবশ্য আরো একটা অর্থ আছে যাতে 'প্রস্তাবনা'

(advocacy) বোঝায় – যখন বলি, 'তোমার মা তোমাকে ভাল হতে শিখিয়েছে।'

সমস্ত প্রস্তাবনারই যোগ বাছাইয়ের সঙ্গে এবং মানুষী সিদ্ধান্তের উপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকে। সম্ভবত যদিও লোকেদের প্রকরণ ও তথ্যাদি বিষয়ে অবহিত করাটা বাছাইয়ের সঙ্গে জড়িত, এই প্রক্রিয়া বাছাইকারীকে তথ্যাদির লক্ষ ও প্রকরণের ন্যায্যতা বিষয়ে চিন্তায় প্রচুর স্বাধীনতা দেয়। এ হল আচরণের ছিমছাম ধারা, স্বতঃই প্রশংসনীয় এবং দার্শনিকদের যথেষ্ট পছন্দসই। এটি অবশ্য তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারে; তবে সে যাই হোক, যারা পুরনো সমাজকে নতুন রূপ দিচ্ছে, তাদের মধ্যে এটা খুব একটা কিছু জোরালোভাবে উপস্থিত নেই। ফয়েরবাখের তাত্ত্বিক সূত্রসমূহের (*Theses on Feuerbach*) মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাতটিতে (১১ সংখ্যক) মার্কস বলেন: 'দার্শনিকরা জগতকে ব্যাখ্যা করেছে যদিও, কিন্তু মূল কথাটি হচ্ছে তাকে বদলে দেওয়া।'

মার্কসবাদের নাড়ি হল এই বাক্যটি যা তত্ত্ব ও প্রয়োগ, জ্ঞান ও সিদ্ধি, বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মিলন ঘোষণা করে। জ্ঞান তো নিছক জ্ঞান নয়: জ্ঞান বিবেচনারও বিষয়। আমাদের 'জানতে হয়' সুখী হবার জন্য বা অন্তত বাঁচার জন্য। আমাদের জানতে হয় – কখন এবং কেমন ক'রে আমরা জানি – নিছক জানারই ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী হবার জন্য। আমরা আশা করব যে জগতকে যখন জানতে পেরেছি, এবং জানছি যে আমরা জগতকে জেনেছি, তখন সমঝে উঠব যে যা আছে তা থেকে বিশ্ব আরো কত ভাল হতে পারে।

মধ্য-বিশের এই শতকে জগতকে জানা বিশেষ কিছু কঠিন নয়। কখন জানছি এবং কী জানছি জেনে বুঝছি বিশ্ব আরো কঠিনতর। প্যারাডক্স ন্যায় (logic)-কে ছেয়ে আছে। জ্ঞানতত্ত্বের পেছনে আছে পরাবিদ্যা (metaphysics) এবং পরাবিদ্যার পেছনে জ্ঞানতত্ত্ব। চক্রাকার যুক্তিকে (*petitio*) ছাপিয়ে স্পষ্টতম, সূক্ষ্মতম এবং সবচেয়ে জোরালো যুক্তি আপন ভিত্তিতেই ফিরে ফিরে আসছে। আমার বিশ্বাস বিষয়টা হচ্ছে এই যে জানার প্রতিটি ক্রিয়াই কোনো-না-কোনো সূত্র ভেঙে ঘটছে এবং শেষপর্যন্ত বিজ্ঞান আপন পদ্ধতির উপরেই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

জ্ঞানতত্ত্বের পেছনে আছে পরাবিদ্যা: অর্থাৎ নিজেদের জগতের সঙ্গে মানুষ যে-সম্পর্ক গড়ে, জ্ঞান তারই একটি। ফলে জ্ঞানের যে-কোনো ব্যাখ্যানই হল মানুষ, জগত ও সাধারণভাবে সম্পর্কের সম্পর্কেই ব্যাখ্যান। মার্কস-এঙ্গেলস 'পরাবিদ্যা' শব্দটি প্রত্যাখ্যান করেন, যার অর্থ তাঁদের কাছে ছিল নানাবিধ দুঃখজনক অলীক কল্পনার উৎস। কিন্তু আমি মনে করি ব্যুৎপত্তিগতভাবে এর অর্থ হচ্ছে – যা পদার্থবিদ্যার 'পরে' আসছে এবং এখনো শব্দটি কাজের; (শব্দটি) সাধারণীকৃত ধারণাসমূহের একটি গুচ্ছ, যারা সত্যিসত্যিই বেশি আকর্ষণীয়।

কার্যত, মার্কসীয়-পরাবিদ্যায় (যদি এই নাম দিতে পারি) ধারণাটা এই যে 'ভূ'

(to exist) ধাতুর এমন অর্থ নেই যা একে জুড়ে দেবে 'জানা' বা 'জানতে হবে'-র সঙ্গে। অল্প কথায়, মার্কসীয় মতে, 'অস্তিত্ব' (*esse*) 'প্রত্যক্ষীকৃত' (*percipi*) নয়, বা এমন কি 'প্রত্যক্ষীকরণ' (*percipere*) নয়, তা 'বোধন' (*cognoscer*) নয়, বা 'বোধ্য' (*cognitum*)-ও নয়, বা এমন কি কোনোক্রমে (আমার ধারণায় অস্তিত্ববাদীরা যেমন বলে) *excruciari* নয়। জগত জ্ঞাত না-হয়েও অস্তিত্ববান, এবং মনে হয় কোনো জ্ঞাতা মানুষ আসবার আগেও বহুলক্ষ বছর তেমনিভাবেই থেকেছে।

যে-কোনো যুগের বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত বস্তুবাদের এটাই হল ঋজুতম এবং ন্যূনতম প্রস্তাবনা। কিন্তু মার্কসবাদীরা ভাবাতে চায় যে এই মতবাদের বিশিষ্ট একটি আরোগ্যশক্তি (therapy) আছে। নিছক যুক্তি-শৃঙ্খলের অহমিকাকে এ রোধ করে, কর্মে তত্ত্বের প্রাবর্তনা ছাড়াই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন আত্মবঞ্চনার প্রশ্রয় দেয় না। কারণ, কেবল জগতবিষয়ক বাক্যাবলিতে জগতকে আবদ্ধ করা যায় না, এবং বর্ণনার বাইরেও বিস্তর কথা থেকে যায়। যদি তা না হতো তবে বিজ্ঞাপনলেখক, সাংবাদিক, বাগ্মীরা (আমাদের সংস্কৃতিতে সম্ভবত তারা যেমন) সব দেবতা হয়ে যেতেন।

বিশ্ব যা সে তাই, আর জ্ঞাতার কাজ হল তার স্বরূপ বলা। দুটো ঘটনার পাশাপাশি অবস্থান উপভোগ করবার মতো সৌভাগ্য ঘটলে সে এই উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে : সে মনে করছে যে কোনো কোনো বাক্য সত্য, আর সেই বাক্য সত্যিসত্যিই সঠিক। বাক্য তখনই সত্য যখন তার প্রস্তাবিত অবস্থাটি কার্যতই একটি অবস্থা। নইলে বাক্যটি মিথ্যা, এবং তাতে বিশ্বাসটিই ভ্রান্তি। তাই মার্কসবাদীরা সত্যের প্রতিষঙ্গবাদে (correspondence theory of truth) জড়িত। তাই সম্ভবত, আমার মনে হচ্ছে, কেন 'তাস্' (সংবাদ-প্রতিষ্ঠান) প্রতিবাদ প্রকাশ করলে, এই খাঁচটা রাখে : 'এই বিবরণী তথ্যের সঙ্গে মিলছে না।'

আসলে বিশ্বাস হচ্ছে দেহের একটা স্থিতি, যখন কর্ম সুপ্ত বা তার সূচনা আসন্ন। সত্য বাক্যাবলি এই স্থিতিকে এমনভাবে জানায় যে জ্ঞাতা জগতের সঙ্গে নিপুণভাবে চলতে পারে। তৎসত্ত্বেও যদি সে না পারে, তবে অন্যান্য সত্য-বাক্যগুলো তাকে কারণটি জানিয়ে দেবে। অবশ্য কেবল নৈপুণ্য দিয়ে বাক্যের সত্যকে অনুমান করা যায় না : কোনো কোনো অভিপ্রায়ে কোনো কোনো পুরাকল্প (myths) কার্যকর এবং পাগলামো পাগলকে খুশি করে। যেহেতু সত্য বাক্যাবলি জানায় অবস্থাটি কার্যত কী, তারা (যদি বলা চলে) চূড়ান্ত নিপুণভাবে কার্যকর। তারাই খাঁটি মুদ্রা, চিরকেলে দামী সোনা। এবং চরম কর্তব্য হচ্ছে তাকে দখল করা। দেখা যাক দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়া (dialectics) কি করতে পারে।

জ্ঞাতা ইতিহাসের কোনো একটা মুহূর্তের মানুষ ; সে আছে প্রকৃতি ও সমাজের কোনো একটি বিশেষ পটভূমিতে। তার বোধ প্রসারে সীমাবদ্ধ এবং তথ্যপঞ্জিতে

বেঠিক ; এমনকি যন্ত্রপাতির সহায়তাও পুরোপুরি তার অসামর্থ্য দূর করতে পারে না। মা-বাবার কাছ থেকে অনেক মোহ সে পেয়েছে—এবং তার সমাজও বিস্তর গড়ে দিচ্ছে। তৎসত্ত্বেও সে জানে সে কখনো ভুল করছে, কখনো ঠিক চলছে। এই পার্থক্যটিকে সে যুক্তিতে সাজাতে চায়, যেন যতোটা সম্ভব সে সঠিক হতে পারে। সে ভাবে এই তফাৎটাকে বলবার নিশ্চয়ই কোনো নিয়ম আছে। হিউম বলেছিলেন এমন কোনো নিয়ম নেই, তবে হিউম তো দুশো বছর গত হয়েছেন। এবং আমাদের জ্ঞাতাও আর ইংরেজ অভিজ্ঞতাবাদী (Empiricist) শিশুটি নেই, যে, গল্পের চালে প্রদীপের সলতেতে আঙুল পেতেই রয়েছে, কেননা তাকে তার সাধারণ বক্তব্যটির সুবোধ্যতাকে বাড়াতেই হবে।

যদি নামবাদীরা (nominalists) সঠিক হয়ে থাকেন, যদি জগত কেবলমাত্র বিশেষ (particular) দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে এবং সে-হেতু জ্ঞান কেবলমাত্র বিশেষ বিষয়ক হয়ে থাকে, তবে বিজ্ঞানের প্রচলিত প্রতিটি কেতাবকেই ফেলে দিতে হবে। এমন প্রতিটি কেতাবই সাধারণ সিদ্ধান্তে (generlizations) ঠাসা, বিজ্ঞানের (আসলে) যা লক্ষ এবং যা তার মাথার মুকুট। সমস্যা হচ্ছে কেমন ক'রে জগতবিষয়ক সংক্ষিপ্ত, খাপছাড়া এবং সীমাবদ্ধ চকিতবোধের সহায়তায় জগতের গড়ন ও গতি সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত তৈরি করা যাবে? যখন মাত্র 'কিছু' পাচ্ছি তখন তা থেকে 'সমস্ত'কে অনুমান করবো কী ভাবে? যখন টুকরোকে দেখছি তখন পুরো তন্ত্র বিষয়ে কী অনুমান করতে পারবো?

আমার ধারণা জবাবটা এই, অংশকে অংশ হিসেবে দেখে, সমগ্র তন্ত্রেরও এক-ঝলক পাওয়া যায়, আর 'কিছু কিছু' দেখে তোমার সমগ্রতা বিষয়ে এমন ধারণা হচ্ছে যা-ই 'সব'। যদি এখনকার মতো আমি এমনভাবে কথা বলি যা ইচ্ছাকৃত-ভাবেই সাদামাটা, তাহলে বলতে পারি ইংরেজিতে সমগ্রতা এইভাবে প্রকাশ হয় : 'Myself and every other person,' 'This book and every other book.' This tree and every other tree।' আমার কাছে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে এই বাক্যাংশগুলোতে সংযোগী অব্যয় 'এবং' ('and') ব্যতিরেকী 'অপর' ('other')-এর একই সঙ্গে হাজির হওয়া। দৃশ্যত তাই পূর্ণ-জগত গড়বার জন্য এই দুই বিরোধীকে দরকার করছে।

তাছাড়া, অন্বয় ও ব্যতিরেকের যোগসূত্রটি দৃশ্যত আত্ম-নির্দেশক। সমস্ত অন্বয়ই ব্যতিরেক, যোগ দেওয়াই ছেদ করা, এবং সম্পর্কিত হওয়াই স্বতন্ত্র হওয়া। সমসাময়িক ন্যায়কে ছেয়ে রেখেছে নানা প্যারাডক্স (যেমন রাসেলের, লুইস ক্যারলের ও বিখ্যাত 'এপিমেনাইডিস'), যেহেতু ওই ন্যায়ের নীতিগুলোকে তাদের নিজেদের উপর প্রয়োগ করা যায় না। একটা নীতির সাহায্যে এই অবস্থাকে যুক্তিতে বাঁধাই সম্ভবত ঠিক হবে, যা যুক্তিবদ্ধ প্যারাডক্স হয়েও, মৌল বিচ্ছলতা থেকে রেহাই দেবে এবং ব্যবহারে যা জগতকে ব্যাখ্যা ক'রে চলবে।

হয়তো দ্বন্দ্ব-প্রক্রিয়া পরিবর্তনের ন্যায় (logic of change), যেমন ক্যালকুলাস গতির গণিত।

হাড়ের সঙ্গে সংযোগগুলোর, যা একই সঙ্গে জোড়ে এবং খোলে, সদৃশ যুক্তিতে আমরা এই নীতিকে বলতে পারি রূপায়ণের নীতি (principle of articulation)। আমার মনে হয় বিশ্বের গড়নের মৌল একটা কিছুকে এ বর্ণনা করে এবং মিথ্যা থেকে সত্য বাক্যকে পৃথক করবার একটা সূত্রও দিচ্ছে। এ যেন বলছে : 'পুরো পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত এবং পৃথক যে-কোনো প্রস্তাবিত অবস্থাকে পরীক্ষা করো, তবেই জানতে পারবে প্রস্তাবিত অবস্থার বাক্যটি সত্য কিনা।'

এটাই আমার দ্বান্দ্বিক-প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারণা, যেমন জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়র স্বাতন্ত্র্য হল বস্তুবাদ বিষয়ে আমার ধারণা। এটা হতেই পারে মতবাদটি প্রকাশ করবার সময় আমি আমার (নিজস্ব) বক্তব্যটিই উপস্থিত করেছি। সে-ক্ষেত্রে মূল লেখার (যেমন, মার্কসের ক্যাপিটাল-এর ভূমিকা, ফয়েরবাখ-সম্পর্কিত প্রস্তাব ; এঙ্গেলসের ফয়েরবাখ-নিবন্ধ ও অ্যান্টি-ড্যুরিং ; এবং লেনিনের এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম,) সঙ্গে মিলিয়ে আমার বিবরণটিকে শুধরে নিতে পারবে। অথচ একটা অর্থে কিন্তু মতবাদ'টি'কে স্থির-নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করা যায় না। এই অর্থে যে মতবাদটি কখনো তার পরিণতিতে পৌছায় না। কারণ মার্কসবাদ সর্বদাই তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সংঘর্ষের অপেক্ষা ক'রে থাকে, চায় যে জগত তাকে স্পষ্টতা দিক — যদিও নিজের ক্ষেত্রে তা জগতকে স্পষ্ট করে চলেছে।

তাই মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব বা মার্কসীয় অন্য কোনো-কিছু শেখাবার কথায় বলতে হয় যে মার্কসবাদ হল উদ্‌বর্তনের দর্শন (philosophy of growth) এবং উদ্‌বর্তিত দর্শন। তারও প্রজনবিদ্যা (genetics) আছে নিশ্চয়ই এবং কাঠামোও। কিন্তু পরিবর্তন ও রূপান্তরই তার বিশেষ সাফল্য (éclat)। অধুনা চালু পুরা-কল্পের (myth) প্রতিপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদ এক উন্মুক্ত ('open') সমাজ, এবং নিশ্চিতভাবেই একমাত্র সমাজ যা আপন সম্ভাবনার তরঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বর্তমান পাঠকদের সামনে আমি সততা ও অকপটতার নীতি বিষয়ে বেশি বলতে চাই না, যা আমাদের শিখতে বলে যে, বিষয় হচ্ছে বিষয় যা (নিজে)। নিশ্চয়ই এমন লোক আছে যারা মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নিয়মটি বাতিল করবে, পাছে লোকেরা খাঁটি তত্ত্বটি জেনে তাকে নেকনজরে দেখে। তবুও নিয়মটির স্পষ্ট একটি গুণ আছে এবং স্বাদেশিকতার নির্দেশনাও (patriotic imperative) আছে। আমার দেশের লোকেরা মোটামুটিভাবে শান্তি ও প্রাজ্ঞতার ভক্ত। বিশ্বের মধ্যে একমাত্র বিরাট জাতি যে মার্কসবাদের তত্ত্বে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সে-কারণে ভেবে চলেছে যে অনির্দেশ্য কারণে মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ পাগল হয়ে গেছে ; এহেন অবস্থায় যদি একে ছেড়ে দিই তবে অপকারই করা হবে।

এগুলোকে আলোচ্য হিসেবে রাখলে আমার মনে হয় না মার্কসবাদের জন্য

বিশেষ একটা শিক্ষাক্রমের (pedagogy) দরকার আছে। ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন শেখানো হয় তেমনিভাবেই মার্কসবাদ শেখানো হবে, যেমন—ধরা যাক, মহান ওরিজেন তৃতীয় শতকে খ্রীস্টতত্ত্ব শেখাতেন। তাঁর শিক্ষণ বিষয়ে ছাত্র গ্রেগরি থমাটরগসের বর্ণাঢ্য বিবরণ পাই :

> 'কোনো বিষয়কে বাধা দেওয়া হয় নি, আমাদের কাছ থেকে কিছুই আড়াল করা হয় নি।···জ্ঞানের সমগ্রক্ষেত্রে খেয়ালখুশিতে বিচরণ ক'রে—আধ্যাত্মিক বা জাগতিক বিষয়, গ্রীক বা প্রাচ্য সূত্র থেকে যে-কোনো সিদ্ধান্তে নিজেদের জানবুঝ রাখতে দেওয়া হয়েছে আমাদের। (গুরু শিখিয়েছিলেন) এমন ভাষায় যা তাদের নম্রতা ও আত্মপ্রত্যয়ে আমাদের অনুপ্রেরিত করেছে, এবং চোখ যেমন আলো খোঁজে, শরীর খাদ্য চায়, তেমনি আমাদের মন বস্তুনিচয়ের কার্যকারণ ও ঈশ্বরের সত্য জানবার প্রবল বাসনায় প্রকৃতির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে।' (Bettenson, *The Early Christian Fathers*, Oxford, 1956, পৃ ২৬-২৭ থেকে উদ্ধৃত)।

'ঈশ্বরের সত্য'—আমার ধারণায় তা-ই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র ও সুকুমার শিল্প, শ্রেয় ও সুন্দর। 'বস্তুনিচয়ের কার্যকারণ'—আমার মনে হয় তা-ই হচ্ছে বিজ্ঞান। এ-ছাড়া আর কী শেখানো যায়? (সে-বিষয়ে) আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং আমি বিবেচনা করি, মার্কসবাদও সন্দেহ ক'রে থাকে। কারণ সেই প্রাচীন টাইটান নিজেই বলেছেন যে তাঁর আলোচ্য ছিল 'মানব সমাজ বা সামাজিক মনুষ্যত্ব' (*Theses on Feuerbach*, ১০ সংখ্যক)। এবং এমন সব বচনেই শ্রেয়, সত্য ও সুন্দর স্পষ্টতই এক।

DR. BARROWS DUNHAM পাঠিয়েছেন এই লেখাটি। মূল রচনার নাম ছিল *On Teaching Marxist Epistemology*। অনুবাদ : শান্তি বসু।

মার্কসবাদের সমালোচনা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মার্কসবাদ সম্পর্কে, মার্কসবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিগত একশো, বিশেষত পঞ্চাশ, বছর ধরে এতো যে আলোচনা হচ্ছে তা মার্কসীয় চিন্তাধারার মৌলিকতা, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ। মার্কসবাদ বস্তুত কি ?—এই প্রশ্নে বিভিন্ন মার্কসবাদী পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও প্রভাবশালী পার্টিগুলি ঐকামতে উপনীত হতে পারছেন না। তবু, এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বিশ্ববাসীর বিশাল এক অংশ মার্কসবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় বসবাস করছেন এবং বিশাল আরেক অংশ মার্কসবাদে বিশ্বাসী। এই বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনাটিই মার্কসবাদের আলোচনা ও পুনরালোচনার সপক্ষে মহত্তম যুক্তি। মার্কস-বাদের সমালোচনা নানা দিক থেকেই বোঝা যেতে পারে। ১. যাঁরা মার্কসবাদের বিরোধী তাঁদের দিক থেকে ; কিংবা যাঁরা মার্কসবাদের সমর্থক তাঁদের দিক থেকে। ২. যাঁরা মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিন্তু মার্কসবাদী সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব ইতিহাসের প্রতি সম্পূর্ণ বা অংশত শ্রদ্ধাহীন তাঁদের দিক থেকে ; কিংবা যাঁরা 'মার্কসবাদের' কোনো-না-কোনো বাস্তব রূপায়ণের সমর্থক (কিন্তু ক্লাসিকাল মার্কসবাদ বলতে যা বোঝানো হয় তার প্রতি উদাসীন) তাঁদের দিক থেকে। ৩. এমন অনেকে আছেন যাঁরা মার্কসবাদের একটি (বা কয়েকটি) দিক (যথা, অর্থনীতি) গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য একটি (বা কয়েকটি) দিক (যথা, দর্শন) গ্রহণ করেন না। এঁরা মার্কসবাদকে একটি অবিচ্ছেদ্য 'সিস্টেম' বা প্রস্থান মনে করেন না। ৪. এমন অনেকে আছেন যাঁরা মার্কস-বাদের মূল প্রবক্তাদের একজনের বক্তব্য গ্রহণ করেন, কিন্তু অপর জনের বক্তব্য গ্রহণ করেন না। ৫. মার্কসবাদের সমালোচনা প্রবক্তা ও সমালোচকদের বক্তব্য ধরেও করা যায়, আবার সমালোচ্য বিষয় ধরেও করা যায়। সমালোচনার

এই যে বিভিন্ন দিকের ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হল তা যে সব পরস্পর-বিরোধী তা নয়। আমার মতে মার্কসবাদের যে ত্রুটিগুলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমি কেবলমাত্র সেই সমালোচ্য বিষয়গুলিরই পুনরালোচনার অবতারণা করব।

২

স ত্যা স ত্য বি নি শ্চ য়। হেগেলের ডায়ালেকটিক্-কে সমালোচনা ক'রে মার্কস যা বলেছেন তা সর্বজনবিদিত : হেগেল তাঁর ডায়ালেকটিক্-কে (পায়ের বদলে) মাথা দিয়ে হাঁটাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, জড়-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে হেগেল জড়ের স্থলে মৌলিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন চৈতন্যকে। মার্কসের দাবি, তাঁর ডায়ালেকটিকে জড় তার প্রাপ্য প্রাধান্যের স্বীকৃতি পেয়েছে : মার্কসীয় ডায়া-লেকটিক্ (যা স্বাভাবিক) পা দিয়েই হাঁটে। ফরাসি দার্শনিক মের্লো-পন্তি আপত্তি ক'রে বলেছেন, মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্ অনুসারে পা (অর্থাৎ জড়) শুধু হাঁটবার অধিকারই পায় নি, চিন্তা করবার শক্তিও (স্ব-চৈতন্যও) অর্জন করেছে!

সত্যাসত্যবিনিশ্চয় প্রসঙ্গ মূলত জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। জ্ঞানের সঙ্গে জগতের, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর, এবং কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সম্পর্ক না বুঝে সত্যাসত্য নির্ণয় করা অসম্ভব। মার্কসবাদীর মতে, জগৎ জ্ঞান-নিরপেক্ষ। জগৎ জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হয়। জগৎ সীমাহীন ; জ্ঞানের সীমান্তও ক্রমবর্ধমান। জ্ঞানকে জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ জগতের প্রতিবিম্ব বললে কিছু অসুবিধা আছে। তাতে মনে হতে পারে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী কান্টের মতো প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদী – বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞান-জগতের ও জ্ঞান-কর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত ও নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব অস্বীকার করে। মার্কসবাদী যদি বলেন, বিষয় (তথাচ বস্তুজগৎ) বিষয়ীর (মনোজগতের) সৃষ্টি, তাহলে তার বস্তুবাদ (রিয়ালিজম) ক্ষুণ্ণ হয়। যদি তিনি বলেন, বিষয় বিষয়ীতে বস্তুজগতের প্রতিবিম্ব মাত্র, তাহলে তার দ্বন্দ্ববাদ ক্ষুণ্ণ হয়। ঘনায়মান উভয় বিপদ এড়াতে গিয়ে মার্কসবাদী বলেন, বিষয়ীকে (জ্ঞাতাকে) নির্দ্বন্দ্ব, একক, নিঃসঙ্গ ভাবলে ভুল হবে ; আসলে সে সক্রিয় ও সমাজের প্রতিভূ কোনো এক শ্রেণীর মানুষ। জ্ঞানমাত্রই কর্ম-প্রভাবিত এবং কর্মও জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। প্রশ্ন থেকে যায় : কোনো একটি জ্ঞান-কর্ম যে যথার্থই জ্ঞান-কর্ম তার প্রমাণ কি ? বিষয়ের প্রতিবিম্ব যে সত্য তা নির্ণয় করতে হবে কী ভাবে ?

মার্কসবাদীর মতে, জ্ঞানের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। তবে নির্বিকল্প (ইমিডিয়েট) প্রত্যক্ষে আমরা জগতের বা বিষয়ের আভাস মাত্র পাই, যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি না। যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রত্যক্ষ-লব্ধ অভিজ্ঞতাকে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে আরো নিরবয়ব (এ্যাবস্ট্র্যাক্ট) ও সামান্য (জেনারেল) করতে হবে। প্রত্যক্ষোত্তর এই নিরবয়ব ও সামান্য অভিজ্ঞতাকে বলা হয় যথার্থ (লজিকাল) জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞানে বিষয়বস্তুর সারধর্ম ধরা পড়ে, স্থূল রূপ নয়। যথার্থ জ্ঞানের

লক্ষ হল বিশেষ বিষয়বস্তুতে সামান্য বা সারধর্মকে আবিষ্কার করা। জ্ঞান-লাভের প্রথম দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে স্থূল জড়বস্তু ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে রূপান্তরিত হয়, পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যক্ষলব্ধ বিষয় ধারণার মাধ্যমে উচ্চতর সামান্যধর্ম অর্জন করে। মার্কস-বাদী জ্ঞানতত্ত্বে এইভাবে বুদ্ধিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের বিরোধ নিরসনের চেষ্টা করা হয়।

মার্কসবাদী জ্ঞানকে প্রতিবিম্ব বললেও নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্ব বলে স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষ থেকে শুরু ক'রে যথার্থ জ্ঞান পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটিই দ্বান্দ্বিক এবং উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, বিচার ও ব্যবহারের মধ্যে মার্কসবাদী কোনো নির্দিষ্ট ভেদরেখা আছে বলে মানেন না। এই বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। ব্যবহারের (প্রাক্‌টিসের) ভূমিকা দ্বৈত জ্ঞানের ভিত্তি এবং সত্যের নির্ণায়ক (ক্রাইটেরিয়ান)। যে-কোনো ব্যবহার অবশ্য জ্ঞানের ভিত্তি বা সত্যের নির্ণায়ক বলে স্বীকৃত নয়। প্রথমত বৌদ্ধিক (ইন্টেলেকচুয়াল) ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত ব্যবহার সত্যের নির্ণায়ক ব'লে পরিগণিত হবে না। যে-ব্যবহার বাস্তব (মেটিরিয়াল) এবং সমাজায়ত্ত সেই ব্যবহারই কেবলমাত্র সত্য নির্ণয়ের সহায়ক। বাস্তব ব্যবহারের ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে, সেই ব্যবহারই বাস্তব যা বাস্তব দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রেণীসংগ্রামে, শ্রেণী-উদ্দেশ্যচেতন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পকর্মে নিযুক্ত। মনুষ্যদেহের স্থূল ইন্দ্রিয়াদি থেকে শুরু ক'রে সূক্ষ্ম ধ্যান-ধারণাদি সকল কিছুই ব্যবহারের ফলশ্রুতি। ব্যবহারের দ্বিতীয় কাজ হল সত্য নির্ণয় বা নিরূপণ করা। চিন্তা এককভাবে সত্য নির্ণয়ে অসমর্থ ; ভাববাদীরা যে চিন্তার সার্বভৌমত্ব দাবি করেন মার্কসবাদীরা তা গ্রহণ করেন না। মনুষ্য-চিন্তা বিষয়গত সত্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে কি না তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি, মার্কসবাদীর মতে, ব্যবহারসাপেক্ষ। সত্য চিন্তা ব্যাবহারিক সাফল্যদায়ক, সফল প্রবৃত্তির জনক। কোনো কোনো মার্কসবাদী ব্যবহার রূপে গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শিল্পসংক্রান্ত কার্যাবলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তবে সতর্ক করার জন্য এ-ও বলা হয়েছে যে, সত্যনির্ণয়ের সব থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যহার গবেষণাগারে লভ্য নয়। রুটকেভিচ বলেন 'পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ উভয়ই ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু ব্যবহারের সর্বোত্তম পরিচয় হল জনগণের শ্রমে ও রাজনৈতিক কর্মে—উৎপাদনে ও শ্রেণীসংগ্রামে।' জর্জিয়েভের বক্তব্য আরো স্পষ্ট : 'বৈপ্লবিক ব্যবহার ছাড়া মার্কসবাদী-লেনিনবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।' এ-বক্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও ব্যবহারের যে-অর্থকে মার্কসবাদী মৌল বলে মনে করেন তা স্মরণ করলে এ-বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া এ-বক্তব্যের একটি দিক নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য : তা হল সত্যনির্ণয়ে চিন্তার সার্বভৌম দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চিন্তার ক্রিয়াশীলতার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু এ-বক্তব্য এইভাবে

না হলেও মার্কসবাদীদের পূর্বে (এবং পরে তো বটেই) অনেক দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীই বলেছেন।

মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আরেকটি অভিনন্দনযোগ্য দিক হল নিরপেক্ষ সত্য ও সাপেক্ষ সত্যের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা। নিরপেক্ষ সত্য বিষয়গত এবং সাপেক্ষ সত্য বিষয়ীগত। নিরপেক্ষ সত্য কিন্তু শাশ্বত নয়। সত্য একটি প্রবাহবৎ (প্রসেস); দ্রব্যবৎ এর অস্তিত্ব আছে কল্পনা করলে ভুল হবে। নিরপেক্ষ সত্য বিষয়গত সত্যের পূর্ণ বিস্তার বৈ আর কিছু নয়। কোনো বিষয়ী-চৈতন্যেই বিষয়গত সত্যের পূর্ণ বিস্তার প্রতিবিম্বিত হতে পারে না। সুতরাং মনুষ্যলভ্য সত্য মাত্রই বিষয়ী-সাপেক্ষ এবং অসম্পূর্ণ। ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ বিষয়ীগত ধারণা থেকে বিষয়গত সত্যের প্রতি এগিয়ে চলছে। অসম্পূর্ণ বা খণ্ড সত্যে পূর্ণ বা অখণ্ড সত্য প্রকাশিত, যেমন বিশেষ জ্ঞানে সামান্য জ্ঞান প্রকাশিত। যে-সব পূর্ণ ও অকাট্য সত্য ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন, ধনবিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব।

জ্ঞানতত্ত্বে লেনিন-কথিত প্রতিবিম্ববাদ (কপি থিওরি) সহজ বস্তুবাদের নতুন একটি সংস্করণ মাত্র। ভাববাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে সহজ বস্তুবাদের যে-যুক্তিটি অনেকেই স্বীকার করেন তা হল বস্তু-জগৎ চৈতন্য-নিরপেক্ষ। এই যুক্তিটি স্বীকার করলেই লেনিন যে-প্রতিবিম্ববাদের কথা বলেছেন তা অবশ্য গ্রহণীয় হয় না। বার্কলি-র ভাববাদ বা মাখ্-এর প্রত্যক্ষবাদ ত্রুটিপূর্ণ; কিন্তু লেনিনের সরল বস্তুবাদ উন্নততর বিকল্প নয়। এ-কথা স্বীকার করা শক্ত যে, শ্রুত শব্দ ধ্বনিতরঙ্গের 'কপি' বা 'ইমেজ'। জ্ঞান বিষয়ের প্রতিবিম্ব, না কি প্রতীক – এই বিষয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যেই মতভেদ আছে। কর্নফোর্থের রচনা দেখে মনে হয় না তিনি প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন। লিওনভ ও মিটিন এ-বিষয়ে যা বলেন তাতে সমস্যার গুরুত্ব ও লেনিন-কথিত সমাধান যে আরো ব্যাখ্যাসাপেক্ষ তা স্বীকৃত। প্রত্যক্ষীভূত বিষয় ও জগতে অবস্থিত চৈতন্য-নিরপেক্ষ বিষয়ের সামঞ্জস্য যে যান্ত্রিকভাবে কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না তা অনেক মার্কসবাদীই স্বীকার করেন। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই আবয়বিক সামঞ্জস্য (আইসোমর্ফিজম) ব্যাখ্যার চেষ্টা যদিও হয়েছে, মনে রাখতে হবে, এই দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব সম্বন্ধেই গুরুতর জিজ্ঞাসা আছে। বলা হয়েছে, হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মতো মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিও প্রমাণ-শাস্ত্রের অন্যতম মৌলিক নীতি (স্ব-বিরোধ নীতি)-ভঙ্গের দোষে দুষ্য। মুশকিল হল, লেনিনের মতে, প্রমাণশাস্ত্রের এই নীতিগুলিও বিষয়ী-চৈতন্যে বিষয়ের প্রতিবিম্ব। প্রশ্ন থেকে যায়: তা হলে এই মৌলিক নীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যে দ্বান্দ্বিক নীতিগুলো অনুসৃত হয় তাদের স্বরূপ ও উৎপত্তি কিভাবে বুঝব? অনবস্থা দোষ ঘটছে না?

জগৎ যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ এ-প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রমাণিত বলে স্বীকার ক'রে

মার্কসবাদী জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা শুরু করা হয়েছে। জ্ঞানকে বিষয়ের প্রতিবিম্ব বলা অর্থহীন, যদি না বিনা সমালোচনায় স্বীকার করা হয় যে, বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিষয় বর্তমান। তাছাড়া প্রাথমিক আলোচনা না ক'রেই আরো এমন ক'টি গৌণ তত্ত্বকে মার্কসবাদীরা স্বীকার করছেন যে তাও বহু-বিতর্কিত। যেমন, জ্ঞানের ঐতিহাসিক চরিত্র। এই তত্ত্বটি মার্কসবাদী কর্তৃক স্বীকৃত ঐতিহাসিক বস্তুবাদেরই একটি দিক। জ্ঞানের ঐতিহাসিক চরিত্রে আমি নিজে বিশ্বাসী। জ্ঞানের ঐতিহাসিকতার সঙ্গে বস্তুবাদের কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। যে-মাখ্‌কে লেনিন তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনিও জ্ঞানের ঐতিহাসিক চরিত্রে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানকে যাঁরা জ্ঞান বলে স্বীকার করতে সম্মত এবং নিছক মতামত বলে উড়িয়ে দেন না তাঁরা সকলেই জ্ঞানের ঐতিহাসিকতায় আস্থাবান। যাঁরা মনে করেন জ্ঞান অনৈতিহাসিক এবং অপরিবর্তনীয় দ্রব্য, তাঁদের যুক্তিকে খণ্ডন না ক'রে বিনা প্রশ্নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-নিঃসৃত জ্ঞানের ঐতিহাসিকতায় আস্থা স্থাপন করা অযৌক্তিক।

ব্যবহারকে জ্ঞানের ভিত্তি ও সত্যের নির্ণায়ক বলে মার্কসবাদী যে-যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা চক্রবৎ। ব্যবহারের স্বরূপ (অর্থাৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি ব্যবহারে সমর্থিত হল কি না তা) নির্ণীত হচ্ছে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা দ্বারা। কিন্তু মুশকিল হল : যে-কোনো ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার 'সমর্থন' কিংবা 'অসমর্থন' তো মার্কসবাদী স্বীকার করবেন না। মাখ্‌ও তো ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার উপর চূড়ান্ত আস্থাবান ; কিন্তু তিনি যেহেতু অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বস্তুজগতের (অর্থপূর্ণ) অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তাঁর মত মার্কসবাদীর পক্ষে অগ্রাহ্য। আসল কথা, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্তর্নিহিত এমন কিছু নেই যার জন্য ঐ 'সমর্থন' বা 'অসমর্থন' অবশ্যগ্রাহ্য। তাই আবার ব্যবহারের গোত্র (আইডেন্টিটি)-নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আবার তো ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের (অভিজ্ঞতার) ডাক পড়বে ; কারণ মার্কসবাদী তো আর নিখাদ বুদ্ধিকে জ্ঞানের ভিত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাছাড়া মার্কসবাদী ব্যবহারের যে সংকীর্ণ সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তার সপক্ষে যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ উভয়ই দুর্বল।

হেগেলের মতে, জ্ঞান ও জগতের মধ্যে অন্তর্লীন ঐক্য আছে। মার্কস তা স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, এই ঐক্য ব্যবহারের মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। যে-ব্যবহার দ্বারা এই ঐক্য স্থাপন করতে হবে সেই ব্যবহারও শিক্ষণীয় ; এবং এই শিক্ষা একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী তার বৈপ্লবিক চৈতন্য দ্বারা গ্রহণ করতে সক্ষম। জ্ঞান ও জগতের ঐক্যবিধায়ক সেই ব্যবহারও দেখা যাচ্ছে এক মতবাদসাপেক্ষ ; মতবাদটি হল : সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক ব্যবহারই কেবলমাত্র সত্যের কষ্টিপাথর। এই মতবাদ যিনি স্বীকার করবেন না তাঁর পক্ষে কি সত্যনির্ণয় অসম্ভব ? মার্কসবাদী সত্যের তত্ত্ব শেষ বিশ্লেষণে শ্রেণী-সত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। সত্যের এই তত্ত্ব

নিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক মতবাদসমূহের সত্যাসত্যবিনিশ্চয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ঐ সব মতবাদ যে নিষ্ফল তা বলা শক্ত। সত্যের যে নিরপেক্ষ রূপের কথা মার্কসবাদী বলেন তার একটি ভাষ্য গ্রহণ করলে এই অসুবিধা দূর করা যায় না। কিন্তু সেই ভাষ্য মার্কসবাদীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা সন্দেহের বিষয়।

৩

ধ র্মা ধ র্ম বি নি শ্চ য়। এই শিরোনামায় আমাদের আলোচ্য বিষয় মার্কসীয় নীতিশাস্ত্র (এথিক্স)। সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য নিছক আধ্যাত্মিক নয়, সামাজিকও বটে। মার্কসের মতে, নীতিধর্মের সমাজ-নিরপেক্ষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। এ-দিক থেকে বিচার করলে, ধর্মাধর্মবিনিশ্চয় সত্যাসত্যবিনিশ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। 'কি আমার ধর্ম?' 'কি আমার কর্তব্য?'—এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কসবাদী বলবেন, 'তোমার ধর্ম, কর্তব্য তোমার ঐতিহাসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে; —এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য উত্তর নেই।' এই বক্তব্য নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদেরই প্রকাশ। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো নীতিধর্ম থাকতে পারে না, নেইও। সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়া সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ও বিচার-বর্জিত। এই দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক ও অনিবার্য। সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হলে এই দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবে না; সাম্যবাদী সমাজ যে-পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে সেই পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে না। মার্কসবাদীর বিশ্বাস, সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য ও তার নেতৃত্বে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের অনতিক্রম্য বিধান। লক্ষণীয় হল, যে-সমাজে যে-নীতিই পরিদৃষ্ট হোক না কেন, মার্কসবাদীর মতে, তা অনতিক্রম্য। মানবিক প্রচেষ্টায় নীতিধর্ম সৃষ্টি বা বিনাশ কিছুই করা যায় না, শুধু এর আবির্ভাব-তিরোভাব ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করা যায়, কিংবা স্থায়িত্বকালের কিঞ্চিদধিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। মার্কসবাদীর বক্তব্য, বিবদমান ও শ্রেণীবিভক্ত মানবিক স্বার্থবুদ্ধিকে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে দল ও রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শক্তির প্রশ্ন জড়িত। যে-শক্তিশালী তার হাতেই যদি অনিবার্যভাবে ইতিহাসের বিধানে নিয়ন্ত্রণের অধিকার বর্তায় তাহলে শক্তিই হয়ে দাঁড়ায় অধিকারের উৎস। অনিবার্য ইতিহাসই যদি হয় অধিকার-প্রদায়ক তাহলে মানুষের নতুন নতুন অধিকার অর্জনের সংগ্রাম ও তৎসংশ্লিষ্ট নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও অনেকটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

মার্কসবাদী ঘটনা (ফ্যাক্ট) ও মূল্যের (ভ্যালু) দ্বৈততা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, মূল্যগুলিও ঘটনা। এবং এই যুক্তিতে তিনি নীতিশাস্ত্রকে সমাজ-বিজ্ঞানেরই অংশবিশেষ বলে মনে করেন। ধর্মাধর্ম অর্থনৈতিক বুনিয়াদ (সম্বন্ধ)-নির্ভর। মার্কসবাদীর মতে, সাম্যবাদীর মৌল ধর্ম হল শোষক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে

সংহত, সুশৃঙ্খল ও সম্মিলিত সংগ্রাম। যদিও এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য শোষণ, দারিদ্র্য ও অসম্মান দূর করা, তথাপি, মার্কসবাদীর মতে, এ-কথা ভাবা ভুল হবে যে এই উদ্দেশ্য সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি কোনো প্রেম-উদ্ভূত। শ্রেণীসংগ্রামের নীতিধর্মে ভাবাবেগের কোনো মৌল স্থান নেই। কারণ, ভাবাবেগ, মনোভাব ও ধ্যান-ধারণাদি শ্রেণী-স্বার্থের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-নির্ভর। মার্কসবাদীর এ-কথা যদি যথার্থ, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রশ্নটি বাহুল্য হয়ে দাঁড়ায়। বিচারের সঙ্গে দুটি বিষয় গভীরভাবে জড়িত: প্রথমত মানদণ্ড এবং দ্বিতীয়ত বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিচার্য বিষয়ের নৈতিক গুণাগুণ। আপেক্ষিকতাবাদী মার্কসপন্থীর পক্ষে সকল সমাজের পক্ষে সকল ঐতিহাসিক যুগে প্রযোজ্য একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদীর পক্ষে (ঐতিহাসিক) বিষয়ী-নিরপেক্ষ বিচার্য বিষয়ের নৈতিক গুণাগুণের অস্তিত্ব স্বীকার করাও কঠিন। মার্কসবাদীর সপক্ষে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, ঐতিহাসিক প্রগতির কথা যেহেতু তিনি স্বীকার করেন সেই হেতু যুগ-নিরপেক্ষ কোনো একটি লক্ষও (সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা) তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, এবং এতে তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের ত্রুটি কিঞ্চিৎ লঘু হয়। কিন্তু তখন প্রশ্ন উঠবে: যাঁরা ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না এবং স্বীকার করেন না যে ইতিহাসের অনতিক্রম্য লক্ষ সাম্যবাদী সমাজ, তাঁরা আপেক্ষিকতাবাদের সমালোচনার বিরুদ্ধে মার্কসবাদীর যুক্তি কেন স্বীকার করবেন?

মার্কসবাদী বলেন, নীতিধর্মের প্রগতি শিল্পোৎপাদনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল; শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রগতির অন্তরায়; এই অন্তরায় দূরীভূত হলে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি দেখা দেবে; এবং শ্রেণীহীন সমাজের নীতিধর্ম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নীতিধর্মের তুলনায় প্রভূত উন্নত হবে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শোষণে-সংঘাতে মানুষ স্বধর্মভ্রষ্ট, আত্মচ্যুত; মার্কসবাদীর বিশ্বাস, শ্রেণীহীন সমাজে মানুষের এই আত্মচ্যুতির অবসান ঘটবে, —মানুষ পুনরায় স্বধর্মে স্থিত হবে। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষের আত্মপরিচয় কি? এই প্রশ্নের সদুত্তর না মিলিলে আত্মচ্যুতির আলোচনা নিছকই বিতর্কবিলাস। যদিও তরুণ মার্কস এক সময়ে বলেছিলেন যে, মানুষের আত্মপরিচয় অনির্বচনীয়, তথাপি তাঁর রচনাবলির সামগ্রিক চরিত্র থেকে এই বক্তব্যই স্পষ্ট হয় যে, মানবচরিত্র তার সামাজিক, বিশেষত অর্থনৈতিক, সম্পর্ক-নির্ভর। শ্রেণী-সমাজের সৃষ্টি হলেই যদি মানুষ আত্মচ্যুত হয় এবং এই আত্মচ্যুতি যদি হয় নীতি-বিধায়ক অনিবার্য ইতিহাসেরই দান তাহলে এই আত্মচ্যুতির অবসান ঘটানোর চেষ্টার যুক্তি কি? শ্রেণী সৃষ্টির পূর্বে বা বিলোপের পর মানুষের আত্মস্বরূপ যা ছিল বা দেখা দেবে, তা সে যা-ই হোক, তাকে কি আমরা আদর্শ বলে গ্রহণ করতে পারি? বোধ হয় না; কারণ, তাতে অনৈতিহাসিক

পরাতাত্ত্বিক মানব-আত্মার মতোই প্রকারান্তরে স্বীকৃত হবে, এবং নীতিধর্মের ইতিহাসাপেক্ষিকতার মৌল বক্তব্য খণ্ডিত হবে। এই সমালোচনার অনুক্রমেই দ্বিতীয় সমালোচনাটি উচ্চারিত হয়েছে। তা হল এই : শিল্পোন্নয়ন কি নৈতিক উন্নয়নের থেকে অভিন্ন – অর্থাৎ, শিল্পোন্নয়ন হলেই কি নৈতিক উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী? নাকি, নৈতিক উন্নয়ন শিল্পোন্নয়নের লক্ষণ মাত্র? যদি শিল্পোন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নয়ন অভিন্ন হয় তাহলে নৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ভিন্ন প্রচেষ্টা নিরর্থক। আর নৈতিক উন্নয়ন যদি হয় শিল্পোন্নয়নেরই লক্ষণ তাহলেও আমাদের মূল লক্ষ হওয়া 'উচিত' শিল্পোন্নয়ন। ফলত (একটি অতি সংকীর্ণ প্রান্তিক তাৎপর্য ছাড়া) নৈতিক প্রচেষ্টার বিশেষ কোনো তাৎপর্য মার্কসবাদের সামগ্রিক কাঠামোয় স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না। মানুষের আত্মচ্যুতির অবসান ঘটানো মার্কসবাদীর স্বতন্ত্র কোনো নৈতিক লক্ষ বলে পরিগণিত হতে পারে না।

মার্কসবাদীর মতে, নীতিধর্মের ইতিহাস শাসকশ্রেণীর 'আইডিওলজি' মাত্র। এই যুক্তি অনুসরণ ক'রে সমালোচক বলতে পারেন : মার্কসীয় ধর্মাধর্ম বিচারও একটি বিজয়ী (সর্বহারা) শ্রেণীর আইডিওলজি বৈ কিছু নয়। নীতির ক্ষেত্রে ডারউইনবাদীর বক্তব্য : যে বিজয়ী তার আচরিত ধর্মই নীতিধর্ম। এ-প্রসঙ্গে মার্কসবাদীর বক্তব্য ডারউইনবাদীর মতো হলে আভ্যন্তরীণ সংগতি বজায় থাকত। কিন্তু তাতে যে গুরুতর আপত্তি সৃষ্টি হবে তা ভেবে মার্কসবাদী তাঁর বক্তব্য কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ক'রে বললেন, সর্বহারা শ্রেণীর আইডিওলজি যে-কোনো শ্রেণীর আইডিওলজি থেকে স্বতন্ত্র। সর্বহারা শ্রেণীর আইডিওলজিতে সত্য চৈতন্যের প্রকাশ ; অন্য সকল আইডিওলজি মিথ্যা চৈতন্যের প্রকাশ। চৈতন্যের এই মিথ্যাত্ব যুগসীমার মধ্যে প্রমাণ করা মার্কসবাদীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, যে-শ্রেণী যে-রকম শিল্পোৎপাদনব্যবস্থা বহাল রাখে সেই যুগের নীতিধর্ম সেই শ্রেণীর আইডিওলজিই ঘোষণা করবে। পক্ষান্তরে, আপেক্ষিকতাবাদী মার্কসপন্থীর পক্ষে যুগ-নিরপেক্ষ আইডিওলজির কথা বলা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-বিরোধী এবং আভ্যন্তরীণ সংগতি-বর্জিত। মার্কসীয় চিন্তার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মার্কস ডারউইনপন্থী না হয়ে হেগেলপন্থী হয়ে গেলেন। হেগেল মনে করতেন, ইতিহাসের সকল যুগের, সকল উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ক্রমেই (অনিবার্য-ভাবে) স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। মার্কসবাদীর মতের মধ্যেও এই বক্তব্য প্রচ্ছন্ন যে, শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস সর্বহারা শ্রেণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখে অনিবার্যভাবে ধাবমান এবং যে-যুগে যে-শ্রেণী এই চূড়ান্ত লক্ষ সম্বন্ধে যত বেশি সচেতন হতে পারে সেই যুগে সেই শ্রেণীর চৈতন্যকে তত বেশি সত্যময় বলে মানতে হবে। বলা বাহুল্য, মার্কসবাদী এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন না। কিন্তু অন্যথায় সর্বহারা শ্রেণীর চৈতন্য কেন যে অন্য সকল শ্রেণীর চৈতন্যের তুলনায় বেশি সত্যময় হবে তা বোঝা দুষ্কর।

সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য সকল শ্রেণীর বিরুদ্ধে মার্কসবাদী মিথ্যা চৈতন্য এবং তদ্ভূত নীতিধর্মের যে-সমালোচনা করেন তার পূর্ব-প্রকল্প (প্রিসাপোজিশন) হল যে, ঐ সব শ্রেণী ইতিহাসের শেষ লক্ষ পূর্বাহ্নে বুঝতে পারে নি। এই পূর্ব-প্রকল্পের পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে এই প্রত্যয় যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অভ্রান্ত।

৪

ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি। মার্কসবাদীর মতে, ইতিহাসের প্রকৃতি ও গতি (-তরঙ্গ) একই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামাজিক মানুষের কর্মাবলিই হল ইতিহাস। উদ্দেশ্যহীন মনুষ্য-কর্ম ইতিহাসের আলোচ্য বিষয় নয়। মনুষ্য-কর্ম মনুষ্য-প্রকৃতিনির্ভর। মনুষ্য-প্রকৃতি অর্থনৈতিক সম্পর্কনির্ভর। অর্থ-নৈতিক জীবনের পশ্চাতে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। ইতিহাসের প্রাকৃতিক পশ্চাৎপট উল্লেখযোগ্য না হলেও অনস্বীকার্য। মার্কস মনে করতেন, যে-সকল অর্থনৈতিক গতির নিয়ম দ্বারা ইতিহাসের রূপ ও রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই সব নিয়মগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলির মতোই নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। তাঁর মতে, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান মূলত একই নিয়মাবলির অধীন। এ-কথার পরোক্ষ তাৎপর্য হল : প্রাকৃতিক ঘটনাবলি যেমন মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, সামাজিক ঘটনাগুলিও প্রায় তেমন। 'প্রায় তেমন', কিন্তু ঠিক তেমন নয়। এই সীমিত পার্থক্যের মূলে রয়েছে মানুষের প্রযত্ন ও কর্মের সীমিত স্বাধীনতা। এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে, মার্কসবাদী ইচ্ছার স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী। কোনো দার্শনিকই স্বীকার করেন না যে, তাঁর বক্তব্যে মনুষ্য-স্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। আসল প্রশ্ন হল : স্বাধীনতার কোন্ অর্থে তিনি বিশ্বাসী ?

ইতিহাস ও স্বাধীনতার প্রশ্ন দুটি ভিন্ন হলেও ভিকো ও হেগেল থেকে শুরু ক'রে মার্কস, ক্রোচে ও টয়েনবি অনেকেই এক সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মার্কস ব্যতীত আর ক'জনই বিজ্ঞান থেকে ইতিহাসের, প্রকৃতি থেকে মানুষের, স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। মার্কসের ইতিহাসচিন্তার বিজ্ঞানধর্মী প্রেরণা যুগিয়েছেন কঁৎ, মিল ও বাক্‌ল। ইতিহাস ও স্বাধীনতার সম্পর্কটি দু'ভাবে বোঝা যেতে পারে—স্থিতির ও গতির দিক থেকে। স্থিতির দিক থেকে প্রশ্নটি এইভাবে তোলা যায় : স্বাধীনতার প্রাথমিক আধার কি ব্যষ্টি, নাকি সমষ্টি ? এই প্রশ্নের উত্তরে হেগেল, কঁৎ ও মার্কস বলবেন, 'সমষ্টি', আর মিল ও ক্রোচে বলবেন, 'ব্যষ্টি'। অথচ মিল কঁতের এবং ক্রোচে হেগেলের অনুরাগী। গতির দিক প্রশ্নটি এইভাবে তোলা যায় : মানুষ কি তার ইচ্ছার স্বাধীন শক্তি দ্বারা ইতিহাসের গতি প্রতিহত বা পরিবর্তন করতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মিল ও ক্রোচে বলবেন, 'হাঁ', অনেকটাই পারে', আর মার্কস বলবেন, 'হাঁ', সামান্যই।' মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে-শ্রম করে সেই শ্রমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ।

এমনি করেই প্রকৃতি-বিজয়ী মানব-শ্রম হয় ইতিহাসধারার নিয়ামক। প্রকৃতি-মানব দ্বন্দ্ব যে-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে তাতে এই দ্বন্দ্ব রূপান্তরিত হয় শ্রেণী-দ্বন্দ্বে; এই দ্বন্দ্বের পরিশেষে নতুন রূপে আবার দেখা দেবে প্রকৃতি-মানব দ্বন্দ্ব, সাম্যবাদী সমাজ।

মার্কসের মতে ইতিহাসের ধারায় কয়েকটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ লক্ষ করা যায়— আদিম সাম্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। শেষ তরঙ্গ সাম্যবাদ। ইতিহাসের তরঙ্গ-তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। নতুন হল, এই তরঙ্গের কারয়িত্রী শক্তি সম্বন্ধে মার্কসের বক্তব্য। ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামই ইতিহাসে তরঙ্গ সৃষ্টির কারণ। প্রশ্ন উঠতে পারে: শ্রেণীহীন অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রাম-হীন ইতিহাস কি সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ হবে? মার্কসের বক্তব্য: মানবের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব শ্রেণীহীন সমাজেও তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। তরঙ্গ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্য অনেক প্রশ্নই তোলা হয়েছে। সকল সমাজের ইতিহাসেই কি নির্দিষ্ট সংখ্যক তরঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়? এই তত্ত্বটি কি ইতিহাস-নির্ভর, নাকি ইতিহাস-নিরপেক্ষ? অনাগত ইতিহাস কি কোনোমতেই এই তত্ত্ববিরোধী হতে পারবে না? এ-কথা জোর ক'রে বললে কি মার্কসবাদ অনৈতিহাসিক ও পরাতাত্ত্বিক দোষে দুষ্ট হবে না? মার্কসবাদী ইতিহাস-তত্ত্ব কি বিবরণমূলক, নাকি ভাষ্যমূলক? বিবরণমূলক বক্তব্য তো সর্বদাই ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হবার সম্ভাবনাপূর্ণ; সেক্ষেত্রে মার্কসবাদী বক্তব্য অনাগত ভবিষ্যতেও সত্য বিবেচিত হবে—এই দাবি কি অবৈজ্ঞানিক নয়? আর ভাষ্য-মূলক তত্ত্ব যদি বিরোধী সাক্ষ্য-প্রমাণাদিকে সর্বদা ভাষ্যান্তর ঘটিয়ে সপক্ষে প্রদর্শন করাতে পারে তাহলে সেই ভাষ্য কি শূন্যগর্ভ এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক নয়? এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যে-সমালোচনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা একটু পরিষ্কার ক'রে বলা যাক।

একটি যুগের বা দেশের ইতিহাস আরেকটি যুগের বা দেশের ইতিহাসের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ও অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কে আবদ্ধ, এমন কথা বলায় অনেক অসুবিধা রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কাল সম্পর্কে আমরা যে অস্তিত্ববাচক (এক্সিস্টেন্‌শিয়াল) উক্তি করি, তার সঙ্গে অপর একটি নির্দিষ্ট স্থান বা কাল সম্পর্কে অনুরূপ যে-উক্তি করি এতদুভয়ের মধ্যে কোনো যৌক্তিক (লজিকাল) সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসম্ভব। যদি তা করতে হয় তাহলে মানতে হবে যে উভয় উক্তিই একটি সাধারণ সত্যের বা নিয়মের প্রকাশ। ইতিহাসে এই রকম সাধারণ নিয়ম আছে দেখানো খুব কঠিন। যদি অতীত ইতিহাস থেকে আরোহী অনুমানে কোনো সাধারণ নিয়ম দাঁড় করানোও যায়, তা থেকে এ-কথা বলা যাবে না যে, ভবিষ্যতেও এ-নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অথচ পরিকল্পনার জন্য, ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম (মার্কসের ভাষায়, অর্থনৈতিক গতির নিয়ম) আবশ্যক।

এই বিষয়ে অনেক সমালোচক মার্কসবাদীর বক্তব্য ও আচরণে কিছু অসংগতি আছে বলে মনে করেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য হল, ইতিহাস যদি নির্দিষ্ট তরঙ্গভঙ্গের

মধ্য দিয়ে অনিবার্য গতিতে স্বীয় লক্ষে ধাবিত হবেই তাহলে পরিকল্পিত অর্থ-নীতি ও রাজনীতির উপর মার্কসবাদীরা এত গুরুত্ব আরোপ করেন কেন? তাহলে কি আমরা এই বুঝব যে, মার্কসবাদীরা ইতিহাসের ঘটনাশ্রয়ী বর্ণনা দেন না, আদর্শাশ্রয়ী ভাষ্য দেন মাত্র, এবং কার্যক্ষেত্রে সেই ভাষ্যও মানেন না? কোনো কোনো সমালোচক সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসের যে বিভিন্ন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে 'একই' ঘটনার যে বিভিন্ন 'বর্ণনা' প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ ক'রে এইরকম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ঐ সব ইতিহাস হয়তো ঘটনাশ্রয়ী নয়, ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের স্বার্থানুকূল ভাষ্য মাত্র। কোনো কোনো সমালোচকের বক্তব্য, মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্ব উৎসাহদায়ক শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু ঘটনার 'নিরপেক্ষ' বর্ণনাবর্জিত। ইতিহাস যদি হয় নীতিবিধায়ক এবং ইতিহাসের অনিবার্য গতি যদি হয় সাম্যবাদী সমাজ অভিমুখী, তাহলে মার্কসবাদী সংগতভাবেই অনুগামীদের উৎসাহ দিয়ে বলতে পারেন, 'ইতিহাস আমাদের সপক্ষে।' কিন্তু প্রশ্ন ওঠে উল্লিখিত 'যদি' দুটিকে নিয়ে। যে-ইতিহাস সর্বদেশে সর্বকালে বিবদমান দুটি (মাত্র দুটি?) পক্ষের একটির সপক্ষে সাক্ষ্য দেয় সেই ইতিহাসে (কিংবা যে-তত্ত্ব অনুসারে সে-ইতিহাস রচিত হয় তাতে) কোনো গুরুতর গলদ আছে।

'সব ইতিহাসই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস' — মার্কসবাদীর এই বক্তব্য অতি সরল। এই বাক্যটিকে শূন্যগর্ভ (টটোলজিকাল) সংজ্ঞাও বলা যেতে পারে। কোনো ইতিহাসই যদি শ্রেণীসহযোগিতার ইতিহাস না হয় সে-ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের চরিত্রের উল্লেখ করা হলে 'ইতিহাস কি?' — এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। দ্বিতীয়ত, ইতিহাসে শ্রেণীসহযোগিতার কোনো উদাহরণ নেই বললে অনেকেই তা স্বীকার করবেন না। কোনো কোনো সমালোচক বলেন, উদাহরণ-নির্ণায়ক তত্ত্ব যদি একপেশে হয় তাহলে বিরোধী উদাহরণ শুধু দুর্লভ নয়, সম্পূর্ণ অলভ্য। সর্বোপরি বলা হয় যে, শিল্পোন্নত সমাজে শ্রেণীবিন্যাস মার্কস যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনটি হয় নি। শোষক ও শোষিত সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরোধী ও-বহির্ভূত এই দুটি শ্রেণীতে সকল সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, — মার্কসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের বিন্যাস অত্যন্ত জটিল। মাত্র দুটি শ্রেণী-সংবলিত মার্কসীয় মডেলে তার কার্যাবলির, গতি-প্রকৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা অসম্ভব। শিল্পোন্নত সমাজের মানবস্বার্থ দ্বিধা নয়, বহুধাবিভক্ত। তাছাড়া বহুধাবিভক্ত মানবস্বার্থের (তার মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) দ্বন্দ্বকে দূর ক'রে সংহতি-বিধায়ক সামাজিক শক্তি ও সংস্থাও তো গড়ে উঠছে। মার্কসবাদী তাঁর মৌল ইতিহাসতত্ত্বের সঙ্গে সংগতি রক্ষা ক'রে বলেন, 'সব শক্তি ও সংস্থাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থসেবী।' এ-বক্তব্য যদি হয় ইতিহাসের সংজ্ঞার মতোই শূন্যগর্ভ (টটোলজিকাল) তাহলে বিতর্ক হবে

বিতণ্ডা মাত্র। আর যদি বিভিন্ন দেশের ঘটনা দেখে সিদ্ধান্ত করতে হয় তাহলে স্বীকার করতে হয় যে, অনেক ধনতান্ত্রিক দেশে (এবং কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেও) অন্তত কিছু শক্তি ও সংস্থা আছে যা শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে আন্তঃ-শ্রেণী সহযোগিতা বা সহাবস্থানের চেষ্টা করে। মার্কসবাদী নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে (যেখানে এখনো শ্রেণী বর্তমান) আইনের শাসন একচক্ষু বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট। যারা বুদ্ধিজীবী, বিশেষত যারা শিল্পী-সাহিত্যিক, তাদের সৃজনশীল বক্তব্য শ্রেণীস্বার্থের প্রতিধ্বনি নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, সে-সব ব্যক্তির শ্রম ধ্যান-ধারণাসংক্রান্ত তাদের বক্তব্য শাসক শ্রেণীর সমালোচনাপূর্ণ। ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি মূলত মানুষের ধ্যান-ধারণা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় ; তার অর্থ এই নয় যে, ঐ ধ্যান-ধারণাগুলি সামাজিক ঐতিহ্য-প্রভাবিত নয়। ধ্যান-ধারণাগুলি ইতিহাসের স্রষ্টাও বটে, সৃষ্টিও বটে। জীবনের বাস্তব ভিত্তি ও চৈতন্যের নানা প্রকাশের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্ব চলছে। এই প্রক্রিয়া উভয়মুখী। মার্কসের বক্তব্য, এই উভয়মুখী প্রক্রিয়ায় বাস্তব ভিত্তির প্রভাবই সমধিক। অনেক বস্তুবাদী সমালোচক দেখাতে চেয়েছেন যে, বস্তুবাদী হলেই যে তাকে বস্তু-চৈতন্যের দ্বন্দ্বে বস্তুর আধিপত্য মানতে হবে তা নয়। সত্তা হিসাবে বস্তু চৈতন্যের তুলনায় আদিম হতে পারে, কিন্তু শক্তি বা ক্রিয়াশীলতার দিক থেকে চৈতন্য সমধিক চৈতন্যশালী। এই বক্তব্য থেকে বিশ্লেষণ ক'রে এ-ও দেখানো যেতে পারে যে, কায়িক শ্রম সর্বদাই যে বৌদ্ধিক শ্রমের তুলনায় অধিক প্রভাবশালী হবে এই যুক্তি অচল। সমাজতান্ত্রিক দেশের শাসকবর্গের শ্রেণীগত পরিচয় বিশ্লেষণ করেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ করায় যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তাঁরা প্রধানত কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী-উদ্ভূত। শ্রমিকশ্রেণীর সংজ্ঞা শূন্যগর্ভ না করলে এদের সকলকে শ্রমিক বলা কঠিন। আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব অ-শ্রমিক শ্রেণী পালন করতে পারবে,—এই বক্তব্য গ্রহণে তো মার্কস-বাদীর আপত্তি তীব্রতর হবে।

মার্কস ভাবতেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষেরা ক্রমেই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত (পোলারাইস্‌ড) হয়ে যাবে এবং শোষিত শ্রেণী আপেক্ষিকভাবে আরো শোষিত (পপারাইস্‌ড) হবে ; এর ফলে শেষপর্যন্ত দুটি শ্রেণীর চূড়ান্ত সংগ্রাম হবে ও তার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পোলারাইসেশন সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি ভেবে দেখবার মতো। প্রথমত, যদি একথা স্বীকার করা হয়, যা ঘটনা দৃষ্টে অনেকেই এখন স্বীকার করেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অর্থনৈতিক শক্তিনিচয়কে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে সমর্থ, তাহলে শোষক ও শোষিত শ্রেণী অনিবার্যভাবে পোলারাইস্‌ড হবে এমন নিয়তিবাদে বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত হেতু নেই। দ্বিতীয়ত,

বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন সংবাদপত্র, শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং সর্বোপরি জাগ্রত জনমত বিরোধী স্বার্থের সমন্বয়ে সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পপারাইসেশন সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি ভেবে দেখা দরকার। প্রথমত, জোয়ান রবিনসনের মতে, মার্কস এই সম্ভাবনার কথা ভাবেন নি যে, কোনো কোনো সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তনশীল মূলধন ও উদ্বৃত্ত মূল্যের আনুপাতিক সম্বন্ধ (অথবা শোষণের হার) অল্পবিস্তর স্থিরই থাকবে, অথচ মুনাফা নিম্নগামী হবে। উৎপাদন বাড়লে তাহলে মজুরি বাড়বে। (মার্কসের বিরুদ্ধে এই যুক্তি অবশ্য উন্নতিশীল দেশের ক্ষেত্রে ততটা প্রযোজ্য নয়, যতটা প্রযোজ্য শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে।) দ্বিতীয়ত, মার্কসের এই ধারণাও অভ্রান্ত নয় যে, শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকদের মজুরি কখনোই স্থায়ীভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম স্তরের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, কারণ তাহলেই নাকি মুনাফার হার হ্রাস পাবে, আর সেক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস পেতে থাকবে। ফলত অর্থনৈতিক সংকট ঘনায়মান হবে। মার্কসের ইতিহাস-তত্ত্বের মধ্যে যে সামগ্রিক অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলা হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটের অনিবার্যতা-তত্ত্বে তার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। যে-উপাত্তের উপর মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত সেই উপাত্তের উপরেই মার্কসের মূল অর্থনৈতিক তত্ত্বও প্রতিষ্ঠিত। উপাত্তটি হল : মানুষ সামাজিক উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় ইতিহাসের সাধারণ নিয়মগুলির কার্যকারিতা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করতে অসমর্থ। এই উপাত্তটি খণ্ডন করবার জন্য কার্ল পপার ও আইসায়া বার্লিন যে-সব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা মার্কসবাদের জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

৫

মার্কসবাদ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। মার্কস তাঁর নিজের রচনাবলিকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবি করতেন। মার্কসের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ইয়োরোপে যে-ধনতন্ত্র প্রচলিত ছিল তার অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ এবং তৎকালীন ঘটনাশ্রয়ী কিছু কিছু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়। ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত ত্রুটি কোথায় এবং তার বাস্তবিক ও সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে তাঁর মতামত বিজ্ঞান-বুদ্ধির উজ্জ্বল উদাহরণ। একটি তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক চরিত্র নিম্নলিখিতভাবে বিচার করা যেতে পারে : ১. তত্ত্বের মধ্যে যৌক্তিক সংগতি আছে কি না ; ২. তত্ত্বের দ্বারা যে-জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়েছে সে-জাতীয় ঘটনার (বস্তুসত্তা রক্ষা ক'রে – অর্থাৎ বিনা ভাঙ্গে) কতোটা ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে ; ৩. বাস্তব ঘটনা দ্বারা তত্ত্বটি কতোটা পরীক্ষাযোগ্য (টেস্টেব্‌ল) – সমর্থনযোগ্য (কনফার্মাব্‌ল) নয় ; ৪. তত্ত্বটি কতো সরল এবং ৫. কতো সত্য।

প্রথম ১. বিচারে যে মার্কসের চিন্তা উত্তীর্ণ তা অনেক সমালোচকই স্বীকার

করেন। তবে যাঁরা মনে করেন দ্বান্দ্বিক যুক্তিশাস্ত্র – তা হেগেলীয়ই হোক কিংবা মার্কসীয়ই হোক – চিন্তার একটি মৌল নিয়ম (স্ব-বিরোধের নিয়ম) ভঙ্গ করে এবং সে-জন্য অন্তঃসারশূন্য, তাঁরা অবশ্য প্রথম বিচারেও মার্কসবাদকে উত্তীর্ণ স্বীকার করতে গর-রাজী। তাঁদের বক্তব্য : প্রত্যেক 'হাঁ'-এ যদি তার 'না' থাকে এবং 'না'-এ যদি তার 'হাঁ' থাকে, তাহলে ইতি-নেতির পার্থক্য করা দুষ্কর এবং পার্থক্য যা সচরাচর টানা হয় তা এমন এক পরাতাত্ত্বিক উপাত্তের উপর নির্ভরশীল যে সেই উপাত্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় ২. বিচার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা (এক্সপ্লানেশন) ও ভাষ্যের (ইণ্টারপ্রিটেশন) মধ্যে পার্থক্য মনে রাখা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি তত্ত্ব যে-ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে ভাবা গিয়েছিল বস্তুত তা পারছে না। অর্থাৎ ঘটনার সম্ভাব্য (পূর্ব-কল্পিত) তাত্ত্বিক রূপের সঙ্গে বাস্তব রূপের যদি অসংগতি দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হবে তত্ত্বটি (অন্তত অংশত) ভুল। তত্ত্ব-বিরোধী ঘটনা সন্দর্শনে বৈজ্ঞানিক তাঁর তত্ত্বের ভুল অংশ পরিবর্তন ক'রে তত্ত্বটিকে উন্নততর করার চেষ্টা করেন এবং করার সময়ে অবশ্যই লক্ষ রাখেন যাতে ১. শর্তটি (অর্থাৎ যৌক্তিক সংগতি) না ক্ষুণ্ণ হয়। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে একটি সমালোচনা হল যে, বিরোধী ঘটনার সাক্ষ্য দেখেও মার্কসবাদী বিজ্ঞানীসুলভ শিক্ষার্থীর মনোভাব নিয়ে তাঁর তত্ত্বের ভুল স্বীকার ও মূল তত্ত্বের পরিবর্তন করতে নারাজ। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার অসংগতি দেখা দিলে মার্কসবাদী নিম্নলিখিত দুটির একটি (কখনো কখনো দুটিই) কৌশল অবলম্বন করেন। ক. ঘটনার নতুন ভাষ্য দেন ; এবং তার ফলে তত্ত্ববিরোধী ঘটনা তত্ত্বানুকূল বলে, প্রমাণিত হয়ে যায়। খ. মূল তত্ত্বকে অপরিবর্তিত রেখে মার্কসবাদী বিরোধী ঘটনাগুলিকে তত্ত্বানুকূল দেখানোর জন্য একের পর এক নতুন নতুন তত্ত্ব-কল্পনা (এ্যাড হক্ হাইপথেসিস) মূল তত্ত্বের সঙ্গে সংযোজন ক'রে দেন। এর ফলে প্রায়শই তত্ত্বের যৌক্তিক সংগতি ১. এবং সরলতা ৪. ক্ষুণ্ণ হয়। যে-তত্ত্বের মধ্যে সংগতি (কনসিস্টেন্সি) এবং সরলতা (সিম্প্লিসিটি) নেই সেই তত্ত্বকে ক্রমাগত সমর্থন (কনফার্ম) করা যায় কিন্তু ৪. পরীক্ষা (টেস্ট) করা অসম্ভব। আর সে-ক্ষেত্রে সত্যাসত্যবিনিশ্চয়ের প্রশ্নটিও ৫. নিতান্তই একপেশে ব্যবহার-নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। শেষপর্যন্ত বৈজ্ঞানিক সত্যও (অক্ষসহ) শ্রেণীস্বার্থের ভাষ্য-নির্ভর।

মার্কসবাদ যে উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শর্তগুলি লঙ্ঘন ক'রে থাকেন তা ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কসবাদী তত্ত্বের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে অনেক সমালোচক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। একচেটিয়া ধনতন্ত্র স্থাপিত হবার পূর্ব থেকে পর পর্যন্ত ধনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতিতে যে-সব বিরোধ বা সংকট অনিবার্যভাবে দেখা দেবে বলে মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুসারে ভাবা গিয়েছিল তা বস্তুত দেখা দেয় নি। ধনতন্ত্রের যে-সব সমস্যা ছিল এবং আছে তার মার্কসবাদেতর সদ্ব্যাখ্যা

প্রদত্তও হয়েছে। একচেটিয়া ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নেবেই—এই তত্ত্বকে সমর্থন করাতে গিয়ে 'একচেটিয়া ধনতন্ত্র' ও 'সাম্রাজ্যবাদ' পদ দুটির সংজ্ঞায় একাধিকবার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। তাছাড়া 'ধনতন্ত্র' ও 'সাম্রাজ্যবাদের' প্রকৃত স্বরূপ কি এই প্রশ্নের উত্তরদায়ক ভাষ্যেও মূল তত্ত্বকে বাঁচাবার জন্য বার বার পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে। সাম্রাজ্য চলে যাবার পরেও প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সমস্যা (ভাষান্তরে সংকট) কাটিয়ে উঠতে পারবে এ-সত্য মার্কস বা লেনিন ভাবেন নি। এটা তাঁদের অদূরদর্শিতার প্রমাণ নয় ; এটা ইতিহাসস্রষ্টা মানুষদের বুদ্ধি ও শ্রমের ফলশ্রুতি। বর্তমানে যে-সমাজব্যবস্থাকে মার্কসবাদী 'রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র' বলছেন আর গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রী বলছেন 'জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র', সে-সমাজব্যবস্থার কথাও মার্কস বা লেনিনের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না। তথাপি 'তাঁদের মূল তত্ত্ব আজও সত্য' বলার পশ্চাতে শ্রেণী-স্বার্থবুদ্ধি থাকলেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নেই। অবশ্য যদি বলা হয় 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও শ্রেণী-স্বার্থপ্রণোদিত' সে-কথা আলাদা। যে মূল তত্ত্বের মূল কখনোই খণ্ডিত হয় না, কেবলি সমর্থিত হয়, সে-মূল পরাবিদ্যার (মেটাফিজিক্যাল) বিষয় হতে পারে, বৈজ্ঞানিক বিষয় হতে পারে না। মার্কসবাদকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য পরাবিদ্যার নিরাপদ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মার্কস ও লেনিনকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদের আসন থেকে নামিয়ে ভবিষ্যদ্বক্তার অত্যুচ্চ-আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

এবং এর ফলে তত্ত্বের দিক থেকেই শুধু সমস্যা দেখা দেয় নি আরো বিপদ দেখা দিয়েছে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে। যে-সব দেশ নিজেদের মার্কসবাদী বলে নিজেদের দাবি করে সেই সব দেশের অগ্রগণ্য নেতারা ক. মার্কসবাদ, খ. সাম্রাজ্যবাদ, গ. মার্কসবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপায়, ঘ. অ-মার্কসবাদী (এমন কি মার্কসবাদী) দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক, ঙ. মার্কসবাদী দেশসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিরোধী মতে বিভক্ত। মার্কসবাদের একটি মূল তত্ত্ব হল : তত্ত্ব ও ব্যাবহারের মধ্যে অন্বয়। এই অন্বয় আজ গুরুতরভাবে বিনষ্ট। এই বিনষ্টির জন্য মার্কসের দায়িত্ব সামান্যই ; মূল দায়িত্ব মার্কসবাদের সরকারি ভাষ্যকারদের। বিজ্ঞানীকে অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে প্রতিপন্ন করার সর্বগ্রাসী সরকারি প্রচেষ্টা শুরু হলে বিজ্ঞান রূপান্তরিত হয় শাশ্বত পরাবিদ্যায়, বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় অতল গূঢ় তত্ত্বের সমর্থনে ভাষ্যের পর ভাষ্য প্রণয়ন, আর তাঁদের মর্যাদার উত্থান-পতন হয় ক্ষমতাসীন সরকারের কৃপা-নির্ভর। সত্য যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষের স্বার্থের সেবক নয়, সত্য যে সমাজায়ত—মুক্ত জিজ্ঞাসার ঘটনা-নির্ভর উত্তর,—এ কথা একাধিক তিক্ত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মার্কসবাদী মহলের একাংশে তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত ; কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক স্বীকৃতির প্রতিফলন এখনো অস্পষ্ট। মার্কসবাদী ঠিকই বলেন যে, 'সত্য শাশ্বত

নয় ; নীতিধর্মও শাশ্বত নয়।' সত্য ও নীতিধর্মের পরিবর্তনশীলতার মূলে রয়েছে মানব-অভিজ্ঞতার ঐতিহাসিক চরিত্র। এই ঐতিহাসিক চরিত্র একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিবর্তন থেকে ভিন্ন, আরেক দিকে তেমনি ভিন্ন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছা থেকে। সত্য যদি কর্তৃত্বের ইচ্ছা-নির্ভর হয় তাহলে কর্তৃত্বের পরিবর্তন হলেই সরকারি স্তরে সত্যের রূপান্তরণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রূপান্তরিত সত্যের সরকারি ভাষ্য প্রকাশ হতে স্বভাবতই সময় লাগে ; সত্যসন্ধীর পক্ষে অন্তর্বর্তীকাল নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে ব্যক্তি বিজ্ঞানী যে-সত্য লাভ করেন তা যদি সত্যের সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ না করে তাহলে শুধু কর্তৃত্বের জোরেই বৈজ্ঞানিক সত্য উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বস্তুত এ-রকম ঘটনা মার্কসবাদের ইতিহাসে একাধিকবার ঘটেছে। ঔচিত্য-অনৌচিত্যের এই প্রশ্নও বারবার উপেক্ষিত হয়েছে ধর্মাধর্মের শ্রেণী-ভাষ্যের প্রভাবে।

৬

উপসংহার। যে-মতবাদই মানব জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে সে-মতবাদকেই বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মার্কসবাদও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম নয়। মার্কসবাদের ত্রুটি তার শক্তি ও সাফল্যের অপ্রমাণ নয়। কিন্তু মার্কসবাদের গুরুত্ব শুধু তার ব্যাবহারিক শক্তি ও সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তাহলে মার্কসবাদকে নাৎসিবাদেরই সমপর্যায়ভুক্ত করা যেত। ইতিহাসের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ না ক'রেও এ কথা বলা যায় যে, মার্কসবাদ দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের এক সুগভীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটিয়েছে এবং মেটাচ্ছে। মার্কসবাদ ইতিহাসের নিয়তির অবদান নয় ঠিকই ; কিন্তু যে-প্রয়োজন মার্কসবাদ মিটিয়েছে তার উপযুক্ত বিকল্প মানুষের মনীষা যথাসময়ে উপস্থাপন করতে পারে নি। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদের বিকল্প আজ ধীরে-ধীরে দেখা দিচ্ছে। তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-বিকল্প অনেক দিন ধরেই ছিল। মার্কসবাদের বৈশিষ্ট্য হল এই সত্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরা যে, তাত্ত্বিক বিকল্প যদি ব্যবহারযোগ্য বিকল্প না হয় তবে তার মূল্য স্বল্পই। মার্কসবাদীর অসুবিধা হল তার মতবাদে 'বিকল্প' মাত্রই বিবদমান কিংবা ভ্রান্ত, এবং তাই বিকল্পই নয়। যদিচ তত্ত্বের স্তরে এ-কথা আজ কোনোকোনো মহলে স্বীকৃত যে সমাজতন্ত্রের পথ বহুবিধ, কিন্তু ব্যাবহারিক স্তরে এই স্বীকৃতির প্রমাণ খুবই দুর্বল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী

মার্কসবাদ ও বিপ্লব

মার্কসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এঙ্গেলস বলেছিলেন মার্কসের সব চেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি বিপ্লবী। এঙ্গেলস আরও বলেছিলেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পতন ঘটানো, সেই ব্যবস্থা যে রাষ্ট্র-যন্ত্রের জন্ম দিয়েছে তাকে ধ্বংস করা এবং আজকের দিনের শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্ত করাই ছিল মার্কসের জীবনের ব্রত। এঙ্গেলসের মৃত্যুতে লেনিন বলেছিলেন যে ইয়োরাপের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের বিজ্ঞান ও কর্মপদ্ধতির সৃষ্টি করেছিলেন দু-জন পণ্ডিত ও যোদ্ধা। মার্কসবাদ মার্কস আর এঙ্গেলসের যৌথ সৃষ্টি। পরে লেনিন, স্তালিন ও মাও সে-তুংএর চিন্তা এবং সংগ্রাম এই মতবাদটিকে আরও বিকশিত ক'রে শ্রমিক-শ্রেণীর পরিবেশ ও যুগ-পরিস্থিতির উপযোগী শাণিত অস্ত্র হিসেবে তার সক্রিয়তা অটুট রেখেছে। মার্কসবাদের জন্ম থেকে আমাদের কাল অবধি তার বিস্তৃতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। মার্কসবাদের জন্মের মূলে কোন্ প্রেরণা কাজ করেছিল? প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করার প্রেরণা। মার্কসের বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়: দার্শনিকেরা জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে জগৎটাকে বদলে দেওয়া। মার্কস পূর্বাচার্যদের কথা সবিনয়ে বলেছেন, কিন্তু অবিনীত সত্য কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে মার্কসের পূর্বে জগৎ ও জীবনের গতিপ্রকৃতি ও রূপান্তরের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অন্য কোনোও দার্শনিক উপস্থিত করতে পারেন নি। সেই বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মার্কসবাদেরই অবিস্মরণীয় দান। সমাজব্যবস্থাকে বদলাবার কথা কিন্তু মার্কসের বহু যুগ আগে উৎপীড়িত এবং উদার মানুষের মনে জেগেছে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

অতি প্রাচীন জিনিষ। আধুনিক যুগে তা আরও সংহত রূপ নিয়েছে, চিন্তা ও কল্পনাকে আকুল ক'রে তুলেছে। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার অনগ্রসরতার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও সচেতনতার দুর্বলতার জন্য সমাজ-কাঠামোর সঠিক বিশ্লেষণ এগোয় নি এবং তাই শুভকামনায় উদ্বেল মনের কল্পনা রঙিন স্বপ্নে মুখর হয়েছে, সমাজে কোন্ শক্তি জয়ী হবে এবং কোন্ সংগ্রামের পথে শোষণকে ধ্বংস করবে তার আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নি। যাঁরা সমাজবাদের স্বপ্নই শুধু দেখতেন, রাত্রির অন্ধকার বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকালকে ছিঁড়ে আনবার কথা ভাবতে পারতেন না, সেই ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট বা কল্পজগৎ-বিহারী সমাজ-বাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকে দেখতেন এক উৎপীড়িত অসহায় জনসমষ্টি হিসেবে। কেউ কেউ অপেক্ষা ক'রে থাকতেন এক অমিত-বিক্রম মহামানবের জন্য যিনি স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে বিশ্বমানবের বন্ধনশৃঙ্খল নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। ইতিহাসের যারা প্রকৃত স্রষ্টা সেই জনতার উপর এই স্বপ্নচারী সমাজবাদীদের কোনো আস্থা ছিল না। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে উপলব্ধি করলেন এবং প্রচার করলেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে সেই সামাজিক শক্তি যা সমাজবিপ্লব ঘটিয়ে বহুবাঞ্ছিত রূপান্তরের মাধ্যমে মানুষকে নতুন জীবনে পৌঁছে দিতে পারে।

মার্কসের বিপ্লব-চিন্তা ১৮৪৪ থেকে সুস্পষ্ট রূপ নিতে আরম্ভ করে। তাঁর এই সময়ের লেখা প্রবন্ধে বুর্জোয়া বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের সংজ্ঞা তিনি সর্বপ্রথম মোটামুটিভাবে উত্থাপন করেন। হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছালেন যে প্রগতিশীল দর্শনের কাজ হচ্ছে ধর্ম-বিরোধী সংগ্রামকে সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করতে হবে যে-সমাজব্যবস্থা ধর্মকে জন্ম দেয় এবং লালন ক'রে প্রবল ক'রে তোলে। উপলব্ধি করলেন যে 'স্বর্গ' না হয়ে 'মর্ত' হোক সমালোচনার বিষয়বস্তু, ধর্মতত্ত্বের সমালোচনার মোড় ঘুরিয়ে তাকে করা হোক রাজনীতির সমালোচনা। মার্কস এই প্রসঙ্গে এ-কথাও বললেন যে সে-সমালোচনাকে করতে হবে জোরদার এবং বৈপ্লবিক। কিন্তু আমাদের সতর্ক ক'রে দেবার জন্য আশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গে তক্ষুণি বললেন বিপ্লবী বলপ্রয়োগের প্রয়োজনের কথা। তাঁর সেই উক্তি সমালোচনা-সর্বস্ব মেকি বিপ্লবীদের মুখের সামনে উদ্যত তর্জনীর মতো: 'বলাবাহুল্য, সমালোচনা-অস্ত্রটি অস্ত্রের দ্বারা সমালোচনার প্রয়োজন মেটাতে পারে না, বস্তু-শক্তিকে বস্তু-শক্তিই পরাজিত করতে পারে, তবে থিয়রি বা মতবাদও জনতার মনকে আঁকড়ে ধরা মাত্র বস্তু-শক্তি হয়ে ওঠে[১]।' প্রশ্ন উঠতে পারে: মতবাদ কখন মনকে আঁকড়ে ধরতে পারে? উত্তরে মার্কস বলছেন: যখন মতবাদ জন-স্বার্থে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। মতবাদের মধ্যে জনসাধারণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলোকে প্রতিফলিত দেখলেই সেটাকে আপনার জিনিষ বলে জড়িয়ে

ধরে। একটা মন-গড়া আইডিয়া বা আদর্শ নিয়ে সামনের দিকে জোর ক'রে এগোতে গেলে কোনো ফল হবে না, যদি-না বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই সেই আদর্শের জন্ম হয়। মার্কস বললেন নতুন জীবনদর্শন হবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দাবি-দাওয়ার সংগ্রামের দর্শন—সে-দর্শন সত্যিকার সার্থকতায় তখনই পৌঁছাবে যখন সর্বহারারা নিশ্চিহ্ন হবে, অর্থাৎ তারা যখন হবে সর্বজয়ী। দর্শনের বাস্তব হাতিয়ার হচ্ছে সর্বহারারা আর সর্বহারাদের মনের হাতিয়ার হচ্ছে দর্শন।

তরুণ মার্কসের মনের এই দূরনিরীক্ষা ভবিষ্যতের মর্মভেদের প্রয়াস সমাজ-চিন্তায় নতুন আলোকপাত। তাঁর পথের সবটা তখনও আলোকিত হয়ে ওঠে নি। আলোছায়ার মধ্যে পথের রেখা ফুটে উঠতে শুরু করেছে মাত্র। বিপ্লবী মার্কসের আবির্ভাব হয়েছে। জনসাধারণ এবং বিশেষ ক'রে শ্রমিকশ্রেণীকে সম্বোধন ক'রে মার্কস সমাজ বদলাবার প্রস্তাব ও নির্দেশ তাদের সামনে উপস্থিত করছেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের বিপ্লবতত্ত্বকে আরও বিকশিত ক'রে তুললেন তাঁদের 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থটিতে। বার্লিন থেকে প্রকাশিত ব্রুনো বাউয়ার ও তাঁর ভাইদের এবং তাঁদের সহগামীদের লেখার জবাব হিসেবে 'পবিত্র পরিবার' বইখানি বাউয়ার-গোষ্ঠীকে বিদ্রূপ করল এবং সুযুক্তিপূর্ণ কঠোর সমালোচনা করল। জবাবটি অনেক দেরিতে বার হয় বলে কেউ কেউ বলেন যে এ যেন মরা গাধাকে পেটানোর ব্যাপার। কিন্তু বাউয়াররা তেমন জমাতে পারেন নি বলে তাঁদের মরা গাধা বলা বোধ হয় একটু বাড়িয়ে বলা, আর ঐ জাতীয় গাধা যে সহজে মরে না আধুনিক চীনের অতন্দ্র সাংস্কৃতিক বিপ্লব তার প্রমাণ। নতুন দর্শনের সংগ্রামী ভূমিকা কত যুগ ধরে যে চালাতে হবে তা আজকের দিনের চীনও সঠিকভাবে বলতে পারছে না, মার্কসের পক্ষে সে-আমলে বলা তো আরও অসম্ভব ছিল। মার্কস-এঙ্গেলস দেরিতে হলেও জবাব দিয়ে ঠিকই করেছিলেন। সে-জবাবের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের বিপ্লব সম্পর্কে বক্তব্য আগের চাইতে আরও খানিকটা এগিয়েছিল।

ব্রুনো বাউয়ারের দল বলেছিলেন যে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসের সব বড়ো বড়ো আন্দোলন শুরু থেকেই বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং ব্যর্থতার অভিশাপ বহন করেছে, কারণ জনতা সেগুলোতে উৎসাহ নিয়ে জড়িয়ে পড়ে অথবা পরম আগ্রহে সেগুলোকে সমর্থন করে। অথবা সেই আন্দোলনগুলোর দুঃখময় অপমৃত্যু ঘটে এই জন্যে যে, যে-ধারণাকে কেন্দ্র ক'রে তারা গড়ে উঠেছিল সে-ধারণাকে একটু ভাসা-ভাসাভাবে উপলব্ধি করলেই হতো, অর্থাৎ সেই আন্দোলনগুলো নির্ভর করেছিল জনতার অবুঝ হাততালির ওপর। এই পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিশ্লেষণ থেকে বাউয়াররা এই সত্যে পৌঁছেছেন বলে মনে করেন যে 'বুদ্ধি' আর 'জনতা' পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ বাউয়ারদের মতো 'বুদ্ধিজীবীরা' মনে করেন যে জনতা আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত এবং মেরুদণ্ডের অভাবে অসুস্থ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুন বাউয়ার-গোষ্ঠীর প্রচারপত্রে সব 'গণ'-আন্দোলনকেই ঘৃণার ঝুল-কালি মাখিয়ে সাজানো হতো। 'পবিত্র' এই পরিবারকে আক্রমণ ক'রে মার্কস দেখালেন যে বুদ্ধিজীবীদের 'আইডিয়া' বস্তুহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' ওঠে না, জনস্বার্থের জমিতে তার শেকড় না থাকলে সে আইডিয়া শুকিয়ে মরতে বাধ্য। বাউয়ারের ফরাসি বিপ্লবের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে মার্কস বললেন সে-বিপ্লব বুর্জোয়া স্বার্থের দিক থেকে 'বিপথে পরিচালিত' হয় নি, বুর্জোয়া স্বার্থসিদ্ধি ভালোভাবেই করেছে। স্বার্থসিদ্ধি হওয়ার পর ফরাসি বিপ্লবের প্রগতির ভূমিকা আর রইল না—জনস্বার্থের দিক থেকে বিপ্লব ব্যর্থ হল। এ-ব্যর্থতা অনিবার্য, কারণ বিপ্লবের মূল প্রেরণা আর জনস্বার্থের মধ্যে বিরোধ ঘটল।

রাষ্ট্র বুর্জোয়া সমাজের বিচ্ছিন্ন অণুগুলোকে এক সঙ্গে গেঁথে রাখে—বাউয়ারের এই তত্ত্বকে আক্রমণ ক'রে মার্কস বললেন যে চরম অজ্ঞ লোকেরাই শুধু বলতে পারে যে রাষ্ট্র বুর্জোয়া সমাজকে ধরে রাখে, তার সংহতিকে রক্ষা করে। আসল কথাটা এর উল্টো—বুর্জোয়া সমাজই রাষ্ট্রকে ধরে রাখে।

ক্রনো বাউয়ার ইতিহাসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে শিল্প ও প্রকৃতির গুরুত্বকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। জবাব দিতে গিয়ে মার্কস বললেন যে বাউয়ারের মতো বিদ্বানরা ইতিহাসবিদ্যার দ্বারপথেও এসে পৌছান নি, কারণ তাঁরা ইতিহাসের অগ্রগতির প্রবাহ-পথ থেকে মানুষের প্রকৃতির প্রতি, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রতি এবং শিল্পের প্রতি তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত মনোভাবকে বার ক'রে দিয়েছেন। বাউয়ারের দার্শনিকতা যেমন মননকে অনুভূতি থেকে পৃথক করে এবং মনকে দেহ থেকে পৃথক করে ঠিক তেমনি তা ইতিহাসকে প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে আর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মনে করে ইতিহাসের জন্মস্থান ঊর্ধ্ব আকাশের কুহেলিকাময় মেঘলোকে, মাটির পৃথিবীতে বস্তু-উৎপাদনের কঠিন কঠোর কর্মক্ষেত্রে নয়।

'পবিত্র পরিবার' বইখানিতে মার্কস এবং এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস-নির্দিষ্ট বিপ্লব-ব্রত বিবৃত করেছেন। দেখিয়েছেন যে আদিম সাম্যবাদী সমাজের ইতিহাস বাদ দিলে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছে শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম। ঘোষণা করেছেন যে সর্বহারারাই ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়ে। সর্বহারাদের বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রায় পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তার সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বও রক্ষা ক'রে চলতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য নির্দেশে শ্রমিকশ্রেণীও নিজের অসহনীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তার বিরোধী শক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ধ্বংস করতে বাধ্য। কারণ সেই শক্তিই সর্বহারাকে সর্বহারা ক'রে রেখেছে। এই যে পারস্পরিক বিরোধের সম্পর্ক, এর ভেতর সম্পত্তির মালিক হচ্ছে সংরক্ষণশীল এবং সর্বহারা শ্রেণী হচ্ছে ধ্বংসপন্থী। মালিক-

শ্রেণী বিরোধের সম্পর্ক অটুট রাখতে খুবই সক্রিয়, কারণ বিরোধ-রক্ষা মানেই সম্পদ-রক্ষা। অপর পক্ষ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী বিরোধের সম্পর্কটাকে ধ্বংস করতে চায়, কারণ বিরোধকে চুরমার করতে পারলে তাদের যুগযুগান্তের শেকলও গুঁড়িয়ে যাবে। ধনিক শ্রেণী সৃষ্টি করে সর্বহারাকে, সৃষ্টি করে সর্বহারার নিজের দেহ মনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে চেতনাকে, অমানুষদের অমনুষ্যত্ব সম্বন্ধে বোধকে এবং সেই অমানুষিক অবস্থাকে শেষ ক'রে দেবার সংকল্পকে।

ইতিহাসের বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাজে সর্বহারার ভূমিকাকে সবার উপরে স্থান দিয়ে মার্কস তাদের দেবতা ক'রে তুলছেন—এই অভিযোগ সম্পর্কে তাঁর উত্তর এই : পরিপূর্ণভাবে বিকশিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ও জীবিকা-ব্যবস্থা সমসাময়িক সমাজের অমানুষিক অবস্থার কেন্দ্রবিন্দু, সর্বহারার মধ্যেই মানুষের সর্বরিক্ত রূপ প্রস্ফুট, আবার এই সর্বহারারাই তত্ত্বের দিক থেকে নিজেদের রিক্ততা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং অবস্থার অনিবার্য চাপে বাধ্য হচ্ছে অমানুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে, সুতরাং এই সর্বহারাদের মুক্তি তাদের নিজেদেরই আনতে হবে। যে-অবস্থা তাদের সৃষ্টি করেছে সেই অবস্থাকে নিঃশেষে ধ্বংস না ক'রে সর্বহারারা নিজেদের মুক্ত করতে পারে না, আর তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধ্বংস করা মানে বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সমস্ত অমানুষিক বিধিব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা—যে-অমানুষিক বিধিব্যবস্থা বা অব্যবস্থা সর্বহারাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যেই জমাট হয়ে দেখা দেয়।

আরও বিশদ ক'রে মার্কস বললেন : কঠোর পরিশ্রম এদের পক্ষে এমন একটি বিদ্যালয় যে তা এদের কঠোর করে তোলে—সেখানকার শিক্ষা নিষ্ফল হয় না। সাময়িকভাবে কোনো একজন শ্রমিক বা অপর আরেকজন শ্রমিক, এমন কি গোটা শ্রমিকশ্রেণী লক্ষ সম্পর্কে কি কল্পনা করল সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী আসলে কি এবং সে আসলে যা তার দরুন ইতিহাস তাকে কোন্ কর্তব্যের পথে প্রবলভাবে ঠেলে দিচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক কর্তব্য আগে থেকে নির্ধারিত আছে—সে-কর্তব্য সুস্পষ্ট এবং অলঙ্ঘ্য হয়ে আছে শ্রমিকদের নিজেদের অবস্থার মধ্যেই, বুর্জোয়া সমাজের গোটা সংগঠনের মধ্যেই। বার বার ক'রে মার্কস ও এঙ্গেলস বললেন যে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সর্বহারাদের এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর ইতিহাস-নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং সেই সচেতনতাকে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতার স্তরে উন্নীত করবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা ক'রে চলেছে।

এই 'পবিত্র পরিবার' বইটির কাছাকাছি সময়ে লেখা 'ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' এঙ্গেলসের নিজস্ব গবেষণার ফল। বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসনে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর দুর্গতির বীভৎসতার বাস্তব চিত্র এই বইটিতে আঁকা হল। তবে সর্বহারার লাঞ্ছনার ছবি আছে বলেই যে মার্কসীয় সাহিত্যে এই বইটি মূল্যবান

তা নয়। কারণ এঙ্গেলসের আগেও দুর্গতদের বর্ণনা অনেকেই পরিবেশন করেছেন—যেমন বুরে, গ্যাসকেল প্রমুখ এবং তাঁদের লেখা থেকে এঙ্গেলস উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রচুর। বইখানির গুরুত্ব এই জন্যেই যে ইংল্যাণ্ডের ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বিশ্লেষণ ক'রে এঙ্গেলস সে-ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু রূপ আর শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের উপর জোর দিলেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সূত্র প্রয়োগ ক'রে তিনি দেখালেন যে শ্রমিকশ্রেণী তার জন্মদাতা ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থাকে ধ্বংস করবেই করবে ; ঘোষণা করলেন : শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ-তন্ত্রবাদের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের সর্বহারার শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই বইখানি লেখা শেষ ক'রে এঙ্গেলস মার্কসের সঙ্গে ব্রাসেল্‌সে দেখা করলেন। ১৮৪৫-এর বসন্তকাল। এঙ্গেলস এই সময়ের কথা লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে তখন মার্কস তাঁর ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মূল কাঠামোটা তৈরি ক'রে ফেলেছেন এবং তখন থেকে তাঁরা দু-জনে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বহুবিস্তারিত প্রয়োগের যুক্ত প্রয়াসে ব্রতী হলেন[২]।

তাঁদের যুক্ত উদ্যোগে 'জার্মান ভাবাদর্শ' বইখানির সৃষ্টি হল। বইখানির উদ্দেশ্য অবৈজ্ঞানিক জার্মান দর্শনের আলোচনা অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের 'অতীত দার্শনিক বিবেক' সম্পর্কে সমালোচনা। কারণ তাঁরা গোড়ার দিকে হেগেলপন্থী ছিলেন। এই প্রবন্ধে আমরা আপাতত 'জার্মান ভাবাদর্শ' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে জড়িত। কারণ সেখানেই তথাকথিত 'যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে সমালোচনা আছে। কিছু মানবতা, সম্পত্তিবানদের বিরুদ্ধে কিছু প্রোলেতারীয় আক্রমণ, শ্রমিক-সংগঠন, অবনত শ্রেণীগুলোর উন্নয়নের জন্য কিছু করুণ চেহারার গোবেচারী সমিতি গঠন এবং অর্থনীতি ও সমাজের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে সর্বব্যাপী অজ্ঞতা—এই নিয়ে 'যথার্থ সমাজতন্ত্রবাদ'। বিখ্যাত 'কম্যুনিস্ট ইস্তাহার'ও এই খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদের কঠোর সমালোচনা পরবর্তীকালে করেছিল।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব এই বইখানিতে আরও কিছুটা বিশদ হল, দেখানো হল যে বস্তু-নির্ভর কতকগুলো নিয়মের উপরই সর্বহারাদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ভিত্তি। মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করলেন যে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সীমানার বাইরের স্ব-নির্ভর অর্থনৈতিক নিয়মের ক্রিয়ার ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ফলে বিশ্বে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবেই—কোনো শক্তিই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। অনাগত সাম্যবাদী সমাজের মোটামুটি চেহারাটা 'জার্মান ভাবাদর্শ' ফুটিয়ে তুলল।

প্রায় একই সময়ে লেখা প্রবন্ধ হচ্ছে 'ফয়ারবাখ প্রসঙ্গে'। এই প্রবন্ধে যে-কথাটা জোরের সঙ্গে বলা হয় সেটা হচ্ছে এই যে শুধু মনন-চিন্তন যথেষ্ট নয়, তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের প্রয়াসকে যুক্ত করতে হবে, কারণ ব্যাবহারিক প্রয়োগের সঙ্গে বৈপ্লবিক তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তত্ত্বকে আকাশস্থ নিরালম্ব হয়ে থাকলে চলবে না,

তত্ত্ব হবে জীবনের রণক্ষেত্রে ভাঙা-গড়ার দুর্জয় অস্ত্র। ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমরা মার্কসের যে-উক্তিটি উদ্ধৃত করেছি তা ফয়ারবাখের প্রয়োগ-বিমুখতার প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছিল—বিপ্লবী দর্শনের প্রকৃত ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন : দার্শনিকেরা শুধু জগৎকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ; কিন্তু আসল কথা হল জগৎকে পরিবর্তন করা। সমাজকে শুধু জানলে হবে না, পুরনো সমাজকে ভাঙো, নতুন সমাজ গড়ার কাজে হাত লাগাও—এই হল মার্কসের আহ্বান।

এবারে দেখতে হয় মার্কস ও এঙ্গেলস বিপ্লবী গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের ঐক্যের সূত্র গ্রন্থনের কাজে কিভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক উৎস খুঁজতে গেলে দেখব ইয়োরাপের তিনটি প্রধান রাজধানীতে—প্যারিস, ব্রাসেল্‌স ও লণ্ডনে—প্রবাসী জার্মান শ্রমিক সংগঠনগুলোই এর মূলে ছিল। অবশ্য তারা অন্য দেশের প্রতিনিধিদেরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঙ্গে পেত। এই জার্মান সংগঠনগুলো কিন্তু প্রায়ই জার্মানির কল্পনা-সর্বস্ব 'কম্যুনিস্ট' ভাইটলিংএর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করত।

বিপ্লবী দর্শন ও কর্মধারার আলোচনায় ভাইটলিং এবং তাঁর সঙ্গে ফরাসি দেশের প্রুধঁ এসে পড়বেনই। আমাদের মনে রাখতে হবে যে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিপ্লবী দর্শনকে শ্রমিক জনসাধারণের কাছে পৌছাতে দুটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। এক, বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে। দুই, পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণীর নানা রকমের সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে। তথাকথিত সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মধুকুঞ্জে স্বপ্ন-শয়নে এলিয়ে দিত। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু বুর্জোয়া শোষকদেরই এতে লাভ হতো। ভিলহেল্‌ম ভাইটলিং ছিলেন কাল্পনিক সাম্যের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর এবং তাঁর সহগামীদের মুখরোচক প্রচারে বলা হতো ভালবাসা আর ভ্রাতৃভাবের কথা—উদ্দেশ্য হল সর্বহারা ও সর্বস্বাপহারকদের মধ্যেকার বৈরিতাকে প্রলেপের সাহায্যে সর্বহারার পক্ষে খানিকটা সহনীয় ক'রে তোলা এবং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শ্রেণী-সহযোগিতার পরিবেশ রচনা করা। প্রুধঁর দর্শনের সঙ্গেও সংঘর্ষের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রুধঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রবন্ধের উত্তরে ১৮৪৭-এ মার্কসের লিখতে হল 'দারিদ্র্যের দর্শন' এই প্রবন্ধটিতে মার্কস ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করলেন এবং মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধে বললেন শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির শর্ত হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণীর অবলুপ্তি। সর্বহারা ও বুর্জোয়াদের মধ্যে যে-বিরোধ তা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, কারণ এই বিরোধকে তার চরম পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলেই পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটবে। শ্রেণীহীন সমাজ যেদিন আসবে শুধু সেদিনই

শ্রেণীতে-শ্রেণীতে সংঘর্ষের অবসান হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন প্রতিটি সামাজিক রূপান্তরের পূর্ব-মুহূর্তে সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত কথা হচ্ছে: 'জয়লাভ অথবা মৃত্যু! রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা অবলুপ্তি! প্রশ্নটা এই রকম নির্মমভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায়।' উদ্ধৃতিটি মার্কস নিলেন জর্জ সাঁদ থেকে। প্রুদঁর প্রবন্ধের উত্তরের উপসংহারে এই রকম সংহারের কথাই মার্কসকে বলতে হল—কারণ, বুর্জোয়া দার্শনিকদের মুখের মতো জবাব এটাই।

'দর্শনের দারিদ্র্য' প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উত্থাপন করা বাকি আছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে মার্কসীয় অর্থনীতির ভিত্তি রচিত হল এই প্রবন্ধে। সঙ্গে সঙ্গে বলা ভালো যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ ক'রে মার্কস এখানে প্রমাণ ক'রে দেখালেন যে শোষণ, দারিদ্র্য, সংকট, মন্দা ধনতন্ত্রবাদের নিত্যসঙ্গী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উৎসাদনের মধ্য দিয়েই মানবসমাজ এই অভিশাপগুলো থেকে মুক্ত হবে। সর্বহারার বিশ্বজোড়া ঐতিহাসিক ভূমিকার ব্যাপারে তিনি অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের তাৎপর্যও তুলে ধরলেন এবং সর্বহারার শ্রেণী-সংগ্রামের কৌশলের প্রথম আভাস দিলেন।

বিপ্লবী গ্রন্থ থেকে বিপ্লবীদের গ্রন্থন বা সংঘবদ্ধ করার প্রসঙ্গ তুলে একটু দূরে সরে গেছি। যথাস্থানে ফিরে আসা যাক।

বিপ্লবীদের সংগঠন হিসেবে কম্যুনিস্ট লীগ নামের প্রতিষ্ঠানটি সুপরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্মের সূত্র ধরে পেছনের দিকে গেলে আমরা দেখব যে জার্মান উদ্বাস্তুদের গোপন সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছিল সে-যুগের পৃথিবীর বিপ্লবের কেন্দ্র প্যারিসে। জন্ম-তারিখ ১৮৩৪, নাম নির্বাসিতদের লীগ। ১৮৩৬-এ অপেক্ষাকৃত জঙ্গী কর্মীদের চেষ্টায় পুনর্গঠিত হয়ে নাম হল ন্যায়পরায়ণদের লীগ। লীগের সভ্যরা ১৮৩৯এর অভ্যুত্থানে ফরাসি বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেন। লীগের নেতারা নির্বাসিত হলে পর তার কেন্দ্রীয় দপ্তর প্যারিস থেকে লণ্ডনে উঠে যায়। এঙ্গেলস লিখেছেন যে লণ্ডনে আসার পর থেকে এই লীগ একটি জার্মান সংগঠন থেকে ক্রমে এক আন্তর্জাতিক সংগঠনের রূপ নেয়। 'সব মানুষ ভাই ভাই'—সভ্যদের কার্ডের উপর এই কথা ছাপানো থাকত।

মার্কস ও এঙ্গেলসের ইংল্যাণ্ডের চার্টিস্টদের এবং ফ্রান্সের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যেমন যোগ ছিল তেমনি এই ন্যায়পরায়ণদের লীগের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখে তাঁরা চলতেন, কিন্তু গোড়ার দিকে তাঁরা লীগের সভ্য হতে আপত্তি জানান। আপত্তির কারণ এই যে লীগের ভ্রান্ত কাল্পনিক সাম্যবাদী তত্ত্ব এবং সংকীর্ণ গোপন সংগঠনের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তাঁরা মনে করতেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রাসেল্‌সে জার্মান শ্রমিক সঙ্ঘ বলে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন—একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য

ক্রমে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন। ব্রাসেল্‌সে কম্যুনিস্ট পত্রালাপ সমিতি নামে একটি সমিতিও স্থাপিত হল। তার পর ব্রাসেল্‌সের এই সমিতি ইংল্যাণ্ডের চার্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, লীগের লণ্ডন শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এবং তার প্যারিস শাখার সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন করে। জার্মানির কয়েকটা কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গেও কথাবার্তা হয়। লণ্ডনেও একটি সহযোগী পত্রালাপ সমিতি স্থাপিত হয়। নতুন মতবাদ, অর্থাৎ মার্কসবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করে। ন্যায়পরায়ণদের লীগের একজন প্রতিনিধি ১৮৪৭এর বসন্তকালে ব্রাসেল্‌সে এসে মার্কসের সঙ্গে এবং প্যারিসে এঙ্গেলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এবারে লীগে যোগ দিতে রাজী হলেন। ১৮৪৭এর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে লীগের প্রথম কংগ্রেস হল। মার্কস ও এঙ্গেলসের পরিকল্পনা অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণদের লীগের পুনর্বিন্যাস হল। লীগ গোপন সমিতির ঐতিহ্য বর্জন করল। তার নতুন নাম হল কম্যুনিস্ট লীগ। পুরনো দিনের আহ্বানবাণী 'সব মানুষ ভাই ভাই' বর্জন ক'রে কম্যুনিস্ট লীগ নতুন ডাক দিল : 'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!' এই বাণী-পরিবর্তনের মার্কসীয় তাৎপর্য লক্ষ করবার মতো। 'সব মানুষ ভাই ভাই' আর 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' একই জিনিষ—ধোঁয়াটে মানবতার ঘোলাটে প্রচার। আসলে সব মানুষ তো ভাই ভাই নয়। শোষক মানুষ আর শোষিত মানুষ ভাই ভাই নয়। মুষ্টিমেয় অথচ বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী শোষকরা বিশ্বের শোষিত জনসাধারণের পরম শত্রু, তাদের শত্রু মনে করতে হবে, শত্রুর মতো তাদের ঘৃণা করা মুক্তিকামী মানুষের পবিত্র কর্তব্য, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানের তাই সঠিক স্লোগান হল 'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!' সংক্ষিপ্ততার জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষিপ্ততার খানিকটা কথা এখানে বাদ থেকে গেল, সে-কথা হচ্ছে : 'উপড়ে ফেলো শোষকদের শাসন-ক্ষমতা!' শুধু মানবতাবাদে আমাদের চলবে না, প্রোলেতারীয় মানবতাবাদ চাই—এই বোধ জাগাবার জন্যেই মার্কস ও এঙ্গেলস নতুন স্লোগান উচ্চারণ করলেন। যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় বিপ্লবের লক্ষ এইভাবে ঘোষিত হল 'লীগের লক্ষ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা, সর্বহারার শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণী-সংঘর্ষভিত্তিক পুরনো বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং শ্রেণীহীন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি-শূন্য নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন।'

লীগের দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় ১৮৪৭এর ডিসেম্বরে, লণ্ডনেই। মার্কস সেখানে তাঁর নতুন তত্ত্ব বিবৃত করেন এবং প্রস্তাবিত নতুন নীতিগুলো সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর ভার পড়ে সম্মেলনে গৃহীত আদর্শ ও কার্যক্রম অনুযায়ী একটি ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার রচনা করবার।

সমসাময়িক জার্মানিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর যে সংগ্রাম চলছিল মার্কস ও এঙ্গেলস তাতে সর্বহারাদের বুর্জোয়াদের সঙ্গে যোগ দিতে বললেন, কারণ বুর্জোয়াদের তখনকার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। বিপ্লবী মার্কসবাদ যে গোঁড়া

মতবাদ নয়, কর্মক্ষেত্রে পথনির্দেশ করাই তার কাজ—এঙ্গেলসের এই বিখ্যাত কথাটির অনেক প্রমাণের মধ্যে এটি একটি প্রমাণ। কম্যুনিস্ট লীগের কাজ ছাড়াও মার্কস ও এঙ্গেলস ব্রাসেল্‌জে গণতান্ত্রিক সমিতি বলে একটি সমিতি গড়তে উদ্যোগী হলেন। লক্ষ: গণতান্ত্রিকদের আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলা। তারা বিনা দ্বিধায় সংকীর্ণতা-বিরোধী এই আদর্শ প্রচার করলেন যে সর্বহারাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করা। জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে উৎসাহিত করাই ছিল মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্দেশ্য।

লীগের প্রস্তাবিত কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথমে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হল লণ্ডনে, ১৮৪৮এর ফেব্রুয়ারিতে—ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্তে। যে-বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথাগুলো তাঁরা ইতিপূর্বে মোটামুটি প্রচার করেছেন সেগুলোকেই আরও সুস্পষ্ট ও সংহত ক'রে মার্কস ও এঙ্গেলস এই ইস্তাহারে প্রকাশ করলেন। তার সঙ্গে থাকল বিপ্লবের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা। ১৮৮২তে প্রকাশিত রুশ সংস্করণের ভূমিকায় আছে যে এই ইস্তাহারের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আসন্ন ধ্বংসের কথা প্রচার করা।

কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী, সর্বহারাদের সংগ্রামের পথপ্রদর্শক বিপ্লব-তত্ত্ব ও প্রয়োগপদ্ধতির চুম্বক। যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত ক'রে এতে দেখানো হল যে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতার দরুন শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা কেটে যায় এবং তার পরিবর্তে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক ঐক্য—সান্নিধ্যের ফলে। সুতরাং বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেরাই তাদের কবর খোঁড়বার লোক সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এই শ্রেণীর পতন এবং সর্বহারাদের উত্থান দুই-ই অনিবার্য।

পার্টি এবং আশু দাবিদাওয়া সম্পর্কে ইস্তাহারে যে-কথাগুলো আছে তার সংশোধন পরবর্তীকালে কার্যক্ষেত্রে হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলটিতে করা হয় নি, পুরনো স্মৃতির আধার বলে সেটাকে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কম্যুনিস্ট-দের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ইস্তাহারে যা বলা হয়েছে সেটাই কম্যুনিস্ট পার্টি-গুলোর পক্ষে প্রযোজ্য। সফল সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণীকে নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র কম্যুনিস্টরাই। কারণ তারাই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সর্বাগ্রগামী অংশ, কারণ তারা বৈপ্লবিক তত্ত্বের অস্ত্র হাতে পেয়ে যুদ্ধের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। সেই তত্ত্বের সাহায্যে তারা পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে পারে, সংগ্রামের অগ্রগতি ও ফলাফল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারে।

সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম ধাপ হচ্ছে শাসনক্ষমতা দখল করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামে জয়ী হওয়া। এই কথা বলে এই ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলছেন সর্বহারা শ্রেণী তার রাজনৈতিক আধিপত্যকে ব্যবহার করবে ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর

হাত থেকে সব মূলধন ছিনিয়ে নিতে, রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত করতে এবং উৎপাদনের শক্তি যত দ্রুত সম্ভব বৃদ্ধি করতে। এইভাবে ক্রমবিকাশের ফলে যখন শ্রেণীগুলো নিশ্চিহ্ন হবে, উৎপাদনের উপর সমাজের সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতা নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা আসলে এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা। দাবিয়ে রাখার প্রয়োজন শেষ হলে সাম্যবাদী সমাজ দেখা দেবে, আমরা এমন একটি সমাজে বাস করব যেখানে প্রত্যেক মানুষের অবাধ বিকাশই হবে সবার অবাধ বিকাশের পূর্ব-শর্ত।

প্রোলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ঘোষণাও কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। মার্কস ও এঙ্গেলস বললেন যে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ফলে জাতি-সমস্যার সমাধান হবে, অর্থাৎ একজাতির উপর আরেক জাতির শোষণ পীড়নের অবসান ঘটবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পোল্যাণ্ডের ১৮৩০-এর অভ্যুত্থানের কথা। ম্যানিফেস্টো লেখার কাছাকাছি সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস সেই অভ্যুত্থানের একটি স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছিলেন সর্বহারার সার্থক বিপ্লব উৎপীড়িত জাতিগুলোর মুক্তি এনে দেবে। এঙ্গেলস জাতি-সমস্যার সমাধানের এই বিখ্যাত সূত্রটি সেদিন তুলে ধরেছিলেন: 'কোনো জাতিই স্বাধীন হতে পারে না যদি সে অন্য জাতিদের পীড়ন করে।'

কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বহু-উচ্চারিত শেষ কথাগুলো উদ্ধৃত ক'রে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের এই পর্বের কথা শেষ করি:

> 'কম্যুনিস্টরা তাদের মতামত ও লক্ষগুলোকে গোপন করতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষে পৌছানো যায় কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের সাহায্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে। শাসক-শ্রেণীগুলো কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ভয়ে কেঁপে উঠুক। শেকল ছাড়া সর্বহারাদের আর কিছু হারাবার নেই। একটা গোটা দুনিয়া জয় করবার আছে।
>
> 'সব দেশের শ্রমিকরা, জোট বাঁধো!'

ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্ব-মুহূর্তে কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয়েছিল, এ-কথা বলেছি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব 'বুর্জোয়া রাজা' লুই ফিলিপকে গদিচ্যুত করে। বুরবঁ রাজবংশের পতনের পর তিনি গদিতে বসেছিলেন ফ্রান্সের ব্যাংক-মালিকদের নায়েব হিসেবে। শ্রমিকশ্রেণীর বিরাট চাপে লুই-র পতনের পর প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। বিত্তবানরা ক্ষমতা দখল করল। যাদের বিপ্লবী আক্রমণে লুই-র স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হল সেই শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করাই হল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রথম কাজ। শ্রমিকরা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঐ বছরের জুন মাসের শ্রমিক-অভ্যুত্থান পরাজিত হল। ক্রমে লুই ফিলিপের

সময়কার মতো পুঁজির বড়ো বড়ো মালিকদের হাতেই আবার রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে গেল।

বিত্তবানদের নিজেদের মধ্যেকার মতান্তরের সুযোগ নিয়ে এক ভাগ্যান্বেষী, সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বংশধর, লুই বোনাপার্ট নিপীড়িত কৃষক জনতার সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে ১৮৫১তে আকস্মিকভাবে ক্ষমতা দখল করল এবং সার্বভৌম শাসক হয়ে বসল। লুই বোনাপার্ট তার ভাগ্যান্বেষী-বাহিনী নিয়ে যে-শাসন কায়েম করল ইতিহাসে তার নাম হচ্ছে 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য'—লুই নিজেকে ঘোষণা করল সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বলে।

ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সময় মার্কস ব্রাসেল্‌জ থেকে নির্বাসিত হলেন, কারণ বেলজিয়ামের সরকার বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতে আতংকিত হয়েছিল। ভালোই হল, মার্কস ফ্রান্সের বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য প্যারিসে এলেন। জার্মানিতেও তখন বিপ্লব আসন্ন। এই সময় বিপ্লবী অভিযাত্রী বাহিনী গঠন ক'রে অন্য দেশে বিপ্লব করতে যাবার উন্মত্ত আগ্রহ প্যারিসকে উত্তপ্ত ক'রে তুলেছিল। মার্কস এবং তাঁর সহকর্মীরা জার্মান কবি হেরভেগের 'জার্মান মুক্তি-বাহিনী' গঠন ক'রে প্যারিস থেকে জার্মানি আক্রমণ করার উদ্ভট পরিকল্পনাকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। কারণ মার্কসবাদের পরিষ্কার নির্দেশ বিপ্লব বাইরে থেকে আমদানি করা যায় না।

১৮৪৮-এর এপ্রিল মাসে মার্কস, এঙ্গেলস এবং তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা প্যারিস থেকে জার্মানিতে গেলেন। সেখানে তখন বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। তাঁরা ঘাঁটি করলেন কোলোনে। কম্যুনিস্ট লীগ এখানে সংগঠনের কঠিন কাজে ব্রতী হল। জার্মান শ্রমিকশ্রেণী তখন খুবই দুর্বল, অসংগঠিত এবং রাজনীতিবোধের দিক থেকে বেশ অপরিণত। সুতরাং পার্টি গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তাই মার্কস ও এঙ্গেলস অন্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে কাজ শুরু করলেন এবং 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইতুং' নামে একটি কাগজ বার করলেন। এই পত্রিকায় মার্কস ও এঙ্গেলস আঠারোশ' আটচল্লিশ ও উনপঞ্চাশের ঝোড়ো দিনগুলোর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তখন প্যারিস ও ভিয়েনায় পথে পথে আর জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড ও চেক্‌দের অঞ্চলে শহরে-জনপদে জনতার যে-সংগ্রাম চলছিল তা তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় তুলে ধরছিলেন, যাতে আগুন আরও ছড়ায়। মার্চ মাসের অগ্নিময় সংগ্রামের ফলে জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে পা দিয়ে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল এবং শোষিত শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকের ব্যবহার শুরু করল—কৃষকসমাজ এবং অ-জার্মান জাতিগুলোর উপর হিংস্র নীতি চালাতে লাগল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইতুং' সুস্পষ্ট ও প্রচণ্ড প্রতিবাদ ঘোষণা করে চলল। প্যারিসের শ্রমিকদের ১৮৪৮-এর জুনের অভ্যুত্থান—ফ্রান্সের ইতিহাসে বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে প্রথম গৃহযুদ্ধ। এর তাৎপর্য

ব্যাখ্যা ক'রে 'নয়ে রাইনিশে' বিদ্রোহীদের আশ্চর্য বীরত্বের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

ক্রমে ইয়োরোপের সর্বত্র প্রতি-বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। মার্কস আর এঙ্গেলস তো শুধু তাত্ত্বিক নন, তাই তাঁরা জনতাকে হতাশা থেকে রক্ষা করবার জন্যে সংগঠিত ক'রে তুলতে নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রাশিয়ার সরকার জাতীয় পরিষদকে যখন বের্লিন থেকে ব্রাণ্ডেনবুর্গে স্থানান্তর করবার হুকুমনামা জারি করল মার্কসের উদ্যোগে তখন আঞ্চলিক গণ-তান্ত্রিক কমিটি জনসাধারণকে আহ্বান জানাল সরকারকে অর্থসাহায্য না করতে এবং সশস্ত্র বাহিনী গঠন ক'রে সরকারি ট্যাক্স আদায়ের জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে। কিন্তু জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে গেল। বুর্জোয়া আর পেতি-বুর্জোয়া-দের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে প্রাশিয়ায় প্রতি-বিপ্লব জয়ী হল। মার্কস বিপ্লবের নতুন জোয়ার আসবে আশা ক'রে প্যারিসে চলে এলেন। জার্মানির পালাটিনেট অঞ্চলে তখনো বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতি-বিপ্লবীদের লড়াই চলছিল। এঙ্গেলস সেখানে স্বেচ্ছাসৈন্যের একটি বাহিনীতে নাম লিখিয়ে চারটি খণ্ডযুদ্ধে যোগ দিলেন।

১৮৪৯এর জুনে ফ্রান্সের পেতি-বুর্জোয়াদের নিষ্ফল সংগ্রামের পর সরকার মার্কসকে নির্বাসিত করল। তিনি লণ্ডনে চলে গেলেন এবং এঙ্গেলস ও কম্যুনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও লণ্ডনে এলেন।

'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম ১৮৪৮-৫০' এবং 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' (অর্থাৎ 'কু দেতা' বা আকস্মিক ক্ষমতা-দখল)—মার্কসের এই দুখানি প্রবন্ধ-সংকলনে ফ্রান্সের যে-বৈপ্লবিক সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা এইমাত্র উপস্থিত করলাম তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। এই লেখাগুলোতেই মার্কস সর্বপ্রথম ইতিহাস-বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করলেন।

মার্কসের বিশ্লেষণ থেকে আমরা যে ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের প্রয়োজনে মনের মধ্যে সঞ্চয় করব তা এই ১৮৪৮-এর বিপ্লবে চালিকা শক্তি ছিল শ্রমিক-শ্রেণী, কিন্তু তারা বুর্জোয়া শ্রেণীকেই গদি দখল করতে সাহায্য করেছিল॥ বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পেয়ে শ্রমিকদের আক্রমণ করল, তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে পরাজিত করল॥ তবে এর ফলে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের বিরুদ্ধেই কাজ করল, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করল এবং পরিণামে নিজেদের হাতেও শাসনকর্তৃত্ব রাখতে পারল না॥ পেতি-বুর্জোয়া 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি' নিতান্তই ফাঁপা জিনিষ—পার্লামেণ্টে গলাবাজির সাহায্যে ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ করবে, এই স্বপ্নে সে বিহ্বল। পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে এই মোহ জনস্বার্থ-বিরোধী—'পার্লামেণ্টারি বাতুলতা' হল এর সঠিক নাম॥ বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদীদের শাসন-শোষণের যন্ত্র—বুর্জোয়া শ্রেণীর অবাধ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ॥ ইতিপূর্বে সব বিপ্লবই রাষ্ট্রের শক্তিকে সুদৃঢ় করেছে, কিন্তু প্রোলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে

ফেলা॥ কৃষক সমাজকে শ্রমিকশ্রেণীর বন্ধু হিসেবে বিপ্লবের পথে টানতে হবে, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী-ই বিপ্লবকে সফল করতে পারে। লুই বোনাপার্ট কৃষকদের সাহায্যেই বিপ্লবকে বিপথগত ক'রে স্বৈরাচারী শাসক হতে পেরেছিলেন॥

'জার্মানি : বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লব'—মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখা এই বইখানিতে ১৮৪১-৪২তে জার্মানিতে যে বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল সে-গুলোর আলোচনা আছে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণে বলা হচ্ছে : এই বিপ্লব জার্মানির সামন্তবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লব॥ শ্রমিক, কৃষক, শহরে পেতি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়ারা গোড়ার দিকে প্রাশিয়ান রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য জার্মান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামে। বিপ্লব যখন চলতে থাকে তখন বুর্জোয়া-শ্রেণী বেশ কিছু পেতি-বুর্জোয়াদের সঙ্গে নিয়ে বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে যোগ দেয়, কৃষকরা উদাসীন ভাব দেখায়, শ্রমিকশ্রেণী একা লড়াই ক'রে হেরে যায়॥

১৮৫০-এ লেখা এঙ্গেলসের 'জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ' বইখানি ১৫২৫-এর জার্মান কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণ। বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্ত হল : কৃষক যুদ্ধের মতো বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাহায্যের উপর আধুনিক জার্মানির শ্রেণী-সংগ্রামের সার্থকতা নির্ভর করে॥

মার্কস ও এঙ্গেলসের 'স্পেনের বিদ্রোহ' বইখানি স্পেনের ১৮৩৪-৩৬র ঘটনাবলির ব্যাখ্যা। লেখকরা বলছেন যে সামন্ত আভিজাতদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শ্রমিকরা সেই বিদ্রোহে সাহায্য করে। শেষে বুর্জোয়া শ্রেণী ও সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা বিশ্বাসঘাতকতা করে, শ্রমিকরা নিঃসঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধ ক'রে পরাজিত হয়।

মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থের সামান্য এই পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে প্রকৃত বিপ্লবীদের বুঝতে হবে সমাজ-বিবর্তনের কোন্ স্তরে বিপ্লব সম্ভব, বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর মিত্র কে, শত্রু কে, বিপ্লবে কারা সাধারণত খানিক দূর এগিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, কৃষক সমাজের সর্বহারাদের বিপ্লবে ভূমিকা কি।

একদিকে লেখার কাজ চলছে, অপর দিকে মার্কস ও এঙ্গেলস কঠোর পরিশ্রম করছেন অগ্রণী শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে, শ্রমিকশ্রেণীকে ভবিষ্যতের বিপ্লবের জন্য তৈরি করতে এবং কম্যুনিস্ট লীগকে শক্তিশালী করতে। প্রাশিয়ান সরকার আতংকিত হয়ে ধরপাকড় শুরু করল। কম্যুনিস্ট লীগের অনেকে ধরা পড়াতে এবং ইয়োরাপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ১৮৫২-তে কম্যুনিস্ট লীগ ভেঙে দেওয়া হল।

মার্কস এরপর প্রধানত অর্থনীতির অনুশীলনে মন দিলেন। কিন্তু পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখাও চলল—বিশেষ ক'রে 'নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে'। এই সব প্রবন্ধে মার্কস ভারতের প্রসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের তীক্ষ্ণ

সমালোচনা করেন, চীন ও এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের কথা বলেন, এশিয়ায় সামাজিক বিপ্লব না ঘটলে বিশ্ব মানবের মুক্তি অসম্ভব বলে ঘোষণা করেন। চীনের বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন 'সবচেয়ে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব, এশিয়াতে নবযুগের শুরু হতে আর দেরি নেই।' ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহকে মার্কস ও এঙ্গেলস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে দেখেছিলেন এবং ভারত, চীন ও অন্যান্য উপনিবেশের বিদ্রোহকে সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভেতরকার বিপ্লবী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিলেন।

১৮৬১-৬৬র আমেরিকার গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য এই এই গৃহযুদ্ধ আমেরিকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরেকটা ধাপ মাত্র॥ আমেরিকার বিপ্লবী কর্তব্য হল বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, নিগ্রোদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, আর দাসদের মুক্তি দেওয়া॥ আমেরিকার শ্রমিকশ্রেণীর চাপেই দাসদের মুক্তি সম্ভব হয়েছিল – লিনকনের গভর্নমেণ্ট এই চাপ ছাড়া বেশি এগোত না॥ বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর চাপে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা সত্ত্বেও দাস-মালিকদের সাহায্য করতে পারে নি॥

মার্কস ও এঙ্গেলসের এই লেখাগুলোর উল্লেখ করছি এই জন্যে যে এগুলো প্রমাণ করে যে যেখানেই বিপ্লবী শক্তির অভ্যুদয় হয় সেখানেই সহযোদ্ধার হাত বাড়িয়ে দেয় মার্কসবাদীরা। যেমন ১৮৬৭-র আইরিশ বিদ্রোহের পর মার্কস প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলে প্রস্তাব করেছিলেন যে বৃটিশ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকে আয়ার্ল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করতে হবে এবং বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর প্রভাব থেকে সরে এসে আইরিশদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় যোগ দিতে হবে।

তাই বৃটিশ রাজনীতির নগ্নরূপ, পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ভণ্ডামি ও ধাপ্পাবাজী মার্কস প্রকাশ ক'রে দেন এবং বামপন্থী চার্টিস্টদের উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু তখন ইংল্যাণ্ডে কিছু করা দুই কারণে কঠিন ছিল এবং ১৮৪৮-৪৯-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পর সর্বত্রই প্রতিক্রিয়ার প্রবল আক্রমণ হল; দুই, উপনিবেশ থেকে অতিরিক্ত মুনাফা সঞ্চয় ক'রে বৃটিশ পুঁজিপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর উপরের স্তরের লোকদের টাকাকড়ি দিয়ে কিনে নিল।

মার্কস অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে যে অর্থনৈতিক গবেষণা করে যাচ্ছিলেন সাময়িকভাবে তা এখন এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খণ্ডিত ইতালির একীকরণ ও মুক্তি আন্দোলন এবং খণ্ডিত জার্মানির একীকরণ আন্দোলনে তিনি মন দিলেন। মার্কস বললেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতে হবে, তার মধ্যে টেনে আনতে হবে সাধারণভাবে পেতি-বুর্জোয়াদের, বিশেষভাবে কৃষকদের, এবং অবশেষে সব বিত্তহীন শ্রেণীগুলোকে[৩]।

জার্মানির একীকরণ আন্দোলন সফল হবে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে—এই ছিল মার্কসের মত। সুবিধাবাদী শ্রমিকনেতা লাসালে তার বিরোধিতা করলেন। লাসালের মতে রাষ্ট্র সব শ্রেণীর ঊর্ধ্বে, শ্রমিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ হবে এবং আইনের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে সব সময় আটকে রাখবে। শ্রেণী-সংগ্রাম, স্ট্রাইক, ট্রেড ইউনিয়ন ভালো নয়, আর কৃষকরা হল 'একটা প্রতিক্রিয়াশীল জনসমষ্টি'—এই ধরনের সব ধারণা ছিল লাসালের। তিনি সমাজতন্ত্রবাদের চরম শত্রু বিসমার্কের সঙ্গে গোপন চুক্তি করলেন এই বলে যে সর্বজনীন ভোটাধিকার যদি বিসমার্ক দেন তবে লাসালে শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়ে তাঁর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করিয়ে নেবেন। মার্কস তাঁর 'ক্রিটিক অব গৌথা প্রোগ্রামে' লাসালের ভ্রান্ত ও শয়তানী মতবাদের সমালোচনা করেন।

তখন রাশিয়ায় সবে রাত কাটছে। প্রথম উষার আলো মার্কসের চোখ এড়াতে পারল না। তিনি অভিনন্দন জানালেন, বললেন, রাশিয়ায় ভূমিদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আর আমেরিকায় দাসপ্রথাকে কেন্দ্র ক'রে গৃহযুদ্ধ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক ঘটনা।

জারের সাম্রাজ্যে যেমন ভাঙন ধরেছিল বোনাপার্টের 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে'ও তেমনি শান্তি ছিল না। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে তাঁর সাম্রাজ্যের কবরের ওপর 'জাতীয় প্রতিরক্ষার গভর্নমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা হল। ১৮৭১এর প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী প্যারিসকে রক্ষার জন্যে অস্ত্র হাতে নিল। 'জাতীয়' সরকার প্রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করল কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের শাসন-যন্ত্র গড়ে তুলল—ইতিহাসে যার নাম চির-অম্লান সেই 'প্যারিস কম্যুন' জন্ম নিল। যে-ভুলত্রুটির জন্যে কম্যুনের পতন হল তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষক সমাজকে কম্যুনের পক্ষে আনা যায় নি। 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইখানিতে মার্কস ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের বিশ্লেষণ করলেন। প্যারিস কম্যুন সম্পর্কে মার্কস বললেন: অবশেষে আবিষ্কৃত হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব কি রূপ নেবে—তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র কী রকম হবে। কম্যুনই হবে প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের রাজনৈতিক সংগঠন। কম্যুন প্রমাণ করল যে শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে দখল ক'রে ব্যবহার করতে পারে না, তাদের উচিত হচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করা এবং তার জায়গায় নিজস্ব শক্তি প্রয়োগের উপযোগী যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ-কথা শুনে আমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে আইনসভায় সংখ্যাগুরু হয়ে মন্ত্রীত্ব আয়ত্ত ক'রে সর্বহারার যে-কল্যাণ আমরা চাই তা করা যাবে কি? আরেকটা প্রশ্নও ঠেকানো যাবে না: এহেন কল্যাণ-কর্মের কোনো ঐতিহাসিক নজীর আছে কি?

প্যারিস কম্যুনের আগেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি বা প্রথম আন্তর্জাতিক মার্কসের প্রাণান্ত পরিশ্রমে সংগঠিত হয়েছিল। কারণ পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ, সর্বহারার অবস্থার ক্রমাবনতি, ১৮৫৭র বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, বুর্জোয়া-

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতি বিপ্লবী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ব্যাপক করেছিল। ফ্রান্সের প্রুধ-পন্থীরা, ইংল্যাণ্ডের ঔইন-পন্থী ও সুবিধাবাদী ট্রেড-ইউনিয়ন নেতারা, ইতালির মাটসিনি ও জার্মানির লাসালের অনুসরণকারীরা মার্কস-এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে কাজ ক'রে যেতে লাগল। কিন্তু মতাদর্শগত সংগ্রামে মার্কসবাদের শত্রুরা শেষ অবধি পরাজিত হল। স্বপ্নচারী ও আপোষপন্থীদের বৈপ্লবিক আন্দোলনে পরাজয় অনিবার্য। এই সময় রাশিয়ার বাকুনিন-পন্থীরাও মার্কসবাদের বিরোধী ছিলেন। বাকুনিন ছিলেন নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কসের শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রোলেতারীয় একনায়কত্বের তত্ত্ব মানতেন না।

প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীর অস্থিরতা দেখে আন্তর্জাতিকের সভায় মার্কস অসময়ে, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের বিদ্রোহ করার বিরুদ্ধে সাবধান ক'রে দিলেন। কিন্তু যখন প্যারিস কম্যুনের খবর লণ্ডনে পৌছাল তখন তিনি ফরাসি শ্রমিক-নেতৃত্বকে 'হঠকারী' বলে গালাগাল করলেন না, বরং পৃথিবীর দেশে দেশে শত শত চিঠি পাঠালেন কম্যুনকে সমর্থন ক'রে, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে এবং কম্যুনকে রক্ষা করবার সংগ্রামে যুক্ত হবার আহ্বান জানিয়ে। খাঁটি বিপ্লবী চরিত্র একেই বলে। লেনিন ১৯০৫এ বলেছিলেন 'বর্তমান আন্দোলনে আমরা সবাই কম্যুনের কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।' মার্কস বললেন ফরাসি বিপ্লবের পরের ধাপ হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে চুরমার করা—সর্বত্রই গণবিপ্লবকে এই কাজটি করতে হবে। কম্যুনের শিক্ষা এই। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে অবশ্য মার্কসের অন্য আশা ছিল। স্তালিন তাঁর 'লেনিনবাদের সমস্যাবলি' গ্রন্থে বলছেন ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বুর্জোয়া গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পথে প্রোলেতারীয় গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে মার্কস এ-রকম সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-কথা ভেবেছিলেন যখন একচেটিয়া পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাব হয় নি এবং ঐ দেশগুলো তাদের বিকাশের বিশেষ পরিবেশের দরুন আমলাতন্ত্র ও সমরবাদ সৃষ্টি করে নি। লেনিনকে উদ্ধৃত ক'রে স্তালিন বলেছিলেন যে ১৯১৭ সালে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের যুগে মার্কসের ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা সম্বন্ধে ঐ কথা আর খাটে না। এখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য পথ নেই। স্তালিন এ-কথা বলে উপসংহারে বললেন সশস্ত্র প্রোলেতারীয় বিপ্লবের নীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবার নীতি—একটি অনিবার্য নীতি। তিনি আরও বললেন: অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে যদি অধিকাংশ গুরুত্বসম্পন্ন পুঁজিবাদী দেশে সর্বহারারা জয়ী হয়ে যায়, যদি এখনকার পুঁজিবাদী বেড়াজালের বদলে সমাজবাদী পরিবেষ্টনী সৃষ্টি হয় তবে কোনো কোনো পুঁজিবাদী দেশের পক্ষে শান্তিপূর্ণ অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হওয়া খুবই সম্ভব—সে-দেশের পুঁজিবাদীরা 'প্রতিকূল' আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দরুন সর্বহারাশ্রেণীকে 'স্বেচ্ছায়' বেশ খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা দেওয়া সুবিবেচনার কাজ মনে করবে। কিন্তু এ-অনুমান সুদূর ও সম্ভাব্য এক ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে গেলে এ-রকম অনুমানের কোনো ভিত্তি নেই। আবার লেনিনকে উদ্ধৃত ক'রে স্তালিন বললেন : বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে বলপ্রয়োগে ধ্বংস ক'রে এবং তার জায়গায় একটি নতুন যন্ত্র বসানো ছাড়া সর্বহারার বিপ্লব অসম্ভব।

মার্কস-এঙ্গেলস থেকে আমরা লেনিন-স্তালিনে পৌঁছে গেছি। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রবেশ করেছি। সুতরাং বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা ও কর্মকৌশল যুগ-পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু পরিবর্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। লেনিনবাদ হচ্ছে এই সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কস এবং লেনিনের মধ্যে যুগের ব্যবধানের জন্য তফাৎ দাঁড়াল এই যে মার্কস বলেছিলেন বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ না ক'রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছানো যাবে না। মার্কস এই শিক্ষাও দিয়েছিলেন যে বুর্জোয়া বিপ্লবের সংগ্রামক্ষেত্র থেকে শ্রমিকশ্রেণী সোজা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে পদক্ষেপ করবে, বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাদের শক্তিকে সংহত করবার সুযোগ দেবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে দেবে না। মার্কসের এই তত্ত্বকে কখনও কখনও স্থায়ী, অব্যাহত, অবিরাম বিপ্লবের তত্ত্ব বলা হয়। ১৮৪৮–৫০–এর বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগে মার্কস শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সাহায্য দিয়ে আর ধাক্কা দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিপ্লব সফল হলে বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের গড়ে তুলতে হবে তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণী-সংগঠন, তাদের নিজেদের পার্টি। এই পার্টি নিজেদের দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে বিপ্লব চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করতে পারে। মার্কসের শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদের যুগের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বিকশিত ক'রে তুলে লেনিন ১৯০৫এর রুশ বিপ্লবের সময় এই শিক্ষা দিলেন যে বুর্জোয়া-বিপ্লবে নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর নিজের হাতে নিতে হবেই এবং প্রধান মিত্র হিসেবে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামে যুক্ত করতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীকে গদিতে বসাবে না, শ্রমিক ও কৃষকের হাতে ক্ষমতা এনে দেবে। শ্রমিক-কৃষকদের অর্জিত এই ক্ষমতার নাম দিলেন লেনিন 'শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব'। লেনিন আরো বললেন যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল ক'রে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নততর গণতন্ত্র। ১৯০৫এর রুশ বিপ্লবে লেনিন যে নতুন পথে ধরলেন তা তাঁর 'দুই কৌশল' বই-খানিতে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা আছে। ঐ পথ ধরেই অক্টোবরের মহান বিপ্লব সম্পন্ন হয়, ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া-বিপ্লবের পর এগিয়ে গিয়ে অক্টোবরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা হয়। লেনিন ও স্তালিন হাতেকলমে প্রমাণ করলেন যে সাম্রাজ্য-বাদের যুগে একটি মাত্র ধনতান্ত্রিক দেশেও সমাজতন্ত্রের বিজয় লাভ সম্ভব। সার্থক রুশ বিপ্লব বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করল – সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ।

বিপ্লবী আন্দোলনের গৃহশত্রু সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লেনিনকে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পুরনো সংশোধনবাদী বের্নস্টাইন, কাউট্স্কি, অর্থনীতিবাদী ও মেনশেভিকরা আর ট্রট্স্কি এবং বুখারিন থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কালের ক্রুশ্চভ, তোরে, তোগলিয়াত্তি, আর লিউ শাও-চি – সবাই মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্বের সংশোধন ক'রে আসছে। আজকের পৃথিবীতে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধানতম আভ্যন্তরীণ শত্রু। আধুনিক সংশোধনবাদীরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব প্রচার ক'রে দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের বিপুল ক্ষতি করছে। এমন কি উপনিবেশবাদের অবসান হয়েছে এই সুখবর পরিবেশন ক'রে তারা সাম্রাজ্যবাদের নয়া-ঔপনিবেশিক কৌশলকে আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের দ্বন্দ্বকে তারা মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না।

প্রসঙ্গের টানে একটু ভাবীকালে চলে গেছি, এবারে ফিরি। স্তালিন এমিল লুডভিগকে বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে লেনিনের শিষ্য হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। সত্যিই তাই। রুশ বিপ্লবে তিনি ছিলেন লেনিনের সুযোগ্য সহযোগী। লেনিনবাদ অনুসরণ ক'রে তিনি উৎপীড়িত জাতিদের বিপ্লবী আন্দোলনে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাহায্য করতেন। সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করবার ব্যাপারে আর বিশ্বময় সমাজতন্ত্রকে জয়ী করার সংগ্রামে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তিনি উচ্চ মূল্য দিতেন। জাতীয় মুক্তির সমস্যা মূলত কৃষিবিপ্লবের সমস্যা এবং জাতীয় মুক্তির বিপ্লবে কৃষিবিপ্লবই হচ্ছে মৌলিক ও চূড়ান্ত কার্যক্রম – এই ছিল তাঁর বিখ্যাত তত্ত্ব। চীন বিপ্লবে তাঁর দান বিপুল। তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে চীন বিপ্লবের প্রধান ঝোঁক হতে হবে কৃষক-সমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, লক্ষ লক্ষ কৃষকের অভ্যুত্থান ঘটানো, শ্রমিক-কৃষককে সশস্ত্র করা এবং সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো। স্তালিন শেষবারের মতো যে-কংগ্রেসে যোগ দিতে পেরেছিলেন সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট পার্টির সেই ১৯৫২-র অক্টোবরের ঊনবিংশ কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন: 'কম্যুনিস্টরা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা উচ্চে তুলে ধরুন এবং এগিয়ে যান।'

চীনের বিপ্লব সর্বহারার বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্রমবিকাশের এক নতুন স্তর। লেনিন কম্যুনিস্টদের সেই সব বিজিত দেশ ও উপনিবেশগুলোর উপযোগী ক'রে মার্কসবাদকে ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করেছিলেন যেখানে কৃষকরা হচ্ছে জনসংখ্যার বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ[৪]। মাও ৎসে-তুংএর নেতৃত্বে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টিই লেনিনের শিক্ষাকে যথার্থ সার্থকতার গৌরবে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। মাও ৎসে-তুংএর মতবাদই সাম্রাজ্যবাদের পতনের যুগের মার্কসবাদ।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্রমবিকাশে মাও ৎসে-তুংএর দান হচ্ছে এই বিপ্লব-

তত্ত্ব : যে-সব দেশে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিই প্রধান স্থান দখল ক'রে আছে সেখানে কৃষকসমাজকেই প্রধান বিপ্লবী শক্তি বলে গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লবী কৃষকসমাজ জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্র জয় ক'রে নেবে এবং সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌছাবে। সে-সব দেশে কৃষকদের শুধু শ্রমিকশ্রেণীর সব চেয়ে বড়ো মিত্র মনে করা হয় না, শুধু সর্বহারাদের বিপ্লবী শক্তির সব চেয়ে বড়ো আধার বলে মনে করা হয় না, অধিকন্তু মনে করা হয় বিপ্লবের প্রধান শক্তি। সে-সব দেশে বিপ্লবকে সফল করতে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় তা হচ্ছে : গ্রামাঞ্চলে অভ্যুত্থান। গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরতা। গ্রামাঞ্চল থেকে শহর ঘেরাও। দীর্ঘকাল-স্থায়ী সশস্ত্র সংগ্রাম। সুদৃঢ় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি গঠন। বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক ফৌজ গড়ে তোলা। ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্তবাদবিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন—যে-ফ্রন্টের ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষক।

ভিয়েৎনামে চীন বিপ্লবের তত্ত্বের সার্থক প্রয়োগ ঐ তত্ত্বের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। মাও ৎসে-তুংএর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে হো চি মিন্ বলেছেন : 'ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে বিপ্লব প্রথমত এবং প্রধানত কৃষি-বিপ্লব। ব্যাপক ও সুদৃঢ় জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করবার মৌলিক ভিত্তি হবে কৃষকসাধারণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী।' তাই হো চি মিন্ বলছেন 'চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী দেশের পক্ষে আদর্শ কম্যুনিস্ট পার্টি[৫]।' ১৯৬৩-তে ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নবম অধিবেশনে লে দুয়ান-এর স্বীকৃতি শুনুন : 'এই তত্ত্বের (চীনের বিপ্লবের তত্ত্বের) অনুশীলন ও সৃজন-শীল প্রয়োগের ফলেই আমরা ভিয়েতনামী কম্যুনিস্টরা আমাদের দেশের বিপ্লবী লক্ষ্যকে জয়যুক্ত করেছি। অতীতে লেনিন বলেছিলেন যে রাশিয়ার বিপ্লবী রণ-কৌশল বিশ্বের সব কম্যুনিস্টদের পক্ষেই আদর্শ রণ-কৌশল, আজ আমরাও বলতে পারি যে চীনের বিপ্লবী রণ-কৌশল এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অগণিত কম্যুনিস্টদের পক্ষে আদর্শ রণ-কৌশল[৬]।'

কিউবার বিপ্লবে নাকি মার্কসবাদের ভূমিকা কেন, কোনো সুসংহত তত্ত্বেরই ভূমিকা ছিল না। গুয়েভারা বলেছেন : 'এই বিপ্লবের প্রধান অভিনেতাদের কোনো সুসমঞ্জস তাত্ত্বিক মূল্যমান ছিল না।' তিনি এ-কথাও বলেছেন যে স্বাভাবিকভাবেই মার্কসবাদী হয়ে যাওয়া উচিত[৭]। তিনি বোধ হয় বলতে চান যে কাজের মধ্য দিয়ে আপনা থেকেই মার্কসবাদসম্মত পথ এসে যায়। গুয়েভারা আরও বলেছেন যে হাতেকলমে যারা বিপ্লব করে তারা বিজ্ঞানী মার্কসের যারা পূর্ব-রচিত নিয়ম পালন করে। গুয়েভারা হয়তো বোঝাতে চান যে অজ্ঞাতেই এই ধরনের বিপ্লবীরা মার্কসীয় বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করেন। মার্কসবাদের অনুশীলনের আবশ্যিকতা তিনি স্বীকার করেন না। কাস্ত্রো-পন্থী তাত্ত্বিক গুয়ে

বলেছেন : 'এটা একটা সৌভাগ্যের কথা বলতে হবে যে ওরিয়েন্টের উপকূলে নাববার আগে ফিদেল মাও ৎসে-তুংএর সামরিক বিষয়ের লেখাগুলো পড়েন নি। তাই তিনি উপস্থিতমতো নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এক সামরিক তত্ত্বের মূল নীতি উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন[৮]।' গুয়েভারা বলেছেন যে গুটিকয়েক বিপ্লবী কিউবায় অসাধ্য সাধন করেছেন। ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে মাও ৎসে-তুংএর তত্ত্বের প্রয়োজন নেই, কিছু নির্ভীক দেশপ্রেমিক সশস্ত্র হয়ে গেরিলা বাহিনী বা 'ফোকো' গঠন ক'রে শহর থেকে গ্রামে অভিযান চালালেই সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পৌছানো যাবে—এই তাঁদের মত। কিন্তু গণচেতনাকে না জাগিয়ে রোমাঞ্চকর বিপ্লবী অভিযানের উপর আস্থা বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদসম্মত নয়। ও-পথে বিপ্লবের সার্থকতাও আসে না। বলিভিয়ায় গুয়েভারার ব্যর্থ আত্মদান তার প্রমাণ। বলিভিয়ার অভিযান সম্পর্কে কাস্ত্রো করুণ সুরে বলছেন যে অভিযাত্রীদের বাঁচতে হলে নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে[৯]। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এ-পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। খোদ কিউবার আজকের চিত্র দেখুন :'...কিউবার জমির বেশি অংশই সেই ক্ষুদে মালিকদের হাতে যারা অপরের কায়িক শ্রম থেকে মুনাফা লোটে...কৃষি-উৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক নয় ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে উঠেছে ...আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় নি,...বরং বুর্জোয়া শ্রেণী আরও নিরাপদ হচ্ছে এবং নতুন নতুন ক্ষমতার আসন দখল করছে[১০]।'

আজকের দিনের মার্কসবাদ অর্থাৎ মাও ৎসে-তুংএর মতবাদ প্রয়োগ করলে কিউবার এ-রকম ভয়ঙ্কর পরিণাম হতো না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মাও-এর চিন্তা-ধারায় উদ্দীপ্ত গেরিলাদের বিজয়যাত্রার সঙ্গে বলিভিয়ার গেরিলাদের নাভিশ্বাসের তুলনা করলেই আমরা সঠিক পদ্ধতির প্রমাণ পেতে পারি।

এখন জিজ্ঞাস্য : ভারত কোন্ পথে ? ১৯২৫-এ স্তালিন বলেছিলেন ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শ্রেণীর আপোষপন্থী অংশটা ভারতীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে, মজুর-কিষাণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। বলেছিলেন ভারতের মতো উপনিবেশে শ্রমিকশ্রেণীকেই মুক্তি আন্দোলনের নেতা করে তুলতে হবে, নেতৃত্ব থেকে বুর্জোয়া আর তাদের প্রতিনিধিদের ক্রমে সরিয়ে দিতে হবে[১১]। এরপর সি. পি. আই মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ বছরে কি করলেন ? যুদ্ধ এল। শ্রী পি. সি. যোশি পলিট ব্যুরোর প্রস্তাব উদ্ধৃত করে বললেন : 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রাম তখনই সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে এবং প্রকৃতপক্ষে সফল হইয়া উঠিবে, যখন কংগ্রেস সংগ্রামের নেতৃত্ব লইবে[১২]।' এরপর টীকা অনাবশ্যক। মহাযুদ্ধের সুযোগে মুক্তিসংগ্রামের সুবিধা সম্পর্কে আরেক জন সি. পি. আই নেতা শ্রী জি. অধিকারী বললেন 'ভারতে বৃটিশ ও আমেরিকান ফৌজ মুক্তি ফৌজ হইতে বাধ্য[১৩]।' এখানে টীকা আরও

অনাবশ্যক। তারপর এল ১৯৪৭-এর মেকি স্বাধীনতা — অশ্লীল আপোষের অপজাত সন্তান।

'ফর এ লাস্টিং পিস্, ফর এ পিপল্‌স ডেমোক্র্যাসি'-তে ১৯৪৯এর ২৭এ জানুয়ারি সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হল : 'ভারতের উপর চাপানো হয়েছে এক কৃত্রিম স্বাধীনতা।...এই অবস্থায় ভারতের কম্যুনিস্টদের কাজ হচ্ছে চীন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা' গ্রহণ করা। আশু কর্তব্য হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে 'ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে' ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা। ১৯৪৯এর এশিয়া ও ঔশিয়েইনিয়া-অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হল : 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার গোলামদের পরাজিত করবার জন্যে চীনের জনগণ যে পথ গ্রহণ করেছেন, জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনে ও নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলোর জনসাধারণেরও উচিত সেই একই পথ গ্রহণ করা।'

কিন্তু আমাদের দেশের 'সরকারি' কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব তেলেঙ্গানা থেকে নকশাল-বাড়ি পর্যন্ত সে-পথের উপর প্রতি-বিপ্লবী আক্রমণ চালিয়েছেন এবং সংসদীয় গণ-তন্ত্রের ধ্বজদণ্ডকে বসিয়েছেন বিপ্লবী মেরুদণ্ডের জায়গায়। অতীতে অখণ্ড সি. পি. আই মাও ৎসে-তুংকে 'সূক্ষ্ম আবরণে ঢাকা সংশোধনবাদী' বলেছিলেন[১৪]। আজ দক্ষিণ ও বাম একই সুরে এবং প্রায় একই ভাষায় মাও ৎসে-তুংকে সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতির জন্যে দায়ী করছেন। তবে ভরসার কথা গ্রামে গ্রামান্তরে কৃষি বিপ্লবের পথে চলার কঠিন অভিযান শুরু হয়েছে — 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' শহরে কংসের নিধন-যজ্ঞের আসল প্রস্তুতি চলছে দূর গোকুলে।

উল্লেখপঞ্জি

১. কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, গ্রন্থাবলি, রুশ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৯২।

২. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি, ২য় খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৫, পৃ ৩৪৩।

৩. লেনিন, রচনাবলি, চতুর্থ রুশ সংস্করণ, ২১ খণ্ড, পৃ ১২৮।

৪. পূর্বাঞ্চলের কম্যুনিষ্ট সংগঠনগুলির সর্ব-রুশীয় দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভাষণ : লেনিন রচনাবলি, ৪র্থ রুশ সংস্করণ, ৩০ খণ্ড, পৃ ১৩৯-৪০।

৫. হো চি মিন্ : নির্বাচিত রচনাবলি।

৬. লে দুয়ান : বর্তমানের কতগুলি আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রসঙ্গে।

৭. সি. ডব্লিউ. মিলজ মার্কসবাদী।

৮. দাব্রে . বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লব, পৃ ২০ (পি. এল পত্রিকার ১৯৬৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার উদ্ধৃতি থেকে)।

৯. ইনফরমেশন ব্রুম কিউবা, অক্টোবর, ১৯৬৭।

১০. ওয়ার্ল্ড রেভলিউশন, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (পি. এল পত্রিকার ১৯৬৭-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যার উদ্ধৃতি থেকে)।

১১. প্রাচ্য দেশের শ্রমজীবীদের কম্যুনিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সভায় বক্তৃতা : ১৮ মে, ১৯২৫।

১২. পি. সি. যোশি : কমিউনিষ্টদের জবাব : পৃ ১৬।

১৩. 'স্তালিনের বক্তৃতা'র ভূমিকা—জি. অধিকারী : পৃ ৮।

১৪. কম্যুনিষ্ট, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৭৭।

মার্কস ও আধুনিক অর্থনীতি

অমিয় দাশগুপ্ত

নিও-ক্লাসিকাল অর্থনীতির পরিণতির যুগে 'দাস কাপিটালে'র কী স্থান ছিল তা দেখার জন্য সেই কালের দিকে আজ ফিরে তাকাবার চেষ্টা কৌতূহলজনক। আসলে সেই কাল থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, বা বলা চলে, এগিয়ে চলেছি মার্কসের অর্থনৈতিথক চিন্তার-ই কাছাকাছি, তার থেকে দূরে নয়। ১৯৬০ সালে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতির ভাষণে এই বক্তব্যই আমি রাখতে চেয়েছি যে দাস কাপিটালের অদূরবর্তী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে স্মরণীয় ক'রে রাখা হোক 'মার্কস ও তাঁর পদ্ধতির পুনর্জাগরণ' — এই ধরনের কোনো গ্রন্থে, যা গত শতাব্দীর শেষার্ধে লিখিত ব্যোয়ম্‌-বাওয়ের্কএর সমালোচনার[১] পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে। দাস কাপিটালের প্রতি নিও-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অনাগ্রহের চেয়ে বিরোধিতাই বেশি। নিচের উদ্ধৃতি মারফৎ দেখানো যায় দাস কাপিটালের বিভিন্ন অনুজ্ঞার প্রতি তাঁদের সবচেয়ে সংযত মনোভাবের স্বরূপ : 'যাঁরা মার্কসের প্রকল্পগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একেবারেই গণনা করেন না তাঁদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে। তবুও একথা স্বীকার্য যে-কোনো প্রচলিত হেত্বাভাসের (fallacy) খণ্ডন ধনবিজ্ঞানীদের কার্যক্রমের অঙ্গীভূত। আমাদের বিজ্ঞানের এই একটি বিশেষত্ব যে এ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান শুরু হয় মোটামুটি নির্বিকল্প অজ্ঞানতার পেছন থেকে। অতএব যে-কোনো সদর্থক সত্যে পৌঁছাতে গেলে ভ্রান্তি খণ্ডন ক'রে এগুতে হয়।' উক্তিটি মার্শাল ও ব্যোয়ম্‌-বাওয়ের্কএর সমকালীন পণ্ডিতদের অন্যতম এফ ওয়াই এজওয়ার্থের — ১৯২০ সালে প্রকাশিত নিকলসনের 'মার্কসবাদের পুনর্জাগরণ'[২] গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত। অবশ্য দাস কাপিটালের প্রতি নিকলসনের শ্রদ্ধা যৎকিঞ্চিৎ।

নিকলসনের স্মরণীয় উক্তি : 'মার্কসীয় মূল্যমানের তত্ত্ব তাত্ত্বিক পশ্চাদ্‌গতির নির্দেশক।' দাস কাপিটালের গাণিতিক উপকরণ 'অনেকটা জলদস্যু দ্বারা লুণ্ঠিত গুপ্ত সম্পদ নিয়ে রচিত কাহিনীর মানচিত্র, দলিল ও গুপ্তভাষার মতোই।' এবং 'মার্কসের বীজগণিতকে যদিচ কুর্নোর (Cournot) বীজগণিতের সঙ্গে তুলনা করা হয়···আসলে সে-তুলনা অনেকটা দস্যু-কাহিনীর অন্তর্গত তালিকার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নৌ-বহরের সম্পত্তি-তালিকার তুলনার মতোই।'

এই সমালোচনায় গরলের ভাগ কতখানি তা কিছুটা উত্তেজনা সৃষ্টি না ক'রে ব্যাখ্যা করা বোধ হয় শক্ত। অবশ্য এই প্ররোচনা আমার মতে দাস কাপিটালের রচনারীতির মধ্যেই কিছুটা ছিল। মার্কস নিজেই সেই সব 'মামুলি' (vulgar) ধনবিজ্ঞানীদের ছেড়ে কথা বলেন নি যাঁদের কাছ থেকে স্পষ্টতই নিও-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা প্রেরণা পেয়েছেন। অধিকন্তু, আমার সন্দেহ যে দাস কাপিটাল ছাড়াও মার্কস 'সাম্যবাদী ঘোষণাপত্রে'র লেখক বলেও এই প্ররোচনার জন্ম।

২

বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে মার্কসীয় পদ্ধতির কোনো কোনো প্রকল্পে ছিদ্র বার করা সম্ভব। আসলে যে-সব সমালোচক অরণ্যের বদলে বৃক্ষে আগ্রহী ছিদ্রের সন্ধানেই তাদের সবিশেষ তৎপরতা।

মার্কসীয় বিশ্লেষণের আদি সেই মূল্যমানের শ্রমতত্ত্বে (Labour Theory of Value) ভ্রান্তি দেখানো সম্ভব—অন্তত বিভিন্ন শিল্পে শ্রম ও পুঁজির অনুপাতের অসমতা থাকায় বাজারে প্রচলিত মূল্যমানের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার কাজে ঐ তত্ত্বের নিষ্ফলতা দেখানো চলে। মার্কসের কাছে ব্যাপারটা যে অজ্ঞাত ছিল, তা নয়। যিনি রিকার্ডো পড়েছেন তিনি বোধহয় এটা এড়িয়ে যেতে পারেন না। অর্থনীতির বিভিন্ন অণুতত্ত্বের বিশ্লেষণে (micro analysis) এর অনুপযোগিতা মার্কস মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপক অর্থনীতি (macro economics)-র প্রসঙ্গে এর তাৎপর্য তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও দাস কাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে মূল্যমানের তত্ত্ব (Theory of Value) ও মূল্যতত্ত্বের (Theory of Price) সমীকরণের প্রয়াস বিশ্লেষণের স্তরে আপত্তিযোগ্য[৩]।

পড়তি মুনাফা-হারের (falling rate of profit) তত্ত্ব থেকে মার্কস যে পুঁজিতন্ত্রের অনিবার্য পতনের কথা তুলেছেন তাও যথেষ্ট দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-সব প্রদত্ত সূত্রের উপর মার্কসের তাত্ত্বিক নক্সার নির্ভরতা, যেমন $\frac{\text{ম}}{\text{প}}$ ও $\frac{\text{উ}}{\text{ম}+\text{প}}$, এদের সমীকরণে প্রত্যানুপাতের (inverse relationship) সম্পর্ক অভ্রান্ত, কিন্তু এই সূত্রগুলির নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্কে পারস্পরিক অসংগতি রয়েছে। সঞ্চয়ের বৃদ্ধি অবশ্যই অনিবার্যভাবে স্থায়ী মূলধন (ম) (cons-

tant capital) ও পরিবর্তনশীল মূলধনের (variable capital) (প) অনুপাত বাড়িয়ে দেয়, ফলে, একই সময়ে উৎপাদন বাড়িয়ে মোট মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের (উ)-ও বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সঞ্চিত পুঁজি থেকে শ্রম-চাহিদা-জনিত বেতনবৃদ্ধি হলেও নিও-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে এই প্রক্রিয়ায় মার্কসীয় শোষণ-তত্ত্ব টেকে না, এমন কি তা পড়তি মুনাফা-হারের তত্ত্ব সমর্থন করলেও।

মার্কসীয় পড়তি মুনাফা-হারের তত্ত্ব শুধুমাত্র বিতর্কের বিষয় নয়, অবাস্তব বলেও মনে করা যায়। মার্কসের দিন থেকেই সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সঞ্চয় প্রথাগতভাবে ক্রমশই বাড়তির পথে ছিল, মুনাফার হার পড়তির পথে ছিল না। সম্প্রতি কোনো কোনো আর্থিক পরিমণ্ডলে যদিও পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ ঘটেছে, তা কিন্তু পুঁজির অত্যধিক সঞ্চয়ের দরুন কিংবা মুনাফার হেরফেরের দরুন নয়। আর সাম্যবাদী বিপ্লব যা ঘটেছে তা কোনো উন্নত দেশে নয়, অনুন্নত অর্থনীতির পরিবেশে।

তা ছাড়া সাক্ষ্যপ্রমাণাদির মুখোমুখি এ-ও গ্রাহ্য হতে পারে না যে ধনতন্ত্রে বেকারসমস্যার স্থায়িত্বের কারণ পুঁজির মালিকদের মিলিত চেষ্টায় কর্মহীন মানুষদের নিয়ে রিজার্ভ ফোর্স তৈরি রাখা, যাতে শ্রমিকদের বেতন-হার বাঁচার পর্যায়ের উপরে উঠতে না পারে। তত্ত্ব হিসেবে সর্বাধিক মুনাফার হারের সীমানা-নির্দেশ মার্কসীয় পদ্ধতিতে করা সম্ভব, সন্দেহ নেই ; কিন্তু বাস্তব অবস্থার প্রতি-ফলনে ঐ তত্ত্বের নিশ্চিত ব্যর্থতা।

৩

মার্কসীয় পদ্ধতির বিভিন্ন প্রকল্পে এতসব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও দাস কাপিটাল এমন এক সংহত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে যার থেকে ধনতন্ত্রের গতিময়তা ও তজ্জনিত আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্বের সুগভীর উপলব্ধি সম্ভব। এই বইয়ের প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো আপেক্ষিক মূল্যতত্ত্বের অধিকার পেরিয়ে এগিয়ে গেছে এমন জায়গায় যা নাকি নিও-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ বাইরে। আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁরা মার্কসকে বুঝতে পারেন নি, ফলে, অহেতুক উত্তেজিত হয়েছেন। এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে প্রায় শতাব্দী কেটে গেলেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা তাঁদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি যে-দিকেই থাক না কেন সেই একই প্রশ্ন তুলেছেন, মার্কস যার উত্তর দিতে চেয়েছেন।

পণ্য পরিমাপের এমন কোনো মাপকাঠি কি আছে যা দিয়ে মোট শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদন-উপকরণের তুলনা চলে ? উপকরণের থেকে বাড়তি উৎপাদনের পরিমাণ, যা উদ্বৃত্ত মূল্য রূপেই স্বীকৃত, তার সামাজিক দায়িত্ব কী ? মোট শিল্পোৎপাদন কীভাবে বেতন ও মুনাফার আকারে বণ্টিত হয়ে আর্থিক উন্নয়নের জন্ম দেয় ? কীভাবে সর্বোচ্চ উদ্বৃত্তের উৎপাদন ঘটে ? কালের প্রভাব এড়িয়ে

উদ্বৃত্তের হার স্থায়ী থাকে কি? এই সব চূড়ান্ত প্রশ্ন মার্কসই তুলেছিলেন, এবং এই সব প্রশ্নের উত্তরের প্রচেষ্টা নিয়েই আধুনিক উন্নয়নমূলক অর্থনীতির বিষয়বস্তু সংগঠিত।

মূল্যমানের শ্রমতত্ত্বকে অনেক সময়ে অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছিত তত্ত্ব রূপে মনে করা হয়—অতএব একে বাদ দিলে মার্কসীয় পদ্ধতির[৫] ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। যদিও শ্রমিক-শোষণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় মূল্যমানের শ্রমতত্ত্বের উপযোগিতা, তবু প্রসঙ্গান্তরে এই তত্ত্বের প্রয়োগ কাজে লাগে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে আরো বেশি পরিমাণে শিক্ষাপ্রদ। শিল্পোৎপাদন ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে শ্রমিকের শ্রম গ্রাহ্য, অনেকটা রিকার্ডো যেমন উৎপাদিত শস্যের পরিমাপের নিরিখে উদ্বৃত্ত-সঞ্চয়ের বিশ্লেষণ এনেছেন। এই ক্লাসিকাল চিন্তার আধুনিক সংস্করণ পাওয়া যাবে পিয়েরো-স্রাফার 'স্ট্যাণ্ডার্ড সিস্টেম'-প্রত্যয়ের সূত্র রচনায়। যদি আদর্শ পণ্য (standard commodity) উৎপাদন-শ্রমের সঙ্গে ধ্রুব সম্পর্কে গ্রথিত থাকে, তাহলে এরই সাহায্যে আমরা নিয়োজিত শ্রমের (labour command) পরিমাপ করতে পারি[৬] স্রাফার পদ্ধতি মেনে। এবং এর দ্বারা শ্রমের মূল্যও পরিমাপযোগ্য। এ-ভাবে আমরা অ্যাডাম স্মিথের জগতে চলে আসতে পারি। কারণ নিযুক্ত শ্রম (labour commanded) থেকে প্রযুক্ত শ্রমের (labour embodied) বিয়োগে উদ্বৃত্তের উদ্ভব, স্মিথ যাকে বলেছেন উৎপাদনক্ষম শ্রম (productive labour), আসলে যার থেকে পুঁজির সঞ্চয়। মার্কস এবং স্মিথ উভয়েই মনে করেন যে শ্রমের জন্য যা আর্থিক ব্যয় তাতে অস্তিত্ব রাখার নিম্নতম মান মোটে বজায় থাকে, ফলে, আমরা সন্ধান পাই সর্বাধিক মুনাফার হারের ও সর্বোচ্চ-সম্ভব আর্থিক উন্নয়ন-হারের[৭]। আধুনিক আর্থিক উন্নয়নের তত্ত্ব যা পুঁজির মালিক ও শ্রমজীবী উভয়েরই সঞ্চয়ের আপেক্ষিক প্রান্তীয় প্রবণতার (relative marginal propensity to save) দ্বারা ব্যাখ্যাত, আসলে তা শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচার পর্যায়ে রাখা উপার্জনের চেয়ে সঞ্চয়যোগ্য উপার্জনের ধারণার প্রসার। মার্কস ও আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের কাছে মুনাফা ও বেতনের মধ্যে আয়ের যে বণ্টন তারই ধারণা আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

আধুনিক বিশ্লেষণে সম্পদের বিভাগীয় বণ্টন আসলে মার্কসের সরল পুনরুৎপাদন (simple reproduction) ও বর্ধিত পুনরুৎপাদন (extended reproduction) তত্ত্বের সম্প্রসারণ। মার্কস ধনবিজ্ঞানকে দুটো বিভাগে ভাগ করেছেন, বিনিয়োগ-যোগ্য পণ্যের বিভাগ ও ভোগ্য পণ্যের বিভাগ। মার্কসের বর্ধিত পুনরুৎপাদনের ছক আসলে ভোগ্য পণ্যোৎপাদন থেকে বিনিয়োগযোগ্য পণ্যোৎপাদনের বিভাগে সম্পদের নিয়োগ। এটাই হল সাম্প্রতিক আর্থিক উন্নয়ন তত্ত্বের বনিয়াদ। অবশ্য উন্নয়নের বিশ্লেষণে আরো কয়েকটি বিভাগীয় বিনিয়োগ ব্যবস্থার প্রয়োজন উপলব্ধ

হতে পারে, যেমন বেতনযোগ্য পণ্য (wage goods), বিলাস পণ্য, কাঁচা মাল। ফলে, বহু-বিভাগীয় ছকের (multi-sector models) অস্তিত্ব মেনে নিতে পারা যায়, যেমন আধুনিক উন্নয়ন তত্ত্বের তত্ত্বিকেরা (growth theorists) কেউ কেউ মানছেন। এই সব ছকের সৌন্দর্যমূল্য যা-ই থাক না কেন আসলে উন্নয়নমূলক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে মার্কসের দ্বি-বিভাগীয় ছকে (bi-sector model) প্রতিস্থাপিত করা যাবে – অতি সম্প্রতি ফেল্ডমান ও মহলানবিশ যা করেছেন।

আধুনিক ধনবিজ্ঞানের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রগতি মার্কসীয় পদ্ধতির আত্মীয়-সদৃশ তা হল চাহিদার অনুপাত (demand ratio) থেকে প্রাযুক্তিক অনুপাতে (tichnical ratio) গুরুত্ব অর্পণ। বর্তমানে, বিভিন্ন পণ্য ও পণ্যের পরিবর্ত-সমূহের (substitution) সম্পর্কজনিত কারণে চাহিদা-তত্ত্বের বিশ্লেষণকে আধুনিক আর্থনীতিক চিন্তার অপরিহার্য হাতিয়ার বলে মনে করা হয় না। আধুনিক রৈখিক তত্ত্ব (Linear Theory) ঐ সমস্ত তাত্ত্বিকতার অসারতা বাদ দিয়ে চলে, যেমন যে-তত্ত্ব পরিবর্ত ব্যবহারের প্রান্তীয় হারের সঙ্গে যুক্ত এবং সম্পর্কজনিত সংগতির কারণে আর্থনীতিক ভারসাম্য আনয়নে যাদের মূলত ঝোঁক। বলা চলে, মার্কস যেমনভাবে দেখাতে চেয়েছিলেন প্রায় সেই রকমই অতি সম্প্রতি ক্রেতার প্রাধান্য (consumers' sovereignty)-তত্ত্বের স্থানে সঞ্চয় ও প্রাযুক্তিক সম্ভাবনার (accumulation and technological possibilities) তত্ত্ব গুরুত্ব পাচ্ছে।

উপরন্তু আমাদের ঘরের কথায় এলে বলা চলে যে অনুন্নত দেশগুলির অর্থ-নীতিতে কর্মসংস্থানের গুপ্ত অভাবের (disguised unemployment) তত্ত্ব এবং অস্বাভাবিক শ্রম সরবরাহের তত্ত্ব মার্কসীয় শিক্ষা থেকে গৃহীত। এমন কি রাগনার নার্কসে-র (Ragnar Nurkse) কৃপায় সঞ্চয়-সম্ভাবনার তত্ত্ব যা অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নমূলক আর্থিক চিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে আছে, তা-ও মার্কসীয় প্রাথমিক সঞ্চয় তত্ত্বের[৮] কাছে ঋণী। অতএব বিস্ময়ের কিছু নেই যে অনুন্নত দেশে উন্নয়ন-পরিকল্পনা মূলত মার্কসীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত – কিন্‌স কিংবা নিও-ক্লাসিকাল চিন্তাধারা থেকে নয়।

৪

দাস কাপিটালের শতবার্ষিকীর কথা চিন্তা ক'রে সাত বছর আগে বর্তমান লেখক এই বক্তব্য রাখার সুবিধা পেয়েছিলেন যে নিউ-ক্লাসিকাল যুগে প্রান্তীয় তত্ত্বের উদ্ভাবনা মার্কসীয় ধনবিজ্ঞান-কথিত শ্রেণীসংগ্রামের সংকট[৯] এড়াবার চেষ্টা। বর্তমানেও এই শতবার্ষিকীর সমকালে লেখক পূর্বের অভিমত আরো বিস্তৃত ক'রে রাখতে চান যে আধুনিক আর্থিক উন্নয়নের তত্ত্ব মার্কস-কথিত ধনতন্ত্রের

পড়তি মুনাফা-জনিত সংকট নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্রের চ্যালেঞ্জের সাড়া হিসেবেই গ্রথিত।

আর্থিক উন্নয়নের তত্ত্ব মূলত পুঁজির বৃদ্ধি ও জনবৃদ্ধির সম্পর্ক জনিত পারস্পরিক ক্রিয়া। সমকালীন ভোগ-ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্তের পরিমাণ থেকে পুঁজির সঞ্চয় ঘটে। যদি জনবৃদ্ধির হার পুঁজির সঞ্চয়কে ছাড়িয়ে যায় তাহলে মাথা-পিছু পুঁজির স্বল্পতা ঘটার দরুন কর্মসংস্থানের অভাব দীর্ঘস্থায়ী ঘটনায় দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক এই ধরনের ঘটনাই অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে ঘটে থাকে। যদি অর্থনীতি এই মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং প্রজাবৃদ্ধির সমতালে পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে পারে তাহলে আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হব যখন পরিপূর্ণ কর্মসংস্থান-জনিত স্থায়ী উন্নয়নের হার বজায় থাকবে এবং মুনাফার হার ও বেতন-হারের হের-ফের হবে না।

এখন, কতদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় চলতে পারে? মার্কসের বক্তব্য হচ্ছে স্থায়ী পুঁজির সঞ্চয়ের মধ্যে যে-পরিবর্তনশীলতা আছে পুঁজির মালিকেরা তার-ই ক্রিয়ায় মুনাফার হার বাড়িয়ে কিছুদিনের জন্য বেতন-হার কমিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু মুনাফা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের হার বেড়ে যাওয়ায় বেতনও বাড়তে থাকে, যদিও মোট মুনাফা ও মোট বেতনের অনুপাত প্রায় একই থেকে যায়। কিন্তু দূর ভবিষ্যতে, মোট মুনাফা ও মোট পুঁজি, যা অসমান অনুপাতে বর্জন-শীল, পরে তাও হ্রাস পেতে থাকে। স্মরণ রাখা দরকার, এখানে রিকার্ডো-কথিত জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত ক্ষীয়মাণ প্রাপ্য (diminishing returns) তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না। আধুনিক চিন্তাধারা অবশ্যই রিকার্ডো-কথিত ক্ষীয়মাণ প্রাপ্য তত্ত্বের স্বীকৃতি দেয় না। এতৎসত্ত্বেও আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে মুনাফার হার বজায় থাকে, উন্নয়নও বজায় থাকে। স্থায়ী উন্নয়ন কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক প্রগতি পুঁজি এবং নিয়োজিত শ্রমের সংগত বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যদি পুঁজি ও প্রজা-বৃদ্ধির মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য দেখা দেয় তাহলে সরল শর্তপূরণ সাপেক্ষে ঘটনাই স্বয়ং স্ব-অসংগতি নিরাকরণে সচেষ্ট হয়। একটা আধুনিক সরলতম উন্নয়নের ছক ধরা যাক যদি মুনাফাজাত সঞ্চয়ের প্রান্তীয় প্রবণতা বেতনজাত সঞ্চয়ের প্রান্তীয় প্রবণতা থেকে বেশি হয় তাহলে উন্নয়ন বেশি দূর এগোতে পারে না। কারণ, যদি শ্রমের বিনিয়োগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুঁজির তুলনায় কমতে থাকে তাহলে মুনাফা পড়তির মুখে পড়ে, বেতন বাড়তে থাকে। এর ফল হল গড়-পড়তা সঞ্চয়ের হার কমে যাওয়া এবং শেষে পুঁজি-বৃদ্ধির হার প্রজাবৃদ্ধির হারের সমতালে চলে আসে। এবং উল্টোটাও ঘটে, যখন শ্রমের বিনিয়োগ পুঁজির সঞ্চয়কে ছাড়িয়ে যায়[১০]।

অবশ্য লক্ষণ দেখে বিচার ক'রে বলা যায় না যে কোন্‌টা অধিক বাস্তব, সে সময় এখনো আসে নি। তথাকথিত পরিণত অর্থনীতির প্রসঙ্গ টেনে যদি বলা যায় যে মার্কসের তত্ত্ব অসিদ্ধ তাহলে অপরিণত উক্তিই করা হবে। যদি আমাদের পরিণত

অর্থনীতিতে অসমানভাবে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও মুনাফার সঞ্চয় একই স্তর বজায় রেখে থাকে তাহলে অবশ্যই বাইরের শক্তি বাদ দিয়ে ঐ ঘটনার বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া অসংগত। যেমন যুদ্ধ শেষপর্যন্ত পুঁজির মারাত্মক ধ্বংসকারী শক্তি এবং যুদ্ধের আশঙ্কা পুঁজিকে অক্ষম ক'রে তোলে[১১]। আরো কি, পরিণত অর্থ-নীতি বন্ধ সীমায় সক্রিয় নয়—তাদের চতুর্দিকে উদ্বৃত্ত পুঁজি খাটাবার যোগ্য অনুন্নত দেশের বিশাল বাজারের অবস্থান। এই পৃথিবী সমগ্রভাবে দেখলে এখনো অপরিণত এবং এখনো আশঙ্কা যে বহু বহু দিন সময় লাগবে এর পরিণত অবস্থায় পৌঁছাতে।

নির্দেশিকা

১. Böhm-Bawerk, *Karl Marx and the Close of his System* (জার্মান সংস্করণ ১৮৯৬, ইংরাজি অনুবাদ ১৮৯৮)।

২. *Papers Relating to Political Economy* (Royal Economic Society, re-printed by Burt Franklin, U. S. A), পৃ ২৭৩। অতঃপর নিকলসনের যে-মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি উক্ত সমালোচনা থেকে গৃহীত।

৩. দ্রষ্টব্য: Paul Sweezy, *The Theory of Capitalist Development* (লণ্ডন, ১৯৪৬), পরিচ্ছেদ ৭, পৃ ১১২-১১৫।

৪. দ্রষ্টব্য: Joan Robinson, *An Essay on Marxian Economics*, পরিচ্ছেদ ৫।

৫. 'মার্কসের যুক্তির কাঠামোর কোনো অংশই শ্রম-মূল্যমান তত্ত্বের উপর নির্ভর করে না। ভল্টেয়ার কোনো-এক প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছিলেন যে মন্ত্র দিয়ে যদি এক পাল ভেড়াকে নিধন করতে চাও তো সঙ্গে সঙ্গে ভেড়াদের যথেষ্ট পরিমাণে আরসেনিক্ বিষও খাইয়ে দিও। বর্তমান প্রসঙ্গে ভেড়া হচ্ছেন পুঁজিবাদের নিশ্চিন্ত সমর্থকেরা; শোষণের প্রতি তীব্র ঘৃণা হচ্ছে বিষ, আর শ্রম-মূল্যমান তত্ত্বকে বলা যেতে পারে একপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ।' Joan Robinson, *An Essay on Marxian Economics* (লণ্ডন, ১৯৪২), পরিচ্ছেদ ৩, পৃ ২৭।

৬. Piero Sraffa, *Production of Commodities in terms of Commodities* (কেম্ব্রিজ ১৯৬০), পরিশিষ্ট, পৃ ৯৪।

৭. দ্রষ্টব্য: লেখকের প্রবন্ধ—'Adam Smith on Value', *The Indian Economic Review*, আগস্ট ১৯৬০, পৃ ১১৪-১১৫।

৮. 'যদিও জমি প্রতি চাষীদের সংখ্যায় হ্রাস হল, তবু জমির উৎপাদন আগের মতোই রয়ে গেল। সুতরাং গ্রামীণ লোকেদের একটি অংশ যখন জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল তখন তাদের ভরণ-পোষণের উপযোগী জিনিষগুলিও সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি পেল। এই জিনিষই পরিণত হল পরিবর্তনশীল মূলধনের ভিত্তি হিসেবে।' Karl Marx, *Capital* (Everyman's Library), পৃ ৮২৬।

৯. 'Tendencies in Economic Theory', *The Indian Economic Journal*, ভল্যুম ৮, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ১৯৬১ (পুনর্মুদ্রিত *Planning and Economic Growth*, লণ্ডন ১৯৬৫, এই গ্রন্থে)।

১০. বিভিন্ন ধরনের সম-গতি তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : F. H. Holin ও R. C. O. Mathews, 'The Theory of Economic Growth : A Survey', *Surveys of Economic Theory* (লণ্ডন ও নিউইয়র্ক, ১৯৬৫), ভল্যুম ২ ।

১১. যুদ্ধে লোকক্ষয় হয় সন্দেহ নেই । তবুও (আশা করা যায়) লোকক্ষয়ের মাত্রা মূলধন বিনাশের তুলনায় কম হয়ে থাকে ।

DR. A. K. DASGUPTA ইংরাজিতে লিখেছেন প্রবন্ধটি – *Marx and Modern Economics* । অনুবাদ : মুরারি ঘোষ ও লেখক অমিয় দাশগুপ্ত স্বয়ং ।

মার্টিন ব্রন্‌ফেনব্রেনার

'Why on earth should a man, because he is a Marxist, be a drivelling idiot ?' – Boris Pasternak, *Doctor Zhivago*.

'বুর্জোয়া' অর্থশাস্ত্রে মার্কসীয় প্রভাব

দাস কাপিটাল শতবার্ষিকীতে এ-কথা স্বতঃই মনে হয় মার্কস এখনো সর্বত্র একটি বিতর্কিত নাম। অবশ্য যাঁরা তাঁকে প্লাস্টারে তৈরি প্রতিমূর্তি রূপে দেখেন বা চার অক্ষরের একটি নামে চেনেন, তাঁদের কথা আমি বলছি না। কোথাও তিনি অতিসহজে বিস্মৃতির গভীরে লুপ্ত হয়ে যান নি এবং দাস কাপিটাল-এর মতো এখনো সর্বাপেক্ষা অপঠিত অথচ সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গ্রন্থ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ঠিক যে-কারণে মার্কস একটি বিতর্কিত নাম, আমাকে সে-জন্যই প্রথমে তাঁর সম্পর্কে আমার পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারটা বলে নিতে হচ্ছে। ব্যাপারটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। মনে করুন, কোনো 'ইউনিটারিয়ান' যাজককে জিজ্ঞাসা করা হল : আমাদের পরিচিত ইতিহাসে সব থেকে বড়ো ধর্মীয় দর্শনবেত্তা মহাপুরুষ কে ছিলেন ? আমি নিশ্চিত যে তাঁরা কেউ যিশুর নাম করবেন, আবার কেউ বুদ্ধ বা মোজেসের নাম করবেন। অথচ আমরা জানি 'ইউনিটারিয়ান' কখনোই খ্রীস্টান, বৌদ্ধ বা ইহুদি নন। অনুরূপভাবে আমাকেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে পৃথিবীর ইতিহাসে সেরা সমাজবিজ্ঞানী (সেরা অর্থনীতিবিদ অর্থে নয়) কে ছিলেন, আমি মার্কসের নামই করব, যদিও আমার ধারণায় বা আমার কট্টর মার্কসবাদী বন্ধুদের ধারণায় আমি নিজে মার্কসবাদী নই। মার্কসীয় তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রতি আমার প্রশংসা যতই অপরিসীম হোক না কেন, আমি জানি – আমার চিন্তায় প্রচুর 'বুর্জোয়া' উপাদান রয়েছে এবং আমি একজন দিশেহারা উদারপন্থী।

২

১৯৩৭ সালে আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশনের মার্কসবাদ সম্পর্কে বিগত পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় ভাসিলি লিওনটিয়েফ্ (Wassily Leontief) এবং লিও রোজিন (Leo Rogin) এটুকু স্বীকার করেছিলেন যে সমকালীন গোঁড়ামি ও 'নিউ ডিলে'র (New Deal) জন্য মার্কসের দায়িত্ব সামান্যই ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল তৎকালীন বহু বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী এবং রুজভেল্ট-বিরোধী উগ্রপন্থী-দের[১]। 'নীতি' সম্পর্কে রোজিনের ঐ রায়ের সঙ্গে আমি দ্বিমত নই, কিন্তু 'তত্ত্ব' নিয়ে লিওনটিয়েফের রায়কে ১৯৩৭ সালের পরবর্তী কালে আমাদের (জ্ঞানবুদ্ধির) অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত করা প্রয়োজন বলে মনে করি। অবশ্য আমার মনে এ-প্রশ্নও আসে ১৯৯৭ সালে মার্কস সম্পর্কে আমার ধারণাকেও উন্নত করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে না তো?

আমাদের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত প্রচলিত জ্ঞানবুদ্ধি মার্কসের কাছে কতটা ঋণী : এর আলোচনাতেই আমি আবদ্ধ থাকব ; অবশ্য আলোচনায় আমি মার্কসের পূর্বে ও পরে যে-সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা গিয়েছিল, তার বিশ্লেষণ থেকে নিবৃত্ত থাকব। আমাদের মার্কসের কাছে কতটা ঋণ সে-বিবেচনা করতে গিয়ে মনে হয়, এক জেনারেশন আগে লিওনটিয়েফ্ উক্ত ঋণ যতটা স্বীকার করেছিলেন, আমি আজ তার চেয়ে বেশি করছি, আবার পূর্বেকার জেনারেশনের ব্যোয়ম্-বাওয়ের্ক (Böhm-Bawerk) এবং থর্স্টেন ভেব্লেনের (Thorstein Veblen) তুলনায় লিওনটিয়েফ্ও মার্কসের কাছে সমকালীন অর্থশাস্ত্রের ঋণ অনেক বেশি স্বীকার করেছিলেন। আমার এ-ও বিবেচ্য যে যদি মার্কসের চিন্তাধারাকে প্রথম থেকেই সুবিন্যস্তভাবে বিচার করা হতো এবং আমাদের পূর্বসূরিবৃন্দ তাঁকে বোঝার ব্যাপারে অধিকতর যত্নবান হতেন, তাহলে আমাদের ঋণের পরিমাণ আজ অনেকখানি বেড়ে যেত।

(মার্কস সম্পর্কে) দৃষ্টিভঙ্গির উপরোক্ত দিকে পরিবর্তনের সপক্ষে কিছু বলবার থাকতে পারে। প্রথমেই আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হই তা হল মার্কসবাদকে এমন বহুবিধ সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে আলাদা করবার সমস্যা, যে-চিন্তাধারাগুলো ক্লাসিকাল এবং নিও-ক্লাসিকাল চিন্তার বিপরীত ছিল। এই সমস্যার সমাধান করবার মতো জ্ঞানকাণ্ড আমার নেই, তাই সমস্যার উল্লেখ মাত্র ক'রে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল মনে করছি।

মার্কস অন্তত তাঁর অর্থশাস্ত্রে কেইন্স (Keynes)-এর মতোই সমন্বয়বাদী ছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালীতে এমন উপাদান খুব কমই দেখা যায়, যা তাঁর কোনো-না-কোনো পূর্বসূরির মধ্যে অন্তত অপরিণত অবস্থায়ও দেখা যায় নি। (এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের 'রিকার্ডো-পন্থী সমাজতন্ত্রী'দের কথা মনে আসে।)

আবার মার্কসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় এমন উপাদান আরো কম দেখা যায়, যা তৎকালীন সংস্কারপন্থী বা সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারায় দেখা যায় না। কেইন্‌সের মতোই মার্কসের প্রতিভা এখানেই যে তিনি বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ ক'রে যে-প্রণালীতে উপস্থিত হয়েছেন, তা নিছক যোগফলের চেয়ে অধিকতর হয়ে উঠেছে। মার্কসের পুরনো বুর্জোয়া সমালোচকগণ মার্কসবাদের এ-দিকটিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে সক্ষম হন নি, বস্তুত ঐ সমালোচকদের কাজই ছিল অরণ্যকে রেখে বৃক্ষ উৎপাটনের চেষ্টা করা। মার্কসীয় বিশ্লেষণে আধুনিক ও অত্যাধুনিক বিষয়গুলো অন্তত আজ আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন যদিও বিষয়গুলো প্রায় দু-জেনারেশনের অধিককাল অবহেলায় পড়েছিল। তাছাড়া কে জানে, প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের উপর আধা-মার্কসীয় প্রভাবের উৎস মার্কস নিজেই কিনা, বা মার্কস-নিরপেক্ষ যুগধর্মসহ আধ ডজন অন্যান্য উৎস ?

৩

এ-লেখার মূল আলোচ্যে পৌঁছাবার আগে একটি অসাধারণ দীর্ঘস্থায়ী ভূতকে আমার তুলে ধরা উচিত। ভূতটি হল কিছু লোকের একটা সন্দেহবাতিকতা এই মর্মে যে, মার্কস তাঁর পরবর্তীকালের অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বে কিছু বিপথগামী প্রভাবের সৃষ্টি করেছেন। এদের ধারণা মূল্যমান ও মূল্যের তত্ত্বগুলোতে যে সাবজেক্টিভ, প্রান্তিক এবং উপযোগিতা বিপ্লব ঘটেছিল, তা ছিল আসলে মার্কসীয় মূল্যমানের শ্রমতত্ত্ব সম্পর্কিত ধারণার বিরুদ্ধে একটি আদর্শগত প্রতিক্রিয়া[২]। এ-ধারণা বাস্তবানুগ বলে প্রমাণিত হয় নি, বস্তুত প্রমাণ যা পাওয়া যায় তা ঐ ধারণার বিরুদ্ধেই চলে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য স্থান ও কাল ঐ সন্দেহবাতিকতাকে খানিকটা সমর্থন করে। যেমন, ১৮৬৭ সালে মার্কসের 'দাস কাপিটাল'-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। আবার ১৮৭০ সালেই জেভন্স-মেংগার-ওয়ালরাস উপযোগিতা-বিপ্লব (Jevons-Menger-Walras utility revolution) দেখা দেয়। শুধু তাই নয়, পূর্বে যেখানে উপযোগিতার ব্যাপারটা অর্থনীতিবিদদের মধ্যে কোনো আমলই পায় নি, ১৮৭০-এর পরে উপযোগিতা-বিপ্লবই অর্থশাস্ত্রের বিরাট ক্ষেত্র দখল করতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, মার্কসবাদ যে-যে দেশে প্রবল ছিল এমন জার্মান ভাষাভাষী দেশে মার্কসীয় শ্রমতত্ত্ব দ্রুততর গতিতে অচল হয়ে পড়েছিল, অথচ ফরাসি ও ইংরেজ ভাষাভাষী দেশগুলোতে মার্কসবাদের প্রভাব দুর্বলতম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও শ্রমতত্ত্বের প্রভাব অধিকতর পরিমাণে বজায় ছিল। (ক্লাসিকাল শ্রমতত্ত্বের উত্তরসূরি সর্বত্রই প্রান্তিক উপযোগিতা ছিল না। বিশেষ ক'রে জার্মানিতে উক্ত তত্ত্বের উত্তরাধিকার বর্তেছিল এক ধরনের ইতিহাসবাদের উপর, কিন্তু সে আরেক প্রসঙ্গ।)

উপযোগিতাতত্ত্বের উন্নতির কারণ হিসেবে মার্কস-আতংকিত (Marxophobe) যে-তত্ত্ব রয়েছে, তার বিপক্ষে বড়ো প্রমাণ হিসেবে এমনও বলা হয় যে একমাত্র পেছিয়ে-পড়া প্রাক-ধনতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোথাও 'দাস কাপিটাল' অর্থনীতিবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। 'পশ্চিম ইয়োরোপে এঙ্গেলসকেই প্রায় সব কটি পুস্তক-সমালোচনা (দাস কাপিটালের) লিখতে হয়েছিল···কখনো নিজের নামে, আবার কখনো ছদ্ম-নামে[৩]।' ১৮৮০ সাল নাগাদ যখন দাস কাপিটাল মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছিল, তখনই মাত্র উপযোগিতা-বিপ্লবের রাজত্ব এবং প্রান্তিক উৎপাদনের (marginal productivity) তত্ত্ব অর্থশাস্ত্রের একাংশে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

জার্মানিতেও ১৮৬৭ সালের মধ্যে ক্লাসিক-বিরোধী বিপ্লব অর্থশাস্ত্রে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল ; বস্তুত, 'প্রাচীনতর' ইতিহাস-কেন্দ্রিক মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ভিল্‌হেল্‌ম রসার (Wilhelm Roscher) ছিলেন মার্কস-নিন্দিত প্রতারক-অর্থ-নীতিবিদদের (vulgar economists) অন্যতম।

কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও একই ধরনের আরেকটি বক্তব্য রাখছি। মননশীলতা ও চিন্তাধারার ইতিহাসে মার্কস কখনই নিজের গুরুত্বকে শুকিয়ে যাওয়া ফুল বলে ভাবতেন না, কিন্তু রিকার্ডোর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেই তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা মূল্যমানের শ্রমতত্ত্বকে (labour theory of value) উপস্থিত করতেন ; এবং ঐ তত্ত্বের ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতের কথা বলেই বুর্জোয়াদের ঐ তত্ত্ব পরিহারের দিকে প্ররোচিত করেছেন। *Theorien über den Mehrwert*, অর্থাৎ 'থিয়োরি অব সারপ্লাস ভ্যালু' (উদ্বৃত্ত মূল্যমানের তত্ত্ব) নামে পুস্তকখানি যদিও এখানে পাঠ্য রয়েছে, কিন্তু মার্কসীয় মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসীয় এবং প্রায়-মার্কসীয় বিশ্লেষণ একই রাস্তা (মার্কসীয় শ্রমতত্ত্বের গুরুত্বকে অস্বীকার করবার রাস্তা – অনুবাদক) বেছে নেয়।

৪

মার্কসীয় সামগ্রিক অর্থশাস্ত্রকে (macroeconomics) (অমার্কসীয়ভাবে মার্কসের সমাজদর্শন থেকে ছেঁটে নিয়ে) কিভাবে ছাত্রদের জানা উচিত এ-প্রশ্নের উত্তরে দুটো ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিকে বিশেষ কার্যকর ও সময়-বাঁচানো বলে আমার মনে হয় : তার প্রথমটি হল – ১. মার্কসীয় স্থিতিবিদ্যাকে (Marxian statics) সহজ লুসেনি মতবাদের (Lausanne school) সাধারণ-ভারসাম্য প্রণালীতে বিধিবদ্ধ করা ; এবং দ্বিতীয়টি হল – ২. মার্কসীয় গতিবিদ্যাকে (dynamics) একটি 'সংকট'-ছকে ('dilemma' diagram) বিধিবদ্ধ করা, যাতে শ্রম-সঞ্চয়ী উৎপাদন-কৌশলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি মুনাফার হার থাকবে, যা তারল্য-সংকট (liquidity crisis) এড়াতে পারে এমন উঁচু হবে

না, আবার নির্দিষ্ট বেকারত্বের হারে বা তার নিচে অধিক উৎপাদনের সংকট এড়াতে পারে এমন নিচু হবে না। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অর্থাৎ 'মার্কসের অনুকরণে মডেল' অন্যত্র আমি প্রকাশ করেছি[৪], তাই সংশোধিত আকারে ঐগুলোকে আমি পরিশিষ্টে রেখেছি। পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত বিশেষে বিশেষ সমীকরণের উল্লেখ ক'রে আমি এখানে দেখাচ্ছি যে দাস কাপিটালের মধ্যে এমন নয়টি 'আধুনিক' উপাদান রয়েছে, যাদের বিদ্যালয়-কেন্দ্রিক অর্থনীতিবিদগণ তিরিশ সাল অবধি উপেক্ষা ক'রে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে ঐ আধুনিক উপাদানের কিছু-কিছু কেইন্‌স এবং এমন কি কাঠামোবাদী (structuralist) লিওনটিয়েফের মতো অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারায়ও পরিলক্ষিত হয়। নয়টি উপাদান হল এই :

১. কেইন্‌স-পরবর্তী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে 'বিনিয়োগ' ও 'ভোগে'র ক্ষেত্রে বিভক্ত করতে দেখা যায়, কিন্তু উক্ত প্রকার বিভাগের সূচনা করেন মার্কস স্বয়ং।

২. মার্কসীয় ছকের মধ্যে কিছু আঙ্কিক 'ফাংশনে'র (functions) — পরিশিষ্টের চতুর্থ অংশের ১৫ এবং ১৬ নং সমীকরণ — যোজনা যদি নির্দোষ হয়, তাহলে মার্কসকে সাধারণ ভারসাম্যের তাত্ত্বিক লিওন ওয়ালরাস (Leon Walras)-এর পূর্বসূরি বলা যায়।

৩. মার্কস কেইন্‌সের আগেই এমন একটি উন-কর্মসংস্থান ভারসাম্যের তত্ত্ব (theory of underemployment equilibrium) প্রকাশ করেছেন, যাতে বেকারত্বের হার কালক্রমে কাঠামোগত কারণে বৃদ্ধি পায়।

৪. কেইন্‌সীয় সুদতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তারল্য ফাঁদের (liquidity trap) পরমাত্মীয় হিসেবে (মার্কসের) নিম্নতম মুনাফা-হারের মতবাদকে অভিহিত করা যায়। ঐ নিম্নতম মুনাফাহারের নিচে পুঁজিপতিরা তাঁদের সঞ্চয়কে তরল অর্থ হিসাবে রাখে। বস্তুত মার্কসীয় সুদতত্ত্বে 'অর্থ' এবং অন্য প্রকার পুঁজি একই হারের প্রতিদানকে প্রবণতা হিসাবে পায়। এ-ধারণা হয়তো অত্যাধুনিক, কিন্তু আমার ধারণা এখনো সেকেলে এবং তাই উল্লিখিত মার্কসীয় প্রস্তাবনার বিপরীত।

৫. একটি ব্যাপারে মার্কস তাঁর পরবর্তীকালের সংগঠনবাদী এবং কাঠামোবাদীদের (institutionalists and structuralists) — অর্থাৎ ভেব্লেন ও এইরস্‌ (Ayres) থেকে আরম্ভ ক'রে লিওনটিয়েফ্‌ ও চেনারি (Chenery) অবধি অর্থনীতিবিদগণের — আগেই মূল্যের এবং মূল্য-প্ররোচিত বদলের (price-induced substitution) ব্যাপারকে আমল না-দিয়ে বিশুদ্ধ টেক্‌নিকাল উৎপাদন-সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন।

মার্কসীয় কাঠামোর সংস্কার দিক থেকে এবং প্রতিযোগিতামূলক অণু-অর্থনীতির (microeconomics) তথ্যের কর্মক্ষম মাত্রা হিসেবে মূল্যমানের

শ্রমতত্ত্বকে সহজেই সমর্থন করা যায়, যদি-না আমরা মূল্যকে ও মূল্যমান থেকে মূল্যের সরে যাওয়াকে কোনো গুরুত্ব দিই এবং যদি একমাত্র বাজার ও মুনাফা-হারের স্থিতিশীল ভারসাম্যকে মার্কসীয় কাঠামোয় অপরিহার্য বলে ধরে নিই। যুক্তিটির পুনরুক্তি প্রয়োজন : মূল্যমান থেকে মূল্যের কোনো প্রকার সরে যাওয়াই মার্কস-বর্ণিত 'পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলো'কে কোনো দিক থেকেই দুর্বল করে না।

৬. ১৯৩৭ সালে আমেরিকান ইকনমিক এসোসিয়েশনে পঠিত লিওনটিয়েফের লেখাটি থেকেই আমি বুঝতে পারি যে বাণিজ্য-চক্রের তত্ত্ব (business cycle theory) মার্কসের কাছে কতটা ঋণী। অবশ্য আজকাল ঐ ঋণের কথা সাধারণ-ভাবে বিস্মৃতপ্রায়। এ-বিষয়ে লিওনটিয়েফের বক্তব্যের বিশেষ দিকগুলোকে তুলে ধরবার জন্য অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল :

'আধুনিককালের বাণিজ্য-চক্র বিশ্লেষণ মার্কসীয় অর্থনীতির কাছে সুস্পষ্ট ঋণী। একথা বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে বাণিজ্য-চক্রের সমস্যাকে অর্থশাস্ত্রের আলোচনার প্রথম সারিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে ক্যাপিটালের তিনখণ্ড অন্য (অর্থনীতিবিদদের) যে-কোনো গ্রন্থের তুলনায় অধিক সাহায্য করেছে।'

'অবশ্য সমস্যার সমাধানে মার্কসের অবদান কতটুকু তা বলা শক্ত। 'অর্থ-নৈতিক সংকটে'র মার্কসীয় ব্যাখ্যার দুটো মূল স্তম্ভ (variants) আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। একটি হচ্ছে উন-বিনিয়োগের (underinvest-ment) তত্ত্ব, অন্যটি হচ্ছে উন-ভোগের তত্ত্ব। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা সত্য রয়েছে।'

'(মার্কসের) লেখায় এমন অনেক ইঙ্গিত ও প্রস্তাবনা রয়েছে যাদের (প্রতিটিকে) আধুনিককালের প্রতিটি তত্ত্বের পূর্বসূরি হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। [এখানে লিওনটিয়েফ্ মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র থেকে এমন একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেন, যার থেকে এ-ধারণা করা সম্ভব যে 'জীবনের শেষপ্রান্তে মার্কস বাণিজ্য-চক্র বিশ্লেষণে বস্তুতই সংখ্যা-গাণিতিক (statistical) ও আঙ্কিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।']'

'আধুনিক কালের বাণিজ্য-চক্র তত্ত্বে মার্কসীয় অর্থনীতির তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পুঁজির পুনরুৎপাদনের মার্কসীয় ছকে। অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের যে কোনো বুদ্ধিগ্রাহ্য আলোচনার জন্য প্রয়োজন বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোগত মৌল বৈশিষ্ট্যের উদ্ঘাটনকারী কোনো তাত্ত্বিক মডেল। মার্কসের পরে এ-ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক অবদান খুঁজে পাওয়া শক্ত। (মার্কসই) ভোগ্যদ্রব্য এবং পুঁজিদ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ করতে পারে এমন মৌলিক ছকের সূচনা করেন। বাণিজ্য-চক্রের তত্ত্ববিদ-

দের মধ্যে যে কয়টি মুষ্টিমেয় প্রস্তাবনা মোটামুটিভাবে অবিসংবাদী, মার্কসীয় ছকের তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা তাদের অন্যতম[৭]।'

৭. যেমন স্থিতিশীল অবস্থার (অথবা ফন্ হুয়মেন-রশ্মির!) ও বাণিজ্য-চক্রের বিশ্লেষণে, তেমনি বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার ও অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার আলোচনায় এমন কোনো তত্ত্ব মার্কস দেন নি, যার পরে আর কিছু বলবার থাকে না। তবে তাঁর আলোচনা আত্মসন্তুষ্টির ভাবকে আঘাত করে এবং বাস্তব তথ্য ও বিশ্লেষণের মধ্যে সেতুবন্ধনের যে-সূচনা তিনি করেছিলেন, তার তাৎপর্য তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমার মনে আছে, আমার শিক্ষক ফ্রাংক এইচ নাইট (Frank H. Knight) অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার আলোচনায় অধিক উৎসাহী হওয়ার বিরুদ্ধে সাবধান করেছিলেন, তিনি বলতেন, ঐ বিষয়ে কেউ বেশি পড়াশুনা করলে মার্কসবাদী হয়ে যায়!

৮. সামগ্রিক এবং পদ্ধতিগত প্রশ্নে মার্কসীয় স্থিতিবিদ্যা ও গতিবিদ্যার মসৃণতা এবং স্বভাবজাত সুসংবদ্ধতা উল্লেখযোগ্য হলেও তা কিছু নতুন নয়, কারণ তাঁর ক্লাসিকাল পূর্বসূরিদের মধ্যে একই গুণ পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা বলা যায় যে অন্তত শুম্পিটারের (Schumpeter) কাল অবধি দাস কাপিটালই শেষ গ্রন্থ যার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলি দেখা যায়। ১৮৭০ সাল থেকেই স্থিতিবিদ্যার বিশ্লেষণ অর্থশাস্ত্রে গুরুত্ব লাভ করে, তবে আমরা এখনো মার্কসীয় স্তরের উচ্চতায় ফিরে যেতে পারি নি।

৯. একই ভাবে বলা যায়: তত্ত্ব ও প্রয়োগের, অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে যে হরগৌরী সম্মিলন মার্কসের মধ্যে দেখা যায়, তা কিছু অভূতপূর্ব নয়। তবে আত্মসচেতনতার কৃপায় যাকে আজ আমরা বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থিবন্ধনের ঐতিহ্য (interdisciplinary tradition) বলি সে-ঐতিহ্যের সাধকদের মধ্যে—অর্থাৎ লক্, হিউম, স্মিথ, রিকার্ডো এবং মিলের মধ্যে—মার্কসই ছিলেন সর্বশেষ এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। মার্কসের পরে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে উক্ত গ্রন্থিবন্ধনের প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছিল। যাঁদের মধ্যে উক্ত প্রচেষ্টা কিছুটা অব্যাহত ছিল, তাঁরা অধিকাংশই হলেন দার্শনিক এবং সমাজতত্ত্ববিদ, তবে তাঁরা অর্থশাস্ত্রের ব্যাপারে হয় উদাসীন নতুবা আত্মসন্তুষ্ট। এটা লক্ষণীয় যে কেইন্স তাঁর 'জেনারেল থিয়োরি'তে অন্তর্নিহিত 'সামাজিক দর্শনের' আলোচনাকে মাত্র একটি পরিচ্ছেদে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। অবশ্য তাঁর (এবং শুম্পিটারের) পরে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নতুন ক'রে আবার সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে গ্রন্থি-বন্ধনের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু কেউই এখনো মার্কসের স্তরে পৌছাতে পারেন নি।

৫

যেহেতু মার্কস সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন বোয়ম্ বাওয়ের্কের পাঠ্যপুস্তক-ঘেঁষা

রীতি থেকে আলাদা, এ অবধি মার্কসের প্রশংসা ক'রে এখন আবার উল্টোদিকে চোখ ফেরাতে হয়।

মার্কসীয় স্থিতিবিদ্যার যে-বিচ্যুতি বিভ্রান্তিকর, তা হল তার অস্পষ্টতা, তবে এ-অপরাধ গুরুতর নয়, সাধারণ। কিছু কিছু অস্পষ্টতা – যেমন, পুঁজির ব্যাখ্যায় স্থাণু ও প্রবাহের (stock and flow) মধ্যে পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলা – মার্কস আরেকটু বেঁচে থাকলে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নিজেই দূর করতে পারতেন। অস্পষ্টতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হল মার্কস তাঁর আলোচনাকে সাধারণ ভারসাম্যের, না ভারসাম্যহীনতায় ছকে রাখতে চেয়েছিলেন, তা বোঝা দুষ্কর। এ-প্রশ্ন মার্কসের প্রেতাত্মার কাছেই করা সম্ভব, কারণ এ-প্রশ্ন জীবন্ত মার্কসের মনে এসেছিল বলে আমার মনে হয় না। উপরোক্ত অস্পষ্টতার কথা আমার মনে এসেছে বিশেষ ক'রে তাঁর তথাকথিত 'রূপান্তর সমস্যার' (transformation problem) বা মূল্যমান ও মূল্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যার কথা ভেবে।

মার্কস তাঁর (বক্তব্যের) অর্থ পরিষ্কার করতে পারেন নি, এ সমস্যার চেয়েও যে বড়ো সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়, তা হল এই যে, তিনি যখনই বিকল্প সমাধানগুলো উপস্থিত করেছেন, সমাধানগুলোকে বিচার ক'রে পছন্দ করবার ভিত্তি কী হবে সে-বিষয়ে নীরব থেকে গেছেন। যদি মূল্যের (absolute prices) পরিবর্তে মূল্য এবং মূল্যমানের (বিশুদ্ধ সংখ্যা) পারস্পরিক অনুপাতকে p-সহগ (coefficient) রূপে ব্যবহার করবার আমার পদ্ধতিটি (পরিশিষ্ট দেখুন) আমরা স্বীকার ক'রে নিই, তাহলে কেউ পাঠ্যপুস্তক ঘেঁষা এ-যুক্তি দেখালে অন্যায় করবেন না যে সম্পূর্ণ ও গড় মূল্যমানকে 'সম্পূর্ণ' ও গড় মূল্যের সমান করে এমন ৩নং সমীকরণকে সমর্থন করা চলে। কিন্তু কেউ যদি এ-যুক্তি দেখান যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সমষ্টি মুনাফা-সমষ্টির সমান হবে (সকল বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং উৎপাদন-ব্যয়কে দ্রব্যমূল্যে রূপান্তরিত করবার পর,) তাহলে ঐ যুক্তিও পাঠ্যপুস্তক-ঘেঁষা কারণে সমর্থন লাভ করতে পারে। কেউ কেউ (মার্কসীয় রূপান্তর সমস্যার সমাধান করে) অর্থনীতির যে-কোনো একটি বিভাগে মূল্যকে যেনতেনপ্রকারে মূল্যমানের সমান রাখবার প্রস্তাব করেছেন, কিন্তু মার্কসের মধ্যে এ-ধরনের কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায় না। (সাধারণত অর্থনীতির যে-বিভাগটিতে মূল্য ও মূল্যমানকে যে-কোনো উপায়ে সমান রাখার প্রস্তাব হয়েছে, তা হল 'বিলাসদ্রব্য বিভাগ'—যে-বিভাগের ভোগকারী হল পুঁজিপতিগণ : এ-বিভাগটিকে পছন্দ করবার সাধারণ যুক্তি হল, এ-বিভাগের এমন কোনো নিজস্ব উৎপাদন ব্যয়ের সমস্যা নেই, যার জন্য অন্য কোনো বিভাগকে জড়ানো প্রয়োজন।) এ-ব্যাপারে মার্কসের কোনো সুস্পষ্ট পছন্দ ছিল না – এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য হল : বিভাগ পছন্দের ভিত্তি কী হবে তার কোনো হদিশ তাঁর সমগ্র বিশ্লেষণে খুঁজে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উপায়ে তাঁর বিশ্লেষণী কাঠামোকে সমান

দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ফলাফলগুলো এক হয় না[৬]। এ-প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে শ্রীমতী রবিনসনের কঠোর সমালোচনার কথা ; তিনি নিও-ক্লাসিকাল মূল্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে, বিশেষ ক'রে তার 'স্বাভাবিক মুনাফার' ধারণায় অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করেছিলেন তার কথা[৭]। মার্কসীয় 'রূপান্তর-সমস্যা' সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

মার্কসের বিশ্লেষণে আরেকটি অস্পষ্টতা দেখা যায়। পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় প্রণালীতে ৯নং সমীকরণের কথা বলছি। সরবরাহ ও চাহিদার সামগ্রিক সমষ্টি-দ্বয়ের পারস্পরিক সাম্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। সমস্যা হচ্ছে উক্ত সমষ্টি কীভাবে প্রকাশ করব ? মূল্যমানের (শ্রম-সময়ের) নিরিখে, না, মূল্যের (p-সহগ দ্বারা সংশোধিত শ্রম-সময়ের) নিরিখে ? যেহেতু সরবরাহ ও চাহিদা হল একান্তই বাজারের ব্যাপার (পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে) সুতরাং বাজার মূল্যের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অতএব আমি মিঃ য়ুটাকা কোসাই-র (Mr. Yutaka Kosai) পরামর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয় বিকল্প (অর্থাৎ p-সহগ দ্বারা সংশোধিত শ্রম-সময় দ্বারা যে মূল্য নির্ধারণ) গ্রহণ করেছি। মার্কসীয় দৃষ্টান্তের অধিকাংশই অবশ্য মূল্যমানের নিরিখে রয়েছে, আমি নিজেও আগে ঐভাবেই ব্যবহার করতাম। কিন্তু যে কোনো p-সহগ এককের সমান হতে পারে, এমন একটি তুচ্ছ বিরল সম্ভাবনা ছাড়া অন্য যে-কোনো অবস্থায় (উপরোক্ত) দুটো বিকল্পের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থেকে যায়।

৬

মার্কসীয় গতিবিদ্যা প্রসঙ্গে এ-যাবত যে-সব বুর্জোয়া মূল্যায়ন হয়েছে, তার বেশি নতুন কোনো বক্তব্য আমি রাখতে অক্ষম। কিন্তু আবার আমি বলতে চাই : মার্কস কি বলতে চান তা সর্বদা আমি বুঝি নি। পুঁজিবাদের পতনের মূলে কি মুনাফা, হারের ক্রমাবনতি এবং কোনো প্রকার তারল্য ফাঁদ ? না, অতি-উৎপাদন এবং উন-ভোগের প্রবণতার দ্বারা সৃষ্ট চাহিদা-সরবরাহের বাজারে সংকট (realization crisis) ? না, উভয় প্রকার কারণের মিশ্রণে সৃষ্ট কোনো সংকট ? (এ প্রশ্নগুলোর) জবাব মার্কসের মধ্যে অস্পষ্ট। আরেকটি অস্পষ্টতা হল পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ বিলোপসাধন কি একটানা অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যার ফলশ্রুতি ? না, ঐ স্তরে পৌঁছাবার আগেই বিপ্লব সংগঠিত করা প্রয়োজন ? আমার নিজের ব্যাখ্যানুযায়ী মার্কসীয় 'সংকট মডেলে' (dilemma model) চাহিদা সরবরাহের সংকটই হল আসল পুঁজিবাদী দুর্বলতা, কারণ একচেটিয়া বা গোষ্ঠীবদ্ধ একচেটিয়ার (oligopoly) বাজারে মুনাফার হার বৃদ্ধি পায় ঠিকই, কিন্তু মোট জনসাধারণের তুলনায় পুঁজি-বাদীশ্রেণীর আয়তন ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক শোষণের গভীরতা

ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পায়[৮]। ১৮৪০-এর আশাভঙ্গের পরেও মার্কস (পুঁজিবাদের পতনে) অর্থনৈতিক স্থবিরতা না সমাজবিপ্লব বা বিপ্লবকাল সঠিক নির্ধারণ ইত্যাদি কোন্‌টি মৌল কারণ হবে, তা ঠিক বলে যেতে পেরেছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তিনি যেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্থান ও কাল নির্বিশেষে এবং যে-কোনো একটি পথে যতশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করবার উপরই জোর দিয়েছিলেন!

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে উপরোল্লিখিত অস্পষ্টতা কাটিয়ে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব, তাহলেও মার্কসের প্রধান বিচ্যুতি তাঁর মৌলিক এবং প্রভাবশালী গতি-বিদ্যার একটি ক্ষেত্রে থেকেই যায়। ক্ষেত্রটি হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থিবন্ধনের মার্কসীয় প্রচেষ্টায় সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। দুটো দৃষ্টান্ত আমরা রাখছি যেখানে তর্কশাস্ত্র এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

তর্কশাস্ত্র প্রসঙ্গে আমি অধ্যাপক মারে উল্‌ফসনের (Murray Wolfson) সাম্প্রতিক নৈয়ায়িক-ধ্রুববাদী মূল্যায়নের (logical-positivist critique) অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে পুনারাবৃত্তি করা ছাড়া নতুন ভালো কিছু বলতে পারছি না[৯]। উল্‌ফসন বলেন স্থান, কাল এবং চরিত্রের দিক থেকে পুঁজিবাদ-পতনের মার্কসীয় ভবিষ্যদ্বাণী স্থান, কাল ও ছকে (pattern) এতই অস্পষ্ট যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে খণ্ডনীয় প্রমাণ করবার জন্য সীমিত কালের ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপরম্পরা (মার্কসের লেখার মধ্যে) কল্পনা ক'রে নেওয়াও শক্ত (খুঁজে পাওয়া তো দূরের কথা)। যেহেতু নৈয়ায়িক-ধ্রুববাদী মানদণ্ড অনুযায়ী যা অখণ্ডনীয় তা-ই অর্থহীন, উল্‌ফসনের মতে মার্কসীয় গতিবিদ্যাও ঐ অর্থে অর্থহীন। বাস্তবিকই মনে হয়, মার্কসীয় বিশ্লেষণকে গত শতাব্দীর আমেরিকান বা পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে ভুল প্রমাণ করা যেমন শক্ত, আবার মার্কসীয় চিন্তার সমর্থনে আধা-পুঁজিবাদী বা অনগ্রসর দেশ রাশিয়া এবং চীনকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করানোও তেমনই কষ্টকর।

রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং তার অর্থনৈতিক কার্য্যাবলি তাঁর সমসাময়িক যুগে যতই বিপ্লবী চরিত্রের হোক না কেন, আধুনিক কালের (বুর্জোয়া অর্থনীতিতে) সাংগঠনিক বহুবিধ উন্নতি ও বৈচিত্র্য তাঁর তত্ত্বকে অচল করে দিয়েছে। পুঁজিবাদী কোনো রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণীর 'শুধুমাত্র' যন্ত্র ভেবে উড়িয়ে দেওয়া আজ আর যথেষ্ট নয়। এই মার্কসীয় ধারণার বিরুদ্ধে অধিকাংশ আমেরিকানদের তুলনায় আমার আপত্তি অনেক কম থাকা সত্ত্বেও এমন কি আমিও মনে করি, তাঁর ধারণার তাৎপর্য তাঁর সময়ের তুলনায় আজ আর ততটা স্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রকে যদি পুঁজিবাদী শ্রেণীর যন্ত্র বলে ধরে নেওয়াও হয়, তাহলে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত যে সে-ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চেষ্টা করতে বাধ্য থাকবে এবং কখনো অর্থনৈতিক মন্দা বা স্থবিরতার ভাব অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তুললে নিশ্চয়ই রাষ্ট্রও শুধুমাত্র বেয়নেট-নির্ভর হয়ে চুপচাপ বসে থাকবে না। তাছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের হাতে এমন অনেক আর্থিক ও আয়-সংক্রান্ত (fiscal) ব্যবস্থা রয়েছে, যা মার্কসীয় দর্শনের ধ্যানধারণা কল্পনাও করতে পারে না; কারণ মার্কসীয় দর্শন মূল্যমানের শ্রমতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল বলে আমার মনে হয় তা অর্থনৈতিক জগতে ধাতবমুদ্রা ও বাজেট-সাম্যের বাইরে অন্য কিছুর সম্ভাবনা ভাবতে পারে না। আধুনিককালের আর্থিক-আয়-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রে যতই গলদ থাকুক না কেন, 'নিউ ডিল' যুগের গোঁড়া মার্কসবাদীদের মতো ঐ নীতিসমূহকে 'ধোঁকা দেবার জন্য (fictitious) সৃষ্ট মূল্য' বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত মনে হয়।

স্তালিনোত্তর সোভিয়েতের 'প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান' (competitive coexistence) মার্কসের তত্ত্বের বনেদিয়ানা থেকে পিছু হঠে আসা বলে অনেকে মনে করেন। আমারও মনে হয়, এ-প্রসঙ্গে 'আধুনিক সংশোধনবাদের' চীনা-অভিযোগ যুক্তিসংগত। ঐ সংশোধনবাদী চিন্তা অর্থনৈতিক স্থবিরতা এড়ানোর ব্যাপারে আর্থিক এবং আয়-সংক্রান্ত নীতিগুলোর কার্যকরতা অস্বীকার করে এবং 'যুক্তি-সম্মত' সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের তুলনায় ঐ নীতিগুলোকে (আর্থিক ও আয়সংক্রান্ত) অপব্যয়ী, জংগী এবং জনকল্যাণের পরিপন্থী মনে করে। আমার এ-যুক্তি সম্পর্কে যে যাই ভাবুন না কেন, আমার সত্যিই মনে হয়, প্রসঙ্গটি আলোচনা-সাপেক্ষ এবং দাস কাপিটালের যে-কোনো খণ্ডের আওতাকে ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

৭

উপরের আলোচনায় মার্কসের অর্থনৈতিক চিন্তাকে প্রধানত সামগ্রিক অর্থশাস্ত্র (macroeconomics) হিসেবে দেখা হয়েছে এবং তা মার্কসবাদকে সোজাসুজি গ্রহণ বা বর্জনের উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর স্থিতিবিদ্যার দিকটি এ-আলোচনায় আমেরিকার অধিকাংশ বিদ্যায়তনকেন্দ্রিক আলোচনার তুলনায় সম্ভবত কম সহানুভূতিহীন। গতিবিদ্যার দিকটাতেই আমার আলোচনা সাধারণের তুলনায় অধিক সমালোচনাধর্মী হয়েছে, কিন্তু আমি এ-সিদ্ধান্ত করি নি যে, মার্কসীয় গতিবিদ্যার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নেই বা প্রয়োজনীয় সংযোজনের কোনো সুযোগ নেই বা তা পুরোদস্তুর অচল।

উপসংহারে আমি আমার আর-একটি চিন্তার কথা বলতে পারি, ঐ চিন্তার উল্লেখ ইতিমধ্যে অন্যত্রও করেছি[১০]। দাস কাপিটালের শতবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে আমি এমন-এক সময়ের প্রতীক্ষা করছি যখন আমেরিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মার্কসীয় অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিতর্কসাপেক্ষ দিক নিয়ে মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ এবং আমার মতো অর্থনীতিবিদদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নের কাজ চলতে

থাকবে। এবং আমি এ-ও প্রতীক্ষা করছি যখন আদর্শগত কারণে মার্কসবাদীর একাডেমিক পদোন্নতির এক-তৃতীয়াংশ অসুবিধা—সবচেয়ে ভালো হয় পুরোদস্তর—দূর হয়ে যাবে। আপাতত যদি অপ্রাসঙ্গিক না হয়, তাহলে আমি এ-আশার কথাও জানাতে চাই (অবশ্য কম ভরসা নিয়ে) যে, প্রধানত সমাজতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের বিতর্কসাপেক্ষ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবার অনুরূপ স্বাধীনতাও থাকবে।

পরিশিষ্ট

অঙ্কপাতন (*Notation*) :

বিভাগ I (উপরের চিহ্ন 1) মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করে।

বিভাগ II (উপরের চিহ্ন 2) ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করে।

W—শ্রম-সময়ের দ্বারা পরিমাপ করা মূল্যমান (সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়)।

C—শ্রম-সময়ের দ্বারা পরিমাপ করা স্থির (constant) পুঁজি, ক্ষয় (depreciation) এবং মাধ্যমিক (intermediate) দ্রব্য (প্রবাহ, স্থাণু নয়)।

V—শ্রম-সময়ের দ্বারা পরিবর্তনীয় (variable) পুঁজি, উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি (উৎপাদনে মূর্ত শ্রম-সময়ের, বাস্তব শ্রমের নয়)। [$V_o - \Sigma V_i$ -এর 'পূর্ণ কর্মসংস্থান' মূল্য।]

S—শ্রম-সময়ের দ্বারা পরিমাপ করা উদ্বৃত্ত মূল্যমান, সম্পত্তি থেকে আয় এবং বেতন।

p—মূল্যমানের সঙ্গে মূল্যের অনুপাত, একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা।

w—উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রম-সময়ের দ্বারা পরিমাপ করা উৎপাদনশীল শ্রমের মজুরির হার।

S′—উদ্বৃত্ত মূল্যমানের হার, S/V।

P′—মুনাফার হার, মূলতঃ S/C+V।

K—অপরিবর্তনীয় পুঁজি (স্থাণু)।

d—ক্ষয়ের হার, মূলত C/K।

g—I বিভাগের দ্রব্যে বিনিয়োগ করা S এর অনুপাত।

k—পুঁজির জৈবিক (organic) নিবন্ধ, C/V।

h—II বিভাগের পুঁজি-সহগ W_1/W_2।

u—বেকারত্বের হার, $1-(\Sigma V_i / V_o)$।

সমীকরণ প্রণালীসমূহ (*Equation Systems*)

মূল্যমানের শ্রমতত্ত্ব (৮টি সমীকরণ)

1-2. $W_i = C_i + V_i + S_i \quad (i = 1, 2)$

3. $\Sigma W_i = \Sigma p_i W_i$

4-5. $w = \dfrac{V_i}{S_i + V_i}$

6. $S' = \dfrac{1-w}{w}$

7-8. $P' = \dfrac{S_i\, p_i}{(V_i + c_i)/d_i}$ or $P' = \dfrac{S_i'\, p_i}{(1 + k_i)/d_i}$

সরবরাহ এবং চাহিদা (১টি সমীকরণ)

9. $P_1[V_1 + (1-g)S_1] = p_2(C_2 + gS_2)$

৩. কাঠামোগত সমীকরণ এবং অভেদাবলী (৪টি সমীকরণ)

10-11. $k_i = \dfrac{C_i}{V_i}$

12. $\Sigma C_i = \Sigma d_i K_i$

13. $u = 1 - \dfrac{\Sigma V_i}{V_o}$

14. $h = \dfrac{W_1}{W_2}$

'ফাংশন'গত সম্পর্কসমূহ (২টি সমীকরণ)

15. $g = g(P', h, W_2)$··· সকল ডেরিভেটিভ (derivatives) নেতিবাচক নয়।

16. $u = u(S' - 1)$, ফলে $(7-8)\ P' = \dfrac{[u(S'-1]^{-1}}{1 + (k/d)}$

অজানা অর্থের ভ্যারিয়েব্‌ল (১৬)

W_i, C_i, V_i, S_i, p_i — সর্বসাকুল্যে ১০টি।

S', P', w, h, g, u — সর্বসাকুল্যে ৬টি।

[বি. দ্র. : অন্যান্য ভ্যারিয়েব্‌ল উৎপাদন-কৌশলের দ্বারা নির্ধারিত।]

পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন।

বি. দ্র : ১. k কালক্রমে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়েছে।

২. d অথবা P'_{min}-এ কোনো সময়-ধারা (time trends) নেই।

৩. Z পতনের অবস্থাকে সূচিত করে।

'সংকটের' ছক (*Dilemma Diagram*)

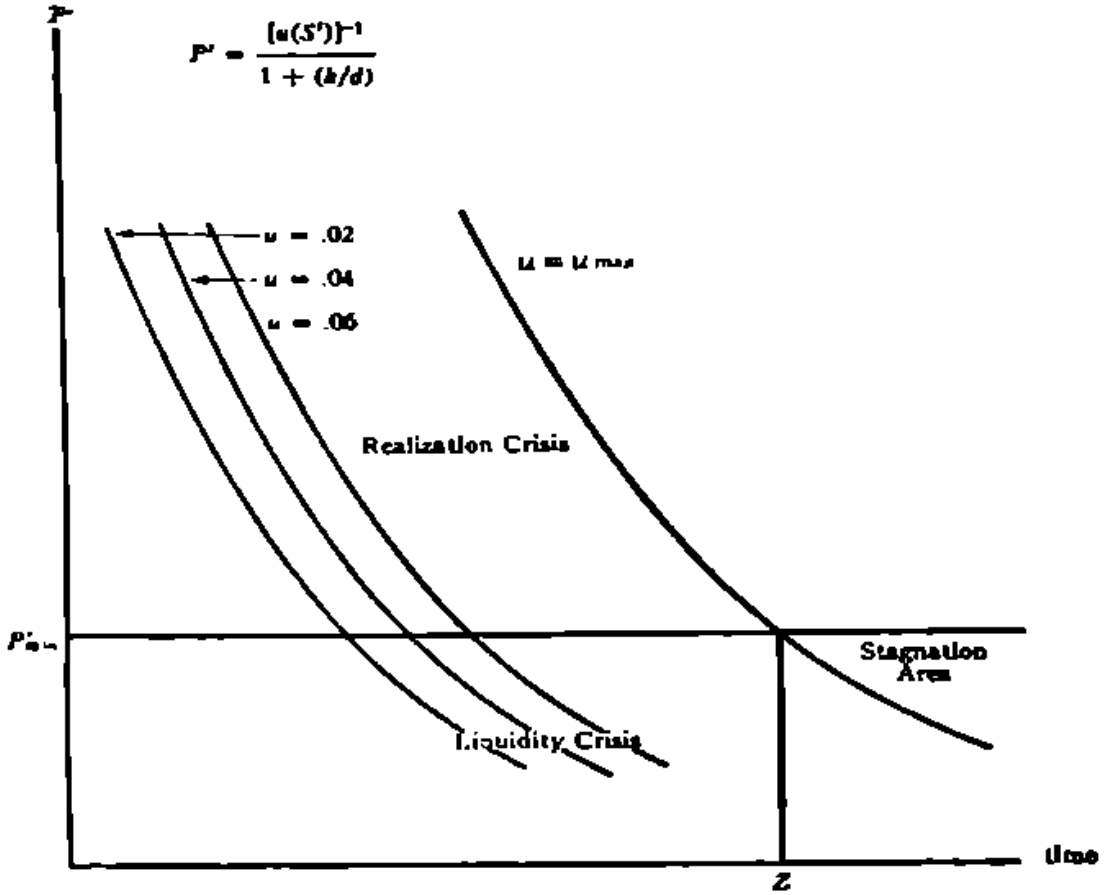

নির্দেশিকা

১. ভাসিলি লিওনটিয়েফ, 'The Significance of Marxian Economics of Present-Day Economic Theory' এবং লিও রোথিন – 'The Significance of Marxian Economics for Current Trends of Government Policy' (*A.E.R.* March, Sup. 1938) ।

২. 'It is worth recalling that parts of [the marginal productivity theory] were, to some extent, originally developed to provide a rebuttal to Marx's theory of exploitation.' Tibor Scitovsky, 'Some Theories of Income Distribution,' in *The Behavior of Income Shares* (Princeton Univ. Press for National Bureau of Economic Research, 1964) p. 22 ।

৩. Bertram D. Wolfe, *Marxism* (Free Press, 1965) p.X ।

৪. M. Brofenbrenner, '*Das Kapital* for the Modern Man', *Sci. and Soc.* Autumn, 1965. 'Classical and Marxian Macro-Economics in Separate Nutshells,' in *Essays in Honour of Marco Fanno* (Padua : Cedam, 1966), pp. 140-50 and 'The Marxian Macro-Economic Model : Extension from Two Departments,' *Kyklos*, June, 1966 ।

৫. *Op. cit.*, pp. 3-5. অধ্যাপক হাওয়ার্ড শেরম্যান তাঁর 'Marx and the Business Cycle' নামে অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখান ; ঐ প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে ।

৬. তিন-ক্ষেত্র (three-sector) মডেলের বিশ্লেষণে ফলাফল যে আলাদা হয় এবং ফলে মূল্য-সমূহের কোনো একটি গুচ্ছই যে মার্কসের ইন্‌ভ্যারিয়েন্স নির্ণায়কের ('invariance criteria') একই সঙ্গে উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য হয় না, সে-জন্য দেখুন Mark Blaug, *Economic Theory in Retrospect* (Irwin, 1962) pp. 213-15 (কিছু মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন ক'রে) ।

৭. Joan Robinson, 'The Basic Theory of Normal Prices', *Q.J.E.*, Feb., 1962, pp. 10-12 ।

৮. অধ্যাপক নোবুও ওকিশিও-র থেকে মুনাফা-হারের পতনোন্মুখ প্রবণতার ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছি । যদি তাঁর ব্যাখ্যা সঠিক হয়, তাহলে উক্ত প্রবণতা তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক এবং একচেটিয়ামূলক উভয় অবস্থায়ই দেখা দিতে পারে । আমাদের d-কে এককের সমান ক'রে অর্থাৎ স্থাণু ও প্রবাহের মধ্যে পার্থক্যকে উপেক্ষা ক'রে আমরা যা পাই, তা হল :

$$P = \frac{S}{C+V} < \frac{S+V}{C} = \frac{\text{'সক্রিয় শ্রম' (living labour)}}{\text{'নিষ্ক্রিয় শ্রম' (dead labour)}}$$

ওকিশিও-র ব্যাখ্যানুযায়ী টেকনিক্যাল উন্নয়নের মার্কসীয় দৃষ্টিতে (*Das Kapital* vol. III, chs. 4-6, 13-15) পুঁজির জৈবিক নিবন্ধ k নয়, উপরোক্ত সর্বশেষ অনুপাতটিই কালক্রমে নিম্নাভিমুখী হয় । (চতুর্দশ পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রায়ই শোনা যায় মার্কস নিজে 'মার্কসের নিয়ম' (Marx's Law)-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর অনুগামীদের অনেকের চেয়ে কম রক্ষণশীল ছিলেন) । সক্রিয় শ্রম ও নিষ্ক্রিয় শ্রমের পারস্পরিক অনুপাতের পতনের প্রবণতাকে (সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে) স্বীকার ক'রে নেওয়া গেলেও (এটা সুস্পষ্ট) এ অনুপাত মুনাফা-হারের চেয়ে অধিক থেকে যায় । সুতরাং একথা বলা যায় না যে P' কালাতিপাতের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নাভিমুখী হয়, কারণ পুঁজি-শ্রমের পারস্পরিক অনুপাতের নিম্নাভিমুখী প্রবণতাকে $SC / [(C+V)(S+V)]$ অনুপাতের ঊর্ধ্বগতি বাধা দেয় ।

৯. Murray Wolfson, *A Reappraisal of Marxian Economics* (Columbia Univ. Press, 1966) ।

১০. M. Bronfenbrenner, 'Marxian Economics in the United States' *A.E.R.*, Dec., 1964 ।

PROFESSOR MARTIN BRONFENBRENNER -প্রেরিত প্রবন্ধটির মূল নাম *Marxian Influences in 'Bourgeois' Economics* । অনুবাদ : প্রভাকর বসু ।

মার্কসের ক্যাপিটাল

মরিস ডব

এতাবৎকালের সবচেয়ে বিতর্কিত গ্রন্থ সম্ভবত দাস কাপিটাল। রিকার্ডোর 'প্রিন্সিপ্‌লস'-এর চেয়েও তীব্রতর ও পর্যাপ্ততর বিতর্কিত বিষয়গুণে দাস কাপিটালের উপর বর্ষিত নিন্দা এবং প্রশংসা দুইয়েরই ব্যাপ্তি অন্য যে-কোনো গ্রন্থের থেকে বেশি। ধনবিজ্ঞানের অন্যান্য তত্ত্বের চেয়ে, প্রায়শই, এর তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের খণ্ডন-চেষ্টা লক্ষণীয় এবং ঐ চেষ্টার বিরতি কোথাও কোথাও দেখা গেলেও—যেমন, তথাকথিত বিদ্বৎ সমাজের অবজ্ঞা—আধুনিক বিশ্বের অতি বিস্তীর্ণ এলাকায় পুঁজিবাদী সমাজের প্রামাণিক ব্যাখ্যা হিসেবে এর বহুমান্য স্বীকৃতি। এমন কি উনিশ শতকের শেষ দশকে একজন সমালোচকের ভাষ্যে কথিত : 'এক বিস্তৃত পাঠকশ্রেণী, এবংবিধ দুরূহ গ্রন্থে যাঁদের সংগত মনোযোগের অভাব, তাঁদের কাছেও মার্কস পূজ্য' (ব্যোয়ম্‌-বাওয়ের্ক)। বস্তুগত ভাবাবেগ বাদ দিয়ে তাঁর সমালোচনায় ব্রতী বিদ্বৎ সমাজে এমন সমালোচকও আছেন যাঁরা মার্কসের মেধার দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। যেমন, জোসেফ শুম্‌পিটার। তাঁর 'অর্থবিজ্ঞান বিশ্লেষণের ইতিহাস' নামক বৃহৎ গ্রন্থে মার্কস সম্পর্কে উক্তি : 'মার্কসকে যাঁরা নজরে রেখেছেন তিনি বন্ধু হোন, শত্রু হোন, তাঁর দৃষ্টির সামগ্রিকতায়, সামগ্রিকতা অর্থে প্রতিটি খণ্ডাংশ জুড়ে যে-ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তির প্রতি, অনবদ্য মোহের তাঁরা নিশ্চিত শিকার' এবং আরেক স্থানে বলেছেন : 'দাস কাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশকালে চিন্তার উৎকর্ষে কিংবা জ্ঞানের প্রাচুর্যে জার্মানিতে মার্কসের সমকক্ষ কেউ ছিল না।' দুটো প্রত্যয় অশেষ বিতর্কের বিষয়—যেমন, উদ্বৃত্ত মূল্যজাত আয়, কিংবা শোষণ-কৃত পরিণাম থেকে সম্পত্তির উদ্ভব, আর বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিণতি সমাজতন্ত্রে। প্রথমটা বলা চলে অ্যাডাম

শিথ-কথিত মুনাফার অবরোহিক তত্ত্বের (deduction theory) সম্প্রসারণ (যেখানে এটা ভ্রূণাকারে কথিত, কিংবা কেউ কেউ বলতে পারেন ইঙ্গিতমাত্র প্রকাশিত), অথবা তথাকথিত রিকার্ডীয় সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা-গুলির আরো নির্খুঁত ও রীতিবদ্ধ প্রকাশ। শেষ প্রত্যয়টি মার্কসের ইতিহাস-দৃষ্টির প্রয়োগ-পরিণাম, এবং তৎকালীন প্রচলিত আর্থিক প্রগতি সম্পর্কিত যে-ধারণা তারই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থিত ইতিহাসের চালকশক্তি হিসেবে শ্রেণীসংঘর্ষ সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণার বিকাশ, যা নাকি 'নিশ্চল (আর্থিক) ব্যবস্থার' (stationary state) অনুকূল বলে আশঙ্কিত এবং যার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার ছায়ামাত্র নেই। অবশ্য ধনতন্ত্রবাদের প্রত্যয়গুলির কাছে এই ভূমিকা অপ্রত্যাশিত এবং এর উদ্ভাবনায় চিরাচরিত ধারণাগুলি যেমন আঘাত পায় তেমনি রূপান্তরিত হতে চলেছে।

মার্কস যেমনভাবে ধনবিজ্ঞানকে দেখেছেন, তার বস্তুগত চৌহদ্দির যথোচিত উপলব্ধি থেকেই এইসব প্রত্যয়গুলির অর্থ পরিষ্কার হবে। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকে সাম্প্রতিক অর্থনীতির ঝোঁক মোটামুটিভাবে বিনিময়পদ্ধতির আলোচনায়, অর্থাৎ বিভিন্ন অনুমানসিদ্ধ অবস্থা সাপেক্ষে বাজারের পর্যালোচনা, কিংবা বাজারের স্থিতিশীলতা (market equilibrium) সম্পর্কে। সূত্র রচনায় ভ্রম-প্রমাদ এড়াবার কারণে উপরোক্ত বিশ্লেষণ আপন পরিধি ও পরিসর ক্রমশ সংকুচিত ক'রে এনেছে। উৎপাদনের শর্তাবলি সংকোচ ক'রে উৎপাদনের বিচ্ছিন্ন কারণগুলির (disembodied productive forces) প্রদত্ত যোগানের অনুমানে নামিয়ে আনা হয়েছে, কিংবা প্রাযুক্তিক গুণাঙ্ক (technical coefficient) বা তথাকথিত উৎপাদক অপেক্ষক (production function)-এর সংকীর্ণ ধারণায় পৌঁছাতে হয়েছে। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে যে-উৎপাদনক্রিয়ার সৃষ্টি তা হয়েছে মূলত উৎপাদন-উপকরণসমূহের সরল রৈখিক গতির দরুন ভোগ্য পণ্যোৎপাদন-ক্রিয়া। সম্পত্তির স্বত্ব স্বামিত্বের সমস্যা, কিংবা বিত্তবান ও বিত্তহীন মানুষদের তুলনার কথা ধনবিজ্ঞানের এক্তিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিছক সামাজিক বা সরল সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যেটা ধনবিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোকে আমলে আনে না।

যেমন যে-কোনো একটা তাত্ত্বিক ছক, তা যে-সমস্ত বিষয় বা ঘটনার নির্বাচনে রচিত, তা যুক্তিগতভাবে যতই চমৎকার বা নির্দোষ হোক না কেন – মোটামুটি-ভাবে তা পক্ষপাতদুষ্টও হতে পারে, যা আমাদের জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত না ক'রে বিকৃত করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক ধনবিজ্ঞানতত্ত্বের ঝোঁক স্থিতিশীল বাজারের বিশ্লেষণ-বিচারকে পরিমাণগত এমন এক কাঠামোয় এনে রাখছে, যেখানে তার গুণগত জাতি বৈশিষ্ট্য (differentia) স্বীকৃতি পাচ্ছে না – বিশেষ ক'রে সামাজিক আর্থনীতিক পরিবেশে যে-সম্ভাব্য জাতিবিচার তার সুযোগই

নেই। মার্কস যাকে বলেছেন 'পণ্যরতি' (fetishism of commodities), অস্বাভাবিকভাবে এই তাত্ত্বিক প্রকরণের পেছনে তা শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা আশ্চর্যের হবে না যে এই পরিস্থিতিতে 'শোষণের তত্ত্ব' কিংবা উদ্বৃত্ত হিসেবে আয়ের চরিত্রায়ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে, ফলে, কোনো আগ্রহী সমালোচকও উদ্বৃত্ত মূল্য বা শোষণের তত্ত্বকে ধনবিজ্ঞানের এক্তিয়ারে অনুপ্রবেশকারী নৈতিক মূল্যায়ন বলে মনে করছেন।

বিপরীতভাবে মার্কস আবার ধনবিজ্ঞানের এলাকাকে আরো সম্প্রসারিত ক'রে দেখছেন। প্রসঙ্গত মার্কস উৎপাদনের সমাজ-সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তি ও বিনিময়ের শর্তকেও একইভাবে বিচার করছেন। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ, সমকালীন সমাজের ভিত্তিস্বরূপ উৎপাদন-প্রথার ইতিহাসবিচারের প্রসঙ্গ থেকে এর উদ্ভাবনা, পক্ষান্তরে যা ইতিহাসের জন্মদাতাও বটে, আবার ক্রীড়াস্থলও বটে। মূল্যমানের (value) পরিমাণগত প্রশ্নের সমাধান এবং মূল্যমান থেকে বাজার-দরের উদ্ভাবনা—এ দুই-এর সঙ্গে একই গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাবে আর্থনীতিক চরিত্রবিচার।

যদি 'শোষণ' বা 'অবৈতনিক শ্রম' (unpaid labour) এই শব্দ দুটিকে সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্কের অঙ্গীকৃত করি তাহলে এদের সত্যিকারের তাৎপর্য বিতর্কের বিষয় হয় না, কেউই প্রশ্ন তুলবেন না যে জমিদারগোষ্ঠীর আয় অন্যের উৎপাদন আত্মসাৎ ক'রেই সংগৃহীত হয় না—ঐতিহাসিক মার্ক ব্লকের ভাষায় যা হল 'অধীনস্থ চাষীর' উৎপাদন। অবশ্যই এ-বক্তব্য অস্বীকৃত হলে বুঝতে হবে সামন্ততান্ত্রিক দাস-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল অর্থনীতির মৌল কাঠামোর বিকৃতি-সাধন করা হচ্ছে ; কিংবা লুকানো হচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের সদৃশ চরিত্রায়ণ থেকে পূর্বেকার শ্রেণীব্যবস্থা-সমন্বিত সমাজের সঙ্গে এই সমাজের সাদৃশ্য দেখানো যায় এবং এ-ছাড়াও দেখানো যায় যে সমস্ত রকম আর্থনীতিক সম্পর্ক বাজার-প্রভাবিত এক ধরনের চুক্তিমাত্র। অন্যভাবে বলা চলে, বর্তমানেও পুঁজির মালিক অপরের শ্রমে নির্ভরশীল, যদিও প্রভুভৃত্যের মধ্যে আইনগত বাধ্যবাধকতার বদলে এখন বিত্তহীনতার সুযোগে আর্থিক বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনী তত্ত্বের আড়াল দিয়ে কথার ভেল্কি চালিয়ে ঐ সব ধনবিজ্ঞানীরা যন্ত্রের কার্যকারিতা বা জমির রাসায়নিক গুণের কথা বলে প্রসঙ্গ এড়াতে দক্ষ। ভুল ক'রে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে শ্রমমূল্যের তত্ত্বজাত উদ্বৃত্ত মূল্যই মুনাফা। আসলে এক নৈয়ায়িক প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তের যা সম্পর্ক মুনাফা ও উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্পর্কও তাই। দুটো তত্ত্বই লকের স্বাভাবিক অধিকারগত ধারণা থেকে উপজাত—সে-তত্ত্ব হল অপরের শ্রমের ফলভোগ করার অধিকার। অবশ্য আমি মনে করি এ-ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। বরং এটা উদ্বৃত্ত মূল্যের বাস্তবতার সঙ্গে ক্লাসিকাল যুগের ধারণার সমন্বয়সাধনের ব্যাপার—যে-ধারণায় বলা হয় অবাধ বাণিজ্য ও

প্রতিযোগিতার রাজত্বে মূল্যের মাধ্যমে পণ্যের বিনিময়—এই সমন্বয়-চেষ্টার মধ্যে মার্কস তত্ত্বগতভাবে শ্রমিকের থেকে শ্রম বিচ্যুত ক'রে দেখাতে পেরেছেন ; পণ্যের মতোই যে-শ্রমের একটা বাজার-দর আছে এবং ঐ শ্রমের বিনিময়মূল্যের উপরেই শ্রমিকের জীবিকা নির্ভর।

২

মার্কস-কথিত মূল্যের তত্ত্ব মূলত ক্লাসিকাল ঐতিহ্যবাহী। যদিও ক্লাসিকাল চিন্তানায়কদের রচিত সূত্রগুলির মধ্যে অর্থের অনিশ্চয়তা ও কিছু দুর্বোধ্যতা রয়ে গেছে, অধিকন্তু অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর মধ্যে যেমন এই ব্যাপারে স্বীকৃত পার্থক্যও রয়েছে। অবশ্য এটা সুনিশ্চিত যে রিকার্ডো মার্কসের খুব কাছাকাছি এবং এই নৈকট্য সম্পর্কে বর্তমানে আমরা আরো বেশি সচেতন, কেননা ইতিমধ্যে রিকার্ডোর অপ্রকাশিত রচনা—'অবাধ ও পরিবর্তনশীল মূল্য' (Absolute and Exchangeable Value) প্রকাশিত হয়েছে। উপরোক্ত মূল্যমান তত্ত্বের ব্যাখ্যা থেকে আমরা জানতে পারি বিনিময়ের শর্ত উৎপাদনের শর্ত-নির্ভর, এবং যার বিশ্লেষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে বলা হয়েছে শ্রমের পরিমাণ দিয়ে উৎপাদনের বাজার-মূল্যের নির্ধারণ সম্ভব—অবশ্য যার সঙ্গে উৎপাদনের প্রাযুক্তিক অবস্থাও বিবেচ্য—মার্কস যাকে বলেছেন পুঁজির আবয়বিক সংযুক্তি (organic composition of capital)। উৎপাদনের সম্বন্ধ থেকে বিনিময়-সম্পর্কের উদ্ভাবনা সম্পূর্ণতই তাঁর ইতিহাসের বাস্তব ধারণা ও পণ্যোৎপাদনের মুখ্য ভূমিকার সঙ্গে সংগতি রেখে রচিত। মূলত ইতিহাসের ধারণার এখানে প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটছে এবং একটা আবয়বিক যোগাযোগ বজায় রেখেছে, যাতে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের সংযোগ এবং মৌল ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

উৎপাদনের বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে যে-মূল্যস্তরের কাঠামো রচিত হয় ধনবিজ্ঞানের উপযোগ তত্ত্বের চিন্তানায়কেরা তা কষ্টকর চেষ্টায় নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। মার্কসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ আনা হয়েছে যে মার্কস এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে চূড়ান্ত স্ববিরোধিতায় মজেছেন—এর উপরই ভর ক'রে মার্কসের প্রধান সমালোচক ফন্ বোয়ম্ বাওয়ের্ক সুনিশ্চিতভাবে মার্কসীয় পদ্ধতির সমাপ্তি ঘোষণায় উচ্চকিত হয়েছেন, ফলে যুগপৎ মূল্যস্তর (prices) ও আয় সম্পর্কে উপযোগ তত্ত্বের (utilities) ভিত্তিতে অন্যতর ব্যাখ্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন। ক্যাপিটাল-এর প্রথম খণ্ডে পণ্যের মূল্যমানেই পণ্যের বিনিময়—এই ধারণার ভিত্তিতে মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রশ্ন বিবেচনা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে মার্কসের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র পুঁজিবাদের সাধারণ কাঠামোর আলোচনায় নিবদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক তত্ত্বগত আলোচনায় বলা চলে ঐ বিশ্লেষণ চূড়ান্ত ব্যাপক (macroscopic) পর্যায়ে। এ-সময়ে মার্কস বিশেষ পণ্য বা বিশেষ কোনো শিল্পোৎপাদনের

আলোচনায় রত ছিলেন না। পণ্যোৎপাদনের সমাজ-সম্পর্ক যার সক্রিয়তায় সামাজিক শ্রেণীগুলির মধ্যে উৎপাদনের বণ্টন ঘটে তাই ছিল বিবেচ্য। তৃতীয় খণ্ডে, শেষ পর্যায়ের বিশ্লেষণে তিনি পরিস্থিতির আরো খুঁটিনাটির বিচারে এসেছেন, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যেকার সম্পর্ক-জাত শর্তের উদ্ভাবনায় এবং অণু (microscopic)-বিশ্লেষণে জাতি ও শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্মতায় পৌঁছেছেন।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন প্রাযুক্তিক পরিস্থিতি-জাত অনৈক্য এবং উৎপাদনের বিভিন্ন প্রণালী-সম্পৃক্ত পুঁজির আবয়বিক সংযুক্তির মধ্যেকার অনৈক্য ও এ-সবের সঙ্গে যুক্ত পুঁজির শিল্পগত প্রয়োগ যা-ই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমহারে মুনাফা উৎপাদনের চেষ্টার বিচারে এসেছেন। এই অবস্থায় অতি সংগত কারণে উৎপাদন-জাত পণ্যের বিনিময়গত দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীল মূল্যস্তর (long term equilibrium prices) প্রকৃত মূল্যমান (values) থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, অবশ্য এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন শিল্পের উদ্বৃত্ত মূল্যের পুনর্বণ্টনের ফলে মুনাফাও সমহারে জন্ম নেয়।

উত্তরকালীন মার্কস-সমালোচনায় উৎপাদনের বাজার-দরের সঙ্গে ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ডে কথিত মূল্যমানের যে-সম্পর্ক তাতেই মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। পণ্যের মূল্যমানেই তার বিনিময়-সম্ভাব্যতার অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব রচিত। তবু ক্যাপিটাল তৃতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে ধনতন্ত্রে পণ্যের বিনিময় মূল্যমানের উপর (values) নির্ভরশীল নয়—পণ্যের বাজার-দরের উপর নির্ভরশীল—কিন্তু বাজার-দর মূল্যমান থেকে পৃথক সত্তা। শেষোক্ত বিচারের ফলে উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? বোয়ম্-বাওয়ের্ক (Böhm-Bawerk)-এর মতে এটাই হল মার্কসীয় ধারণার মধ্যেকার স্ববিরোধ এবং ভবিষ্যতে মার্কসীয় পদ্ধতির ধ্বংসের বীজ আপন তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত। প্রথম থেকে দ্বিতীয় তত্ত্বে উপনীত হওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন একই তত্ত্বের দু-ধারায় বিশ্লেষণ বা দু-রকমের মান নির্ণয় কী ক'রে সম্ভব? অন্তত মার্কস যে-ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন তাতে সম্ভব নয়, ফলে মূল্যতত্ত্বের মার্কসীয় ব্যাখ্যা বা মুনাফার তত্ত্ব টিকছে না—অন্যত্র এদের ব্যাখ্যা খুঁজতে যেতে হয়। অবশ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যাবে না যে পণ্যের বিনিময়ের শর্তগুলি উৎপাদনের শর্ত-নির্ভর।

এই প্রশ্নের পরবর্তী আলোচনায় সাধারণ মূল্যমান থেকে পণ্যের বাজার-দর বার করার পদ্ধতি 'রূপান্তর সমস্যা' (Transformation Problem) নামে অভিহিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এর দুর্বোধ্য আলোচনা কিছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে চালু আছে, যা মার্কসীয় বা অমার্কসীয় চিন্তাবিদ মহলে সুপরিজ্ঞাত নয়। বস্তুত এরই পরিণাম বা গুরুত্বের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বোয়ম্-বাওয়ের্কএর তিন খণ্ড ক্যাপিটালের গুরুতর সমালোচনা—বিশেষ ক'রে প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড তো বটেই। আর এই ব্যাপারেই বোয়ম্-বাওয়ের্ক যথাযথভাবে বিশদ হতে চেয়েছেন

এবং মার্কস-রচিত সমাধান অন্তত অবজ্ঞার সঙ্গে নাকচ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পক্ষান্তরে সমস্যার চরিত্রবিচারের পর অন্যতর সমাধানেও আসতে চান নি।

আসলে বোয়ম্-বাওয়ের্কএর তর্কবিচার সমস্যার গুরুত্বকে যথেষ্ট লঘু ক'রে ফেলেছে এবং 'উৎপাদনের বাজারদরের (prices) পেছনে মূল্যমানের' অস্তিত্বের যে-ধারণা—এই ধারণার জটিলতা সম্পর্কে তিনি সচেতন নন। অবশ্য 'মূল্যমান থেকে উৎপাদনের বাজার-দরের উদ্ভাবনা'—মার্কস-রচিত এই তত্ত্বের গাণিতিক উদাহরণ যথেষ্ট অসম্পূর্ণ—এ-ব্যাপারে মার্কস স্বয়ং সচেতন ছিলেন (*Theorien über den Mehrwert*—পুস্তকে এক স্থানে এর উল্লেখ আছে। দ্র. *Theorien* vol. III, পৃ ২০০-২০১, ২১২)। এমন কি গড়পড়তা বাজার-দর ও মূল্যমানের পটভূমিকায় মুনাফা এবং উদ্বৃত্ত মূল্য সমান হয়ে যায়—এই অতি সরল তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ক্যাপিটালের অনেক কিছুর সঙ্গে এই তাত্ত্বিক অনুজ্ঞাও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে, ফলে বোয়ম্-বাওয়ের্ক ও পরে বর্টকিভিক্‌ৎস্ (Bortkiwicz)-এর সমালোচনা ও আলোচনার চাপ এসে পড়ছে এর উপর। এই অসম্পূর্ণতা এইভাবে রয়ে গেছে যে উৎপাদনের পরিমাণকে বাজার-দরে পরিবর্তিত করা হল, অথচ উৎপাদনের উপকরণের সমীকরণ করা হল মূল্যমানের সঙ্গে। অবশ্যই এই অসম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা মার্কসের চোখ এড়িয়ে যায় নি—বস্তুত, উৎপাদন-উপকরণগুলিকেও বাজার-দরের সমতায় আনতে হবে। যদি উপকরণগুলিকে এইভাবে একই সমীকরণে আনতে পারা যায় তাহলে মুনাফার হার ও উৎপাদনের বাজার-দরও পরিবর্তিত ধারণায় এসে পড়বে। ফলত, মূল্যের আঙ্কিক গড় থেকে উদ্ভূত উদ্বৃত্ত মূল্য-জনিত মুনাফার হার উদ্বৃত্ত মূল্যের সমান হবে না এবং মার্কসের গাণিতিক উদাহরণেই ঐ মুনাফার হার ভিন্নতর রূপ নেবে, অন্তত যে-মুনাফার হারের প্রসঙ্গে তিনি উৎপাদনের বাজার-দরের তত্ত্ব খাড়া করেছেন। অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে না যে শেষোক্ত মুনাফার হার মূল্যতত্ত্বের পরিবেশে কথিত প্রথমোক্ত মুনাফার হারের সঙ্গে কোনো গাণিতিক সম্পর্ক রাখে না, কিংবা সম্পর্ক রাখছে না উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের সঙ্গে। এই যে জটিল সম্পর্ক, যেখানে উৎপাদনের বাজার-দর উৎপাদন-উপকরণের বাজার-দরের উপর নির্ভরশীল এবং উৎপাদনের বাজার-দর বিপরীতভাবে উপকরণের বাজার-দরকেও প্রভাবিত করে। এই পরিবেশে একই আঙ্কিক পরিমাণ দিয়ে সমস্ত পরিবর্তনীয় গাণিতিক উপাদানকে (variables) বিচার করা যায় না। এর সমাধান করতে গেলে অনেক-গুলি সহ-সমীকরণের (simultaneous equation) সমাধান প্রয়োজন।

আসলে এ-ব্যাপারে কৃতিত্ব বর্টকিভিক্‌ৎস্-এর। তিনিই এই শতকের গোড়ার দিকে শিল্পোৎপাদনের ত্রি-বিভাগীয় সরল ছকে সমাধান বার করেছিলেন, যার মধ্যে থাকছে স্থায়ী মূলধনের (constant capital) উৎপাদন, বেতনযোগ্য পণ্য (wage goods) ও বিলাসপণ্যের (luxary goods) উৎপাদন। এ-সমাধানের

শর্ত (তথাকথিত সরল পুনরুৎপাদনের শর্ত) ছিল যে প্রতি বিভাগীয় উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ তাদের বিক্রয়লব্ধ আয়ের সমান (যথা, স্থায়ী মূলধনের পরিপূরক ব্যয়, সমগ্র বেতন ও সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য।)

বর্টকিভিক্‌ৎস্‌-সমাধানের চিত্তাকর্ষক ব্যাপার এই যে এই সমাধান মূলধন-অধিকর্তার ব্যবহারযোগ্য তৃতীয় বিভাগীয় পণ্য-উৎপাদনের শর্তাধীন নয়, বরং অপর দুই বিভাগের পণ্য-উৎপাদনের শর্তগুলির উপর নিশ্চিতভাবে তা নির্ভর করছে। এই সমাধান সাধারণ ফলশ্রুতি নয়, বস্তুত শোষণের পরিণাম থেকে যে-মুনাফার উৎপত্তি এ-সমাধান স্পষ্টরূপে তার প্রমাণ দিয়েছে, এর সঙ্গে মূলধনের উৎপাদনশীলতার তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ আসে না।

বর্টকিভিক্‌ৎস্‌-এর এই ত্রি-বিভাগীয় সমাধান মূলত তিন-শিল্পপণ্যের সহ-সমীকরণগত সমাধান। পর্যায়ক্রমে প্রতি বিভাগীয় উৎপাদনে গড় মূল্যান্তর পাওয়া যাবে এবং এই গড় মূল্যান্তর সাধারণ মূল্যের (শ্রম-মূল্যের ভিত্তিতে যা মাপা হয়) উপাত্ত (data of the value situation) থেকে উদ্ভূত। এর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে এসে যায় যে, যখন তিন-পণ্যের সহ-সমীকরণ সমাধানযোগ্য তখন নিশ্চয় বহু পণ্যের ক্ষেত্রবিশিষ্ট প্রশ্নের সমাধানও সম্ভব। অবশ্য কিছুদিনের জন্য এইসব সমস্যা সমাধানযোগ্য বলে প্রমাণ করা যেত না – এতে মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের অনুসৃত সক্রিয় মার্কসবাদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। বহু পণ্যের ক্ষেত্রে বা যে-কোনো সংখ্যামতো পণ্যের ক্ষেত্রে সম্ভবমতো সমস্যার প্রথম সাধারণ সমাধান করেছেন ফ্রান্সিস সেটন ('Transformation Problem', *Review of Economic Studies*, XXIV, 1956-57, পৃ ১৪৯-১৬০)। যার পরিশেষে ধরে নেওয়া যায় যে মার্কসীয় তত্ত্বের উপরিতলের (superstructure) গঠন নিখুঁত এবং এই তাত্ত্বিক প্রতিপাদন থেকে মনে করা অসংগত হবে না যে লেখক মার্কসীয় উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হতে চাইছেন না।

পিয়েরো স্রাফার 'পণ্য দ্বারা পণ্যের উৎপাদন' (*Production of Commodities by Means of Commodities*) পুস্তকের প্রথম ভাগে – বিভিন্ন সমীকরণে, উৎপাদনের বিভিন্ন শর্ত থেকে বা মুনাফা ও বেতনের অনুপাত থেকে বাজার-দরের উদ্ভব এই তত্ত্ব স্বীকৃত – সেখানে সমীকরণগুলির মধ্যে এই প্রতিপাদন (demonstration) প্রতিফলিত। অর্ধশতাব্দী ধরে এইসব আলোচনার ফলশ্রুতি এই যে মার্কস তাঁর প্রতিপাদনে যথার্থই ত্রুটিহীন, কেননা উৎপাদনের বাজারদর হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্থিতিশীল মূল্যান্তর (equi-librium prices) উৎপাদনের বিভিন্ন সম্পর্ক ও শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং উৎপাদনের সম্পর্ক-জনিত ব্যাপারে শোষণ-অনুপাত (exploitation ratio) উদ্বৃত্ত মূল্যের হার হিসেবেও (rate of surplus value) স্বীকৃত। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার মার্কসীয় বিশ্লেষণের কাঠামো এবং প্রথম খণ্ডের মূল্য তত্ত্বের

বিশ্লেষণ থেকে তৃতীয় খণ্ডের বাজার-দরের তত্ত্বগত উদ্ঘাটন শতাব্দীব্যাপী তীব্র, কূটকচালে ও নির্বোধ সমালোচনার ঝড় পেরিয়েও আজ অটুট রয়েছে। এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের মৌল সত্যগুলির গুণগত চরিত্রায়ণে মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যে যদি কিছু সন্দেহ থাকে তাহলে এই তত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টি আর কোনো অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে পাওয়া যাবে কি ?

৩

ঐ তিন খণ্ডে আলোচনাযোগ্য বহুবিধ বিষয়ের উপর যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ এখানে সম্ভবপর নয়, বিশেষত সে-চেষ্টার ফলে বর্তমান নিবন্ধ নিরবধি ক্লান্তিজনক হয়ে উঠবে। মার্কসের পদ্ধতি সম্পর্কে এক সাধারণ মন্তব্য হয়তো করা যেতে পারে, যথা, তাঁর আগ্রহ ও উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে প্রাথমিকভাবে তত্ত্ববিষয়ক। এ-ব্যাপারে তিনি অ্যাডাম স্মিথের মতোই তত্ত্ববিষয়ক সামান্যীকরণ (theoretical generalisation) ও বিমূর্ত যুক্তিতর্কের সঙ্গে ইতিহাসের বাস্তব ও সূক্ষ্ম উপাদানগুলির সংযোজন ঘটাতে পেরেছেন। অবশ্য গ্রন্থের মৌল উদ্দেশ্যের এটা একটা অংশ এবং বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তত্ত্বগত সম্পর্কের পূর্ণ সংগতি রেখেই তা চলেছে। এখানে দুয়ের সম্মিলনে সাধারণের মধ্যে বিশেষের প্রকাশ ঘটাতে পেরেছে এবং তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের মধ্যে জীবনের শূন্য বিমূর্তন নয়, জাগতিক পরমার্থের স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এইভাবে প্রথম খণ্ডের অংশবিশেষে উনিশ শতকের কারখানা পরিদর্শকদের রিপোর্টের মূল্যবান আলোচনা, শ্রমিক-বেতন, কারখানা-গৃহের পরিবেশ-সম্পর্কিত গভর্নমেণ্ট ব্লু-বুক, যন্ত্রের প্রভাব এবং অষ্টম অধ্যায়ে প্রাথমিক সঞ্চয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত পরিচিত তথ্যসমূহের আলোচনা। তৃতীয় খণ্ডে বিভিন্ন ধরনের খাজনা ও বিশেষ ধরনের সমাজ-সম্পর্কের ইতিহাস-অনুসন্ধান, বণিকপুঁজি সংক্রান্ত আলোচনা এবং সুদ ও লগ্নি সংক্রান্ত তত্ত্বে টমাস টুকের বিখ্যাত 'মূল্যমানের ইতিহাস' 'কারেন্সি-সম্পর্কিত অনুসন্ধান', ১৮৪৭-৪৮-এর সংকট সম্পর্কে সরকারি তত্ত্ব এবং ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির বক্তব্য আলোচিত হয়েছে।

অবশ্য মূল্যমান ও উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব ছাড়াও তাঁর আরো তিনটি বিষয়ের উপর সমালোচকের নজর ও বিতর্ক এড়ানো যায় না : প্রথমত, শ্রমিকশ্রেণীর ক্রম-দুরবস্থার তত্ত্ব প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে, এই অধ্যায়ের নাম 'পুঁজিসঞ্চয়ের সাধারণ নিয়ম'। এখানেই শ্রমিকশ্রেণীর চরম আর্থিক ক্রমাবনতির আলোচনা রয়েছে — যা পরে বেতনের পরিসংখ্যানবিচারে বহু প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে পড়তি মুনাফার তত্ত্ব ও তার প্রতিরোধকারী প্রবণতাসমূহের আলোচনা। এদের নিয়ে অনেক বিতর্কের উদ্ভাবনা হয়েছে — বিশেষ ক'রে সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পরিণতি ও তাঁর আলোচ্য

সংকট-তত্ত্বের মধ্যে এদের স্থান এবং এ-সবের বিপরীত প্রবণতাসমূহের প্রতিক্রিয়াও আলোচনার লক্ষ।

তৃতীয়ত, তাঁর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় ভাগের পুনরুৎপাদন-ছক (schema of reproduction)। সেখানে সারিবদ্ধ পরিসংখ্যান দিয়ে সরল ও বর্ধিত পুনরুৎপাদন-সম্পর্কিত পরিবেশে স্থিতিশীল অবস্থার (equilibrium relations) দ্বি-বিভাগীয় (two sectoral) ছক দেওয়া হয়েছে, এবং ঐ সূত্রে বলা হয়েছে যে একমাত্র অভাবনীয় কোনো কারণ ছাড়া পণ্যোৎপাদনের বিশৃঙ্খলার (anarchy of production) আওতায় ঐ উপরোক্ত পরিবেশ সম্ভব নয়। এই দ্বি-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা হল পণ্যোৎপাদনের মাধ্যম ও পণ্যের ভোগক্রিয়ার মাধ্যমের (means of consumption) উদ্ভাবনায়—প্রথমটি স্থায়ী পুঁজির (constant capital) পুনরাবর্তনের জন্য (বা উৎপাদনক্ষম ভোগক্রিয়া পূরণ করার জন্য) এবং শেষেরটি পুঁজির মালিক ও বেতনভোগী শ্রেণীর সাধারণ প্রয়োজন মেটাবার জন্য। প্রত্যেক বিভাগে সমগ্র উৎপাদন বিভিন্ন মূল্যমানে বিভক্ত ক'রে দেওয়া আছে : যেমন, স্থায়ী পুঁজির ব্যবহার (এর বিভাজন হল, কাঁচা পণ্য, যন্ত্রপাতি), বেতনের জন্য ব্যয় (পরিবর্তনশীল পুঁজি) এবং উদ্বৃত্ত মূল্য। এর থেকে জানা যায় যে সরল পুনরুৎপাদনে প্রথম বিভাগের সমগ্র উৎপাদন উভয় বিভাগে প্রযুক্ত স্থায়ী পুঁজির সমান হবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বিভাগের সমগ্র উৎপাদন উভয় বিভাগের বেতন ও উদ্বৃত্ত মূল্যের যোগফলের সমান হবে। অতএব উভয় বিভাগের বিনিময় সম্ভাব্যতা দাঁড়াল এই রকম প্রথম বিভাগের উৎপাদনের মাধ্যম দ্বিতীয়ের স্থায়ী পুঁজির পূরক এবং দ্বিতীয়ের ভোগ-ক্রিয়ার মাধ্যম প্রথমটির বেতন ও উদ্বৃত্ত মূল্য পূরণ করে দেয়। যতক্ষণ না ঐ সমতা বজায় রাখা যাচ্ছে [প্রথম বিভাগে উদ্বৃত্ত মূল্য+পরিবর্তনশীল পুঁজি $(s+v)$ = দ্বিতীয় বিভাগের স্থায়ী পুঁজি (c)] ততক্ষণ এক বিভাগের অতি-উৎপাদন অন্য বিভাগে নিঃশেষিত না হয়ে বাড়তি হয়ে থাকবে। আবার বর্ধিত পুনরুৎপাদনের স্থিতিশীলতার শর্ত-সমূহ আলোচ্য পরিস্থিতির আরো জটিলতর-পর্যায় বা স্তর। ১৮৫৭-৫৮ সালে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনার ভিত্তিভূমি' পুস্তকের মধ্যে এই ছকের প্রাথমিক বক্তব্য রয়েছে। আমরা জানি তখন থেকেই মার্কসের চিন্তায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপকরণগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক একটা ছকের মধ্যে প্রকাশিতব্য বলে উজ্জীবিত ছিল। এটা অবশ্য 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিশাস্ত্রের সমালোচনা' পুস্তকটি প্রকাশের (১৮৫৯) আগের ঘটনা।

দেখা যাবে ঐ ছক অনেকটা বীজাকারে আধুনিক উপকরণ ও পণ্যসংক্রান্ত দ্বি-বিভাগীয় ছকের (input-output matrix) অনুরূপ, যার সারি এবং স্তম্ভের (rows and columns) ভিতরকার উপাদানসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক রয়ে গেছে। আধুনিক বিশ্লেষণ (ছক) পূর্বোক্ত ছকের উত্তরপুরুষ—যে-ছক

উনিশ শো বিশের সোভিয়েট রাশিয়ায় সমতার (balance) উদ্ভাবক এবং আমাদের অজ্ঞাত নয় যে লিয়নটিয়েফের আরো জটিল পণ্যোপকরণের ছক (input-output matrix) এর থেকেই উদ্ভূত। দেখা যাবে যে সাম্প্রতিক অর্থনীতির সচল সমস্যা-সমূহের বহুদিন বাদে পুনরাবর্তন ঘটেছে, ঠিক যেমনভাবে ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীরা বা বিশেষ ক'রে মার্কস এই সব সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এদের সম্মুখবিচার মার্কসীয় পদ্ধতি দিয়েই সম্ভব, বিশেষ ক'রে মার্কসের পুনরুৎপাদন তত্ত্বের বিশ্লেষণের সাহায্যেই।

পুনরুৎপাদনের ছক মার্কসীয় সংকট-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাখ্যার আকর্ষণ ছিল – বিশেষ ক'রে রোজা লুক্সেমবার্গ-রচিত তত্ত্বের, যার আরম্ভ বর্ধিত পুনরুৎপাদন তত্ত্ব থেকে, এবং যা উদ্বৃত্ত মূল্যের তথাকথিত সংসাধন (realization) সম্পর্কিত সমস্যার উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং অনুরূপভাবে 'টুগান-বারানোস্কি'র প্রচণ্ড বিরোধী তত্ত্বের সঙ্গেও ; এবং যা বর্ধিত পুনরুৎপাদন পদ্ধতির সম্ভাব্য বিরোধ-হীনতার কথা বলতে চেয়েছে। বিশেষ অর্থে বলা চলে যে পণ্যের স্বল্প বিক্রয় (under consumption) যা অপর কোনো কোনো তত্ত্বের উপাদান হিসাবে গ্রাহ্য, আসলে তা অতি-উৎপাদনের অপর দিক। প্রসঙ্গত পূর্বোল্লিখিত বিভাগদ্বয়ের মধ্যেকার স্থিতিশীলতার সম্পর্ক সম্বন্ধে এটাই সত্য। একদিক দিয়ে এই সম্পর্কের তাৎপর্য হল চাহিদার স্বল্পতা-জনিত অবস্থা, অন্যদিকে এটাই আবার উদ্বৃত্ত জোগানের অবস্থা। অবশ্য এ-ব্যাপারে অতি সাধারণভাবে বলা চলে যে বিনিময়-ব্যবস্থায় এ-দুটো দিক থাকবেই। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল সেই উৎস যেখান থেকে বিনিময়-ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার বিচ্যুতি ঘটে। আর একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে, এই দ্বিমুখী ধারণা সেই মৌল উৎস-জাত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহকে অলীক উপায়ে এক সংগতির মধ্যে আনতে চেষ্টা করে। তাঁর তত্ত্বের অপর অংশে, তাঁর বিশ্লেষণ-বিচারে যে পক্ষপাতিত্ব তা নিশ্চিতভাবে পণ্য উৎপাদনের অবস্থা ও সংগঠন-সম্পর্কিত কার্যকারণের উপর ঘনীভূত হয়েছে – বিনিময় বা ভোগক্রিয়া সম্পর্কিত প্রশ্নে নয়, কিংবা ক্রেতার মানসিক প্রবণতা-জনিত চাহিদার প্রশ্নেও নয়।

৪

১৮৬৬ সালের নভেম্বরে দাস কাপিটালের প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হামবুর্গে 'গণতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রকাশক' অটো মাইসনের কাছে পাঠানো হল। পাঁচ মাস পরে পাণ্ডুলিপির বাকি অংশ মার্কস নিজেই হামবুর্গে নিয়ে গেলেন। এঙ্গেলসের বক্তব্য অনুসারে, ১৬ আগস্ট ১৮৬৭ তারিখে দুপুর দুটোয় পাণ্ডুলিপির শেষ প্রুফ-কপি দেখে মুদ্রকের কাছে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম জর্মন সংস্করণের মুখবন্ধে তারিখ রয়েছে ঐ বছরের ২৫ জুলাই ; পরের সেপ্টেম্বর প্রকাশ কাল।

প্রথম খণ্ড প্রায় দু-দশকের কর্ম-ফল – কাজে বাধা ও ব্যাঘাত নানারকমে

এসেছে, কখনো শারীরিক অসুস্থতায়, কখনো রাজনৈতিক ব্যস্ততায়—এর মধ্যেই আবার গেছে, প্রথম আন্তর্জাতিকের কাল।

ক্লাসিকাল চিন্তানীতির ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের রচনার সঙ্গে মার্কসের পরিচয় ঐ শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি (তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার পর)। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞান ও পুঁজিতন্ত্র সম্পর্কিত পড়াশুনা ও লেখা বিশেষভাবে আরম্ভ হয় ১৮৫০-এর লণ্ডনে প্রবাস-জীবন থেকেই। বৃটিশ ম্যুজিয়মের পাঠগৃহ ছিল তাঁর সৃষ্টির কারখানা—আসল লেখার কাজ চলতো সোহো-য় অবস্থিত পারিবারিক আবাসস্থলে, এখানে ছিলেন বছর ছয়, পরে হাভারস্টক পর্বতের কাছাকাছি মনোরম পরিবেশে আরো বিস্তৃত সংকুলানক্ষম গৃহে। ১৮৫১-র এপ্রিলে মার্কস এঙ্গেলসকে লিখছেন : 'এতদিন বাদে এখন আমি ধনবিজ্ঞানের নীরস বাস্তবতা কাটিয়ে উঠেছি। এবার বাড়িতে বসে বইটা লেখায় মন দেব এবং এর সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের জন্যে ম্যুজিয়মে যাব। ব্যাপারটা তবু বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর পর থেকে রাষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানের কোনো মৌলিক অগ্রগতি হয় নি।' কিন্তু মার্কসের এই মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী ছিল না, কিছুকাল পরেই তিনি আবার বৃটিশ ম্যুজিয়মে রাষ্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসচর্চায় মন দিলেন। অবশ্য খুব শীঘ্রই তাঁর পুস্তকটি শেষ ক'রে ফেলা সম্ভব হয় নি। এ-ব্যাপারে মার্কস বলছেন : 'বিশেষ ক'রে বাঁচার প্রধান তাগিদে আমার হাতের সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' ১৮৫৭-র ডিসেম্বরে তিনি লিখলেন : 'বইটার জন্য দিনের মধ্যে ১২ ঘণ্টাই আমাকে লিখতে হচ্ছে' (কুগেলমানের কাছে লিখিত পত্র, ১৫ জানুয়ারি ১৮৬৬) ; এবং এর কয়েক মাস বাদে তাঁর মুখ থেকে আবার অভিযোগ শোনা যায় : 'শারীরিক কারণে কয়েক ঘণ্টার বেশি কোনো কাজের কাজ করতে পারি না···এ ছাড়াও বাইরের নানা চাপে ও অবস্থার ফেরে আমার কাজের ক্ষতি হয়' (কুগেলমানকে লিখিত পত্র ২৩ আগস্ট, ১৮৬৬)।

সম্ভবত ১৮৬৬ সালের শুরুতে প্রথম খণ্ডের পরিকল্পনা ও তার প্রকাশ-ইচ্ছা মার্কসের মনে জাগরূক হল। সেই বছর কুগেলমানকে এক পত্রে তিনি লিখছেন : 'আমার এই অবস্থায় (শারীরিক ও বাইরের প্রতিকূলতার চাপে) প্রথম খণ্ড আলাদা ক'রে প্রকাশ করতে হল, প্রথমে যেমন ভেবেছিলুম দুটো খণ্ড একত্রে প্রকাশ করব, তা আর হয়ে উঠল না (১৩ অক্টোবর, ১৮৬৬)।' মার্কস আরো বলছেন : 'সমগ্র কাজটা বিভক্ত করা হয়েছে : প্রথম খণ্ড, পুঁজির উৎপাদন-প্রক্রিয়া ; দ্বিতীয় খণ্ড, পুঁজির আবর্তন-প্রক্রিয়া ; তৃতীয় খণ্ড, প্রক্রিয়ার সামগ্রিক-রূপ ; প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র ক'রে প্রথম বইটি হবে।' মেহ্‌রিং-এর মতে ১৮৬৬-র জানুয়ারি থেকে '৬৭-র মার্চ-এর মধ্যে প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়ে গেল।

অজানা নয় যে মার্কস তাঁর জীবনকালে অন্য খণ্ডগুলো প্রকাশ ক'রে যেতে

পারেন নি। এদের উপ-নাম (subtitles) : 'পুঁজির আবর্তন-প্রক্রিয়া' ও 'পণ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সামগ্রিক রূপ' এবং মার্কসের মৃত্যুর দু-বছর বাদে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ডটি এঙ্গেলস-কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুকালে এদের পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত খসড়া হিসেবে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধারণ মন্তব্যের আকারে রক্ষিত ছিল—এঙ্গেলস সে-গুলিকে একত্র ক'রে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেন। 'একটি পাণ্ডুলিপি (৪ নম্বর) আগাগোড়া পরিমার্জিত ক'রে ছাপার জন্য তৈরি করতে হয়েছে।' দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধে এঙ্গেলস বলছেন, বিষয়বস্তু 'বিচ্ছিন্ন' এবং 'স্থানে স্থানে অসমাপ্ত,' ভাষার দিক দিয়ে অমার্জিত—'যত্নহীন, কথ্যভাষায় লিখিত, কখনো অশালীন ও হাস্যকর ভাব ও বাগধারা ব্যবহৃত', 'লেখকের মাথায় যেমন-যেমন চিন্তা আসছে তেমনিভাবেই লিখিত' ; 'কোথাও কোথাও আলোচনা পুরোপুরি যুক্তিপূর্ণ, কোথাও বা সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আভাসে-ইঙ্গিতে সারা' কখনো কোনো কোনো অধ্যায়ের শেষে অসংলগ্ন বাক্য সমাবেশে অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের সূচনা। এরই মুখবন্ধে (২য় খণ্ডের) তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তুর পূর্বাভাস দিয়েছেন : 'আসলে সমান-সমান নিয়োজিত পুঁজিতে শ্রমের পরিমাণ যা-ই হোক না একই সময়ে তারা সমপরিমাণ গড় মুনাফা উৎপাদন করবে। এখানে মূল্যমানের নিয়ম ব্যাহত হচ্ছে—রিকার্ডো যা লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারায় তা সামঞ্জস্যের মধ্যে আনতে পারছিলেন না।

গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই দুটি খণ্ড সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবার্গের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> 'এই অবস্থায় ক্যাপিটালের শেষ দুই খণ্ডে আমরা সমস্ত আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান পাব না। কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে, স্থানে স্থানে ইতস্তত উল্লেখে তাদের সমাধানের ইঙ্গিতও দেওয়া আছে। মার্কসের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি বিচার ক'রে বুঝতে হবে যে তাঁর ক্যাপিটাল চরম ও পরম সত্যের পথনির্দেশক বাইবেল নয়, বরং আরো অধিকতর চর্চায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও সত্যানুসন্ধানের অশেষ প্রেরণাদায়ক।'

মার্কসের মৃত্যুর পরে বারো বছর জীবিত থেকেও এঙ্গেলসের জীবৎকালে মার্কসের অর্থনীতিচিন্তার ইতিহাস, যা গত শতাব্দীর পাচ-এর দশকে রচিত, তার প্রকাশ ঘটে নি। একদা এই কাজটি তিনি তাঁর গ্রন্থ *Kritik*-এর উত্তর-পর্ব হিসেবে তৈরি করেছিলেন এবং এর নামও দিয়েছিলেন 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা'। পরে এটি 'দাস কাপিটালে'র চতুর্থ খণ্ড হিসেবে পরিকল্পিত হয়, এবং এর পাণ্ডুলিপি ১৮৬১-৬৩ সালের সমগ্র পাণ্ডুলিপির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। সম্ভবত এর রচনাকাল ১৮৬২-র জানুয়ারি থেকে ১৮৬৩-র জুলাই। ১৯০৫-এ কার্ল কাউট্স্কি 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' নাম দিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অতি-সম্প্রতি এর পাণ্ডুলিপি মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনস্টিটিউট ক্রয় করেন এবং পুনর্গ্রন্থনায় নতুন সংস্করণ বেরোয় ১৯৫৪-তে, কাউট্স্কির সংস্করণ থেকে এর ভিন্ন পাঠ, পক্ষান্তরে তা মার্কসের মৌল চিন্তার নিকটবর্তীও।

PROFESSOR MAURICE H. DOBB তাঁর ৩০-৪-৬৮ তারিখের পত্রে এক্স-এর কার্ল মার্কস সংখ্যার জন্য এই প্রবন্ধটি প্রকাশের নির্দেশ দেন। এটি দাস কাপিটাল-এর একটি ইতালীয় সংস্করণের (*Il Capitale*, Libro Primo, trad. Delio Cantimori, Editori Riuniti, Roma, 1964) ভূমিকা স্বরূপ রচিত। প্রবন্ধটি *Science and Society* (New York), পত্রিকায় (Fall, 1967) পুনর্মুদ্রিত এবং অধ্যাপক ডবের সাম্প্রতিক গ্রন্থ (*Papers on Capitalism, Development and Planning*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1967)-এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলা অনুবাদ : মুরারি ঘোষ।

কার্ল মার্কস ও নির্গমতত্ত্ব

অমলেন্দু গুহ

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটানা রপ্তানি উদ্বৃত্তের আকারে ক্রয়শক্তির একতরফা অপসারণ-প্রক্রিয়ার মারফৎ বৃটিশ ভারতের ধন ক্রমাগত বাইরে নির্গমীভূত হয়ে এসেছে — এমন একটি তত্ত্ব দাদাভাই নওরোজির (১৮২৫-১৯১৭) নামের সঙ্গে জড়িত। ভারতের মতো ঔপনিবেশিক দেশে আর্থনীতিক বিকাশের অভাব বা শ্লথতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনিই আঠারো শতকের বৃটিশ উদারপন্থীদের দ্বারা লালিত একটি ধারণাকে ঘষে-মেজে নির্গমতত্ত্ব (drain theory)-রূপে দাঁড় করিয়েছিলেন। বিস্তৃত পরিসংখ্যানের চতুর ব্যবহার তাঁকে এবং তাঁর অনুবর্তী রমেশচন্দ্র দত্তকে (১৮৪৮-১৯০৯) উনিশ শতকের নির্গম-তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিশিষ্ট ক'রে তুলেছিল। একই নির্গমতত্ত্ব কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) ভারত-সম্পর্কিত চিন্তায়ও স্বাধীনভাবে প্রকাশিত। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক বি. এন্. গাঙ্গুলি লিখছেন : '…গত শতাব্দীর ৮০-র দশকে, আর কেউ নন, কার্ল মার্কস স্বয়ং দাদাভাইএর সূত্রটির নির্যাস ঈষৎ অতিরঞ্জিতভাবে প্রকাশ করেছিলেন[১]।' এই মন্তব্যটিতে কালানুক্রমের একটি অসংগতি রয়েছে। পঞ্চাশের দশকেই, অর্থাৎ নওরোজির সংশ্লিষ্ট রচনাবলি প্রকাশিত হওয়ার দুই দশক আগেই, 'বাৎসরিক ধন-নির্গম' সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণাটি দানা বেঁধেছিল। *New York Daily Tribune*-এ, (অতঃপর, *NYDT*) ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে প্রকাশিত মার্কসের প্রবন্ধমালায় নির্গম-তত্ত্বের প্রথম পরিচ্ছন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। তখনই তিনি দেখিয়েছিলেন, বহির্বাণিজ্য তথা রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের কাঠামোর মধ্যে একতরফা ধনাপসারণের সন্নিবিষ্ট (built-in) কলাকৌশল কীভাবে কাজ করে। নওরোজি এবং মার্কস প্রায় একই সময়ে বৃটিশ মিউজিয়মের গ্রন্থশালায় রক্ষিত একই

নথিপত্রের ভিত্তিতে তাঁদের তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। অথচ তাঁদের মধ্যে চেনাশোনা বা যোগাযোগ ছিল না, এ-কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

নির্গমতত্ত্বের নওরোজি-দত্ত ভাষ্যের মূলে ছিল ভারতের তদানীন্তন জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা। অপরপক্ষে, মার্কসীয় ধারণাটি ছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বদৃষ্টির উপজাত, কাজেই ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতের উপর স্থাপিত উভয়েরই প্রেরণাস্থল অবশ্য একই বিষয়ে পূর্ববর্তী কিছু বর্ণনাত্মক বৃটিশ রচনা। নির্গমতত্ত্বের মার্কসীয় ভাষ্যের প্রকৃতি ও গুরুত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য এই প্রবন্ধে চেষ্টা করা হবে।

২

'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—এর ইতিহাস ও ফলাফল' (*NYDT*, ১১ জুলাই ১৮৫৩) এবং 'ভারতে বৃটিশ আয়' (*NYDT*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭) প্রবন্ধদ্বয়ে মার্কস দেখিয়েছেন যে পলাশির পর পররাজ্য দখলের অভিযানের যুগে কোম্পানির আর্থিক অবস্থায় দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৭৬৭ সনে কোম্পানি বৃটেনের জাতীয় ধনাগারে বার্ষিক চার লক্ষ পাউণ্ড নজরানা (tribute) দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু এর বছর সাতেকের মধ্যেই কোম্পানি এই টাকা দেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়। বরং, ১৭৮৪ সনের মধ্যেই দেখা গেল যে কোম্পানি আর্থিক সাহায্যের জন্য বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে[২]। সুতরাং ভারতের আদায়ী রাজস্ব থেকে ব্যয়াতিরিক্ত কোনো উদ্‌বৃত্ত সোজাসুজি নজরানা হিসাবে আত্মসাৎ করা বৃটেনের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না।

এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও লক্ষণীয়। এতদিনকার ভারতমুখী বুলিয়ন-প্রবাহের ধারা উল্টে গেল। কোম্পানির হুণ্ডির মাধ্যমেই চীনে লগ্নির টাকা যেত এতকাল। কিন্তু এখন ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে রৌপ্যের চালান শুরু হল। এই চালানি রৌপ্যের বিনিময়ে চীনের বাজারে চা কিনে বৃটেনে পাঠানো হতো। কোম্পানির কর্মচারীরা এই রন্ধ্রপথেই তাঁদের বৈধ ও অবৈধ উপার্জন থেকে সঞ্চিত পুঁজি স্বদেশে পাঠাতেন। ১৭৫৭ সন থেকে ১৭৬৬ সন পর্যন্ত কয়েক বছরেই কোম্পানি এবং তার কর্মচারীরা ভারতীয়দের কাছ থেকে উপঢৌকন হিসাবে ষাট লক্ষ পাউণ্ড পেয়েছিলেন[৩]। রবার্ট ক্লাইভ একাই আড়াই লক্ষ পাউণ্ড পুঁজি নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন বলে কথিত আছে। বুলিয়নের বিপরীতমুখী প্রবাহের শুরু এইভাবেই। মার্কসের মতে, এই বিপরীত-মুখী প্রবাহ উনিশ শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত একটানাভাবে চালু ছিল। 'চীনে ও ইয়োরোপে বিপ্লব' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন : '১৮৩০ পর্যন্ত, বাণিজ্য-ব্যালান্স একটানাভাবে চীনের সপক্ষে থাকায় ভারত, বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীনে রৌপ্যের আমাদানি নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় ছিল' (*NYDT*,

১৪ জুন ১৮৫৩)। বলা বাহুল্য যে ভারতের রৌপ্যে বৃটেনের জন্যই চা কেনা হতো।

১৮৩৩-এর পর—বিশেষ ক'রে ১৮৪০ সন থেকে বুলিয়ন-প্রবাহের গতিমুখ আর একবার পরিবর্তিত হল। একদিকে ভারতীয় আফিমের জন্য চীন থেকে, এবং অন্যদিকে ভারতে পুঁজি লগ্নির অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বৃটেন থেকে, ভারতে রৌপ্যের আমদানি শুরু হল। তা সত্ত্বেও, এভাবে আমদানি-কৃত মোট বুলিয়নের পরিমাণ ভারতের অনুকূল বাণিজ্য-ব্যালান্স মিটিয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। লেনদেনের এই ঘাটতি ভারতের বাণিজ্যে স্থায়ীভাবে দেখা দিল। অর্থাৎ ধন-নির্গম 'বছর বছর ইংলণ্ডে প্রেরিতব্য প্রতিদানহীন পণ্যসম্ভারের' রূপ পরিগ্রহ করল মাত্র[৪]। কাজেই, দ্রব্য ও দৌলতের খাতে বহির্বাণিজ্যের ব্যালান্স যে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের অনুকূল ছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতীয় রেলপথে লগ্নি-কৃত বৃটিশ পুঁজি আমদানির প্রাবল্যে একবার মাত্র সাত বছরের (১৮৫৬-৬২) জন্য এই একটানা অনুকূল বাণিজ্যে ব্যতিক্রম ঘটেছিল।

কোম্পানি-পরিচালিত ভারত সরকারের আয়-ব্যয় কাঠামোও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। বৃটেনের স্বার্থে ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৪-২৬ ; ১৮৫২), আফগান যুদ্ধ (১৮৩৮-৪২), শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ ; ১৮৪৮-৪৯), সিপাহি বিদ্রোহ দমন (১৮৫৭) ইত্যাদি ব্যয়বহুল অভিযানে জড়িয়ে পড়ার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেনার পরিমাণ শেষপর্যন্ত ৭ কোটি পাউণ্ড ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ধাপে ধাপে এই দেনা কীভাবে বেড়ে চলছিল তা নিচের ছকে দেখানো হল :

ভারতের ক্রমবর্ধমান দেনা

(নিযুক্ত পাউণ্ড)

মার্কস-প্রদত্ত তথ্য		দত্ত-প্রদত্ত তথ্য		
বছর	ভারতীয় ঋণ	ভারতীয় ঋণ	ইংলণ্ডে লব্ধ ঋণ	মোট
১৮০৫	২৫·৬	২১·০		—
১৮২৯	৩১·০	৩০·০		
১৮৫০	৮৭·২	৫০·৫		
১৮৫৮	৬০·০	৬০·৭		

উৎস :

১. কার্ল মার্কস, 'Taxes in India', *NYDT*, ২৩ জুলাই ১৮৫৮।

২. রমেশচন্দ্র দত্ত, *The Economic History of India*, ১ম খণ্ড (ভারত সরকার কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত, ১৯৬০) পৃ ২৯২ ; ঐ ২য় খণ্ড, পৃ ১৬৩।

একদিকে সরকারি দেনার ক্রমবর্ধমান বোঝা এবং অন্যদিকে আয়ের তুলনায় ব্যয়াধিক্যের স্থায়ী ঝোঁক—এই পরিস্থিতিতে আফিমের খাতে আবগারি রাজস্ব দিয়ে কোনোরকমে সরকারি জমাখরচে সমতা রক্ষিত হতো। চীনারা নিজেরাই

আফিমের চাষ শুরু করায়, মার্কসের মতে, তা-ও কঠিন হয়ে পড়ছিল। আফিম-বেচা আবগারি আয় আসলে ছিল চীনা পরিদ্দারের কাছ থেকে আদায়-করা রপ্তানি-কর, ভারতীয়দের উপর কোনো প্রত্যক্ষ বোঝা নয় (*NYDT*, ১১ ও ২৩ জুলাই ১৮৫৩)। কোম্পানির সরকারের ব্যালান্স-শিটের অবস্থাই যখন টলমল, তখন আর বৃটিশ সরকারের স্বার্থে প্রত্যক্ষভাবে ভারত থেকে নজরানা আদায় সম্ভব নয়। কাজেই, ভারত সাম্রাজ্য থেকে সর্বপ্রকার সুবিধা গ্রহণ বৃটিশ নাগরিকদের ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের মধ্যেই সীমিত ছিল। এই মুনাফা ও সুযোগ-সুবিধার মোট পরিমাণ অবশ্য নেহাৎ কম ছিল না, এবং বৃটেনের 'জাতীয় ধনবৃদ্ধির' সহায়ক ছিল (*NYDT*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭)।

পূর্বোল্লিখিত 'ভারতে বৃটিশ আয়' এবং 'ভারতের সরকার' প্রবন্ধে (*NYDT*, ২০ জুলাই ১৮৫৩) মার্কস এদেশে বৃটিশ উপার্জনের চরিত্র নিরূপণ করেছেন। এই উপার্জনের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রায় তিন হাজার অংশীদারের লভ্যাংশ বাবদ ও লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া হাউসের খরচ (home establishment charges) বাবদ একুনে প্রায় আট লক্ষ পাউণ্ড বার্ষিক ভারতীয় দেয় ;

২. ভারতের খরচে বখশিস্-বিতরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার ঢালাও নীতি অনুসারে প্রায় ১০,০০০ সামরিক-বেসামরিক বৃটিশ চাকুরের বেতন বাবদ বার্ষিক আনুমানিক ২০।২৫ নিযুত ডলারের সম-মূল্যের দেয় অর্থ ;

৩. বৃটেনে বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত চাকুরেদের পেন্সন বাবদ বছর-বছর দেয় অর্থ ;

৪. আনুমানিক ১০ কোটি ডলার মূল্যের ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থেকে প্রায় ৬,০০০ ভারতস্থ বৃটিশ ব্যবসায়ীর দ্বারা অর্জিত মুনাফা ;

৫. বৃটেনে সংগৃহীত ঋণের উপরে দেয় সুদ।

বৃটিশ নাগরিকদের ভারতে অর্জিত আয়ের সবটুকুই যে মার্কসের চোখে 'বার্ষিক ধননির্গম' রূপে গণ্য ছিল, তা নয়। এই আয়ের যে-অংশ ভারতে ব্যয়িত হতো তা ভারতেরই কর্মসংস্থান, আয়-প্রবাহ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়ক হওয়ার কথা। যে-অংশ প্রতিদান ছাড়াই ভারতের আভ্যন্তরীণ আয়-প্রবাহ থেকে ছিটকে বছর-বছর ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত হতো শুধু তা-ই নির্গমীভূত ধনের পর্যায়ে পড়ে। 'ভারতে বৃটিশ আয়' প্রবন্ধটিতে মার্কস লিখছেন :

> 'ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের উপর সুদ ও লভ্যাংশসহ, এই পেন্সন বাবদ ভারত থেকে বছর-বছর পনেরো-কুড়ি নিযুত ডলার ব্যয়িত হয়। বলা যেতে পারে ইংরেজ সরকার পরোক্ষভাবে তার প্রজাদের মারফৎ এই পরিমাণ নজরানা আদায় করে। প্রতি বছর যারা বিভিন্ন চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তাঁরাও বেতন থেকে জমানো যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। ভারত থেকে বার্ষিক ধননির্গমের সঙ্গে এটাও যুক্ত হয়।'

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি থেকে এটা পরিষ্কার যে উপার্জনের যে-অংশটা ভারতবাসী ইংরেজরা ভারতেই ব্যয় করতেন, সেটা মার্কসের চোখে নির্গমীকৃত ধনের পর্যায়ে পড়ে না। ১৮৮১ সনে এন এফ ড্যানিয়েলসন-কে লেখা চিঠিতে এই ধারণাটি আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। নির্গম বলতে তিনি বোঝেন :

> '...হিন্দুদের কাজে লাগে নি এমন রেলপথ বাবদ লভ্যাংশ ও খাজনার আকারে ইংরেজ তাদের থেকে যা গ্রহণ করে ; আফগানিস্থান ও অন্যান্য যুদ্ধে একদা-নিযুক্ত সামরিক-বেসামরিক লোকদের জন্য পেন্সন ইত্যাদি ইত্যাদি – ভারতের ভিতরে নিজেদের ভোগের (appropriate) অতিরিক্ত যা-কিছু ওরা তাদের কাছ থেকে সমান প্রতিদান ছাড়াই গ্রহণ করে...'[৫]

কাজেই মার্কসের মতে, বৃটেনকে দেয় সুদ, খাজনা (rent), পেন্সন এবং ভারতস্থ বৃটিশ নাগরিকদের স্থানান্তরিত সঞ্চয় – অর্থাৎ ভারতে অর্জিত বৃটিশ ক্রয়শক্তির স্থানান্তরিত অংশের সমস্তটাই – ঔপনিবেশিক ধননির্গমের পর্যায়ভুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জমাখরচের খাতায়, অদৃশ্য আমদানি বাবদ, অর্থাৎ বীমা ব্যাংক, জাহাজী পরিবহণ ইত্যাদির 'সেবা'র মূল্য বাবদ দেয় বলে যা গণ্য, মার্কসের চোখে তা-ই উপযুক্ত প্রতিদানবিহীন ঔপনিবেশিক নির্গম।

নির্গমের পরিমাণ-নির্ণয়ের জন্য নওরোজি যতটা চেষ্টা করেছেন, মার্কস ততটা করেন নি। তবু, নির্গমতত্ত্বের মার্কসীয় ভাষ্যে পরিসংখ্যান একেবারে অনুপস্থিত নয়। ভারতস্থ প্রায় ১০,০০০ বৃটিশ চাকুরের মোট বার্ষিক আয় কত ছিল তার একটা পরিমাণগত আভাস – বিভিন্ন চাকুরির বেতন-হারের ভিত্তিতে – তিনি দিয়েছেন। কিন্তু এর থেকে কতটা সঞ্চয় ইংলণ্ডে প্রেরিত হতো তা হিসাব করা সম্ভব হয় নি। পেন্সন ও ব্যবসায়ীদের স্থানান্তরিত মুনাফার হিসাবও তিনি দেন নি। তবু মোটামুটিভাবে আন্দাজ করেছিলেন যে ১৮৫৭-এর কাছাকাছি সময়ে পেন্সন, লভ্যাংশ ও ইংলণ্ডস্থ দেনার সুদের বাৎসরিক পরিমাণ মিলিয়ে দেড়/দুই কোটি মার্কিন ডলারের সমান ছিল। এর সঙ্গে চাকুরেদের স্থানান্তরিত সঞ্চয় যোগ দিয়ে বাৎসরিক নির্গমের পরিমাণ পেতে হবে। (*NYDT*, ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭)। অন্যত্র মার্কস বলেছেন : কর্মচারীরা বেতন থেকে সঞ্চিত যে-অর্থ এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ইংলণ্ডে লগ্নির জন্য মুনাফার যে-অংশ পাঠায় তা হিসেবের মধ্যে না ধরেই বলা যায় যে ভারত একাই 'সুশাসনের' মূল্য হিসাবে ৫ নিযুত পাউণ্ড (=৫ কোটি টাকা) নজরানা দিয়ে আসছে[৬]। দেখা যাচ্ছে যে সে-যুগের অন্যান্য নির্গম-তাত্ত্বিকদের তুলনায় মার্কস-প্রদত্ত আংশিক পরিসংখ্যান মোটেই অতিরঞ্জন নয়। যথেষ্ট তথ্যের অনুপস্থিতিতে, তিনি বরং নির্গমের পরিমাণ আংশিকভাবে এবং কম করেই দেখিয়েছেন।

ড্যানিয়েলসন-কে লেখা মার্কসের ব্যক্তিগত চিঠিটিতে অবশ্য নির্গমের পরিমাণ 'ভারতের ৬ কোটি কৃষি ও শিল্প মজুরের মোট আয়ের চেয়ে বেশি বলে বলা

হয়েছে। সম্ভবত, ইতিমধ্যে মার্কস নওরোজির লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পরিসংখ্যানের সূত্র ধরেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। নওরোজির হিসাব অনুযায়ী ভারতীয়দের জনপ্রতি গড়-পড়তা আয় ছিল দেড় পাউণ্ড বা ১৫ টাকা। কৃষি ও শিল্প-মজুরদের জনপ্রতি গড়-পড়তা আয় যদি এর এক-তৃতীয়াংশ ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এই শ্রেণীর ৬ কোটি লোকের আয় দাঁড়ায় ৩ কোটি পাউণ্ড বা ত্রিশ কোটি টাকা। নওরোজির হিসাব অনুযায়ী, ভারত থেকে বাৎসরিক নির্গমের পরিমাণ ২।৩ কোটি পাউণ্ড (১৮৬৫-৭২ সনের ভিত্তিতে)। কাজেই, অপেক্ষাকৃত অসাবধানভাবে লেখা ব্যক্তিগত এই চিঠিটিতেও বা অতি-রঞ্জন কতটুকু ?

নির্গমের আর একটি গুণগত দিকও রয়েছে। ইংলণ্ডের খরচ (home charges) চালানোর জন্য ভারত-সরকার কৃষি-খণ্ড থেকে বর্ধিত খাজনা ও লবণ-কর মারফৎ ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত আদায় ক'রে নিত। মোট আদায়ী রাজস্বের চার ভাগের তিন ভাগই আসত এই দুই উৎস থেকে। অন্যদিকে, সেচ ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজে প্রায় কিছুই ব্যয়িত হতো না। যেমন, ১৮৫১-৫২ সনে বঙ্গ, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রেসিডেন্সির একত্রিত মোট বাৎসরিক রাজস্ব ১৯৮ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে পৌনে ২ লক্ষ পাউণ্ডেরও কম টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হয়েছিল বলে মার্কস উল্লেখ করেছেন[৭]। দ্বিতীয়ত, নির্গমের পথ সুগম করার জন্য ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য কাঠামো-গত পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। ফলে ভারত থেকে আফিম ও খাদ্যশস্যের রপ্তানি দ্রুত বেড়ে চলতে থাকে। ১৮৪৯ থেকে ১৮৭৭ সন পর্যন্ত আটাশ বছরে খাদ্যশস্যের রপ্তানি-মূল্য অনধিক ১০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বাড়তে বাড়তে ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে এবং আফিমের রপ্তানি-মূল্য ৫৮ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ১২৪ লক্ষ পাউণ্ডে পৌঁছেছিল। ভারতের অর্থনীতি স্বাধীন হলে, এই রপ্তানি-বৃদ্ধি হয়তো বিকাশের লক্ষণ বলেই গণ্য হতো। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির তদানীন্তন পরিস্থিতিতে এটা সমৃদ্ধির লক্ষণ ছিল না। আফিমের রপ্তানি-বৃদ্ধিতে কৃষক লাভবান হয় নি। ১৮৫৮ সনে কলকাতার নিলামে এক বাক্স আফিমের দাম ১২১০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা পর্যন্ত উঠতো, কিন্তু উৎপাদন-খরচ ছিল আড়াইশো টাকারও কম। চাষীর লাভালাভ তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। বরং, মার্কসের মতে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে চাষীদের দাদনের শর্তে আবদ্ধ ক'রে এবং চাপ দিয়ে আফিমের চাষ বাড়ানোর ফলে দেশের উৎপাদনী সম্পদ (resources) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল[৮]।

কুটিরশিল্প ধ্বংস হওয়ার দরুন অন্য বিকল্প রপ্তানি-পণ্যের অভাবই ভারতকে খাদ্যশস্য রপ্তানির পথে ঠেলে দিয়েছিল। রপ্তানি-কৃত খাদ্যশস্য বাড়তি উৎপাদন থেকে আসে নি। ১৮৬১-৬৫ সনে মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়ে কার্পাস তুলা ও কাঁচা পাটের চাহিদা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কসের মতে ভারতের অনেক

এলাকার ধান চাষ কমে গিয়েছিল, এবং চড়া দর পেয়ে চাষীরা ২।৩ বছরের পুরনো চালের সঞ্চয় বাজারে বিক্রী ক'রে দিয়েছিল। চাষীদের ভাণ্ডার এভাবে নিঃশেষিত হওয়ার ফলেই ভারতে ১৮৬৬ সনে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল[৯]। সমসাময়িক একজন অর্থনীতিবিদ, এ. কে. কনেল, তাঁর 'ভারতীয় রেলপথ ও ভারতীয় গম' প্রবন্ধে (১৮৮৫) অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বিহারে ও মধ্যভারতে নীল ও আফিমের চাষ প্রসারিত হওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের স্থানীয় যোগান সঙ্কুচিত এবং দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা প্রসারিত হয়েছিল। রেলপথ খাদ্যশস্যের রপ্তানি সুগম ক'রে এবং কৃষকের গোলার ফসল বাজারে টেনে এনে কৃষককে অসহায়ভাবে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছিল[১০]।

৩

দুর্ভাগ্যবশত নির্গম-প্রক্রিয়াটির মার্কস-প্রদত্ত ব্যাখ্যা কোথায়ও একটিমাত্র সুসংহত আলোচনার আকারে পাওয়া যায় না। এই ব্যাখ্যা নানা লেখার মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। বৃটিশ পার্লামেন্টে একবার উইলিয়ম নিউমার্চ (১৮০২-৮২), জেম্‌স উইলসন (১৮০০-৬০) এবং চার্লস্ উড (১৮০০-৮৫)-এর মধ্যে ভারত-ইংলণ্ড দেনা-পাওনার ব্যালান্স-সম্পর্কিত পরিস্থিতি নিয়ে বাদানুবাদ হয়েছিল। 'ক্যাপিটাল' তৃতীয় খণ্ডে মার্কস এর উল্লেখ করেছেন, কেননা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত তথ্যসমূহ তাঁর ধারণাকেই সমর্থন করে। বাদানুবাদের বিষয় ছিল ১৮৫৫ সনের ভারত-ইংলণ্ড বাণিজ্য পরিস্থিতি। প্রশ্ন ছিল, ভারতের একটানা রপ্তানি-উদ্‌বৃত্তের উপযুক্ত কারণ নির্ণয়[১১]। নিচের ছকে ঐ বছরের বাণিজ্য-তথ্য দেওয়া হল :

ক. বৃটেনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ১৮৫৫

মোট আমদানি	মোট রপ্তানি	রপ্তানি উদ্‌বৃত্ত
পাউণ্ড	পাউণ্ড	পাউণ্ড
১০৩৫০,০০০	১২৬৭০,০০০	২৩২০,০০০

খ. সকল দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য : ১৮৫৫

১৪৭৭০,৯২৭	২০১৯৪,২৫৫	৫৪২৩,৩২৮

উৎস :

ক. *Capital*, III (মস্কো, ১৯৬২) পৃ ৫৬৯।

খ. রমেশচন্দ্র দত্ত, *Economic History of India*, II (দিল্লি, ১৯৬০) পৃ ১১৯।

সাধারণ পরিস্থিতিতে, কোনো দেশের অনুকূলে রপ্তানি-উদ্‌বৃত্ত দেখা দিলে বিনিময়ে সমমূল্যের বুলিয়ন, বৈদেশিক সম্পত্তি বা ঋণপত্র প্রাপ্য হয়। কিন্তু ভারতের বেলায় তা ঘটে নি। ইণ্ডিয়া হাউস হুণ্ডি দিয়ে অর্থাৎ ভারতে টাকার যোগান ধরে এই উদ্‌বৃত্ত কিনে নিত এবং তাই দিয়ে তথাকথিত ইংলণ্ডের খরচ (**home charges**) মেটাতো। ১৮৫৫ সনে এর পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড।

এর স্বরূপ সম্বন্ধে মার্কস বলেছেন : 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (বর্তমানে ইস্ট ইণ্ডিয়া সরকার) হাতে রূপান্তরিত হয় ভারতের উপর চাপানো নজরানায়[১২]।' কিন্তু রপ্তানি-উদ্বৃত্তও ইংলণ্ডস্থ খরচ মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় ঐ বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ পাউণ্ড বকেয়া থেকে গিয়েছিল। অতএব, এইভাবে নজরানা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকেই বছর-বছর বৃটেনের কাছে ভারতের ঋণ বেড়ে চলেছিল। ১৮৫৮ সনে ভারতের প্রশাসন কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি মহারানীর হাতে তুলে নেওয়ার সময় পর্যন্ত দেশের ঋণের পরিমাণ এইভাবেই ৭ কোটি পাউণ্ডের কোঠায় পৌঁছেছিল[১৩]।

নির্গম-প্রক্রিয়ার দুটো দিক ছিল। প্রথমত, ভারত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা ছিল, কিভাবে প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় মিটিয়েও বাজেটে উদ্বৃত্ত বাড়ানো যায়। এর জন্য একদিকে ব্যয়ভারবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে জনকল্যাণে অবহেলা সরকারের পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। ইংলণ্ডে দেয় দেনার সুদ, লভ্যাংশ, ইণ্ডিয়া হাউসের খরচ ইত্যাদি মেটানোর জন্য রাজস্বের যে-উদ্বৃত্ত, তা যথেষ্ট ছিল না। ফলে, আরো কিছু অর্থ ভারতে ধার করতে হতো। এইভাবে সংগৃহীত ভারতীয় অর্থ রপ্তানি-উদ্বৃত্তে রূপান্তরিত হয়ে ইংলণ্ডে পৌঁছাত। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মোটামুটিভাবে বার্ষিক সরকারি রাজস্ব আয় ছিল তিন কোটি পাউণ্ডের মতো। এর তিন-পঞ্চমাংশই আসত জমির খাজনা থেকে, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আসত আফিম-রাজস্ব থেকে এবং এক-নবমাংশের কিছু বেশি আসত লবণ-কর থেকে। মোট সরকারি আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ এইসব উৎস থেকে আসত। এই আয় কি কি খাতে ব্যয়িত হতো? লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া হাউসের খরচ বাবদ রাজস্বের শতকরা ৩ ভাগ এবং ইংলণ্ডে দেয় সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ শতকরা ১৪ ভাগ—মোট শতকরা ১৭ ভাগ রাজস্ব ভারত থেকে ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষ-ভাবে হস্তান্তরিত হতো। বাকি রাজস্বের শতকরা ৬৬ ভাগ (অর্থাৎ মোট রাজস্বের শতকরা ৫৪ ভাগ) ব্যয়িত হতো আর্থনীতিক দিক থেকে অনুৎপাদন-শীল সামরিক খাতে[১৪]। মার্কস-বিশ্লেষিত নির্গম-প্রক্রিয়াটির স্বরূপ সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রজনী পাম দত্ত তাঁদের কালের তথ্যের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি আরো বিশদ ক'রে দেখিয়েছেন।

রপ্তানি বছর-বছর আমদানিকে ছাড়িয়ে গেলেও যদি দেশের হাতে রপ্তানি-উদ্বৃত্তের সমমূল্যের সোনা, বৈদেশিক সম্পত্তি বা ঋণপত্র না জমে, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? অর্থনীতির পাঠ্যপুঁথির উত্তর হল, সে-ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সমমূল্যের কিছু অদৃশ্য প্রয়োজনীয় সেবা (services) বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে। এই যুক্তিমতে, ভারতীয়দের সেবায় নিযুক্ত বৃটিশ ব্যাংক, জাহাজী পরিবহণ, বীমা, পরিচালন-দক্ষতা, ঝুঁকিগ্রহণ ইত্যাদি বাবদ এবং ভারতে লগ্নি-কৃত বৃটিশ সঞ্চয়ের সুদ বাবদ ন্যায্য প্রাপ্য মেটানোর জন্যই ইংলণ্ডে অতিরিক্ত রপ্তানি

পাঠাতে হতো। কিন্তু মার্কস আরো তলিয়ে দেখেছিলেন। যখন ভারতের কৃষির জন্য দরকার সেচপ্রণালী, তখন বৃটিশ যন্ত্রশিল্পের বাড়তি মাল কাটতির জন্য এবং সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার স্বার্থে ভারতে রেলপথ বসানো হয়েছিল। ভারতে এবং বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে ঋণ সংগ্রহ না ক'রে বৃটেনকে একচেটিয়া-ভাবে ঋণদানের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তা না হলে অপেক্ষাকৃত কম সুদে এবং সুবিধাজনক শর্তে হয়তো ঋণ পাওয়া যেত এবং রেলপথ নির্মাণও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল হতো। রেল-ঋণ বাবদ জগদ্দল সুদ যে অনেকাংশে ভারতের উপর চাপানো অপ্রয়োজনের বা অকাজের মাশুল, সে-বিষয়ে ডানিয়েল থর্নার সম্প্রতি কিছু আলোচনা করেছেন[১৫]। এহেন রেল-ঋণের রন্ধ্রপথে বিপুল পরিমাণ সুদ-প্রেরণ মার্কসের চোখে ধন-নির্গম বলেই গণ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, বৃটিশ লাট-বেলাট ইত্যাদির কাছ থেকে ভারত যে 'সেবা' পেয়েছে সে-সম্বন্ধেও মার্কসের বক্তব্য একই। তিনি বলেছেন, কোম্পানি প্রায় ১০,০০০ চাকরি বিতরণ করত স্বজনপোষণের জন্য – ভারতের প্রকৃত প্রশাসনিক স্বার্থে নয়। তাই তাদের মোটা বেতন ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হক্ প্রাপ্য ছিল না। অদৃশ্য আয় অদৃশ্য সেবার খেসারৎ – এমন কূট যুক্তি তুলে ধরতে সেকালের অর্থনীতি-বিদেরাও ইতস্তত করতেন। ভারত থেকে একটানা রপ্তানি-উদ্বৃত্তের সংগতি প্রসঙ্গে পার্লামেণ্টে নিউমার্চ সোজা ভাষায় বলেছিলেন, এটা হল ইংলণ্ড থেকে অদৃশ্য-ভাবে 'সুশাসন' আমদানি বাবদ ভারতের দেয়। প্রাক্তন হুইগ সচিব চার্লস উড্ বলেছিলেন, বৃটেনের ভোগের জন্য ভারতের একটানা রপ্তানি-উদ্বৃত্ত নজরানা তো বটেই – প্রথমত, সুশাসন আমদানির মূল্য হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, সেখানে লগ্নি-কৃত পুঁজি থেকে উদ্ভূত আয় হিসাবে, যার জন্য প্রতিদানের প্রশ্ন অবান্তর[১৬]।

ভারত এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা আলোচনা ক'রে মার্কস যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, তা তিনি অন্যান্য উপনিবেশের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করেছিলেন। পুঁজিবাদ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> 'একই কারণে প্রত্যেক উপনিবেশকেই একটানাভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে পাঠাতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং কানাডায় অধিকাংশ ব্যাংকই বৃটিশ পুঁজির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তজ্জনিত লভ্যাংশ ইংলণ্ডে প্রদেয়। ইংলণ্ড অনেক বৈদেশিক ঋণপত্রের মালিকানাসূত্রে ইয়োরোপ, উত্তর-আমেরিকা এবং দক্ষিণ-আমেরিকা থেকেও সুদ পেয়ে থাকে। অধিকন্তু বৈদেশিক রেলপথ, সেচপ্রণালী, খনি ইত্যাদিতে স্বার্থ থাকার দরুনও লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী। এইসব প্রাপ্যের প্রায় সবটাই মেটানো হয় ইংলণ্ড-প্রেরিত রপ্তানির চেয়েও বেশি মূল্যের মাল পাঠিয়ে। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড থেকে ইংলণ্ডীয় ঋণপত্রের মালিকদের কাছে এবং বিদেশস্থ ইংরেজদের ভোগের জন্য যা পাঠানো হয় তা তুলনায় নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর[১৭]।'

নওরোজির মতে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডের মোট রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য ছিল শতকরা ২৫ ভাগ। তিনি দেখিয়েছেন যে এই উদ্‌বৃত্ত আমদানির উৎস ছিল ভারত ও অন্যান্য সমগোত্রীয় উপনিবেশ — উত্তর-আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া নয়। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৮ সন পর্যন্ত পরিসংখ্যান-বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে শেষোক্ত দেশ দুটি ঐ কয় বছর রপ্তানির চেয়ে আমদানিই বেশি করেছিল। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে এইচ ডব্লিউ সিংগার (H. W. Singer)-ও দেখিয়েছেন কেন উত্তর-আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি ভারত থেকে আলাদাভাবে বিচার্য[১৮]। সেখানে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। উত্তর-আমেরিকার সস্তা খাদ্য ও কাঁচামাল ইয়োরোপকে সমৃদ্ধ করেছিল। আবার সেই সস্তা খাদ্য ও কাঁচামালে পরিপুষ্ট হয়ে হাজারে হাজারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক নিজেদের অল্পস্বল্প পুঁজিপাটা নিয়ে স্বাধীনভাবে উত্তর-আমেরিকায় চলে এসেছিল। ফলে, নির্গমীভূত ধন বহুলাংশে আবার ফিরে এসেছে। উত্তর-আমেরিকার দ্রুত পুঁজি-গঠনের মূলে এই ঘটনা। এ-পার্থক্যটা কিছু পরিমাণে নওরোজির নজরে পড়লেও, মার্কসের নজরে পড়ে নি। কিন্তু সিংগার-এর এবং উপনিবেশে আর্থ-নীতিক দ্বৈততায় বিশ্বাসী অনেক অর্থনীতিবিদদের মূল বক্তব্য নির্গমতত্ত্বের মার্কসীয় ভাষ্যের মধ্যে সূত্রাকারে পাওয়া যায়।

৪

আমরা বলেছি যে উপনিবেশ থেকে রপ্তানি-উদ্‌বৃত্ত উৎপাদনশীল, সেবামূলক, অদৃশ্য আমদানির মূল্য হিসেবে জমাখরচের খাতায় দেখিয়ে নির্গমের উলঙ্গ সত্যকে ঢেকে রাখা কষ্টকর। ইংলণ্ডের কাছে ভারতের ঋণ বহুলাংশে ভারতের কাঁধে বন্দুক রেখে ইংলণ্ডেরই ঔপনিবেশিক যুদ্ধাভিযান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। মার্কস ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন যে এই যুদ্ধনীতির একটি উদ্দেশ্য ছিল, বৃটিশ অভিজাতদের 'কনিষ্ঠ পুত্রদের কাজ যোগানো'। তাছাড়া, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরেরা বৃটিশ অভিজাত শ্রেণীর তোষণের জন্য তাদের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নানা চাকুরি বিতরণ করতো (*NYDT*, ২০ ও ৩০ জুলাই ১৮৫৩)। রেল-ঋণের চরিত্র কী? গ্যারান্টি-ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে, লোকসানের ঝুঁকির সবটুকুই নিয়েছিল ভারত সরকার। শতকরা পাঁচভাগ লভ্যাংশে ঘাটতি পড়লে ভারতীয় রাজস্ব থেকে পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই রক্ষাকবচের ছত্রছায়ায় বৃটিশ ঠিকাদার, বৃটিশ যন্ত্রনির্মাতা, বৃটিশ রেল-কর্মচারী এবং বৃটিশ আরোহীর স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে গ্যারান্টি-প্রাপ্ত কোম্পানিগুলি রেলপথের নির্মাণ, মেরামতি ও পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ক'রে তুলেছিল। শত রন্ধ্রপথে বৃটিশ নাগরিকদের অর্থপ্রাপ্তির ঢালাও ব্যবস্থা রেল-অর্থনীতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট (built-in) করা হয়েছিল। সে-জন্যই এই কোম্পানিগুলি সুদীর্ঘকাল শতকরা ৫

ভাগ লাভ দেখাতে না পেরে ভারতীয় রাজস্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই, রেল-ঋণের সুদ ন্যায্য প্রাপ্য হিসাবে গণ্য না হয়ে মার্কসের চোখে রাজনৈতিক নজরানা-রূপেই গণ্য। জাহাজী পরিবহণ, বীমা এবং ব্যাংকের 'সেবা'-বাবদ মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট সেবার ন্যায্য মাশুলের চেয়ে অনেক বেশি ভারতের কাছ থেকে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা আদায় ক'রে নিত। তার কারণ এই 'সেবা' ক্রয়ের বাজার প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। সরকারি পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্বের পরিবেশে তা অসম্ভব ছিল। প্রসঙ্গান্তরে, তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা ক'রে মার্কস বলেছেন : 'যখনই বৃটিশ স্বাধীন বাণিজ্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করা যায়, তখনই প্রায়শ দেখা যায় যে এই 'স্বাধীনতা'র মূলে রয়েছে একচেটিয়া অধিকার[১৯]।'

মার্কসের নির্গমতত্ত্ব প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। ইংরেজ মালিকরা যেমন উপনিবেশের উদ্বৃত্তটুকু পুঁজিবাদী শোষণ-প্রক্রিয়ার মারফৎ শোষণ ক'রে নিত, তেমন তো স্বদেশেও উৎপাদনক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শুষে নিত। তাহ'লে স্বদেশে শোষণ এবং উপনিবেশে শোষণের মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য কোথায়? উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্বের বাইরে আলাদা একটি নির্গমতত্ত্বের অবতারণা কেন? এর উত্তর দুটি। প্রথমত, মার্কসীয় চিন্তাক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক নির্গম প্রথম পর্যায়ে মোটামুটি লুটপাট মারফৎ স্বদেশে প্রাথমিক পুঁজিগঠনের অন্যতম উপায় মাত্র। এই ঐতিহাসিক স্তরে—

> 'উপনিবেশগুলি বিকাশমান শিল্পোৎপাদনের জন্য বাজার হিসাবে দেখা দিয়েছিল এবং এই বাজারের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্বের মারফৎ অধিকতর পুঁজিগঠন সম্ভবপর ক'রে তুলেছিল। প্রকাশ্য লুটপাট, হত্যা এবং দাস-ধরার মারফৎ ইয়োরোপের বাইরে হৃত ধনদৌলত স্বদেশে পৌঁছে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছিল[২০]।'

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো সযত্নে-গড়া বাগিচা-উপনিবেশেই হোক কিংবা ভারত ও মেক্সিকোর মতো সমৃদ্ধ, জনবহুল দেশেই হোক, পুঁজিগঠনের জন্য এহেন উপনিবেশবিস্তারের যুগে স্বভাবতই আদিবাসীদের প্রতি ব্যবহার ছিল ভয়াবহ[২১]।

অন্তর্বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের প্রাথমিক পুঁজি গঠন করেছিল এইভাবেই। ভারতস্থ বৃটিশ ফ্যাক্টরিগুলির প্রেসিডেন্টের অনুমতিপত্র বা 'দস্তক' দেখিয়ে তারা দেশি-বিদেশি সকল ব্যবসায়ীর উপর প্রযোজ্য স্থানীয় রাষ্ট্রের শুল্ক ফাঁকি দিত। ১৭১৩ সাল থেকেই স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ীরাও কোম্পানির কর্মচারীদের বেনামে বা তাদের সঙ্গে শরিকানায় এই বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। ১৭৭৩ সালে দস্তক রদ হওয়া পর্যন্ত প্রায় ১০০ বছর ধরে এই অপকর্ম চালু ছিল। গায়ের জোরে এই অসম সুবিধাভোগের ফলেই ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলার অন্তর্বাণিজ্য ভারতীয়দের হাত থেকে সম্পূর্ণ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল[২২]। মার্কস লিখেছেন :

'...ভারতের আন্তঃবৈপিক ও উপকূল-বাণিজ্য তথা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। লবণ, আফিম, পান এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল অফুরন্ত ঐশ্বর্যের খনি। কর্মচারীরাই দর বেঁধে দিত এবং হতভাগ্য হিন্দুদের লুণ্ঠন করত। এই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে গবর্নর-জেনারেলও অংশ নিতেন। রূপকথার রাসায়নিকের চেয়েও চতুর তাঁর প্রিয়পাত্রেরা এমন সব শর্তে ঠিকা পেত যার বলে তারা ধুলোকেও সোনায় রূপান্তরিত ক'রে ফেলত। রাতারাতি ব্যাঙের ছাতার মতো বিরাট সম্পত্তি গড়ে উঠত, এক কপর্দকও লগ্নি না ক'রে প্রাথমিক পুঁজি গড়ে উঠত[২৩]।'

সারা আঠারো শতক ধরে ভারত থেকে ইংলণ্ডে স্থানান্তরিত ধনের সামান্য অংশই ছিল সৎ ও স্বাভাবিক ব্যবসায়ের লাভ। তাই এর সবটাই মার্কসের মতে একচেটিয়া ক্ষমতার সুযোগে নির্গমীভূত ধন (*NYDT* , ১১ জুলাই ১৮৫৩)।

পরবর্তী যুগে, ঔপনিবেশিক শোষণ ক্রমশ উদ্বৃত্ত মূল্যের শোষণ হিসাবে দেখা দিলেও, এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে গিয়েছিল। স্বদেশজাত উদ্বৃত্ত-মূল্য যেখানেই লগ্নি-কৃত হোক না কেন তার থেকে উদ্ভূত চক্রায়িত সুযোগ সুবিধার স্রোত – আধুনিক পরিভাষায় 'গুণক' ফয়দা (multiplier effects) – স্বদেশীয় অর্থনীতিকেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলে। উপনিবেশের বাগিচা ও খনিতে লগ্নি-কৃত পুঁজি লগ্নিকারী দেশের শিল্পায়নকেই ত্বরান্বিত করে। পক্ষান্তরে, বিদেশী মালিকানা ও পরিচালনার খেসারৎ হিসাবে আভ্যন্তরীণ আয়-প্রবাহ থেকে অনেকখানি ক্রয়শক্তি বেরিয়ে যাওয়ার ফলে উপনিবেশে ভোগ্য পণ্যের কারখানা গড়ে উঠার পথে বাধা পায়। এই বহির্গত ক্রয়শক্তিকেই মার্কস 'নির্গমীভূত ধন' হিসাবে দেখিয়েছেন, উপনিবেশে বৃটিশ উপার্জনের সবটুকুকে নয়। সাম্প্রতিক আর্থনীতিক দ্বৈততার তত্ত্ব (dualistic theory) এই বিষয়ে মার্কসের ধারণার পরিপোষক। আমরা এখানে শুধু সিংগার-এর বিশ্লেষণ তুলে ধরব।

সিংগার দেখিয়েছেন যে লগ্নিকারী উন্নত ও লগ্নি-গ্রাহক অনুন্নত দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন থেকে উদ্ভূত আর্থনীতিক সুযোগসুবিধাগুলির প্রায় সবটাই প্রথমোক্ত দেশের ভাগে পড়ে। বিদেশী-পরিচালিত যে রপ্তানি-খণ্ড উপনিবেশের অর্থনীতিতে গড়ে উঠে সেটা শুধু ভৌগোলিক অর্থেই উপনিবেশের অংশ, আসলে লগ্নিকারী দেশের অর্থনীতিকেই পরিপুষ্ট করে। তাই একে লগ্নিকারী দেশের অর্থনীতির অগ্রগামী ঘাঁটি বা কুঠি বললেও অত্যুক্তি হয় না। উপনিবেশের ভোগ্য পণ্য ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য লগ্নিকারী দেশে শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়। তার ফলে, সেখানকার জনশক্তি অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনশীল শ্রমক্ষেত্র থেকে বেশি উৎপাদনশীল শ্রমক্ষেত্রে সরে আসতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পবিস্তারের দরুন বহিরাঙ্গিক ব্যয়সংক্ষেপের (external economies) সকল

সুবিধা সেখানে দেখা দেয়। তৃতীয়ত, শিল্পজাত পণ্যের তুলনায় খাদ্য ও কাঁচা-মালের দর পড়ে যেতে থাকায় লগ্নিকারী দেশ প্রথমোক্ত পণ্যের উৎপাদকারী হিসাবে এবং দ্বিতীয়োক্ত পণ্যের ভোক্তা হিসাবে দু-দিক দিয়ে লাভবান হয়। অর্থাৎ, যান্ত্রিক প্রগতি থেকে উদ্ভূত উন্নতির সবটুকুই লগ্নিকারী দেশ এইভাবে আত্মসাৎ করে। অপরপক্ষে লগ্নিগ্রাহী দেশ একটি বা দুটিমাত্র কাঁচামাল তৈরির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার ফলে উপনিবেশের অর্থনীতি একপেশে হয়ে ওঠে। একপেশে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের দরুন বিকল্প সম্ভাবনাগুলি অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায়। ফলে যান্ত্রিক উন্নতি, দক্ষতা, যন্ত্রশিক্ষা, উদ্ভাবনী প্রেরণা ইত্যাদি উন্নয়নের একান্ত আবশ্যিক শর্তগুলি শতপথে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। বিদেশী-পরিচালিত খণ্ডে যে আয়-প্রবাহ সৃষ্ট হয়, তার অনেকখানি দেশের মধ্যে পুনর্লগ্নি-কৃত না হয়ে বাইরে চলে যায়। উৎপাদনশীল যন্ত্রের বদলে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য ও অদৃশ্য পণ্যের আমদানি প্রশ্রয় পায়। সিংগার-এর এই বিশ্লেষণ মার্কসের নির্গম তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায়[২৪]।

৫

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটেছিল কার্যত ১৮১৩ সনেই। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্য তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারত শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিকারক থেকে আমদানি-কারকে রূপান্তরিত হয়েছিল। টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হার আড়াই শিলিং থেকে দুই শিলিংএ এসে নামল ১৮২৩-এ। ১৮৭০ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে রূপার দাম কমতে থাকে। এর ফলে টাকার বৈদেশিক দরও আরো নামতে নামতে উনিশ শতকের শেষে দেড় শিলিংএ ঠেকেছিল। কাজেই ইংলণ্ডের প্রাপ্য মেটানোর জন্য ভারতকে ক্রমাগত রপ্তানি-উদ্বৃত্ত বাড়িয়ে যেতে হয়েছিল। তাছাড়া, ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানি-পণ্যের (যেমন চা) দাম আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগত পড়ে যাচ্ছিল উনিশ শতকের শেষ কুড়ি বছরে।

মার্কস লক্ষ করেছিলেন যে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বৃটেনের ভারতীয় বাণিজ্য আগের মতো বাড়তির দিকে না গিয়ে বরং সংকোচনের সম্মুখীন। ১৮৪৩-৪৬এর বছর ক-টিতে ভারত থেকে বৃটেনে গড়-পড়তা বাৎসরিক রপ্তানির মূল্য ছিল ২৭৪ নিযুত টাকা। ১৮৪৭-৫০এ তা ২৫৩ নিযুত টাকায় নেমেছিল। একটি হিসাব অনুযায়ী যে-স্থলে বৃটিশ কারখানা-জাত পণ্যের মাথা-পিছু ভোগের পরিমাণ বৃটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ১৪ শিলিং, ব্রাজিলে ৬ শিলিং ৫ পেনি এবং কিউবায় ৫ শিলিং ৭ পেনি ছিল, সে-স্থলে ভারতে ছিল মাত্র ৯ পেনি (*NYDT*, ১১ জুলাই ১৮৫৩)। বৃহদাকারে বৃটিশ পুঁজি ও দক্ষতা বিনিয়োগ ক'রে ভারতীয় অর্থনীতির রপ্তানিখণ্ডের সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা তাই বৃটিশ পুঁজিপতি মহলে বিশেষ

ক'রে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য প্রধান অন্তরায় ছিল কোম্পানির শাসন। তাই, ১৮৫৮ সনে কোম্পানির শাসন ঘুচিয়ে ভারতকে সরাসরি মহারানীর শাসনে আনা হল। মার্কসের মতে এই সময় থেকেই ভারতীয় ইতিহাসে বৃটিশ কারবারী পুঁজির যুগের অবসান ও বৃটিশ শিল্প-পুঁজির যুগের আরম্ভ নিরঙ্কুশভাবে সূচিত।

এই পরিবর্তনের ফলে নির্গমের পরিমাণে ও গুরুত্বে কোনো হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছিল কি? কোম্পানির যুগে ভারতে বৃটেনের ভূমিকা ছিল মোটামুটিভাবে ধ্বংসাত্মক। মার্কসের 'ভারতের সরকার' প্রবন্ধে (*NYDT*, ২০ জুলাই ১৮৫৩) বৃটিশ শাসনের ফলাফল পাঁচ দফায় এইভাবে সংক্ষেপিত হয়েছিল: ১. চিরস্থায়ী আর্থিক ঘাটতি, ২. যুদ্ধবিগ্রহের ছড়াছড়ি, ৩. জনকল্যাণকর্মের অনুপস্থিতি, ৪. ঘৃণ্য করনীতি এবং ৫. অনুরূপ ঘৃণ্য আইন ও বিচারব্যবস্থা। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যপাতির ভিত্তিতেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কোম্পানির শাসনের অবসানের পর মার্কস আরো পঁচিশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু নতুন তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের অবস্থা নতুন ক'রে বিশ্লেষণের সুযোগ তাঁর হয়ে উঠে নি। অবশ্য তাঁর এ-ধারণা দৃঢ় ছিল — ধারণাটি তাঁর পুঁজিবাদ-সম্পর্কিত তত্ত্বপ্রসূত — যে শিল্পপুঁজির কর্তৃত্বের যুগে ইংলণ্ড ভারতে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ: 'একটি ধ্বংসাত্মক, অপরটি সঞ্জীবনী — পুরাতন এশীয় সমাজের বিলোপসাধন এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি (material foundations) স্থাপন' (*NYDT*, ৮ আগস্ট ১৮৫৩)। ঐ একই প্রবন্ধে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

> 'বিরাট একটি দেশে রেল চলাচলের আশু ও দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য দরকারি শিল্প-প্রক্রিয়া প্রবর্তন না ক'রেই বিস্তৃত রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। এটা করতে গেলেই রেলপথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কিত নয় শিল্পের এমন সব শাখায়ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। অতএব রেলপথব্যবস্থা ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত হবে।'

কলকাতার টাকশালে ও কয়লাখনি অঞ্চলে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালনায় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের পারদর্শিতার উল্লেখ করেছেন মার্কস। এ থেকে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সম্মতি থাকার দরুনই ভারতীয়রা শিল্পশ্রমের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল এবং পারবে। তাই তিনি ভারতে রেলপথের ভবিষ্যৎ ও গঠনাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে আশাবাদী (*NYDT*, ৮ আগস্ট ১৮৫৩)। কিন্তু আটাশ বছর পর ১৮৮১ সনে ড্যানিয়েলসন-কে লেখা চিঠিতে তিনি ভারতীয় রেলপথকে 'হিন্দুদের জন্য অকেজো' বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন। এই আটাশ বছর ধরে ভারতে রেলপথ নির্মাণের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয় তিনি আর এর সঞ্জীবনী ভূমিকার উপর আগের মতো আস্থা রাখতে পারছিলেন না।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৃটিশ শাসনের এই দ্বৈত ভূমিকা—একাধারে সঞ্জীবনী ও ধ্বংসাত্মক—মার্কসের পরেও সমান তালে বজায় ছিল। মার্কস কখনো একথা বলেন নি যে এই প্রক্রিয়ার চলৎশক্তির (dynamics) বলে সৃজনী ঝোঁক ধ্বংসের চেয়ে আপনা-আপনি প্রবল হবে। ভাঙন, বিলগ্নীকরণ ও ধননির্গমকে পুনর্গঠন, লগ্নীকরণ ও বর্ধিত উৎপাদন ছাড়িয়ে যাবেই—এমন নিশ্চিত ধারণা তাঁর ছিল না। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে 'শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপর নয়, জনসাধারণ এর কতটা নিজস্ব ক'রে নিচ্ছে, তার উপর এ-প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভরশীল (*NYDT*, ৮ আগস্ট ১৮৫৩)।

ধনঞ্জয় রামচন্দ্র গাডগিল ও রজনী পাম দত্তের বিশ্লেষণে উনিশ শতকের ভারতে বৃটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক দিকটাই প্রকট। তাঁদের পূর্বসূরি রমেশচন্দ্র দত্তও ১৯০৩ সনে এই রায়ই দিয়েছিলেন যে 'ইংলণ্ডের পতকার পিছু-পিছু তার বৃহত্তম উপনিবেশে ক্রমবর্ধমান ধন, বর্দ্ধিষ্ণু শিল্প এবং সমৃদ্ধ কৃষি দেখা দেয় নি[২৫]।' ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত এই মতবাদের সঙ্গে হালের কয়েক জন গবেষক একমত নন। কিন্তু বিকল্প প্রস্তাবের সপক্ষে তাঁরা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি। অপর পক্ষে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে নবাগত 'দ্বৈত অর্থনীতি'র ধারণা মারফৎ নির্গমতত্ত্বের নির্যাসটুকু নতুন ক'রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দ্বৈততা-তত্ত্বের অনেকগুলি দিক নির্গমতত্ত্বের মার্কসীয় ভাষ্যেও উপস্থিত। মার্কসের মতে, বৃটেনের দ্বৈত ভূমিকার ফলে 'পুনর্গঠনের লক্ষণহীন ভারতীয় সমাজ-কাঠামো'র মধ্যে সুবিকশিত উৎপাদনশক্তিবিশিষ্ট একটি শিল্পখণ্ড ও 'সমাজের নতুন উপাদান' গড়ে উঠেছিল। তবু দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয় নি। কারণ, বৈদেশিক মালিকানা ও পরিচালনার অন্তরায় থাকার দরুন জনসাধারণ নতুন উৎপাদনশক্তির বিকাশকে নিজস্ব ক'রে নিতে পারে নি (*NYDT*, ৮ আগস্ট ও ২৫ জুন ১৮৫৩)।

৬

মার্কস, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে, উপনিবেশ থেকে ধননির্গম সম্বন্ধে যা লিখেছেন, এই প্রবন্ধে তা একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মার্কসের নির্গমতত্ত্ব একদিকে পুঁজিবাদ-সম্পর্কিত তাঁর সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় এবং অন্যদিকে নির্গমতত্ত্বের নওরোজি-দত্ত ভাষ্যের সারাংশকেও প্রকাশ করে। আমাদের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টি অধিকতর স্বচ্ছ; কারণ, বৃটিশ শাসনের বিষয়ী-মুখী ভূমিকা হিতকর ও প্রগতিশীল বলে তিনি কখনো ভাবেন নি, বরং এর শ্রেণীচরিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অন্যদিকে, এর বিষয়-মুখী প্রগতিশীল ভূমিকার প্রতিও তিনি অন্ধ ছিলেন না। ভারতের অর্থনীতিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আধুনিকতার উপাদান বিকশিত হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু

বৈদেশিক মালিকানা ও পরিচালনার দরুন তার প্রভাব সমাজদেহে সঞ্চারিত হতে পারে নি। লগ্নি থেকে উদ্ভূত চক্রায়িত (cumulative) সুযোগ-সুবিধা বিদেশি মালিকানার শান-বাঁধানো নালি দিয়ে নিয়মিতভাবে বিদেশে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে।

১৮৫৩ সনে মার্কসের আশা ছিল, রেলপথ অগ্র-পশ্চাৎ যোগাযোগ-সূত্রের মারফৎ দেশময় যন্ত্রকৌশল ছড়িয়ে দেবে এবং নতুন নতুন শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায়—এবং পরেও দীর্ঘকাল—তাঁর এ আশা অপূর্ণ ছিল, একথা আগেই বলা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছরে নির্গমের দিকটাই ভারী না আর্থনীতিক নিট্ লাভের দিকটাই ভারী এ নিয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। মার্কস এ-বিষয়ে শেষ কথা বলেন নি, বলার চেষ্টাও করেন নি। অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাসের সমকালীন মতামতকেই মেনে নিয়েছিলেন। আর, ভারতে বৃটিশ শাসনের ফলাফল সম্বন্ধে কোনো বিকল্প তথ্যভিত্তিক মত এখনো পর্যন্ত কেউ দাঁড় করাতে পারেন নি।

নির্দেশিকা

১. B. N. Ganguli, *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory* (বোম্বে, ১৯৬৫) পৃ ৪২।

২. 'The Indian Bill', *New York Daily Tribune*, ২৪ জুলাই ১৮৫৮; J. C. Sinha, *Economic Annals of Bengal* (লণ্ডন, ১৯২৭) পৃ ৪০ ও সংশ্লিষ্ট পাদটীকা।

৩. *Capital*, ১ম খণ্ড (মস্কো) পৃ ২৯২।

৪. *NYDT*, ১৪ জুন ১৮৫৩।

৫. লণ্ডন থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ সনে N. F. Danielson-কে লেখা চিঠি থেকে উদ্ধৃতি। দ্রষ্টব্য Marx and Engels, *On Colonialism* (দ্বিতীয় মুদ্রণ, মস্কো) পৃ ৩৩৭।

৬. *Capital*, ৩য় খণ্ড, XXXV অধ্যায়।

৭. 'Sir Charles Wood's East Indian Reforms', *NYDT*, ২২ জুন ১৮৫৩।

৮. 'The Opium Trade', *NYDT*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

৯. *Capital*, ২য় খণ্ড (মস্কো, ১৯৬১) পৃ ১৪০-৪১ ও সংশ্লিষ্ট পাদটীকা।

১০. গাঙ্গুলি, টীকা ১, পৃ ১৩৩-৩৪।

১১. *Capital*, ৩য় খণ্ড (মস্কো, ১৯৬২) পৃ ৫৬৫-৭০।

১২. ঐ, পৃ ৫৬৯।

১৩. রমেশচন্দ্র দত্ত, *The Economic History of India*, ২য় খণ্ড (ভারত সরকারের পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬০) পৃ ১৬৫-৬৬।

১৪. 'India', *NYDT*, ৫ আগস্ট ১৮৫৩; 'Taxes in India', ঐ, ২৩ জুলাই ১৮৫৮।

১৫. Daniel Thorner, 'Great Britain and the Development of India's Railways', *The Journal of Economic History* (Fall, 1951) পৃ ৩৮৯-৪০২ ; 'The Pattern of Railway Development in India', *Far Eastern Quarterly*, পৃ ২০১-১৬।

১৬. *Capital*, ৩য় খণ্ড, ৫৬৯-৭০।

১৭. ঐ, পৃ ৫৭৭।

১৮. Dadabhai Naoroji, *Poverty of India* (বোম্বে, ১৮৭৮) পৃ ২৪-২৬ ; গাঙ্গুলি, টীকা ১, পৃ ২১-২৩। H. W. Singer, 'The Distribution of gains between investing and borrowing countries', *The American Economic Review*, XL (মে ১৯৫০) পৃ ৪৮৩।

১৯. 'Opium Trade', *NYDT*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮।

২০. *Capital*, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৩৩-৫৪।

২১. ঐ।

২২. সিংহ, টীকা ২, পৃ ৯-১০, ৬৯-৭০ ও ১৫৮।

২৩. *Capital*, ১ম খণ্ড, পৃ ৭৫২।

২৪. Singer, ১৮, পৃ ৪৭৩-৮৪।

২৫. প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১৯০৩, *The Economic History of India*, ১ম খণ্ড।

New York Daily Tribune-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির জন্য আমরা মস্কো থেকে প্রকাশিত *On Colonialism* সংকলনটি ব্যবহার করেছি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সুন্দর ও কার্ল মার্কস

ভাবুক মার্কসের জাতক লগ্ন ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে একজন পার্নাসিয় কবি জন্মেছিলেন, ল্যকঁৎ দ্য লীল। দুই ভাবুকের জন্মস্থলের নিসর্গশোভার মধ্যে যদি-বা কোনো সাদৃশ্য আরোপণ সম্ভব, দু-জনের মধ্যে নিশ্চয় কোনো দিক থেকেই ন্যূনতম সগোত্রতা প্রত্যাশিত নয়। ধ্রুপদী দুই দেবতা আপোলো ও দিঅনুসাসের নামে উৎসর্গিত গ্রীসিয় পর্বত পার্নাসাসের অনুষঙ্গে মেতে উঠলেও পার্নাসিয় কবিগোষ্ঠীর অব্যবহিত প্রেরণা ছিল তেঅফিল গোতিয়ের-কীর্তিত প্রকরণসর্বস্ব 'স্বাশ্রিত শিল্পবাদ' (l'art pour l'art)। এটাও বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে, প্রতীকী কবি মালার্মে এই কাব্যধারার মধ্য থেকেই তাঁর আপন পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। ঐ সংক্রান্তিমুহূর্তেই সম্পূর্ণ প্রতীপ ধারণা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্লোবেয়ার (জ. ১৮২১), যাঁর বিষয়ে এডমাণ্ড উইলসন এতদূর বলেছিলেন যে মার্কস দেখতে পান নি এমন-কিছুও তাঁর নজরে এসেছিল। উইলসন অন্যত্র আমাদের অবহিত করেছেন প্রতীকবাদ ও প্রকৃতিবাদ এই দুয়ের বিবাদী সমন্বয় আধুনিক সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। মার্কস এই উভয় প্রবণতাকেই খারিজ ক'রে দিয়েছিলেন। অন্তত দুই শিল্পাদর্শের প্রতি তাঁর বিমুখতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছড়িয়ে আছে একাধারে আঙ্গিকমুখ্যতা ও উদ্দেশ্যগন্ধি উপন্যাসের (Tendenzroman) প্রতি তুল্য অনাস্থায়। তাঁর সতীর্থ ও মুখপাত্র এঙ্গেলসের এই বক্তব্য[১] এখানে স্মরণযোগ্য : 'বালজাক, যাঁকে আমি বাস্তবতার দক্ষতর শিল্পী বলে মনে করি, তাঁর 'মানবিক কমেডি' (*La Comédie Humaine*) বইতে যা দিয়েছেন সমস্ত জোলাদের[২] 'ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' (passés, presents et à venir) জড়ো করেও তার সমান হবে না : ১৮১৬-৪৮এর অন্তর্বর্তী অভিজাত ফরাসি সমাজে জায়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর

আন্তর প্রগতিপন্থার আশ্চর্য বাস্তব আলেখ্য এঁকে তুলেছেন···রাজনীতিক হিসেবে বালজাক প্রথানুগত ; তাঁর মহান্ শিল্পকাজ ভালো সমাজের অরোধ্য ক্ষয়িষ্ণুতা বিষয়ে একটি শোকগাথা যেন : মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতিই তাঁর সহানুভূতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যাঁদের উপর তাঁর দরদ গভীরতম সেই অভিজাত নরনারীদের যখন তিনি গতিময় ক'রে তুলেছেন তাঁর স্যাটায়ার সে-সব ক্ষেত্রে তন্নিষ্ঠ, শ্লেষ তিক্ত।' আবার, এই বালজাকের অবাস্তব রূপায়ণের কারণও, মার্কসের মতে, তাঁর আত্যন্তিক উদ্দেশ্যবাদ –

> বালজাক, যিনি বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর নিখুঁৎ দখলের জন্য উল্লেখ্য, 'চাষীরা' (*Les Paysans*) নামক তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসে খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন, কী ক'রে এক তুচ্ছ চাষা তার মহাজনের জন্য স্বেচ্ছায় এটা-ওটা ক'রে দেয়, মহাজনের শুভেচ্ছা পাবে বলে, ভাবে নগদ কিছু না পেলে কি হয়েছে, সে তো আর মহাজনকে এমনি-এমনি শ্রমদান করছে না। এইভাবে তিনি মহাজনের হয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। তিনি নগদ মাইনে বাঁচিয়ে চাষীকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরছেন, যে-বেচারা নিজের শ্রমক্ষেত্রে বঞ্চিত থেকে মাকড়সার মতো কুশীদ-জালে জড়িয়ে পড়ছে[২]।

যদিও মূলধন মুনাফা প্রভৃতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই মার্কস এই উদাহরণ দিয়েছেন, এখানে তাঁর ক্ষোভ ঔপন্যাসিকের উগ্র একদেশদর্শিতায়। এই উষ্মা প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি সরাসরি বালজাক বাস্তব কি অবাস্তব চিত্র এঁকেছেন সে-সম্পর্কে কটু কটাক্ষ করতে পারেন নি, স্বগত স্বরে একবার বলে নিয়েছেন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রভাবিত সমাজব্যবস্থায় অ-পুঁজিপতি উৎপাদকও ধনতান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা চালিত হয়। ঐ সংস্কারের বশীভূত হওয়ার জন্য লেখককে তিনি সর্বৈব অভিযুক্ত করতে চান নি, শুধু প্রচার-পক্ষপাতের উপর বাঁকা চোখে তাকিয়েছেন। এখানেই মার্কসীয় সৌন্দর্যবোধের একটা গাঢ় বিশেষত্ব আমাদের কাছে ফুটে ওঠে। প্রচারধর্মিতার জন্য বারংবার নিন্দিত মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনা – যার জন্য মার্কসবাদী সমালোচকদের বৃহদংশই দায়ী – জীবনের রূপ সম্পর্কে একটি শুদ্ধতা অপেক্ষা করেছিল এবং অতিরিক্ত প্রোগ্রাম-পরায়ণতাকে পরিহার করতে চেয়েছিল। প্রকৃতিবাদী লেখকেরাও মার্কসের কাছে এই কারণেই পরিহার্য ছিলেন যে তাঁরা বস্তুবিশ্বকে সুবিধেজনক কয়েকটি অতিনির্দিষ্ট অংশে নিজেদের বক্তব্য হাঁসিল করবার প্রয়োজনে শিখণ্ডিত ক'রে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিল না পটভূমির বৃহৎ অনিশ্চিতিগুণ, ছিল না সত্তার সামগ্রিক বৃত্তান্ত সম্পর্কে অন্বেষণ। সেই কারণে সময়নিষ্ঠ টেইন-এর কার্যকারণসাবলীল ইতিহাস-ব্যাখ্যা (সামন্ততন্ত্রের উত্থান থেকে শুরু ক'রে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত) মার্কসের কাছে মনঃপূত হয় নি, কেননা ইতিহাস এঙ্গেলস কিংবা মার্কসের কাছে জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি[৩], সে হাইনের মতো কবিকেও প্যারডি করতে পারে, আর তার অগ্রগতির

কোনো যন্ত্রানুগ ছন্দ নেই। ইতিহাস নিজেই যেন বিষয়ী, আবার এই ইতিহাস যখন শিল্পের বিষয় হয়ে ওঠে, যখন জগতের জীবনলোক থেকে শিল্পীকে নির্বাচন ক'রে নিতে হয়, শুধুমাত্র অন্ধের মতো সেই মুহূর্তটিকে নির্বাচন ক'রে নিলে মহৎ শিল্প কখনোই জন্ম নিতে পারে না। প্রগতি ও মুহূর্ত সম্পর্কে এই বিষণ্ণ দ্বিধাতুর মার্কসের নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয় এই উচ্চারণে গ্রথিত আছে—

> শিল্পের ক্ষেত্রে এটা তো রীতিমতো জানা কথা যে, সমাজের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গে তার কোনো তাৎক্ষণিক সম্পর্কই নেই। এ যেন কাঠামোর সঙ্গে সামগ্রিক ছন্দের সম্পর্ক। গ্রীকদের প্রসঙ্গে আধুনিকদের, কিংবা শেক্সপিয়রের কথাও ধরা যেতে পারে। এপিকের মতো কোনো-কোনো শিল্পরীতির ক্ষেত্রে তো দেখাই যায়, তাদের আরব্ধ রচনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্লাসিকের ধ্রুপদী রূপটি কখনোই ফুটে উঠতে পারে না; সুতরাং শিল্পের রাজ্যে অনুন্নত পর্যায়েই কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সৃজন সম্ভাবনার পরিচয় মেলে[৫]।

এখানে যে-আত্মস্থতার অনাড়ম্বর উদ্‌ঘাটন আছে তার মূল্য বুঝতে হলে উল্লেখিত ১৮৪৮ এপ্রিলে লামার্তিনকে লেখা মহিলা-শিল্পী জর্জ সাঁদের পত্রাংশ পাঠ করতে হবে—

> কেন মিথ্যে সন্দেহে ভুগছো? ঊর্ধ্ব থেকে উদ্ভাসিত দিব্যশক্তিবলে তুমি তো অনুপ্রাণিত কবি, শিল্পী, তুমি কি জানো না সর্বশক্তিমান অসহায় ও শোষিতদের জন্য কী অপরিমাণ ইন্দ্রজাল সঞ্চিত রেখেছেন?...ঐ প্রোলেটারিয়ানদের আগে গিয়ে তুমি দাঁড়াও, তাদের সন্ত্রাসের মুখপাত্র হও, এখুনি, পরমুহূর্তেই যেন সেই সব ত্রাস ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে।

এ-রকম 'বৈপ্লবিক' আশাবাদ মার্কসের ছিল না। লেখিকা যে শাসকসম্প্রদায় (তাঁর ভাষায় caste) ও হিংসাত্মক বিপ্লবী-চক্রের (sect) লড়াইতে শেষোক্ত গোষ্ঠীর হাতিয়ার হিসেবে শিল্পকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, মার্কসের পক্ষে ও-রকম কোনো কৈশোর অকল্পনীয় ছিল, যদিও তাঁর সাম্যবাদী ইশ্‌তেহারে তিনি নিশ্চয় বিপ্লবের প্রথম সোপান হিসেবে এমন একটি পদ্ধতি চেয়েছিলেন যা গণতন্ত্রের লড়াই জিতবার জন্য প্রোলেটারিয়ানদের শাসকশ্রেণীতে আসীন করবে। কবি বা শিল্পীর কাছে মার্কস নিঃসন্দেহে ইতিহাসচেতনা প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু কখনোই কোনো সমাধান নয়। এবং শিল্পের ইতিহাসও নিজস্ব পুরাণকে নিজের মধ্যে সুন্দরভাবে সংহরণ ক'রে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, গ্রীক কাব্যগুলি তার প্রমাণ। একালে বায়রনের তুলনায় তিনি যে শেলিকে নন্দিত করেছেন তার কারণ, তাঁর কাছে বায়রনের ইতিহাসবিমুখ প্রতিক্রিয়াশীলতা—অথচ এই বায়রনই কিন্তু মার্কসের প্রিয় কবি গ্যোয়েটের কাছে মান্য ছিলেন তিনি যুগমুহূর্তের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন বলে—এবং শেলির আন্তরিক বিপ্লবধর্ম। তাহলে কি যুগের জমিন্ থেকে অন্তত একটা প্রাতিভাসিক ব্যবধান মেনে চলা শিল্পীর অন্যতম দায়িত্ব?

এখানেই মার্কস সংকটাপন্ন বোধ করেছেন। এই সূত্রে হেগেলপন্থী নন্দন-তাত্ত্বিক ফ্রিডরিশ থেয়োডোরে ফিশার (১৮০৭-১৮৮৮) সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করবার মতো। ১৮৫৮ সালে লাসালেকে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠিতে মার্কস ফিশারের 'সৌন্দর্যবোধ তথা সৌন্দর্যশাস্ত্র' (*Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen*) বইয়ের ধারাবাহিক প্রকাশ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। এই নন্দন-বিজ্ঞানী যথার্থ প্রেক্ষিত পাবার জন্য 'কালগত দূরত্বে'র কথা বলেছেন, যেমন পরবর্তী কালে এড্‌ওয়ার্ড বুলাউ বলেছেন 'মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বে'র প্রয়োজনের কথা। ফিশার এর মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক শুদ্ধিও খুঁজেছিলেন। দূর থেকে দেখলে মহাপুরুষের জীবনের প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতাগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, তিনি পূর্ণায়ত গৌরবে প্রকাশমান হতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও হুবহু এই কথা বলেছেন বুদ্ধ প্রসঙ্গে এবং রাবীন্দ্রিক সৌন্দর্যশাস্ত্রে প্রধানত এই অর্থেই 'সমগ্রদৃষ্টি' তথা দূরত্বের মাত্রা প্রযুক্ত হয়েছে[৬]। মার্কস অবশ্যই এই অনুষঙ্গ গ্রহণ করেন নি। তাছাড়া, এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি চিঠিতে (লণ্ডন, ১৮৬৮) তিনি সময়কে নিয়ে আদর্শায়ন বিষয়ে বেশ একটু বিরক্ত —

> মানুষের ইতিহাস মৃত জীবতত্ত্বের মতো চলে যায়। এমন কি নিছক আপন ধারণার গোঁড়ামি বশে অগ্রণী মনস্বীরাও বিধিবদ্ধ অন্ধতার দ্বারা গ্রস্ত হয়েছেন, নাকের ডগায় উপস্থিত বিষয়গুলোকেও দেখতে পান নি। এমন কি যখন সেই মুহূর্ত এসে গেছে, তাঁরা কী সব দেখতে পান ভেবে অবাক হতে হয়। ফরাসি বিপ্লব ও উদ্দীপন-পর্বেও (Enlightenment) তাঁরা সমস্ত-কিছুকে মধ্যযুগীয়, রোমান্টিক ঠাউরে নিয়েছেন ; এমন কি গ্রীমের মতো মানুষেরাও এই মোহ থেকে মুক্ত ছিলেন না।

শেষ লাইনটা পড়ে চমকে উঠতে হয়। য়াকব গ্রীম্‌ তো একটি মানুষ ছিলেন না : তিনি ছিলেন একাধারে সংস্কৃতি-ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, আইনজ্ঞ ও পুরাণবেত্তা, সর্বোপরি তাঁর ভাই ভিল্‌হেল্‌ম গ্রীমের সঙ্গে রূপকথা-রচয়িতা। ধরা যাক 'দুই-ভাই' গল্পে সুদূর সময়ে স্থাপিত শিকারীর সঙ্গে ড্রাগনের লড়াই। পুরো ব্যাপারটা হয়তো বর্তমানের পটে আঁকা যেতে পারতো, কিন্তু তার সাহায্যে সেই আধুনিকতা ফুটে উঠতো না—যা ফুটেছে ঐ সংগ্রামের মধ্যে প্রতীক ব্যবহারে। এখানে তথাকথিত মার্কসীয়-সমালোচকেরা শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা বলতেন। মার্কসের পক্ষে এ-রকম অপব্যাখ্যাও অবাস্তব ছিল। আসলে মার্কস সময় বিষয়ে এক ধরনের শিল্পীসুলভ দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন : অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী সময় সৌন্দর্যকে উপকৃত করে, আবার নিকটকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সুন্দর অবাস্তব হয়ে পড়ে। মার্কস সহজাত-চিরায়ত সৌন্দর্য ও সমকালীন অপূর্ণতার মধ্যে সেতু ছুঁড়ে দিতে পারেন নি— এখানেই তাঁর নন্দনশাস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো ফাটল। অন্তদিক থেকে এটাই কি

আবার যূথ-মানস ও ব্যক্তি-স্বভাবের সম্পর্কসূত্রে মার্কসের সীমাংসাহীনতার নামান্তর ?

২

একাত্ম বেদনা বড় বিড়ম্বনা বিচ্ছিন্ন শহরে।

তাই তো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি দুস্তর বাস্তবে
এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু

— বিষ্ণু দে

Alienation বা বিচ্ছিন্নতাবোধ রুশোর কাছ থেকে হেগেল পেয়েছিলেন, তাঁর কাছ থেকে মার্কস। এরই সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ফয়েরবাখের সেই রোমান্টিকতা যা মানুষের সত্তাকে একমাত্র আরাধ্য বলে জেনেছিল। জর্জ লিশট্‌হাইম দেখিয়েছেন ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ নিজে থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়, স্বরচিত পূর্ণতার ধারণায় নিজেকে নির্জীব ক'রে তোলে। আসলে আমাদের স্বোপলব্ধির অভাবই তো বিচ্ছিন্নতাবোধ, আর তাই যে-ইতিহাসপ্রক্রিয়া মানবপ্রকৃতির সমস্ত অন্তর্লীন সম্ভাবনাকে উন্মোচিত করে তাই দূর করে ঐ নঙর্থক বোধকে। ফলে নিজেকে একজায়গায় নির্জিত ক'রে বৃহত্তর সত্তাকে ফলিত করতে পারলে ঐ বোধ কেটে যায়। গর্কি যাকে destruction of personality বা অস্মিতা-বিলোপ বলেছেন তা একান্ত মার্কসীয়, নিজেকে বৃহৎ একটি আধারে সঞ্জীব ক'রে রাখবার অভীপ্সায় প্রাণময়। প্রচলিত ভারতীয় মার্কসীয় সমালোচকেরা প্রায়ই একটা মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন 'ব্যক্তি' ব্যাপারটাই একটি অন্তস্তিকর অলীক ধারণা, যেন তাকে যে করেই হোক না কেন অ্যাবস্ট্রাক্ট যূথচারিতায় পর্যবসিত হতে দিলে ভালো। এখানে মনে রাখা ভালো 'কাপিটালে'র ভূমিকাশেষে দান্তে থেকে তাঁর উদ্ধৃত সেই পংক্তি : 'যা খুশি বলুক লোকে, তোমার আপন পথে চলো।' তাঁর 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া ১৮৪৪' (*Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844*) বইতে এই 'আপন পথ' ও মার্কসীয় মহাযানের মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরি করার উদ্যোগ আছে। তাঁর যুক্তিধারা এই রকম : মনে কর মানুষ হল মানুষ এবং তার সঙ্গে জগতের যোগসূত্রও মানবিক। তাহলেই ভালোবাসলে ভালোবাসা পাবে; বিশ্বাস করলে বিশ্বাস। যদি শিল্প সম্ভোগ করতে চাও, শিল্প-শীলিত হতে হবে ; যদি অন্য মানুষের উপর প্রভাব ছড়াতে চাও, তাদের সঙ্গে উদ্দীপিত আচরণ করতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে অপরাপর মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে বিশেষ একটি প্রকাশ, তোমাদের যথার্থ কামাবস্তু, তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে একটি সংগতি রেখে।

এঙ্গেলস এখানেই একটু বৈচিত্র্য এনেছেন। এই তত্ত্বটিকে তিনি উপন্যাসের মূল সূত্র বলে জেনেছেন: 'ঔপন্যাসিক যথার্থ সমাজসম্পর্ক চিত্রিত করবার প্রয়োজনে ঐ সব সম্পর্কের প্রথানুগত দিকটি ভেঙে বুর্জোয়া আশাবাদ চুরমার ক'রে দেবেন, তার নিত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবেন, এবং এ-কাজটা তিনি কোনো সমাধান না দিয়ে, এমন কি বিশেষ কোনো পক্ষ না নিয়েই ঘটাতে পারেন[৭]।'

এখানে শ্রতব্য, প্রতিটি বস্তু ও ব্যক্তির অভিব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে আস্থাশীল মার্কসের হেগেল-বিরোধিতা। ব্যক্তিতাহীন যূথধর্ম ও হেগেলের 'পরম ভাবনা' সমান বর্জনীয়। মার্কসের এই উপমা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

> ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমর্থিত আমার সুসীম বোধ আপেল, স্যাসপাতি আর বাদামের মধ্যে পার্থক্য ধরতে ঠিকই পারে; কিন্তু আমার জল্পনামূলক বুদ্ধি সংবেদনগত ঐ পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে নিশ্চেতন। সে দেখতে পায় আপেল আর বাদাম আর স্যাসপাতির মধ্যে একাকার সেই এক, যার নাম 'ফল'। প্রতিটি ফল তার কাছে প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্য মাত্র, যার 'শাঁস' হল 'ফল'।...যে খনিতত্ত্ব-বিশারদের কাছে সব খনিজ পদার্থই নিছক খনিজ পদার্থ তাকে কি খনি-তত্ত্ববিশারদ বলা চলে[৮]।

রসবোধের সঙ্গে পাংশু তত্ত্ববুদ্ধির তুলনা রবীন্দ্রনাথও করেছেন অনেকটা এই ধরনের উপমা ব্যবহার ক'রে। শেষ পর্বে যেখানে সাহিত্য বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে এ-রকম তুলনার সন্নিবেশ করেছেন সেখানে ঐ সব তুলনা তাঁরই বিরুদ্ধে গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের রচনা রসবোধের পক্ষে এই পার্থক্যপ্রণিধান যে কত জরুরি সেটা এভাবে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—

> তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত্ব ভালো, তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ ও জলীয় আঁশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই লোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল...কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব, যাহার প্রকৃতি, যাহার সমগ্র সমষ্টি আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়...অনেক সময় ভিতর দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরির প্রত্যাশায় বসিয়া আছি[৮]।

প্রতীয়মান এই সাদৃশ্যের আড়ালে মার্কস ও রবীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তার একটি পার্থক্য স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকে। দু-জনেই ব্যক্তির সামাজিকতায় বিশ্বাসী, কিন্তু মার্কসের কাছে ব্যক্তির সমাজসংগতি ঠিক কী অর্থে অত্যুজ্জ্বল? তিনি এই মর্মে যে-উক্তি করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তা হয়তো রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশি বৈপ্লবিক[১০]—

পঞ্চেন্দ্রিয়ের গঠনকালের পিছনে অনাদিকাল থেকে শুরু ক'রে এ-পর্যন্ত জগতের ইতিহাস নিহিত রয়ে গেছে। স্থূল জৈব প্রয়োজন দ্বারা বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ। ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে খাদ্যের তো কোনো রূপই নেই, আছে শুধু তার অবচ্ছিন্ন সারবস্তু। স্থূলতম চেহারা নিয়ে তা হয়তো হাতের কাছে লভ্য হতে পারে এবং একথা নির্ধারিতরূপে বলা শক্ত কোথায় বুভুক্ষু মানুষের আহারের সঙ্গে পশুর খাদ্যগ্রহণের তফাৎ রয়েছে। ক্লিষ্টকাতর দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষের পক্ষে সূক্ষ্মতম নাট্য-আস্বাদন সম্ভব নয়; ধাতুব্যবসায়ী শুধু বাজারদর বোঝে, জানে না ধাতুর মৌলতা, সৌন্দর্য। তার কোনো খনিজ বোধভাগ্যি নেই। তাই তো থিয়োরিগত ও বস্তুগত অর্থে মানুষের অনাত্মীকরণ(objectivization) প্রয়োজন, প্রয়োজন সেই মাধ্যমের যা মানব-ইন্দ্রিয়কে মনুষ্যজীবন ও প্রকৃতির ঐশ্বর্যের সমানুপাতে মানবিক ক'রে তোলে[১১]।

তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ—

অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে; কিন্তু সৌন্দর্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্বর ছিল তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মতো, রাক্ষসের মতো, যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না; অতএব আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে[১২]।

এবং প্রসঙ্গত মার্কস—

'পশুরা নিজেদের সন্ততিকুলের অব্যবহিত প্রয়োজনবোধ মেটাতে কিছু তৈরি করে, তারা একদিক-ঘেঁষা জিনিস তৈরি করে; মানুষ করে নিখিল অর্থে; তারা শুধু অব্যবহিত প্রয়োজনের বশ্যতা মেনে তৈরি করে, যেখানে মানুষ জৈব প্রয়োজন নিরপেক্ষ হয়ে সৃষ্টি করে, এবং তখনই যথার্থ সৃষ্টি করে যখন সে ঐ প্রয়োজনসমূহ থেকে মুক্ত[১৩]।

রবীন্দ্রনাথ—

প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি[১৪]।

অথবা

'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান / তার বেশি করে না সে দান / আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান / আমি গাই গান।' ঐ সর্বশেষ উক্তি থেকেই প্রভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের সৃজনী 'আমি' সামাজিক নয়, এমন

কি তার সৃষ্টিপথে শেষপর্যন্ত সমাজ / জীবন / প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত না থেকে সমাজ / জীবন / প্রকৃতিকে উচ্ছলভাবে বদান্যতা করতে পারে; তাদের কাছ থেকে কিছু না নিয়ে। পক্ষান্তরে মার্কসীয় মানুষ জৈব প্রয়োজন থেকে মুক্ত হলেও জৈবনিক ও বৈশ্বিক সংগ্রহশালার কাছে অধমর্ণ। তেমনি দু-জনের শিল্প-জিজ্ঞাসায় সাধারণীকরণের ধারণাও আলাদা। দু-জনেই সাধারণভাবে ভোগীকরণে আস্থাবান, যদিও রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা অন্য ধরনের স্বয়ম্পূর্ণতা দাবি ক'রে বসে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত ও সর্বশেষ সিদ্ধান্ত —

> বর্ট্রণ্ড রাসেল তাঁর কোনো রচনায় বলেছেন, বেঠোফেনের সিম্ফনিসমূহ বিশ্বমনের (Universal Mind) সৃষ্টি ব'লে গৃহীত হতে পারে না, কেন না তারা তাঁর ব্যক্তিগত। রাসেল বলতে চান যে সিম্ফনি তো গাণিতিক সত্যের মতো নয় যা সকল চিত্তবৃত্তির কাছে বস্তুপ্রতিম এবং যার সৃষ্টির পিছনে ব্যক্তিমানস বড়ো জোর একটি উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু, যদি এটা মেনে নিতে হয় যে সকলেরই উচিত বেঠোফেনের সৃষ্টির আস্বাদন, আর যদি গ্রাহকচিত্তে কোনো নিহিত ত্রুটি থেকে না থাকে, তাহলে যথার্থ শিক্ষণ-কর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞতা ও অনভ্যাস তিরস্কৃত হবে। এবং তাহলে এটাও মেনে নিতে হবে যে শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টার সৃষ্টির পূর্ণ পরিগ্রহণ মানুষের মনেই (mind of Man) সম্ভব, এবং শ্রোতা হিসেবে অসম্পূর্ণ কিছু বিক্ষিপ্ত মানুষের (some particular men) মধ্যে সেটা ব্যাহত[১৫]।

একই সময়ে বর্ট্রণ্ড রাসেলের মনে হয়েছে এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের পত্র 'কান্নার একটি তালিকা' (*Freedom and Organisation 1814-1914* / London, 1934)[১৬]। দুঃখবোধ তথা সংবেদনশীলতার সমৃদ্ধ মার্কস — এই অগভীর বিদ্রূপ সত্ত্বেও — শিল্পবিচারে তাঁর সংবেদনের অন্তঃসাক্ষ্য ছড়িয়ে গিয়েছেন, যদিও তাঁর অন্তিম অভিজ্ঞান যতদূর সম্ভব সামাজিকতার এবং সামাজিক মানুষের সমর্থনে —

> গান যে-রকম মানুষের শুধু সাংগীতিক বোধই জাগায়, এবং বেসুরো কানের কাছে যেমন সূক্ষ্মতম সংগীতের আবেদনের অভাব গ্রাহ্য বিষয় নয় (কারণ আমার গ্রাহ্য বিষয় তো আমার অন্তর্লীন সামর্থ্যেরই স্বীকৃতি, আর এ-বিষয়ে আমার অধিকার ততখানিই আমার অন্তর্লীন ক্ষমতা যতখানি) এবং যেহেতু আমার মধ্যে গ্রাহ্য বিষয়বোধ ততদূরই এগোয় যতদূর আমার ইন্দ্রিয়চেতনা যেতে পারে (গ্রাহ্য বিষয় তার আনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়ের কাছেই অর্থময়), ঠিক তেমনি সামাজিক মানুষের বোধ অসামাজিক মানুষের বোধ থেকে আলাদা হয়ে যায়[১৭]।

এই জটিল বিশ্লেষণের পর যদিচ মার্কস ইন্দ্রিয়কে মার্জিত ক'রে নিতে বলেছেন, তাঁর কাছে গ্রাহ্যগ্রাহকসম্পর্কই চূড়ান্ত সত্য। তাছাড়া এটাও লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ অ-রসিককে particular বলেছেন, 'অ-সামাজিক' বলেন নি। ফলত রবীন্দ্রনাথের

Man বিশ্বব্যাপী, মার্কসের 'man' বিশ্ববীক্ষায় উৎসুক, অথবা, বলা যায়, বিশ্ব-ইতিহাসপ্রবাহের মধ্যে সচেতনতা সত্ত্বেও বহুলাংশে ওতপ্রোত। আর শেষোক্ত মানুষ যদিও রিয়ালিটির রূপান্তরে ব্রতী, তার নিজের রূপান্তরও সেক্ষেত্রে নিয়তির মতো সত্য। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, হেগেলের মতোই আইডিয়াকে জগতের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন, এবং তাঁর অঙ্কিত মানুষ রচনা-পাঠক গ্রাহ্যগ্রাহক সম্পর্ক ছাপিয়ে হিরণ্ময় হংসের মতো রচয়িতার আপন গরিমায় দেদীপ্যমান। 'আমার আশঙ্কা হয়, এক সময়ে গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে' – রবীন্দ্রনাথের এই দুরুদুরু বাক্যে রাবীন্দ্রিক অহংয়ের অভিমান এবং তথাকথিত মার্কসীয় সমালোচনার মূঢ়াদোষ গোষ্ঠীগ্রাহকের প্রবল পরাক্রম দুইই বেজে ওঠে।

জীবনানন্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে[১৮] (জুন ১৯৪৬, বরিশাল) তৃতীয় কবিতায় 'প্রগতিপথে' কয়েকটি নক্ষত্রের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে দুটি পংক্তি : 'অনেক জেগে বেবিলনে নিনেভে রোমে কলকাতাতে প্রায় / নিভেছে জেনে রবি লেনিন মার্কস অবিরল অকুণ্ঠিত আলো' (শেষ লাইনটি বর্জিত এবং 'মার্কস' নামের কিনারে বিকল্পনাম লেখা আছে 'গান্ধী' ; আগের লাইনে 'কলকাতাতে'র কিনারে লেখা 'ন্যু ইয়র্কে')। কবিতাটিতে, যেমন জীবনানন্দের অন্তিম পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে, তাঁরই ভাষায়, 'ইতিহাসযান' বর্ণিত হয়েছে। ভাবুক মার্কস যথার্থই ইতিহাসযান তথা ঐতিহ্যের শিল্পী যিনি গ্রীক চিদানন্দের ধারারক্ষী ; যাঁর নামের সঙ্গে তাঁরই মনোনীত ঈস্কাইলাস্, গ্যোয়েটে, দিদেরো-র পাশাপাশি যেন লুথার থেকে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর নাম মানিয়ে যায় ; জেগে থাকে তাঁর নির্বাচিত নায়ক স্পার্টাকাস, কেপ্‌লারের সঙ্গে-সঙ্গে গ্যোয়েটে লেলি ও গর্কির আঁকা প্রোমেথেউসের নাম, মার্কস যাকে 'দার্শনিক সমগ্রপঞ্জিতে অগ্রণীতম শহীদ্ সন্ত' বলে বর্ণনা করেছিলেন। আর সম্ভবত ঐ অগ্নিহোত্র প্রোমেথেউসের প্রতীকেই তাঁর জীবনের অন্তিম তুলনা পাওয়া যায়, কেননা, মানুষের নিঃশর্ত মুক্তিই তাঁর আরাধ্য ছিল। সম্ভবত তাঁর চোখে আর কিছুই মুক্তির মতো সুন্দর ছিল না, এবং সেই সৌন্দর্যের তপস্যায় শিল্প তাঁর কাছে জরুরি অথচ আপেক্ষিক মূল্যবোধ হিসেবেই ধরা দিয়েছিল। সুন্দরের কেন্দ্রকে ধ্যানের দ্বারা বিদ্ধ করবার মতো সময় তিনি পান নি, কিন্তু তা বলে প্রয়োজনের কাঠগড়ায় সৌন্দর্যকে তিনি বাধিত করবার কথা একবারও ভাবেন নি। আজ যখন লুকাচ্ প্রমুখ নন্দনতাত্ত্বিকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরেও মার্কসীয় সমালোচনা, বিশেষত বাংলা দেশে, প্রগতির নামে একটি কূপমাণ্ডুক্যের অতিসন্ধিচর্চায় অবসিত হয়েছে, তখন একবার অন্তত মুমুক্ষু মার্কসের প্রাথমিক ও মানবিক অভিপ্রায়ের সেই ব্যাপ্তির কথা মনে রাখা

ভালো যিনি সুন্দরের প্রয়োজনকেই ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন, প্রয়োজনের সুন্দরকে নয়।

নির্দেশিকা

১. কথাশিল্পী মার্গারেট হার্কনেসকে লণ্ডন থেকে লেখা চিঠি, ১৮৮৮।

২. প্রসঙ্গত এমিল জোলার 'জার্মিনাল' উপন্যাসে 'তোমার বন্ধু কার্ল মার্কস তো সব কিছুই স্বাভাবিক বিবর্তনের উপর ছেড়ে দিতে চান। না রাজনীতি, না ষড়যন্ত্র – এই তো ব্যাপারখানা? প্রকাশ্য দিনের আলোয় সমস্তটা ঘটবে আর এরি মধ্যে উদ্দেশ্য হল বেতনবৃদ্ধি। আমাকে ও-রকম বিবর্তনের কথা বোলো না হে' – কোনো চরিত্রের এই মন্তব্য আসলে জোলার মার্কস-বিমুখতা সূচিত করছে কিনা কে জানে।

৩. *Das Kapital*, vol. III।

৪. মাঞ্চেস্টার থেকে মার্কসকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠি ১৮৭০।

৫. *Grundrisse*, p. 30 ; *Zur Kritik*···p. 268. George Lichtheim তাঁর *Marxism : an Historical and Critical Study* (সু ইয়র্ক, ১৯৬১) নামক বইতে (পৃ ১৬২, ১৬২-৬৩) এ-সম্পর্কে নতুন আলো ফেলেছেন।

৬. 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের পথে।

৭. বুনুয়েল তাঁর ফিল্মের নন্দনসূত্র হিসেবে এই তত্ত্বটিকে ব্যবহার করেছেন। Ado Kyrou, *Luis Bunüel*. tr. Adrienne Foulke, p. 112।

৮. 'পবিত্র পরিবার' (*Gesamtausgabe* থেকে) মেখানভ্ বিস্তৃতভাবে তাঁর *The Development of the Monist View of History* বইতে (পৃ ১৩৭-৩৯) উদ্ধৃত করেছেন।

৯. 'মনুষ্য', পঞ্চভূত। অধোরেখ অংশ বর্তমান প্রবন্ধিকের। শিল্প বা মনুষ্যত্ব নিয়ে আপাত-মন্থর তত্ত্বালোচনার যেন অবকাশ নেই, এটাই কি রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য নয়?

১০. পিকিং-এ পণ্ডিতদের আয়োজিত ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথ নিজের গান প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'This too is the work of a revolutionist'। এই অর্থে ই বৈপ্লবিক শব্দটা এখানে ব্যবহৃত হল।

১১. অর্থ নৈতিক ও দার্শনিক খসড়া ১৮৪৪।

১২. 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য।

১৩. পূর্বোক্ত সূত্র।

১৪. ঐ, রবীন্দ্রনাথ।

১৫. *Man*। অন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৩৪-এ রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত ভাষণ, পৃ ৩২-৩৩। তুলনীয় ইতিপূর্বেই অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'সেই বেজান্ শহরের কথা মনে হয় ; উপবনে সেখানে পাখি গাইলো ফুল ফুটলো মুকুল খুললো ফল ধরলো পাতা ঝরলো, সবই সুন্দরভাবে হয়ে চললো দিনে রাতে, কিন্তু শহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলে না, পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে ব'সে রইলো, শুধু দু চারজন পথিক দুটো-একটা হতভাগা ভিখারী নয় পাগল তারাই কেবল থেকে থেকে এলো গেলো সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি-ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ করে বসে আছে মূক বধির অন্ধ বধির নিশ্চল মানুষের দল খোলা চোখ মেলে' ['সুন্দর', বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী]।

১৬. Hiren Mukherjee – *Remembering Marx*, New Delhi, 1967, p. 23।

১৭. অর্থ নৈতিক ও দার্শনিক খসড়া।

১৮. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ-আয়োজিত 'আধুনিক কবিতা ও কবিকথা' শীর্ষক প্রদর্শনীতে (২৩-২৭ এপ্রিল ১৯৬৮) অশোকানন্দ দাসের সৌজন্যে প্রদর্শিত জীবনানন্দ-পাণ্ডুলিপি।

কার্ল মার্কসের কবিতা

সমর সেন -অনূদিত

১

Da ward ich tief gebunden
Da ward mein Auge klar,
Da hatte ich gefunden,
Das dunkles Streben war.

Was nicht mein Geist erflogen,
Geteiben vom Geschick,
Das kam ins Herz gezogen
Von selbst mit deinem Blick.

অন্তরে দুর্বহ বোঝা
অন্তর্দৃষ্টি কিন্তু স্বচ্ছ হল
অস্পষ্ট আমার বাসনা
অবশেষে মূর্ত হল তোমাতে।

জীবনের বন্ধুর কণ্টকিত পথে
যা পারি নি আনতে হাতের মুঠোয়
তা এল অযাচিত আমার কাছে
তোমার মদির দৃষ্টিতে।

২

Doch wie sollen Worte richtig zwängen
Selber Nebelrauch und Schall,
Was unendlich ist, wie Geistesdrängen,
Wie du selber und das All ?

মনের উত্তমের মতো মহান শক্তিকে,
পৃথিবীর মতো যা অনন্ত
তাকে কী ক'রে রূপ দেবে শুধু শব্দ,
ধোঁয়ার মতো বঙ্কিম রেখায় ভেসে-চলা এই শব্দ ?

৩

Nimmer Kann ich ruhig treiben,
Was die Seele stark erfasst,
Nimmer still behaglich bleiben,
Und ich stürme ohne Rast.

Alles möcht' ich mir erringen,
Jede schönste Göttergunst,
Und im Wissen wagend dringen
Und erfassen Sang und Kunst.

হৃদয়কে যা জাপ্‌টে ধরে কঠিন শক্তিতে
ধীরে সুস্থে তার মোকাবিলা পারব না কখনো,
অস্থির অশেষ যাত্রায়
এগিয়ে যেতে হবে দ্বন্দ্বে পথ ক'রে।

যা কিছু অনবদ্য, যা কিছু সুন্দর
আমার জীবনে আনব
ভেদ করব বিজ্ঞানের জগত
শিল্প ও সংগীতের রসে হব মুখর।

৪

Darum lasst uns Alles wagen
Nimmer rasten, nimmer ruhn,
Nur nicht dumpf so gar nichts sagen,
Und so gar nichts woll'n und thun.

Nur nicht brütend hingegangen
Aengstlich in dem niedern Joch,
Denn das Sehnen und Verlangen
Und die That, sie blieb uns doch.

সাধ্য সীমার পরোয়া না ক'রে চল,
সংঘাত থেকে হটা কখনো নয়
ইচ্ছাশক্তিবর্জিত স্থবিরের মতো
বেঁচে থাকা কখনো নয়।

যন্ত্রণা আর খাটুনির জোয়ালে
শান্তভাবে কাঁধ গলানো ? ধিক !
যা হবার হোক, আমাদের আছে
আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম ও প্রয়াস।

উপরোক্ত কবিতাগুলি পাওয়া গেছে *Karl Marx : His Life and Work*, John Spargo (New York, 1909) গ্রন্থটির মধ্যে (দ্র. পৃ ৪২-৪৩)। ইংরাজি অনুবাদের সহায়তায় এগুলি অনূদিত হয়েছে।

—

[ভারতবর্ষে তেমন পরিচিত না হলেও ১৯২০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইয়োরোপ জানত মার্কস কবিতা লিখেছেন এবং সেই কবিতার সংখ্যা দুটি। বার্লিনে *Athenaum* পত্রিকায় (জানুয়ারি ২৩, ১৮৪১) কবিতা দুটি – Der Spielmann (The Minstrel) ও Nachtliebe (Night Love) – প্রকাশিত হয়েছিল। এবং মার্কসের জীবিতকালে সেই প্রথম ও সেই শেষ কবিতাপ্রকাশ। ১৮৪১-এ কবিতা দুটি যখন প্রকাশিত হয় তখন মার্কসের বয়স ২৩ এবং কবিতা লেখা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।

মার্কসের প্রায় সব জীবনীকারই তাঁর তরুণ বয়সের সাহিত্যরুচি ও কাব্য-রচনার বিশেষ উল্লেখ করেছেন। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস, নাটক ও ব্যালাড্ রচনার কথাও পাওয়া যায়। মার্কসের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার ফ্রান্‌ৎস মেহ্‌রিং এ-সব নিয়ে কোনো উচ্ছ্বাস করেন নি। আর তা করার কথাও নয়। কারণ এ-সব কবিতার সাহিত্যমূল্য সামান্যই, কিছুটা জীবনীগত তাৎপর্যই লক্ষ করা যেতে পারে। ১৮৪৪-এ রচিত বিখ্যাত 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের (১৯৩২, ইংরাজি অনুবাদ ১৯৫৯) সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মার্কস-তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি তরুণ মার্কসের রচনাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে – শুধু অর্থনৈতিক, দার্শনিক বা রাজনৈতিক রচনার প্রতিই নয় – তাঁর যাবতীয় তরুণ রচনার প্রতি। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যচর্চাও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

মার্কস যে সারাজীবন কাব্যপ্রেমিক, সাহিত্যরসিক ছিলেন, তাঁর আশ্চর্য স্মৃতি-শক্তিতে স্মরণ রাখতে পেরেছিলেন বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকে, আপন পরিণত রচনাবলির অনন্য রচনাগুণ ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথেচ্ছ সাহিত্যগত উদাহরণপ্রয়োগের আত্মবিশ্বাসে, দান্তে-শেক্‌সপিয়র-গ্যেটে থেকে নিরবচ্ছিন্ন উচ্চারণের ক্ষমতায় তার প্রমাণ স্পষ্ট। এই মানসিক গঠনের নেপথ্যে আছে বালক বয়সের কবিতাপ্রেম, লুডভিক্ ফন ভেস্টফলেনের সাহচর্য, পিতা হাইনরিখের উৎসাহ ও প্রেয়সী জেনি-র প্রেরণা।

তাঁর এ-সময়ের যাবতীয় কবিতা দু-খানি খাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে সংকলিত ক'রে তিনি জেনি-কে উপহার দিয়েছিলেন (গ্রীষ্মাবকাশ, ১৮৩৬)। সমস্ত জীবন জেনি সেগুলি রক্ষা করেছিলেন সযত্নে এবং কাউকে দেখতে দেন নি (দ্র. পল লাফার্গের স্মৃতিকথা)। এই কবিতাগুলি যখন জেনি-কে কার্ল উপহার দেন তখন তিনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (১৮৩৫-৩৬) – অর্থাৎ তাঁর বয়স ১৭/১৮। বন্-এ একটি নিয়মিত কবিতাপাঠের আসরে (Poet's Club) তিনি এ-সময়ে ছিলেন একজন উৎসাহী সদস্য। পিতা হাইনরিখ একাধিক চিঠিতে এ-ব্যাপারে মার্কসকে উৎসাহিতই ক'রে গেছেন। কিন্তু কার্ল যখন কবিতাগুলি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেন পিতা তাঁকে আরো অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন – একটি চিঠিতে লেখেন : 'প্রত্যেক কবি বা লেখককে এ-যুগে বিবেচনা করতে হবে যে তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য রচনাশক্তির অধিকারী হয়েছেন কিনা···আমি স্পষ্টই তোমায় বলতে চাই যে তোমার

প্রতিভায় আমি আনন্দিত···কিন্তু একজন সাধারণ গৌণ কবির ভূমিকায় জনসমক্ষে তুমি অবতীর্ণ হবে, এ-ব্যাপারটা আমার কাছে খুব যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দেখা দেবে। কেবল একজন সত্যিকার উল্লেখযোগ্য কবিরই অধিকার আছে বর্তমান কঠিন পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার।'

কিন্তু কবিতার মায়া সহজে কাটে নি। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রেকর্ডে'ও দেখা যায় আইনপাঠের চেয়ে নন্দনতাত্ত্বিক সমস্যায় তিনি অধিক চিন্তিত – ক্লাসিকাল সাহিত্য, গ্রীক শিল্প ও পুরাণ সম্পর্কে অধিক উৎসাহী – এবং নিয়মিত হেগেলের কাছে অধ্যয়নরত। হাইনরিখ চিন্তিত হয়ে উঠলেন ও কার্লকে বন্ থেকে বার্লিন যাওয়ার নির্দেশ পাঠালেন। বার্লিনে এসে তাঁর বিষণ্ণ ও অধৈর্য হৃদয় থেকে আর-এক গুচ্ছ কবিতার জন্ম হল। শুধু কবিতাই নয়, এই তরুণ ছাত্রটি অতঃপর একটি উপন্যাস ও একটি ট্রাজেডি রচনায় নিজের সাহিত্যিক সম্ভাবনার পরীক্ষায় নামলেন। বার্লিন থেকে পিতাকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে (১০ নভেম্বর ১৮৩৭) মার্কস তাঁর এ-সময়ের মনোভাব প্রকাশ করেছেন : 'জীবনে এমন এক-একটা সময় আসে যা একটি পর্যায়ের সমাপ্তি ঘোষণা ও নতুন একটি পথের নিশ্চিত নির্দেশক সীমান্ত-প্রাচীরের মতো অবস্থান করতে থাকে। এ-রকম সন্ধিকালে আমরা আমাদের ভাবনার ঈগলচক্ষুতে আমাদের অতীত ও বর্তমানকে পর্যালোচনা করি এবং আমাদের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি।···এইসব সময়েই মানুষ 'লিরিক্যাল' হয়ে ওঠে, কারণ প্রত্যেকটা রূপান্তরই কিছুটা যেন বিদায়ী সংগীত (swansong), কিছুটা নতুন বিরাট এক কাব্যের মুখবন্ধ (overture) ···বার্লিনের পথে যখন চলেছি···আমার সমস্ত হৃদয়মন গাঢ় বেদনায় আচ্ছন্ন, যে-সব পাহাড় চোখে পড়ল তার পাথরও বেশি কঠিন মনে হল না আমার অনুভূতির চেয়ে, বড় বড় সব শহরকে আদৌ প্রাণময় মনে হল না আমার রক্তের চেয়ে, সরাইখানার কলগুঞ্জনমুখরিত টেবিলগুলো বেশি ভারাক্রান্ত মনে হল না আমার নিজের কল্পনার চেয়ে এবং সব থেকে বলার কথা : কোনো শিল্পকর্মই আমার জেনি-র চেয়ে বেশি সুন্দর মনে হয় না। যখন বার্লিন পৌঁছালাম কারো সঙ্গে সম্পর্ক রাখলাম না, নিজেকে জ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে চেষ্টা করলাম। আমার এ-সময়ের মনোভাব থেকে একমাত্র গীতিকবিতাকেই আকর্ষণীয় মনে হয়।···আরো দূরবর্তী আমার ভালবাসাই হয়ে উঠল আমার স্বর্গ, আমার শিল্প। প্রতিটি বাস্তব হয়ে উঠল অস্পষ্ট ও সব অস্পষ্টতা তার সীমানা হারিয়ে বসল।···' (Otto Rühle-র মার্কস-জীবনী থেকে উদ্ধৃত)।

মার্কসের ছাত্রজীবন নানা মানসিক দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে এ-সময়ে পার হচ্ছিল। এ-অবস্থায় রচিত সাহিত্য তাই কোনো পরিপূর্ণতা লাভে বঞ্চিত। তাঁর মনোভাবের কিছুটা প্রকাশ ঘটল ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ 'এপিগ্রাম' রচনায় – অনেকটা গ্যেটে ও শিলারের *Xenien* (১৭৯৭)-এর ঐতিহ্যে – বিশেষত, হেগেলের বিরুদ্ধে রচিত 'এপিগ্রামে'।

মার্কস যে-সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন তাতে সেকালের 'আধুনিকতা'র ছাপ ছিল না, বরং তাঁর পূর্বসূরি কবিদের ভাবধারাই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল – সম্ভবত ক্লাসিকাল কাব্যপ্রীতিই তার কারণ। তাঁর কবিতায় গোটে, শিলার, বার্জার ও হোল্‌টি প্রমুখ কবিদের প্রভাবই বেশি। সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র হাইনে (১৭৯৭-১৮৫৬) ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি ও ব্যক্তিগত জীবনে বিশেষ বন্ধু। কবিতা থেকে মার্কস যখন বিদায় নিয়েছেন তখনো দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি হাইনে ও ফ্রেলিগ্রাথ্‌কে কবিতাবিষয়ে বিচক্ষণ পরামর্শ দিয়েছেন। যাঁরা হাইনের কবিতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত (বিশেষত হাইনের *The Silesian Weavers* এবং *Germany – A Winter's Tale*-এর সঙ্গে) তাঁরাই তার প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন।

১৮৩৭ সালই মার্কসের সাহিত্যচর্চার শেষ বছর। এই বছর একটি উপন্যাস রচনায় (*Skorpion and Felix*) হাত দেন, কিন্তু শেষ করেন না। বহু উপন্যাস-পাঠের (বিশেষত স্টার্ন, জাঁ পল, হিপ্‌পেল ও হোফমান্‌-এর) অভিজ্ঞতাকে একই উপন্যাসে প্রকাশ করতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খল কয়েকটি পরিচ্ছেদ রচনা করতে পেরেছিলেন – এর উপ-নাম দিয়েছিলেন 'A Humourous Novel'।

এরপর একটি ট্রাজেডি (*Oulanem*) রচনায় মন দিলেন একই বছরে। পিতা প্রথমে উৎসাহিত হয়ে পরামর্শ দিলেন প্রাশিয়ান সরকারকে খুশি করার মতো প্রাশিয়ান ইতিহাসকে বিষয় ক'রে নাটকটি রচনা করতে – অন্তত নাটকে দেশপ্রেমমূলক একটি 'ওড্' রাখতে। মার্কস যা লিখতে আরম্ভ করলেন তাতে প্রাশিয়ান রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনোই উৎসাহ প্রকাশ পায় নি। ভবিষ্যৎবংশীয়দের জন্য সে-নাটকের একটি অঙ্কই টিকে আছে। এতে সমসাময়িক 'গথিক থ্রিলার'-এর প্রচলিত পন্থাই তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

ট্রাজেডির পরও মার্কস একটি নাট্যসমালোচনার পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু পিতা অবশেষে জোরালো চিঠি দিলেন : 'আমি ঈশ্বরের কাছে একটাই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করি যে যেমন করেই হোক তুমি এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার সত্যিকার লক্ষ্যের দিকে চালিত হও।' ১৮৩৭-এ মার্কস গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং এর পর থেকেই দর্শনের পথে অগ্রসর হলেন – যে হেগেলকে ব্যঙ্গ করেছিলেন কবিতায়, সেই হেগেলের পথেই। ১৮৩৮-এ পিতা হাইনরিখের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পর্ব চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে গেল।

এতদিন পর্যন্ত মার্কস-তাত্ত্বিকদের ধারণা ছিল তাঁর এ-সব কীর্তি লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ষাটটি কবিতা পাওয়া যায় ১৮৪৪-এ রচিত *Economic and Philosophical Manuscript*-এর সঙ্গে। ১৯২৯ সালে কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়। পিতা হাইনরিখ মার্কসের এক জন্মদিনে ১৮৩৭ সালে মার্কস একটি নোট-বুকে এই লেখাগুলো উপহার হিসেবে পাঠান। নোটবুকে লিখে দিয়েছিলেন : 'Gedichte / meinem / teueren Vater Zu seinem Geburt-stage

1837 / als schwaches Zeichen ewiger Liebe' – 'Poems / for my / dear Father on his Birthday, 1837 / as a poor token of eternal love'।

কিছু কবিতায় মার্কসের তৎকালীন রাজনৈতিক বোধের ছাপ স্পষ্ট। জর্মন বিজ্ঞানবাদ ও হেগেলের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের সঙ্গে লেখেন :

Kant und Fichte gern zum Äther schweifen.
Suchten dort ein fernes Land,
Doch ich such' nur tüchtig zu begreifen
Was ich – auf der Strasse fand.

[কাণ্ট ও ফিক্‌টে চেয়েছেন ঘুরবেন ইথরে / দূরবর্তী কোনো দেশের সন্ধানে / আর আমি চেয়েছি সম্পূর্ণ বুঝতে / আমি যা পেয়েছি রাজপথে]।

তরুণ সম্ভাব্য কবিদের উপর হেগেলীয় বিমূর্তভাবনার ছাপ সম্পর্কে অন্য একটিতে লেখেন :

Verzeiht uns Epigrammendulgen,
Wenn wir fatale Weisen singen
Wir haben uns nach Hegel einstudiert
Auf sein Äesthetik noch nicht abgeführt.

[এপিগ্রামের জীবদের ক্ষমা কর / আমরা যদি অপছন্দের সুর ভাঁজি / আমরা আমাদের শিক্ষিত করেছি হেগেলে / আর তাঁর নন্দনতত্ত্ব থেকে নিজেদের এখনো বিশুদ্ধ করতে পারি নি।]

আর ছুটিতে হেগেলের মুখে বসান :

Hegel : Epigramme

১

Weil ich das Höchste entdeckt und die Tiefe sinnend gefunden,
Bin ich grob, wie ein Gott, hüll' mich in Dunkel, wie er
Lange forscht' ich und trieb auf dem wogenden Meer der Gedanken,
Und da fand ich das Wort, halt' ich am Gefundenen fest.

[যেহেতু আমি চূড়ান্তকে আবিষ্কার করেছি, চিন্তায় পেয়েছি গভীরতাকে / ঈশ্বরের মতোই আমি অ-মার্জিত, আমি তারই মতো লুকাই অন্ধকারে / দীর্ঘকাল আমি খুঁজেছি, আর চিন্তার উত্তাল সমুদ্রে ভেসেছি / এবং যখন আমি শব্দকে পেলাম, যা-পেয়েছি তাকেই আঁকড়ে আছি।]

২

Worte lehr' ich, gemischt in dämonisch verwirrtem Getriebe,
Jeder denke sich dann, was ihm zu denken beliebt.
Wenigstens ist er nimmer geengt durch fesselnde Schranken,
Denn wei aus brausender Flut, stürzend vom ragenden Fels,
Sich der Dichter ersinnt der Gellebten Wort und Gedanken.
Und was er sinnet, erkennt, und was er fühlet, ersinnt,
Kann ein jeder sich saugen der Weisheit labenden Nektar.
Alles sag' ich euch ja, weil ich ein Nichts euch gesagt.

[শব্দ শেখাই আমি দানবীয় বিভ্রমে, / যে যা-খুশি ভেবে নিতে পারে তার মানে। / অন্তত সে আর কখনোই সীমার বন্ধনে হবে না আবদ্ধ, / কারণ যেমন এক প্রসারিত শান্ত হতে নেমে আসে জলধারা ঘোর গরজনে, / কবি তার প্রেমিকার কথা আর ভাব করে রচনা, / দেখে যা সে ভাবে আর ভাবে যা সে অনুভব করে ; / জ্ঞানের সরল সুধা সকলেই ক'রে নিতে পারে পান ; / আসলে বলছি সবই তোমাদের কারণ কিছুই তো বলি নি।]

জনতাকে বিদ্রূপ করেন :

In seinem Sessel, behaglich dumm,
Sitzt schweigend das deutsche publikum.
Braust der Sturm herüber, hinüber ;
Wölkt sich der Himmel düster und trüber,
Zischen die Blitze schlängelud
Das rührt es nicht in seinem Sinn,
Doch wenn sich die Sonne hervorbegegnet
Die Lüfte säuseln, der Sturm sich leget
Dann hebt's sich und macht ein Geschrei
Und schreibt ein Buch : 'der Lärm sei vorbei.'

[তার আরাম কেদারায় তৃপ্ত বোকা / জর্মন জনতা বসে আছে বাক্যহীন / যখন ঝড় দাপাচ্ছে উপরে ও চারপাশে / যখন আকাশ মেঘে ঘন আর অন্ধকার / যখন বিদ্যুত পাকায় আর হিস্‌হিশায় চারপাশে / তখন জনতাকে চেতনায় উত্তেজিত করতে পারে না / কিন্তু যখন সূর্য বেরিয়ে আসে / যখন মৃদুমন্দ কথা বলে হাওয়া আর ঝড় থামে / তখন জনতা ওঠে আর আওয়াজ ছাড়ে / আর একটি গ্রন্থ লেখে : 'বিপদ-সঙ্কেত কেটে গেছে'।]

শিল্পীদের সম্পর্কে লেখেন :

Was geig' ich Mensch ! was brausen Wellen,
Dass donnernd see am Fels zerschellen,
Dan's Auge erblind't, dass Busen springt,
Dass die Seele hinal zur Hölle Klingt !

[আমি কী বাজাচ্ছি, মশায় ! ঢেউ কী গর্জন করে / যখন তারা বজ্রনাদে ভাঙে পাহাড়ে / যখন নয়ন অন্ধ হয়, যখন বক্ষ লাফিয়ে ওঠে / যখন আত্মা গড়িয়ে যায় নরকের দিকে !]

প্রশ্নকর্তা তখন বলে :

Spielmann, Zerreibst dir's Herz nuit Spott,
Die kunst, die lieh dir ein lichter Gott,
Sollst Ziehn, sollst Sprühn auf Klangeswellen,
Zum Sternentanz hinanzuschwellen !

[চারণ, তুমি তোমার হৃদয় গুঁড়াও বিদ্রূপে / এবং জ্বলজ্বলে দেবতা যে শিল্প তোমাকে দিয়েছে / তুমি তাকে বহন করবে এবং শব্দের তরঙ্গে তাকে ঝলমলাবে / যতোক্ষণ না সে ফুলেফুলে উঠবে নক্ষত্রের নৃত্যে।]

কবি ক্রোধে বলছে :

Was, was ! Ich stech' stech' ohne Fehle
Blutschwarz den Säbel in deine Seele
Fort aus dem Haus, fort aus dem Blick
Wills kindlein spielen Im dein Genick ?
Gott kennt si nicht, Gott acht't nicht die kunst,
Die stiess In den kopf aus Höllendunst,
Bis das Hirn Vernarrt, bis das Herz verwandelt,
Die hab' ich lebendig vom Schwarzen erhandelt !
Der schlägt mir den Takt, der kreidet die Zeichen
Muss voller, toller den Todmarsch streichen
Muss spielen dunkel, muss spielen licht
Bis Herz durch Salt' und Bogen bricht.

[ওটা কি ? আমি বিদ্ধ করব লক্ষভ্রষ্ট না হয়ে আমার তরবারি রক্তে কালো তোমার হৃদয়ে / আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও / তুমি কি চাও শিশুরা খেলবে তোমার ঘাড়ের চারপাশে ? / ঈশ্বর শিল্প জানে না, ওদিকে নজর দেন না তিনি / নরকের ধোঁয়া থেকে যে-শিল্প মাথার ভেতর জাগে / যতক্ষণ না মস্তিষ্ককে ঘাঁটানো হয়, যতক্ষণ না হৃদয় রূপান্তরিত হয় / আমি তা সস্তাসদ্বি পেয়েছি এবং বাঁচাচ্ছি কৃষ্ণকায় লোকটি থেকে / যে আমার মুহূর্ত গোণে, যে আমার লেখা লেখে / মৃত্যুর পদযাত্রাকে বাজাবে উচ্চগ্রামে সুতীব্রভাবে / বাজাবে অন্ধকার, বাজাবে আলোক / যতক্ষণ না হৃদয় ভাঙবে ধনুককে ও ছিলায় ।]

এই আলোচনার বহু তথ্য পাওয়া গেছে পিটার ডেমেট্জ-এর গ্রন্থে (Peter Demetz, *Marx, Engels and the Poets*, University of Chicago Press, 1967) ও *Journal of the History of Ideas*, New York, ···এবং এইচ পি আডাম্স-এর গ্রন্থ (H. P. Adams, *Karl Marx : In His Earlier Writings*, London, 1940) থেকে। আলোচনার অভ্যন্তরে কবিতাগুলি অনুবাদ করে দিয়েছেন সুখময় দাশগুপ্ত ।]

— সম্পাদক, এক্ষণ ।

মার্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী

রজনী পাম দত্ত

'Everywhere the bourgeoisie considers the spectre laid for good.' – Marx, *letter to Sorge*, September 27, 1873.

মার্কসবাদের জন্মের দেড়শো বছর নিশ্চয়ই এটা নয় : 'কমিউনিস্ট ইস্তাহারে' পূর্ণ-পরিণত মার্কসবাদের প্রথম ধ্রুপদী সূত্রায়ণের একশো বিশ বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু ৫ মে ১৮১৮-য় মার্কসের জন্ম থেকে দেড়শো বছর, যা আমরা উদ্‌যাপন করতে চলেছি, তাকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যুগরূপে চিহ্নিত করা চলে এবং এই যুগ মার্কসবাদের নিরিখে অনুধাবনযোগ্য। এই যুগেরই মধ্যে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধগুলির উপসংহার থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বের বিবর্তনকাল। মার্কসবাদ এই যুগকে তার নিজস্ব তত্ত্বে প্রথম ব্যাখ্যা করেছিল এবং যতই দিন যাচ্ছে তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে চলেছে।

প্র য়ো গে র প রী ক্ষা

যে-কোনো তত্ত্বকেই বাস্তব রূপায়ণের মাপকাঠিতে বিচার করতে দেড় শতাব্দী বেশ যথেষ্ট সময়। দেড় শতাব্দী –

একালীন সব বিপ্লবের অগ্রদূত ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবের পর – যার মধ্যে ইংল্যাণ্ড ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবের প্রধান নায়ক ও সংগঠক হয়ে উঠল। যে-বিপ্লব ইয়োরোপের নিপীড়িত জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক আশার সংকেতধ্বনি শুনিয়েছিল সেই আমেরিকান বিপ্লবের পর দেড় শতাব্দী – যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার পটভূমিতে অবাধ সঞ্চয়নশীল বহু-লক্ষাধিপতির দৃঢ় দুর্গে পরিণত। ফরাসি বিপ্লবের দেড় শতাব্দী – যে-বিপ্লব সমস্ত মানবতার মর্মে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রেরণা জাগ্রত করেছিল, সেই ফরাসি দেশ এরই মধ্যে কেমনভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগৃহীত

এক উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে নিজের এবং অর্ধেক ইয়োরোপের উপর ন্যাটো-র শৃঙ্খল শক্ত ক'রে জড়িয়ে নিয়েছিল।

ইতিহাসের বিচার

কিন্তু মহাপ্রতিভাদীপ্ত চিন্তাধারার যে-প্রকাশ মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষায় দেখা গেছে – যাকে লেনিন আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর ক'রে দিয়েছেন, ইতিহাসের পথকে যা আলোকিত করেছে এবং যা শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে শ্রেণীহীন সমাজে অগ্রসর ক'রে দেওয়ার পথ বেঁধে দিয়েছে – মার্কসের জন্মের সার্ধ শতাব্দী পর, সমস্ত বিশ্বে তার ব্যাপক বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে তাদের সত্য ও সামর্থ্যের প্রমাণ দেখিয়েছে ও দেখিয়ে চলেছে। একইভাবে সেই শিক্ষা পুঁজিবাদ ও তার পরিণাম, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশ, মার্কসবাদের ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির ক্রমবর্ধমান বিজয়, সমাজতন্ত্রের গঠন, সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের বর্তমান বিকার এবং সমাজবাদী বিপ্লবের অগ্রগতির প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণে নিযুক্ত। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন মুষ্টিমেয় সদস্যের পুরনো কমিউনিস্ট লীগ থেকে আজ পাঁচ কোটি মানুষে গড়ে উঠেছে; এবং সমাজবাদ কেবল সেই সমস্ত দেশেই জয়লাভ করেছে যেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল শ্রমিক-সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে।

খণ্ডনকারীর পণ্ডন

এই ইতিহাসের সমস্ত পথটাই মার্কসবাদের পণ্ডিতমন্য 'খণ্ডন' ও 'অপ্রমাণে' বিস্তীর্ণ এবং প্রত্যেকটি (খণ্ডন ও অপ্রমাণ-চেষ্টা) একদা আলোকোজ্জ্বল প্রচার-কৌশলে উদ্ভাসিত ছিল, কিন্তু আজ তারা আবর্জনার স্তূপে বিলুপ্ত। প্রতি-বিপ্লবের অসংখ্য মহাবীর ধর্মযোদ্ধা – ক্যাভেনাক্ (Cavaignac) থেকে থিয়ের্স (Thiers), বিস্‌মার্ক (Bismarck) থেকে কোলচাক্ (Kolchak) এবং হিটলার থেকে ডালেস্ – বারবার ঘোষণা করেছেন সাম্যবাদের ছায়ামূর্তিটি চিরতরে নির্বাসিত হয়েছে; কিন্তু হায়, কেবল নিজেদেরই পরাজয় ঘটেছে বারবার। বিপ্লবের দুরারোহ পথের প্রতিটি ক্রান্তি বাঁকে ও যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তে কখনোই একদল মহাজ্ঞানী দর্শক ও উচ্চকণ্ঠ পণ্ডিতমন্য বাক্যবাগীশের অভাব হয় নি যারা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের 'মারাত্মক সংকট' ও 'ভাঙনে'র কথা ঘোষণা করেছে। কমিউনের ব্যর্থতার পর তা 'নিঃশেষিত', ১৯১৪-র ইন্টারন্যাশনালের ভাঙনের পর তা 'নিঃশেষিত', Nep (National economic policy)-এর পর তা 'নিঃশেষিত', বিংশ কংগ্রেসের পর তা 'নিঃশেষিত'। আজ, চীনের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে বা পূর্ব-ইয়োরোপের নতুন সমাজবাদী শাসনের বিকাশমান যন্ত্রণায় আবার 'নিঃশেষিত'। এই রকম প্রতিটি ক্রান্তি বাঁকের মুখে যা কঠিন সংকটকালে মার্কসবাদ নতুন জীবনীশক্তি নিয়ে

ও আগের থেকে আরো বেশি শক্তিতে সত্যিকার ইতিহাসের বিশ্বপটভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যেমন ১৯১৭-র দিনগুলির আগেই ক্লারা জেট্‌কিন (Klara Zetkin) ঘোষণা করেছিলেন—যখন শত্রুপক্ষ কমিউনের ব্যর্থতায় ও ১৯০৫-এর পরাজয়ে আত্মতৃপ্তির আচ্ছাদনে নিশ্চিন্ত ছিল, অপরাজিতা ক্লারা তাঁর জলন্ত বিপ্লবী আত্মবিশ্বাসে বিপ্লবের অনির্বাপনীয় সত্তাকে আহ্বান ক'রে এই শত্রুপক্ষকে জবাব দিয়েছিলেন : 'আমি ছিলাম! আমি আছি! আমি থাকবো!' অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস তাঁর আত্মবিশ্বাসের সার্থকতা প্রমাণ করেছে। *Die Weltgeschichte ist das Weltgericht*। বিশ্বের ইতিহাসই বিশ্বের বিচারশালা।

মার্কস ও বিপ্লবের কাল

১৮১৮-য় মার্কস যখন জন্মালেন তখনো নেপোলিয়ন জীবিত—সেণ্ট হেলেনায় বন্দী। ব্রিটিশ মুষ্টিমেয় শাসনতন্ত্র তখনো তাঁকে ফরাসি বিপ্লবের উত্তরসাধনার সাক্ষাৎ বিগ্রহ রূপে ভয় পাচ্ছে; সে-উত্তরসাধনায় সামরিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিকৃতি সত্ত্বেও, ইয়োরোপের প্রাচীন সামন্ত-প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার ভিত্তিকে চূর্ণ করার তাঁর ভূমিকার জন্য। বিজয়ী প্রতিক্রিয়ার শক্তি আপাতত স্বপ্ন দেখতে থাকল যে তারা বিপ্লবের ভয়াবহ অপচ্ছায়াকে শৃঙ্খলিত রাখতে পারবে। বন্ধনের মধ্যে ইয়োরোপকে বশীভূত রাখতে কাস্‌লরিয়া (Castlereagh), মেটার্নিক (Metternick) ও রাশিয়ার জার নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। পবিত্র মিত্রতার (Holy Alliance) ব্যর্থ স্বপ্ন যেন ট্রম্যান ও ডালেসের স্নায়ু-যুদ্ধেরই পূর্বাভাস—একই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি। মার্কসের জন্মের এক বছরের মধ্যে পিটার্লু (Peterloo), অনাগত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন—চার বছরের মধ্যে কাস্‌লারিয়া তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন : সাত বছরের মধ্যে ডিকাব্রিস্ট (Dekabrist) বিদ্রোহ রুশদেশের ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিয়েছিল—বারো বছরের মধ্যে জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বুরব রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করেছিল, অবশ্য প্রথমটায় তার বদলে ব্যাংক-মালিকদের মনোনয়নদাপেক্ষ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৮৪৮-এর মধ্যে ইয়োরোপে বিপ্লবের যুগের উদ্বোধন ঘটে গেছে।

বিপ্লবের পক্ষে যে-লেলের তাৎপর্য

মার্কসের বাল্যকালে ও প্রথম যৌবনে ইয়োরোপে 'পবিত্র মিত্রতা' (Holy Alliance)-র ও তার প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের শীতল তুষার ভেদ ক'রে যে-সমস্ত নতুন জীবন ফুটে বেরোচ্ছিল তার সবটাই ফরাসি বিপ্লবের ও তার পথ-প্রস্তুতকারী পূর্ববর্তী উদ্দীপন (Enlightenment)-পর্বের প্রবক্তাদের থেকে প্রেরণা পেয়েছিল। ঐ বিপ্লব যে-সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে নি সকলেই সেই সমাধান খুঁজছিল। সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনে একই ব্যাপার—ইংল্যাণ্ডে তার পুরোধা শেলি ও

বায়রন ; দর্শনে ফিক্‌টে ও হেগেল ; রাজনীতিতে জ্যাকোবিন্‌দের উত্তরাধিকারীরা ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সূত্রপাতে ও চার্টিজ্‌ম-এ এই নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। হেগেল, যিনি পরিণামে প্রাশিয়ান স্বেচ্ছাতন্ত্রের রক্ষণশীল সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, অথচ যিনি মার্কস-পূর্ব ক্লাসিকাল দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথম সর্বোচ্চশিখরে পৌঁছেছিলেন, তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন ফরাসি বিপ্লব ও তার বিশ্বপুনর্গঠনের যুক্তিবোধ (conception of Reason) থেকে। একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদে তিনি ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> 'অধিকারবোধ (idea of Right) নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, অবিচারের পুরনো ইমারত ভেঙে পড়ল। গৌরবোজ্জ্বল সূর্যোদয় হচ্ছে। সব চিন্তাশীল ব্যক্তি একে স্বাগত জানাল ; সমস্ত পৃথিবী এক আধ্যাত্মিক উদ্দীপনায় রোমাঞ্চিত হল, যেন স্বর্গের কাহিনী মাটির পৃথিবীতে বাস্তবে রূপ পেল।'

মানুষের সব ইতিহাস, হেগেল বললেন, বিদ্রোহ দিয়ে শুরু ; এবং তিনি সব পুরাকল্পের (mythology) ঐতিহ্য থেকে উদাহরণ দিলেন : বাইবেলের কাহিনীতে আদম ও ইভের জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় বিদ্রোহেরই প্রকাশ ও তার জন্য তারা ঈশ্বরের ক্রোধে শাস্তি-প্রাপ্ত ; অথবা গ্রীক পুরাণের প্রমিথিউসের বিদ্রোহ মানুষের জন্য অগ্নি জয় করায় ও তার জন্য অনন্ত নির্যাতন ও পাথরের সঙ্গে শৃঙ্খলিত হয়ে চরম শাস্তি ভোগ করা, তবু যে আত্মসমর্পণ করে না। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ এক শক্তিশালী অস্ত্র, যা দিয়ে তিনি অধিবিদ্যা ও সব অটল মতাদর্শকে ধূলিসাৎ করলেন এবং ভাবনা ও বাস্তবের নিয়মগুলিকে সমভাবে একটা অন্তহীন পরস্পরবিরোধী পদ্ধতি হিসেবে তুলে ধরলেন—যা ক্রমাগতই আপাতস্থির ও চিরস্থায়ী সমস্ত-কিছুকে আত্মসাৎ করছে ও নতুন ক'রে একটি উচ্চ স্তর রচনা ক'রে চলেছে। আর যে-নিয়মগুলো বোঝা যায় ও যে-উপলব্ধি স্বাধীনতার পথ নির্দেশ করে তাকেও হেগেল উদ্ঘাটন করলেন। অবশ্য হেগেলের নিজস্ব দ্বান্দ্বিকতা ভাববাদী রহস্যায়নের কুয়াশায় বিকৃত হয়েছে, যার পরিণামে একটা বীভৎস পদ্ধতি (system) দাঁড়িয়ে গেছে, মার্কস যাকে বলেছেন, 'অলৌকিকতার খোলসে যুক্তিবাদী সার', সেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ছিল গভীরভাবে বিপ্লবাত্মক। হার্জেন (Herzen) ঘোষণা করেছেন, হেগেলের দর্শন হচ্ছে 'বিপ্লবের বীজগণিত।'

ভা ব বা দী দ্বা ন্দ্বি ক তা থে কে ব স্তু বা দী দ্বা ন্দ্বি ক তা

সুতরাং হেগেলের দুটি দিক ছিল—রক্ষণশীল ও বিপ্লবী। হেগেল শিক্ষা দিয়েছেন : যা বাস্তব (real) তাই যুক্তিসহ (rational) ; যা যুক্তিসহ তাই বাস্তব। প্রথমার্ধ ঘোষণা করছে যে আজকের পৃথিবীতে যা-কিছু বর্তমান, সব অবিচার ও অত্যাচারের ভয়ঙ্করতাসহ, তার সব কিছুই যুক্তি দিয়ে অনুধাবন করা যায়, কেমন ক'রে ও কেন এমন হল। বিচ্ছিন্নভাবে এই অংশ রক্ষণশীলতার ভিত্তি হতে পারে।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ ঘোষণা করে যে বর্তমান সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন ক'রে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ধারণা করতে মানুষের বুদ্ধি যতটা সক্ষম তাকে বাস্তবে পূর্ণ ক'রে তোলা সম্ভব, কারণ বিবর্তন এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যখন সেই রকম ধারণাই উপায় বাতলে দেবে যে তার পরিপূরণের উপযুক্ত অবস্থা তৈরি হয়েছে। এটাই হচ্ছে হেগেলের শিক্ষার বিপ্লবী দিক। সুতরাং এতে অবাক হবার কিছু নেই যে হেগেলীয়দের মধ্যে দুটি দল – দক্ষিণ ও বাম। এই বামপন্থী হেগেলীয় বা তরুণ হেগেলীয়দের মধ্যেই মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে গড়ে তুলেছিলেন, দ্রুত তাদের মুখপাত্র হিসেবে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তাদের সীমা ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে চললেন তিনি। তারা হেগেলের সমালোচনা-পদ্ধতিকে ধর্ম, রাষ্ট্র ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনায় প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু তাদের সমালোচনা তত্ত্বগত স্তরেই সীমিত রইল, কেবল প্রচলিত সনাতন ধ্যানধারণার ও ভ্রান্তি সম্পর্কেই মত গঠন করতে থাকল। ফয়েরবাখ্ হেগেলের ভাববাদকে সরিয়ে বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু এটাও অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিকদের নিষ্ক্রিয় (passive) বস্তুবাদের বেশি কিছু নয় – যে-বস্তুবাদে মানুষ কেবল বাস্তব অবস্থার সৃষ্টি এবং পরন্তু বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনে তার সক্রিয় ভূমিকা নেই। একমাত্র মার্কসই তাঁর জীবন্ত বাস্তব বিশ্ব-সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বোধ নিয়ে এবং তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ঐক্যবিধানের প্রয়োজনবোধ নিয়ে – সমস্ত বিচারবিতর্কের আলোড়নের মধ্য থেকে সমস্যার সমাধানের বিস্তার সাধন ক'রে – দ্বান্দ্বিকতার শক্তিশালী সমালোচনা-পদ্ধতির সঙ্গে, আত্মাগত ভাববাদী রহস্যময়তা থেকে মুক্ত বস্তুবাদের দৃঢ় নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তির যোগসাধন করলেন, কিন্তু তা পরবর্তী প্রবক্তাদের নিষ্ক্রিয় যান্ত্রিক চরিত্র থেকে মুক্ত এবং এইভাবে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার – মার্কসবাদের ভিত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে – পৌঁছায়। এইভাবে অস্ত্র তৈরি হল, শুধুমাত্র জগৎকে ব্যাখ্যা করতেই নয়, জগৎকে রূপান্তরিত করতে। সেই রূপান্তর-ক্রিয়া চলছেই সেই থেকে আরো জোরকদমে, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন রূপে। মানবমুক্তির সমগ্র আন্দোলন নিজেদের শক্তিকে সংগঠিত করতে পেরেছে এবং আরো সচেতনভাবে মার্কসবাদের ভিত্তিতে নিজের যাত্রাপথকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

দুই ধরনের ডিনামাইট

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে দুটি ঘটনা ঘটল, যা বিশ্বের সামনে দুটি পথের উদাহরণ। ঐ বছর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল – যে-রকম দীর্ঘ বছরের গবেষণা ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই সুবিশাল গ্রন্থটি রচিত তা জগতে বিরল, সেই বছরগুলি একই সঙ্গে তীব্র কর্মপ্রবাহে – যথা, প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে – ভরা। ক্যাপিটাল কেবল প্রথম পুঁজিবাদী সমাজের গতিপ্রকৃতিকেই উদ্ঘাটন করে নি,

বুর্জোয়া ধনবিজ্ঞানীদের তথাকথিত চিরন্তন 'অর্থনৈতিক নিয়মাবলি'র একঘেয়ে যুক্তির জায়গায় সূচনা ও উপসংহার-সমন্বিত এক ঐতিহাসিক স্তর (phase)-রূপে তার চরিত্রকে দেখিয়ে দিয়েছে। তা শুধু পূর্ববর্তী সমাজবাদীদের নীতিবাগীশ উপদেশাবলির জায়গায় তার শোষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকেই তুলে ধরে নি ; তার দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রেণীসংগ্রামের পথনির্দেশ করেছে ভবিষ্যতের সমাজবাদী সমাজে তার ফলশ্রুতিতে। এই গ্রন্থ তার সম্পূর্ণ গঠন ও উপস্থাপনায় বস্তুবাদী দ্বান্দিকতার গোটা পদ্ধতিও দেখিয়ে দিয়েছে, যে-কোনো পাঠ্য কেতাবের চেয়ে অনেক সাফল্যের সঙ্গে, আর ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য বিষয়ে সমস্ত প্রসঙ্গ-প্রক্রিয়ায় অসংখ্য আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গ ছাড়িয়ে চলেছে। একই বছরে নোবেল ডিনামাইট উদ্ভাবন করেন।

দুই পথ—দুই পৃথিবী

এক শতাব্দীর কিছু বেশি সময় আগে একই বছরে দুটি ঘটনার এই সম্মিলন দুটি পরস্পরবিরোধী জগতের দুই পথের প্রতীক হয়ে উঠেছে। দুই জগতের ডিনামাইট। সমাজতন্ত্রের ডিনামাইট : চিন্তার, তত্ত্বের বিস্ফোরক শক্তি, যা সামনের শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ মানুষের চৈতন্যকে আলোকিত করেছিল এবং শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাতে ও নতুন সমাজবাদী সমাজ গঠন করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। পুঁজিবাদের ডিনামাইট : নাইট্রো-গ্লিসারিনের ডিনামাইট, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে বিদীর্ণ, দগ্ধ ও ধ্বংস করতে নিযুক্ত, আসন্ন শতাব্দীতে নোবেল তাঁর উইলে তাঁর বিস্ফোরক আবিষ্কার থেকে উপজাত ধনসম্পদ দিয়ে শান্তির জন্য পুরস্কার সৃষ্টি ক'রে গেছেন। এই নতুন উদ্ভাবনায় পর তাঁর বিশ্বাস বিবৃত করেছিলেন যে ডিনামাইট এমন সাংঘাতিক এক অস্ত্র যে ভবিষ্যতে যুদ্ধ এক অসম্ভব ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে। আজকের পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পর্কেও একই ভ্রান্ত তত্ত্ব প্রচার করা হয়। মনোরম ভ্রান্তি। ১৮৭১-এ জার্মান ডিনামাইট 'শেল' পারি শহরে বর্ষিত হয়েছিল। সেই একই ১৮৭১-এ পারি কমিউন শ্রমিক-শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক অধিকার-অর্জন দেখিয়েছিল; প্রথম সর্বহারার একনায়ক-তন্ত্রকে—যা মার্কস তাঁর অমর '*Civil War in France*'-এ উচ্চারণ করেছিলেন—সফল ক'রে তুলেছিল, ১৯০৫ বা ১৯১৭-তে প্রত্যেক দেশের নতুন জেনারেশনের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রেরণা হয়েছিল ; নবযুগের সংকেত। দুই পথ। দুই জগৎ।

বিপ্লবের গতিপথ

আমাদের কালে পুরনো সমাজ থেকে নতুন সমাজে বিশ্ববিপ্লবের পথ সম্পূর্ণও হয় নি, সহজও হয় নি। কিন্তু গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সমগ্র আধুনিক যুগ; ধনতন্ত্রের গভীর সংকট ও বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রসার চরম অন্ধ ও নিষ্ঠে

ব্যক্তির কাছেও মার্কসবাদের প্রয়োগমূল্যকে ঢক্কানিনাদ করেছে ; আজকের দিনটি পর্যন্ত যে-কোনো রাজনীতিকের বক্তৃতা, সংবাদপত্রের নিবন্ধ বা বর্তমান প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত এমন কোনো বই নেই যাতে মার্কসবাদের, যতই অলিখিত হোক, কিছু-না-কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। এইসব হালের মার্কসবাদের শৌখিন 'ব্যাখ্যাতারা' ও সমালোচকরা, যাঁরা এতদিন পূর্ববর্তী উটপাখিসুলভ স্বভাবে মার্কসবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা এখন একঘেয়ে সুরে বস্তাপচা ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছেন, অথচ মার্কস ও লেনিন সত্যি সত্যি কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন সে-বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা থাকলে তাঁরা বেঁচে যেতে পারতেন। সুতরাং, আধুনিক যুগের বিচার-বিশ্লেষণে তাঁরা ধরেই নেন যে সাম্যবাদীরা বুঝি আশা করেন সমগ্র পৃথিবীতে বিশ্ববিপ্লবের মধ্য দিয়ে এক স্বর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটবে, অথবা অন্তত একসঙ্গে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। এবং তাই ১৯১৭ থেকে অর্ধশতাব্দীর ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা ক'রে তাঁরা সোৎসাহে দেখান যে তা ঘটে নি। অজ্ঞাত শিশুর মতোই তাঁদের অজ্ঞতা। তাঁরা জানেন না, মার্কস ও লেনিন বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্ববিপ্লব ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা একটা বহু-বছরব্যাপী জটিল প্রক্রিয়া।

আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অনিবার্যতা

সব থেকে সাধারণ বিভ্রান্তি এই যে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে ও সেই সূত্রে সমগ্র বিশ্ববিজয়ে সাম্যবাদীদের এতখানি আত্মবিশ্বাসের তাৎপর্য হচ্ছে ১৯১৭-তে সাম্যবাদীরা অন্যান্য দেশে আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে নিজেদের হিসাবকে দাঁড় করিয়েছিলেন, এটা ১৯১৮-তে লেনিন আমেরিকার শ্রমিকদের কাছে লেখা চিঠিতে পরিষ্কার বলেছিলেন :

> 'আমরা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অনিবার্যতার উপর বাজি ধরেছি ; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা নির্বোধের মতো এক নির্দিষ্ট ও কাছাকাছি তারিখে বিপ্লবের অনিবার্যতার বাজি ধরেছি···আমরা জানি ফরমাশ-মাফিক বিপ্লব আসে না।'

ঐ একই বছরে, ১৯১৮-র মার্চে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায় তিনি ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ পতন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের জন্মকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেন তা

> 'ইতিহাসের এক সমগ্র যুগ, নানা জাতীয় যুদ্ধের এক সমগ্র যুগ — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, দেশের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ ও উভয়ের সংমিশ্রণ — সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে জর্জরিত জাতীয়তার মুক্তিতে জাতীয় যুদ্ধ — সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নানা মিশ্রণ, যা এ-যুগে নানা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র ও সামরিক আঁতাতের সাহায্যে অনিবার্যভাবে প্রবেশ লাভ করে। এই যুগ, প্রকাণ্ড মহাপ্লাবনের যুগ, যুদ্ধ ও সংকটের যুগ

জোর ক'রে আরোপিত গণসিদ্ধান্তের এই যুগ, আরম্ভ হয়েছে ও আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার – এটা শুধু আরম্ভ মাত্র।'

অর্ধ শতাব্দী পূর্বের বিবরণটি বর্তমান অর্ধ শতাব্দীর বাস্তব সত্যের নিরিখে অন্তর্দৃষ্টিহীন নয়।

বিপ্লব সচল

আধুনিক বিশ্বে মার্কসবাদের তথাকথিত 'ব্যর্থতা'য় উল্লসিত একই সমালোচকের দল দেখান যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব – যা ১৯১৭র আগে তাঁরা অবাস্তব স্বপ্নবিলাস বলে উড়িয়ে দিতেন – ঘটে গেছে বটে, কিন্তু মার্কস উন্নত পশ্চিম ইয়োরোপে যেমনভাবে তা আশা করেছিলেন তেমন নয়, বরং এক দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়ায়। এতে তাঁরা নিজেদের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন, কারণ মার্কস ও এঙ্গেলস উনবিংশ শতকের শেষ চতুর্থাংশ থেকেই তাঁদের পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লবের সূত্রপাত হওয়ার পূর্ববর্তী আশা থেকে পরিষ্কার সরে এসেছিলেন এবং রাশিয়াকে 'ইয়োরোপের বিপ্লবী কর্মধারার অগ্রদূত' বলে নির্দেশ করেছিলেন। একই উল্লাসের সঙ্গে তারা রাশিয়ার বাইরে বিপ্লবের বিস্তৃতি – যা তারা স্বপ্ন-বিলাস বলে ধরে নিয়েছিল – ঘটে গেছে বটে, কিন্তু লেনিন সমৃদ্ধ পশ্চিম ইয়োরোপে যেমন ঘটবে কল্পনা করেছিলেন (সেটা ট্রট্স্কির ভ্রান্তি) তেমনভাবে নয়, কিন্তু এমন সব অনুন্নত দেশে যা পূর্বে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক এলাকা ছিল। এতদ্বারা আবার তারা নিজেদের অজ্ঞতাই প্রকাশ ক'রে থাকে, কারণ লেনিন এটাই আশা করেছিলেন ১৯২৩-এ তাঁর সর্বশেষ নিবন্ধে। আবার উল্লাসের সঙ্গে তারা স্বীকার করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বর্তমানে রাশিয়া ছাড়িয়ে ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছে বটে, তা 'কেবল' পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ধনতান্ত্রিক দেশেই হয়েছে, কিন্তু তা পশ্চিম-ইয়োরোপ বা উত্তর-আমেরিকার সমৃদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশে এখনো পৌঁছাতে পারে নি। তারা ভুলে যায় যে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে ১৯১৮-র মার্চ মাসে লেনিন বলেছিলেন :

'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উন্নত দেশগুলিতে তেমন সহজে আরম্ভ হতে পারে না যেমন তা রাশিয়ায় হতে পেরেছে···যে-দেশে পুঁজিবাদ পরিণত হয়ে উঠেছে, যেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংস্থা প্রত্যেকের জন্য গড়ে উঠেছে, শেষতম ব্যক্তি পর্যন্ত – সেখানে প্রস্তুতিহীনভাবে বিপ্লবের আয়োজন হবে ভুল, উদ্ভট।'

আজ এই সমস্ত দুর্গেও ফাটল দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছে।

সাম্রাজ্যের শূন্যগর্ভতা

পুঁজিবাদের সাম্রাজ্য একের পর এক ভেঙে পড়ছে। ১৮৭৩-এ মার্কস তাঁর

'ক্যাপিটালে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন কেমন ক'রে পুঁজিবাদের সংকট নতুন পবিত্র প্রাশো-জার্মান সাম্রাজ্যের ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে-ওঠা অর্বাচীনগুলোর মগজেও দ্বন্দ্ববাদের ঢাক বাজাতে থাকবে। সেই প্রাশো-জার্মান সাম্রাজ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। প্রথমে পশ্চিমী শক্তিগুলি জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে গভীর একনিষ্ঠতায় পুনর্গঠন করল, তারপর ইয়োরোপের অন্য অঞ্চলের জাতিগুলির উপর পড়ে তাদের আয়ত্তাধীন ক'রে এল হিটলারের 'সহস্রবর্ষব্যাপী রাইখ', যা আবার দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে ভেঙে পড়ল, যখন তা সমাজ-বাদী সোভিয়েটের অপরাজিত সমবেত শক্তি ও বীরত্বের সংঘাতে এল, বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জাতিগুলির লড়াইয়ের পুরোধা হিসেবে। পুঁজিবাদী কূটনীতির অবদান 'মিত্রপক্ষের প্রথাসিদ্ধ ভিগবাজি'র পর, ২৩ বছর আগের নাৎসিবাদের পতন যেন আমাদের বিভ্রান্ত না করে পশ্চিমী শক্তিবর্গের একই নীতির পুনরা-বৃত্তিতে আবার নতুন বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হতে—যাদের কাণ্ডজ্ঞানহীন সিসিফাসীয় আচরণে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গীবাদের পুনরভ্যুত্থান ঘটছে এবং নব্য-নাৎসিবাদ ও সম্প্রসারণবাদী লক্ষ আবার প্রকাশ্য হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন বিশ্বময় স্বাধীনতার ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদল পূর্বতন ব্যবস্থার দুর্গরক্ষকের ভূমিকায় দেখা দিল এবং ইয়োরোপের সেইসব অঞ্চলে সমাজতন্ত্রের পথ রুদ্ধ হল যেখানে এই সেনাদল ও ডলারের অনুপ্রবেশ প্রসারিত্ব হতে পেরেছিল। কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ সুয়েজে জোর শিক্ষা পেয়েছিল ; নাসেরের পতন হয় নি, যদিও কাইরোর উপর বৃথা-আস্ফালিত বৃটিশ 'লিফলেট' বর্ষিত হয়েছিল সেই মর্মে ; বরং পতন হয়েছিল সেদিন ইডেনের। বৃটিশ সাম্রাজ্য পথে বসেছে, এমন কি বৃটেনের সমস্ত আর্থ ব্যবস্থা দেনার দায়ে বাঁধা পড়েছে, মহানগরের লর্ডদের মরীয়া চেষ্টার দ্বারা, নব্য-ঔপনিবেশিকতাবাদের কৌশলে সমুদ্রপারের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ সংরক্ষণ ও প্রসারিত করার প্রয়োজনে। দুর্বল বৃটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিপালিত হতে হচ্ছে। এবং এখন যুক্তরাষ্ট্রের শেষতম দুর্গটিতেও ফাটল দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছে।

কাগজের দুর্গ

মাত্র গত বছর সেনেটর ফুলব্রাইট তাঁর *Arrogance of Power* গ্রন্থখানি প্রকাশ করছিলেন যাতে অকরুণ ভাষায় প্রতি-বিপ্লবের প্রধান আরক্ষীরূপে যুক্ত-রাষ্ট্রের শাসকবর্গের সর্বশক্তিমত্তার স্বপ্ন বিবৃত হয়েছিল। শান্তির সময়েও পনেরো লক্ষ মার্কিন সৈন্য বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রক্ষা ও সমাজতান্ত্রিক জগৎকে ভয় দেখানোর জন্য। স্বর্ণ ও অন্যান্য মুদ্রাব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে ডলারই বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থায় পরিণত হতে চলেছিল। কয়েক কুড়ি

দেশের তাঁবেদার সরকার, এমন কি উইলসনের লেবার সরকারও তাতে কাঁপছিল ও মেনে নিচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর এ-বছর নববর্ষ বক্তৃতায় জানিয়েছেন যে-সমস্ত দেশ 'অর্থনৈতিক বিকাশ ও স্থিতিস্থাপকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল' দাক্ষিণ্যস্বরূপ বৃটেনকেও তাদের মধ্যে গ্রহণ করা হল। এখন সেইসব সর্বশক্তিমত্তা কোথায় গেল? আঘাত খুব দ্রুত-পারম্পর্যে এসেছে। ডলার কাঁপছে, এবং স্টকহোল্‌মের সমস্ত কলাকৌশল দিয়েও তাকে পূর্বতন কর্তৃত্বে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। ভিয়েতনামের বীরত্বময় ক্ষুদ্র জাতির বিরুদ্ধে মার্কিন দৈত্যের নির্লজ্জ আগ্রাসী যুদ্ধ পাঁচ লক্ষেরও বেশি সৈন্য দিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশি বোমা দিয়ে, নাগরিক অধিবাসীদের উপর ধ্বংসের পাশবিক অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে, সীমাহীন ব্যয়ে এমন কি মার্কিন বাজেটকে ঘায়েল করেও, শেষ হতে চলেছে অসম্মানজনক পরাজয়ে – শুধু ভিয়েতনামের জনগণের প্রতিরোধের মুখেই নয়, সমস্ত বিশ্বের ক্রোধবহ্নিতে ও মার্কিন জনগণের প্রগতিশীল অংশের বিদ্রোহে। সেই বাকাবীর অহঙ্কারী জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডকে ফেরৎ নিয়ে যেতে হল। আলাপ-আলোচনার যন্ত্রণাদায়ক পন্থাই বেছে নিতে হল, যার একমাত্র পরিণাম হতে পারে আক্রমণ বন্ধ করা ও আক্রমণকারীদের ফেরৎ নেওয়া।

সে রা লে র লি থ ন

আর পুরাতন দুর্গের অভ্যন্তরে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে, ওয়াশিংটনের মধ্যে? মার্টিন লুথার কিংএর হত্যার পরই যে-দৃশ্যের অবতারণা হল তা সমস্ত বিশ্বের কাছে উন্মোচিত করেছে আদর্শ 'নব্য ধনতন্ত্রে'র পীঠস্থানটির স্বরূপ – গভীর অস্থিরতা ও ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্ব একদা আদর্শায়িত মার্কিন দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি, যিনি সাম্যবাদের কোনো বন্ধু নন, গত বছরের শেষে অষ্টাদশতম বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। তিনি যে-রূপান্তর দেখেছেন সেখানে সে-বিষয়ে 'লাইফ' পত্রিকার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতাকে বলেছেন :

> 'আমার মতে গত ২৪ মাসে এত পরিবর্তন হয়েছে যা গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় থেকে অনেক বেশি···দু-বছর আগেও মার্কিনিরা নিজেদের সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করত···তাদের মনে হয়েছিল ভিয়েতনামের বাধা তারা এক লাফেই পার হয়ে যাবে, অন্য সব বাধা তারা যেমন অবলীলায় পার হয়···তখন থেকেই মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে···এই দু-বছরে আমেরিকা ভিতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই জোরালো নাড়া খেয়েছে। আমেরিকার সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত বোধ করছে, তারা দৈন্যবোধ করছে··· যুবসমাজ বয়স্কদের বিরুদ্ধে মাথা তুলছে। সেই শোচনীয় বিদ্রোহ, যা

আপনারা জানেন, আমার মার্কিন বন্ধুদের কাছে নিদারুণ এক আঘাত — ভিয়েতনাম-যুদ্ধের চাইতেও এটিকে মেনে নেওয়া কঠিনতর···এ-ধরনের ঘটনা কেবল ১৯২৫-এ নয়, ১৯৬৫-তেও অচিন্ত্যনীয়। সে-সময়ে আমেরিকা একটা তথাকথিত আত্মিক শান্তির মধ্যে ছিল, একটা তথাকথিত সুখের মধ্যে ; আর এখন সে-সমস্তই ধ্বসে পড়েছে।'

পুঁজিবাদের নববিধানের দুর্ভেদ্য প্রতীকের মতোই প্রেসিডেন্ট, যিনি ভিয়েতনামের তাঁবেদার শাসনব্যবস্থার রক্ষায় পাঁচ লক্ষ সেনা পাঠিয়েছেন, তিনি নিজেকে রক্ষা করতেই হাজার-হাজার সদাপ্রস্তুত বেয়নেটধারী সৈন্য, প্যারাসৈন্য ও প্রতিটি জায়গায় মেশিন-গান বসিয়েছেন হোয়াইট হাউসের চারপাশে — 'ক্যাপিটলে'র আশেপাশেও আরও এক বহর পদাতিক সৈন্য — আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের হাতে মারের ভয় থেকে রক্ষা পেতে। ভেতরে ও বাইরে সমান উত্তেজনা এবং একটি অপরটিকে বাড়িয়ে চলেছে। সারা বিশ্বের সামনে এই দেবমূর্তিতে ফাটল বেরিয়ে পড়েছে। এটাই পথের শেষ নয়। আরো অনেক দীর্ঘ ও কঠিন পথ পার হয়ে মার্কিন জনগণের স্বাধীনতা অর্জিত হবে, যে-মুক্তি বিশ্বে সমস্ত মানুষের মুক্তি ও শান্তি অর্জনে বিরাট ভূমিকা নেবে। দেয়ালের লিখন দেখা যাচ্ছে।

বর্তমানের চ্যালেঞ্জ

আমরা বাস্তবিকই জগৎ-পরিবর্তনের পরিণত পর্যায়ের কাছে পৌঁছেছি, যে-পরিবর্তন মার্কস প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ও পথ দেখিয়েছিলেন, যার নিয়ম সম্পর্কে বোধ তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন, শ্রমিকদের কাছে জয়ের পথে কর্তব্য-নির্দেশ করেছিলেন। পুঁজিবাদের উনিশ শতকের মুখপাত্ররা ভেবেছিলেন তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছেন ; তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম-কানুনই চিরন্তন নিয়ম ; অগ্রগতির সরল পন্থা অনিবার্য ক্রমবিকাশের পথে যাবে যতক্ষণ সমগ্র মানবসমাজ এই সর্বজনীন মুক্ত বাণিজ্যের যুগে তাদের নিজের সুখজনক অবস্থা অর্জন করতে পারে। মার্কস এককভাবে সেই মধ্য-উনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের সত্যিকার চরিত্র উদ্ঘাটন করেছিলেন, যাতে পুঁজিবাদ একটি পরিবর্তমান ঐতিহাসিক স্তর, যার একটা আরম্ভ ও একটা শেষ আছে ; এর গতিপ্রকৃতির নিয়ম বিশ্লেষণ করেছিলেন ও তার থেকে এর গন্তব্য নির্ণয় করেছিলেন ; সংকটের সন্ধিকাল ও বিপ্লবী সংগ্রাম পার হয়ে মানুষের জন্য — যে-মানুষ তার আপন ভাগ্যবিধাতা ও ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছাবে — সামনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ যখন পুঁজিবাদের অর্ধশতাব্দীর সাধারণ সংকট ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে চলেছি, তখন বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদের ও তার বিশিষ্ট শিল্পসাহিত্যের মুখপাত্ররা,

নৈরাশ্য ও হতাশার অন্ধ গহ্বরে পড়েছেন, প্রগতির উনিশ শতকী বিশ্বাসকে মিথ্যা আদর্শরূপে নিপাত জানাচ্ছেন, ঘোষণা করছেন, অস্তিত্বের মধ্যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তি বা শৃঙ্খলা নেই, সবকিছুই হোধহীন অর্থহীন আকস্মিকতা, যাকে কেবল নিরাকার তত্ত্বই একমাত্র ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সাধারণভাবে বিশ্ব কেবল অমঙ্গলকামী শয়তানদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একমাত্র মার্কসবাদই কখনো উনিশ শতকের পুঁজিবাদের অন্ধ আত্মতৃপ্ত মিথ্যা আশাবাদের অংশীদার হয় নি এবং তার বিশ শতকী উত্তরাধিকারীদের একই রকম অন্ধ নৈরাশ্যবাদ ও নিহিলিজ্‌মেরও নয়। মার্কসবাদ সর্বদাই সেই শক্তি ও বিভ্রম-মুক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছে যা আমাদের কর্তব্যের ও আমাদের কালের পরিপূর্ণ সামাজিক চৈতন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে কঠিন পরীক্ষা ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে কখনোই তাকে অস্বীকার করতে বা তার সম্মুখীন হতে অস্বীকার করে না (এবং এখনো কঠোর সংগ্রাম সামনে, বৃটেনের ও বিশ্বের), কিন্তু সর্বদাই অবিচল বিপ্লবী আশাবাদের সঙ্গে – যা তার সমস্যাপূরণের ও ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানোর সামর্থ্যের উপর আস্থা নিয়ে গড়ে উঠেছে। 'মার্কসবাদের শিক্ষা', লেনিন ঘোষণা করেছিলেন, 'সর্বশক্তিমান, কারণ তা সঠিক।'

MR. RAJANI PALME DUTT পাঠিয়েছেন এই লেখাটি : *Marxism – 150 Years of Vindication*। এ-প্রসঙ্গে শ্রীদিলীপ বসুর সহায়তা স্মরণীয়। গত মে মাসে *Labour Monthly* (London) পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ : নিরঞ্জন গুপ্ত।

দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে

প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে ইয়োরোপীয়দের জিজ্ঞাসা একেবারে সাম্প্রতিক নয়। সাহস ক'রে বলা যায়, 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র' (Oriental Despotsim) কথাটির মধ্যেই কিঞ্চিৎ 'ফিজিওক্র্যাটিক' (physiocratic) আমেজ রয়েছে[১]। কিন্তু এশীয় সমাজ নিয়ে আগেকার ইতস্তত সব আলোচনা ইয়োরোপীয় মনের পল্লবিত কল্পনার আভাসই শুধুমাত্র দেয় না, তার ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দেয়। তা-ই স্বাভাবিক। অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তখন ইয়োরোপীয়দের হাতে বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য ছিল না। এঁদের মধ্যে যাঁরা এশিয়ার সমাজব্যবস্থা নিয়ে লেখালেখি করতে সচেষ্ট হলেন, তাঁরা প্রধানত তাঁদের নিজেদের দেশের সমাজ-অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রাচ্যদেশীয় পাঁচমিশেলি মশলা জুড়ে মুখরোচক একটা-কিছু খাড়া করলেন মাত্র। বস্তুত, এঁদের আরশিতে একটি জিনিসই দেখা যেত : সেটি ইয়োরোপ। খুব দুঃখেরই কথা, ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক ব্যাখ্যা-সম্পর্কিত হাল আমলের কোনো-কোনো তত্ত্ব যে এই ইয়োরোপকেন্দ্রিক মনোভাবের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছে, তা নয়। এক ধরনের ইয়োরোপবাদ আজও বহু লেখককে, এমনকি কোনো-কোনো মার্কসবাদী লেখককেও, সম্মোহিত ক'রে রেখেছে। এঁদের একজন তো কিছুদিন আগে লিখেই বসলেন, ব্রনজ যুগ থেকে হঠাৎ ইয়োরোপ অনেকটা এগিয়ে গেল, এবং '…বহুযুগ পূর্বে অকস্মাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের এমন কপাল খুলে গিয়েছিল যে তাঁরা (তখন) ইতিহাসের 'এক্সপ্রেস্ ট্রেনে' উঠে বসতে পেরেছিলেন[২]।' গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম জীবন থেকে সংগঠিত সমাজ-জীবন—এই রূপান্তর ইয়োরোপে খুব তাড়াতাড়ি হয়েছিল, এশিয়ায় নয় : এ-ধরনের মতবাদের শিষ্টতা খুঁজে পাওয়া শক্ত। আবার, পশ্চিম ইয়োরোপে

যে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থাকে সাধারণত 'ফিউড্যালিজ্‌ম' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, সেই ব্যবস্থার মূলসূত্র দিয়ে প্রতিবঙ্গী (corresponding) এশীয় সংগঠনগুলোকে ব্যাখ্যা করবার ফ্যাশান্, একই অর্থে, অশিষ্ট। ইতিহাসের বিকাশ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে হতে পারে। এবং ঠিক এই সমস্যাটিই—এশিয়ার এক বা বহু সমাজ-সংগঠনের স্বতন্ত্র (এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ?) বিকাশ—আজ প্রাচ্যের নতুন ঐতিহাসিক-দের কাছে প্রধান, এবং একটি বিশেষ আকর্ষণীয়, সমস্যা। নিছক 'এশিয়াটিক ব্যতিক্রমবাদ' আখ্যা দিয়ে এই সমস্যাকে আজ আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বলা বাহুল্য, 'প্রাচ্য সমাজ' (oriental society)-সম্পর্কিত কোনো-কোনো ধারণা আজ গবেষণার প্রকল্প হিসাবে কাজে লাগতে পারে। অধুনা-খ্যাত ভেবার (Weber)-কল্পিত চীন সমাজের সংগঠনের নিমিতি নিঃসন্দেহে এদের একটি : আরেকটি হল মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' (Asiatic mode) যা, দুর্ভাগ্যক্রমে, আজও স্বল্প-পরিচিত।

২

কেউ কেউ বলেন, সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম (?) যে-ইয়োরোপীয় চীন দেশের 'ইতিহাসসম্মত' একটি সমাজচিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তিনি হলেন স্পেন্সার সম্প্রদায়ের ই. টি. সি. ওয়েনার[৩]। এঁদের নক্সায় মানব-সমাজের একটি বিশিষ্ট বিভাগ হল 'প্রাচ্যদেশীয় পর্যায়' (oriental stage)। অত্যন্ত সুগঠিত শ্রেণী-বিভাজনহেতু প্রাচ্যের সমাজব্যবস্থা বিশেষ সচল ছিল না। ওয়েনারের মতে, বিত্তবর্গ-নিয়ন্ত্রিত চীন সমাজ এই পর্যায়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্পেন্সার ঘরানার এই মডেলটি সম্ভবত আরো অনেক বেশি পর্যালোচনার যোগ্য, কিন্তু ওয়েনারের এই অতি-সরলায়িত নির্লেখ কার্যত ইতিহাস-গবেষণার বিশেষ সাহায্যে আসতে পারবে বলে মনে হয় না। যেমন পারবে না এশীয় সমাজ সম্বন্ধে ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, যদিও এ নিয়ে মাঝেমধ্যে এখনো কথাবার্তা শোনা যায়। অ্যাডাম স্মিথ চীন, ভারত ও মিশরের সমাজকে একই শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, এই সব দেশের সরকার জলসেচের ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দিতেন। স্মিথ এই প্রসঙ্গে 'ম্যাণ্ডারিন্ ও অন্যান্য কর-আদায়কারীদের' বিশেষ ভূমিকার কথাও বলেছেন[৪]। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে জেম্‌স মিল-ও 'শাসনব্যবস্থার এশিয়াটিক মডেল' এবং ইয়োরোপীয় ফিউড্যা-লিজ্‌মের সঙ্গে এর পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন[৫]। ১৮৩১ সালে রিচার্ড জোন্‌স 'এশিয়াটিক সমাজ'-এর একটি বিবরণ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন[৬], এবং তারপর ১৮৪৮ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল 'প্রাচ্য সমাজ' এই বিভাজনমূলক আখ্যাটি প্রয়োগ করলেন[৭]। এঁদের এইসব ইতস্তত মন্তব্য কিন্তু একেবারেই ভাসা-ভাসা এবং সম্পূর্ণ আনুষঙ্গিক। এখানে ঐতিহাসিক তথ্য যেমন বিশেষ-কিছু

নেই, সমাজবিজ্ঞানসম্মত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বও তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না।

এশীয় সমাজের এইসব অতি-সাধারণ পরিলেখের তুলনায় কিন্তু সহস্রগুণ তীক্ষ্ণ ম্যাক্স ভেবার-পরিবেশিত চীন সমাজের রেখাচিত্র। জার্মানির এই প্রতিভাধর দার্শনিক ভাবগত ও সমাজগত বিকাশের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে চীনদেশকে একটি বিশিষ্ট 'টাইপ' হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। বস্তুত, তাঁর বিশ্লেষণের প্রধান হাতিয়ারই হল এই আদর্শ-টাইপের (ideal-type) ধারণা। উদ্দেশ্য : পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যাদি নির্ভর ক'রে বিভাজনভিত্তিক মডেল নির্মাণ। কোনো ঐতিহাসিক অবস্থার যথাযথ চিত্রাঙ্কন-উপযোগী বর্ণনামূলক পদ্ধতির সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। ঐতিহাসিক তথ্যের বিস্তারিত খুঁটিনাটি কেন্দ্র ক'রে এর গঠন নয়, বরং চীন ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সময় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উদাহরণ সংগ্রহ ক'রে এই আদর্শ-টাইপের নির্মাণ। তবু চীনের সমাজ-সংগঠন এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোর সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে এই মডেলটি নতুন পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে[৮]।

পিতৃ-শাসিত কর্তৃপক্ষ-ব্যবস্থার একটি উপশ্রেণী হিসাবে চীন সমাজের কর্তৃত্ব-প্রথাকে ভেবার 'প্যাট্রিম্যানিয়াল' আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রথার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন অমূলদ উপাদান লক্ষণীয়। যথা, শাসনব্যবস্থার পিরামিড-শীর্ষে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শাসকের বিধিবহির্ভূত কাজ করবার 'ন্যায্য' ক্ষমতা। একটি 'প্যাট্রি-ম্যানিয়াল' আমলা-সংস্থাকে ভেবার এই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার মূল বনিয়াদ বলে চিহ্নিত করেছেন : এ আমলা-সংস্থা ছিল অসংখ্য স্থানিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন, বংশ বা কুল বা গিল্ড) উর্ধ্বে কেন্দ্র-স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত। এ আমলা-কৃত্যক, প্রকৃতপক্ষে, ক্রমোচ্চ শ্রেণীভাগভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে রাষ্ট্রীয় পরীক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'ভদ্রলোকদের' নিয়োগ করা হত। সরকারি কার্যের দস্তুরি (prebend)-ভোগী আমলারা এ-কারণে চীন সমাজের একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ গোষ্ঠী। বস্তুত, বহু শত বৎসর ধরে সামাজিক পদমর্যাদার মাপকাঠি ছিল শিক্ষা এবং প্রধানত রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা-রীতি।

চীনদেশের অর্থনৈতিক অবয়বের বর্ণনা দিতে গিয়ে ভেবার কিন্তু কোনো উন্নত আর্থ ব্যবস্থার প্রসাধন লক্ষ করেন নি : অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল 'স্বাভাবিক' পর্যায়বদ্ধ, যেখানে মুদ্রার প্রচলন অতি সামান্য। সরকার

> 'নিজেকে নদনদী ও জলপথ সংরক্ষণের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত রাখত, কেননা বড়ো বড়ো প্রদেশে শস্য সরবরাহ করবার ব্যাপারে এগুলো ছিল অপরিহার্য। আর সবকিছু ঠিক টিপিক্যাল 'প্যাট্রিম্যানিয়াল' ব্যবস্থা – মহার্ঘতা ও নিত্য-চাহিদার উপভোগ। আধুনিক অর্থে, সরকারের কোনো 'বাণিজ্য নীতি' ছিল না[৯]।'

সরকারের কর্মচারীরা নিয়মিত জলকর আদায় করত, কিন্তু এই কর ছিল নিছক রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার। কর্তৃপক্ষের অতিলৌকিক (charismatic) প্রকৃতির জন্য সম্ভবত কোনো-কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি মারাত্মক রাজনৈতিক প্রত্যয়ের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু এই 'জরুরী অবস্থা' ব্যতীত অন্যান্য সময় সরকার কেবলমাত্র খাজনা-আদায় এবং লেনদেন নিয়েই ব্যস্ত থাকত, কোনো সচেতন 'অর্থনৈতিক নীতি'র প্রয়োগে নয়।

চীনদেশের আপাত ছন্দোবদ্ধ 'সুস্থিত' সমাজের অন্তর্নিহিত 'অস্থির' শক্তি-গুলোর বিশ্লেষণ বোধহয় ভেবারের এই মডেলের সব থেকে অন্তর্ভেদী দিক। এই সুস্থিতি প্রকৃতপক্ষে দু-ধরনের বিপরীতমুখী শক্তির সম্পর্কগত এক ক্ষীণ ভারসাম্যের প্রতিফলন : একদিকে সম্রাট ও তাঁর 'প্যাট্রিম্যানিয়াল' আমলাগোষ্ঠী, অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন কুলগত ও গোষ্ঠীগত আঞ্চলিক ঐতিহ্যধারা। ভেবারের মতে, এই বিরোধই চীন সমাজের সর্বপ্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব। তবু একের দুর্বলতা অপরের সহায়ক : তাই এই সামাজিক ভারসাম্য। সম্রাট-কেন্দ্রিক আমলাসংস্থার কাছে একটি বিরাট সুবিধা ছিল স্থানীয় শক্তিগুলোর অন্তর্জাত অগণিত স্থানীয় স্বার্থের পারস্পরিক সংগতির অভাব। অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার টানাপোড়েন ছিল আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্বার্থের অনুকূলে।

কেন্দ্রের 'প্যাট্রিম্যানিয়াল' প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা প্রধানত দু-ধরনের : এক আমলা-ব্যবস্থার অসংগত (irrational) দিকগুলো ; এবং দুই, সরকারের প্রাপ্য কর ও খাজনাকে আত্মসাৎ ক'রে উচ্চস্থ রাজকর্মচারীদের পক্ষে এগুলোকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করবার সম্ভাবনা। কেন্দ্র-স্বার্থের প্রতিকূল এই সম্ভাব্য বিপদ কিন্তু দুটি তথ্যাপ্ত (objective) কারণে এমনিতেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রশমিত হয় : চীনের মতো এই বিরাট মহাদেশে তৎকালীন অনুন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা, এবং আমলা-সংস্থার আকারিক ক্ষুদ্রতা। কেন্দ্র-শাসকও এ বিপদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন ছিল। বস্তুত, এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল, বলা যেতে পারে, অত্যন্ত উন্নত সমাজ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অসংখ্য দপ্তরি-আকাঙ্ক্ষী-দের মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা-ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানবদ্ধ ক'রে। যাই হোক, কেন্দ্রীয়-স্থানীয় শক্তি-দ্বন্দ্বে ভেবারের কাছে স্থানীয় শক্তিই প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। লক্ষণীয়, চীন সমাজে গ্রামাঞ্চলের স্থানিক 'স্বয়ং-শাসন' এবং জ্ঞাতিত্ব-প্রথার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা ভেবার বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। বস্তুত, ভেবারের মতে, এই কৌলিক প্রভাবের প্রচণ্ড ক্ষমতার জন্যই চীনদেশের তথাকথিত 'গণতন্ত্র' সম্ভব হয়েছে[১০]।

ভেবারের বক্তব্যের কোনো-কোনো দিক – যেমন, স্থানীয় শক্তির তুলনাত্মক প্রাধান্য – নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর সমাজদৃষ্টির সমৃদ্ধি তাঁর টাইপ-নির্ধারক মডেলটির প্রত্যেকটি দিক নতুন প্রশ্ন ও নতুন জিজ্ঞাসা

উপস্থাপিত করেছে, নতুন চিন্তাধারার ইঙ্গিত বহন ক'রে এনেছে। আজও গবেষণাকাঙ্ক্ষী ঐতিহাসিকদের কাছে এই সমাজদৃষ্টির পরিজ্ঞান যথেষ্ট মূল্যবান। ভেবারের প্রত্যক্ষ প্রভাবে অবশ্য ইতিমধ্যে কিছু-কিছু গবেষণা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ধরনের গবেষণা উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত এবং, ফলে, পূর্ব-পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ছক-বাঁধা গণ্ডির চাপে বিকৃত হতে পারে। আর তা-ই বোধহয় হয়েছে কার্ল ভিট্‌ফোগেলের রচনাবলিতে।

ম্যাক্স ভেবারের (বা মার্কসের ?) বক্তব্যের সেই ধরে ১৯৩১ সালে, যখন তিনি জেইমার্-জার্মানির প্রখ্যাত মার্কসবাদী বলে পরিচিত, ভিট্‌ফোগেল 'চীনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থা' (*Wirtschaft und Gesellschaft Chinas*) নামক বই-এ তাঁর জলতত্ত্ববাদ নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। চীন এমন একটি দেশ (শুধু চীন নয়, অন্যান্য বড়ো বড়ো এশীয় দেশগুলোও) যার ভূ-সংস্থান ও ভূমি-চাষ চিরকালই একটি সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায়, ভিট্‌ফোগেলের মতে, রাষ্ট্রীয় জল-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিস্তৃত ও সুচারু সংগঠন। এই দায়িত্ব-পালনে আমলা-সংস্থার একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। ভিট্‌ফোগেলের পরবর্তী কালের রচনায় এই একই বক্তব্য নানাভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, এ এক অবিশ্রান্ত রোমন্থন। অধুনাখ্যাত (?) ১৯৫৭ সালে ইয়েল্-প্রকাশিত 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র : সামগ্রিক শক্তির তুলনামূলক অনুশীলন' (*Oriental Despotism : A Comparative Study of Total Power*) নামক 'চূড়ান্ত' গ্রন্থে ভিট্‌ফোগেলের এই 'আকর্ষণীয়' অথচ একঘেয়ে বক্তব্য কিন্তু নিঃশেষিতপ্রায়।

ভিট্‌ফোগেলের এই নির্লেখ চীনদেশকে একটি 'জলব্যবস্থাভিত্তিক' (hydraulic) সমাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। এই ধরনের সমাজে চাষবাস ক্ষুদ্রকায় জলসেচ-ব্যবস্থায় ['জল-কৃষি' (hydro-agriculture)] সাধিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন রাষ্ট্র-সংগঠিত বৃহদাকার ও বিস্তৃত জলসেচন এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ['জলব্যবস্থাভিত্তিক কৃষি' (hydraulic agriculture)]। ভিট্‌ফোগেলের মতে, এই আবশ্যিক প্রয়োজন পূরণার্থে উদ্ভব হল এক কৃষি-ব্যবস্থাপক (agro-managerial) শাসকশ্রেণীর। উক্ত শ্রেণীকে এন্ট্রাপ্র্যান্যার (entrepreneur) অথবা প্রাতিজনিক (private) সম্পত্তির মালিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলা সম্ভব নয়, বরং এই ব্যবস্থাপক গোষ্ঠীই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসল দখলদার। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রক্ষমতার 'একচেটিয়া' অধিকার আমলা-সম্প্রদায়ের এই 'জেন্ট্রি'-গোষ্ঠীরই করায়ত্ত ছিল। ভিট্‌ফোগেলের মতে, প্রাতিজনিক সম্পত্তির মালিকানা বা এই সম্পত্তির আকারিক আয়তন এই ধরনের সমাজে শ্রেণীভেদের নির্ণায়ক নয়। দস্তুরি-ভোগী আমলাদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হতো একান্তভাবে 'রাজনৈতিক' পরিস্থিতি ভিত্তি ক'রে, যে-পরিস্থিতি প্রাতিজনিক মালিকানার

মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মোট কথা, ভিট্‌ফোগেল আমলা-প্রথাকেই এশিয়ার (বিশেষত চীনের) সমাজ-সংগঠনের আসল বনিয়াদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ভেবার যেখানে গ্রামীণ 'স্বয়ং-শাসনের গণতান্ত্রিক চরিত্র' অঙ্কন করেছিলেন, ভিট্‌ফোগেল সেখানে নির্মাণ করলেন 'ভিক্ষুকের গণতন্ত্র', এমনকি এ-ও জাহির করলেন যে মার্কস পর্যন্ত 'সত্য থেকে হটে এসেছেন'।

এ অভিযোগ অবশ্য অবান্তর। বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় জলসেচ-পদ্ধতি ব্যবস্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্ভবত আমলা-সংস্থার উত্থানের একটি কারণ, কিন্তু একটি মাত্রই। সুতরাং জলতন্ত্র=আমলাতন্ত্র, এ-ধরনের সমীকরণ নিতান্তই অর্থহীন। প্রসঙ্গত, জলসেচের সুপ্রচুর ব্যবস্থা সত্ত্বেও সিংহলে কোনো উল্লেখযোগ্য আমলা-সংস্থার উদ্ভব হয় নি[১১]। অনস্বীকার্য, চীনের সমাজ-সংগঠনে এই আমলা-প্রথার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনদেশের বাস্তব জীবনে এর সুপ্রচুর ক্ষমতার কথা আজ ইতিহাসে মোটামুটি প্রমাণিত। কিন্তু, চীনের বিস্তীর্ণ সমাজে আঞ্চলিক ও স্থানিক সংগঠনের ব্যবস্থায় ট্রাডিশান্ ও জনমতকে উপেক্ষা করা কখনো সহজ ছিল না। সামাজিক জীবনের কোনো-কোনো এলাকায় পরিবার, গোষ্ঠী বা গিল্ডের প্রাধান্য অবিসংবাদিত: এই সব এলাকায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সাধারণত হস্তক্ষেপ করতে পারে নি। প্রচলিত 'আইন' অনুসারে সম্রাটই অবশ্য দেশ-প্রধান, কিন্তু লোকপ্রথার ট্রাডিশনাল নজিরগুলো চিরকালই সম্রাটের এই একতান্ত্রিক ক্ষমতাকে প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে রেখেছে। সংকটকালীন অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য সব সময়ই চীন সরকারের চলন ছিল অতি মৃদু ঢুল্‌কি চালে, সাধারণত সব ব্যতিচার পরিহার ক'রে। স্মর্তব্য, যুগ যুগ ধরে চীন সমাজ চলেছে 'বিদ্যার পথ'কে সম্বল ক'রে, সেনানায়কের কর্তৃত্বাধীনে নয়, বিদ্বজ্জনের আশ্রয়ে।

৩

ভিটফোগেলের 'জলব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ'-এর মূল্যায়নে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে: এ হয়তো মার্কস-অঙ্কিত এশীয় সমাজচিত্রের এক ধরনের অপেরণ (aberration)। কিন্তু এই একদা-মার্কসবাদীর অতি-কর্ষিত বক্তব্য মার্কসের 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা' (Asiatic mode of production)-সম্পর্কিত প্রশ্নটি আজ নতুন ক'রে তুলে ধরেছে। 'প্রাচ্য সমাজ' নিয়ে ভেবার যা লিখেছেন, তার অনেক কিছুই মূলত মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'-র অনুরূপ। সুতরাং জর্জ লিখ্‌টহেইমের মতো এ-কথা বলা যায়, ১৯৩৯-৪১ সালের পরিবর্তে যদি যথাসময়ে মার্কসের ১৮৫৭-৫৮ সালে লিখিত পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হতো, যখন ভেবার জীবিত ছিলেন, তাহলে 'ম্যাক্স ভেবার ও তাঁর সম্প্রদায় মার্কসের গবেষণার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করবার আরো মজবুত কারণ খুঁজে পেতেন[১২]।'

যাই হোক, আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যজনক মনে হবে, যাঁদের কাছ থেকে মার্কসের

'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'-র যথেষ্ট পর্যালোচনা আশা করা যেত, তাঁরাই এই বিষয়টিকে সর্বাধিক উপেক্ষা করেছেন, এমনকি এককালে একে প্রায় পরিত্যাগও করেছিলেন।

আধুনিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় বিগত দশকগুলোতে মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র অনুল্লেখ—এবং অবহেলা—ব্যাখ্যা করা বোধহয় খুব শক্ত নয়। প্রথমত, এ-বিষয়ে মার্কস (এবং এঙ্গেলস) যে সঠিক কী বলেছেন, তা-ই বহুদিন সুপরিজ্ঞাত ছিল না। এ-সম্পর্কে মার্কসের মূল রচনাটি বহুকাল অপ্রকাশিত থেকে যায়। 'অর্থনীতির সমালোচনা' (*Critique of Political Economy*) এবং 'পুঁজি' (*Capital*)-র প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন হিসাবে ১৮৫৭-৫৮ সালে লিখিত এই রচনাটি—'অর্থনীতি সমালোচনার পরিলেখ' (*Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie*)—বহুদিন প্রাপ্তি-সাধ্যও ছিল না। এই পাণ্ডুলিপির 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-পূর্ব সংগঠন' (*Formen die der Kapitalistischen Produktion vorhergehen*) নামক অংশে মার্কস পুঁজিবাদ-পূর্ব ঐতিহাসিক পর্যায়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অসাধারণ, বিশ্লেষণ করেছেন : 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' এই পর্যায়গুলোরই একটি। তাত্ত্বিক বিমূর্তন (abstraction) নয়, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-গঠিত এই বিশ্লেষণ প্রায়-হেগেলীয় ভাষায় পরিবেশিত হলেও প্রাঞ্জল এবং প্রগাঢ়। ১৯৩৯-৪১ সালে এই পাণ্ডুলিপিটির প্রথম প্রকাশ, মস্কোতে। তবু বহুদিন এটি অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল। ১৯৫৩ সালে এর জার্মান সংস্করণ এবং আরো তিন বৎসর পর এর ইতালীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে মাত্র এই সেদিন, ১৯৬৪ সালে[১৩]।

বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবে মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র অপ্রয়োগের দ্বিতীয়, এবং সম্ভবত প্রধান, কারণ সমগ্র মানব-ইতিহাসকে স্তালিন ও তাঁর টাল্‌মুডীয় অনুগামীদের গায়ের জোরে একটি—এবং একটিই মাত্র—ছকে আবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা। লেনিন কিন্তু তত্ত্বগত অর্থে এ-সমস্যাটি সম্পর্কে একেবারে অসচেতন ছিলেন না, যদিও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি এ-বিষয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা ক'রে যেতে পারেন নি। অবশ্য যে-সময় কাউট্‌স্কি, প্লেখানভ্‌ এবং রোজা লুক্সেমবুর্গ 'এশিয়াটিক স্বৈরতন্ত্র'-এর আমলাতান্ত্রিক ও কার্মিক অবয়বের (functional aspect) কথা পর্যালোচনা করছিলেন, লেনিন তখন এ-ব্যাপারে খুব একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। তবে একটি বিষয় থেকে 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' সম্পর্কে লেনিনের মনোভাব সম্ভবত বোধগম্য হতে পারে, অন্তত নঞর্থক দিক থেকে। নিজের দেশকে অভিহিত করতে গিয়ে ফিউড্যালিজ্‌মের (*feodalisma*) পরিবর্তে তিনি যে-শব্দটি বহুবার ব্যবহার করেছেন, তা হল 'বন্ধন' বা 'সংশ্লিষ্টতা' (*krepostnichestvo*)। অবশ্য কখনো-কখনো তিনি রাশিয়া বা চীনের সমাজকে 'ফিউড্যাল' বা 'প্রায়-ফিউড্যাল' আখ্যা দিয়েছেন, তবে মনে হয় তিনি 'বন্ধন' শব্দটি অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দ করতেন :

'চীনদেশে কৃষকের ফিউড্যাল শোষণের উৎস হল জমির সঙ্গে তার 'বন্ধন', তা যে ধরনেরই হোক না কেন[১৪]।'

প্রাসঙ্গিক হলেও মনে রাখা দরকার লেনিনের জীবনের দুই অবিচ্ছিন্ন ভূমিকার কথা—একদিকে মার্কসীয় তত্ত্ববিদ, অন্যদিকে বিপ্লবের সংগঠক। ফলত লেনিনের বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বগত আলোচনা এবং নিছক রাজনৈতিক টেক্‌নিক, এই উভয়ের সম্মিত (মিলিত, fermented) অবস্থান আশ্চর্যের নয়। বরং অনেক সময়ই শ্রমিক-আন্দোলনের নেতা ও বিপ্লবের সংগঠক হিসাবে লেনিন কোনো সমস্যার এক বা অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন নিছক বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে, তত্ত্বগত দিক থেকে নয় [যেমন, 'এশিয়াটিক পুনরধিষ্ঠান' (Asiatic restoration)-সম্পর্কিত বিতর্কটি।] তবু লক্ষণীয়, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রান্তে এসেও তিনি রাশিয়ার ঐতিহ্যকে 'প্রায়-এশিয়াটিক' আখ্যা দিয়েছেন। ২০ এপ্রিল ১৯২১ তারিখে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন : 'সাম্যবাদ পুঁজিবাদ থেকে ভালো, কিন্তু পুঁজিবাদ মধ্যযুগীয়তা, ক্ষুদ্রকায় উৎপাদন-প্রণালী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে জড়িত আমলা-প্রথার থেকে ভালো[১৫]।' এই উদ্ধৃতির দ্বিতীয় অংশটি, নিঃসন্দেহে, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র একটি প্রায়-পরিচ্ছন্ন বর্ণনা।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম দশকে মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'-সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনার কথা শোনা যায়, যে-আলোচনায় বুখারিন্, ভার্গা ও অন্যান্য অনেক প্রখ্যাত মার্কসবাদী যোগদান করেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, এ-আলোচনার বিশেষ কিছুই প্রকাশিত হয় নি। ব্যতিক্রমহীনভাবে ইতিহাস একই মাত্র পথ অনুসরণ ক'রে চলেছে—স্তালিনীয় এই প্রচারকার্য সম্ভবত এই দশকের শেষের দিকেই আরম্ভ হয়[১৬]। ফলে ১৯৩১ সালের বিখ্যাত 'লেনিনগ্রাদ আলোচনা'-র সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত স্তালিন-পন্থা অনুসরণ ক'রেই গঠিত হয়। যে-ধারণা মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'-র নির্মিতিতে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, সেই 'ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব'-কে অতি অল্পদিনের মধ্যে, ১৯৩৯ সালে, স্তালিন প্রায় সম্পূর্ণভাবে খারিজ ক'রে দিলেন :

> 'যা সহস্র সহস্র বৎসরেও বিশেষ পরিবর্তিত হয় না, তা কখনো ইতিহাস-বিকাশের প্রধান কারণ হতে পারে না[১৭]।'

এই সুবিখ্যাত (?) 'সংক্ষিপ্ত পাঠ'-এ স্তালিন অবশেষে মানব-ইতিহাসকে ব্যতিক্রমহীন 'আদিকাল—ফিউড্যালিজ্‌ম—পুঁজিবাদ' এই ছকে আবদ্ধ ক'রে ফেললেন[১৮]।

অনুরূপভাবে চৈনিক মার্কসবাদীরাও তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯২৮ সালের ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে চীন সমাজের 'ফিউড্যাল' ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেন। লক্ষণীয়, এই কংগ্রেসে দুটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব খারিজ করা হয় : এক, চীনদেশের গ্রামাঞ্চলে

'পুঁজিবাদী সম্বন্ধ' সম্পর্কে ট্রট্স্কির বিখ্যাত বক্তব্য ; এবং দুই, চীন সমাজের 'এশিয়াটিক' ব্যাখ্যা[১৯]। ইতিমধ্যে ১৯২৬ সাল থেকে মাও সে-তুং নিজে চীনের 'ফিউডাল' ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। চীন সমাজের শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি 'জমিদার শ্রেণী'কে জনগণের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলে অভিহিত করলেন[২০], যদিও এই বিশ্লেষণে তিনি 'বনেদী জেন্ট্রিদের' কথা উল্লেখ করতে বিস্মৃত হন নি। কিন্তু, মনে হয়, মাও এদের জমিদারশ্রেণীর অংশ বলেই ধরেছেন, যখন তিনি জমিদারদের, 'বিশেষত ভাড়াটে গুণ্ডা ও অসৎ জেন্ট্রির', ক্ষমতা ধ্বংস করবার দায়িত্বের কথা বলেছেন[২১]। ১৯২৮ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসের পর থেকে চীনের প্রায় সব খ্যাতনামা মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র ধারণাকে মোটামুটি বর্জন করেছেন। একমাত্র লু চেন্-ইয়ু ১৯৪০ সালে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে চীনদেশে 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা' দাসত্ব-প্রথারই একটি বিশেষ অধ্যায়, যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ এবং আদিম কমিউনিজ্‌মের কোনো-কোনো উপাদান পরিলক্ষিত হয়[২২]। যাই হোক, স্তালিনীয় নায়কবাদী যুগের প্রমত্ত আবহাওয়ায় রাশিয়া এবং চীন এই উভয় দেশেই মার্কসের 'প্রাচ্য সমাজ'-এর মডেলটি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। ১৯৫০ সালে, সোভিয়েট প্রাচ্যদেশ-সম্পর্কিত গবেষণার বিবরণ দিতে গিয়ে টল্‌স্টভ্ 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থার কুখ্যাত থিয়োরি ছারখার হয়ে গেছে' এ-কথা বড়াই ক'রে জাহির করতে পারলেন[২৩]। পৃথিবীর সকল সমাজের ইতিহাস একই পথ অনুসরণ ক'রে চলেছে—মার্কসবাদ সম্পর্কে এই উদ্ভট ধারণা আজ অকারণে গড়ে ওঠে নি।

দাসপ্রথা—ফিউড্যালিজ্‌ম—পুঁজিবাদ এই প্রায়-স্বর্গীয় অনুশাসনের প্রতি বর্তমান প্রতিক্রিয়া কিন্তু আংশিকমাত্র। উদাহরণ, ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত একটি সরকারি সোভিয়েট বই :

> 'মানব-ইতিহাস যে কয়েকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক সংগঠনের পর্যায়ানুক্রমিক বিবরণী, অতীতকাল সম্পর্কে এই ধারণা বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত। মানবজাতি মোটের উপর চারটি সংগঠন অতিক্রম করেছে—আদিম গোষ্ঠীগত, দাস, ফিউড্যাল, পুঁজিবাদী...[২৪]।'

চীনদেশের সমকালীন ঐতিহাসিক মতামত একই ধরনের। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম : এক, ফান্ ওয়েন্-লানের ১৯৫৪ সালের প্রবন্ধ,[২৫] যেখানে জমি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার, এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করবার কিছু-কিছু সুযোগ এবং জমিদার ও ব্যবসায়ীর একীভবন, এইসব কারণে তিনি চীন সমাজের কাঠামোকে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপ থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন ; এবং দুই, ইয়াং শিয়াং-কুয়েই লিখিত ১৯৫৬ সালের প্রবন্ধ[২৬], যা চীনের অনগ্রসরতা 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র স্বয়ংসম্পূর্ণতা-

জাত নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে। অবশ্য বর্তমান সোভিয়েট সমাজবিজ্ঞান ঠিক স্তালিনীয় যুগের ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমহীনতায় বিশ্বাস করে না। ১৯৬০ সালে স্টকহোল্মে ইতিহাস-বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে জুকভ্ স্পষ্টই বলেছেন, সোভিয়েট ঐতিহাসিকরা দাস-প্রথাকে আর 'সর্বত্র-দৃষ্ট' পর্যায় হিসাবে গ্রহণ করেন না, বরং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সহ-অবস্থান সম্পর্কে এঁরা আজ নিঃসন্দেহ [২৭]।

পশ্চিম ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় সমাজ-সংগঠনকে যে সাধারণত 'সার্ফ'-প্রথা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তার ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করবেন। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বহুধা-বিভক্ত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-সংগঠনকে এই পশ্চিম ইয়োরোপীয় আখ্যায় অভিহিত করা ইতিহাস-বিবেককে চোখ ঠারারই সামিল।

> 'আজকের রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডি এবং ১৭৮৮ সালের ফ্রান্সকে, ১৯০০ সালের চীন এবং নর্ম্যান ইংলণ্ডকে একই সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যায়ভুক্ত করলে বিপদ এই যে উক্ত পর্যায়টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—যা ইতিহাস-বিশ্লেষণকে সাহায্য করতে পারে—একেবারে হারিয়ে যাবে [২৮]।'

ঠিক এই কারণেই ভারতবর্ষ, চীন ও অন্যান্য এশীয় অঞ্চলের ঐতিহাসিক সমাজ-কাঠামোর প্যাটার্ন-নির্ণয় উদ্দেশ্যে ইতিহাস-গবেষণায় মার্কসের 'প্রাচ্য সমাজ'-সম্পর্কিত মডেলটির প্রয়োগ ফলপ্রসূ হতে পারে। যেহেতু এই মডেলটি এখনো স্বল্প-পরিচিত এবং যেহেতু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহু ঐতিহাসিকরা আজও মার্কসকে 'চার অক্ষরের শব্দে'র মতো সযত্নে পরিহার ক'রে চলেন, সে-কারণে মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র একটি পরিলেখ, বর্ণনা-মূলক হলেও, নিম্নে উপস্থাপিত করা হল।

৪

মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র শিষ্ট পরিবেশন কিন্তু, এক অর্থে, সমস্যা-কণ্টকিত। প্রথমত, এই বিষয়ে মার্কসের লেখার পরিমাণ অতি সামান্য ; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর এই বক্তব্য মোটেই সুবদ্ধরূপে গ্রথিত নয়। সুতরাং একমাত্র উপায় হল তাঁর বিভিন্ন রচনাবলি ও কয়েকটি চিঠিপত্র একত্রিত ক'রে এবং কোনো অভিভাব (suggestion) আশ্রয় ক'রে—এই বক্তব্যের একটি মিত পরিবেশনের প্রচেষ্টা। তবু একটি সমস্যা থেকে যেতে পারে। মানব-সমাজের পর্যবেক্ষণ-নির্ভর এই বিশ্লেষণ সম্পর্কে মার্কস কোনো পর্যায়েই আত্মতৃপ্ত ছিলেন না। এ-বিষয়ে তিনি যত পড়াশুনা করেছেন, ততই নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ ক'রে সেগুলোকে তিনি ব্যবহার করেছেন।

বস্তুত, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র মার্কস প্রধানত তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে

বিকশিত। প্রথমত, ১৮৫৩ সালের 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন্'-এর মার্কস[২৯], যখন তিনি ভারতবর্ষে বৃটিশ পুঁজিবাদের তথ্যাপ্ত বৈপ্লবিক ভূমিকায় মুগ্ধ এবং এশীয় সমাজের 'উদ্ভিদ্‌বৎ (vegetative) নিষ্ক্রিয়তা'য় ক্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, ১৮৫৭-৫৮ সালের 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন'-এর মার্কস, যখন 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র গবেষণা-নির্ধারিত বিশ্লেষণে তাঁর অসাধারণ মননশক্তি পূর্ণ-প্রতিভাত। পরিশেষে, ১৮৬৭ সালে প্রথম খণ্ড ক্যাপিটাল প্রকাশের পরবর্তী-কালের মার্কস, যখন প্রতীচ্যের ধনতান্ত্রিক চাপে মানুষের আত্মলুপ্তিতে তাঁর মন ব্যথিত এবং এশীয় সমাজের সুস্থ সারল্যের সম্পদে তাঁর পূর্বমত সম্ভবত আংশিক সংশোধিত। এশীয় সমাজ-সংগঠন সম্পর্কে মার্কসের চিন্তাধারার এই ক্রমবিকাশ অনুসরণ ক'রে তাঁর 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা'র নির্মিতিটিকে কয়েকটি বিশেষ দিক থেকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল।

এক ॥ 'এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা'র উদ্ভব।

'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র উৎস সন্ধানে ১৮৫৭-৫৮ সালের উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিতে মার্কস মানব-ইতিহাসের প্রারম্ভিক সমাজ-সংগঠন নিয়ে একটি আলোচনার অবতারণা করেন। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ থেকে কীভাবে যৌথ (*gemein-schaftlichen*) ও ব্যক্তিগত (private) মালিকানার বিভিন্ন সংগঠন সৃষ্ট হল, তা-ই ছিল এ-আলোচনার মূল বিষয়। মার্কসের মতে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বতোজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ (*naturwüchsig*) থেকে মানুষের সম্প্রদায়ের উদ্ভব ; এবং এই সম্প্রদায়ই সম্পত্তির আদিতম সংগঠনের প্রথম প্রয়োজন জুগিয়েছে। কেননা প্রারম্ভে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে তার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে। অন্য কথায়, সমাজ-অভিব্যক্তির প্রারম্ভ সম্পর্কে মার্কসের প্রথম অনুমান হল গোষ্ঠীবদ্ধ প্রাণী হিসাবে মানুষের আচরণ : বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত মানুষের কল্পনা মার্কসের মতে একটি 'নির্বোধ' ধারণা[৩০]।

একজন শক্তিশালী বীরপুংগবের কল্পনা করা অবশ্য খুব শক্ত নয়, যে প্রথমে জন্তুজানোয়ার ধরত, তারপর অনেক মানুষ ধরতে আরম্ভ করল যারা তার জন্য তখন থেকে এইসব জন্তুজানোয়ার ধরে দেবে। অর্থাৎ এই মহানায়কটি তার নিজের সংজননের (reproduction) জন্য মানুষকেও অন্য যে-কোনো প্রাণীর মতো ব্যবহার করতে আরম্ভ করল প্রকৃতিতে বিদ্যমান অবস্থা হিসাবে। আর এইভাবে কর্তৃত্ব-আরোপের প্রক্রিয়ায় তার নিজের শ্রম হতো নিঃশেষিত। এই ধরনের একটি বিচ্ছিন্ন মহানায়কের অস্তিত্ব হয়তো কোনো-একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সত্য হতে পারে ; কিন্তু একমাত্র ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব। একাকী বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ যেমন কথাবার্তা বলতে পারে না, তেমন ভূ-সম্পত্তিও অধিকার করতে পারে না। প্রকৃত-

পক্ষে, প্রারম্ভে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে 'একটি বর্গীয় (generic) জীব, একটি গোষ্ঠীবদ্ধ (tribal) প্রাণী, একটি যূথবদ্ধ (herd) জন্তু হিসাবে', রাজনৈতিক প্রাণী (*zoon politikon*) হিসাবে নয়[৩১]। এই যূথবদ্ধ জীবনযাপনের সামিক সংযুক্ততার মধ্য দিয়েই, স্বাভাবিকভাবে, মানব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি—'পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠীতে বিস্তারণ অথবা বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিবাহ থেকে গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীমণ্ডলীর মিলন'। এ কথা অবশ্য ঠিক যে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখবার আদিতম ধরন ছিল সাধারণভাবে প্রচরণশীল জীবন—কোনো-একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস না ক'রে গোষ্ঠীবর্গ ঘুরে বেড়াত, তাদের নিত্যপ্রয়োজনের সামগ্রী ইতস্তত সংগ্রহ ক'রে। অর্থাৎ ভূ-বাসন প্রকৃতি-দত্ত নয়। অতএব গঠিত হল গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়, স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত হল এই সর্বজনীন সংগঠন। আর এই সংগঠনই হল জমির যৌথ দখল ও ভোগের মূল 'শর্ত', তার 'ফল' নয়[৩২]।

অন্য কথায়, 'জীবনের তদ্ব্যাপ্ত পরিবেশের দখলীকরণ' (appropriation), এবং 'যে-ক্রিয়াকলাপ নিজের বাস্তব রূপদান করে ও নিজেকে সংজনন ক'রে চলে, পশুপালক, শিকারী বা কৃষিকারক-সুলভ সেই ক্রিয়াকলাপ' : এই উভয়ের আদি-শর্তই হল স্বতোজাত গোষ্ঠীবদ্ধ সম্প্রদায়ের (*die stammgemeinschaft*) স্বাভাবিক উদ্ভব। আদিম মানুষের কাছে ধরিত্রী হল একটি 'বিরাট গবেষণাগার, (একটি) অস্ত্রাগার যা সরবরাহ করছে তার শ্রমের হাতিয়ার ও উপাদান উভয়ই, এবং তার কর্মক্ষেত্রও[৩৩]।' সম্প্রদায়বদ্ধ মানুষ এবং তার তদ্ব্যাপ্ত পরিবেশের মিলনে ভূ-সম্পত্তি ও কৃষিকার্য ভিত্তি ক'রে যে-অর্থনৈতিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়, সেই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার উৎপাদন (production for use values) ; অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংজনন (reproduction of the individual)। এই পদ্ধতিতে মার্কস প্রধানত দুটি মূল সূত্র লক্ষ করেছেন :

১. শ্রমের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার—অর্থাৎ শ্রমের আদিতম হাতিয়ার হিসাবে এবং 'উৎপাদনের গবেষণাগার ও ভাণ্ডার' হিসাবে, এই ধরিত্রীর—দখলীকরণ। এ দখলীকরণ শ্রমারম্ভের আদি 'শর্ত' বা 'নিমিত্ত', শ্রমের 'ফল' বা 'পরিণতি' নয়। এই তদ্ব্যাপ্ত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত সরল ও সাদাসিধে : এ-কে মানুষ তার নিজের জিনিস বলেই ভাবে অর্থাৎ তার অজৈব মন্ময় প্রকৃতি হিসাবে। একদিকে ব্যক্তি, অন্যদিকে তার সংজননের তদ্ব্যাপ্ত 'শর্ত' এই ধরিত্রী।

২. কর্মরত মানুষের ধরিত্রীর প্রতি, ভূমির প্রতি যে-মনোভাব—সে ভাবে, এই ভূমি তার নিজেরই সম্পত্তি—তার সেই মনোভাব, সে শুধুমাত্র একজন 'শ্রমজীবী ব্যক্তি, এই বিমূর্তন দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর একমাত্র ব্যাখ্যা হল, ভূমির এই 'স্বত্বাধিকারে' ব্যক্তির একটি তদ্ব্যাপ্ত অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে।

বাস্তবক্ষেত্রে, যা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির এই মনোভাবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তা হল 'সম্প্রদায়ের একজন সভ্য' হিসাবে তার প্রকৃতিগত, ইতিহাসজাত ও ইতিহাস-প্রভাবিত সত্তা—গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম প্রাণী হিসাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব[৩৪]।

সুতরাং সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির মমত্ব এবং তদ্ব্যাপ্ত সত্তার অবিচ্ছিন্ন একত্বের অর্থই হল সম্পত্তি। সম্প্রদায়ের অজৈব দেহ হল এই ধরিত্রী বা ভূমি। এর সঙ্গে সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত সম্বন্ধ থেকেই ভূমির সঙ্গে (অর্থাৎ উৎপাদনের বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে) ব্যক্তির সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত এবং ধরিত্রীগত এইসব বিভিন্ন সম্বন্ধ এবং এইসব সম্বন্ধের পরিবর্তন ও বিকাশ বিবিধ উপাদান বা হেতুর উপর নির্ভরশীল যথা, সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট অথচ স্বাভাবিক বিন্যাস (make-up) অর্থাৎ গোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রকৃতি (*naturan-lagen*) ; যে-পরিস্থিতিতে গোষ্ঠী তার মালিকানা (অর্থাৎ শ্রমার্জিত সম্পত্তির ফলভোগ) জাহির করে সেই অর্থনৈতিক অবস্থা ; ভৌগোলিক পরিবেশ জলবায়ু ; নানা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ; ইত্যাদি। এই সব উপাদানে প্রভাবিত উৎপাদনব্যবস্থা কিন্তু মূলত সম্প্রদায় ও ধরিত্রীর একত্বের বাস্তব প্রতিফলন। সম্প্রদায়বদ্ধ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও অজৈব প্রকৃতির প্রতি তাদের প্রাত্যহিক আচরণ বা তাদের শ্রমের বিশিষ্ট রূপ (অর্থাৎ পারিবারিক শ্রম এবং / অথবা সাম্প্রদায়িক শ্রম)—এই সবের মধ্য দিয়েও একইভাবে ঐ উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রতিভাত হয়। উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও হেতুর উপর নির্ভর ক'রে উৎপাদনের যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই অবস্থার বিশেষ বিশেষ ধরন (যেমন পশুপালন, কৃষিকার্য, হস্তশিল্প ইত্যাদি) বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ উৎপাদন 'পদ্ধতি'র সূচনা করে। সর্বশেষে, শ্রমরত মানুষের উৎপাদনশক্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট পর্যায় হিসাবে দেখা যায় এই সম্প্রদায় ও সম্প্রদায়ভিত্তিক সম্পত্তিকে। এবং কিছুদূর পর্যন্ত সংজনন, তারপর ভাঙন।

মার্কসের মতে, মানবসমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাবিক সম্পত্তির ধরন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে : যেমন ইয়োরোপের 'প্রাচীন ক্লাসিকাল' ব্যবস্থা, যেখানে ভূ-সম্পত্তি এবং কৃষিভিত্তিক নগর ছিল সামাজিক পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ; অথবা 'জার্মানীয়' (শুধু যে টিউটনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়) ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের একক-বিন্দু ছিল 'প্রতিটি পৃথক গৃহস্থালী', সুতরাং যেখানে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার অন্তত আংশিক বিকাশ সম্ভব। আর একটি বিশেষ প্রাথমিক সমাজ-গঠন হল, মার্কসের মতে, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'।

দুই ॥ 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র মৌলিক গঠন।

সমাজ-কাঠামোর বনিয়াদ ও উপরিগঠনগত বিভেদ অনুসারে এ-কথা বলা যায় যে 'এশিয়াটিক উৎপাদনব্যবস্থা'র বনিয়াদ (base) হল সম্প্রদায়ের সর্বজনীন

সম্পত্তি। পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এ-ধরনের ব্যবস্থায় সম্প্রদায়ের সভ্য হিসেবেই ব্যক্তি নিজেকে সম্পত্তির মালিক বলে ভাবতে পারে। এর বাইরে তার মন্ময় ও তদ্ব্যাপ্ত কোনো সত্তাই নেই। ব্যক্তির সত্তা এখানে সমান দুইভাগে বিভক্ত, এ কথাও বলা যায় না : ব্যক্তি = সম্পত্তির মালিক + সম্প্রদায়ের সভ্য। এখানে ব্যক্তি = সম্পত্তির সম্প্রদায়ভুক্ত মালিক। অর্থাৎ প্রকৃত মালিক = সম্প্রদায়; ব্যক্তি তার একটি অংশমাত্র। ব্যক্তি এখানে স্বাধীন শ্রমিকের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একাকীত্বে প্রতিভাত হয় না। তার কোনো পৃথক বা স্বতন্ত্র মন্ময় সত্তা নেই। একের সঙ্গে অন্যের পোষাকী পার্থক্য যাই হোক না কেন, ব্যক্তির মালিকানা শুধুমাত্র 'সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির' মালিকানা।

> 'এশিয়াটিক সংগঠনে সাধারণত প্রাতিজনিক সম্পত্তি বর্তমান নয়, কেবল-মাত্র ব্যক্তিগত ভোগদখল। প্রকৃতপক্ষে আসল স্বত্বাধিকারী হয় সম্প্রদায়। অতএব সম্পত্তি শুধুমাত্র সর্বজনীন সম্পত্তি[৩৫]।'

'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র উপরিগঠন (superstructure) মার্কসের একটি বিমূর্ত কল্পনা দিয়ে সম্ভবত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদিও এই ব্যবস্থার আসল বনিয়াদ হল সার্বিক সম্পত্তি, তবু মনে হয় প্রাচ্য সমাজের প্রারম্ভে একটি 'মহা-সমগ্রতা' (Gesamteinheit) এই গোষ্ঠিগত সার্বিক মালিকানার উপর নিজেকে বিস্তার ক'রে রয়েছে। অর্থাৎ এই 'সর্বব্যাপী সমগ্রতা'ই প্রকৃত স্বত্বাধিকারী এবং সর্বজনীন মালিকানার আদি হেতু বলে প্রতিভাত হতে পারে। সুতরাং অসংখ্য প্রকৃত সম্প্রদায় থেকে পৃথক ও উচ্চতর 'বিশেষ একটা-কিছু' (*als ein Besonderes*) হিসাবে এই সমগ্রতাকে দেখা যেতে পারে। প্রাতিজনিক সম্পত্তি যেন সম্প্রদায়ের মধ্যস্থতায় প্রদত্ত এই মহা-সমগ্রতারই একটি দান (*ablassen*)।

> 'সম্রাট যেন এখানে অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় সম্প্রদায়ের জনক, সকলের সর্বজনীন একত্বকে যে অস্তিত্বদান করেছে। অতএব মনে হতে পারে, এই উচ্চতম সমগ্রতাই উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রকৃত মালিক (যে উৎপাদন, প্রসঙ্গক্রমে, শ্রমের মাধ্যমে নিষ্কর্ষিত উদ্বৃত্ত দ্বারা আইন অনুসারে [*infolge*] নির্ণিত)[৩৬]।'

সুতরাং 'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রে' প্রাতিজনিক সম্পত্তি আইনসম্মত বলে মনে না-ও হতে পারে। অনুরূপভাবে মনে হতে পারে যে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের অন্তত কিয়দংশ এই 'সর্বব্যাপী সমগ্রতা'র দখলে, যে-সমগ্রতা

> 'পরিশেষে একজন 'ব্যক্তি'র মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয়। সর্বজনীন শ্রম এবং করের নৈবেদ্য হিসাবে এই উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিবেদন করা হয় সমগ্রতার মাহাত্ম্য-বর্ণনে, অংশত সম্রাটের ও অংশত গোষ্ঠী-কল্পিত ভগবৎ-সত্তার মহিমা-কীর্তনে[৩৭]।'

একজন ব্যক্তির মধ্য দিয়ে এই সমগ্রতার প্রকাশ—এ হল এক ধরনের সম্ভাবনা, কিন্তু এক ধরনেরই মাত্র। উপরোক্ত উদ্ধৃতি নজির ক'রে কেউ-কেউ বলেন, সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রই 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র একমাত্র রাজনৈতিক উপরিগঠন। আসলে কিন্তু এই উদ্ধৃতিটির অব্যবহিত পরের অংশেই মার্কস অন্যান্য কয়েকটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই উপরিগঠনের বাহিরিক (external) অবয়ব নির্ণীত হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। গোষ্ঠী-জীবনের সর্বজনীন সংগঠন *(die Gemeinschaftlichkeit)* কখনো জাতি-প্রধানের মধ্য দিয়ে মার্কস-কল্পিত 'সমগ্রতা'র প্রতিনিধি হিসাবে, আবার কখনো বা ভিন্ন ভিন্ন বংশ-প্রধানের মধ্যে অন্তর্বংশগত সম্বন্ধ হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে। অর্থাৎ হয় 'স্বেচ্ছাচারী' না-হয় 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে এশিয়াটিক ব্যবস্থার বহিরাবরণ নির্ণীত হতে পারবে। অন্যদিকে, যেখানে এই 'সমগ্রতা' শ্রমের সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইনসঙ্গত একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, সেখানে সংগঠনটির কাঠামো হবে 'অভিকেন্দ্রিক'। আবার, যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় তাদের পৃথক সত্তা রক্ষা ক'রে চলতে পারে এবং যেখানে ব্যক্তি তার নিজের ও পরিজনের শ্রমের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্যাদি নির্বাহ করতে পারে, সেখানে কাঠামোটি স্বভাবতই হবে 'বিকেন্দ্রিক'।

বলা বাহুল্য, 'বনিয়াদ' ও 'উপরিগঠন' সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যাখ্যা মার্কস-নির্মিত 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র রূপের—ম্যাক্স ভেবারের ভাষায়, 'আদর্শ-টাইপের'—বর্ণনা। অন্য কথায়, মার্কসের যুক্তি অনুসারেই, তাঁর এই মডেলটির বাস্তব-রূপ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটু অন্যরকমের মনে হতে পারে। তবে পার্থক্যগুলো স্বভাবতই মৌলিক হবে না, যদি-না অবশ্যই এই 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র ক্রমবিকাশ ক্রমে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। বহুদূর পর্যন্তই অবশ্য এইসব পার্থক্য বা পরিবর্তন মূল বনিয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে পারবে—অথবা এগুলোকে মনে হবে বনিয়াদের 'নির্দোষ প্রসারণ' বা 'নিছক বিকৃতি'। প্রকৃতপক্ষে, মূল বনিয়াদকে ভিত্তি ক'রে অথবা অংশত প্রভাবিত ক'রে যথেষ্ট পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। সর্বজনীন 'সম্পত্তি'ও প্রাতিজনিক 'ভোগ দখলের' কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেছেন 'ঐতিহাসিক ও স্থানীয় ইত্যাদি পরিবেশ এই ভোগদখলের চরিত্রকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করতে পারে[৩৮]।' আবার এমন কি সম্প্রদায়-গ্রাসিত ব্যক্তিকেও কখনো-কখনো মহানায়ক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় সমাজ বা ব্যক্তির 'স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশ' বাস্তবে অসম্ভব : সমাজ বা ব্যক্তির স্বাধীন অভিব্যক্তি স্বার্থহীনভাবে এই ব্যবস্থার মৌলিক সম্বন্ধের বিরোধী।

তিন ঃ 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মার্কসের বিশ্লেষণ অনুসারে, এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থার প্রাণ হল স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং স্বয়ং-পোষক অসংখ্য স্থানিক সম্প্রদায়, 'হস্তশিল্প ও চাষবাসের এক সংসক্তি' যার অর্থনৈতিক ভিত্তি। 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন'-এ মার্কস দেখলেন—

> 'ছোটো ছোটো সম্প্রদায়ের মধ্যে কুটিরশিল্প ও কৃষিকাজের একটি একত্ব, যা সম্পূর্ণ স্বয়ং-পোষক এবং যা নিজের মধ্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে ও সংজননের সকল বীজ ধারণ করতে সক্ষম[৩৯]।'

এর আগে, ১৮৫৩ সালে, ভারতে বৃটিশ শাসন-সম্পর্কিত প্রবন্ধাদিতেও মার্কস লক্ষ করেছেন 'কৃষিকর্ম ও হস্তশিল্পের প্রচেষ্টার একটি গার্হস্থ্য সংযোগ'[৪০] এবং এইভাবে উদ্ভূত অসংখ্য বিচ্ছিন্ন জনবাস—গণনাতীত 'অসম্বদ্ধ অণুপরমাণু'[৪১], অর্থাৎ সেই তথাকথিত 'পল্লী-ব্যবস্থা' যা এই কৃষি ও শিল্পের 'প্রতিটি সমন্বয়কে তার স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবন দান করেছে'[৪২]। 'নিয়মিত অসংখ্য তন্তুবায় ও সূতাকাটুনি নিয়ে হাতে-চালানো তাঁত এবং চরকাই হল এই সমাজ-সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু[৪৩]।' আবার,

> 'গ্রামের বিচ্ছিন্নতার জন্যই ভারতবর্ষে রাস্তাঘাটের অভাব, আর এই রাস্তা-ঘাটের অভাব গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাকে চিরস্থায়ী ক'রে রেখেছে। অত্যন্ত নিম্নমানের সুযোগ-সুবিধাসহ এই প্ল্যানেই এক-একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যার সঙ্গে অন্যান্য গ্রামের প্রায় কোনো সংযোগ নেই নেই[৪৪]।'

পরে 'ক্যাপিটাল'-এ আবার দেখালেন যে 'ক্ষুদ্রমানের কৃষিকার্য ও গৃহশিল্পের সমন্বয়'ই চীন ও ভারতবর্ষের উৎপাদনব্যবস্থার বনিয়াদ[৪৫]। নগর এ-ব্যবস্থার 'অপরিহার্য' অঙ্গ নয়। মার্কসের অতি-প্রিয় 'শহর-গ্রামের প্রতিতুলনা' অনুসারে বলা যায় যে, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র কারিগরি ও চাষবাসের সমন্বয়ের অর্থই হল 'শহর (এ ক্ষেত্রে গ্রাম) ও পল্লী অঞ্চলের সংসক্তি'[৪৬]। অন্য কথায়, এখানে শহর-গ্রামের মধ্যে এক ধরনের অভিন্নতা লক্ষণীয়

> 'শুধুমাত্র সেই জায়গা যে-জায়গা বহির্বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক অথবা যেখানে রাষ্ট্রের অধিপতি ও তাঁর ক্ষত্রপরা তাঁদের খাজনা (উদ্বৃত্ত উৎপাদন) শ্রমের বদলে বিনিময় করেন···সেখানেই প্রকৃত অর্থে শহর গ'ড়ে উঠে[৪৭]।'

অর্থাৎ প্রশাসনিক কারণে ও বহির্বাণিজ্যের নিমিত্তই এশিয়ায় নগর স্থাপন হয়েছে। বস্তুত, চাষবাস ও কারিগরির সমন্বয়ে গঠিত মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর এই শহর একটি কৃত্রিম আরোপণ।

এক অর্থে, গৃহশিল্প ও কৃষিকর্মের এই পরিণয় একটি 'সুদৃঢ় শ্রমবিভাগ' প্রতি-ফলিত করে। ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের উপর প্রথম প্রবন্ধতে ১৮১২ সালে প্রকাশিত 'চাউস্ অব কমন্সের'[৪৮] একটি সরকারি বিবরণী উল্লেখ ক'রে মার্কস একটি

বিস্তৃত উদ্ধৃতি পরিবেশন করেন এই প্রতিবেদনটিতে একটি টিপিক্যাল্ ভারতীয় গ্রামের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে এই শ্রমবিভাগের একটি চমৎকার চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে[৩৮]। ১৮৬৭ সালের প্রথম খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এ মার্কস উপরোক্ত বিবরণীর অনুরূপ একটি চিত্রাঙ্কন করলেন : গ্রাম-প্রধান যিনি একাধারে কর-আদায়কারী কর্মচারী, পুলিশ এবং বিচারক ; হিসাব-রক্ষক যার কাজ গ্রামের চাষবাস ইত্যাদির হিসাব ঠিক ক'রে রাখা ; সীমানা-সংরক্ষক যার দায়িত্ব হল আশেপাশের গ্রাম-অধিবাসীদের অবৈধ হস্তার্পণ থেকে নিজের গ্রামের সীমানা রক্ষা করা, জল-উপদর্শক যে সর্বজনীন দীঘি ইত্যাদি থেকে জলসেচের জন্য জল-সরবরাহ করে ; দুয়েক জন ব্রাহ্মণ যে বা যারা গ্রামের অধিবাসীদের পরলোকে মুক্তির জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে ; গ্রামের পণ্ডিত যার কাজ হল মাটিতে আসন পেতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ; একজন গণৎকার যে বীজ-রোপণ বা ধানকাটা ইত্যাদি চাষবাসের প্রতিটি অনুষ্ঠানের পক্ষে কোন্‌দিন শুভ তা গণনা ক'রে বলে দেয় ; একজন ছুতোর ও একজন স্যাক্‌রা যাদের কাজ হল হালচাষের যন্ত্রপাতি মেরামত করা ; একজন কুমোর যে গ্রামের সব বাসনপত্র তৈরি করে ; একজন ধোপা ; একজন নাপিত ; প্রভৃতি।

> 'কাজকর্মের এই পুরো বন্দোবস্ত একটি রীতিবদ্ধ শ্রমবিভাগ ব্যক্ত করছে, যে-শ্রমবিভাগ কিন্তু শিল্পকার্যে একেবারেই অচল। ঐ স্যাক্‌রা বা ঐ ছুতোর, এদের তৈরি জিনিসপত্রের বাজার তো একেবারে সীমাবদ্ধ। বড়জোর, এক-জনের বদলে, গ্রামের আয়তন যদি বড় হয়, দু-চারজন ছুতোর বা স্যাক্‌রা কাজ করতে পারবে। যে-নিয়মে এই শ্রমবিভাগ চলতে থাকে, সেই নিয়ম-কানুন ঠিক প্রকৃতির নিয়মের মতো দুর্নিবার কর্তৃত্ব চালিয়ে যায়[৩৯]।'

অন্য কথায়, এই শ্রমবিভাগের আসল উদ্দেশ্য 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা'য় মূল্য সৃষ্টি নয়, শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনের চাহিদা মেটানো[৪০]।

উদ্দেশ্য যেখানে অতি সংকীর্ণ, নিষ্ক্রিয়তা ও এক ধরনের অনীহা সেখানে রাজত্ব করতেই পারে। বহুবার মার্কস 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র অতি-মন্থর চলনের কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, এই সমাজব্যবস্থার বেঁচে থাকবার, টিকে থাকবার ক্ষমতা অনস্বীকার্য। ১৮৫৩ সালের প্রবন্ধাদিতে মার্কস দেখালেন যে 'অতীত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবয়ব যতই পরিবর্তনশীল মনে হোক না কেন, অতি প্রাচীন কাল থেকে এর সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত হয়ে গেছে[৪১]।' ১৮৬৭ সালে প্রথম খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এ মার্কস ঠিক এই একই রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার বৈপরীত্যের কথা বলেছেন—এশিয়াটিক 'রাষ্ট্রে'র অবিরাম প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা, আর এশিয়াটিক 'সমাজে'র চিরাচরিত অনুবৃত্তি। 'সমাজের অর্থ-নৈতিক উপাদানের সংগঠন রাজনৈতিক আকাশের কালবৈশাখী সত্ত্বেও অক্ষত থেকে যায়[৪২]।' বস্তুত, এশিয়াটিক ব্যবস্থা টিকে থাকে বহুদিন, অন্যান্য তুলনীয়

সমাজ-সংগঠনের থেকে অনেক, অনেক বেশি[৩৩], এঙ্গেলসের ভাষায় 'হাজার হাজার বৎসর'[৩৪]।

'এশিয়াটিক' সমাজের এই সনাতন চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মার্কসের চিন্তাধারা, এ-কথা বোধ হয় বলা যায়, ক্রমে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৫৩ সালের প্রবন্ধাদিতে এই ব্যাখ্যা ছিল অনেকটা আবেগ-ভরা এবং অত্যন্ত সরলায়িত। এখানে মার্কস শুধুমাত্র এশিয়ার অসংখ্য জনবাসের 'মর্যাদাহীন, নিষ্ক্রিয় ও উদ্ভিদ্‌ধর্মী'[৩৫] জীবনযাত্রার কথা বলেছেন, এবং 'সামাজিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য যে-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা, তার অভাব'কে পল্লীজীবনের প্রকটি 'স্বয়ং-সম্পূর্ণ জড়ত্ব'[৩৬] দিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। অগণ্য সম্প্রদায়-গুলোর নির্দোষ অপরিসরতা মানুষের মনকে ট্র্যাডিশনাল বিধিনিয়মের দাসত্ব-শৃংখলে, সংস্কারের ধোঁয়াশায়, অতি-সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ক'রে তার মননীয়তা ও সহজাত সমাহার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। এই নিরুদ্ধ জীবনযাত্রা

> 'যে-মানুষ পরিবেশের প্রভু হতে পারে তাকে এর দাস ক'রে রেখে, আপনি গড়ে উঠছিল যে-সমাজ তাকে নিয়তির হাতে সমর্পণ ক'রে, এক বুদ্ধীহীন প্রকৃতি-পূজার অবিশ্রান্ত আয়োজন ক'রে চলেছে। যার অর্থ, নতজানু হয়ে বানর হনুমান ও কামধেনু সবলার পূজায় প্রকৃতির সম্রাট যে-মানুষ সেই মানুষের আত্মনিবেদন[৩৭]।'

ভাবাবেগপূর্ণ ব্যাখ্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু খুব প্রগাঢ় নয়। ১৮৫৩ সালের রচনা-বলিতে শুধুমাত্র একটি জায়গায় 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র মন্থর-গতির কারণ হিসেবে 'বংশপরম্পরাগত শ্রমবিভাগের' উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু নিছক নঞর্থক ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্র : 'ভারতের প্রগতির সেইসব চূড়ান্ত বাধা[৩৮]।'

দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৮৫৭-৫৮ সালে, 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন'-এ এই ব্যাখ্যার উন্নততর রূপ পরিবেশিত হয়েছে

> 'উৎপাদন-প্রথা যত বেশি ট্র্যাডিশনাল, অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত নিষ্কর্ষণের 'বাস্তব প্রক্রিয়া' যতবেশি অপরিবর্তিত থেকে যায়, ততবেশি অপরিবর্তনীয় থাকবে সম্পত্তির আদি সংগঠনগুলো এবং সেই কারণে সমগ্রভাবে সম্প্রদায়গুলোও। [লক্ষণীয়, ট্র্যাডিশনাল প্রথাগুলো কৃষিব্যবস্থায় যতদিন টিকে থাকে, প্রাচ্যের গৃহশিল্প ও চাষবাসের অভিন্ন ব্যবস্থায় তার চেয়ে অনেক বেশি দিন[৩৯]।]'

অর্থাৎ এশীয় ব্যবস্থায় উৎপাদনের চক্রটি স্বয়ং-পোষক। আর চাষবাস ও কারিগরির সমন্বয়ে যে-পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে সেই পদ্ধতি 'নিজের মধ্যেই উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন ও সংজননের সকল বীজ ধারণ ক'রে রাখতে সক্ষম'[৬০]। ১৮৬৭ সালে প্রথম খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এ এই সংজননের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা'র কথাই আবার বলা হল :

'এইসব স্বয়ং-সম্পূর্ণ সম্প্রদায়গুলো, যে-গুলো অবিরাম নিজেদের একই রূপে

'সংজনন' ক'রে চলে—আর যদি-বা দৈবাৎ বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলেও সেই একই জায়গায় সেই একই নাম নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়—এইসব সম্প্রদায়ের উৎপাদন-সংগঠনের অবিমিশ্র সারল্যই এশিয়াটিক সমাজের 'অপরিবর্তনীয়তা'র রহস্যের চাবিকাঠি [৬১]।'

পরে তৃতীয় খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এর যেখানে মার্কস চীন ও ভারতবর্ষে বৃটিশ ব্যবসার 'বৈপ্লবিক প্রভাব' এবং এই সমাজগুলোর ক্রমাত্মক ভাঙনের কথা আলোচনা করেছেন, সেখানে বোধহয় এগুলির সংগঠনগুলোর অপরিবর্তনশীলতার একটি অপ্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা রয়েছে। চাষবাস ও কারিগরির সমন্বয়ে ধীরে ধীরে যে 'সমৃদ্ধ অর্থব্যবস্থা ও সঞ্চয়' (substantial economy and saving) গঠিত হতে পারে, সামাজিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তার 'অনমনীয় প্রতিরোধের'র প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে মার্কস এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন [৬২]। আধুনিক বৃহদাকার যন্ত্রশিল্পের 'আনুষঙ্গিক ব্যয়াধিক্য' (*faux frais*) নিয়ে ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের আলোচনা মার্কসকে এখানে একটি অনায়াস যুক্তি সরবরাহ করল। আধুনিক যুগের যন্ত্রশিল্পের এই অন্তর্জাত দুর্বলতার বিপরীত দিকে কৃষি-নির্ভর ছোটো ছোটো কারিগরি প্রচেষ্টার আর্থিক সঞ্চয়ের সংরক্ষণশীল ক্ষমতাকে দাঁড় করিয়ে মার্কস সম্ভবত 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র দীর্ঘ-স্থিতির একটি যথাযোগ্য ব্যাখ্যার ইঙ্গিত উপস্থাপিত করেছেন।

চার ॥ মার্কসের পর্যায়বাহী ইতিহাসের নির্লেখে 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র স্থান।

সমাজ-বিবর্তনগত পর্যায়-অনুক্রমের সর্বাধিক-পরিচিত মার্কসীয় বিবৃতি বোধ হয় 'অর্থনীতির সমালোচনা' (*Critic of Political Economy*) বই-এর সুবিখ্যাত মুখবন্ধে উল্লিখিত উক্তিটি, যা 'এশিয়াটিক, প্রাচীন, ফিউড্যাল ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদনব্যবস্থাকে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রগতিতে কয়েকটি অধিযুগ' হিসাবে চিহ্নিত চিহ্নিত করেছে[৬৩]। এখানে 'প্রগতি' শব্দটি ব্যবহারের অর্থ কিন্তু এই নয়, উপরোক্ত পর্যায়গুলো যে-পরম্পরায় সাজানো হয়েছে, তা একটি কালনিরূপণ-সংক্রান্ত বিন্যাস। ১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে পুঁজিবাদ-পূর্ব সমাজ বর্ণনায় মার্কস চারটি সংগঠনের প্রত্যক্ষ উল্লেখ করেছেন: 'এশিয়াটিক, স্ল্যাভোনিক, প্রাচীন ক্লাসিকাল এবং জার্মানিক'[৬৪]। শেষের দুটি সংগঠন থেকে ইয়োরোপে ফিউড্যালিজ্‌ম-এর উদ্ভব হয়েছে, উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিটির আসল যুক্তি মেনে নিলে এ-কথাই মনে হবে, যদিও মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই মনে করতেন যে 'আদিম' সমাজ থেকে সরাসরি ফিউড্যালিজ্‌ম-এ রূপান্তর সম্ভব। আসল কথা, এই চারটি (শুধুমাত্র চারটি?) সংগঠনকে মার্কস 'সুপ্রাচীন বা প্রাথমিক সংগঠনের' বিভিন্ন 'টাইপ' হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। ১৮৮১ সালের ভেরা জাসুলিচ্‌কে লেখা চিঠির খসড়াগুলো এ-প্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

'আমাদের পৃথিবীর সুপ্রাচীন বা প্রারম্ভিক সংগঠন বিভিন্ন কালের কয়েকটি স্তর ধারণ ক'রে রয়েছে, যেগুলো একটি আরেকটির উপর অধিশায়িত। ঠিক একইভাবে সমাজের সুপ্রাচীন সংগঠনের কতগুলো বিভিন্ন 'টাইপ' লক্ষিত হয়[৬৫]।'

আবার,

'প্রাচীন সম্প্রদায়গুলো সব একই প্যাটার্নে গঠিত নয়। বরং একসাথে ধরলে এদের একটি সারিকাবদ্ধ সম্প্রদায়-সমাবেশ বলে মনে হবে। ধরনে ও বয়সে এগুলো একে অন্যের থেকে পৃথক, এবং ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় কতকগুলো ক্রমান্বিত উপ-পর্যায় (successive phases)[৬৬]।'

সংগঠিত-সমাজ অভিব্যক্তির প্রথম পর্যায় সুতরাং, মার্কসের ভাষায়, প্রারম্ভিক বা প্রাথমিক (primary) পর্যায়[৬৭]। এ-সম্পর্কে মার্কস তাঁর বক্তব্যটিকে বিশদ-ভাবে উপস্থাপিত করেন নি। পুঁজিবাদী সমাজের আগেকার সংগঠনগুলোর অন্তর্গতি নিয়ে তিনি অবশ্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন না। তৃতীয় খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এ, যেখানে তিনি ফিউড্যাল কৃষি-প্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানে তো মার্কস স্পষ্টই বলেছেন যে ধনতন্ত্র-পূর্ব ঐতিহাসিক সংগঠনের ভূ-সম্পত্তির বিশদ বিশ্লেষণ তাঁর দায়িত্ব নয়। পুঁজিবাদ ব্যাখ্যা করতে গেলে এর পূর্বেকার সংগঠন-গুলো যতটুকু জানা দরকার, ততটুকু পর্যালোচনা করাই তাঁর কাজ। আর তা-ছাড়া, 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন' নামক পাণ্ডুলিপিটি অনেকটা শর্ট-হ্যাণ্ডে লেখার মতো : অনেক কিছুই এখানে উহ্য রয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় খসড়া-গুলোই একমাত্র লেখা যেখানে প্রাথমিক পর্যায় সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের মূলসূত্র স্বার্থহীনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই বক্তব্যের অন্তঃস্থ যুক্তি অনুসারে মার্কসের 'প্রাথমিক' পর্যায়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা বলা যায়।

প্রথমত, প্রারম্ভিক পর্যায়ভুক্ত সংগঠনগুলোর বিভিন্ন টাইপ। ১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত চারটি টাইপ — যার মধ্যে 'এশিয়াটিক' সংগঠন একটি — ব্যতীত অন্যান্য আরো সংগঠন থাকতে পারে। আর এগুলোর মধ্যে, চরিত্র-গত অর্থে, কখনো-কখনো একটি অন্যটির খুব নিকট বলেও মনে হতে পারে। যেমন, স্লাভোনিক সংগঠন, যা মার্কসের মতে কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত প্রাচ্যদেশীয় সংগঠন[৬৮]। যেমন, মেক্সিকান, পেরুভিয়ান ও কেল্টিক সংগঠন, যেগুলোর মূল বনিয়াদ হল 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র অনুরূপ সর্বজনীন শ্রম-সংগঠন[৬৯]। [কিন্তু কেল্টিক বা পেরুভিয়ান সর্বজনীন সম্পত্তি-সংগঠন সম্ভবত জটিলতর 'স্তরে'র সংগঠন, কেননা এগুলো আদিতে দেশজ নয়, বহিরাগত বিজয়ী গোষ্ঠীবর্গ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত[৭০]।] যেমন, ট্যাসিটাস্-বর্ণিত 'কৃষি-সম্প্রদায়', যার ভাঙন ইতিহাসে অকথিত রয়ে গেছে[৭১]। যেমন, রাশিয়ার 'গ্রামীণ সম্প্রদায়', যেখানে চাষী ইতিমধ্যেই তার 'বসতবাড়ি ও পাশের বাগানের মালিক'[৭২]। দ্বিতীয়ত, মার্কসের

যুক্তি অনুসারে বলা যায় যে এইসব বিভিন্ন সংগঠন, একই পর্যায়ভুক্ত হলেও, যে ঠিক একই সময়ে সহ-অবস্থান করে তা নয়। [দ্রষ্টব্য, পূর্বোল্লিখিত জাহুলিচ্-খসড়া : '…বয়সে একে অন্যের পৃথক।'] । যেমন 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র ভাঙনের বহু পূর্বেই অন্যান্য অনেক সংগঠনের মৌলিক রূপান্তর হয়েছে। তৃতীয়ত, 'প্রাথমিক' পর্যায়ের অন্তর্জাত ক্রমবিকাশ লক্ষণীয় : অর্থাৎ এখানে উপ-পর্যায়গত কয়েকটি বিভাজন সম্ভব [দ্রষ্টব্য, উল্লেখিত খসড়া : '…কতগুলো ক্রমান্বিত উপ-পর্যায় (successive phases)।] । যেমন, রাশিয়ার 'কৃষি-সম্প্রদায়', যা এই পর্যায়ের 'সর্ব-কনিষ্ঠ'[১৩] সংগঠন, অর্থাৎ 'সুপ্রাচীন সংগঠনের শেষ উপ-পর্যায়'[১৪]। চতুর্থত, আদ্য – অনু-সম্ভূত – তৃতীয় পর্যায় (পুঁজিবাদী) – চতুর্থ পর্যায় (সমাজতান্ত্রিক) – এই ধারার প্রদত্ত অনুক্রম যে সর্বত্র এবং সর্বদা ব্যতিক্রমহীনভাবে চলবেই, তা নয়। অর্থাৎ মাঝখানের এক-আধটি পর্যায় বাদ দিয়েও কোনো-কোনো সমাজব্যবস্থা এগিয়ে যেতে পারে। যেমন, 'আদিম' সমাজ থেকে 'সরাসরি' ফিউডালিজ্‌ম-এর উদ্ভব হতে পারে, এ-কথা তো মার্কস ও এঙ্গেলস উভয়েই মেনে নিয়েছেন। আবার, সমাজের 'প্রারম্ভিক' সংগঠনের শেষ উপ-পর্যায় হিসাবে (রাশিয়ার) 'কৃষি-সম্প্রদায়'কে মার্কস একটি পরিবৃত্তিকাল বলেও চিহ্নিত করেছেন, যা থেকে সরাসরি অনু-সম্ভূত বা দ্বিতীয় পর্যায়টি গড়ে উঠবে, 'কিন্তু এ-কথার অর্থ কি এই যে কৃষি-সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক জীবন অবশ্যম্ভাবীভাবে এ-দিকে যাবে? নিশ্চয়ই নয়।…সবকিছু নির্ভর করছে ঐতিহাসিক পরিবেশের উপর[১৫]।'

এই শেষাংশটি, নিঃসন্দেহে, মার্কসের 'অনাবদ্ধ' মনের এবং তাঁর বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস-চেতনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যা তাঁর সমাজ-অভিব্যক্তির তত্ত্ব ও তৎসম্বন্ধীয় পর্যায়-অনুক্রমের বিশ্লেষণকে উৎকর্ষ দান করেছে।

এই অনুক্রমের 'প্রাথমিক' পর্যায়ভুক্ত এশিয়াটিক ব্যবস্থার 'আইডিয়াল' সংগঠন হল, মার্কসের যুক্তি অনুসারে, মানব-জন্মের নিকটতম পর্যায়, যেখানে 'মাতৃজঠর ও শিশুর নাভির সংলগ্নতার মতো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ এখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি, ঠিক যেমন একটি মৌমাছি মৌচাকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হতে পারে না[১৬]।'

অন্য কথায়, এ-ই হল বিখ্যাত 'প্রাচ্যের সাধারণ দাসত্ব', যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রায় অবিকশিত। এ-কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইয়োরোপের মতো এশিয়াটিক ব্যবস্থায়ও দাস-প্রথা বর্তমান ছিল। যেহেতু গোষ্ঠীর সভ্য হওয়াই সর্বজনীন সম্পত্তির অপরিহার্য নিমিত্ত, সুতরাং যদি কোনো-একটি গোষ্ঠীকে অন্য একটি গোষ্ঠী যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আয়ত্তাধীনে এনে ফেলে তাহলে প্রথম গোষ্ঠীটি তার মালিকানা হারিয়ে ফেলবে এবং বিজয়ী গোষ্ঠীর সংজনন-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত অবস্থায় অন্ত হয়ে পড়বে। ইয়োরোপে দাস-প্রথা এ-ভাবে গোষ্ঠীভিত্তিক সম্পত্তির রূপান্তর ঘটিয়েছে, কিন্তু 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় তা সম্ভব নয়। জয়করণ

এশিয়াটিক ব্যবস্থার কৃষি ও শিল্পের গার্হস্থ্য 'সমন্বয়ে'র পরিবেশে তেমন একটি আবশ্যিক শর্ত নয়, যেমন ইয়োরোপে, যেখানে ভূ-সম্পত্তি 'এবং' কৃষিকার্যের একচেটিয়া প্রাধান্য। যেহেতু ব্যক্তি এখানে প্রকৃত মালিক নয়, শুধুমাত্র সম্পত্তির 'অধিকারী' (possessor), সে-জন্য মূলত সে নিজেই চল সম্পত্তি, অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্বজনীনতার 'দাস'। প্রতিষ্ঠানবদ্ধ দাসত্বের কথা এখানে অবান্তর[৭৭]। (সম্পূর্ণ বাহিরিক প্রভাব ব্যতীত) ব্যক্তি এখানে তার সম্প্রদায়গত সম্পর্কে এমন কোনো অনধীন পথে নিয়ে যেতে পারে না, যা এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার তন্ত্যাপ্ত ও অর্থ-নৈতিক বন্ধনের হাত থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। পুঁজিবাদ-পূর্ব সব সংগঠনেই সম্পত্তি গোড়াতে শ্রমরত ব্যক্তির সঙ্গে তার উৎপাদন ও সংজননের অবস্থার সম্পর্ক সূচনা করে। সুতরাং স্বভাবতই উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে এই সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। আর এই বিভিন্ন রূপ সমাজের বিভিন্ন অধ্যায়েরই নামান্তর, যেগুলো ব্যক্তির 'অ্যালিয়েনেশন'-এর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার প্রতিভাস মাত্র। 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় এই অ্যালিয়েনেশন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের। ব্যক্তি এখানে স্বাধীন একজন 'শ্রমিক' নয়, কেবলমাত্র একজন 'কর্মী'। ব্যক্তি এখানে উৎপাদনের তন্ত্যাপ্ত অবস্থাকে 'শুধু মূল্য' হিসাবে, 'অন্য কোনো লোকের সম্পত্তি' হিসাবে, তার নিজের সঙ্গে সম্বন্ধহীন কোনো-কিছু বলে মনে করতে পারে না। ব্যক্তি 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় প্রায় সম্প্রদায়-গ্রাসিত।

পাঁচ ॥ দুটি সমস্যা।

ক. 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় শ্রেণীবিভেদ এবং এই ব্যবস্থার অন্তর্জাত পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্পর্কে সমস্যা।

মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'কে কেউ কেউ একটি শ্রেণীবিভেদ-পূর্ব পরিবর্তন-প্রতিরোধী সমাজ হিসাবে বর্ণনা ক'রে থাকেন। বলা বাহুল্য, ১৮৫৩ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস, সেকালের ইয়োরোপীয় পর্যটকদের ধরনে, ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত মালিকানার অবর্তমানতাকেই বিশেষ ক'রে তুলে ধরেছিলেন। যেমন, ২ জুন ১৮৫৩ তারিখের একটি পত্রে ব্রানিয়ারকে উল্লেখ ক'রে মার্কস লিখলেন যে প্রাচ্যের সব-কিছুরই ভিত্তি হল 'প্রাতিস্বনিক ভূ-সম্পত্তির অবর্তমানতা'। 'এই হল আসল চাবিকাঠি, এমন কি প্রাচ্যের স্বর্গেরও[৭৮]।' এবং ৬ জুন ১৮৫৩-এর জবাবে এঙ্গেলস একই কথা বললেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে মার্কস প্রাতিস্বনিক সম্পত্তিকে 'এশিয়াটিক সমাজের প্রধান অভাব (desideratum)' বলে চিহ্নিত করেছেন[৭৯]। পরবর্তীকালেও অবশ্য মার্কস এশিয়াটিক ব্যবস্থায় 'সর্বব্যাপী সমগ্রতা'কে 'একমাত্র মালিক'[৮০] এবং রাষ্ট্রকে 'প্রকৃত' ও 'সর্বোচ্চ ভূমিপতি'[৮১] আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে তাঁর

আসল বক্তব্য গড়ে উঠেছিল প্রধানত এশীয় সমাজে চাষবাস ও গৃহশিল্পের সমন্বয়কে কেন্দ্র ক'রে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে এশীয় সমাজের উপরোক্ত চিত্রাঙ্কন মূলত 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র অবিমিশ্র আদি-রূপের, অর্থাৎ এর 'আইডিয়াল টাইপের', চিত্রাঙ্কন মাত্র। এই আদি রূপ কালক্রমে এবং বাস্তব জীবনে পরিবর্তিত হতেই পারে। বস্তুত, মার্কস তাঁর সমকালীন 'এশিয়াটিক' সমাজে পূর্ণ মালিকানার অর্থে জমির প্রাতিজনিক ব্যবহার, ইজারাদারি ও ভোগদখল মেনে নিয়েছেন। যেমন, ৭ জুন ১৮৫৮ তারিখের 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে, ক্যানিং-এর ৩ মার্চ ১৮৫৮-র অযোধ্যা-সম্পর্কে ঘোষণাটি উল্লেখ ক'রে, মার্কস ভারতবর্ষে জমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে সেকালের বিতর্কটির অবতারণা করেন জমিদার বা তালুকদারদের ভূমি-স্বত্বের উদ্ভব কি বলপ্রয়োগে জমি-দখল থেকে (?), সরকারই কি প্রকৃত ভূমিপতি, না-কি জমির সঙ্গে যার সংযোগ চিরাচরিত সেই চাষীই আসল মালিক (?), ইত্যাদি[৮২]। ১৮৫৯ সালে মার্কস মন্তব্য করলেন যে চীনদেশে শাসকবর্গ প্রায় সব চাষীকেই 'পূর্ণ মালিকানার শর্তে জমি ভোগ' করবার অধিকার দিয়ে এসেছে[৮৩]। পরে, তৃতীয় খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এ, যেখানে মার্কস এশিয়ায় প্রাতিজনিক সম্পত্তির অবর্তমানতার কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে এ-ও বলেছেন যে তৎসত্ত্বেও এশিয়াটিক ব্যবস্থায় 'জমির প্রাতিজনিক ও সর্বজনীন দখল ও ব্যবহার উভয়ই' বাস্তবে বর্তমান ছিল[৮৪]। এই খণ্ডের অন্যত্র মার্কস চীনদেশে বহু আগে সর্বজনীন ভূমি-ব্যবস্থার পতনের ইঙ্গিত দিয়েছেন[৮৫]। সুতরাং এ-কথা বলা অশিষ্ট হবে না যে 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় প্রাতিজনিক 'সম্পত্তি'র অবর্তমানতাকে মার্কস প্রধানত আইনগত অর্থে বা তত্ত্বগত অর্থে 'মালিকানা'র অবর্তমানতা বলে ধরেছেন—এবং শুধুমাত্র তত্ত্বগত অর্থেই, বাস্তবক্ষেত্রে নয়।

এশীয় সমাজের আদর্শ-টাইপের রূপ এবং মার্কসের সমকালীন 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র মার্কস-স্বীকৃত প্রকৃত চিত্র এই দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য থেকে সম্ভবত দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। প্রথমত, যেহেতু 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় মার্কস জমির ইজারা-বণ্টন, জমির চিরাচরিত প্রাতিজনিক ব্যবহার ও ভোগ-দখল এবং সেইভাবে গঠিত অধিকার, এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পূর্ণ মালিকানা মেনে নিয়েছেন, সেহেতু এ-কথা বলা অবান্তর যে মার্কসের প্রাচ্য সংগঠনে সম্পত্তি-ভিত্তিক কোনো শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি। এরিক হব্‌সবামের অনুমান, 'সর্বজনীন সম্পত্তিব্যবস্থার ভাঙন সম্পর্কে কোনো এক ধরনের মাধ্যমিক ঐতিহাসিক পর্যায়' সম্ভবত মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারায় গ্রথিত ছিল[৮৬]। তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে এশিয়াটিক ব্যবস্থার আদি চিত্র ও মার্কসের সমকালীন এশীয় সমাজের তৎ-স্বীকৃত রূপের পার্থক্য ব্যাখ্যা করা সহজ। কিন্তু

হব্‌সব্যামের অনুমান শুধুমাত্র অনুমানই : এই বক্তব্যের পেছনে কোনো গ্রাহ্য যুক্তি থাকলেও সেটি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত হয় নি। সুতরাং এশীয় সমাজের মার্কস-কথিত দীর্ঘ-স্থিত উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রেণীবিভেদের উৎপত্তি মেনে নেওয়াই যুক্তিসংগত, তবে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োরোপীয় সমাজের মতো এ শ্রেণী-বিভাগ উচ্চতর কোনো পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত, পরিবর্তন-প্রতিরোধী প্রাচ্য সমাজেও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষণীয়, যদিও এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও ধারা ছিল অপেক্ষাকৃত ধীরগামী। ১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে মার্কস 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় পরিবর্তনের উপাদান ও উপকরণগুলোর উপস্থিতি অস্বীকার করেন নি। একটি উচ্চতর 'সমগ্রতা'র অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায়ের সহ-অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস দেখালেন যে এইসব সম্প্রদায় সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রয়োজনে (যেমন, যানবাহন ও রাস্তাঘাট নির্মাণ) এবং সর্বজনীন উদ্দেশ্যে (যেমন, যুদ্ধবিগ্রহ বা পূজাপার্বণ) এদের উদ্বৃত্তের অংশবিশেষ ব্যয় করতে পারে।

> 'এখানেই 'লর্ডের কর্তৃত্ব', তার আদিতম রূপে, উদ্ভূত হয় ; উদাহরণ, স্লাভোনিক ও রুমানিয়ান সম্প্রদায়। এখান থেকেই ফিউডালিজ্‌মে রূপান্তর...৮৭।'

অর্থাৎ উদ্বৃত্তের এই 'পরকীকরণ' (alienation) থেকে ইয়োরোপের মতো 'ডোমিনিয়াম্'-মালিকানা ও 'ডিলিনেক্'-প্রজাস্বত্ব গড়ে উঠতে পারে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এশিয়াটিক ব্যবস্থার 'ক্রমানুযায়ী বিকাশ' নিয়ে মার্কস কোথাও আলোচনা করেন নি। ১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে তিনি 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'কে, তাঁর বিভাজন-ভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুসারে, একটি 'প্রাথমিক' সমাজ-সংগঠনের নমুনা হিসাবে ইয়োরোপের 'সুপ্রাচীন' ও 'জার্মানীয়' সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করেছেন—এবং তা-ও কেবলমাত্র গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন থেকে সংগঠিত জীবনে রূপান্তর প্রসঙ্গে। জাসুলিচ্‌কে লেখা পূর্বোল্লিখিত পত্রে উপপর্যায়-অনুক্রমিক বিকাশের কথা মার্কস তো স্পষ্টই বলে গেছেন। এশিয়াটিক ব্যবস্থার প্রারম্ভিক অধ্যায়ে সাবিক মালিকানা-প্রথা এবং মার্কসের সমকালীন অধ্যায়ে জমির দীর্ঘকালীন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহার, দখল এবং পূর্ণ সম্পত্তিগত উপভোগ এই দুই পর্বের মধ্যেকার দীর্ঘায়িত ক্রমবিকাশ 'এশিয়াটিক উৎপাদন ব্যবস্থা'র পরিবর্তনশীলতাকেই সপ্রমাণ করে। আজ যদি মার্কসের আবার জন্ম হয়, তাহলে এশীয় সংগঠনের এই ক্রমায়িত বিকাশের সমস্যাটি ব্যাখ্যা করাই হবে মার্কসের একটি প্রধান দায়িত্ব। যাই হোক না কেন, 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' তো আর একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়।

হব্‌সব্যামের মন্তব্য[৮৮]—সামাজিক পরিবর্তন এশিয়াটিক ব্যবস্থায় শুধু 'একটি 'বিদ্যা সমাজ'—এই প্রসঙ্গে একটি গ্রাহ্য প্রশ্ন তুলতে পারে, বহিরাগত শক্তির

প্রভাব ব্যতিরেকে উচ্চতর কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের ক্ষমতা এশীয় সমাজে অন্তর্নিহিত ছিল কি না! অর্থাৎ ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদের ধাক্কা ছাড়া 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র কোনো মৌলিক পরিবর্তনের বীজ নিহিত ছিল কী? ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের ভাঙনে বৃটিশ পুঁজিবাদের তথাকথিত ভূমিকা—'ইতিহাসের নির্জ্ঞাত হাতিয়ার'—সম্পর্কে মার্কসের ১৮৫৩ সালের বক্তব্য তো অতিপরিচিত[৮৯]। তবে, 'প্রায়-এশিয়াটিক' রাশিয়ায় স্থানিক সম্প্রদায়গুলো সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের প্রথম সোপান হতে পারে, পরবর্তীকালে মার্কসের এই মতামত সম্ভবত 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' সম্পর্কেও একটি ইঙ্গিত বহন করছে। পূর্বোক্ত জাসুলিচ্-পত্রে তিনি এই আশা প্রকাশ করেছেন যে

> 'পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সদর্থক ফল সংগ্রহের মাধ্যমে রাশিয়া তার গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন সংগঠনকে ধ্বংস না ক'রে এর পরিবর্তন ঘটাতে এবং একে উন্নততর একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে সমর্থ[৯০]।'

এই প্রসঙ্গে তিনি রাশিয়ার অর্থনৈতিক সংগঠনে একটি উভয়ত্ব লক্ষ করেছেন—সর্বজনীন স্বত্বাধিকার এবং প্রাক্তিজনিক মালিকানার সহ-অবস্থান। এর অর্থ এই নয় যে 'আধা-এশিয়াটিক' রাশিয়া 'অবশ্যম্ভাবীভাবে' সার্ফপ্রথা-ভিত্তিক কোনো সংগঠনের দিকে এগিয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, সার্বিক ও প্রাক্তিজনিক মালিকানার উভয়ত্ব একটি বিকল্পের ইঙ্গিত বহন করে 'হয় এর মধ্যেকার ব্যক্তিগত মালিকানার উপাদানটি সমষ্টিগত উপাদানকে পরাস্ত করবে, না-হয় ঠিক উল্টো[৯১]।' 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার'-এর ১৮৮২ সালের রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকায়ও এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে

> 'যদি রাশিয়ান বিপ্লব প্রতীচ্যের শ্রমিক বিপ্লবের সূচনা করে, যাতে একে অন্যের সম্পূরক হতে পারবে, তাহলে বর্তমান রাশিয়ার সার্বিক ভূমি-স্বত্বই হবে সাম্যবাদ গঠনের প্রথম সোপান[৯২]।'

তর্ক উঠতে পারে, এই সব ইঙ্গিত কেবল রাশিয়ার পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু মার্কস তো নিজেই রাশিয়াকে 'প্রায়-এশিয়াটিক' আখ্যা দিয়েছেন, এবং স্পষ্ট বলেছেন যে রাশিয়ার সর্বজনীন সম্পত্তি সংগঠন 'প্রাথমিক' পর্যায়েরই একটি সংগঠন, তবে এই পর্যায়ের উন্নততম অধ্যায়[৯৩]। সুতরাং মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্যের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের অন্যান্য সংগঠন অর্থাৎ চীন বা ভারতবর্ষের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র একটি সুনিশ্চিত প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। তা ছাড়া, ভারতবর্ষে বৃটিশ ভূমি-বন্দোবস্তকে 'কিম্ভূত (কার্যত অঘন্ত) অর্থনৈতিক পরীক্ষা' হিসাবে মার্কসের মন্তব্য[৯৪]; কৃষিকর্ম ও হস্তশিল্পের উদ্বাহ-বন্ধনে জাত ট্র্যাডিশনাল সম্প্রদায়গুলোর সারগর্ভ 'সংগতি' মার্কসের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য; এবং 'সমবায়ী ও সার্বিক শ্রমের বনিয়াদ হিসাবে সর্বজনীন মালিকানা-প্রথার অর্থনৈতিক উৎকর্ষ' সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস[৯৫] এগুলো সম্ভবত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে

ট্রাডিশনাল সমাজগুলোর প্রতি মার্কসের (পরবর্তী কালের) আসক্তির ইঙ্গিত। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের বিপুলাকার প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্তর্জাত অপচয়ের প্রতিতুলনায় ক্ষুদ্রাকার কারিগরি প্রচেষ্টায় সঞ্চয়ের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, এবং পুঁজিবাদের অতি-পার্থিব আবহাওয়ায় শ্রমিকের যন্ত্রবৎ আচরণের প্রতিতুলনায় সর্বজনীন উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রমের সমবায়ী ও সহযোগিতাপূর্ণ রূপ : মার্কসের এই মনোভাব কি এ-আভাস দিতে পারে যে যদিও ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদ 'বহিরাগত' শক্তি হিসাবে 'এশিয়াটিক' সমাজগুলোর মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে, তথাপি এই সমাজ-গুলো নিজে-নিজেই অনেক বেশি সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারত? সমাজ পরিবর্তন-প্রক্রিয়ায় কোনো 'বাহিরিক' নিমিত্তের—এ ক্ষেত্রে এশীয় সমাজের ভাঙনে ইয়োরোপীয় পুঁজিবাদের—উপর অত্যধিক নির্ভরতা ঠিক সমান গুরুত্বপূর্ণ 'অন্তঃস্থ' কারণকে অশিষ্টভাবে উপেক্ষা করতে পারে, অনেকটা পল্ সুইজির মতনে[১৬]।

খ. 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় উদ্‌বৃত্ত-নিষ্কর্ষক শাসকশ্রেণীর গঠন এবং সেই সম্পর্কে প্রশাসনিক শাসকশ্রেণীর উদ্ভবের সমস্যা।

এশীয় সমাজে উদ্‌বৃত্ত-আহরণে লিপ্ত শাসকশ্রেণীর গঠন সম্পর্কে মার্কস কোনো আলোচনা করেন নি। তবে তাঁর যুক্তি অনুসারে বলা যায় যে সম্রাট, তার আমলাতন্ত্রী এবং জমিদার সম্প্রদায়ই ছিল প্রকৃত উদ্‌বৃত্ত-ভোগী শাসকশ্রেণী। স্বৈরতন্ত্রী সম্রাটের উদ্‌বৃত্ত-উপভোগের উৎস হল মার্কসের 'উচ্চতর সমগ্রতা'র মূর্তি[১৭]। জমিদারদের উদ্‌বৃত্ত-আহরণ প্রসঙ্গে তৃতীয় খণ্ড 'ক্যাপিটাল' এর বিখ্যাত মন্তব্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে[১৮]। তৃতীয়ত, আমলাতান্ত্রিক উদ্‌বৃত্ত-নিষ্কর্ষণ সম্পর্কে মার্কস-উদ্ধৃত বার্নিয়ারের মন্তব্যটি লক্ষণীয় : সরকারের রাজস্ব প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীকে পালন করত। তা ছাড়া ১৮৬১-৬৩ সালের 'উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব'-এ মার্কস রিচার্ড জোন্‌সকে উদ্ধৃত করেছেন : এশিয়ায় বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ও তার কর্মচারীরা ভূমি-রাজস্বের উদ্‌বৃত্ত ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে নিত[১৯]।

'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'য় এই আমলা-প্রথা কিভাবে গড়ে উঠল বা তার প্রকৃত ভূমিকাই বা কী, এ-সম্পর্কে মার্কস কিছুই আলোচনা করেন নি। মার্কস হয়তো বিশ্বাস করতেন, কেন্দ্রীয় সরকারের জলসেচ ব্যবস্থার দায়িত্ব-পালনের মধ্য দিয়ে এই 'এশিয়াটিক' আমলা-প্রথা গঠিত হয়েছে। ১৮৫৩ সালের প্রবন্ধাদিতে এশিয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূ-সংস্থান ও জলবায়ুর ভূমিকার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং জলসেচের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। প্রাচ্য সভ্যতাগুলোর অনগ্রসরতা এবং রাষ্ট্রাদির বিশাল আয়তন—এই দুই কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়মণ্ডলীর পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জল-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংগঠন সম্ভব হয় নি। অতএব এ-দায়িত্ব ন্যস্ত হল সরকার ও তার

আমলা-সংস্থার উপর[১০০]। পরে, ১৯৫৭-৫৮ সালে, উদ্বৃত্ত আহরণের সর্বজনীন নিমিত্ত হিসাবে মার্কস নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বেশ জোর দিয়েছেন : 'জলসেচ ব্যবস্থা (এশীয় জনগণের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), যাতায়াতের বন্দোবস্ত, ইত্যাদি[১০১]।'

ভিট্‌ফোগেল যা-ই দাবি করুন না কেন, মার্কস এর থেকে বেশি কিছু বলেন নি। যে-কারণেই হোক তিনি প্রাচ্যদেশে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা পর্যালোচনায় সচেষ্ট হন নি, যদিও বোনাপার্টিজ্‌ম-এর ব্যাখ্যায় মার্কস হম্বোল্ডীয় আমলাপ্রথার উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় 'সামাজিক-প্রশাসনিক শাসকশ্রেণী' সম্পর্কে এঙ্গেলসের বক্তব্য : একটি অপরিহার্য অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক দায়িত্ব-পালনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্ভাব্য উৎপত্তি এবং ক্রমে এই ক্ষমতার সমাজ-উর্ধ্বস্থ একটি স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরের সম্ভাবনা। প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রে এই ধরনের সামাজিক-প্রশাসনিক ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা এঙ্গেলস স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন তাঁর মতে, এশীয় রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আমলা-সংস্থা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল যে 'সে হল এক অট্টাপ্র্যাক্তার্ যে নদীমাতৃক উপত্যকাগুলোতে সর্বজনীন জলসেচ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য দায়ী। এই জলসেচ-ব্যবস্থা ছাড়া কৃষিকর্ম এখানে অসম্ভব[১০২]।'

উল্লেখ করা অসংগত হবে না, প্রধানত শ্রমিকদের জন্য লিখিত এঙ্গেলসের এই ড্রাইরিং-সমালোচনার খসড়াটি প্রকাশের পূর্বে মার্কস নিজে দেখেছিলেন। অপরিহার্য কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক দায়িত্ব-পালনের মাধ্যমে প্রশাসনিক-পরিচালকগোষ্ঠীর শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে তবে কি মার্কস নিজেও মেনে নিয়েছিলেন? এ-প্রশ্ন নিছক অবান্তর নয়; কিন্তু মার্কসের নিজস্ব শ্রেণী-সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রের পরিচালক-ব্যবস্থাপকগোষ্ঠী হয়তো একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়, বড়জোর দপ্তরি-ভোগী একটি উপশ্রেণী বলে গণ্য হতে পারে, স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসকশ্রেণী হিসাবে কখনই নয়।

মার্কস-তত্ত্বে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বতোজাত সম্পর্কের আদি পর্ব থেকে মানুষের অগ্রগতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গঠনের এক দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা—প্রকৃতির বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির এক সুদীর্ঘ সংগ্রাম। প্রগতির এই বিস্তীর্ণ সংজ্ঞায় 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' মার্কসের পর্যবেক্ষণ-নির্মিত একটি প্রাথমিক পর্যায়। এ সম্পর্কে কিন্তু 'পুঁজিবাদ-পূর্ব অর্থনৈতিক সংগঠন'-এ মার্কসের আলোচনাটি মোটেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় : একটি প্রারম্ভিক মুখবন্ধ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, মার্কস-বর্ণিত এই ঐতিহাসিক পর্যায়টি একটি 'বিশ্লেষণমূলক' নির্মিতি। আজ যদি মার্কসের এই 'এশিয়াটিক' মডেল ভিত্তি ক'রে কোনো ঐতিহাসিক গবেষণা

এই প্রকল্পটির ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে, তাহলে মার্কসেরই ইতিহাস-অন্বেষণ ফলপ্রসূ হবে।

নি র্দে শি কা

১. L. A. Maverick : *China, a Model for Europe*. San Antonio, Texas, 1946 দ্রষ্টব্য।

২. Robert Browning : 'On Stages of Social Development', *Marxism Today*, 5 (1961), পৃ ৩১৯।

৩. E. T. C. Werner (compd.) : *Descriptive Sociology, or, Groups of Sociological Facts, Classified and Arranged by Herbert Spencer. Chinese.* (Henry Todder ed., London, 1910)।

৪. Adam Smith : *Wealth of Nations*, New York, Modern Library edn. 1937, পৃ ৬৪৫-৪৭, ৭৮৯-৯০।

৫. James Mill : *The History of British India*, London, 1820 ; vol. I, পৃ ১৭৫ ও তৎপরবর্তী এবং vol. II, পৃ ১৭৫ ও তৎপরবর্তী পৃ ১৮৬।

৬. Richard Jones : *An Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation*, London, 1831, পৃ ৭ ও তৎপরবর্তী, পৃ ১০৯ ও তৎপরবর্তী, পৃ ১১১-তে 'এশিয়াটিক সমাজ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. John Stuart Mill *Principles of Political Economy*, London, 1909, পৃ ১২-২০।

৮. R. Bendix : *Max Weber : An Intellectual Portrait*, London, 1960, পৃ ২৮১।

৯. Hans H. Gerth & C. Wright Mills : *From Max Weber Essays in Sociology*, London. 1948, পৃ ৪৪০।

১০. তুলনীয়, Hans H. Gerth (trans.) : *The Religion of China*, Glencoe, 1951, পৃ ১৬।

১১. দ্রষ্টব্য, E. R. Leach : 'Hydraulic Society in Ceylon', *Past & Present*, Oxford, 15, 1959।

১২. George Lichtheim : 'Marx and the *Asiatic Mode of Production*', *St. Antony's Papers*, 14, London, 1963। আরো দ্রষ্টব্য তাঁর *Marxism*, London, 1961, পৃ ৩৮৫।

১৩. Karl Marx : *Pre-Capitalist Economic Formations*, ed. & intrn., Eric Hobsbawm ; trans. Jack Cohen, London। অতঃপর শুধু *Formen* নামে উল্লিখিত।

১৪. V. I. Lenin : *National Liberation Movement in the East*, Moscow, 1957, পৃ ৪৪।

১৫. প্রবন্ধের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত, Karl Wittfogel-এর গ্রন্থ (পৃ ৩৮৯) থেকে উদ্ধৃত। লেনিন

সম্পর্কে ভিট্‌ফোগেল অভিযোগ করেছেন যে তিনি 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা'র প্রকৃত মার্কসীয় ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। দৃষ্টান্ত-সর্বস্ব এ-অভিযোগের যুক্তি প্রশ্নন (ঐ, পৃ ৩৮৯-৪০০) মোটেই সুবদ্ধ নয়।

১৬. Eric Hobsbawm : intron., *Formen*, পৃ ৩০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। হব্‌সবাম্ লিখেছেন 'এশিয়াটিক ব্যতিক্রমবাদ'-কে অনুপ্রাণিত করা হতে পারে এবং (পশ্চিমের) / সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব প্রতিরোধ যথেষ্ট-দৃঢ় সংগ্রামকে নিরুৎসাহিত করা হতে পারে – এই ভয়ই ছিল ১৯০০-পরবর্তী আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পক্ষে মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' বর্জনের জোরালো ও সম্ভবত চূড়ান্ত কারণ।' এই ধরনের যুক্তি, নিঃসন্দেহে, অত্যন্ত সমাসুভূতিপূর্ণ ব্যাখ্যা (?)।

১৭. 'Dialectical and Historical Materialism', *History of the Communist Party of the Soviet Union, Bolsheviks*, Short Cource, Moscow, 1939, পৃ ১১৮ ও তৎপরবর্তী।

১৮. ঐ, পৃ ১৩১।

১৯. Benjamin, I. Schwartz : *Chinese Communists and the Rise of Mao*. Harvard, 1951, পৃ ১২২ ও তৎপরবর্তী।

২০. Mao Tse-Tung : *Selected Writings*. Peking, 1955, পৃ ১৩ এবং ৭ম পরিচ্ছেদ।

২১. ঐ, পৃ ৪২ ও তৎপরবর্তী।

২২. Lu Chen-yu : 'চুং-কুয়ো শে-হুই-শি চু ওয়েন্-তিই' পৃ ২, ৩১ ও অন্যান্য। এটি উদ্ধৃত হয়েছে, Albert Feuerwerker : 'China's Histoty in Marxian Dress' নিবন্ধে – *American Histrical Review*, 66 (1961), পৃ ৩৩৯।

২৩. S. Tolstov : 'For Advanced Oriental Studies', *Kaltura i zhizn*, 11 August 1950। অনূদিত, *Current Digast of the Soviet Press*, Vol IX. No. 33, পৃ ৩-৪।

২৪. Clemens Dutt (ed.) *Fundamentals of Marxism-Leninism*. Second edn.. Moscow, 1963, পৃ ১২৫।

২৫. Fan Wen-lan : 'শি সুন্ চুং-কুয়ো সু চীন্-হান্ শি চে:-ওয়ে তুং-ই কুয়ো-চিয়া তি ইয়ুনান্-ইন্' (চীন-হান্ কাল থেকে চীন দেশ কেন অবিভক্ত ছিল সে সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা), 'লি-শি ইয়েন্-চিউ' (ঐতিহাসিক অনুশীলন), No. 3, 1954, পৃ ১৩-২৪। উদ্ধৃত, Albert Feuerwerker, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৬. Yang Hsiang-K'uei : 'চুং-কুয়ো লি-শি কেন্-চি ওয়েন্-তিই' (চীন-ইতিহাসকে পর্যায়-বদ্ধ করার সমস্যা), 'চুং-কুয়ো তি সু-লি-চি ইং কে:-চিয়েন্-চি কোন্-চি ওয়েন্-তিই সুন্-ওয়েন্ ওয়ান্-চি' (চীনে দাস ও ফিউডাল যুগ বিষয়ে সংগৃহীত প্রবন্ধাবলি), Peking, 1956 : উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

২৭. স্তালিনীয় প্রভাবে ভারতবর্ষের বহু মার্কসবাদীও এককালে নিজেদের দেশের সমাজ-সংগঠনের ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা একেবারে বিস্মৃত হয়েছিলেন। S. Dange : *From Primitive Communism to Slavery* বিখ্যাত বইখানি এই আত্মবিস্মৃতির প্রধান নিদর্শন। ইদানীং 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহল লক্ষ করা যায় যথা, E. M. S. Namboodiri-pad : *National Question in Kerala*, Bombay, 1952।

২৮. Joan Simon : Report of the discussion on 'Stages of Social Development', *Marxism Today*, 6 (1962), পৃ ১৮৩-১৮৮।

২৯. যদিও 'নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন্' (১৮৪১-১৯২৪)-এর সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের সংযোগ প্রায় দশ বছর (আগস্ট ১৮৫৩ – মার্চ ১৮৬২), একমাত্র ১৮৫৩ সালের কয়েকটি প্রবন্ধেই তাঁরা 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন।

৩০-৩২. *Formen*, যথাক্রমে পৃ ৯৯, ৯৬, ৬৮।

৩৩. ঐ, পৃ ৬৯। এ-কথা সত্য যে সম্পত্তি অর্থাৎ দখলীকরণ (appropriation) আদিতে ছিল 'চলমান' (mobile), কেননা মানুষ তখন আহরণ ক'রে বেড়াত এই ধরিত্রীর সাজানো ফলমূল, এমন কি জন্তুজানোয়ারও – বিশেষ ক'রে যেগুলো পোষ-মানানো সহজ। কিন্তু এই অবস্থাও – শিকারে বা পশুপালনে বা ফলমূল আহরণে জীবনধারণ – তো ধরিত্রীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক ধরনের দখলীকরণ (ঐ, পৃ ৯০)।

৩৪-৩৯. ঐ, যথাক্রমে পৃ ৮১-৮২, ৭৯, ৬৯, ৭০, ৭৫, ৭০ (এবং ৮৩, ৯১, ৯৩, ৯৪)।

৪০. *New York Daily Tribune*, (অতঃপর *N. D. T*) ২৫ জুন ১৮৫৩। Karl Marx & F. Engels, *Selected Works*, (অতঃপর শুধু *Selected Works*) Vol I, (Moscow, 1951) থেকে উদ্ধৃত।

৪১-৪৪. *N. D. T*, যথাক্রমে ৮ আগস্ট ১৮৫৩, ২৫ জুন ১৮৫৩, ঐ, ৮ আগস্ট ১৮৫৩।

৪৫. Karl Marx : *Capital*, Vol III, (Moscow 1960), পৃ ৩২৮ ; Vol I, পৃ ৩৭৪।

৪৬-৪৭. *Formen*, যথাক্রমে পৃ ৯৪ ও ৭৭-৭৮।

৪৮ *N. D. T.* ২৫ জুন ১৮৫৩। এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটির উৎস হল G. Campbell : *Modern India*, (লণ্ডন, ১৮৫২), পৃ ৮৪-৮৫।

৪৯. Karl Marx : *Capital*, Vol I, (Moscow, 1932), পৃ ৩৭৬ ; উদ্ধৃতি ইংরাজিতে অনূদিত, T. B. Bottomore & Maximillian Rubel : *Karl Marx*, Pelican Edn., 1963, পৃ ১২৩।

৫০. *Formen*, পৃ ৬৮।

৫১. *N. D. T*, ২৫ জুন ১৮৫৩।

৫২. Karl Marx : *Capital*, Vol I, পৃ ৩৭৯।

৫৩. *Formen*, পৃ ৮৩।

৫৪. F. Engels : *Herr Eugen Duhring's Revolution in Science*, Moscow, 1954, পৃ ২৫১।

৫৫-৫৮. *N. D. T*, যথাক্রমে ২৫ জুন ১৮৫৩, ৮ আগস্ট ১৮৫৩, ২৫ জুন ১৮৫৩, ৮ আগস্ট ১৮৫৩।

৫৯-৬০. *Formen*, পৃ ৯৩ ও পৃ ৭০।

৬১. Karl Marx : *Capital*, Vol I, পৃ ৩৭৬।

৬২. ঐ, Vol III, (Moscow, 1960), পৃ ৩২৮।

৬৩. *Selected Works*, (Moscow 1951), পৃ ৩২৯।

৬৪-৬৬. *Formen*, যথাক্রমে পৃ ৯৫, ১৪২, ১৪৪।

৬৭. প্রসঙ্গত, দাস ও সার্ফ-প্রথার উপর গঠিত বিভিন্ন সমাজকে মার্কস অনু-সমৃত বা দ্বিতীয় (secondary) পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

৬৮-৭৫. *Formen*, যথাক্রমে পৃ ৯৭, ৭০, ৮৮, ১৪৪, ১৪৩, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৫।

৭৬. Karl Marx : *Capital*, Vol I, পৃ ৩৫০।

৭৭. *Formen*, পৃ ৯১-৯২।

৭৮. *Selected Correspondence* (Marx & Engels), পৃ ৯৯।
৭৯. *N. D. T.*, ৮ আগস্ট ১৮৫৩।
৮০. *Formen*, পৃ ৬৯।
৮১. Karl Marx : *Capital*, Vol III, পৃ ৭৭১-৭২।
৮২-৮৩. *N. D. T.*, ৭ জুন ১৮৫৮ এবং ৩ ডিসেম্বর ১৮৫৯।
৮৪. Karl Marx : *Capital*, Vol III, পৃ ৭৭২।
৮৫. '...ভূমির সর্বজনীন মালিকানা বা প্রসঙ্গত চীনের আদি সংগঠন ছিল।' (ঐ, পৃ ৩২৮), অর্থাৎ 'আদি' সংগঠন, 'বর্তমান' সংগঠন নয়।
৮৬-৮৮. *Formen*, যথাক্রমে পৃ ৪১-৪২, ৭০, ৩৪।
৮৯. *N. D. T.*, ২৫ জুন ১৮৫৩।
৯০-৯১. *Formen*, পৃ ১৪২ ও ১৪৫।
৯২. *Selected Works*, Vol. 1, পৃ ২৪।
৯৩. *Formen*, পৃ ১৪২ (
৯৪. Karl Marx : *Capital*, Vol III, পৃ ৩২৮ (পাদটীকা)।
৯৫. *Formen*, পৃ ১৪৩।
৯৬. দ্র. *Science and Society* (New York) পত্রিকায় ফিউডালিজ্‌ম থেকে ক্যাপিটালিজ্‌মে রূপান্তর সম্পর্কে অধুনা-খ্যাত বিতর্কে পল সুইজি-র বক্তব্য। এই বিতর্কের প্রবন্ধগুলো একটি ভারতীয় সংস্করণে সংকলিত হয়েছে [Peoples Book House, Patna, 1957]।
৯৭. *Formen*, পৃ ৬৯ ও অন্যান্য।
৯৮. Karl Marx : *Capital*, Vol III, পৃ ৭৭১।
৯৯. Richard Jones : *Literary Remains, Consisting of Lectures and Tracts on Political Economy* (London, 1859), ৪৪ ও পরবর্তী।
১০০. *N. D. T.*, ২৫ জুন ১৮৫৩।
১০১. *Formen*, পৃ ৭০ ও পরবর্তী।
১০২. F. Engels ; op. cit., পৃ ১১০ ও পরবর্তী এবং পৃ ২৪৯।

জোসেফ নীডহ্যাম

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ

১৯৩৮-এর কাছাকাছি যখন আমি প্রথম চীনা সাংস্কৃতিক অঞ্চলের[১] বিজ্ঞানের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং যন্ত্রকৌশল তত্ত্বের (প্রযুক্তিতত্ত্ব, technology) ধারাবাহিক, তথ্যগত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখার কথা ভাবি, তখন নিহিত সমস্যাটি মনে করেছিলুম : কেন আধুনিক বিজ্ঞান (যা আমরা + সপ্তদশ শতক, গ্যালিলিওর সময়, থেকে জেনেছি) কেবলমাত্র ইয়োরোপেই গড়ে উঠেছে, চীনা (বা ভারতীয়) সভ্যতায় নয় ? কালক্রমে আমি যখন অবশেষে চীনা বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ে কিছু-কিছু জানতে শুরু করেছি[২], আমি বুঝতে পারলাম যে, দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন আছে যা ন্যূনপক্ষে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ ; যা হল : কেন চীনা সভ্যতা (−)প্রথম ও (+)পঞ্চদশ শতকের মধ্যে, মানুষের ব্যাবহারিক প্রয়োজনে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান প্রয়োগে প্রতীচ্যের চেয়ে অনেক বেশি নিপুণ ছিল ? আমি এখন বিশ্বাস করি, এ-সমস্ত প্রশ্নের জবাব মেলে প্রধানত বিভিন্ন সভ্যতার সামাজিক, মানসিক ও অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে। চীন এবং ইয়োরোপের তুলনা বিশেষভাবেই জ্ঞানপ্রদ, যাকে বলা চলে প্রায় টেস্ট-বেড পরীক্ষা, কারণ আবহাওয়ার গোলমেলে সূত্রটি এতে পড়ে না ;

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে চীনের সংস্কৃতি-অঞ্চলের জলবায়ু ইয়োরোপের সমতুল্য। এ-কথা কারো পক্ষে বলা সম্ভবপর নয় (ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে) যে, অস্বাভাবিকভাবে উষ্ণ জলবায়ুর পরিবেশ আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে[৩]। যদিচ বিভিন্ন সভ্যতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উদ্‌বর্তনে প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ুর অবস্থা নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা নিয়েছিল, তবু ভারতীয় সংস্কৃতিতে আমি এমন বক্তব্যের ন্যায্যতা মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী নয়। বস্তুত, চীনের ক্ষেত্রেও এই প্রস্তাবনা অচল।

শুরু থেকেই আমি, বিস্তর লোককে খুশি করেছে এমন সব 'ভৌম-নৃতাত্ত্বিক' (physical-anthropological) বা 'জাতিগত-আধ্যাত্মিক' (racial-spiritual) কার্য-কারণের কোনো একটিরও ন্যায্যতা বিষয়ে গভীরভাবে সন্দিগ্ধ ছিলাম। প্রথম যখন চীনা বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসি তখন থেকেই আমার বিগত তিরিশ বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা ঐ সংশয়কে পুষ্টই করেছে। তারা পুরোপুরি *di nostra qualita* বলে প্রমাণিত হয়েছে, বহু শতাব্দী আগে যেমন মন্টি কর্ভিনোর জন (John of Monte Corvino) বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহাসিক বিভিন্নতাকে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যাখ্যা করা যায় এবং একসময়ে তা হবেও। যখন অন্য সমস্ত কৌম (ethnic) সাংস্কৃতিক নদীর মতো তারা আধুনিক বিজ্ঞানের সাগরসঙ্গমে এসেছিল, তারও পূর্বেকার চীনা বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলতত্ত্বের সার্থকতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমি যতোই অনুপ্রবেশ করেছি ততোই স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র ইয়োরোপেই সমুত্থানের কারণ জড়িত ছিল রেনেসান্স-কালীন বিশেষ সামাজিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এবং তাকে কোনোক্রমেই চীনা মন বা চীনা মানসিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের কোনো অসম্পূর্ণতা দ্বারা কখনোই ব্যাখ্যা করা যায় না। খ্রীষ্টীয় বিশ্ববীক্ষার চাইতে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বরং এ অনেক বেশি খাপ খায়। এমন একটা দৃষ্টিকোণ মার্কসীয় বা অ-মার্কসীয় হতে পারে আমার কাছে তা জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পড়াশুনার উপর দাঁড়িয়ে।

সুতরাং বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের প্রয়োজনে, ইয়োরোপের অভিজাত সামরিক সামন্ত-প্রথার সঙ্গে, যার গর্ভ থেকে রেনেসান্স ও রেফার্মেশন-সহ সওদাগরি এবং পরে শিল্প-নির্ভর পুঁজিবাদ জন্মাতে পেরেছে, মধ্যযুগীয় এশিয়ার বৈশিষ্ট্যযুক্ত অন্য জাতের সামন্ত-প্রথার (যদি তা সত্যি থেকে থাকে) কিছু মৌলিক পার্থক্য বিষয়ে আমাদের নজর রাখতে হবে। বিজ্ঞানের ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে ইয়োরোপে যা ছিল তা থেকে যেমন করেই হোক আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক কিছু রাখতে হবে, আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য। এ-কারণেই, সমস্ত সভ্যতাকে 'অবশ্যই পার হতে হবে' এমন সামাজিক ক্রমবিকাশের স্তরের দৃঢ় ও একক এক সূত্র-সন্ধানরত মার্কসীয় চিন্তার অপর একটি ধারার প্রতি আমি সহানুভূতিশীল হতে পারি নি।

এদের আদি পর্যায়, 'আদিম গোষ্ঠীবদ্ধতাবাদ' (Primitive Communalism) প্রত্যয়টি প্রচুর বিতর্ক তুলেছে। যদিও এই পর্যায়টি সাধারণত অধিকসংখ্যক পশ্চিমা নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাতিল করেছেন (অবশ্য গর্ডন চাইল্ডের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও আছেন), আমার কাছে সর্বদাই শ্রেণীবিভাগ-পূর্ব-সমাজের একটা পর্যায়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা বিশেষভাবে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে,

এবং আমার প্রাচীন চীনা সমাজের গবেষণায় আমি দেখেছি যে, তা বারবার কুয়াশার মধ্য দিয়ে সবিশেষ উপস্থিত হচ্ছে। কাহিনীর অন্যদিকে তেমনি সামন্ত-প্রথা থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তরে মূলত কোনো অসুবিধে নেই, যদিও অবশ্য লতায়-পাতায় তা খুবই জটিল এবং এখনও অনেক কিছু সমাধান করতে হবে। বিশেষত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশের সঠিক সম্পর্ক, অর্থাৎ প্রাকৃতিক ঘটনার ধারাবাহিক পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধানে, গাণিতিক অনুমানের (mathematised hypotheses) সার্থক প্রয়োগ অনায়ত্ত থাকছে। তাবৎ ঐতিহাসিকরা, তাঁদের তাত্ত্বিক ঝোঁক এবং সংস্কার যাই হোক না কেন, সাধারণত অনেক কষ্টে মানেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উত্থান ঘটেছে রেনেসান্স, রিফরমেশন ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের পাশাপাশি[৪]—একদিকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও অপরদিকে 'নতুন বা পরীক্ষামূলক' বিজ্ঞানের সাফল্য, এই দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কে মনস্থির করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। এই বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়, যেমন 'উচ্চ কারিগর সংস্থা'র (higher artisanate) গভীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এই সময়ে তার শিক্ষিত বিদ্বৎ-সমাজে স্বীকৃতি[৫]; কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধটি সে-আলোচনার স্থান নয়, যেহেতু আমরা অন্য কিছুর সন্ধানে আছি। আমাদের কাছে জরুরি প্রসঙ্গ হল এই যে, ইয়োরোপেই আধুনিক বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, অন্য কোথাও নয়।

চীনের সঙ্গে ইয়োরোপের অবস্থা তুলনা করলে সবচেয়ে বড় এবং দুর্বোধ্য সমস্যা হল : ক. কেমনভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত চীনা মধ্যযুগীয় সামন্ত-প্রথা (এটাই যদি তার সঠিক শব্দ হয়) ইয়োরোপীয় সামন্ত-প্রথা থেকে পৃথক এবং খ. ক্লাসিকাল গ্রীস ও রোমের সদৃশ কোনো 'দাস-সমাজের' মধ্য দিয়ে কি চীন (অথবা এমনকি ভারতবর্ষ) কখনও পার হয়েছে? বস্তুত প্রশ্নটা শুধুমাত্রই এই নয় যে দাস-প্রথা ছিল কিনা। ওটা নিছকই ভিন্ন ব্যাপার, কিন্তু জিজ্ঞাস্য, সমাজের ভিত্তি কখনো তার উপর ছিল কি না।

আমার অল্প বয়সে যখন হাতেকলমে জৈব-রাসায়নিক (biochemist) ছিলুম, কার্ল. এ. ভিট্‌ফোগেলের গ্রন্থ *Wirtschaft und Gesellschaft Chinas* আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এটা যখন লেখা হয়েছে তখন লেখক হিটলার-পূর্ব জার্মানির গোঁড়া মার্কসবাদী ছিলেন[৬]। তিনি বিশেষ ক'রে উৎসাহী ছিলেন 'এশীয় আমলাতন্ত্র' (Asiatic bureaucratism) প্রত্যয়টি গড়ে তুলতে, অথবা আমি যেমন দেখেছি, কিছু চীনা ঐতিহাসিক যাকে পরবর্তীকালে 'আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র' (bureaucratic feudalism) বলেছেন। শব্দটির উদ্ভব স্বয়ং মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা থেকেই। তাঁরা আবার অংশত নির্ভর করেছিলেন, বা যোগাড় করেছিলেন, ভারতের মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চিকিৎসক সপ্তদশ শতকের ফরাসি ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়েরের মন্তব্যের উপর, বা মন্তব্য

থেকে[৭]। মার্কস ও এঙ্গেলস 'এশীয় উৎপাদন রীতির' (Asiatic mode of production) বিষয়ে বলেছেন। কেমন সঠিকভাবে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং বর্তমানে কেমন সঠিকভাবে তার সংজ্ঞা দেওয়া যায় বা দেওয়া উচিত, প্রতিটি দেশেই আজকাল তা আবার উত্তেজিত আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, জন্মগত নয় এমন 'এলিট' (élite)-পরিচালিত, চরিত্রে মূলতই আমলাতান্ত্রিক এক রাষ্ট্র, যার ভিত্তি ছিল কৃষি ও শিল্পে সম্পূর্ণ শ্রম-বিভাগহীন বা সামান্য শ্রমবিভাগসহ প্রভূত গোষ্ঠীচরিত্র-জারিত, তুলনায় অনেক বেশি স্বয়ং-শাসিত কৃষক-সম্প্রদায়ের বিরাট এক অংশের উপর। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের জন্য, অর্থাৎ রাজা বা সম্রাটের রাজসভা এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী-বহরের জন্যে কর-সংগ্রহই ছিল এখানে শোষণের পদ্ধতি। বস্তুত রাষ্ট্রযন্ত্রের স্থাপনা ছিল দ্বিবিধ, একদিকে তা সমগ্র এলাকার নিরাপত্তা সংগঠিত করেছিল (তা সে প্রাচীন 'সামন্ততান্ত্রিক' রাষ্ট্র বা পরবর্তীকালে সমগ্র চীনা সাম্রাজ্যই হোক না কেন) অপরপক্ষে জন-প্রকল্প (public works) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংগঠিত করেছিল। প্রতিবাদের ভয় না ক'রেও বলা চলে, সমগ্র চীনা ইতিহাস জুড়ে তুলনায় প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয় কর্মটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং অনেক কিছুর মধ্যে ভিট্‌ফোগেল এটা নজর করেছিলেন। ক. বৃহৎ নদনদীর সংরক্ষণ, বন্যাত্রাণ ইত্যাদি ধরনের কাজ, খ. সেচের জন্য জলের ব্যবহার, বিশেষ ক'রে ভিজা ধান চাষ এবং গ. রাজধানী ও শস্যভাণ্ডারের কেন্দ্রগুলিতে ফসল-কর (tax-grain) আনার জন্য দূরবিস্তৃত খাল-পরিবহণব্যবস্থার উন্নতি – এই সমস্ত উদ্দেশ্যে দেশের ভূসংস্থান (topography) ও কৃষির প্রয়োজন সূচনা থেকেই এক বিরাট জলসঞ্চয় ব্যবস্থাবলির পত্তন করেছিল। চীনে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি নায়ক (culture hero) ছিলেন যে-কোনো একজন হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার[৮]। এ সব কিছুই কর-শোষণের সঙ্গে বেগার (corvée) শ্রম আদায়ের ব্যবস্থা তৈরি করেছিল এবং যে-কেউ বলতে পারে রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি স্বয়ং-শাসিত কৃষক সম্প্রদায়ের একমাত্র কর্তব্য ছিল কর দেওয়া এবং জনসাধারণের প্রয়োজনমতো শ্রম-ক্ষমতা যোগানের ব্যবস্থা কর।[৯]। এ-ছাড়াও উৎপাদনের সাধারণ সংগঠনব্যবস্থার দায়িত্ব আমলাতন্ত্র নিজেই নিয়েছিল ; অর্থাৎ মোদ্দা কৃষিনীতির পরিচালনা, এবং এই কারণেই এই জাতীয় সমাজের রাষ্ট্রযন্ত্রটি বর্তমানে 'একটি অর্থনৈতিক উচ্চপরিচালক' (high command) রূপে আখ্যা পাচ্ছে। একমাত্র চীনের ক্ষেত্রেই অতি প্রাচীন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সন্ন খুঙ্, সন্ন থু, এবং সন্ন হুঙ্ (কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য জনগোষ্ঠীর পরিচালকদের) দেখা যায়। মনে রাখতে হবে(–)পঞ্চম শতকে লবণ ও লৌহ (সর্বত্র উৎপাদন সম্ভব না হওয়ায় দুটি পণ্যই চলাচল করেছে) উৎপাদনের 'জাতীয়করণের' প্রস্তাব হয়েছিল এবং (–) দ্বিতীয় শতকে পুরোমাত্রায় তা কার্যকর হয়। হান্ আমলেও একটা সরকারি

মাদক-পানীয় কর্তৃপক্ষ (Fermented Beverages Authority) ছিল ; এবং পরবর্তী রাজবংশাবলির অধীনেও এমন আমলাতান্ত্রিক শিল্প-সংস্থার প্রচুর উদাহরণ মেলে[১০]।

আরো গভীরে তাকালে এই অবস্থার আরো অনেক দিক নজরে পড়ে ; যেমন, কৃষকের উৎপাদন, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানায় ছিল না, ছিল জন-সাধারণের নিয়ন্ত্রণে এবং জ্ঞানত সাম্রাজ্যের সমস্ত জমিই ছিল নিছক সম্রাটেরই অধিকারে। প্রথমটায় মনে হয় প্রত্যেক পরিবার নিশ্চিন্তে যেন একটা ভূসম্পত্তির মালিক, কিন্তু পশ্চিমের সামন্ততান্ত্রিক রায়তীস্বত্বের (fief) সঙ্গে একভাবে তুলনীয় এই প্রথা চীনের ইতিহাসে কখনই গড়ে ওঠে নি, যেহেতু চীনা সমাজ পশ্চিমের অগ্রজ জন্মাধিকার (primogeniture)-প্রথা রক্ষা করে নি। ফলে, প্রতিটি পরিবারের কর্তার মৃত্যুতে স্বত্বাধীন সমস্ত জমিকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে হতো। এই সমাজে আবার নগর-রাষ্ট্রের ধারণাও পুরোপুরি অনুপস্থিত ছিল ; নগরগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই তৈরি করা হয়েছিল প্রশাসনিক জালের গ্রন্থির মতো, যদিও তারা নিঃসন্দেহে প্রায়শই কেনাবেচার কেন্দ্র (বাজার)-রূপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে চেয়েছে। প্রতিটি শহরই ছিল সম্রাট বা রাজার নামে বে-সামরিক শাসক ও সামরিক কর্মচারীদের দ্বারা অধিকৃত সুরক্ষিত নগর। চীনা সমাজে সামরিক অপেক্ষা অর্থনৈতিক কৃত্য (function) এতোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দুর্গস্থিত সেনাপতির চাইতে শাসনকর্তা অনেক বেশি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। শেষে স্থূল কথাটা হচ্ছে এই, কৃষি উৎপাদনে দাসেদের ব্যবহার ছিল না, এমন কি শিল্পেও বিশেষ কিছু নয় ; দাস-প্রথা ছিল প্রধানতই গৃহগত (domestic), অথবা কেউ কেউ বলবে, বিভিন্ন যুগব্যাপীই তার চরিত্র পিতৃতান্ত্রিক[১১]।

বিকাশের পরবর্তী উন্নত রূপগুলোতে, যেমন তাঙ্ অথবা সুঙ্ চীনে দেখা যায়, 'এশীয় উৎপাদনরীতি' একটা সামাজিক বিন্যাসে পরিণত হয়েছিল, এবং অধিকাংশ সম্পদই কৃষি-শোষণনির্ভর থাকার কারণে সংকীর্ণ অর্থে মূলতই 'সামন্ত-তান্ত্রিক' হলেও[১২] কার্যত তা ছিল আমলাতান্ত্রিক, সামরিক-আভিজাতিক (military-aristocratic) নয়। চীনা ইতিহাসে নাগরিক জীবনের মৌল প্রাণ-সত্তার (ethos) গভীরতা না-বাড়িয়ে দেখে উপায় নেই। জায়গিরদার সামন্তদের (enfeoffed barons) স্তরপরম্পরার মধ্যে দিয়ে নয়, রাজকীয় ক্ষমতার ব্যবহার হতো যৎপরোনাস্তি বিস্তৃত জনপালন-কৃত্যকের (civil service) মারফৎ, যাকে পশ্চিমীরা জানে 'মান্দারিন্ প্রথা' (mandarinate) নামে, যা ভূমিস্বত্বে, জন্মগত উত্তরাধিকারের নীতিতে চলতো না, প্রতিপুরুষে নতুন ক'রে নিযুক্ত হতো। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আমার প্রায় তিরিশ বছরব্যাপী চীনা সংস্কৃতির চর্চায় অন্য সব প্রত্যয়ের চাইতে এগুলোই চীনা সমাজ বুঝতে বেশি সাহায্য করেছে।

আমার বিশ্বাস অনেকটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানো যাবে, কেন এশীয় 'আমলা-তান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র' গোড়ায় প্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রসার ও মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তি-বিদ্যায় তাকে ব্যবহারের আনুকূল্য করেছিল, যদিচ অবশেষে তা আধুনিক পুঁজিতন্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশকে অবরুদ্ধ করেছে,—কিন্তু ইয়োরোপে অন্য ধরনের সামন্ততন্ত্র, আমার মতে, সমাজের নতুন সওদাগরি ব্যবস্থার পর্যায়-ক্রমে ধ্বংস ও উজ্জীবনের দ্বারা, উক্ত বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতাই করেছিল। প্রধানতই সওদাগরি সমাজব্যবস্থা চীনা সভ্যতায় কখনো জন্মাতে পারে নি, যেহেতু 'মান্দারিন্' প্রথার মূলমন্ত্র কেবল জন্মগত আভিজাতিক সামন্ততন্ত্রের নীতিরই নয়, ধনী সওদাগরদের মূল্যপদ্ধতিরও বিরোধী ছিল। চীনা সমাজে নিশ্চয়ই পুঁজি সঞ্চিত (accumulation) হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু নিয়ত উৎপাদনশীল শিল্পপ্রয়াসে পুঁজির প্রয়োগকে বিদ্বান-আমলারা (scholar-bureaucrats) অবিরত বাধা দিয়েছে। তাদের সার্বভৌমত্বকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে এমন যে-কোনো সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রেই এটা ঘটত, ফলে চীনের সওদাগরি সংস্থাগুলো (guilds) কখনো ইয়োরোপীয় সভ্যতায় নগর-রাষ্ট্রের সওদাগরি সংস্থার ক্ষমতা ও মর্যাদার তুল্য কিছু লাভ করতে পারে নি।

অনেক দিক থেকেই আমি বলতে রাজী আছি যে মধ্যযুগের ইয়োরোপ থেকে মধ্যযুগীয় চীনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনেক বেশি যুক্তি-নির্ভর (rational) ছিল। সুদূর দ্বিতীয় শতকে সৃষ্ট আমলাতন্ত্রে প্রবেশের রাজকীয় পরীক্ষা 'উদ্ভিন্ন মনীষার সুপারিশ' (recommendation of outstanding talent) নামক যুগ-প্রাচীন রীতির সঙ্গে মিলে এমন ঘটিয়েছিল যে মান্দারিন্-ব্যবস্থা দু-হাজার বছরের উপর নিজের মধ্যে জাতির (এবং জাতি ছিল পুরো উপমহাদেশটাই) সমস্ত সেরা মস্তিষ্ককে আবিত করেছে[১৩]। এটা ইয়োরোপীয় চিত্রের সঙ্গে একেবারেই মেলে না—সেখানে সামন্ত প্রভুদের পরিবারে বা সামন্ত প্রভুদের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের আরো সংকীর্ণ চৌহদ্দিতে, সেরা মস্তিষ্ক জন্মাবার বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল কিনা সন্দেহ। আদি মধ্যযুগে ইয়োরোপীয় সমাজেরও নিশ্চয়ই কিছু-কিছু আমলাতান্ত্রিক চরিত্র ছিল, উদাহরণত যেমন, 'কাউন্টে'র পদ, যে সংগঠন থেকে তৈরি হয়েছে 'লর্ড-লেফ্‌টেনান্টের' পদ, এবং রাজার অধীনে বিশপ ও পাদ্‌রিদের রীতিমতো একটা প্রথা হিসেবে প্রশাসকরূপে কাজে লাগানো; কিন্তু চীনা সংগঠন যেমন প্রশাসক-মনীষাকে প্রণালীবদ্ধভাবে পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে পেরেছে এগুলো তার ধারে কাছেও আসতে পারে নি।

অধিকন্তু প্রশাসনিক মনীষাকে শুধুমাত্র যে সামনে আনা হয়েছে এবং যথাযোগ্য স্থানে বসানো হয়েছে এমনই নয়, উপরন্তু কনফুসীয় প্রাণসত্তা (ethos) ও আদর্শ এতোই পরাক্রান্ত ছিল যে বিদ্বান-বাবু (scholar-gentry) নয় এমন ব্যক্তিদের প্রধান প্রতিনিধিরা, বেশির ভাগ সময়েই, জীবনে তাদের অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থান

সম্পর্কে সচেতন থেকেছে। সম্প্রতি এক বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদে যখন আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন কেউ-একজন আমাকে চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছিলেন : 'এমন কী করে সম্ভব হল যে চীনের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে সামরিক ব্যক্তিরা জনপালন কর্মচারী (civil officials) থেকে তাদের হীনতাকে মেনে নিলেন?' বস্তুত, 'অসির দাপট'ই তো অন্যান্য সভ্যতায় প্রবল থেকেছে। জবাবে তক্ষুনি যা আমার মনে এল তা হচ্ছে আমলাতন্ত্র-নির্বাহিত রাজকীয় 'দৈবানুগ্রহ' (*charisma*),[১৪] লিখিত লিপির (character) পবিত্রতা, (যখন আমি প্রথম চীনে যাই তখনো প্রত্যেক মন্দিরে লিখিত শব্দ-সম্বলিত যে-কোনো কাগজই সম্মানের সঙ্গে পোড়াবার চুল্লি দেখতে পাওয়া যেত), এবং এই চীনা বিশ্বাস অসি জয় করে বটে, কিন্তু রক্ষা করে একমাত্র ন্যায়তত্ত্ব (logos)। প্রথম হান্ সম্রাট সম্পর্কে একটা চালু গল্প আছে : গোড়ায় গোড়ায় রাজসভার জন্য তাঁর অনুচর দার্শনিকদের পরিকল্পিত বিস্তৃত কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি খুব বিরক্ত ছিলেন ; কিন্তু একদিন যখন তাদেরই একজন তাঁকে শোনালো, 'আপনি তো ঘোড়ার পিঠে সাম্রাজ্য জয় করেছেন, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে থেকেই কখনো তা শাসন করতে সক্ষম হবেন না।' তখন থেকেই ঐসব অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ প্রায় পূজা-পার্বণের গরিমায় (liturgical magesty) প্রকাশ হতে পেরেছিল[১৫]। সাবেক আমলে চীনা নেতা প্রায়শই ছিলেন একাধারে বড়ো কর্মচারী ও সেনাপতি, কিন্তু নজর করার মতো হচ্ছে ফৌজী লোকদের মনস্তত্ত্ব, তারা নিজেরাই নিজেদের হীনতা মেনে নিত। প্রায়শই তারা হতো 'ব্যর্থ জনপালক' (civilians)। 'অবশ্য সমস্ত সমাজেই যেমন, চরম যুক্তি, শেষ নিষ্পত্তিই ছিল, শক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন্ শক্তি, নৈতিক, না নিছক শারীরিক? চীনারা গভীরভাবে বিশ্বাস করতো যে কেবল প্রথমটিই স্থায়ী এবং দ্বিতীয়ে যা আহরিত হয় তাকে রক্ষা করে কেবল প্রথমটিই।

অধিকন্তু চীনা সমাজে কথিত ও লিখিত শব্দের অগ্রাধিকারের প্রাসঙ্গিক কারণ থাকতে পারে[১৬]। একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, সাবেককালে আক্রমণাত্মক অস্ত্র আবিষ্কারের অগ্রগতি, বিশেষত কুশলী আড়-ধনুক, (cross-bow) প্রতিরোধক অস্ত্রাদির (defensive armour) অগ্রগতিকে অনেক পিছনে ফেলে গিয়েছিলেন। প্রাচীন কালে আড়-ধনুকে সজ্জিত সাধারণ মানুষ বা চাষীদের হাতে সামন্ত-প্রভু হত্যার বিস্তর ঘটনা আছে। এই অবস্থাটা পশ্চিমা মধ্যযুগীয় সমাজে ভারী অস্ত্রাচ্ছাদিত 'নাইটে'র অনুকূল অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্ভবত এই কারণেই আলাপের দ্বারা স্ব-মতে আনার (persuasion) উপর কনফুসীয় ঝোঁক শুরু হয়। চীনারা ছিল 'হুইগ', 'কারণ হুইগরা সওয়াল জবাব ছাড়া অন্য কোনো শক্তি প্রয়োগ করে না'। রাষ্ট্রের সীমান্ত-রক্ষার লড়াইয়ে কখনো চীনা জোত-চাষীকে (peasant-farmer) নামানো যেত না, উদাহরণত যেমন, সাম্রাজ্যের এককেন্দ্রীকরণের (unification)

আগে। কারণ, গোড়াতেই সে তার রাজাকেই যথেষ্ট তীব্র মেরে দিতে পারতো; কিন্তু, দেশপ্রেমিক বা তর্কবিলাসী (sophist) কোনো দার্শনিক যদি তাকে ভজাতে পারতো এই বলে যে, রাষ্ট্রের জন্য, বা পরবর্তী কালে যেমন, সাম্রাজ্যের জন্য লড়া তার প্রয়োজন, তবেই সে কদম ফেলতো। তাই চীনা প্রপদী ও ঐতিহাসিক রচনাবলিতে, যাকে বলা চলতে পারে 'প্রচার' (উদ্দেশ্যমূলক অর্থে নিশ্চয়ই নয়), কিছুটা উপস্থিত আছে। এ যেন এক ধরনের 'ব্যক্তিগত সমীকরণ' (personal equation) যার জন্য ঐতিহাসিককে কিছুটা জায়গা ছাড়তেই হয়। এটা কিছু চীনেরই বৈশিষ্ট্য নয়, এটা নিশ্চয় বিশ্বব্যাপী ঘটনা, উল্লেখ-যোগ্য জোসেফাস (Josephus) থেকে গিবনে (Gibbon); কিন্তু চীনতাত্ত্বিককে (sinologist) সর্বদাই তা খুঁজে বেড়াতে হয়, যেহেতু এটাই হচ্ছে সভ্য নাগরিকগুণের বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে আর একটা আকর্ষণীয় যুক্তি আছে, তা হচ্ছে, চীনারা আদতে সর্বদাই ছিল জোত-চাষী, পশুপালন বা সমুদ্র চারণায় (sea-faring) তারা অভ্যস্ত ছিল না[১৭]। শেষোক্ত পেশা দুটো অত্যধিক কর্তৃত্ব (command) ও বাধ্যতা তৈরি করে; মেষপালক বা রাখাল ছেলে তার জন্তুজানোয়ার চরিয়ে বেড়ায়, আর সমুদ্র-সারেঙ (sea-captain) তার মাঝি-মাল্লাদের নির্দেশ দেয়, যা অবহেলা করলে জাহাজে যাত্রীদের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়; কিন্তু জোত-চাষী জমিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজের পর অপেক্ষায় থাকে কখন তার ফসল ফলবে। চীনা দর্শনের উপদেশাত্মক একটা বিখ্যাত গল্পে সুং-রাজ্যের এক ব্যক্তিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে, যথেষ্ট দ্রুতগতিতে বাড়ছিল না বলে অসন্তুষ্ট হয়ে সে তার চারাগুলিকে টেনে বাড়াবার জন্যে চেষ্টা শুরু করেছিল[১৮]। সুতরাং, জবরদস্তি সব সময়েই কোনো কাজ করার ভুল পন্থা, কাজেই সামরিক শক্তির চেয়ে সামাজিক প্রবর্তনাই কাজের সঠিক পদ্ধতি, এবং যা-কিছুই নাগরিক কর্মচারীদের পাশাপাশি সৈন্য-সামন্তদের অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, তা কিছু ব্যতিক্রমসহ (*mutatis mutandis*) সওদাগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্পদের নিজস্ব কোনো তাৎপর্য ছিল না। তার কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিও ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্য সে দিতে পারতো, কিন্তু সম্বোধি নয়, এবং চীনে প্রাচুর্যের (affluence) সম্মান ছিল তুলনায় অনেক কম। প্রত্যেক সওদাগর-সন্তানের একটিই লক্ষ ছিল যে তাকে বিদ্বান হতে হবে, রাজকীয় পরীক্ষায় বসতে হবে, ও আমলাতন্ত্রে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে। এইভাবে দশ হাজার পুরুষ (generation) ধরে এই প্রথা চলে এসেছে। পরে অবশ্য এ-ব্যবস্থা কিছুটা উঁচু স্তরে উঠেছিল, কিন্তু আজও তা চালু আছে কিনা আমি নিশ্চিত বলতে পারি না। কারণ পার্টি-কর্মীরা যাদের বর্তমান অবস্থান জন্মের দৈব ঘটনার উপর নির্ভর করে নি, কি একদিকে অভিজাত ও অপর দিকে সঞ্চয়ীমূল্যকে ঘৃণা করে না? এক কথায়, সম্ভবত সমাজ-

তন্ত্র ছিল প্রভুত্বহীন ন্যায়ের বোধ, যা মধ্যযুগের চীনা আমলাতন্ত্রের কোটরবন্দী হয়েছিল[১৯]। সম্ভবত, মৌলিক চীনা ঐতিহ্য ইয়োরোপের চেয়ে,বৈজ্ঞানিক সহযোগী বিশ্বের অনেক বেশি সমধর্মী।

১৯২০ এবং ১৯৩২-এর মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কস 'উৎপাদনের এশীয় রীতি' (Asiatic mode of production) বলতে কী বোঝান তাই নিয়ে বিরাট আলোচনা চলেছিল, কিন্তু সেগুলো পশ্চিম দেশগুলোতে যেহেতু কখনো অনূদিত হয় নি, তাই এ-সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। যদি রুশ ভাষায় সেই বিবরণের কোনো পাঠ থাকে তবে পশ্চিমা ভাষাগুলোতে তার পুনর্মুদ্রণ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। যদিও আমরা সে-আলোচনার ফলাফল বিবেচনা করতে সক্ষম হই নি, তবু এ-কথা শোনা গেছে যে, যারা আদিম যূথবদ্ধতা—দাস-সমাজ—সামন্ততন্ত্র—পুঁজিতন্ত্র—সমাজতন্ত্র,—এই স্বীকৃত ধারাবাহিকতার পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাই তৎকালে শিরোপা পেয়েছেন। ব্যক্তি-পূজার যুগে সমাজবিজ্ঞানে যে সংকীর্ণতার আবহাওয়া দেখা গিয়েছে, নিঃসন্দেহে এই অবস্থায় তার একটা ভূমিকা ছিল।[২০] হালের কিছু আলোচনায় প্রকাশ যে, আমাদের কিছু-কিছু তরুণ লেখক ইংরেজ মার্কসবাদীদের বিড়ম্বনাটিই প্রকাশ করছেন যে 'সামন্ততন্ত্র' একটি অর্থহীন পদ হয়ে গেছে[২১]। তাঁরা বলেন, 'স্পষ্টতই যে-সামাজিক অর্থনৈতিক পর্যায় আজকের রুমানিয়া-উরুগুয়ে, (+) ১৭৮৮-র ফ্রান্স, এবং উনিশ শতকের চীন এবং নরম্যান ইংলণ্ড ব্যেপে চলে, বিশ্লেষণের কাজে লাগে তার এমন যে-কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নষ্ট হতে চলেছে···।' বিভাজনের (sub-divisions) নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এইসব লেখকেরা, মনে হয়, মার্কস ও এঙ্গেলসের মূল বক্তব্য বিশেষ কিছুই জানেন না। এঁদের একজন বলেন : 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা বহুকালই নিঃসাড়ে অপ্রচলিত হয়ে গেছে[২২]।' যাই হোক, একই লেখক আফ্রিকান ও এশীয় সমাজের উন্নয়ন থেমে যাওয়ার সমস্যাটি চমৎকারভাবে অবতারণা করেছেন এবং মার্কসের 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' বা এমন কি আরো কতকগুলি ব্যবস্থার নতুন ক'রে প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেছেন, যাতে আঞ্চলিক বিভিন্নতার মধ্যে পরিভাষা (nomenclature)-গত পার্থক্য নির্দেশ করা যায়। 'প্রোটো-ফিউড্যাল' (proto-feudal) শব্দটাও (বোধ হয় আমার নিজের উদ্ভাবন) একটা মূল স্তরের বিবরণ হিসেবে অনুমোদন করা হয়েছে—যে স্তর পরে বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছিল।

আজকাল যখনই ভিট্‌ফোগেলের নাম মার্কসবাদীদের লেখায় দেখা যায়, তা বিরূপ মনোভাব থেকে উল্লেখ করা হয়। এর কারণ হিটলারের যুগে ভিট্‌ফোগেল আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি এখনো কাজ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বুদ্ধিজীবীদের 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এ 'টোমাহক' (উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত কুঠার) ঘুরিয়েছেন এবং যে-সব লেখকেরা

তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র'কে (*Oriental Despotism*)[২৩] প্রাচীন ও নব্য যুগের রাশিয়া ও চীনের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান বলে মনে করে তারা বোধ হয় বিশেষ করেই সত্য। এক সার্বিক শাসনতন্ত্রী (totalitarian) অন্য সমাজে ক্ষমতা অপব্যবহারের কারণ ভিট্‌ফোগেল বর্তমানে খুঁজছেন আমলাতন্ত্রের নীতিতে, যদিচ তিনি, আমার এবং অন্য অনেকের সমর্থিত ধারণাগুলোর মস্ত বড় বিরোধী হয়েছেন, তবু তার দ্বারা এই তথ্য উল্টে যায় না যে, একসময়ে তিনি নিজেই সে-সব ধারণাকে আশ্চর্য সাজিয়েছিলেন। তাই তাঁর শেষ গ্রন্থটির নিন্দা করেও আমি প্রথম গ্রন্থটির প্রশংসা করছি। যদিও ভিট্‌ফোগেল সম্ভবত কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন, তবু আমি মনে করি না 'জল ব্যবস্থাভিত্তিক সমাজ' (hydraulic society)-এর তত্ত্বটি ভুল, কারণ আমিও বিশ্বাস করি যে চীনা ইতিহাসে জল-প্রকল্পের স্থানব্যাপ্তি (spatial range) (নদী-নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও যানবাহনের জন্য খালকাটা) যুগের পর যুগ ব্যক্তিগতভাবে কোনো সামন্তপ্রভু অথবা প্রোটো-ফিউড্যাল প্রভূদের পারস্পরিক সীমানার বাধা দূর ক'রে দিয়েছে। ফলে অনিবার্যভাবে তা শক্তিকে কেন্দ্রে সংহত করার দিকে ঝুঁকেছে, অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌম (tribal) গোষ্ঠী (clan)-গত গ্রাম-গুলির বিভিন্নতার উপর খিলানের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছে[২৪]। আমার মনে হয় চীনা সামন্ততন্ত্রকে 'আমলাতান্ত্রিক' ক'রে তুলতে এটা একটা প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করেছিল। নিশ্চয়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেই ইয়োরোপীয় সামান্ততন্ত্রের সঙ্গে চীনা সামান্ততন্ত্রে পার্থক্যের মাত্রায় কিছু এসে যায় না। তবে তফাৎ করতেই হয় (এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পার্থক্য যথেষ্টই ছিল) পশ্চিমে পুঁজিতন্ত্র ও আধুনিক বিজ্ঞান সার্থক প্রসারের প্রতিপক্ষে চীনে উভয়েরই সম্পূর্ণ অভাবের কারণ নির্দেশ করতে হলে।

সমস্ত সামাজিক অন্যায়ের কারণ আমলাতন্ত্রের উপর চাপানো নিছক অর্থহীন। অপরপক্ষে তা যুগ যুগ ধরে ছিল মানুষের সমাজ-সংগঠনের মহান হাতিয়ার। অধিকন্তু, যদি মানুষ বাঁচে, তবে অনেক শতাব্দী ধরে তা আমাদের সঙ্গে থাকবে। এখন আমাদের সামনে মৌলিক সমস্যা হল আমলাতন্ত্রের মানবীকরণ (humanisation of bureaucracy), যাতে সমাজতন্ত্রে সাধারণ নরনারীর হিতার্থেই শুধু এর সংগঠনী শক্তিকে ব্যবহার করা হবে না, সেই সঙ্গে জানা চাই, দেখা চাই ও প্রত্যক্ষভাবে বোধ করা চাই যে তার ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমান যুগে মানবসমাজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এবং ক্রমশই আরো থাকবে। আর যতই এইভাবে চলবে ততই বিশেষভাবে সংগঠিত আমলাতন্ত্র অপরিহার্য হয়ে উঠবে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের পরবর্তী সে-জাতীয় পদ্ধতির সঙ্গে পূর্ববর্তী কোনো ঐ ধরনের পদ্ধতির তুলনা ভ্রান্তি মাত্র। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান টেলিফোন থেকে কম্পিউটার পর্যন্ত অজস্র যন্ত্রের সম্ভার দিয়েছে,

যা একমাত্র এখনই আমলাতন্ত্রকে মানবিক করার সংকল্প পূরণ করতে পারে। সে-সংকল্পটি মূল কনফুসীয়, তাও এবং বিপ্লবী খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের উপর দাঁড়াতে পারে, মার্কসবাদের উপরেও।

'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র' (oriental despotism) পদটি (+) ১৮ শতকের ফ্রান্সের 'ফিজিওক্র্যাট'দের ভাবনা মনে পড়ায়, যাঁরা তখনকার চীনা অর্থনীতি ও সমাজ-সংগঠনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন[২৫]। অবশ্যই তাঁদের কাছে তা ছিল উদার উদ্দীপিত স্বৈরতন্ত্র (enlightened despotism), যাকে তাঁরা যথেষ্টই পছন্দ করেছেন এবং মোটেই তা ভিট্‌ফোগেলের পরবর্তী কল্পনার ভয়ঙ্কর ও বিকৃত পদ্ধতি ছিল না। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থবিষয়ে[২৬] সারা পৃথিবীতে চীন-তাত্ত্বিকেরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন, যেহেতু গ্রন্থটি তথ্য থেকে নিরন্তর বাছাই করেছে – উদাহরণত যেমন, মধ্যযুগীয় চীনে শিক্ষিত জনমত ছিল না এ-কথা বলা অসম্ভব। অপরপক্ষে বিদ্বান-ভদ্রলোকেরা (scholar-gentry) এবং পণ্ডিত আমলারা ব্যাপক ও অত্যন্ত শক্তিশালী জনমত গঠন করেছিলেন এবং এমন একসময় ছিল যখন সম্রাট আদেশ জারী করলে আমলাতন্ত্র না-ও মানতে পারতো[২৭]। তত্ত্বগতভাবে সম্রাট চূড়ান্ত শাসক হতে পারেন, কার্যত যা ঘটেছিল তা, ঐতিহাসিক শাস্ত্রাদির যুগ-যুগব্যাপী কনফুসীয় ভাষ্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত দীর্ঘদিন-প্রতিষ্ঠিত নজীর ও প্রথা দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হতো। চীন সব সময়েই ছিল 'একদলীয় রাষ্ট্র', (one-party state), এবং দু-হাজার বছরের উপর শাসন ছিল কনফুসীয় দলের হাতে। আমার মত হচ্ছে সুতরাং 'প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র' পদটি 'ফিজিওক্র্যাট'দের হাতে যেমন সাজে নি, তেমনি ভিট্‌ফোগেলের হাতেও নয়। আমি নিজেও আর এটা ব্যবহার করি না। অপরপক্ষে, কিছু পুরনো ও কিছু হালে প্রতিষ্ঠিত বিস্তর মার্কসীয় শব্দ (term) আছে, যা ব্যবহারে আমি যথেষ্ট অসুবিধা দেখি। যেমন কিছু গ্রন্থে 'কাল্পনিক রাষ্ট্র-রূপ' (imaginary State construct)-কে স্বাধীন চাষী-প্রধান গ্রামের প্রকৃত অধঃস্তর (real sub-tratum)-এর সঙ্গে পৃথক করা হয়েছে—এটা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্রটি তার নিজের নিয়মে জোত-চাষীদের কাজের মতোই, যথেষ্ট সত্য। 'স্ব-শাসিত' (autonomic) এই পদটিকেও আমি গ্রাম-সমাজ সম্পর্কে প্রয়োগ করতে রাজী নই, কারণ আমার মনে হয় এটা কেবল অত্যন্ত নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যেই সত্য। আসল কথা হল এই যে, সম্পূর্ণ নতুন কিছু পারিভাষিক শব্দ আমাদের বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছে। আমরা এখানে সমাজের এমন সব অবস্থা নিয়ে কথা বলছি যা প্রতীচ্য কখনোই জানতো না। আত্যন্তিক-ভাবে বিভিন্ন সব সমাজ প্রসঙ্গে প্রয়োগ করার জন্য প্রাসঙ্গিক এইসব পারি-ভাষিক শব্দ তৈরি করার কাজে আমি বলব গ্রীক ও ল্যাটিন ধাতুরূপের বদলে চীনা রূপগুলোই আমরা বরং ব্যবহার করতে পারি[২৮]। এখানে

'কুয়ান-লিয়াও'। পদটি আমলাতন্ত্র বুঝাতে উপযুক্ত হতে পারে। আমরা যদি আরো কোনো যথাযোগ্য পরিভাষা পাই তবে তা আমাদের আরো কিছু প্রাসঙ্গিক সমস্যা বিষয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এখানে আমি এই উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাটি বিষয়ে ভাবছি যে জাপানি সমাজ পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজের অনেক বেশি সদৃশ ছিল এবং নিছক সে-কারণেই আধুনিক পুঁজিতন্ত্র গড়তে সমর্থ হয়েছে। বহুকাল আগে থেকেই ঐতিহাসিকেরা তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট পথে জাপানি সামরিক -অভিজাতিক (military-aristocratic) সামন্ততন্ত্র পুঁজিতন্ত্রের জন্ম দিতে পেরেছে, অথচ চীনা আমলাতান্ত্রিক সমাজ যা পারে নি—সাম্প্রতিক লেখাগুলো তাকেই স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করেছে[২৯]।

খুব বেশি না হলেও অতঃপর 'দাস-সমাজ' সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি। যাই মূল্য থাক, চীনা পুরাতত্ত্ব ও সাহিত্য বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি বিশ্বাস করতে বিশেষ রাজী নই যে, চীনা সমাজ, এমনকি আদি চৌ-পর্যায় এবং শাঙ্-পর্যায়ে কখনো দাস-ভিত্তিক ছিল, যে-অর্থে ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতি-গুলো তাদের দাস-চালিত নৌবহর নিয়ে ঐ সমুদ্রে বিচরণ করেছে এবং তাদের বিশাল ভূ-সম্পত্তি (*latifundia*) ইটালির মাঠ-ঘাট দিয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এখানে আমি গভীর বিনয়ের সঙ্গে সরে আসছি কিছু সমসাময়িক চীনা পণ্ডিতদের থেকে, যাঁরা গত বিশ-তিরিশ বছর ধরে মার্কসীয় চিন্তায় মূল্য উদ্‌বর্তনের ধারা বিষয়ে এক-মুখী (single-track) বিন্যাসের দ্বারা চূড়ান্তভাবে অনুপ্রাণিত। বিষয়টি এখনও গভীর তর্কসাপেক্ষ এবং আমরা এখনো বলতে পারি না যে এর কোনো স্তরেই নিষ্পত্তি পাওয়া গেছে। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন সভ্যতায় দাসত্ব-প্রথা বিষয়ে কেম্‌ব্রিজে একটি আলোচনা-সভা বসেছিল; তাতে অংশ গ্রহণকারীরা আলোচনাসূত্রে একমত হতে বাধ্য হলেন যে, চীনা সমাজে দাসত্বের প্রকৃত রূপ অন্য যে-কোনো স্থান থেকে পৃথক। গোষ্ঠী ও পারিবারিক আনুগত্যের চাপে এ-কথা বোধহয় সংশয়জনক যে ঐ সভ্যতায় কাউকে কোনো-কোনো পশ্চিমী অর্থে 'মুক্ত' বলা চলে কিনা, যদিও অন্যদিকে (অনেকের বিশ্বাসের বিপরীতে) চীনে অস্থাবর-দাসত্ব (chattel-slavery) স্পষ্টতই দুর্লভ ছিল[৩০]। সত্যিকথা বলতে কি, বিভিন্ন সময়ে চীনের দাসোচিত এবং অর্ধ-দাসোচিত দলের (এবং এ-রকম বিভিন্ন ধরনের অনেকই দল ছিল) কী স্থান (status) ছিল তা আজও পর্যন্ত পুরোপুরি কেউই জানে না, পশ্চিমা চীনতাত্ত্বিকরা বা চীনা পণ্ডিতরা নিজেরাও নয়। এখনও অনেক গবেষণা বাকি আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থাবর-দাসত্ব কখনো সমগ্র চীনা সমাজের ভিত্তি ছিল না, কোনো এককালে প্রতীচ্যে যেমন ছিল[৩১]।

যদিও গ্রীক ও রোমকদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবস্থাকে

প্রভাবান্বিত করার দিক থেকে সমাজের ভিত্তিমূলে দাস-প্রথার প্রশ্ন কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, আদিতে আমার যা মূল উৎসাহের বিষয়, অর্থাৎ পশ্চিমে রেনেসাঁসের শেষদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে এর সার্থকতা নিশ্চয়ই কম। যাই হোক, চীনা সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম চোদ্দ এবং তার পূর্বেকার চার কি পাঁচ শতকে মানুষের হিতার্থে প্রকৃতি-বিজ্ঞানসমূহের প্রায়োগে চীনা সমাজের বৃহৎ সিদ্ধির উপর এর যথেষ্ট গভীর প্রভাব থাকতে পারে। এটা কি খুবই চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে ভূমধ্যসাগরের জাহাজে দাঁড়বাহী দাসদের সমকক্ষ দ্রষ্টব্য বস্তু চীনে কিছুই নেই? প্রাচীনকাল থেকেই পাল (sail) ও পালের সুষ্ঠু ব্যবহার ছিল চীনে জাহাজের সম্মুখ-গতির (propulsion) সার্বিক পদ্ধতি। প্রাচীন মিশরের নির্মাণ-পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয় মানুষী গতি-সঞ্চালকের (motor) যুথবদ্ধ ব্যবহারের কোনো নজীর চীনে নেই। তেমনি এটাও খুব উল্লেখযোগ্য যে, আমরা কখনোই চীনা সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যা-জনিত বেকারত্বের ভয়ে কোনো নতুন আবিষ্কার প্রত্যাখ্যানের একটি নজীরও পাই নি। অধিকাংশ লোকের ধারণা অনুযায়ী চীনের শ্রমশক্তি যদি সত্যিই এত বিপুল হয়ে থাকে তাহলে বোঝা দুষ্কর কেন মাঝেমধ্যে উক্ত সমস্যা বিশিষ্ট হয়ে উঠবে না। ইয়োরোপের বহু পূর্বে প্রায়শই চীনা সংস্কৃতিতে পুরাকালেই শ্রম-নিবারক (labour saving) কৌশলের অজস্র উদাহরণ আমাদের আছে : (+) তৃতীয় শতকের চীনে সুলভ, কিন্তু পশ্চিমে (+) ত্রয়োদশ শতকের আগে অজানা এক-চাকার মালগাড়িটি (wheel-barrow) একটি প্রত্যক্ষ নজীর, এবং সম্ভবত তা নিশ্চিতভাবে সেখানে আরও অন্তত দুশো বছর আগে তৈরি হয়েছে। এটা এমন হতেই পারে যে, যেমন চীনা সংস্কৃতিতে আধুনিক বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত জন্মের ব্যর্থতার ব্যাখ্যা আছে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, তেমনি গোড়ার শতাব্দীগুলোতে বিশুদ্ধ (pure) এবং ব্যাবহারিক (applied) বিজ্ঞানের প্রসারে, চীনা সংস্কৃতির বৃহত্তর সার্থকতায়, অস্থাবর-দাস-প্রথার ব্যাপক অনুপস্থিতি একটি প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে যেতে পারে।

বর্তমানে তরুণতর ইয়োরোপীয় সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মধ্যে 'এশীয় উৎপাদন রীতি' সমস্যাটির পুনর্বিবেচনা নিয়ে বিরাট চাঞ্চল্য লক্ষ করা যায়[৩২]। অনুন্নত অবস্থা থেকে উঠ্‌তি আফ্রিকার সমাজগুলোর ব্যাখ্যায় এই মতবাদগুলোর গুরুত্বের জন্যই অংশত এমন ঘটছে। মামুলি হয়ে-যাওয়া সীমাবদ্ধ প্রত্যয়গুলি (categories) এমন ঘটনার পুরো ব্যাখ্যা করবে কিনা, তা স্পষ্ট নয়, কিন্তু সম্ভবত এর সবচেয়ে বেশি উৎসাহ এসেছে *Formen die der kapitalischen Produktion vorhergehen* নামে ১৮৫৭-৫৮তে মার্কসের নিজের লেখা পুথিটির ১৯৩৯ সালে মস্কোয় প্রকাশিত বইটিতে। এটা ছিল

'ক্যাপিটাল'-এর জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি, এবং ১৯৫২ সালে জার্মানিতে পুনঃ-প্রকাশিত মূল প্রবন্ধাবলির সংকলন *Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে[৩৩]। একারণেই দুঃখের বিষয় যে বিশ ও ত্রিশের রুশ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে মার্কসের পুঁথিটি অপরিচিত ছিল, কারণ এই পুঁথিটিই একমাত্র 'এশীয় উৎপাদনরীতি' বিষয়ক তাঁর ভাবনা সম্পর্কে গভীর ও সুসংবদ্ধ প্রকাশ। একটা বড় প্রশ্ন হল, পৃথিবীর অন্য অংশে প্রথাসিদ্ধভাবে স্বীকৃত সমাজ-রূপের কোনো-কোনোটার সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস একে গুণগতভাবে, না কেবলমাত্র পরিমাণগতভাবে তফাৎ করেছিলেন। এটা এখনও স্পষ্ট নয় যে, তাঁরা একে মূলত 'ক্ষণস্থায়ী' (transitory) অবস্থা বলে (যদিও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তা দীর্ঘকালের স্থায়ী অবস্থাও হতে পারে) দেখেছেন না তাঁরা 'আমলাতন্ত্রবাদ'কে সমাজের চতুর্থ মূল সমাজ-রূপ বলে ভেবেছেন। 'এশীয় উৎপাদনরীতি' কি সনাতন দাস-প্রথা বা সনাতন সামন্ত-তন্ত্রের নিছক একটি অন্যতর রূপ? কিছু চীনা ঐতিহাসিক অবশ্যই একে বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্র বলে মনে করেন। কিন্তু কখনো-কখনো মনে হয় মার্কস ও এঙ্গেলস এমনভাবে কথা বলেন যেন তাঁরা সত্যিই একে দাস-উৎপাদন বা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন থেকে গুণগতভাবে পৃথক ক'রে দেখেন। এই প্রশ্নটা সব সময়েই ছিল যে, 'আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রে'র প্রত্যয়গুলো প্রাক্-কলাম্বীয় আমেরিকা বা মধ্যযুগীয় সিংহলের মতো অপর সমাজগুলির পক্ষে কতটা প্রযোজ্য হতে পারে। সম্প্রতি কালে ভিট্‌ফোগেল এই ধরনের সমস্যায় জড়িত হয়েছেন, কিন্তু কোনো সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি (সিংহলকে তিনি তাঁর সূচির মধ্যে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি) এবং তরুণ সমাজতাত্ত্বিকেরা বর্তমানে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে এই সমস্যাটি নাড়াচাড়া করছেন[৩৪]।

এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে চীনা বিজ্ঞান এবং যন্ত্রকৌশলতত্ত্বের গোড়ায় উন্নত এবং পরে প্রতিহত চরিত্র বিষয়ে আমার নিজস্ব সমস্যাটিকে তাঁদের চিন্তা যথেষ্ট স্পষ্ট করবে। বিশেষত আমার ফরাসি বন্ধু এবং সহকর্মী Jean Chesneawa এবং Andrè Haudricourt এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর এবং অতঃপর যা লিখছি সবই আমাকে বলা তাঁদের কয়েকটি বক্তব্যের উপর নির্ভর ক'রে। এটা স্পষ্ট, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী চীনা বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল-তত্ত্বের গরিষ্ঠতাকে 'এশীয় সামন্ততন্ত্রে'র চরিত্রান্বিত সমাজের বিস্তৃত, যুক্তিনিষ্ঠ এবং সচেতন কর্মরীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রে বসাতে হবে। এটা এমনই একটা সমাজ যা মূলত 'বিজ্ঞজনোচিত' পদ্ধতিতে কাজ করেছিল, যেহেতু ফৌজী নায়করা নয়, বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা ক্ষমতার আসনগুলি পূর্ণ ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রাম-সম্প্রদায়ের 'স্বয়ংক্রিয়' কাজের উপর খুব বেশি মাত্রায় নির্ভর করেছিল এবং সাধারণভাবেই তাদের জীবনে এর হস্তক্ষেপ

ন্যূনতমই রাখতে চেয়েছে। আমি ইতিমধ্যে একদিকে জোত-চাষী এবং অপর দিকে মেষপালক বা নাবিকদের মৌল পার্থক্যের কথা বলেছি। এই তথ্যটা চীনা *wei* এবং *wu wei* এই শব্দ দিয়ে ব্যঞ্জনাত্মকভাবে প্রকাশিত হয়। *wei* এর অর্থ বল, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ এবং একটি সংকল্প যে, বস্তু বা এমন কি অন্য মানুষরাও আদিষ্ট কর্ম করবে। কিন্তু *wu wei* তার বিপরীত ; যা যেমন আছে রেখে প্রকৃতিকে নিজের মতো চলতে দেওয়া, বস্তুর বিরুদ্ধে না গিয়ে তার সপক্ষে থেকে লাভবান হওয়া এবং কেমন ক'রে মাথা না গলিয়ে থাকা যায় তা জানা। দীর্ঘকাল ধরে এটা তাও-বাদীদের মহা সংকেতবাক্য, অনির্দেশিত তত্ত্ব, শব্দবিহীন অনুশাসন হিসেবে চলে আসছে[৩৫]। চীনে থাকাকালীন বার্ট্রাণ্ড রাসেল কর্তৃক সংগৃহীত ব্রহ্মবাক্যে (numinous) এর সারাংশ আছে : স্বত্বহীন উৎপাদন, আত্মপ্রতিষ্ঠাহীন কর্ম, আধিপত্যহীন উন্নতি[৩৬]। এবার *wu wie* বা হস্তক্ষেপহীনতাকে কৃষিজীবী ব্যক্তি ও কৃষক সমাজের স্বয়ং-অভিপ্রেত ক্ষমতায় শ্রদ্ধার প্রসঙ্গে চমৎকারভাবেই ব্যবহার করা যায়। এমনকি যখন প্রাচীন 'এশীয়' সমাজ 'আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র'কে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে তখনো এই ধরনের ধারণা যথেষ্ট জোরালো ছিল। চীনা রাজ-নৈতিক অনুশীলন এবং সরকারি শাসন চিরকালই স্থাপিত হয়েছে, প্রাচীন এশীয় সমাজ এবং 'গ্রাম-রাজা'র (village-prince) একজোড়া বৈপরীত্য থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া হস্তক্ষেপহীনতার উপর। ফলে সমগ্র চীন ইতিহাসে তিনিই সবচেয়ে ভাল শাসক যিনি সমাজের বিষয়ে সবচেয়ে কম নাক গলিয়েছেন এবং সমগ্র ইতিহাস জুড়েই গোষ্ঠী পরিবারের প্রধান লক্ষ ছিল নিজেদের ব্যাপার আদালতের শরণ ছাড়াই আভ্যন্তরীণভাবে মিটিয়ে ফেলা[৩৭]। সম্ভবত এইরকম সমাজ প্রকৃতির রাজ্য বিষয়ে চিন্তা করার পক্ষে অনুকূল হয়। মানুষ চেষ্টা করবে যতোটা সম্ভব প্রকৃতির নিয়মকানুনের মধ্যে ঢুকে পড়তে, এবং যতোটা সম্ভব কম সরাসরি হস্তক্ষেপে 'দূরের ক্রিয়া' ('action at a distance') ব্যবহার ক'রে নিহিত শক্তির উৎসকে প্রয়োগ করতে। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত এই জাতের ভাবনা সামান্যতম উপকরণে ফল ফলাতে চেয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মূলত বেকনীয় যুক্তিতে প্রকৃতির চর্চাকে অনুপ্রেরিত করেছে। সে-কারণেই প্রাথমিক সাফল্য—ভূকম্প-নির্ণায়ক যন্ত্র, লৌহ-ঢালাই এবং জলশক্তি।

শুরু করার জন্য এ-কথা বলা যায়, মানুষী কার্যকলাপে হস্তক্ষেপহীনতার এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে অনুকূল। যেমন 'দূরের ক্রিয়া'র প্রতি পক্ষপাত প্রাথমিক ঊর্মিতত্ত্ব, (wave-theory) জোয়ার-ভাটার চরিত্র বিষয়ক আবিষ্কার, ভৌম-উদ্ভিদবিদ্যার (geo-botanical) খোঁজখবর, খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিদের সম্পর্কের জ্ঞান বা আবার চুম্বকবিজ্ঞানের উপর প্রভাব ফেলেছে। এটা ভুলে

যাওয়া হয় যে, গ্যালিলিওর সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সবলে অনুপ্রবেশের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল চৌম্বক মেরুত্ব (magnetic polarity), বিষুব-লম্ব (declination) ইত্যাদির জ্ঞান এবং চৌম্বক বিজ্ঞান, যুক্লিডীয় জ্যামিতির ও টলেমীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রতিপক্ষে, সম্পূর্ণরূপে অ-ইয়োরোপীয় অবদান[৩৮]। (+) দ্বাদশ শতকের শেষভাগের আগে ইয়োরোপে এ-সম্পর্কে বলার মতো কিছুই জানা যায় নি এবং চীনাদের পূর্ববর্তী কাজ থেকে তার স্থানান্তরীকরণে (transmission) কোনো সন্দেহ নেই। যদি চীনারা (ব্যাবিলনবাসী ছাড়া) সমস্ত প্রাচীন মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক ছিলেন, তবে 'জল-প্রতীক' এবং 'শাশ্বত-নারী' বিষয়ক তাও-পন্থীদের ব্রহ্মবাদী কবিতায় সংরক্ষিত হস্তক্ষেপহীনতার তত্ত্বগুলির আনুকূল্যের স্পষ্ট কারণেই কি সম্ভবত এগুলো হয় নি[৩৯] ?

যাই হোক, যদি, 'গ্রাম-রাজা'র হস্তক্ষেপহীন চরিত্র বিজ্ঞানের প্রগতির অনুকূল জগৎবিষয়ক কোনো তত্ত্বের জন্ম দিয়ে থাকে, তার কতকগুলো স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। সমুদ্র-চর ও মেষপালকগোষ্ঠীর স্বাভাবিক প্রতীচ্য বৈশিষ্ট্যজাত হস্তক্ষেপতত্ত্বের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। যেহেতু সভ্যতায় সওদাগরি মনোবৃত্তিকে প্রধান স্থান দেওয়া এর সাধ্য নয়, বিশেষজ্ঞরা যেমন তৈরি করেছেন, গাণিতিক এবং নৈয়ায়িক যুক্তিপদ্ধতির সঙ্গে উচ্চ কারিগরি গোষ্ঠীর প্রয়োগপদ্ধতির মিলনও এর সাধ্য ছিল না ; ফলে, আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের প্রসারে তিন্সীয় থেকে গ্যালিলিও পর্যায়ে উপনীত হওয়া সফল হয় নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। গ্রীক বা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের প্রয়াসে যা কখনো ছিল না, মধ্যযুগীয় চীনে তার চেয়ে অনেক বেশি সুসংবদ্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। কিন্তু যতোদিন 'আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্র' অনড় থেকেছে ততোদিন গণিত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের সহযোগিতায় মৌলিকভাবে নতুন কিছু গড়ে তুলতে পারে নি। প্রস্তাবটি এই যে, পরীক্ষণ অত্যন্ত বেশি সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবি করে এবং যেহেতু চীনে কার্যত তাকে ইয়োরোপের চেয়ে অনেক বেশি স্বীকার করা হয়েছে, শিল্পকলায় এবং বাণিজ্যে দার্শনিকভাবে তাকে ভদ্রস্থ করা সম্ভবত এখানে অনেক বেশি দুরূহ ছিল।

আর একভাবে মধ্যযুগীয় চীনা সমাজ প্রাক-রেনেসান্স স্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বৃদ্ধির অনেক বেশি অনুকূল ছিল। প্রচলিত চীনা সমাজ ছিল অনেক বেশি সুসংহত ও প্রাণসম্পর্কে স্থিত, রাষ্ট্র ছিল সমগ্র সমাজের সুপরিচালনায় অনেক বেশি দায়িত্বশীল এবং যদিও ন্যূনতম হস্তক্ষেপে সে-দায়িত্ব পরিচালিত হয়েছে। আমরা জানি শ্রেষ্ঠ শাসকের প্রাচীন সংজ্ঞা ছিল, তিনি দক্ষিণে মুখ ক'রে বসে সমস্ত দিকে তাঁর শীল (*te*) প্রয়োগ করবেন যাতে দশ সহস্র বস্তু স্বয়ংক্রিয়-ভাবে সুশাসিত হবে। আমরা তো বারবার দেখাতে পেরেছি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রাষ্ট্র পরাক্রান্ত সাহায্য নিয়ে এসেছে[৪০]। জ্যোতির্বিদ্যার মান-

মন্দির (observatory) যেমন, সহস্র বর্ষব্যাপী নথিপত্রের সংরক্ষণ ছিল জনপালন কৃত্যকের অংশ, রাষ্ট্রের খরচায় প্রকাশিত হতো শুধুই সাহিত্যিক নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় এবং কৃষির বিরাট জ্ঞানকোষগুলি। সে-সময়ের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক অভিযানগুলোও সার্থকভাবে পরিচালিত হয়েছে (মনে পড়বে প্রাথমিক (+) ৮ম শতকের ইন্দোচীন থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত মধ্যরেখীয় চাপের সীমা-পরিমাণের নিরীক্ষা এবং দক্ষিণ আকাশ-মেরুর ২০°-র মধ্যে দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রপুঞ্জকে ধারাবদ্ধ করার অভিযানের কথা)[৪১]। প্রতিতুলনায় ইয়োরোপে বিজ্ঞান সাধারণতই ব্যক্তিগত উদ্যোগমাত্র ছিল। সুতরাং তা বহু শতক পিছিয়ে ছিল। যদিও চীনের রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান ও ভেষজশাস্ত্র, সময় এলে সেই গুণগত লাফটি দিতে পারতো না, যা (+) ষোড়শ এবং প্রাথমিক (+) সপ্তদশ শতকে প্রতীচ্য বিজ্ঞানে ঘটেছে।

কিছু এশীয় পণ্ডিত 'এশীয় উৎপাদনরীতি' অথবা 'আমলাতান্ত্রিক সামন্তপ্রথা' বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন, কারণ তাঁরা একটা 'স্থবিরতা'র (stagnation) সঙ্গে একে একাকার ক'রে দেখেছিলেন, যা তাঁরা নিজেদের সমাজের ইতিহাসে দেখেছেন মনে করেছিলেন। এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রগতির অধিকারের নামে তাঁরা এই মনোভাবকে অতীতে সিঁধিয়েছেন, এবং পাশ্চাত্য যার মধ্য দিয়ে গেছে ঠিক সেই-সেই স্তরের মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষেরাও গেছেন দাবি করতে চায়, যে পশ্চিমা জগৎ তাদের উপর ঘৃণার সঙ্গে বেশ কয়েক বছর প্রভুত্ব করেছে। আমার মনে হয় এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করা খুব জরুরি, কারণ এ-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই কেন আমরা পূর্বনির্দিষ্টভাবে ধরে নেব যে চীন এবং অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতাগুলো পশ্চিম ইয়োরোপের মতো একই সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে। বস্তুত 'স্থবিরতা' শব্দটি কোনোক্রমেই চীনের ক্ষেত্রে কখনও প্রযুক্ত নয়; এটা সম্পূর্ণই পশ্চিমা ভুল ধারণা। যেমন আমি অন্যত্র দেখাই[৪২], একটা পরম্পরাগত সাধারণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতি প্রাচীন চীনা সমাজে নিজেকে প্রতিফলিত করেছে, কিন্তু ইয়োরোপে, রেনেসাঁসের পরে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্বমূলক বুদ্ধি দুর্নিবারভাবে তাকে ছাপিয়ে গেল। ইচ্ছে করলে চীনকে বলা চলে homeostatic এবং cybernetic, কিন্তু কখনো পচনশীল নয়। অসাধারণ সম্ভাব্যতার সঙ্গে উদাহরণের পর উদাহরণ তুলে দেখানো যায়, চীনের মৌল উদ্ভাবন ও আবিষ্কারগুলোই ইয়োরোপে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, যেমন চুম্বকবিজ্ঞান, যে-বিষুবরৈখিক স্থানাঙ্কগুলো (equatorial celestial co-ordinates) এবং জ্যোতির্বিদ্যা-সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণমূলক যন্ত্রপাতিগুলোর বিষুবস্থিতি[৪৩], পরিমাণগত মানচিত্র নির্মাণবিদ্যা, লোহাঢালাই কৌশল[৪৪], পরস্পর পরিপূরক বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের অপরিহার্য অঙ্গগুলো[৪৫], যেমন যুগ্মক্রিয়াতত্ত্ব, অনুগতি ও দেশান্তরগতির আন্তঃপরিবর্তনের মান (standard interconver-

sion of rotary and longitudinal motion)[৪৭], যান্ত্রিক ঘড়ি[৪৬], জুতোর রেকাব, এবং ঘোড়ার কুশলী সাজ—বারুদ এবং বারুদ-জাত বস্তু বিষয়ে না-হয় কিছু নাই বললাম[৪৭]। এই রকম বহু বিচিত্র আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ইয়োরোপে পৃথিবী-কাঁপানো ফল ঘটিয়েছিল, কিন্তু চীনে আমলাতান্ত্রিক সামন্ততন্ত্রের সামাজিক ছকটি তাদের দ্বারা কমই বিক্ষুব্ধ হয়েছে। সুতরাং ইয়োরোপীয় সমাজের গড়ে-তোলা অস্থিরতাকে চীনের homeostatic ভারসাম্যের সঙ্গে অবশ্য তুলনা করতে হবে, যা, আমার বিশ্বাস, কার্যত মৌলিকভাবে যুক্তিনিষ্ঠ এক সমাজের ফল। যা রইল তা হচ্ছে ইয়োরোপ ও চীনের সামাজিক শ্রেণীর সম্পর্কের বিশ্লেষণ; প্রতীচ্যে তাদের মধ্যেকার সংঘর্ষ ভালোভাবেই গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু চীনে সমস্যাটা অনেক বেশি জটিল—আমলাতন্ত্রের উত্তরাধিকারবিহীন ধরনের জন্য; এটা ভবিষ্যতের একটা কর্তব্য।

সাম্প্রতিক কালে বিরাট অ-ইয়োরোপীয় সভ্যতায়, বিশেষত চীন এবং ভারতবর্ষে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসের দিকে উৎসাহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎসাহ আছে বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, দার্শনিক এবং প্রাচ্য-তত্ত্বজ্ঞদের তরফে, কিন্তু কার্যত ঐতিহাসিকদের মধ্যে নয়। যে-কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে চীনা এবং ভারতীয় বিজ্ঞান তাদের কাছেই জনপ্রিয় নয় কেন? প্রয়োজনীয় ভাষাবিষয়ক এবং সাংস্কৃতিক হাতিয়ারের অভাব মূল উৎসের নিকটবর্তী হবার পক্ষে স্বভাবতই বাধাস্বরূপ এবং সত্যিই যদি কেউ প্রাথমিকভাবে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হয়, ইয়োরোপীয় ক্রমবিকাশ তার উৎসাহকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আরও গভীর কারণ আছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে-সব বিরাট সভ্যতায় গড়ে ওঠে নি, তার চর্চা স্বভাবতই কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় সমস্যা তুলতে চায়, কেমন ক'রে আধুনিক বিজ্ঞান প্রাচীন পৃথিবীর ইয়োরোপীয় অংশেই জন্মালো এবং তা তীব্র আকারেই তোলে। সত্যি সত্যিই প্রাচীন ও মধ্য যুগের এশীয় সভ্যতাগুলোর সিদ্ধি যতই বর্ণাঢ্য, সমস্যাগুলো ততই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে ওঠে। গত তিরিশ বছরে পশ্চিম দেশীয় বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো প্রত্যাখ্যানের দিকে ঝুঁকেছেন, যে-পর্বটি এই শতকের গোড়ায় যথেষ্ট চালু ছিল। যে-ছকে এই রকম অনুমান পেশ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বেশ অপরিচ্ছন্ন[৪৮] কিন্তু তারা কেন মার্জিত হবে না তার নিশ্চয়ই কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাস যখন তথ্যনিষ্ঠ অ্যাকাডেমিক চর্চার বিষয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে তখন কিছুকালের জন্য সম্ভবত অনুমানগুলোকেই অত্যন্ত গোলমেলে ঠেকেছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরাই সমাজের উপর বিজ্ঞানের প্রভাবকে দেখতে তৈরি ছিলেন, কিন্তু সমাজের দ্বারা বিজ্ঞান প্রভাবিত হয়েছে মানতে রাজী নন। এবং তাঁরা বিজ্ঞানের উন্নতিকে

দেখতে চেয়েছেন সম্পূর্ণত ধারণার আভ্যন্তরীণ স্বয়ংচালিত উৎপত্তি, তত্ত্বাদি, মানসিক অথবা গাণিতিক কৌশল এবং ব্যাবহারিক আবিষ্কারগুলোর সূত্রেই, প্রজ্বলিত মশালের মতো যা এক মহাপুরুষ থেকে অপর মহাপুরুষে হস্তান্তরিত হয়েছে। তাঁরা মূলত ছিলেন 'অভ্যন্তরবাদী' (internalist) অথবা 'আত্মচালনা-বাদী' (autonomists)। অপরপক্ষে 'ঈশ্বর একজন মানুষকে পাঠিয়েছিলেন যার নাম ছিল…' কেপলার[৪৯]।

অন্যান্য সভ্যতার চর্চা তাই প্রচলিত ঐতিহাসিক ভাবনাকে চিন্তার গভীর বিপাকে ফেলে। কারণ এই আলোচনা এমন এক স্পষ্ট এবং অনিবার্য ব্যাখ্যার প্রসঙ্গ তোলে যা এক প্রান্তে ইয়োরোপ ও অন্য প্রান্তে এশীয় সভ্যতার মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও তার পরিবর্তনশীলতার মৌলিক পার্থক্যকে প্রকাশ করবে, যে-পার্থক্য কেবলমাত্র ইয়োরোপেই আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্‌বর্তনের আখ্যান নয়, কিন্তু একমাত্র ইয়োরোপেই – গোলার্ধের অন্য অংশে সমান্তরালভাবে নজীরহীন – জাতীয়তাবাদ, প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ইত্যাদির বিশিষ্ট সহযোগিতায় পুঁজিতন্ত্রের ব্যাখ্যা দেবে। আমার বিশ্বাস এই ব্যাখ্যাগুলোকে আরও ছিমছাম করা যায়। ভাবনার রাজ্যে – ভাষা ও ন্যায়শাস্ত্র, ধর্ম ও দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব, সংগীত, মানবতাবাদ, সময় ও পরিবর্তন বিষয়ক ধারণা – বহুবিচিত্র এইসব কার্য-কারণের গুরুত্বকে কোনোক্রমেই অবহেলা করা তাঁদের উচিত হবে না। কিন্তু আলোচ্য সমাজের বিশ্লেষণ, তার বিন্যাস, তার ঝোঁক, তার প্রয়োজন ও তার রূপান্তরের বিষয়ে তাঁরা গভীরভাবে জড়িত হবেন। অভ্যন্তরবাদী বা আত্মচালনাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এ-রকম ব্যাখ্যা অবাঞ্ছিত। এই মতবাদীরা তাই সহজাতভাবে অন্য বিরাট সভ্যতার অনুশীলন পছন্দ করে না।

আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা রেনেসাঁসের শেষ পর্বের 'বৈজ্ঞানিক বিপ্লবে'র ব্যাখ্যায় যদি বিবরণের ন্যায্যতা বা এমনকি প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা হয়, যদি এই বিপ্লবের জন্য তাদের অত্যন্ত বৈপ্লবিক বিবেচনায় বর্জন করা হয়, এবং যদি একই সঙ্গে ভারতীয় এবং চীনারা পারে নি অথচ ইয়োরোপীয়রা পেরেছে এ-কথার ব্যাখ্যা করতে চাওয়া হয়, তাহলে অপ্রতিরোধ্য উভয়সংকটে পড়তে হবে। এর একটি শিঙ্‌কে বলা হয় শুদ্ধ আকস্মিকতা (pure chance) এবং অন্যটি হল জাতি-বৈরিতা, যতই লুকানো হোক না কেন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মকে সম্পূর্ণ দৈবের হাতে ছেড়ে দেবার অর্থ মানুষের মনের আলোকপ্রাপ্তির একটি মাধ্যম হিসেবে ইতিহাসের দেউলেপনাই ঘোষিত হওয়া। জলবায়ু এবং ভূগোলকে দৈব ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করলেও মুখ রক্ষা হবে না। কারণ তা সরা-সরি নগর-রাষ্ট্র, নৌ-বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বাস্তব ঘটনার প্রশ্ন নিয়ে আসে, স্বয়ং-চালনাবাদ যার মুখোমুখি হতে চায় না। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মতোই 'গ্রীক দৈবী সংঘটন' (Greek miracle) তখন আরও অলৌকিক থেকে যাবে। তাহলে

দৈবের বিকল্প কি ? একমাত্র সেই মতবাদ যে, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী, এক্ষেত্রে ইয়োরোপীয় 'জাতি' (race), অন্যান্য জন-গোষ্ঠী থেকে স্বভাবজ কিছু শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। মানবগোষ্ঠীর আলোচনায়, ভৌম-নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক শোণিততত্ত্ব (haematology) এবং এই জাতীয় বিষয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো প্রতিবাদ থাকতে পারে না, কিন্তু ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বটি রাজনৈতিক অর্থে জাতি-বৈরিতা এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই। ইয়োরোপীয় আত্মচালনা-বাদীর কাছে, আমার ভয় হয়, 'আমরাই একমাত্র মানুষ, জ্ঞানের জন্ম আমাদেরই সঙ্গে।' সে যাই হোক, যেহেতু জাতি-বৈরিতার (ন্যূনপক্ষে এর প্রকাশ) রূপগুলি যেমন চিন্তায় ভদ্র নয় তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতও নয়। আত্মচালনাবাদী তাত্ত্বিকেরা মহা বেকায়দায় পড়েছেন এবং আশা করা যায় তা কালে-কালে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে[৩০]। আমি তাই নির্ভয়ে আঁচ করছি এই মোক্ষম ইয়ো-রোপীয় শতাব্দীগুলোতে বিজ্ঞান ও সমাজের সম্পর্কে উৎসাহের বিরাট পুনর্জন্ম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যতার সমাজ-সংগঠন বিষয়ে এবং এক থেকে অন্যের মহত্ত্বের তফাৎ বিষয়ে গভীর চর্চা হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে চীন এবং পশ্চিম ইয়োরোপের মধ্যে বিশ্লেষণযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পার্থক্যসমূহ, কেন চীনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রাথমিক আধিপত্য এবং একমাত্র ইয়োরোপেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের জন্ম—এই উভয় ঘটনাকে পরিশেষে যতোটুকু সম্ভব আলোয় আলোকিত করবে। নিশ্চয়ই সংকীর্ণ গোঁড়ামি এখানে সাহায্য করতে পারে না এবং আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণের পথেই চলবো[৩১]।

নির্দেশিকা

১. Wang Ling, Lu Gwei-Djen, Ho Ping-Yü, Kenneth Robinson ও Tshao Thien-Chhin-এর সহযোগিতায় কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত সাত খণ্ডে *'Science and Civilisasion in China* লেখার সময়। ইতিপূর্বে আলোচনার সাধারণ ধারাটি লিখেছি 'Thoughts on the Social Relations of Science and Technology in China', *Centaurus*, ১৯৫৩,৩,৪০ এবং তারও আগে 'Science and Social Change', *Science and Society*, ১৯৪৬, ১০, ২২৪।

২. যে-সব চীনা পণ্ডিত ও বন্ধুদের কাছে আমার অপরিসীম ঋণ তাঁদের কয়েকজন হলেন : Hou Wai-Lu, Hsü Shih-Lien, Kuo Mo-Jo, Kuo Pen-Tao, Li Shu-Hua, Shih Sheng-Han, Thao Meng-Ho, Thang Phei-Sung, Wu Su-Hsüan, Wen I-To।

৩. E. Huntington-এর লেখা, বিশেষত *Mainsprings of Civilisation*, Wiley, New York, 1945।

৪. ইতিহাসের অভ্যন্তরবাদীদের ইতিহাসতত্ত্বের প্রধান বাধা হল ঐতিহাসিক কার্য-কারণ। অর্থনৈতিক নির্ধারণ সর্বত্র দেখতে পেয়ে এঁরা বলতে চান, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কার্যত বৈজ্ঞানিক ধারণার বিপ্লব। রেনেসাঁসন বা পুঁজিবাদের জন্ম ইত্যাদি সামাজিক অভ্যুত্থান থেকে নয়। এঁরা মূলতই ম্যালিকীয়, মানতেই চান না যে বৈজ্ঞানিকদেরও শরীর আছে, তাঁরা খানাপিনা করেন, অন্যান্যদের সঙ্গে সামাজিকভাবে বাঁচেন। এবং এ-কথাও মানতে চান না যে বৈজ্ঞানিকদের অবচেতন মনও থাকতে পারে।

৫. Edgar Zilsel যে-কথা সবিশেষ বলেন। এর গুরুত্ব অধুনা মধ্যযুগপন্থী A. C. Crombie স্বীকার করেছেন তাঁর 'The Relevance of the Middle Ages to the Scientific Movement' প্রবন্ধটিতে, যেটি সংকলিত হয়েছে K. F. Drew ও F. S. Lear-সম্পাদিত *Perspectives in Mediaeval History* (Rice University Semicentennial Volume, Univ., Chicago Press, 1963. p. 35)-তে। ওঁকে কোনোক্রমেই মার্কসবাদী বলা যায় না। (তাঁর 'Quantification in Mediaeval Physics' প্রবন্ধটিও দ্রষ্টব্য), সেটি সংকলিত আছে H. Woolf সম্পাদিত *Quantification* গ্রন্থে (Bobbs-Merrill, Indianopolis and New York, 1961, p. 13)

৬. Hirschfeld, Leipzig, 1931। বিখ্যাত চীন-তাত্ত্বিক Richard Wilhelm-এর পুত্র Hellmut Wilhelm-রচিত সোনালি ছোট একটি গ্রন্থ *Gesellschaft und Staat in China*, Verch, Peiping, 1944 থেকেও বিস্তর শিখেছি। দুঃখের কথা যে এই অ-মার্কসবাদী রচনাটি এখনো ইংরেজিতে অনূদিত হয় নি।

৭. *The History of the Late Revolution of the Empire of the Great Mogul*, মূলত ফরাসিতে প্রকাশিত, ১৬৭১, পারি। ১৯০৯-এ কলকাতায় পুনঃপ্রকাশিত, দাস। ২ জুন, ১৮৫৩, এঙ্গেলসকে লেখা মার্কসের চিঠি দ্রষ্টব্য।

৮. Ta Yü, Yü the Great। কিংবদন্তীর প্রাচীন সম্রাট, দ্বিতীয় মিলেনিয়মে শাঙ্ রাজত্বের পূর্ববর্তী।

৯. বর্তমানে তাদের দিতে হয় না। প্রতি শ্রম-দিবসের কমিউন-নির্দিষ্ট হারে তাদের দেওয়া হয়। কাজটা গ্রামের লোকেরা হাল্কা কাজের সময় করে। (A. L. Strong *Letter From China*, 1964, no. 15)। শ্রমের এই চূড়ান্ত এবং যুক্তিপূর্ণ ব্যবহারের ইতিহাস দু-হাজার বছরের এবং 'অর্থনৈতিক হাইকমাণ্ডের' একটি কাজ।

১০. দ্র. H. F. Schurmann, *The Economic Structure of the Yuan Dynasty*, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. 1956, pp. 146.

১১. দ্র. F. Tokei, 'Die Formen der chinesischen patriarchalischen Sklaverei in der Chou-Zeit, in *Opuscula Ethnologica Memoriae Ludovici Biro Sacra*, Budapest, 1959, p. 291।

১২. এর অর্থ নয় শিল্প ও ব্যবসা মধ্যযুগে কিছু কম ছিল। বরং (+) ১২ ও (+)১৩ শতাব্দীতে, বিশেষত দক্ষিণ সুঙে তা অনেক বেশি জাঁকিয়ে ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তৎসত্ত্বেও বিশিষ্ট আমলাতান্ত্রিক রূপগুলো বজায় থেকেছে।

১৩. Lu Gwei-Djen & J. Needham-এর প্রবন্ধ 'China and the Origin of (Qualifying) Examinations in Medicine, *Proc. Roy. Soc. Med.* 1963, 56, 63.।

১৪. মাদ্দারিনের উপর কুনফুশিয়সের বিরাট নৈতিক প্রভাব ছিল।

১৫. দ্র. *'Science & Civilisation in China'*, vol. 1, p. 103।

১৬. এই যুক্তিটি H. G. Creel-এর।

১৭. বৈপরীত্যটি প্রথম করেন André Haudricourt।

১৮. দ্র. *Science & Civilisation in China*, vol. 2. p. 576.

১৯. নিশ্চয়ই মধ্যযুগের 'মান্দারিন' প্রথা শোষণেরই, তবু 'এলিট'রা জন্মসূত্রাধীন না-হওয়ায় অভিজাত ও সওদাগরদের জীবনযাত্রাকে বাধা দিয়েছে। দ্রষ্টব্য : C. Brandt, B. Schwartz & J. K. Fairbank, *A Documentary History of Chinese Communism*, Harvard Univ Press, 1952 ; J. Needham, 'The Past in China's Present', *Centennial Review*, 1960. 4, 145, 281 ; *Pacific Viewpoint*, 1963. 4, 115।

২০. পরবর্তী কয়েক যুগে রুশ চীনা-বিশেষজ্ঞরা এশীয় সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক সমাজতান্ত্রিক কাজ করেছে, যদিও 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' প্রস্তাবটি বাদ দিয়ে।

২১. J. Simon, *Marxism Today*, 1962. 6 (no. 6)

২২. ঐ।

২৩. Yale Univ. Press, New Haven, 1957। অন্যান্য সূত্রে সমালোচনা করেন J. Needham, *Science & Society*, 1959, 23 58। আইনের দিক থেকে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য আলোচনা ভিট্‌ফোগেলের তত্ত্ব বিষয়ে Orlan Lee. 'Traditionelle Rechtsgebräuche und der Begriff d. Orientalischer Despotismus', *Zeitscher. f. vergl. Rechtswiss.* 1964, 66, 157।

২৪. গোষ্ঠী বা সামরিক জঙ্গীরা আভিজাত্যের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে লড়াই করে। গ্রামের প্রাণসত্তা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য V Dedijer, *Times*, 18 Nov. 1963, 'The Chinese Theory of Revolution'।

২৫. দ্র. L. A. Maverick, *China a Model for Europe* (Anderson, San Antonio, Texas, 1946)। গ্রন্থটিতে F. Quesnay-র *Le Despotisme de la Chine* (১৭৬৭)-এর অনুবাদ আছে।

২৬. সমালোচনা, E. G. Pulleyblank in *Bull. London School of Oriental and African Studies*, 1958, 21 (no 3)।

২৭. Liu Tzu-Chien, 'An Early Sung Reformer, Fan Chung-Yen', J. K. Fairbank-সম্পাদিত *Chinese Thought and Institutions* গ্রন্থে, Chicago Uuiv. Press, Chicago, 1957, p. 105।

২৮. এই ধারণাটি পাই হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক সহকর্মী Dr. R. Arthur-এর কাছে।

২৯. N. Jacobs-এর *The Origin of Modern Capitalism & Eastern Asia* (Univ. Press, Hongkong, 1958) পুস্তিকা। ওবের-পন্থী এই পণ্ডিত মার্কসের নাম নিপুণভাবে বাদ দিয়েছেন।

৩০. E. G. Pulleyblank, 'The Origins and Nature of Chattel-Slavery in China', *Journ. Econ. & Soc. History of the Orient*, 1958, 1, 185।

৩১. T. Pokora, 'Existierte in China eine Sklavenhaltergesellschaft ?', *Archiv. Orientalni*, 1963, 31, 353 ও E. Welskopf, 'Problem der Periodisierung d. alten Geschichte ; die Einordnung des alten Orients und Altamerikas in die Weltgeschichtliche Entwicklung, *Zeitschr. f. Geschichtswiss.* 1957. 5, 296। Welskolp-এর মতে E. Erkes বাড়াবাড়ি করেন, যখন

বলেন চীনে দাস-প্রথা নেই। তেমনি একই উল্টো বাড়াবাড়ি করেন তিনি, যেমন Erkes, *Das Problem der Sklaverei in China* (Akad. Verlag, Berlin, 1952) ও *'Die Entwicklung der chinesischen Gesellschaft von der Urzeit bis zur Gegenwart* (Akad. Verlag, Berlin, 1953)। C. M. Wilbur-এর সংকলনটি 'Slavery in China During the Former Han Dynasty (−206 to+25)' মূল উপকরণের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। (গ্রন্থটির প্রকাশক *Field Museum of Nat. Hist. Pubs.* (Anthropol. ser.), 1943, *34*, 1 – 490 (Pub. no. 525)।

৩২. J. Chesneaux-এর সমালোচনা 'Le Mode de Production Asiatique ; une nouvelle Étape de la Discussion', *Eirene* (in the press, 1964) ; 'Le Mode de Production Asiatiques ; quelques Perspectives de Recherche', 'Récents Travaux···, Pensée', 1964, no. 114। এই ধারার বিখ্যাত লেখক F. Tökei, 'Les Conditions de la Propriété foncière `a l'Époque des Tcheou' in *Acta Antiqua Acad. Scient. Huugar*, 1958, 6 (no. 3-4) ও *Sur le 'Mode de Production Asiatique'* (mimeogr.). Centre d' Études et de Rech. Marxistes, Paris, 1964, ও Pensée, 1964, no 114 ; M. Godelier, *La Notion de Mode de Production Asiatique* (mimeogr.), Univ. Press, Paris, 1964 ; 'Les Écrits de Marx et Engels sur le Mode de Production Asiatique. Pensée, 1964. no. 114।

৩৩. Dietz, Berlin.

৩৪. E. R. Leach, Hydraulic Society in Ceylon', *Past & Present*, 1959 (no 15), 2।

৩৫. *Science and Civilisation in China*, vol. 2, p. 564।

৩৬. *Ibid.*, vol. 2, p. 164 ; *The Problem of China*, Allen & Unwin, London, 1922, p. 194 থেকে।

৩৭. এই বৃত্তান্ত অংশত আছে আমার বন্ধুর আত্মজীবনীমূলক লেখায় : Kuo Yu-Shou, *La Lune sur le Fleuve Perle*, Bonne, Paris, 1963।

৩৮. J. Needham, 'The Chinese Contribution to the Development of the Mariner's Compass', *Scientia*, 1961, *55*, 1 ; *Acta do Congresso Internacional de Historia dos Descobrimentos*, Lisbon, 1961, vol. 2, p. 311।

৩৯. *Science & Civilisation in China*, vol. p. 57।

৪০. *Ibid.*, vols. 2, 3, 4, 6। A. C. Crombie-সম্পাদিত *Scientific Change* গ্রন্থে আমার লেখা 'Poverties and Triumphs of the Chinese Scintific Tradition'।

৪১. A. Beer, Ho Ping-Yü, Lu Gwei-Djen, J. Needham, E. G. Pullyblank & G. I. Thompson : 'An Eighth-Century Meridian Line' ; I-Hsing's Chain of Gnomons and the Prehistory of the Metric System', *Vistas in Astronomy*, 1961, *4*, 3।

৪২. R. Dawson (Oxford Univ. Press, 1964) সম্পাদিত *The Legacy of China* গ্রন্থে 'China's Scientific Influence on the World' রচনা।

৪৩. J. Needham, 'The Peking Observatory in+1280 and the Development of Equatorial Mounting', *Vista in Astronomy*, 1955, *1*, 67।

৪৪. J. Needham, *The Development of Iron and Steel Technology in China*, *Newcomen Society*, London, 1958।

৪৫. ১৯৬১-তে নিউকাসল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আর্ল গ্রে বক্তৃতা, 'Classical Chinese Contribution to Mechanical Engineering' এবং আমার নিউকোমেন সেক্টেনারি বক্তৃতা, 'The Pre-Natal History of the Steam Engine', *Trans. Newcomen Soc.* (গ্রন্থস্থ)।

৪৬. J. Needham, Wang Ling & D. J. de S. Price, *Heavenly Clockwork*, Cambridge Uuiv. Press, 1960।

৪৭. Lynn White তাঁর *Mediaeval Technology and Social Change* (Oxford Univ. Press, 1962) গ্রন্থে প্রাক-রেনেসাঁস জগতের উপর চীনা আবিষ্কারের বিরাট প্রভাবের কথা আলোচনা করেন।

৪৮. ১৯৩১ সালে লণ্ডনে International Congress of the History of Science সম্মেলনে B. Hessen-এর বিখ্যাত আলোচনা, 'On the Social & Economic Roots of Newton's *Principia*'। অনেক যুগ পর R. K. Merton-এর 'Science, Technology & Society in Seventeenth-Century England', *Osiris*, 1938, 4, 360-362 প্রবন্ধে একই প্রসঙ্গ আরো সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে। E. Zilsel-এর গবেষণা এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৪৯. J. Agassi, বহুবার পশ্চাদ্ভূত হলেও, *Towards a Historiography of Science* প্রবন্ধে ভালই অগ্রসর হয়েছেন (Mouton, The Hague, 1963 ; *History and Theory. Studies in the Philosophy of History*, Beiheft 2)। বিজ্ঞের সপক্ষে ইনি Walter Pagel -কে ব্যবহার করতে পারেন নি। মার্কসবাদকে আরোহণবাদীদের ত্রুটি বলে বাদ দেন এবং চীনের খোঁজ করেন না।

৫০. D. J. de S. Price আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী, এশীয় দান বিষয়ে বিস্তর জানেন, কিন্তু তাঁর *Science since Babylon* (Yale Univ. Press, 1961) আইনস্টাইনের একটা 'hunch'-কে অনুসরণ করে এবং গ্রীক ও রেনেসাঁসের বিজ্ঞানকে মনে করে আকস্মিক ঘটনা। A. R. Hall তাঁর 'Merton Revisited' (*History of Science*, 1963, 2, 1) লেখায় বিজ্ঞানের 'বাহ্য' ইতিহাসতত্ত্বকে আক্রমণ করেন, কিন্তু এশীয় রচনাদির কথা বলেন না। একমাত্র A. C. Crombie, এই তিনজনের মধ্যে, সঠিক বোধ প্রকাশ করেন।

৫১. J. D. Bernal-এর সম্মানার্থে প্রস্তুত গ্রন্থ *The Science of Sciences* (সম্পাদনা করেন M. Goldsmith ও A. McKay, ১৯৬৪)-তে এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

DR. JOSEPH NEEDHAM অন্যত্র প্রকাশিত তাঁর *Science and Society in East and West* রচনাটির 'কপি' পাঠিয়েছেন এবং ৩০ এপ্রিল ১৯৬৮ তারিখের পত্রে এক্ষণের কার্ল মার্কস সংখ্যায় এটি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। অনুবাদ : বীথি বসু।

কার্ল মার্ক্সের
জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি

১৮১৮	মে ৫	রাইনল্যাণ্ডে ট্রিয়ের শহরে কার্ল হাইনরিখ মার্কসের জন্ম। মার্কস-পরিবারের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ। ট্রিয়েরে কলেজের পাঠ সাঙ্গ।
	অক্টোবর ১৫	বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে পাঠ শুরু। প্রেয়সী জেনি ভন্ ডেস্টফলেনের বাক্ দান।
	অক্টোবর ২২	বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে প্রবেশ। তরুণ হেগেলপন্থীদের সঙ্গে পরিচয়। পিতার মৃত্যু।
	এপ্রিল	জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'থিসিস' ('ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনচিন্তার পার্থক্য') প্রদান ও 'ডক্টরেট' লাভ।
	জানুয়ারি	প্রাশিয়ান সেন্সর-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে মার্কসের প্রবন্ধ রচনা এবং সেটি পরে আর্নল্ড রুগের 'আনেক্‌ডোটা' পত্রে প্রকাশ (১৮৪৩)।
	এপ্রিল	'রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকায় লেখা শুরু।
	অক্টোবর	কোলোন্-এ গমন (ও আর্নল্ড রুগের সহযোগিতায়) 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ। এঙ্গেলসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। *Kritik des Hegelschen Staatsrecht* (হেগেলের 'অধিকার দর্শনে'র সমালোচনা) রচনা।
১৮৪৩	জানুয়ারি	প্রাশিয়ান সরকার কর্তৃক 'রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা ও ১ এপ্রিল থেকে কণ্ঠ-রোধের আদেশ দান।
	মার্চ ১৭	সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় গ্রহণ।
	জুন ১৯	জেনি-র সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন।
	অক্টোবর	পারি গমন। আর্নল্ড রুগের সঙ্গে একত্রে *Deutsche Französischen Jahrbücher* (জর্মন-ফরাসি-

		বার্ষিকী) সম্পাদনা, ১৮৪৪ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ, এতে 'হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনার ভূমিকা' ও 'ইহুদি সমস্যা' (*On the Jewish Question*) প্রকাশ। এঙ্গেলসেরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ।
		পারির *Vorwärts* পত্রে রচনা প্রকাশ।
		'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি' রচনা।
	জুন	সাইলিশীয় তন্তুবায় শ্রমিক অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানিয়ে 'জর্মন-ফরাসি বার্ষিকী'তে নিবন্ধ রচনা।
	সেপ্টেম্বর	পারিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের সাক্ষাৎকার। একত্রে *Die Heilige Familie* (পবিত্র পরিবার) রচনা।
		'১৮৪৪-এ ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' নিয়ে এঙ্গেলসের রচনা।
		এই বছরই হাইনে, প্রুদোঁ প্রমুখের সঙ্গে যোগাযোগ।
১৮৪৫	জানুয়ারি	প্রাশিয়ান সরকারের চাপে ফরাসি সরকার কর্তৃক পারি থেকে বহিষ্কৃত।
	ফেব্রুয়ারি	ব্রুসেল্‌সে আগমন। 'পবিত্র পরিবার'-এর প্রকাশ।
	বসন্তকাল	'ফয়ারবাখ প্রসঙ্গে' (*Theses on Feuerbach*) রচনা। এঙ্গেলসের ব্রুসেল্‌স-এ আগমন।
		এঙ্গেলস-রচিত 'ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা' লিপ্‌জিগে প্রকাশিত।
	জুলাই	মার্কস ও এঙ্গেলসের ইংলণ্ড গমন — উদ্দেশ্য : ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাহিত্য সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ। চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এবং 'লীগ অব দি জাস্ট'-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।
	ডিসেম্বর	প্রাশিয়ান নাগরিকত্ব ত্যাগ (উদ্দেশ্য : বহিষ্কার আদেশ প্রতিরোধ)।
		মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক *Die deutsche Idcologie* (জর্মন ভাবাদর্শ) রচনা।
		প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের জন্য লণ্ডন, পারি ও জার্মানি-তে যোগাযোগ সমিতি (Correspondence Committee) স্থাপিত। জর্মন

		'প্রকৃত সমাজবাদী'দের ('True Socialists') স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রে মার্কস-এঙ্গেলসের রচনা ব্রুসেল্‌স কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।
		এঙ্গেলস কর্তৃক পারি কমিটি সংগঠন।
	ডিসেম্বর	প্রুধোঁকে সমালোচনা ও ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রে আন্নেন্‌কোফ্‌ (Annenkov)-কে লেখা মার্কসের পত্র।
		Misère de la philosophie (দর্শনের দারিদ্র্য) রচনা।
	ফেব্রুয়ারি	'লীগ অব দি জাস্ট'-এর লণ্ডন কমিটির প্রতিনিধি (J. Moll) কর্তৃক ব্রুসেল্‌স-এ মার্কস-এঙ্গেলসের কাছে সদস্যপদ গ্রহণ ও সহায়তার আবেদন।
	জুন	উক্ত সংস্থার লণ্ডন কংগ্রেসে এঙ্গেলসের যোগদান এবং অতঃপর সংস্থাটির নতুন নাম 'কমিউনিস্ট লীগ'।
	নভেম্বর-ডিসেম্বর	লণ্ডনে 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলসের অংশ গ্রহণ। মার্কসের উপর একটি কার্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ।
	ডিসেম্বর	ব্রুসেল্‌স-এ জর্মন শ্রমিক সমিতির কাছে 'মজুরি, শ্রম ও পুঁজি' (*Wage Labour and Capital*) বিষয়ে মার্কসের বক্তৃতা।
		Deutsche Brüsseler Zeitung পত্রে নিয়মিত রচনা।
১৮৪৮	ফেব্রুয়ারি	মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক লণ্ডনে জর্মন ভাষায় *Manifest der Kommunistischen Partei* (সাম্যবাদী ইস্তাহার) প্রকাশ।
	মার্চ	বেলজিয়াম থেকে বহিষ্কৃত ও পারি আগমন। পারিতে তখন 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' সংঘটিত হচ্ছে। 'কমিউনিস্ট লীগ' পুনর্গঠন – মার্কস চেয়ারম্যান ; স্ক্যাপার (Schapper) সেক্রেটারি ; এঙ্গেলস, মোল্‌ ও বয়ের (Bauer) কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য।
		জার্মানিতে বিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক জর্মন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কার্যসূচি প্রণয়ন।

মার্কস-এঙ্গেলসের পারি ত্যাগ ও জার্মানি গমন—উদ্দেশ্য সেখানে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ। মার্কসের কোলোন্-এ 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকা সম্পাদনা (১ জুন প্রথম সংখ্যার প্রকাশ) এবং ১৮৪৮-৪৯ এ অনেকগুলি নিবন্ধ রচনা।

আগস্ট — মার্কসের বার্লিনে ও ভিয়েনায় গমন ও নানা বক্তৃতা।

১৮৪৯ ফেব্রুয়ারি ৮ — 'বিপ্লবে উস্কানি'র অপরাধে কোলোন্-এ মার্কসের বিচার। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন ও মুক্তি লাভ। প্রাশিয়া থেকে মার্কসের বহিষ্কার। 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ'-এর প্রকাশ বন্ধ। পারি আগমন। সেখানেও বহিষ্কার-আদেশ।

আগস্ট — লণ্ডন আগমন (এবং ১৮৮৩-তে মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী বসবাস)।

এঙ্গেলসের লণ্ডন আগমন ও পরে ম্যাঞ্চেস্টার গমন এবং সেখানে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে কর্ম গ্রহণ।

মার্কসের কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু।

'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এর প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত। অনুবাদ: হেলেন ম্যাকফার্লেন। 'রেড রিপাবলিকান' পত্রে প্রকাশিত।

কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ভাষণ মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক রচনা।

'নয়ে রাইনিশে রিভ্যু' পত্রিকা প্রকাশ। উক্ত পত্রিকার ছয়টি সংখ্যায় 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম ১৮৪৮-১৮৫০' ও এঙ্গেলসের 'জার্মানিতে কৃষক বিদ্রোহ' এবং আরো অনেক রচনা প্রকাশ। মার্কস জার্মানিতে হঠকারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন লাভ করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক *New York Daily Tribune*-এ নানা নিবন্ধ প্রকাশ।

মার্কসের কনিষ্ঠ কন্যার মৃত্যু।

মার্কসের *Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon* (লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার) গ্রন্থ এবং 'কোলোন্-এ কমিউনিস্টদের বিচার' প্রসঙ্গে পুস্তিকা প্রকাশ।

		মার্কসের প্রস্তাবক্রমে কমিউনিস্ট লীগের অন্তিম বিলোপ।
		মার্কসের পুত্র এডগারের মৃত্যু।
		'নয়ে ওডের-ৎসাইটুঙ' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ।
		The New American Cyclopoedia-র জন্য রচনা।
		লাসাল্লে (Lassalle)-র সঙ্গে পত্রবিনিময়।
		Grundrisse der Kritique der politischen Ökonomie (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনার ভূমিকা) রচনা। পরবর্তী গ্রন্থের 'ভূমিকা' স্বরূপ ১৮৫৯-এ প্রকাশিত।
		Das Volk পত্রিকা (লণ্ডন)-য় রচনা প্রকাশ।
	জুন	*Zur Kritik der politischen Ökonomie* (রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে) গ্রন্থ ও ১৮৫৭-র 'ভূমিকা' প্রকাশিত।
১৮৬০		*Herr Vogt* প্রকাশিত।
১৮৬১		জার্মানি পরিদর্শন। লাসাল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
১৮৬১-৬২		ভিয়েনার *Die Presse* পত্রিকায় আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ বিষয়ে রচনাবলি প্রকাশ।
১৮৬৪		লাসাল্লের মৃত্যু।
	সেপ্টেম্বর	'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন' বা 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠা। সংগঠনের জন্য মার্কসের 'উদ্বোধনী ভাষণ' ও 'নিয়মাবলি' প্রণয়ন।
১৮৬৫	ফেব্রুয়ারি	মার্কসের পরামর্শে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক 'ন্যাশনাল রিফর্ম লীগ' প্রতিষ্ঠা।
	জুন	সাধারণ পরিষদের কাছে মার্কস-প্রদত্ত ভাষণ *Value Price and Profit* (মূল্য, বাজার দর ও মুনাফা) —পরে *Wages, Price and Profit* নামে পরিচিত।
	সেপ্টেম্বর	লণ্ডনে 'আন্তর্জাতিকে'র প্রথম অধিবেশন।
১৮৬৬	জুলাই	'আন্তর্জাতিকে'র জেনিভা কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের জন্য মার্কসের ট্রেড ইউনিয়ন-সংক্রান্ত নির্দেশাদি প্রণয়ন।
		আন্তর্জাতিকের মুখপত্র *Der Vorbote*।

সেপ্টেম্বর ৩-৮	জেনিভায় 'আন্তর্জাতিকে'র প্রথম কংগ্রেস।
এপ্রিল	*Das Kapital* প্রথম খণ্ড নিয়ে মার্কসের হামবুর্গে প্রকাশকের কাছে গমন।
সেপ্টেম্বর	লুসানে 'আন্তর্জাতিকে'র দ্বিতীয় কংগ্রেস।
সেপ্টেম্বর ১৭	হামবুর্গে *Das Kapital*, vol. I প্রকাশিত।
নভেম্বর	আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের আলোচনা। ব্রুসেল্‌স-এ 'আন্তর্জাতিকে'র তৃতীয় কংগ্রেস। বাকুনিন কর্তৃক 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব সোস্যালিস্ট ডেমোক্রেসি' প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৮–৬৯	পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে ক্রমাগত ধর্মঘট আন্দোলন।
১৮৬৯	রুশ অর্থনীতি বিষয়ে মার্কসের বিশেষ অধ্যয়ন এবং প্রথম 'আন্তর্জাতিকে' (জেনিভায়) সাধারণ পরিষদে রুশ অংশের প্রতিনিধিত্বে সম্মতি দান। এইসেনাক্ (Eisenach)-এ জর্মন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেস। বেল (Basle) শহরে 'আন্তর্জাতিকে'র চতুর্থ কংগ্রেস। বাকুনিন সম্পর্কে 'গোপন নির্দেশ'। মার্কস কর্তৃক সাধারণ পরিষদে আয়ার্ল্যাণ্ডে গ্ল্যাড-স্টোনের পুলিশ-শাসন সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন।
জুলাই	ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ শুরু ও এ-বিষয়ে সাধারণ পরিষদে মার্কসের প্রথম বক্তৃতা।
সেপ্টেম্বর ৯	সেডানে ফরাসি সৈন্যদলের পরাজয়ে ও ফ্রান্সে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠায় সাধারণ পরিষদে ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কসের দ্বিতীয় বক্তৃতা।
সেপ্টেম্বর ১৮	এঙ্গেলসের ম্যাঞ্চেস্টার পরিত্যাগ ও স্থায়ীভাবে লণ্ডনে বসবাস আরম্ভ এবং 'আন্তর্জাতিকে'র সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।
মার্চ	পারি কমিউনের প্রতিষ্ঠা। এর সমর্থনে বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের সমাবেশ সংগঠনে মার্কস-এঙ্গেলসের উদ্যম। সাধারণ পরিষদে উভয়ের বক্তৃতাবলি। কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে কুগেলমান্-কে মার্কসের পত্রাবলি। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মার্কস-লিখিত বক্তৃতা *Civil War in France* গৃহীত।

	সেপ্টেম্বর	'আন্তর্জাতিকে'র দ্বিতীয় লণ্ডন অধিবেশন। বাকুনিনের সঙ্গে বিরোধ। শ্রমজীবীদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন ও ক্ষমতা-লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কসের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত।
	এপ্রিল	'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত। দি হেগ্-এ 'আন্তর্জাতিকে'র পঞ্চম কংগ্রেস। 'আন্তর্জাতিক' থেকে বাকুনিনের বহিষ্কার। সাধারণ পরিষদের নিউ ইয়র্ক গমন। আমস্টার্ডাম-এ মার্কসের ভাষণ। বাকুনিনের বিরুদ্ধে প্রচার-পুস্তিকা। মার্কস গুরুতর অসুস্থ। গোথা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে জর্মন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দুই বিরোধী দলের ঐক্য-স্থাপন। মার্কসের *Critique of the Gotha Programme* প্রকাশিত। বাকুনিনের মৃত্যু। *Anti-Dühring* রচনায় এঙ্গেলসকে মার্কসের সহযোগিতা।
১৮৭৮	জুলাই	*Vorwärts* পত্রে (১৮৭৭-৭৮) প্রকাশিত *Anti-Dühring* গ্রন্থের প্রকাশ।
	অক্টোবর	জার্মানিতে সামাজবাদ-বিরোধী আইন ঘোষিত।
১৮৭৯-৮৩		মার্কস গুরুতর পীড়িত।
১৮৭৯	সেপ্টেম্বর	বেবেল্ প্রমুখের কাছে সুবিধাবাদী নীতি বিষয়ে লিখিত পত্র প্রেরণ। এঙ্গেলসের *Socialism Utopian and Scientific* প্রকাশিত।
	এপ্রিল	লাফার্গ প্রমুখকে ফরাসি শ্রমিক দলের কার্যসূচি প্রণয়নে মার্কস-এঙ্গেলসের সহায়তা।
১৮৮১	ডিসেম্বর ২	মার্কসের স্ত্রী জেনির মৃত্যু।
১৮৮২	জানুয়ারি	'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এর রুশ সংস্করণে মার্কস ও এঙ্গেলসের ভূমিকা রচনা।
	ফেব্রুয়ারি-অক্টোবর	গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য মার্কসের

		অ্যালজিয়ার্স, ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ।
	জানুয়ারি ১১	মার্কসের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেনি লঙ্‌গুয়েটের মৃত্যু।
	মার্চ ১৪	কার্ল হাইনরিখ মার্কসের মৃত্যু।
	মার্চ ১৭	লণ্ডনে হাইগেট সমাধি-ভূমিতে মার্কস সমাধিস্থ। তথায় এঙ্গেলসের বিখ্যাত বক্তৃতা।
		এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের 'ক্যাপিটাল' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ।
		'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডের প্রথম ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত। স্যামুয়েল মুর ও এডোয়ার্ড আভেলিং -অনূদিত।
১৮৮৮	জানুয়ারি	এঙ্গেলস-সম্পাদিত ও স্যামুয়েল মুর-অনূদিত 'সাম্যবাদী ইস্তাহার'-এর প্রথম অনুমোদিত ইংরাজি অনুবাদের প্রকাশ।
		এঙ্গেলস কর্তৃক মার্কসের 'ক্যাপিটাল' তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ।
		মার্কসের *Class Struggle in France (1848-1850)*-এর নতুন সংস্করণে এঙ্গেলসের ভূমিকা।
	আগস্ট ৫	ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের মৃত্যু।
		স্টাটগার্টে কার্ল কাউট্‌স্কি কর্তৃক মার্কসের *Theorien über den Mehrwert (Theories of Surplus Value* প্রকাশিত।

এই ঘটনাপঞ্জি প্রধানত Franz Mehring, *Karl Marx The Story of his Life*, 2nd edn., London 1948 এবং John Lewis, *The Life and Teaching of Karl Marx*, New York, 1965 গ্রন্থদ্বয়ের সহায়তায় প্রস্তুত হয়েছে।

সম্পাদক।

কার্ল মার্কসের রচনাবলি

[কার্ল মার্কস তাঁর ৬৪ বছরের জীবনে অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পুস্তিকা, বক্তৃতা, বিতর্ক, ইস্তাহার রচনা করেছেন। দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে সাহিত্য বা পার্টি সংগঠন ইত্যাদি পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় তাঁর অবাধ বিচরণভূমি। কিন্তু আজপর্যন্ত তাঁর সমগ্র রচনাবলি (মূল ভাষাতেও) কোথাও সংকলিত হয় নি – তাঁর কিছু-কিছু অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ ইংরাজিতেও অনুবাদ হয়েছে অতি সম্প্রতি। পূর্ব বার্লিনের মার্কস-এঙ্গেলস ইনস্টিটিউট একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সদ্য ৩৪টি খণ্ডে মূল জর্মন ভাষায় মার্কসের রচনাবলি প্রকাশ করেছে। এটিও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ কিনা সন্দেহ। মার্কসের সমগ্র রচনাবলি প্রকাশের দুটি অতীত পরিকল্পনার উল্লেখ আপাতত প্রাসঙ্গিক ১. *Aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle*, Stuttgart, 1902, সংকলনকারী ফ্রানৎস্ মেহ্‌রিঙ্—মোট ৪ খণ্ড (অতঃপর শুধু 'মেহ্‌রিঙ' নামে উল্লিখিত)। ২. *Karl Marx / Friedrich Engels. Historisch-kritische Gesamtausgabe*, Marx-Engels Institute, Moscow, 1927-1931, সংকলক রিয়াজানভ্ (D. Riazanov), মোট ৪২ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার কথা, কিন্তু অসম্পূর্ণ (অতঃপর শুধু 'মেগা')। এই দ্বিতীয়োক্ত, সংকলনেই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মার্কসের যাবতীয় বই, প্রবন্ধ, পত্রগুচ্ছ একত্র করার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৩১-এ রিয়াজানভ্-এর 'অন্তর্ধানে'র পর V. Adoratzki-র উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু মূল পরিকল্পনার ৪২ খণ্ডের স্থানে মোট ১২ খণ্ডের বেশি প্রকাশিত হয় নি। ইংরাজি ভাষায় মার্কসের প্রধান রচনাবলি অনূদিত হয়েছে ; পৃথক সংস্করণে সেগুলি এবং দুই খণ্ডে নির্বাচিত রচনাবলি আমাদের একমাত্র সম্বল। ইংরাজি সংস্করণ সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত। নিচে মার্কসের প্রধান রচনাগুলির একটি কালানুক্রমিক বিবরণ দেওয়া হল। রচনা – রচনাকাল – প্রকাশ-স্থল – প্রথম বা প্রধান ইংরাজি অনুবাদ (ইং-অনু) – সম্ভবক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ত সূত্র : এই পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে।]

Differenz der democritischen und epikureischen Naturphilosophie – ১৮৪১ / 'মেহ্‌রিঙ' ও 'মেগা'। পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি অনুবাদ চোখে পড়ে নি। *Science and Society* (New York) পত্রিকায় (XII/1, 1948) এবং মস্কো-প্রকাশিত *Marx & Engels on Religion* সংকলনে (১৯৫৭) অংশবিশেষ উদ্ধৃত। জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের 'ডক্টরেট'-এর গবেষণা-পত্র। গ্রীক বস্তুবাদী দুই দার্শনিক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য তরুণ হেগেলপন্থী মার্কস এখানে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্র. এ-সংখ্যার পৃ ১২-১৪।

২. Rheinische Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি – ১৮৪২-৪৩, কোলোন্ / অংশত 'মেহ্‌রিঙ'-এ সম্পূর্ণ 'মেগা'-য় সংকলিত। ইং-অনু নেই। মোজেল-এর আঙুর চাষীদের সমস্যা, দরিদ্র অরণ্যবাসীদের কাষ্ঠসংগ্রহের অধিকার, সরকারি সেন্সর-ব্যবস্থার বিরোধিতা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ। দ্র. এ-সংখ্যার পৃ ১৪-১৫।

৩. Kritik des Hegelschen Staatsrecht – ১৮৪২-৪৩ / 'মেগা'। ইং-অনু নেই। হেগেলের 'রাষ্ট্রীয় অধিকারে'র সমালোচনা। দ্র. পৃ ১৫-১৬।

৪. Anekdota (আর্নল্ড রুগে-সম্পাদিত) পত্রিকার প্রবন্ধাবলি – ১৮৪৩ / 'মেহ্‌রিঙ' ও 'মেগা'। ইং-অনু নেই।

৫. Deutsch-Französische Jahrbücher পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ – ১৮৪৪ / 'মেহ্‌রিঙ' ও 'মেগা'। H. J. Stenning, *Selected Essays*, 1926 (অতঃপর শুধু 'স্টেনিং') এবং T. B. Bottomore, (ed.) *Karl Marx : Early Writings*, 1963 (অতঃপর শুধু 'বটোমোর')। ইং-অনু হয়েছে। 'হেগেলের অধিকার দর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা' এবং 'ইহুদি সমস্যা প্রসঙ্গে' (*Zur Judenfrage*) প্রবন্ধদ্বয় বিখ্যাত। দ্র. পৃ ১৪-১৬।

৬. Vorwärts পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ – ১৮৪৪, পারি / অংশত 'মেহ্‌রিঙ' এবং সম্পূর্ণ 'মেগা'য়। ইং-অনু (আংশিক), 'স্টেনিং'।

৭. Ökonomisch-philosophische Manuskripte – 1844 / 'মেগা' ১৯৩২ ইং-অনু ১৯৫৯, *The Economic and Philosophical Manuscript, 1844* ('১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি')। প্রথম অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা। বিযুক্ত শ্রম, মজুরি, অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ ও হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা। 'অ্যালিয়েনেশন' প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা। দ্র. পৃ ১৯-২০, ১৩৪।

৮. Die heilige Familie – ১৮৪৫, ফ্রাংকফুর্ট / 'মেগায়' পুনর্মুদ্রিত। ইং-অনু *The Holy Family* ('পবিত্র পরিবার'), 1957। এঙ্গেলসের সঙ্গে

যুগ্মভাবে লিখিত। ব্রুনো বাউয়ের ও তাঁর ভ্রাতাদের 'পবিত্র পরিবার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থে হেগেলীয় ভাববাদের সমালোচনা ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। দ্র. পৃ ২০-২১।

৮ক. Theses on Feuerbach – ১৮৪৫ / মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস এই রচনাটি খুঁজে পান এবং ১৮৮৮-তে প্রকাশিত তাঁর *Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Ideology* গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে এটি মুদ্রিত করেন। মস্কো থেকে প্রকাশিত *Marx & Engels on Religion* (১৯৫৭)-তে ইং-অনু পাওয়া যায়। ফয়ারবাখ ছিলেন উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের একজন জর্মন দার্শনিক। হেগেলীয় ভাববাদ থেকে তিনি বস্তুবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন – মার্কস ও এঙ্গেলসের উপর তাঁর অনেকখানি প্রভাব আছে। সংক্ষিপ্ত ১১টি সূত্রের (Theses) সহায়তায় মার্কস যান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রতিপক্ষে নিজের চিন্তাধারার সারাংশ উপস্থিত করেছেন। প্রতিটি সূত্রই বহুল উদ্ধৃত হয়ে থাকে – যেমন একটি সূত্র : 'দার্শনিকেরা এ-যাবৎ কেবল নানাভাবে বিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, আসল কথা অবশ্য তাকে বদল করা।'

৯. Die deutsche Ideologie – ১৮৪৬ / 'মেগা'য় প্রথম সম্পূর্ণ মুদ্রণ। ইং-অনু *The German Ideology* (জর্মন ভাবাদর্শ), ১৯৩৮-এ R. Pascal-এর সম্পাদনায় ১ম ও ৩য় খণ্ডের প্রকাশ। এটিও মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ রচনা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এখানেও ('পবিত্র পরিবার'-এ তার সূচনা) বিশ্লেষিত। সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ ক'রে মানুষ সমাজ-সম্পর্ক ও সম্পত্তি সংগঠন করে। তারই ভিত্তিতে নির্দিষ্ট চেতনা-পদ্ধতি তৈরি হয়। প্রতি যুগেই শাসক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাই যুগের চিন্তাধারা বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু বিপ্লবী শ্রেণীর নতুন চিন্তাধারা তাকে চ্যালেঞ্জ করে। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে সমসাময়িক লেখক (যেমন, ফয়ারবাখ, বাউয়ের, স্টার্নার) বা তথাকথিত 'প্রকৃত সমাজবাদী'দের সমালোচনা। দ্র, পৃ ২১-২২। Misère de la philosophie – ১৮৪৭, পারি / প্রথম জর্মন অনুবাদ ১৮৮৫। 'মেগা'য় পুনর্মুদ্রিত। ইং-অনু *Poverty of Philosophy* (দর্শনের দারিদ্র্য) অনুবাদ : Henry Quelch, 1900। প্রুদোঁর *Philosophy of Poverty* (দারিদ্র্যের দর্শন)-এর জবাব। এই প্রথম ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সুস্পষ্ট সূত্রসমূহ নির্দেশিত হল। পুঁজিবাদের দ্বারা শ্রমিক-শোষণের প্রকৃত অর্থনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষিত। 'শ্রম' ও 'শ্রম-শক্তি'র পার্থক্য নির্দেশ। অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ ঐতিহাসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত, কোনো 'চিরন্তন অর্থনৈতিক স্তর' (categories)-এর বহিঃপ্রকাশ নয়। শ্রেণীসংগ্রামের (class struggle) তত্ত্ব প্রচার। দ্র. পৃ ২৩-২৪।

Deutsche-Brüsseler Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি – ১৮৪৭-৪৮ / অংশত 'মেহ্‌রিঙ'-এ, সম্পূর্ণ 'মেগা'য়। ইং-অনু 'স্টেনিং'-এ আংশিক। পোল্যাণ্ডের উপর বক্তৃতা, Grün ও Heinzen-এর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ এবং *Die moralisierende Kritik und die kritische Moral* এই সময়ে লিখিত।

১২. Speech of Dr. Marx on Protection, Free Trade and the Working Classes – ১৮৪৮ / *The Northern Star* পত্রিকায় (লণ্ডন, ১৮৪৭) প্রথম প্রকাশিত।

১৩. Manifest der Kommunistischen Partei – ১৮৪৮, লণ্ডন / মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ রচনা। 'মেগা'য় পুনর্মুদ্রিত। ইং-অনু *The Manifesto of the Communist Party* ; *The Red Republican* পত্রিকায় (১৮৫০) Helen Macfarlane কর্তৃক। ইং-অনু প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ, ১৮৮৬। Samuel Moore-এর অনুবাদ, ১৮৮৮ ; Eden & Cedar Paul-এর অনুবাদ, ১৯৩০ ; বিলেতে লেবার পার্টির উদ্যোগে ইং-অনু H. J. Laski-র ভূমিকাসহ, ১৯৪৮। প্রথম রুশ অনুবাদ (মার্কসের নতুন ভূমিকাসহ) : জেনিভা, ১৮৮২। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' মার্কসবাদের মৌলিক তত্ত্ব ও সাম্যবাদ অর্জনের বাস্তব পন্থা সম্পর্কে প্রথম সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি। ১৮৪৭ নভেম্বর 'কমিউনিস্ট লীগে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে এটি রচনার নির্দেশ আসে এবং ১৮৪৮ ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে তখন '৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব এবং বৃটেনে চার্টিস্ট আন্দোলনের চরম পর্যায়। এই 'ইস্তাহার' রচনার পটভূমি ও তাৎপর্য জানতে হলে এর বিভিন্ন সংস্করণে মার্কস-এঙ্গেলসের ভূমিকাগুলি, এঙ্গেলসের *History of the Communist League* এবং মার্কসের *Class Struggle in France, 1848-50* পাঠ করা দরকার। এতদিন পর্যন্ত সমাজবাদীরা নানা কাল্পনিক পরিকল্পনা বা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল – নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনের কোনো বিপ্লবী তত্ত্ব ছিল না। 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' এই জন্য যুগান্তকারী রচনা যে এতেই প্রথম বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ ও শ্রমিক আন্দোলনের পূর্ণ মিলন ঘটল। এই ইস্তাহারের মূল চিন্তাধারাকে পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় : ক. শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ; খ. পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ ; গ. সর্বহারা শ্রেণীর বিকাশ ; ঘ. সমাজতন্ত্র থেকে শ্রেণীহীন সমাজ এবং ঙ. সাম্যবাদী দলের লক্ষ।

১৪. Lohnarbeit und Kapital – ১৮৪৮ / 'নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত (১৮৪৯) এবং 'মেগা'য় পুনর্মুদ্রিত। ইং-অনু *Wage Labour and Capital* (মজুরি-শ্রম ও পুঁজি), অনুবাদ J. L. Joynes,

1885। ১৮৪৭-এ ব্রুসেল্‌সে জর্মন শ্রমিক সমিতির কাছে প্রদত্ত মার্কসের বক্তৃতাগুলির উপর ভিত্তি ক'রে রচিত পুস্তিকা। এটি রচনার উদ্দেশ্য : পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করা। 'ক্যাপিটাল' রচনার প্রস্তুতির ইঙ্গিত।

১৫. Neue Rheinische Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি – ১৮৪৮-৪৯, কোলোন্‌ / 'মেহ্‌রিঙ'-এ আংশিক। ইং-অনু নেই।

১৬. Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Okonomische Revue-এ প্রকাশিত রচনাবলি – ১৮৫০, লণ্ডন-হামবুর্গ-নিউইয়র্ক / যেমন (পরবর্তী রচনা দ্রষ্টব্য) :

১৭. Die Klassenkämpfe in Frankreich, 1848-50 – ১৮৫০ / উপরোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত। এঙ্গেলসের ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রণ, ১৮৯৫। ইং-অনু *The Class Struggle in France, 1848-50* (ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম) অনুবাদ : Henry Kuhn, 1924। পরবর্তী 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার' ও 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনাদ্বয়ের সঙ্গে একত্রে পাঠ্য। এই রচনা তিনটিতে ফ্রান্সে ১৮৪৮-এর বিপ্লব থেকে ১৮৭১-এর পারি কমিউন পর্যন্ত বিপ্লবী ঘটনাবলির বিশ্লেষণ আছে। এত সমস্ত বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনাবলি যখন ঘটে যাচ্ছে সেই মুহূর্তেই মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে সেগুলিকে পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছেন। আর সেই মুহূর্তেই এগুলি বিশ্লেষণ করছে কেমন ক'রে মার্কসবাদ জটিল শ্রেণী-সম্পর্ক ও শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে বিচারে সক্ষম এবং শ্রমিকশ্রেণীর সম্মুখে নির্ভুল পথ কোন্‌টি।

১৮. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte – ১৮৫২, নিউ ইয়র্ক / J. Weydemeyer-এর *Die Revolution* পত্রিকায় (২য় সংখ্যা, ১৮৫২) প্রকাশিত। ইং-অনু *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার), অনুবাদ : Daniel de Leon। প্রথমে *The People* পত্রিকায়, পরে গ্রন্থকারে, নিউ ইয়র্ক, ১৮৯৮। পূর্ববর্তী ফরাসি বিপ্লবের (১৮৪৮) তাৎপর্য, যা পূর্বোক্ত রচনায় প্রকাশিত, সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে গ্রন্থারম্ভ হয়েছে। তা সংক্ষেপে হচ্ছে এই : ১৮৩০ জুলাই-এ বুরবঁ আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে 'বুর্জোয়া রাজা' লুই ফিলিপের রাজত্ব শুরু হয়েছিল – কিন্তু ১৮৪৮-এর গণ অভ্যুত্থানে তারও পতন ঘটে। লুই ফিলিপের শাসন ছিল 'ব্যাংক-মালিকদের শাসন' এবং 'অর্থনৈতিক আভিজাত্য'ই সেখানে স্বীকৃতি লাভ করত। এই শাসনের অবসানে একটি প্রজাতন্ত্র (রিপাবলিক) প্রতিষ্ঠিত হল, কিন্তু তারও নেতৃত্ব বিত্তবানদের হাতে। যে-শ্রমিকেরা ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারি বিপ্লব সম্ভব করেছিল, তাকেই নিরস্ত্র করা এদের প্রথম কাজ হল। জুন

মাসে শ্রমিকদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে গেল। যে-সমস্ত শ্রেণী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিল একে-একে সকলেরই পরাজয় ঘটল। প্রথমে শিল্পপতিরা পাতি-বুর্জোয়াদের শেষ করল (জুন, ১৮৪৯), তারপর 'অর্থবান অভিজাত'রা ঐ শিল্পপতিদের শেষ ক'রে পুনরায় ক্ষমতায় পৌছাল। সম্পত্তিবান শ্রেণী-গুলির এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেন জনৈক ভাগ্যান্বেষী – সম্রাট নেপলিয়নের বংশধর লুই বোনাপার্ট। নিপীড়িত কৃষি-সমাজের সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে তিনি 'রিপাবলিকে'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন এবং ১৮৫১-র 'কু্য দেতাঁ' (Coup d' état) (১৮ই ব্রুমেয়ার নামে পরিচিত) নিজেকে সার্বভৌম অধিকারসম্মত শাসক রূপে ঘোষণা করলেন। কিছু পরেই তিনি নিজেকে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে আখ্যাত করলেন। সুতরাং শ্রমিক বা বুর্জোয়া শ্রেণী কেউই শাসন-ক্ষমতা পেল না। ১৮৭০-এ ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ পর্যন্ত 'বোনাপার্ট'-শাসন চলল। রাইনের সীমানা পর্যন্ত ফরাসি সীমানাকে প্রসারিত করতে গিয়ে প্রাশিয়ানদের কাছে তাঁর পতন ঘটল এবং ১৮৭০-এ 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গঠিত হল। ইতিমধ্যে পারির শ্রমিকেরা পারির প্রতিরক্ষায় সশস্ত্র হয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত 'সরকার' পারির প্রতিরক্ষার চাইতে শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণে সচেষ্ট হল। ১৮৭১ জানুয়ারিতে প্রাশিয়ানদের হাতে 'সরকারে'র পরাজয় ঘটল – 'সরকার' ভার্সাইতে গিয়ে অবসর যাপন করতে লাগল। অতঃপর পারির শ্রমিকশ্রেণী ও ভার্সাইয়ের 'সরকার'-এর মধ্যে লড়াই চলতে থাকল। ১৮৭১-এর মার্চ মাসে পারির শ্রমিকেরা 'পারি কমিউন' প্রতিষ্ঠা করল। কিন্তু ভার্সাইয়ের 'সরকার' প্রাশিয়ানদের সঙ্গে মিলে একে নির্মম-ভাবে বিনষ্ট করল। মার্কস তাঁর তিনখানি রচনায় (ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম, ১৮ই ব্রুমেয়ার ও ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ) এই সমস্ত ঘটনার বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা করেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তি, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, পাতি-বুর্জোয়া 'সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট'দের সুবিধাবাদী স্বরূপ উদ্ঘাটন, পুঁজিবাদী শাসনের মুখপাত্ররূপে বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ, শ্রমিক-কৃষক মিত্রতার তাৎপর্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ এতে স্থান পেয়েছে।

১৯. **Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln** – ১৮৫৩, বের্ন্ ও বস্টন / ১৮৭৫-এ মার্কস কর্তৃক উপসংহার অংশ রচনা ও ১৮৮৫-তে নতুন সংস্করণ ; ১৯১৪-তে মেহ্রিঙ-এর ভূমিকাসহ পুনঃপ্রকাশ। ইং-অনু নেই। মার্কস স্বয়ং ১৮৪৯-এ কোলোন্-এ 'বিপ্লবের উস্কানিদাতা' রূপে অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে মুক্তিলাভ করেছিলেন। কোলোন্-এ কমিউনিস্টদের যে-বিচার হয়েছিল তার স্বরূপ ও তাৎপর্য নিয়ে রচিত একটি পুস্তিকা।

The New York Daily Tribune পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি – ১৮৫১-৬২ / ১৯১৭-য় প্রকাশিত D. Riazanov-সম্পাদিত ২ খণ্ড *Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels, 1852-62*, Dietz, Stuttgart (অতঃপর শুধু 'জেসাম' নামে উল্লিখিত) সংকলনের অন্তর্ভুক্ত এবং পৃথকভাবেও পুনর্মুদ্রিত। এইসব রচনার মধ্যে *Revolution and Counter Revolution in Germany*, *The Eastern Question* (ক্রিমিয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে) *Palmerston* বিখ্যাত। এ ছাড়া, স্পেনের বিপ্লবকালীন অবস্থা, ১৮৫৭-তে ভারতবর্ষে প্রথম জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিশ্লেষণে বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির দুষ্কৃতির উন্মোচন এবং ভারতীয় সমাজ-কাঠামোর বিশ্লেষণ, চীন-ইংরাজ যুদ্ধ ও তাই-পিং বিপ্লব, মার্কিন গৃহযুদ্ধের বিশ্লেষণ ইত্যাদি এ-কালীন যাবতীয় ঘটনার উপর নিপুণ আলোচনা এই পর্বে লক্ষ করা যায়।

২১. The People's Paper পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলি – ১৮৫৩-৫৮, লণ্ডন / কোথাও সংকলিত হয় নি। পত্রিকার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবসে মার্কস-প্রদত্ত ১৮৪৮-এর ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা তার অন্যতম।

২২. Der Ritter vom edelmüthigen Bewusstsein – ১৮৫৩, লণ্ডন ও নিউ ইয়র্ক / কোথাও সংকলিত হয় নি। ইং-অনু নেই। August Willich-এর বিরুদ্ধে বিতর্ক।

২৩. Neue Oder-Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহ – ১৮৫৫, ব্রেসলু / 'জেসাম'-এ অংশত ও *Die Neue Zeit*-এ প্রকাশিত। ইং-অনু নেই।

২৪. The Free Press এবং The Diplomatic Revue পত্রিকায় প্রকাশিত রচনা – ১৮৫৬-৫৮ / পৃথকভাবেও পুনর্মুদ্রিত। ইং-অনু *Secret Diplomatic History of the 18th Century* এবং *The Story of the Life of Lord Palmerston* উল্লেখযোগ্য। মার্কসের কন্যা E. M. Aveling কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে লণ্ডনে ১৮৯৯-এ প্রকাশিত।

২৫. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie – ১৮৫৭-৫৮ / মস্কোয় ১৯৩৯ ও ১৯৪১-এ প্রথম প্রকাশিত। পূর্ণাঙ্গ ইং-অনু নেই। কিন্তু ১৯৫৭-য় রচিত 'ভূমিকা'টি অনূদিত ও সংকলিত হয়েছে (পরবর্তী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ১৮৫৭-৫৮ তে রচিত এই সমস্ত 'অর্থনৈতিক পাণ্ডুলিপি' মার্কসের মৃত্যুর অনেক পরে পাওয়া গেছে। 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা' ও 'ক্যাপিটাল' রচনার রীতিমতো খসড়া বলা যায় এগুলিকে। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপির একটি অংশ সম্প্রতি ইং-অনু হয়েছে : *Pre-Capitalist Economic Formations* (*Formen* নামেও পরিচিত), ed. & intrn. E. J. Hobsbawm, London, 1964। ['প্রাক্-পুঁজিবাদী

অর্থনৈতিক সংগঠন' প্রসঙ্গে এক্ষণের বর্তমান সংখ্যার 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে' এবং 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ' প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।]

২৬. Zur Kritik der politischen Ökonomie – ১৮৫৯, বের্লিন / Karl Kautsky কর্তৃক মার্কসের ১৮৫৭-য রচিত 'ভূমিকা'(পূর্ববর্তী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)-সহ এই গ্রন্থের একটি সংস্করণ প্রকাশিত (Stuttgart, 1907)। ইং-অনু *A Contribution to the Critique of Political Economy*। কাউট্স্কি-সংস্করণ থেকে অনুবাদ : N. I. Stone, 1909। মার্কস মূলত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের ১ম খণ্ড রূপে এটি রচনার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু পরে পরিকল্পনা বদল ক'রে আট বছর পর 'ক্যাপিটাল'-এর ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এটিকে 'ক্যাপিটাল' রচনার সূত্রপাত বলা যায়। এর দুটি পরিচ্ছেদে পণ্য ও অর্থ বিষয়ে যে-আলোচনা আছে তা বক্তব্যে 'ক্যাপিটাল'-এর ১ম খণ্ডের সঙ্গে প্রায় এক। পণ্য ও অর্থের যে-তত্ত্ব এখানে আছে তা ক্যাপিটাল-এ উদ্বৃত্ত মূল্যের আবিষ্কার ও পুঁজিবাদ বিকাশের প্রকৃতি ও নিয়ম সম্পর্কিত পূর্ণ বিশ্লেষণে পরিণতি পেয়েছে। এই রচনায় এমন কিছু নেই যা ক্যাপিটাল-এ আরো বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নি। একমাত্র বুর্জোয়া অর্থনীতিকদের বিরুদ্ধে যে-সব বিতর্ক এখানে আছে তা ক্যাপিটাল-এর ১ম খণ্ডে বর্জিত। পরে মার্কসের *Theories of Surplus Value* গ্রন্থে সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে উঠেছে এবং কিছুটা এঙ্গেলসের *Anti-Dühring* গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ) মার্কসের রচনাংশ 'From the Critical History'-তে। ১৮৫৭-র বিখ্যাত 'ভূমিকা'-য় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধ্রুপদী সূত্রায়ণ হয়েছে।

২৭. Das Volk পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলি – ১৮৫৯ / কোথাও সংকলিত হয় নি। ইং-অনু হয় নি।

২৮. The New American Cyclopoedia-তে প্রদত্ত রচনাবলি – ১৮৬০, নিউ ইয়র্ক / অন্যত্র সংকলিত হয় নি। *Jean Baptiste Bernadotte*, *Simon Bolivar* ও *Blücher* ইত্যাদি রচনা উল্লেখযোগ্য।

২৯. Herr Vogt – ১৮৬০, লণ্ডন / সংকলিত হয় নি। ইং-অনু নেই। Dr. Karl Vogt ছিলেন ফ্রাংকফুর্ট অ্যাসেম্ব্লির একজন বামপন্থী নেতা এঁর নীতি ও ব্যক্তিগত দুর্নীতির বিরুদ্ধে মার্কসের ১৯২ পৃষ্ঠার বই। ১৯২৭-এ লিপ্‌জিগে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

Die Presse পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ – ১৮৬১-৬২, ভিয়েনা / উত্তর-আমেরিকার গৃহযুদ্ধ নিয়ে লেখাটি উল্লেখযোগ্য।

৩১. The Beehive পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ – ১৮৬১-৭০, লণ্ডন / ইংলণ্ডের শ্রমিক-দের পক্ষ থেকে রচিত বক্তৃতাটি অন্যতম।

৩২. Address and Provisional Rules of the International Working-men's Association – ১৮৬৪, লণ্ডন / লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন হল-এর জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ। ১৮৬৬-তে প্রথম জর্মন অনুবাদ, জেনিভা-র *Der Vorbote* পত্রিকায়। ১৯২৪-এ লণ্ডনে পুনর্মুদ্রণ।

৩৩. Sozial-Democrat পত্রের প্রবন্ধ – ১৮৬৫ / প্রুধোঁর বিরুদ্ধে রচিত। *The Poverty of Philosophy*-র ১৮৯২-এর জর্মন সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত।

৩৪. Declarations against J. B. von Scweizer – ১৮৬৫ / উক্ত বছরে তিনটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত :

৩৫. Value, Price and Profit – ১৮৬৫ / 'আন্তর্জাতিকে'র সাধারণ পরিষদে মার্কসের ইংরাজি বক্তৃতা। তাঁর কন্যা Eleanor Marx-Aveling কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত লণ্ডন, ১৮৯৮। অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত। মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য বিষয়ে অর্থনীতির মূল্যতত্ত্ব এই পুস্তিকায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বিশেষত ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ উল্লেখযোগ্য। 'ক্যাপিটাল'-এ যে-কথা বিস্তৃত আছে, এখানে তা সহজ ভঙ্গিতে রচিত। মার্কস দেখাচ্ছেন অর্থনীতিবিজ্ঞান কেমনভাবে শ্রমিকদের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারে। উপসংহারে মার্কস দেখিয়েছেন যে মজুরি ও মুনাফার স্তর-নির্ণায়ক কোনো 'অর্থনৈতিক নিয়ম' কোথাও নেই – এটা স্থির হবে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য থেকে – বিবদমান দুই শ্রেণীর আপেক্ষিক শক্তি থেকে। সুতরাং মার্কসের নির্দেশ : 'পুরো দিনের কাজের জন্য পুরো দিনের মজুরি' – এই পুরনো নীতি নয়, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পতাকায় লেখা থাকা দরকার – 'মজুরি-পদ্ধতির অবসান'।

৩৬. Manifestos, Programmes and Declarations of the General Council of the International – 1867-73 / নানাভাবে পুনর্মুদ্রিত। এর মধ্যে উদ্বোধনী ভাষণ, প্রেসিডেণ্ট লিনকন্ ও জনসনের কাছে বক্তব্য, বেলজিয়ান হত্যাকাণ্ড ও ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ বিষয়ে নানা বক্তৃতা।

৩৭. Das Kapital. Kritik der politischen Öknomie. vol. 1 – ১৮৬৭, হামবুর্গ / ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৮৭২-৭৩ ; ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ এঙ্গেলস কর্তৃক সংশোধিত ১৮৮৩ ও ১৮৯০। ইং-অনু *Capital. A Critical Analysis of Capitalist Production* ; অনুবাদ : Samuel Moore ও Edward Aveling ; সম্পাদনা : এঙ্গেলস, ১৮৮৭। ৪র্থ জর্মন সংস্করণের ইং-অনু *Capital*, অনু : E & C Paul ; ভূমিকা : G. D. H. Cole, 1928। ফরাসি অনু : *Le Capital*, অনুবাদ : J. Roy ; পারি, ১৮৭৫। রুশ অনুবাদ, ১৮৭২ এপ্রিল। অতঃপর সমস্ত বিশ্বে অসংখ্য অনুবাদ ও সংস্করণ হয়েছে। [সম্প্রতি নাকি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের একটি ভারতীয় সংস্করণ হয়েছে –

মালয়ালম ভাষায় ৩ খণ্ডই অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য প্রবর্তক কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ, কোট্টয়ম]। মার্কসের সমস্ত জীবনের দানবিক পরিশ্রমের ও মহাপ্রতিভার সৃষ্টি 'ক্যাপিটাল' (পুঁজি)। আমৃত্যু এটি রচনায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু ১ম খণ্ডের প্রকাশই তিনি জীবিত অবস্থায় দেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এঙ্গেলস ২য় ও ৩য় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৫ ও ১৮৯৪-তে প্রকাশ করেন। কিন্তু এঙ্গেলসেরও মৃত্যু (১৮৯৫) হওয়ায় অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি Karl Kautsky কর্তৃক *Theorien über den Mehwert* (Theories of Surplus Value) নামে প্রকাশিত হয় (১৯০৫-১০)। [বি. ভ্র. এ-সংখ্যায় মরিস ডবের প্রবন্ধ]। মার্কসের বিশ্ববীক্ষা এত চরম উৎকর্ষে অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি। আধুনিক পৃথিবীর সব থেকে বিতর্কিত রচনা। জীববিজ্ঞানে ডারউইন যেমন যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন, সমাজবিজ্ঞানে তেমন মার্কস। [কথিত আছে, মার্কসের ইচ্ছা ছিল 'ক্যাপিটাল' তিনি ডারউনকে উৎসর্গ করবেন, এ-বিষয়ে ডারউনের সঙ্গে তিনি যোগাযোগও করেছিলেন]। ক্যাপিটাল-কে বলা হয়েছে সর্বহারা শ্রেণীর 'বাইবেল'। আধুনিক সমাজবিবর্তনের অর্থনৈতিক নিয়ম উদ্ঘাটন করাই ছিল মার্কসের লক্ষ। মার্কস এখানে একজন বৈজ্ঞানিক। এতে তিনি দুটি জিনিস আবিষ্কার করেছেন মানবসমাজের বিবর্তনের নিয়ম (ঐতিহাসিক বস্তুবাদ) এবং উদ্বৃত্ত মূল্য, যা পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার বিশেষ নিয়মের চাবিকাঠি। উভয় আবিষ্কারের দ্বারা মার্কস পুঁজিবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও কীভাবে পুঁজিবাদী সমাজ তার নিজস্ব ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তার বিবরণ দিয়েছেন। পুঁজিবাদী শ্রেণী কেমনভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে তার গূঢ় রহস্য, পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী-সংঘর্ষ, শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ব্রত – তথা ক্ষমতা গ্রহণ ক'রে ও পুঁজিবাদ উৎখাত ক'রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা – সবই মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন। 'ক্যাপিটাল' ১ম খণ্ড : পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রকৃতি ও তার বিকাশের নিয়ম এই খণ্ডে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই খণ্ডে ৮টি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে পণ্য (commodity)-এর স্বরূপ আলোচিত। সমস্ত গ্রন্থের এই প্রথম পরিচ্ছেদটিই সব থেকে দুরূহ। পুঁজিবাদী উৎপাদন হচ্ছে পণ্য উৎপাদন, ফলে সামাজিক সম্পদ এক বিপুল পণ্য সঞ্চয় (accumulation of commodities)-রূপে প্রতিভাত হয়। পণ্য অবশ্যই শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন, যার ব্যাবহারিক মূল্য আছে ও যা বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। পণ্যের তাই দুটি স্বরূপ প্রয়োজন-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য। প্রথম মূল্যটি স্থির হয় মানুষের প্রয়োজন মেটানোর দ্বারা। কিন্তু দ্বিতীয়টি স্থির হয় কেমন ক'রে ? অর্থাৎ পণ্যসমূহের মধ্যে এমন কী সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তারা

বিনিময়-মূল্যে পরস্পরের কাছে সমীকৃত ? মার্কসের উত্তর : প্রতিটি পণ্য মানুষের শ্রম নিয়োগ ক'রে উৎপন্ন হচ্ছে, অতএব তার মধ্যে আছে কিছু পরিমাণ সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়। তাই কোনো পণ্যের দর (valuc) স্থিরীকৃত হবে তার মধ্যে কতটা ঐ সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময় যুক্ত আছে তার দ্বারা। এই বিশ্লেষণ থেকে মার্কস অর্থ (money)-এর স্বরূপ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন ও দেখিয়েছেন কোন্ রহস্যে অর্থ মূল্যব্যবস্থার মাপকাঠি ও পণ্যের গতি (circulation)-নির্ধারক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় ভাগে মার্কস দেখিয়েছেন অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর নির্ভর করে অর্থের অধিপতি হিসাবে পুঁজিবাদীর উপর, যে শ্রমিকের শ্রম-শক্তি ক্রয় করতে সক্ষম। শ্রম-শক্তিও একটা পণ্য যা ক্রয় ও বিক্রয় করা যায়। অন্য পণ্যের ক্ষেত্রেও যা সত্য, শ্রম-পণ্যের বেলাতেও সেই একই নিয়ম। যেমন, কোনো শ্রমিক যদি তার নিজের শ্রম-শক্তির মূল্য উৎপাদন করতে ৬ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাহলে যখনই তার অতিরিক্ত শ্রম করবে তখনই উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিবাদী গ্রাস ক'রে থাকে। তৃতীয় ভাগে আরো গভীরভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য সম্পর্কে মার্কস আলোচনা করেছেন। এটাই পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির মূল চাবি কাঠি। শ্রম-পদ্ধতি তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম বা মূল কাজটি, কাজের বিষয়টি ও যন্ত্রপাতি। পুঁজিবাদী শ্রম-শক্তি ক্রয় করে পণ্য উৎপাদনে তাকে ব্যবহার করতে – মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করতে। তার পুঁজি স্থির (constant) ও পরিবর্তনশীল (variable)। প্রথমটি কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জন্য এবং দ্বিতীয়টি শ্রম-শক্তি ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত। সুতরাং 'উদ্বৃত্ত মূল্যের হার'-এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় : কতটা পরিবর্তনশীল পুঁজি নিয়োগ ক'রে কতটা উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জিত হল তার অনুপাত। পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রবণতাই হল উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বাড়িয়ে যাওয়া, অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ বাড়িয়ে যাওয়া। তাই পুঁজিবাদী যুগের গোড়ার দিকে শ্রমের সময় বাড়িয়ে যাওয়াই ছিল পুঁজিবাদী পদ্ধতি (মার্কস ব্রিটেনের উদাহরণ দিয়েছেন)। চতুর্থ ভাগে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারাও শ্রমের উৎপাদনশক্তি বাড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রম-সময় বাড়িয়ে যে-উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হয় তাকে পূর্ণ (absolute) উদ্বৃত্ত মূল্য এবং শ্রম-সময় কমিয়ে যে-উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হয় তাকে আপেক্ষিক (relative) উদ্বৃত্ত মূল্য বলা হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন তিনটি স্তর পার হয়েছে : ক. সরল সমবায় (simple co-operation) – যাতে কয়েকজন কারিগর একত্র সমবেত হয়ে প্রত্যেকে একটি সম্পূর্ণ (finished) বস্তু তৈরি করছে ; খ. উৎপাদন (manufacture) – যাতে শ্রম-বিভাজনের দ্বারা

উৎপাদন হয় এবং গ. আধুনিক শিল্প (modern industry) – যাতে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতির সহায়তায় উৎপাদন। এই শেষোক্ত অংশে মার্কস যন্ত্রপাতির স্বরূপ ও পরিণতি এবং শ্রমিকদের উপর তার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পঞ্চম ভাগে মার্কস পূর্ণ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের কোনো-কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ষষ্ঠ ভাগে 'মজুরি' নিয়ে আলোচনা। যেহেতু শ্রমের কোনো নিজস্ব মূল্য নেই, তাই মজুরিকে শ্রমের দাম মনে করা ভুল। মজুরি দিয়ে যা কেনাবেচা হয় তা হল শ্রমিকের শ্রম-শক্তি। সপ্তম ভাগে মার্কস দেখিয়েছেন পুঁজির সঞ্চালন (circulation) পদ্ধতিতে তিনটি স্তর আছে ক. কিছু অর্থ উৎপাদন-উপায় (means) ও শ্রম-শক্তিতে রূপান্তরিত হল ; খ. শ্রম-শক্তির নিয়োগে উৎপাদন-উপায় পণ্যে রূপান্তরিত হল, যার মূল্যের মধ্যে রয়ে গেছে আদিতে নিয়োজিত পুঁজি ও তার সঙ্গে যুক্ত একটি উদ্বৃত্ত মূল্য এবং গ. উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের দ্বারা এই মূল্য পুনরায় অর্থে রূপান্তরিত হয়। মার্কস দেখালেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি হচ্ছে একই সঙ্গে পুঁজি-সঞ্চয় পদ্ধতি। যতই পুঁজি সঞ্চিত হতে থাকে ততই স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির অনুপাত বাড়তে থাকে। ক্রমশ আরো বড় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের হাতে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। তার ফলে ক্রমশ শ্রম-শক্তি ক্রয়ের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় একদল শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়তে থাকে, যারা ('industrial reserve army') পুঁজিবাদী শোষণের স্বার্থে শ্রমের সঞ্চয় (reservoir)-রূপে থেকে যায়। পুঁজি সঞ্চয় পাশাপাশি সামাজিক দুর্দশা সঞ্চয়ে প্রতিভাত হতে থাকে। পুঁজিবাদী শ্রেণীর সম্পদবৃদ্ধি শ্রমিকশ্রেণীর দুরবস্থা বাড়িয়ে দেয়। অষ্টম ভাগে আদিম সংগঠন (primitive accumulation) নিয়ে আলোচনা। পুঁজিবাদী উৎপাদনে উৎপাদন-উপায় ও শ্রম-শক্তি ক্রয়ের উপযুক্ত প্রাথমিক সম্পদ সঞ্চয় আবশ্যক, আর চাই মজুরিহীন শ্রমিক, অর্থাৎ সম্পত্তিহীন এমন এক সর্বহারা শ্রেণী তৈরি করা দরকার, যার শ্রম-শক্তি ছাড়া কিছু বিক্রয় করার নেই। পরিশেষে মার্কস দেখাচ্ছেন কেমন-ভাবে পুঁজিবাদ বিকাশের নিয়মগুলিই পুঁজিবাদের অবসানের দিকে চলেছে। এখানেই 'ক্যাপিটাল' ১ম খণ্ড সমাপ্ত।

৫৮. Addresses of the General Council of the International – ১৮৭১, লণ্ডন / পৃথকভাবে প্রকাশিত একাধিক সংস্করণ। প্রধানত দুটি রচনা উল্লেখযোগ্য : ক. *On the War* ও খ. *The Civil War in France* (পরবর্তী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

৫৯. The Civil War in France – ১৮৭১, লণ্ডন / ইংরাজিতেই প্রকাশিত। এঙ্গেলসের ভূমিকা ও পারি কমিউনের উপর লেনিনের বক্তৃতাসহ সংস্করণ,

লণ্ডন, ১৯২১। ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ)সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ তাৎপর্য-পূর্ণ। তাঁর মতে প্রাশিয়ানদের পক্ষেই এটি ন্যায়যুদ্ধ। কিন্তু যে-মুহূর্তেই বিস্‌মার্ক একে আগ্রাসী যুদ্ধে পরিণত করলেন তখনই জর্মন শ্রমিকেরা তার যে-বিরোধিতা করেছিল মার্কস তাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। অতঃপর পারি কমিউনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ। কমিউনই প্রথম সর্বহারার একনায়কতন্ত্র (dictatorship of the proletariat), (দ্র. এঙ্গেলসের ভূমিকা)। কমিউন প্রমাণ করেছে 'বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে আয়ত্ত' করা যায় না ; কিন্তু তাকে 'চূর্ণ' ক'রে নিজস্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে (আরো দ্র. কুগেলমান্‌কে লেখা মার্কসের চিঠি, এপ্রিল ১৮৭১)। কমিউনের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাণ বিশ্লেষিত হয়েছে। [বিশেষ দ্র. ১৭ ও ১৮ সংখ্যক গ্রন্থ]।

'Alliance Pamphlet' – ১৮৭৩, লণ্ডন ও হামবুর্গ / সংকলিত হয় নি। 'আন্তর্জাতিকে'র হেগ্‌ কংগ্রেসের নির্দেশে বাকুনিন্‌ ও তাঁর সহযোগীদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে রচিত রিপোর্ট ও তথ্য।

Randglossen zum Gothaer Parteiprogramm – ১৮৭৫ / মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস কর্তৃক *Neue Zeit*-এ প্রকাশিত, ১৮৯১। ইং-অনু *Critique of the Gotha Programme*, লণ্ডন, ১৯৩৩। C. P. Dutt-সম্পাদিত সংস্করণ, ১৯৩৮। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির তত্ত্ব ও কর্মসূচির মূল প্রশ্ন নিয়ে এটি রচিত। ১৮৭৫-এ জার্মানির গোথা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত জর্মন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্যবিধায়ক সম্মেলনের খসড়া কার্যসূচির উপর প্রস্তুত সমালোচনা। জার্মানির সুবিধাবাদী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি এটিকে গোপন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নেতৃত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এঙ্গেলস এটি প্রকাশ করেন (১৮৯১)। খসড়া কার্যসূচি বা 'গোথা কার্যসূচি'র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তুত করা। কিন্তু 'ঐক্যে'র খাতিরে তা নীতির ক্ষেত্রে কিছু-কিছু আপোষপন্থা গ্রহণ করেছিল – বিশেষত ফার্দিনান্দ লাসালের নেতৃত্বে একদল বিভেদপন্থীর সঙ্গে। তারই বিরুদ্ধে মার্কসের গঠনমূলক সমালোচনা। বক্তব্যগুলো অত্যন্ত মূল্যবান : ক. মার্কস দেখাচ্ছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা সমাজ-তন্ত্রে অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা তৈরি করেছে ও কী পন্থায় সামাজিক উৎপাদন সমাজতান্ত্রিক সমাজে বণ্টন করা হবে। সমাজতন্ত্র হচ্ছে সাম্যবাদের প্রথম স্তর এবং এর নীতি হচ্ছে : 'প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেকের শ্রম অনুসারে'। এটাই ক্রমশ পরিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছাবে, যার নীতি হবে : 'প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুসারে, প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে' ; খ. মার্কস 'শ্রমের উৎপন্নকে ন্যায্য বণ্টন কর' এই সংস্কারবাদী দাবি (slogan)-কে আক্রমণ করলেন, কারণ এই দাবির মধ্যে তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি

আছে। শ্রমের উৎপন্নকে বণ্টন করা সর্বদাই উৎপাদনপদ্ধতির পরিণামে ঘটবে। মার্কস উৎপাদনের অবস্থাকে বিপ্লবায়িত করার কথা বললেন ; গ. শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তুলনায় আর সবাই প্রতিক্রিয়াশীল, এমন ধারণাকেও মার্কস আক্রমণ করলেন। সকলকে একবাক্যে 'প্রতিক্রিয়াশীল' তকমা না দিয়ে প্রত্যেক ঐতিহাসিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করার কথা বললেন ; ঘ. গোথা কার্যক্রমের সংকীর্ণ জাতীয় লক্ষের প্রতিপক্ষে মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের ইঙ্গিত দিলেন ; ঙ. তিনি 'মজুরির লৌহদৃঢ় নিয়মে'র ধারণা খণ্ডন করলেন ও দেখালেন যে তাতে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কখনোই সর্বনিম্ন অস্তিত্বরক্ষার স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারে না ; চ. তিনি 'স্বাধীন রাষ্ট্রে'র সংস্কারবাদী দাবিকেও আক্রমণ ক'রে বললেন পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে আছে একটির অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের কাল। রাজনৈতিক রূপান্তরের কালও এইসঙ্গে আসবে, যাতে রাষ্ট্র সর্বহারার বিপ্লবী একনায়কতন্ত্র ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

৪২. 'From the Critical History' — ১৮৭৮ / এঙ্গেলসের *Anti-Dühring* গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০ম পরিচ্ছেদ মার্কসের রচনা। *Marx and Engels on Religion* সংকলনটি (লণ্ডন, ১৯৩৫) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৪৩. 'Enquete Ouvrière' — ১৮৮০ / *Revue Socialiste* পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৮৮০) প্রকাশিত। ইং-অনু *A Worker's Inquiry*, লণ্ডন, ১৯৩৩ (C P G B)। সম্প্রতি *Karl Marx : Selected Writings in Sociology and Social Philosophy*, ed. & intrn., T. B. Bottomore & M. Rubel, Pelican Books, 1967 বইটিতে এটির পুনর্মুদ্রণ হয়েছে নতুন অনুবাদে। শ্রমিকদের কাছে ১০০টি প্রশ্ন করা হয়েছে এতে — প্রথমে ২৫০০০ সংখ্যা অতিরিক্ত ছেপে ফ্রান্সের শ্রমিকদের কাছে ছড়ানো হয়েছিল।

৪৪. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, vol. 2 — ১৮৮৫, হামবুর্গ / মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত। ইং-অনু *Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 2. The Process of the Circulation of Capital* ; অনুবাদ : Ernst Untermann, London, 1907। 'ক্যাপিটাল' ১ম খণ্ডে যে-সব বিষয় আলোচনা বাকি ছিল অবশিষ্ট দুটি খণ্ডে তা আলোচিত হয়েছে। ১ম খণ্ড পুঁজিবাদী উৎপাদনের অন্তর্নিহিত সত্তা (*essence*) নিয়ে আলোচনা করেছে, ২য় ও ৩য় খণ্ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে সেই সত্তা কীভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বরূপকে আকার দেয় বা প্রকাশ করে, যা নিয়ে কেবল পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদেরা নিজেদের

ব্যাপৃত রাখে। ২য় খণ্ডের আলোচ্য পুঁজির সঞ্চালন (circulation of capital)। এই খণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বিশ্লেষিত হয়েছে কেমনভাবে একটি নির্দিষ্ট পুঁজিকে কতগুলি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়—অর্থ থেকে পণ্য ও পুনরায় আরো অর্থে বিবর্তন। অর্থকেন্দ্রিক পুঁজি (money capital) উৎপাদন-উপায় ও শ্রম-শক্তি নিয়োগে অগ্রিম ব্যয় হয়, ফলে উৎপাদনশীল পুঁজিতে (production capital) পরিণত হয়। তারপর চলে উৎপাদন-প্রক্রিয়া, যার ফলে পণ্যরূপ উৎপাদিত হয় এবং পুঁজি এখন পণ্য পুঁজিতে (commodity capital) রূপান্তরিত। উপসংহারে পণ্যবিক্রয়ের দ্বার পুনরায় অর্থে পরিণতি ঘটে। পুঁজি অবশ্যই এই সম্পূর্ণ চক্রটি আবর্তন করবে এবং মার্কস প্রতিটি স্তরের প্রয়োজনীয় অবস্থা ও ব্যয় বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে প্রতিবারের ব্যবসায়িক গতি (turnover) বিশ্লেষিত হয়েছে। এক দফা ব্যবসা ঘুরিয়ে আনতে যত কম সময় লাগবে ততই উদ্বৃত্ত মূল্য অধিক পরিমাণে অর্জিত হবে (অন্যান্য অবস্থা এক থাকলে)। স্থির ও সঞ্চালিত পুঁজির পার্থক্যও এখানে নির্দেশিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগের আলোচ্য উদ্বৃত্ত (aggregate) সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন।

৩৫. Das Kapital. Kritic der politischen Ökonomie, vol. 3 – ১৮৯৪, হামবুর্গ / এঙ্গেলস কর্তৃক প্রকাশিত। ইং-অনু *Capital. A Critique of Political Economy. vol. 3. The Process of Capitalist Production as a Whole*; অনুবাদ : E. Untermann, 1909। পরিমার্জিত অনুবাদ, ১৯৫৯। এই খণ্ডে খাজনা, সুদ ও মুনাফা নিয়ে আলোচনা। প্রথমেই মার্কস মুনাফার হার (rate of profit) নির্ধারণ করছেন। স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজিসহ মোট কতটা পুঁজি নিয়োজিত হয়ে কতটা মোট উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হল তার অনুপাতের দ্বারা মুনাফা-হার স্থির হবে। তারপর মুনাফা-হারের একটা গড় নির্ণয়ের চেষ্টা। তার থেকে উৎপাদনের বাজার-দর নির্ধারণের তত্ত্ব। অতঃপর মুনাফার পতনশীল হারের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম (law of the falling rate of profit)-এর প্রসঙ্গ। এই খণ্ডে মার্কস বিস্তৃতভাবে বাণিজ্যিক ও আর্থিক পুঁজি এবং সুদ ও ঋণ পদ্ধতিরও বিশ্লেষণ করেছেন। শেষে আছে খাজনার (rent) তত্ত্ব। ৩য় খণ্ডের সম্পূর্ণ বিচার্য হচ্ছে সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণী সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণীর কাছে শোষিত হচ্ছে, সমগ্র উদ্বৃত্ত মূল্য নানারূপে নানা পুঁজিবাদী স্বার্থেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এই খণ্ডের উপসংহারে রাজস্ব ও তার উৎস বিষয়ক আলোচনা মার্কস শেষ করতে পারেন নি।

৩৬. Theorien über den Mehrwert (3 vols.) – ১৯০৫-১০, স্টাটগার্ট /

এঙ্গেলসের মৃত্যুর (১৮৯৫) পর মার্কসের 'ক্যাপিটাল' -সংক্রান্ত অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপি থেকে Karl Kautsky এটি প্রকাশ করেন। ইং-অনু *Theories of Surplus Value*. নির্বাচিত অংশের অনুবাদ ; G. A. Bonner & E.Burns. 1953 এবং *A History of Economic Theories*, এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের অনুবাদ T. McCarthy, 1952। পূর্ণাঙ্গ ইং-অনু (?)। এ থেকে বোঝা যায় 'ক্যাপিটাল'-কে মার্কস মোট ৪ খণ্ডে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন এবং এটিকে সেই ৪র্থ খণ্ড বলা যায়। কাউট্স্কির এই সংস্করণ সোভিয়েট রাশিয়ায় চরম সমালোচনার সম্মুখীন হয় ও একটি নতুন অনুমোদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৩ খণ্ডে মার্কসের পূর্ববর্তী অর্থনীতিবিদদের উপর পর্যালোচনা : ১. অ্যাডাম স্মিথ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের আদি-তত্ত্বসমূহ ; ২. ডেভিড রিকার্ডো ও ৩. রিকার্ডো থেকে 'ভাল্গার' অর্থনীতিকরা।

সংযোজন

ক. Correspondence / মার্কসের চিঠিপত্র প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ইং-অনু সামান্যই হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র 'মেগা'য় প্রকাশিত, ১৯২৯-৩১। গুরুত্বপূর্ণ ইং-অনু Marx / Engels : *Selected Correspondence 1864-95*। অনুবাদ ও সম্পাদনা : Dona Torr, London, 1934। সোভিয়েট রাশিয়া থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটিই বর্তমানে সব থেকে সুলভ।

খ. Literary Remains – ১৮৩৫-৩৭ / 'মেগা'য় সংকলিত। এক্ষণের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত 'কার্ল মার্কসের কবিতা' দ্রষ্টব্য। এ-ছাড়া 'Selections from the Literary Ramins of Karl Marx', ed. Max Beer, *The Labour Monthly*, (London) Vol. V, Nos., 1 to 3 ; July, August and September, 1923 দ্রষ্টব্য।

—

এই গ্রন্থপঞ্জি ফ্রান্‌ৎস মেহ্‌রিঙ, মরিস কর্নফোর্থ, জন লুইস, টি. বি. বটোমোর প্রমুখ লেখকদের অনেকগুলি পুস্তকের সহায়তায় প্রস্তুত এবং তথ্যগুলি নির্ভুলভাবে সংকলন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

সম্পাদক।

বাংলায় মার্কস-চর্চার দিক্‌নির্ণয়

ক. ভূমিকা

বাংলাদেশে কার্ল মার্কস বা মার্কসবাদের কথা কবে প্রথম শোনা গেল? যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এর সদুত্তর পাওয়া যায় নি। বিশেষত বাংলাভাষায় এ-বিষয়ে খুব পুরনো কোনো লেখার সন্ধান এখন পর্যন্ত পাই নি। কিছু পরোক্ষ উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু মূল রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। বাংলায় যা-কিছু লেখা হয়েছে সবই সোভিয়েট বিপ্লবের পর, অর্থাৎ লেনিনের কাহিনীর মধ্যেই মার্কস এদেশে পৌঁছেছেন।

অথচ মার্কস তাঁর শেষ জীবনের বহু বছর লণ্ডনে বাস করেছেন, 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে' ভারতবর্ষের অবস্থা ও সিপাহি যুদ্ধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন, তাঁর বিলেতে থাকাকালীন নানা সক্রিয় আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং 'আন্তর্জাতিকে'র বিবরণ বিলেতের সংবাদপত্র শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে নি—বেশ ফলাও করেই প্রকাশ করেছে। এ-সবের কোনো প্রতিক্রিয়া ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতায় পৌঁছায় নি, এটা ভাবা কঠিন হয়ে পড়ে।

শোনা যায় কেশবচন্দ্র সেন বিলেতে মার্কসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এর কোনো প্রমাণ নেই, জনশ্রুতি মাত্র। তবে দেশে ফিরে তাঁর কিছু-কিছু কার্য-কলাপ লক্ষ করার মতো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধে 'আন্তর্জাতিক' বা সাম্যবাদের কথা তুলেছেন। এই রচনাটি ও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কোনো কোনো প্রবন্ধ পাঠ করলে এ-কথা ভাবতে ইচ্ছে হয় না যে তিনি মার্কস বা তাঁর রচনার সঙ্গে কিছুটাও পরিচিত ছিলেন না।

আর একটি জনশ্রুতি আছে যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-র একটি বঙ্গানুবাদ হয়েছিল। কিন্তু এরও প্রমাণাভাব।

অতএব রুশ বিপ্লবের আগে মার্কসের প্রসঙ্গ নিয়ে এক্ষেত্রে বাক্যবিস্তার নিরর্থক। শুধু একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। অবশ্য তাতে রহস্য আরো ঘনীভূতই হবে। কেবল অপেক্ষা করব উপযুক্ত গবেষকের, যিনি এর উপর আলোকপাত করতে পারবেন।

প্রথম 'আন্তর্জাতিক'-এর সাধারণ পরিষদের একটি সভায় কলকাতা থেকে প্রেরিত একটি পত্র পাঠ করা হয় (১৫ আগস্ট, ১৮৭১)। তার অংশবিশেষ এই :

'...great discontent exists amongst the people, and the British Government is thoroughly disliked. The taxation

is excessive and the revenues are swallowed up in maintaining a costly system of officialism. As in other places the extravagancies of the ruling class contrast in a painful manner with the wretched condition of the workers. whose labour creates the wealth thus squandered. *The principles of the International would bring the mass of the people into its organisation if a section was started*'।

যে-অধিবেশনে উপরোক্ত পত্র পাঠ করা হয় সেই অধিবেশনের বিবরণ প্রসঙ্গে বিলেতের *The Eastern Post* পত্রিকা (No. 151, August 19, 1871) এই অংশটি উদ্ধৃত করে। ১৫ আগস্ট, ১৮৭১-এর ঐ অধিবেশনের মূল 'মিনিট' বইতে পাওয়া যায় :

'The Minutes of the preceding meeting having been read and confirmed, the secretary announced that branches had been formed at Liverpool and Loughborough in Leicestershire. He also read *a letter from Calcutta asking for powers to start a section in India*. The secretary was instructed to write and advise the establishment of a branch. but he [is] to inform the writer that it must be self-supporting. He was also to urge *the necessity of enrolling natives in the Association*'। [উভয় উদ্ধৃতিতেই বাঁকা হরফ আমাদের]।

এই পত্রের লেখক কে ? সত্যিই কি কোনো সংগঠন তৈরি হয়েছিল ?

খ. গ্রন্থপঞ্জি

অতঃপর একটি গ্রন্থপঞ্জি সন্নিবেশিত হল। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষায় মার্কস ও মার্কসবাদ প্রসঙ্গে যত রচনা বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এটি তার একটি অতি অসম্পূর্ণ তালিকা। পত্র-পত্রিকায় বহু রচনা রয়ে গেছে, আমরা সে-তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করি নি। দু-একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে শুধু গ্রন্থ-তালিকাই দেওয়া হয়েছে। তা-ও খুব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংকলন করা সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থ সচক্ষে দেখা যায় নি এবং পরোক্ষ উল্লেখের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। ফলে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশকের নাম, প্রকাশের নির্ভুল তারিখ, এমন কি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামেও কিছুটা সন্দেহ রয়ে যেতে পারে। অনেকগুলি গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার উপর নির্ভর করেই প্রধানত এটি রচিত। মনে রাখতে হবে কার্ল মার্কস ও মার্কসবাদ সংক্রান্ত বইপত্র গ্রন্থাগারগুলিতে এতকাল সংগৃহীত হয় নি নানা কারণে এবং অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই একই জাতীয় পাচ-

সাতখানি বই মাত্র আছে। আমাদের মনে হয়, বহু রাজনৈতিক কর্মী বা উৎসাহী পাঠকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে অনেক পুস্তক রয়ে গেছে। সেগুলি একত্র না হলে এ-বিষয়ে একটা মোটামুটি নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন সম্ভব নয়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরাজ আমলের সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ পুস্তকের তালিকা দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য, অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রকাশিত গ্রন্থাদিও বিস্মৃতির মধ্যে চলে গেছে।

তবু যত অসম্পূর্ণই হোক, আমরা এই গ্রন্থপঞ্জি মুদ্রিত করছি একটি ভরসায়— এর দ্বারা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জির একটি দিক্‌নির্দেশ হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে যোগ্যতর ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নিশ্চয়ই সে-কার্য সম্পন্ন হবে।

এই তালিকায় কার্ল মার্কসের নিজের রচনার অনুবাদ ও মার্কসবাদের নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হয়েছে এমন গ্রন্থেরই স্থান হয়েছে। মার্কস বলতে স্বভাবতই মার্কস ও এঙ্গেলস। কিন্তু দু-একটি গ্রন্থ উল্লিখিত হয়েছে একটি মাত্র যুক্তিতে যে তাতে মার্কসের প্রসঙ্গ বা তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। দু-একটি গ্রন্থের মধ্যে মার্কস বা মার্কসবাদ-প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ আছে বলেই এখানে স্থান পেয়েছে, হয়তো বাইরে থেকে তার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় দুটি ক্ষেত্রে পত্রিকার উল্লেখ হয়েছে, তার বিশেষ গুরুত্বের জন্য।

লেখক বা অনুবাদকের নাম প্রথমে, তারপর রচনার নাম, সংস্করণ ও প্রকাশের তারিখ, এবং প্রকাশের স্থান দেওয়া হয়েছে। স্থানের উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে কলকাতায় প্রকাশিত। অতঃপর পৃষ্ঠা সংখ্যা। তথ্য যত বেশি পাওয়া গেছে সবই দেওয়া হয়েছে, যেখানে সে-স্থান শূন্য, বুঝতে হবে তা পাওয়া সম্ভব হয় নি।

এই গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়নে যাঁদের সক্রিয় সহায়তা পাওয়া গেছে : নচিকেতা ভরদ্বাজ, বিমান সিংহ, পঞ্চানন সাহা, অচিন্ত্য মল্লিক, দেবব্রত মজুমদার, দেবপ্রসাদ ঘোষ, মঞ্জু গুপ্ত, সুচিত্রা ও সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

অক্রুর দত্ত / কমিউনিজম কি, ১৯৩৪। [১৯৩৫-এ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]।

অনল রায় / যুগের আলো : মার্কসবাদের গোড়ার কথা ; ১ম সংস্করণ ১৯৫২ (?)।
২য় সংস্করণ। মৈত্র প্রকাশনী, ১৯৬৮। ৩৩৩ পৃ।

অনিল মুখোপাধ্যায় / সাম্যবাদের ভূমিকা। পূরবী পাবলিশার্স, ১৯৪২।

অনিল রায় / সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ। অগ্রগামী সংস্কৃতি পরিষদ, ১৯৫৯।
১০, ২০৬ পৃ।

অমলা দেবী / কেন সোসালিজম চাই। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০। ১২২ পৃ।

অমিত সেন / ইতিহাসের ধারা : ১ম সংস্করণ ১৯৪৯ ? । ৪র্থ সংস্করণ, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৭ । ১৬৩ পৃ ।

অমূল্য অধিকারী / কমিউনিজম । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০ ।

অমূল্য অধিকারী / শ্রেণী সংগ্রাম । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪০ ।

আবদুল রসুল / কমিউনিজম কাহাকে বলে । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৫ । ৪, ১০৮ পৃ ।

ইয়াপৎ, ও / ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ । মনীষা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ । ২, ২৭৭ পৃ ।

এ. গোস্বামী / মার্কসবাদের ভূমিকা । শ্রীরামপুর, ইউথ কাউন্সিল, ১৯৬৭ । ২৮ পৃ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / ঐতিহাসিক জড়বাদ ; বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / কমিউনিজম ; আবদুল হালিম কর্তৃক অনূদিত । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩২ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / কমিউনিস্ট লীগের প্রতি । সুধী প্রধান কর্তৃক অনূদিত । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র । বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক অনূদিত : ২য় সংস্করণ, এন. এম. রায়চৌধুরী কোং, ১৯২৪ । ৩২, ২৬৫ পৃ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি । মন্মথনাথ সরকার কর্তৃক অনূদিত । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৪ । ৬, ১৮৬ পৃ । ২য় সংস্করণ, ১৯৫০ ; ৬, ২০৪ পৃ । ৩য় সংস্করণ, ১৯৫৭ ; ২, ২০৬ পৃ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ; রেবতী বর্মন কর্তৃক অনূদিত । ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি । ৬, ৬, ২৬১ পৃ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / সমাজতন্ত্রবাদ : কল্পনামূলক ও বিজ্ঞানমূলক । রেবতী বর্মন কর্তৃক অনূদিত । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৪ । ৮৮ পৃ ।

এঙ্গেলস, ফ্রেডেরিক / সমাজতন্ত্রবাদ : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক ; ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও কৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত । বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৩ । ৮২ পৃ । ২য় সংস্করণ, ১৯৩৮ । ১১৮ পৃ ।

কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, পশ্চিম বঙ্গ / কমিউনিজম কি । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৯ । ৪, ৫৬ পৃ ।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো অব থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল, ১৯২১ / পার্টি সংগঠনের মূলনীতি । ন্যাশনাল বুক এজেন্সি । ২, ৬১ পৃ ।

কলিকাতা ইনস্টিটিউট অব মার্কসইজম-লেনিনিজম / মার্কস-লেনিনের পতাকা-তলে ; প্রবন্ধ সংকলন । ৭, ৬৮ পৃ ।

কাউটস্কি, কার্ল জোহান / কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্র ; ডেভিড স্থব কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরেজি থেকে অনূদিত ।

ওয়ার্কার্স পাবলিকেশন হাউস। ১৩০ পৃ। [*Social Democray versus Communism* গ্রন্থের অনুবাদ।]

কালীপ্রসন্ন দাশ / সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ। ১৯৩৪।

কিশোরীলাল মশরুওয়ালা / গান্ধী ও মার্কস। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

ক্যাপিটাল / দিনাজপুরের জনৈক উকিলকৃত সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ, ১৯২৭-২৮। [Confidential Reports on Indian Newspapers (Govt. of Bengal Archives)-এ পরোক্ষ-উল্লেখ]।

গণ সাহিত্য চক্র / সমাজতন্ত্রের অর্থনীতি, ১৯৩৮(৪০ ?)। ঢাকা।

গিরীণ চক্রবর্তী, সম্পাদক / সংকলন ; ৪র্থ বর্ষ। সুসাহিত্য। ৩৬২ পৃ। [প্রাসঙ্গিক রচনা : আলেকজাণ্ডার বুরোব, 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের দুইটি বৃহৎ সমস্যা' প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]।

গোপাল লাল সান্যাল / সমাজতন্ত্রবাদ। ১৯২৫।

জিলাস, মিলোভান / বর্তমান জগৎ ও মার্কসবাদ ; নিরঞ্জন হালদার কর্তৃক অনূদিত। ইনস্টিটিউট অব পলিটিক্যাল এণ্ড সোশ্যাল স্টাডিস। ২, ৩৬ পৃ। [*The Moderd World and Marxism* গ্রন্থের অনুবাদ]।

তারাপদ লাহিড়ী / মার্কসীয় দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা। লোকায়ত সাহিত্য চক্র।

দয়াল চন্দ্র ঘোষ / সোসিয়ালিজম্ ও কমিউনিজম্। ১৯৩২।

দেবজ্যোতি বর্মন / কার্ল মার্কস। যুগবাণী সাহিত্য চক্র, ১৯৩০। ৪, ৮২ পৃ।

দেবব্রত সেনগুপ্ত / অবাস্তব মার্কসীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের জিঘাংসাবৃত্তি ও ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যার অসারতা। লেখক, ১৯৬৮। ৩৩ পৃ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন। বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ। ৪, ৭২ পৃ। [পুস্তিকার শেষ প্রবন্ধ : 'মার্কসবাদ আজ, আগামী কাল']।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ভাববাদ খণ্ডন মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি। ঈগল পাবলিশার্স, ১৯৪১। ১১৪ পৃ। —২য় সংস্করণ। সাহিত্য জগৎ, ১৯৫৪। ৪, ১৩৩ পৃ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / মার্কসবাদ ; ১ম খণ্ড। কালকাটা বুক ক্লাব, ১৯৫২। ১০৪ পৃ।

ধীরেন্দ্রনাথ সেন / কার্ল মার্কস ও তাঁহার মতবাদ। সরস্বতী লাইব্রেরী, ১৯৩২। ৪৭ পৃ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় / বক্তব্য। বিদ্যোদয়, ১৯৫৭। ১০, ২৫৮ পৃ। [কয়েকটি প্রবন্ধ : নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকা, নব্য সমাজদর্শনের প্রতিজ্ঞা, মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম, অতঃকিম, ইতিহাস]।

নিকুঞ্জ সেন / নেতাজী ও মার্কসবাদ। পি. আর কুণ্ডু এণ্ড কোং, ১৯৫৪। ২, ৪৮ পৃ।

নীহার সরকার / ছোটদের অর্থনীতি। পুঁথিঘর, ১৯৪০।

নীহার সরকার / ছোটদের রাজনীতি। পুঁথিঘর, ১৯৪০।

পণ্ডিত বিভূ নারায়ণ মিশ্র / -সংকলিত ও প্রকাশিত। নভেম্বর বিপ্লব উৎসব, ১৯৩১। [গয়া ও বেনারস থেকে পুস্তিকাটি প্রচারিত। ঐ বছরই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী / মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৮। ৮, ১০০ পৃ।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী / মার্ক্সের অর্থনীতি। অগ্রণী লাইব্রেরী, ১৯৪০ ? ১০১ পৃ।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার / মার্কসবাদ। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯। [লেনিনের *Teaching of Karl Marx*-এর অনুবাদ]।

পোজোসেৎনিক ও শিরকিন / এক নজরে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৬৭। ৩, ১২৯ পৃ।

পোজোসেৎনিক, ভি এবং ও, ইয়াখৎ / সংক্ষিপ্ত ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ : সরল পাঠ। কালান্তর প্রকাশনী, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ। ৫, ১৪৭ পৃ।

ফণী বন্দ্যোপাধ্যায় / মজুরী ও মূলধন। আত্মশক্তি লাইব্রেরী, ১৯৩৩।

বটকৃষ্ণ ঘোষ / মার্কসবাদ। কুলগাছিয়া, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়।

বসুধা চক্রবর্তী / রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন যৌবন। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। ৬, ২৩০ পৃ। [সূচি : রাষ্ট্রীয় শক্তির কেন্দ্র কোথায় ? মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে মহাত্মা গান্ধী : প্রশ্ন ; ব্যক্তি ও রাষ্ট্র : ভারতপথে কার্ল মার্কস ; বাম পন্থা]।

বার্নস, এমিল / মার্কসবাদ। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত, ৩য় সং। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৩। ৪, ১১৬পৃ। ২য় সং মার্চ, ১৯৫২। v.+১০০ পৃ। [*What is Marxism* গ্রন্থের অনুবাদ।]

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় / কমিউনিজম। গুপ্ত ফ্রেণ্ডস কোং। ৯০ পৃ।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় / সাম্যবাদের গোড়ার কথা। আত্মশক্তি লাইব্রেরী। [৯. ১. ৩৯ তারিখে বাজেয়াপ্ত]।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় / সাম্যবাদের মর্মকথা।

বিনয় ঘোষ / শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৯৩৯।

বিমল রাহা / মার্কসবাদের বিকৃতি। ১৯৩৬।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ভূমিকা। ইংরেজি থেকে অনূদিত। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১। ৪, ৫৭ পৃ।

ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত / জাতি সংগঠন ও তরুণের অভিযান, ১৯২৮। [ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে পাঠচক্র স্থাপন ক'রে কীভাবে মার্কসবাদ শিক্ষা দিতে হবে ও মজুর কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে হবে তার শিক্ষা।]

মণিময় প্রামাণিক / ঋষি কার্ল মার্কস ও তাঁহার মতবাদ। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩০ ? ১৯৩২ ?।

মনোরঞ্জন রায় / মার্কসের দর্শন।

মনোরঞ্জন রায় / সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ।

মন্মথ সরকার / কার্ল মার্কস। ১৯৫১।

মানবেন্দ্রনাথ রায় / মার্কসবাদ। রেণাসাঁ পাবলিশার্স, ১৯৪৬। ১০, ৬৫ পৃ। ['What is Marxism', 'Marxism and Moral Philosophy' এবং 'Science, Philosophy and Politics' প্রবন্ধ তিনটির সমরেণ রায়-কৃত অনুবাদ।]

মার্কস, কার্ল / কম্যুনিস্ট লীগের প্রতি। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯।

মার্কস, কার্ল / কেপিটেল। মর্মানুবাদ ; বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৯। রেবতী মোহন বর্মন-কৃত।

মার্কস, কার্ল / ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জি। মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়। ২২৪ পৃ।

মার্কস, কার্ল / ভারতে ইংরেজ শাসন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। ঢাকা, গণসাহিত্য চক্র, ১৯৩৮।

মার্কস, কার্ল / ভারতে বৃটিশ শাসন। মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়। ২২ পৃ।

মার্কস, কার্ল / মজুরি ও পুঁজি ; ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক অনূদিত। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩৩।

মার্কস, কার্ল / মজুরি ও পুঁজি। মুজফ্‌ফর আহমেদ কর্তৃক অনূদিত। ১৯৫৪। ১৮, ৬০ পৃ।

মার্কস, কার্ল / মজুরী ও মূলধন। ফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। উত্তরপাড়া, ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৩। ৮১ পৃ। [*Wage Labour and Capital* গ্রন্থের অনুবাদ।]

মার্কস, কার্ল / মজুরি দাম মুনাফা। মুজফ্‌ফর আহমেদ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লি, ১৯৫৭। ৪, ৮৩ পৃ। মস্কো সংস্করণ, ৭১ পৃ।

মার্কস, কার্ল / মূল্য দর মুনাফা : শ্রমজীবীদের প্রতি অভিভাষণ ; ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক অনূদিত। বর্মন পালিশিং হাউস, ১৯৩৯(১৯৩৩ ?)। ১১১ পৃ। [কার্ল মার্কসের কন্যা ই. এম. এভেলিং কর্তৃক সম্পাদিত *Value, Price and Profit* গ্রন্থের অনুবাদ।]

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে। মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়। ৪৪২ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / কমিউনিস্ট ইস্তেহার। অসীম চৌধুরী

কর্তৃক অনূদিত। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৮। শতবার্ষিকী সংস্করণ। ৪, ৭৭ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / কমিউনিস্ট ইস্তেহার। আবদুল হালিম কর্তৃক অনূদিত। গণশক্তি পাবলিশার্স, ১৯৩২।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহার। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। ৮০ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ১৮৫৭-৫৯। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, ২৬৫ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / রচনা সংকলন ; ১ম খণ্ড, ১ম অংশ। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। ৩৬০ পৃ। ২য় অংশ ; প্রগতি প্রকাশন। ৩৪৭ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / সাধারণ স্বত্ববাদীর ইস্তাহার (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো)। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত। 'গণবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। ১৯২৬-২৭। [১৯৩০-এ আবদুল হালিম কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত।]

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / সাম্যবাদীর ফতোয়া। শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক অনূদিত। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩২। [ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ]।

মার্কস, কার্ল ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস / সাম্যবাদীর ফতোয়া বা কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো। ৩য় সংস্করণ ; ব্রজবিহারী বর্মন সম্পাদিত। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৬। ৬৪ পৃ। [আখ্যাপত্রে অনুবাদকের নাম নেই। সম্পাদকের 'নিবেদন' থেকে জানা যায় যে 'কম্যুনিস্ট ইস্তেহার' নামে ১৯৩২ সালে প্রকাশিত আবদুল হালিম-কৃত বঙ্গানুবাদ বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক আমূল পরিবর্তনের পর ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণ উক্ত পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ]।

মার্কস, কার্ল, ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ও ভি. আই. লেনিন / শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৮। ১৩১ পৃ।

মার্কস, কার্ল ও ভি. আই. লেনিন / মার্কসবাদ লেনিনবাদের মূল নীতি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৫। ১৫২, ৬ পৃ।

মার্কসবাদ ও জাতি সমস্যা / ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৩।

মার্কসবাদী (পত্রিকা) / ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত। ১ম সংকলন, ১৯৪৮। ['বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র', 'সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি' ইত্যাদি প্রবন্ধ]।

মার্কসবাদী / ৮ম সংস্করণ। নিউ পাবলিশার্স, ১৯৫০। ৪, ১৪৬ পৃ।

রঞ্জন চৌধুরী / মার্কসবাদের ভূমিকা। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৬। ১৭৮ পৃ।

রবি রায় / পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্কসীয় দর্শন। সিগনেট প্রেস, ১৯৫৮। ৮, ১৯৬ পৃ।

রবি রায় / মার্কসীয় দর্শন। লেখক, ১৯৩৯। ২, ৯৪ পৃ।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন / বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কর্তৃক হিন্দি থেকে অনূদিত। পূরবী পাবলিশার্স লিমিটেড। ১৯৪৮। ১৮+১৯২+৪ পৃ। [রচনাসূচি : কার্য-কারণ(হেতুবাদ) ; সত্য অসত্যের জ্ঞান : মূঢ় বিশ্বাস ; আচার বিচার ; দৃষ্টির বিকার ; বস্তু এবং দ্বন্দ্ববাদ ; বস্তুবাদ ; দ্বন্দ্ববাদ ; দ্বন্দ্বাত্মক (বৈজ্ঞানিক) বস্তুবাদ ; পরিভাষা সূচি ; ইত্যাদি]।

রেবতীমোহন বর্মন / অর্থনীতির গোড়ার কথা। ১৯৪৫।

রেবতীমোহন বর্মন / মার্কস প্রবেশিকা। ঢাকা, গণসাহিত্য চক্র, ১৯৩৮।

রেবতীমোহন বর্মন / সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫২। ১৪, ২১২ পৃ।

রেবতীমোহন বর্মন / সমাজের বিকাশ। ১৯৩৯।

রেবতীমোহন বর্মন / সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। ১৯৩৮।

রেবতীমোহন বর্মন / হেগেল ও মার্কস। আর্য পাবলিশিং কোং, ১৯৩৮ (১৯৩৪?) ৪, ৪৮ পৃ।

লালওয়ানী, কস্তুরচাঁদ / মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র ; ১ম খণ্ড। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৪৭। ১৮, ১০৭ পৃ।

লিওনটিয়েভ, এ. / মার্কসীয় অর্থনীতি ; ২য় সংস্করণ। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫১। ৮, ২৭৭ পৃ। [*Political Economy* গ্রন্থের অনুবাদ]।

লেনিন, ভি. আই. ইউ / কার্ল মার্কসের শিক্ষা। অমিত সেন কর্তৃক অনূদিত। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৪৪। ২, ৫৬ পৃ।

লেনিন, নিকোলাই / মার্কসবাদ ; অনিলা রায় কর্তৃক অনূদিত। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৯৩২। ৬৬ পৃ।

লেনিন, ভি. আই. ইউ. / মার্কসবাদের ঐতিহাসিক বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো। ৭৮ পৃ।

ল্যাস্কি, হ্যারল্ড / কমিউনিজম। রীডার্স কর্নার।

শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় / সাম্যবাদ। সরস্বতী প্রেস, ১৯২৪।

শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী / ভারতীয় রাজনীতি ও ডায়েলেক্‌টিক্‌। বর্মন পাবলিশিং হাউস, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ। ১৪২ পৃ।

সেসিঙ্গার, ইনা ও জোনা ব্লাস্টেইন / সাম্যবাদ : বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি। অমর নাথ দত্ত অনূদিত। এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৮। ৮, ৩৭১ পৃ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য / কার্ল মার্ক্স জীবন ও মতবাদ। পূর্বাশা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, ৬১ পৃ।

সরোজ আচার্য / মার্কসীয় দর্শন। পুঁথিঘর, ১৯৪৩। ২২৭ পৃ।
সরোজ আচার্য / মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৯৪৭। ২, ১৩৩ পৃ।
সরোজ সেন / মার্কসবাদের মর্মকথা। বাণী সেন এণ্ড কোং, ১৯৪৭। ২,৭৩ পৃ।
সুকুমার মিত্র / কার্ল মার্কস। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, [১৯৪০ ?]।
সুপ্রকাশ রায় / পরিভাষা কোষ। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৫৮। ২৮, ৩৯২ পৃ।
সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত / প্রগতি। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ-প্রকাশিত সংকলন, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে উৎসর্গ। [মার্কসের 'ভারতে ইংরেজ শাসন' রচনার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদসহ]।
সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত / 'মার্ক্সবাদ—প্রথম পর্ব্ব', ভারতবর্ষ পত্রিকা। একত্রিংশ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৫০। পৃ ১৬।
সুশোভন সরকার / সমাজ ও ইতিহাস। বাক্, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। ১০, ২০৮ পৃ। ['সোশালিজ্‌মের মূলসূত্র', 'সমাজবাদে নীতি ও প্রয়োগ', 'সাম্যবাদ ও রুশ বিপ্লব' ইত্যাদি প্রবন্ধ]।
সোমনাথ লাহিড়ী / সাম্যবাদ। ১৯৩১। ১২ নং হরতুকি বাগান লেন থেকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। [ঐ বছরই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত]।
স্তেপানোভা, এলেনা অ্যান্দ্রিভনা / কার্ল মার্কস। কল্পতরু সেনগুপ্ত কর্তৃক অনূদিত। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৬৪। ২০, ১২২ পৃ।
স্বদেশরঞ্জন দাস / ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।
স্বদেশরঞ্জন দাস / মার্ক্সীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / ভারতবর্ষ ও মার্কসবাদ ; বুক ফোরাম, একত্রে দুইখণ্ড সমবায় পাবলিশার্স, ১৯৪৩। ৮,১০৩, ৬৫ পৃ।
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / মার্কসবাদের অ. আ. ক. খ.। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, ১৯৫৫। ১৩৮ পৃ।
হুমায়ুন কবীর / মার্কসবাদ। গুপ্ত রহমান এণ্ড গুপ্ত, ১৯৪৮। ২, ১০৭ পৃ।
হৃষীকেশ সেন / সমানাধিকারবাদ। আত্মশক্তি লাইব্রেরী, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ। ৪, ১৫৬ পৃ।
হেমন্তকুমার সরকার ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় / বিপ্লবের পঞ্চ ঋষি [এক ঋষি কার্ল মার্কস]। ক্যালকাটা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯২৩। ২, ৫৮ পৃ।

—

সম্পাদকের কথা

I call revolution the conversion of all hearts and the raising of all hands in behalf of the honour of the free man.
– Karl Marx

The whole of Marx's world outlook is not a doctrine but a method. It does not yield any ready-made dogmas, but shows the starting points for further inquiry and a method for this inquiry. – Friedrich Engels

কার্ল হাইনরিখ মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৩) জন্মের দেড়শো বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে এই বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ। অবশ্য এক্ষণ পত্রিকা প্রকাশের গোড়া থেকেই অনেকগুলি বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। এই সংখ্যাটি তার অন্যতম। গত বছর শারদীয় সংখ্যায় মার্কসের 'দাস কাপিটাল'-এর শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রটির কথা পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে।

আধুনিক মানব সভ্যতায় মার্কসের চিন্তাধারার ব্যাপক ও গভীর প্রভাব স্বীকার করতেই হয়। একালের দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব এবং সমাজে মানুষের সত্যিকার অবস্থার বিচারে মার্কসীয় চিন্তাধারা যতখানি সফল হয়েছে তেমন আর কোনো তত্ত্ব হয় নি। আর শুধু তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ নয়, এইখানেই আর সব দার্শনিক থেকে মার্কসের পার্থক্য, মার্কস মানুষের বন্ধনমুক্তির ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তোলার সক্রিয় কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন। সত্যকে শুধু আবিষ্কার নয়, জগৎপরিবর্তনে তাকে ব্যবহারের কথাই বলেছেন। এবং তিনি ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। – মানুষের মহৎ ও অপরাজিত প্রতিষ্ঠাই দেখতে চেয়েছিলেন।

গত শতাধিক বর্ষ ধরে দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদ ইতিহাসে তার অপ্রতিহত শক্তিতে ক্রমাগতই জয়ী হয়ে চলেছে। সেই শক্তি ও সেই জয় শুধু শাসনক্ষমতা অর্জন বা অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাতেই প্রতিফলিত নয়, তা মানুষের চেতনার অগ্রগতিতেও প্রভূত সহায়তা করেছে। বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশে মার্কসবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় দর্শনের অসামান্য তাৎপর্য প্রমাণ করছে। আর অপর এক অংশ তার বিরোধিতার দ্বারা প্রমাণ করছে মার্কসীয় চেতনারই মহত্ত্ব। যে-কোনো বিতর্কের সম্মুখীন হয়েও স্বীকার করতে হয়, মানব সভ্যতায় মানুষের জীবন ও সমাজের সংহতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণবিধানের যত রকম প্রচেষ্টা

এ-যাবৎ হয়েছে তার মধ্যে নিঃসন্দেহে এ যুগে মার্কসবাদ সব থেকে বেশি নির্ভুল এবং সব থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য। সেইসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার মার্কসবাদ কোনো স্থাণু তত্ত্ব নয়। এবং অন্ধ ধর্মবিশ্বাস নয়। বিশ্বব্যাপী বহু মার্কসবাদী সংগঠনের ভুলভ্রান্তি এবং ব্যক্তিবিশেষের বিচ্যুতি দিয়ে মার্কসবাদের অসারতা প্রমাণ করা যায় না। তত্ত্বের সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য না ঘটলে অনেক সময়ই বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই, গ্রহণ বা বর্জনের আগে চাই সত্যিকার তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় এবং ইতিহাসজ্ঞান। আর তার অভাব বিংশ শতাব্দীর মানুষের পক্ষে আত্ম-ঘাতেরই সমান।

আমাদের বর্তমান তরুণ জেনারেশনের সামনে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার একটি অতি সামান্য ও আংশিক পরিচয় এই সংখ্যায় তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আমাদের আশা ও অপেক্ষা: বাংলাদেশে আরও অনেক চিন্তা ও চর্চার মধ্যে মার্কসবাদের সত্যিকার মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা দেখা দেবে।

স্বভাবতই এ-সংখ্যার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির পরিমাণ সামান্য নয়। বাধা-বিপত্তি অনেক, আমাদের সাধ্যও সীমিত। শুধু সাহস ক'রে বলতে পারি, আমাদের কল্পনা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

স্থানাভাবে শেষপর্যন্ত অনেকগুলি রচনা আপাতত বর্জন করতে হল। মার্কসের মূল রচনার কিছু অনুবাদ প্রস্তুত করেও প্রকাশ করা গেল না—শুধু নানা বিবেচনায় মার্কসের কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ পৃথক পর্যায়ে মুদ্রিত হল।

এই সংখ্যার রচনাগুলি সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, সব মিলিয়ে সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য আপনিই প্রকাশ পেয়েছে। মনোযোগী পাঠক রচনা-নির্বাচন ও বিন্যাসের তাৎপর্য অনুধাবন করবেন সহজেই। শুধু একটা কথা বাহুল্য হলেও বলা দরকার। আমরা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে চালিত হই নি—লেখক ও রচনাই নির্বাচন করেছি, লেখকদের রাজনৈতিক মতবাদ বা / এবং আনুগত্যের বিচার করি নি। আবার সর্বমতসমন্বয়ের চেষ্টাও করি নি। তাই বিভিন্ন রচনায় কোথাও কোনো মতবাদের বিশেষ প্রকাশ ঘটে থাকলে তার দায় সম্পাদকদের উপর চাপানো অন্যায় হবে।

অনেক লেখককেই লেখার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, শেষপর্যন্ত অনেকে লিখতে পারেন নি এবং কেউ-কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেছেন। এ-সংখ্যার বিষয়গত অসম্পূর্ণতা ও প্রকাশের বিলম্ব অনেকটাই এই কারণে। এই প্রসঙ্গে বিদেশী লেখকদের রচনাগুলি সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আমাদের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী দু-একজন বিদেশী লেখককে লেখার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ ও বিদেশের সাম্প্রতিক মার্কসবাদী চেতনার একটা অবিচ্ছিন্ন রূপ ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক লেখকই শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে না পারায় আমরা আরো বেশি সংখ্যক বিদেশী চিন্তাবিদ্‌কে

আমন্ত্রণ জানাই। তাঁদের অনেকেই আমাদের প্রচেষ্টায় আশাতীত সহায়তা ক'রে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অনেকেই অতি দ্রুত লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পত্র দেন ও সে-প্রতিশ্রুতি যথাযথ রক্ষা করেন। কারও কারও লেখা আমাদের হাতে পৌঁছালেও দ্রুত বঙ্গানুবাদ করে ফেলা সম্ভব হয় না। তবু এ-রকম নয়টি রচনা এ-সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। যাঁরা এগুলি অতি দ্রুত অনুবাদ করে দিয়েছেন তাঁদের সহযোগিতা তুলনাহীন। কয়েকটি রচনা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হবে।

এই বিদেশী লেখকদের কাছে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ

J. D. Bernal, Martin Bronfenbrenner, Maurice Dobb, Barrows Dunham, R. Palme Dutt, Benjamin Farrington, Arnold Hauser, Christopher Hill, Leo Huberman, Michael Kalecki, John Lewis, Ronald Meek, Herbert Mercuse, Joseph Needham, Joan Robinson, Adam Schaff, Howard Selsam, Paul M. Sweezy, Arnold J. Toynbee, Shigeto Tsuru।

এই বিশেষ সংখ্যায় লেখা বা অনুবাদ ছাড়াও যাঁরা নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছেও আমাদের অনেকখানি ঋণ। তাঁদের কয়েক জন হলেন : অশোক সেন, অশোক মিত্র, অরুণ মজুমদার, কল্যাণ চৌধুরী, চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, নির্মলকুমার চন্দ্র, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, বিমান সিংহ, মুরারি ঘোষ, রণবীর রায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি বসু, সুনীত সেনগুপ্ত, সমর দাশগুপ্ত এবং সত্যজিৎ রায়।

—

মুদ্রণে সহায়তা
জর্নাল প্রেস / ৫১।১০ রানী হর্ষমুখী রোড কলকাতা ২

শ্রীপ্রণবীর ঘোষ কর্তৃক বাণিজ্য প্রেস ৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা

শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৫

অন্যান্য বছরের মতো এবারও নানা রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে
বর্ধিত আয়তনে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে।

সম্ভাব্য লেখক সূচি

নীহাররঞ্জন রায় অমলেন্দু বসু সত্যজিৎ রায় অশোক মিত্র কমলকুমার মজুমদার ভেভিড ম্যাককাচিয়ন অসীম রায় নির্মলকুমার চন্দ্র পদ্মনাভ দাশগুপ্ত সত্যজিৎ চৌধুরী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর্নল্ড হাউসার হার্বার্ট মার্কিউজ হাওয়ার্ড সেলসাম শিগেটো সুরু লুই আলপুসে মাইকেল কালেস্‌কি এবং আরো অনেকে।

প্রবন্ধ গল্প কবিতা ও চিত্রে সুশোভিত একটি মূল্যবান সংখ্যা।
এ-সংখ্যা যাঁরা নিশ্চিত পেতে চান তাঁরা এখুনি আড়াই টাকা পাঠালে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পেয়ে যাবেন।
এক্ষণের বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা সাত টাকা মাত্র।

—

সব রকম যোগাযোগের ঠিকানা

এক্ষণ / ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯

With the publication of this issue, Ekshan commemorates the 150th birth anniversary of Karl Heinrich Marx (1818-1883). Marx's ideas and their impact on modern human thought and endeavour have been analysed here in a way, in which, we hope, the process of exploration will be continued.

The contributors :

DIPTENDRA BANERJEE on 'Asiatic Mode'
PRATUL BANERJEE on Marxism and Science
MARTIN BRONFENBRENNER on Marxian influences on Economics
AMIYA CHAKRABORTY on Revolution
SATINDRANATH CHAKRABORTY on 'Alienation'
SHYAMAL CHKRABORTY on Marxism and Marxists
DEBIPRASAD CHATTERJEE on Critics of Marxism
AMIYA DASGUPTA on Marx and Modern Economics
ALOKRANJAN DASGUPTA on 'Beauty' and Marx
MAURICE DOBB on 'Capital'
BARROWS DUNHAM on Marxian Epistemology
RAJANI PALME DUTT on '150 years'
MURARI GHOSH on Marx's Life
AMALENDU GUHA on 'Drain Theory'
CHRISTOPHER HILL on his personal Marx
JOHN LEWIS on Unknown Marx
HIREN MUKHERJEE on Marx's Idea of History
SOMENDRA N. MUKHERJEE on Religion
JOSEPH NEEDHAM on Science and Society in East and West
GAUTAM SANYAL on Marxism and the Individual
ADAM SCHAFF on Marx and Contemporary Humanism
SAMAR SEN translates Poems of Marx
SUNIL SEN on Marx's India
PAUL SWEEZY on Marx and the Proletariat

With chronology, bibliography, etc.

Cover designed by Satyajit Ray

Ekshan 73 Mahatma Gandhi Road Calcutta 9
Regn. No. 5308/61
Vol. VI : Nos. 2 & 3 (May-June & July-August 1968)

Rs. 3·50

এক্ষণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৫
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও
নির্মালা আচার্য সম্পাদিত
সাহিত্য ও
সংস্কৃতিবিষয়ক
দ্বিমাসিক

এবারের পূজোয়
মেগাফোনের
প্রাণ মাতানো
নতুন গানের রেকর্ড

সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ‖ আমি একদিন আমার জীবনী ‖ সব কিছু ফেলে যদি

উৎপলা সেনগুপ্ত ‖ মনের বয়স এল মনে ‖ বোঝাতে পারিনি কোনদিন

বিশ্বজিৎ ‖ তুমি আমার সুরের প্রথম বীণ ‖ মনকে নিয়ে আমি যত যেতে চাই

বাদ্যিক সঙ্গীত ‖ ELECTRIC GUITER

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ‖ সুপ্রভাত—রবীন্দ্রনাথ ‖ হতভাগ্যের গান—রবীন্দ্রনাথ

জহর রায় ‖ শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ‖ প্রথম খণ্ড ‖ দ্বিতীয় খণ্ড

বাদ্যিক সঙ্গীত ‖ ELECTRIC GUITER ‖ TUNE OF TAGORE SONGS 33⅓ R P M

দেবেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ‖ পূব পশ্চিম ‖ সবহারাদের গান

তপন চট্টোপাধ্যায় ‖ এই দুঃখ সুখের পরে ‖ ঘুম চোখে নেই

নচিকেতা রায় ‖ ELECTRIC GUITER

অরুণ ঠাকুর ‖ কি বলে তোমায় ডাকবো মাগো ‖ কালী নাম করেছি সার

সুনীল ঘোষ ‖ VIOLIN

শিশুলাল সরকার ‖ রূপকথা লিখেছিল ‖ ওগো অনুপমা

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

সখি লোকেরি কথায় ‖ প্রেতে কি চাতুরী সহে

৪৫ R.P.M. হিন্দী রাগপ্রধান

পূজোয় চাই
নতুন জুতো
Bata

MUKUND
IS
S T E E L

নিজের দেশকে চিনুন

কালীঘাটের পট বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিল্পরূপ। ঐতিহ্য সন্ধানের প্রবর্তনায় একালের কিছু দিক্‌পাল শিল্পী কালীঘাটের পটুয়াদের কাজ আয়ত্ত করতে চেয়েছেন শ্রদ্ধাশীল অনুরাগে।

আমাদের শিল্প-ঐতিহ্যের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবাংলার বহুস্থানে: শান্তিনিকেতন, বহরমপুর ও বেলুড়ায়; দার্জিলিং, বহরমপুর ও কৃষ্ণনগরের কুটির-শিল্পে; পাণ্ডুয়া, আদিনা, কালনার মসজিদে; বিষ্ণুপুর, ওন্দা-পাড়া, ইলামবাজার, আটপুরের মন্দির-স্থাপত্যে ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে ॥

পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমায় আমাদের সঙ্গীনিবাসে ওঠাই সুবিধে

শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, কালিম্পং, দুর্গাপুর, দীঘা, ডায়মণ্ডহারবারে লাক্সারি ও ইকনমি ট্যুরিস্ট লজে বুকিং-এর জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩/২ ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট, কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : 'TRAVELTIPS'

মালদায় শীগ্‌গিরই একটি ট্যুরিস্ট লজ খোলা হচ্ছে।

Allied Resins & Chemicals Ltd.

Registered Office

10/1, ELGIN ROAD, CALCUTTA-20

Phone : 47-7325
47-2145

Head Office

13, CAMAC STREET, CALCUTTA-17

Phone : 44-7671 (4 lines)

Manufacturer of :

Formaldehyde, Paraformaldehyde, Pantaerythritol, Hexamine, Urea Formaldehyde Resin, Phenol Formaldehyde, Melamine Formaldehyde, Resorcinol Formaldehyde, Epoxy Resin and Synthetic Tanning Agent.

Unit No. 1 : 47, Hyde Road Extension, Calcutta-27.
Phone : 45-4751-52

Unit No. 2 Rampur (On Budge Budge Trunk Road).
Phone : 45-5364

Unit No. 3 : Bulk Oil Storage Installation, Budge Budge.
Phone : BU-269.

শহরে শহরে
গ্রামে গ্রামে
পাড়ায় পাড়ায়
ঘরে ঘরে

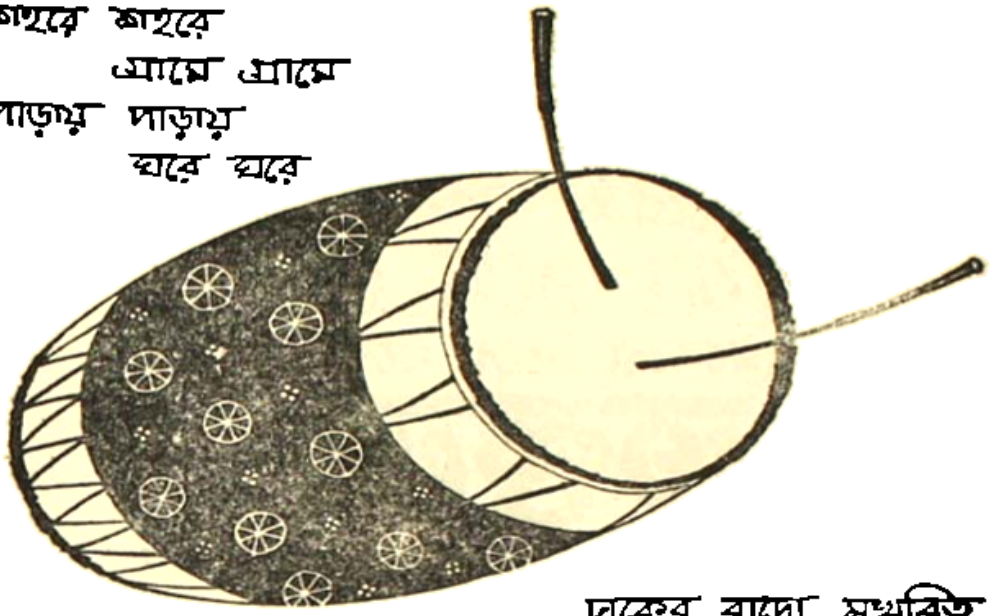

ঢাকের বাদ্যে মুখরিত
আকাশ বাতাস,
আবার মা আসছেন ঘরে

বোরোলীন

এ্যান্টিসেপ্‌টিক সুরভিত ক্রীম
বিদীর্ণ ও শুষ্ক ত্বকের
অস্বস্তি দূর করে

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

পূজা এসে গেল

এই আনন্দের দিনে ঘরে ঘরে চাই

তন্তুজ

বাংলার সকল সুখ্যাত তাঁতকেন্দ্রে প্রস্তুত

ধুতি
সাউথের কাপড়
শাড়ী
বেডকভার
ইত্যাদি

দেখতে ভালো • প'রে আরাম • বেশিদিন টেকে

আপনার কাছাকাছি বিক্রয়কেন্দ্র থেকে পছন্দমত কেনাকাটা করুন

টাকা প্রতি ১০ পয়সা

বিশেষ পূজা রিবেট

॥ সুতী তাঁত বস্ত্রের উপর ॥

• ২৯শে সেপ্টেম্বর '৬৮ পর্যন্ত •

সেন্ট্রাল সেল্ ডিপো :

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স'
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
ফোন : ৩৫-৩৬৫৮

Progressive/SH-19

স্বাস্থ্যকর
খাবারের অভ্যাস
শুরু করে

পোস্টম্যান

পোস্টম্যান, শোধন করা চিনাবাদামের তেল,
পুষ্টিকর সহজপাচ্য রান্নার উপকরণ।
পোস্টম্যানে আছে শতকরা ৫০% ভাগ
অপরিপূর্ণ স্নেহযুক্ত অ্যাসিড, যা আপনার খাবার
আরো স্বাস্থ্যকর করে তোলে।
আজ থেকেই পোস্টম্যান ব্যবহার করুন।
এটি স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস।
সব সাইজে পাওয়া যায়
আহমেদ মিল্‌স, বোম্বাই-৮

প্রাপ্তিস্থান
খিমজি হমসরাজ
১৬৫ লোয়ার চিৎপুর রোড। কলকাতা ১
টেলিফোন ৩৪৩০-৫৭ টেলিগ্রাম 'কোকোনাট'

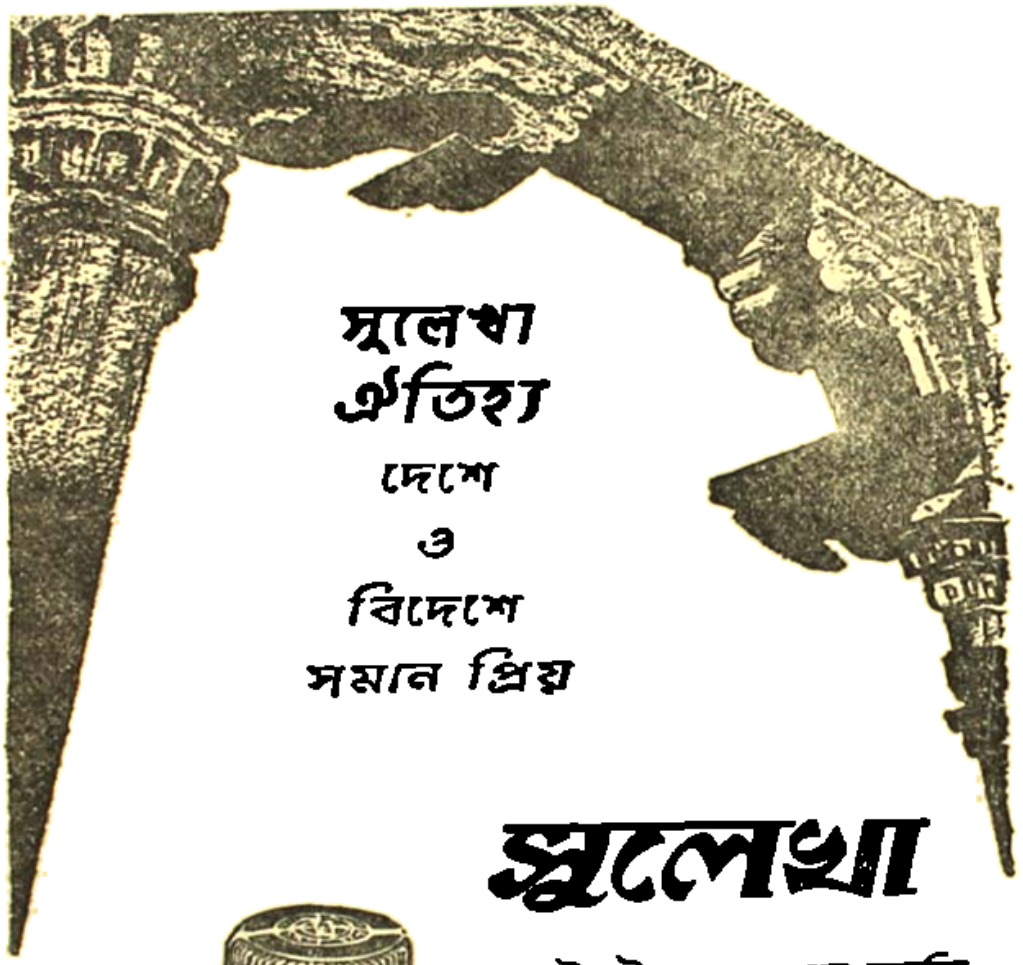

সুলেখা
ঐতিহ্য
দেশে
ও
বিদেশে
সমান প্রিয়

সুলেখা

ফাউণ্টেন পেন-এর কালি

এই সব রঙে পাবেন :
ব্লু ব্ল্যাক • রয়াল ব্লু • ব্ল্যাক
রেড • গ্রীন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

Progressive SW-318

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে ! যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না ? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

১৪৪টি সাইক্লোস্যাক

ট্যাবলেট

=৬ কাপ চিনি

=০ ক্যালোরি

সাইক্লোস্যাক খান

উৎকৃষ্ট মিষ্টকারক—পরে মুখে তিক্ত স্বাদ লাগে না

বিনা চিনির খাবারেও এখন আপনি চিনির সেই মধুর স্বাদ পেতে পারবেন। রোজকার রান্নায় ব্যবহার করুন—সাইক্লোস্যাকের গুণ পুরোপুরি বজায় থাকবে। বারংবার ব্যবহারে দেখা গেছে ১৪৪টি সাইক্লোস্যাক ট্যাবলেট – ৬ কাপ চিনি – ০ ক্যালোরি। আপনার কাছে এ এক আশ্চর্য খবর নয় কি? আজই সাইক্লোস্যাক কিনুন। জেনে রাখুন, সাইক্লোস্যাক সম্পূর্ণ নির্দোষ। চিঠি লিখলে বিনামূল্যে পুস্তিকা পাবেন।

১টি ট্যাবলেট – ২ চামচ চিনি

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

CLC-BEN

পূজোয় অথবা যেকোন দিন
তৃপ্তিতে সিজার্স তুলনাহীন

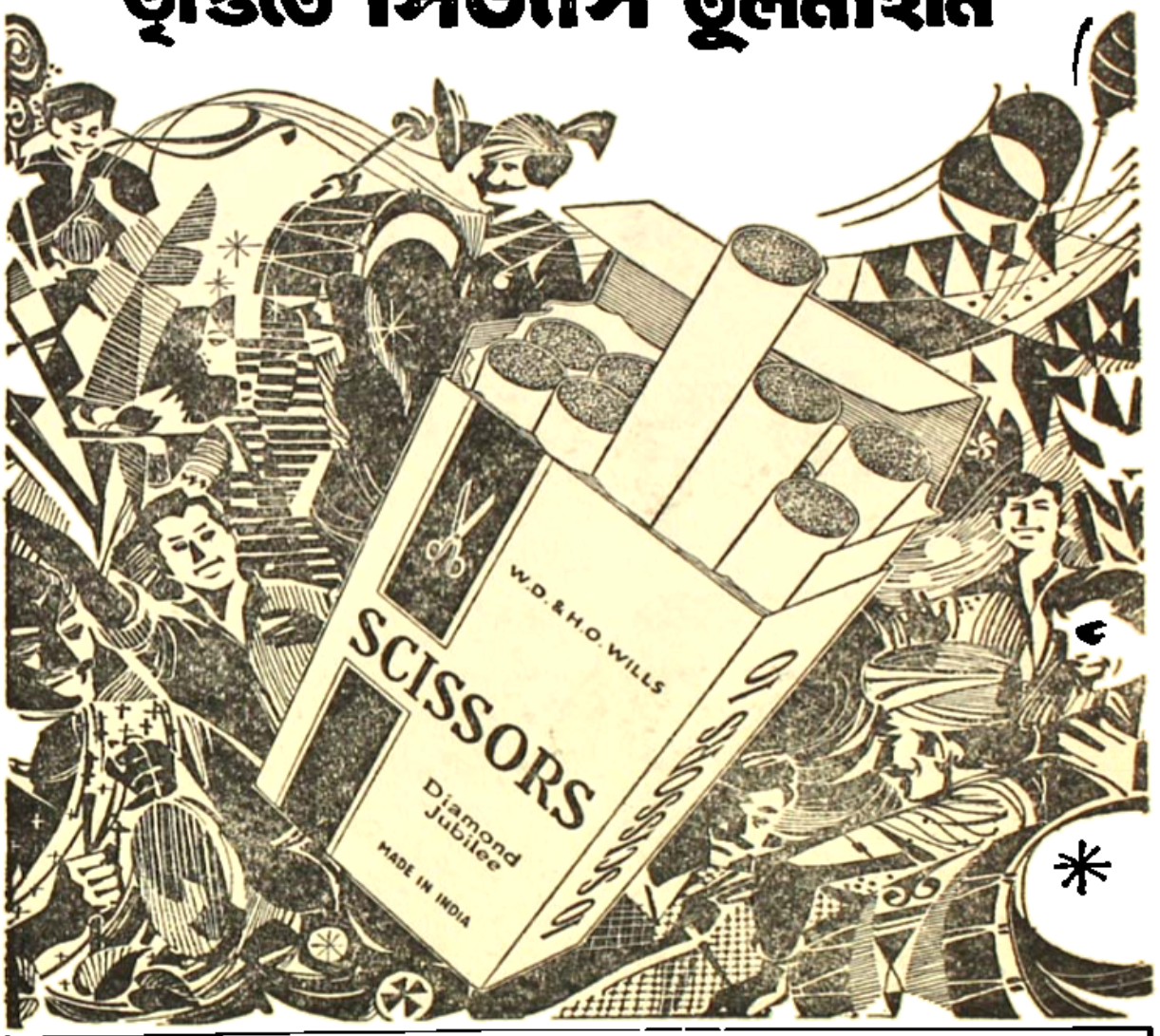

আজই সেরা দিন!

সিজার্স প্রতিযোগিতা—"মুখের পাশ দেখে বলুন কোন্ চিত্রতারকা"

প্রবেশপত্র সিগারেটের দোকানেই পাবেন।

শারদীয়
মহাপূজার অভিনন্দন

ষ্ট্যাডমেড প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ২০

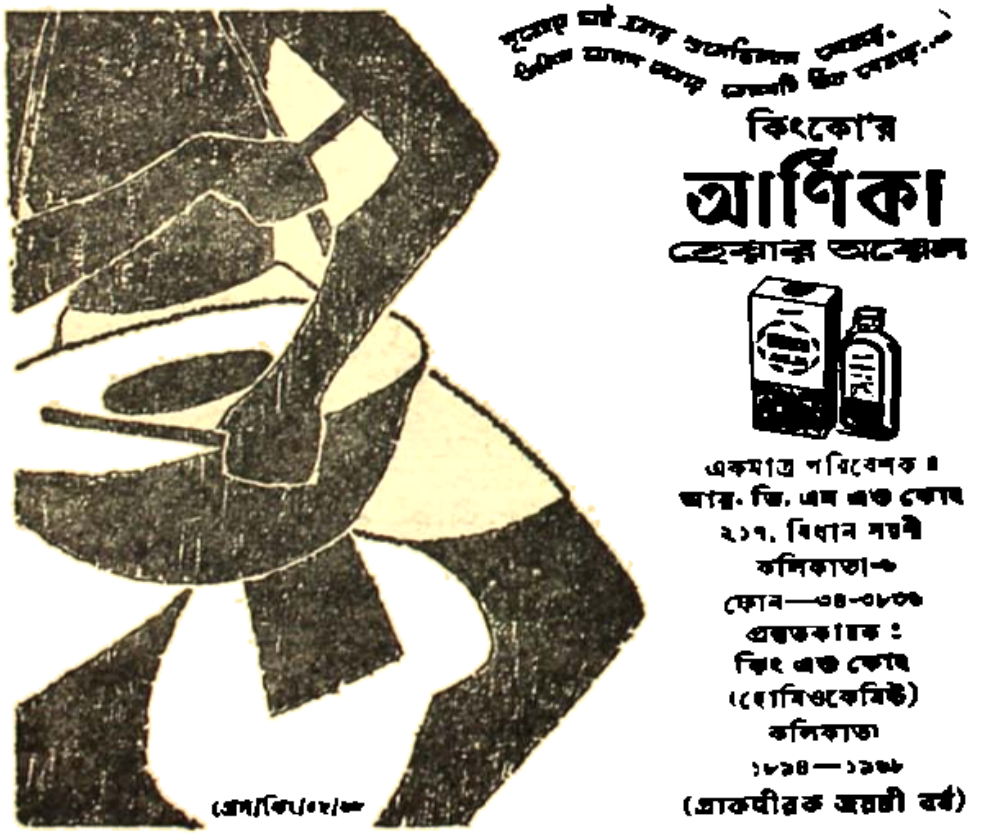

১২ ঘণ্টা সূর্যের কিরণ আর

KALPANA GEC-4009

১২ ঘণ্টা Osram-এর আলো

অসরাম ল্যাম্প ও ফ্লোরেসেন্ট টিউব শুধু চোখ ধাঁধানো আলো দেয় তাই নয়—তারা আলো সমস্যার সমাধান করে।

অসরাম ল্যাম্পের আলোয় চোখে জোর পড়ে না বা চোখ ধাঁধায় না। অসরাম ল্যাম্পের স্নিগ্ধ আলো এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, তার মধ্যে আরামে কাজ করা যায়।

অত্যাশ্চর্য অসরাম ল্যাম্প কিনুন

অসরাম
দীর্ঘস্থায়ী

G.E.C.
আপনার গ্যারান্টি

দি জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোং অফ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা · গৌহাটি · ভুবনেশ্বর · পাটনা · কানপুর · নিউ দিল্লী · চণ্ডীগড় · জয়পুর · বোম্বাই · আমেদাবাদ · নাগপুর · মাদ্রাজ · কোয়েম্বাটোর · বাঙ্গালোর · সেকেন্দ্রাবাদ · এর্নাকুলাম

সুতী তাঁতবস্ত্রের উপর

টাকা প্রতি

১০ পয়সা

বিশেষ পূজা রিবেট

॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর '৬৮ পর্যন্ত ॥

হ্যাণ্ডলুম

সার্ট • টৌল **শাড়ি** বেড কভার
টাই • সুটিংস গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি

…ভারতের সকল প্রদেশের তাঁতবস্ত্র সম্ভার

শীততাপনিয়ন্ত্রিত

হ্যাণ্ডলুম হাউস

২, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Progressive/HH-2/67

WHAT SHOULD YOU LOOK FOR IN A CAR ?

ASP/HM-1/68 A

IS IT

- Sturdy in construction ?
- Well proportioned ?
- Capable of sustained cruising speed ?
- Fitted with power-packed OHV engine ?
- Reliable for road-hugging stability ?
- Renowned for fuel economy ?
- Spacious for stretch-out comfort ?

When you buy an AMBASSADOR MARK II the answer to all these questions is a resounding "YES" ! Book one with your local dealer—today.

HM HINDUSTAN MOTORS LIMITED, CALCUTTA

ত্রিপুরার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।
ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্য
ত্রিপুরা আধুনিকতা ও সমৃদ্ধির
পথে দেশের তালে এগিয়ে চলেছে।
ত্রিপুরার রুদ্রসাগর "দুঃখ" ডুম্বুর জলপ্রপাত
উনকোটি পাহাড় বা জম্পুই পাহাড় দেখলে বেশ
আনন্দ পাবেন, আপনার অর্থব্যয় সার্থক হবে।

ত্রিপুরায় আসুন

সেকালের ও একালের ত্রিপুরা দেখুন

With the compliments of

METAL BOX

MB 2815

আজকের বিন্দুই
আগামী দিনের সিন্ধু

হোক্ না সামান্য ৫৲ টাকা, তাই দিয়েই আপনার এ-সঞ্চয় হোক্ শুরু। উৎসবের আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলো সুন্দরতর হোক্ এই শুভ সূচনার মধ্য দিয়ে। ইস্টার্ন ব্যাঙ্কে প্রথমে মাত্র ৫৲ টাকা দিয়েই সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। বার্ষিক সুদ ৩½%। চেকের সুবিধে তো আছেই।

আপনার সামান্যতম অসুবিধাও যাতে না হয়,
তার জন্য আমাদের কর্মীরা
সব সময়েই সতর্ক।

দি ইষ্টার্ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

(সীমাবদ্ধ দায়িত্বের সহিত ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

টেলিফোন : ২২-৫৫৭১/২/৩

১৪ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১

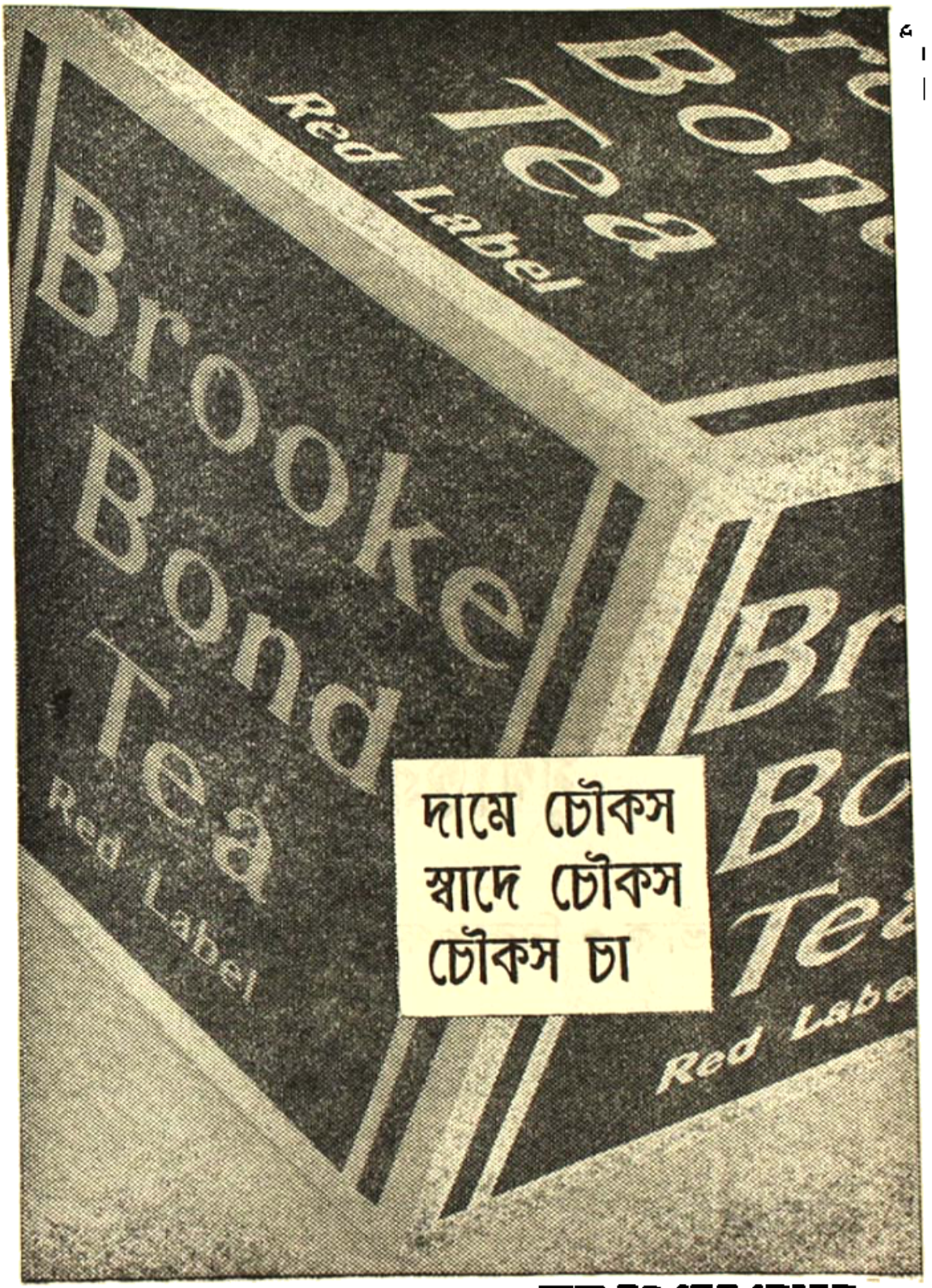

ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল
মানেই চের বেশী কাপ ভালো চা

* দেশবিদেশের সংবাদ পরিবেশনে
* আন্তর্জাতিক ঘটনা বিশ্লেষণে
* সম্পাদকীয় মন্তব্যে
* জনমত প্রতিফলনে

লক্ষাধিক প্রচারিত
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র

যুগান্তর

নির্ভীক * নিরপেক্ষ * স্বাধীন

২ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা ৩

গানের সুরেই জাগে মনের প্রীতি
গানই পারে সবাইকে আপন ক'রে তুলতে! দিনে অন্ততঃ একটিবার সময় করে প্রিয়জনদের নিয়ে মনের মতো গান-বাজনা শুনুন···দেখবেন কী আনন্দ!

একমাত্র এইচ এম ভি-ই আপনার পছন্দসই রেকর্ডে আপনাকে মনের মতো গান শোনার সুযোগ এনে দেয়।

এইচএমভি ফিয়েস্টা রেকর্ড প্লেয়ারে আপনার মর্জি ও মেজাজ মাফিক হরেক রকম গান-বাজনা শুনতে পাবেন···একেবারে আপনার নিজের পছন্দ করা সংগীত। হালফ্যাশানের রেকর্ড প্লেয়ার **এইচএমভি ফিয়েস্টা** সুবহ এবং সহজে চালান যায়—এসি ও ব্যাটারী চালিত দু'রকম মডেল। সব রকম সাইজও সব রকম স্পীডের রেকর্ডই এতে বাজে। মজবুত ছিম-ছাম র‍্যাপ অ্যারাউণ্ড ক্যাবিনেট। ফিয়েস্টা **এইচএমভি**র তৈরী—যাঁরা ভারতে ধ্বনি ও সংগীতের শিল্পকর্মে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

এইচ এম ভি
ফিয়েস্টা
দাম ২৯২.৬০ টাকা
স্থানীয় কর আলাদা

হিজ মাস্টার্স ভয়েস
কাজে ভালো, দামে কম

GC 1625 BEN

বাংলা ছবি বাঁচান

শরৎচন্দ্রের

চিত্রলিপি ফিল্মস্ নিবেদিত

পরিণীতা

পরিচালনা
অজয় কর

সঙ্গীত
হেমন্ত মুখার্জি

সৌমিত্র — মৌসুমী
বিকাশ রায় — কমল মিত্র
ছায়া দেবী — অনুভা গুপ্ত
যমুনা সিংহ — গীতা দে
রোমি চৌধুরী — সমিত ভঞ্জ
বঙ্কিম ঘোষ — শৈলেন মুখার্জি
নীরা মালিয়া

প্রযোজনা
অজয় কর ও
বিমল দে

একমাত্র পরিবেশক : চিত্রলিপি ফিল্মস

সর্বত্র এবেস্ট : রবীন্দ্রনাথের মালাদান (বাংলা) ও সুবোধ ঘোষের পরশপাথর (হিন্দী)

পূর্ণিমা পিকচার্সের
নিবেদন
সত্যজিৎ রায়ের

পাখি ও পাখাবাহন

উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে

প্রযোজনা
গোপাল দত্ত / অমীম দত্ত

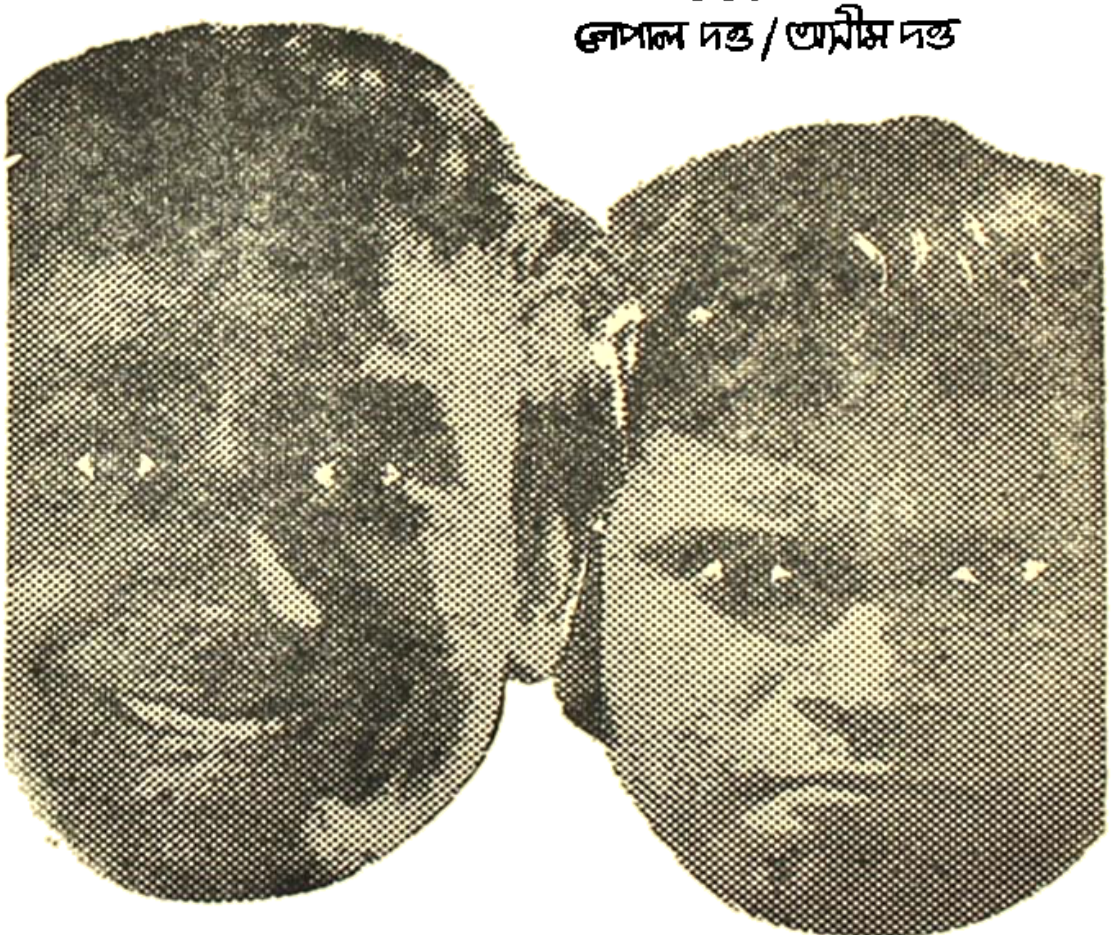

ঐতিহ্যপূর্ণ নৃত্য নাটক ও সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবনে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

লোকরঞ্জনশাখা

লোকরঞ্জন শাখার গুণপ্রিয় নিবেদন –

নাটক – ঝলীকবাবু। বিবাহ-বিভ্রাট।
মহা-উদ্বোধন। গুনস্লাবন।
হাসপাতাল। মৃৎবস্তু। চাষী।
জাসরী। পারঘাট।

নৃত্যনাট্য —
মহুয়া। শবরী। শতাব্দীর সাধনা।
ভারতের সাধক কবি।

তথ্য ও জনসংযোগ
পশ্চিমবঙ্গ

FLIES TWICE A DAY TO BAGDOGRA

HAPPY HOLIDAYS IN KALIMPONG & DARJEELING

CALCUTTA - BAGDOGRA - CALCUTTA				
Viscount IC-223	F-27 IC-221	Flight time :	F-27 IC-222	Viscount IC-224
Daily	Daily		Daily	Daily
1405	0700	D CALCUTTA A	1060	1735
1535	0840	A BAGDOGRA D	0910	1605

Provide connection to/from Delhi & Bombay (All timings are local time)

Indian Airlines 39, Chittaranjan Avenue, Calcutta

DARJEELING Laden La Road. Tel : Booking Office—365
BAGDOGRA Hillcart Road, Siliguri. Tel : Booking Office—4146 Airport—2411

IAC-84

যে সেবার আর বিরাম নেই

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে, শীতের হাড়কাঁপুনে শৈত্যে বা মুষলধারে বৃষ্টিকালে রেলকর্মীগণ ইঞ্জিনে, ইয়ার্ডে, লোকো শেডে, লাইনে, কেবিনে বা অন্যত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিষেবা কার্যকে অব্যাহত রেখে চলেছেন। সমষ্টির চক্রকে আবর্তিত রাখার জন্যে তাঁদের নিজের অস্তিত্বের সমষ্টিকে উপেক্ষা করে তাঁরা কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট

আগামী বছরের পুজোর খরচের জন্য ফেস্টিভ্যাল অ্যাকাউন্ট খোলার এখনই উপযুক্ত সময়।

প্রতিমাসে টা. ৫ জমা দিলে আগামী পুজোয় সময় টা. ৬১.৫০ হবে। পাঁচ টাকার গুণিত অধিক পরিমাণ টাকাও জমা লওয়া হয়।

আমরা সেবার সাথে দিই আরও কিছু

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

রেজিষ্টার্ড অফিস : ৭, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-১

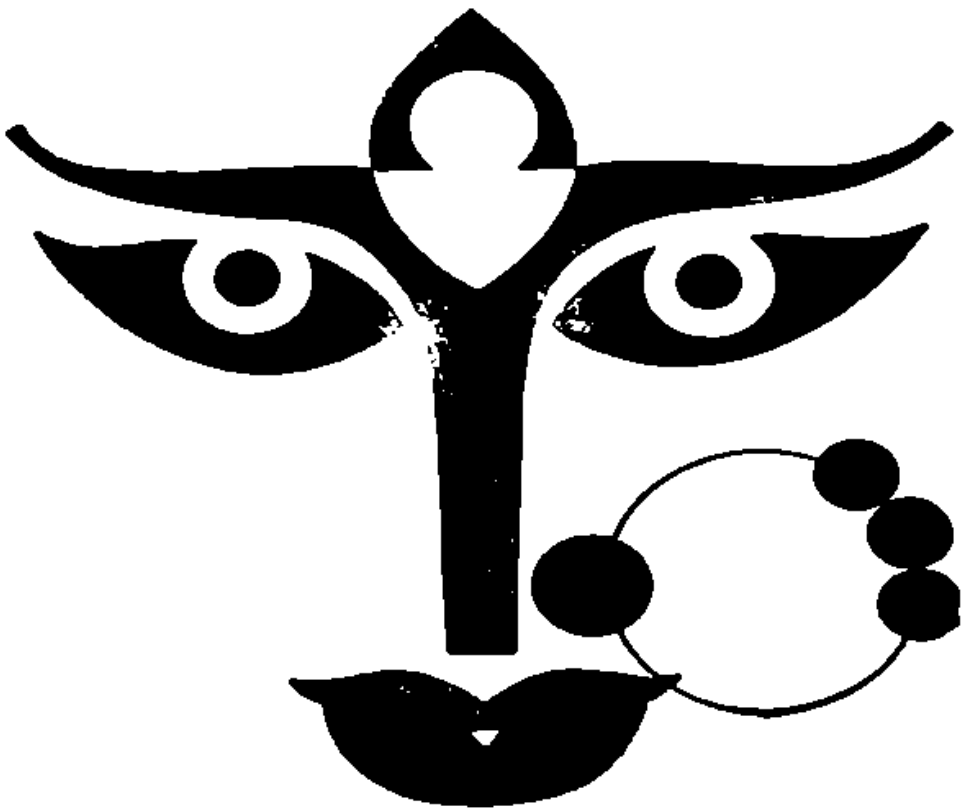

With Compliments From

INTERNATIONAL TIMBER WORKS

14 MOHANCHAND ROAD

CALCUTTA 23

enjoy vinkola-12 ! *and enjoy an active healthy life !*

Wonderful VINKOLA-12.
Peps you up in no time.
You feel so full of vitality,
you want to enjoy life.
VINKOLA-12 provides you
with IRON to build red blood
cells — VITAMIN B_{12} to stimu-
late appetite and increase
stamina — DRAKSHARISTA
to replenish energy quickly
— PLUS other vitamins
and minerals for health,
resistance and vitality.
Go get VINKOLA-12 today.

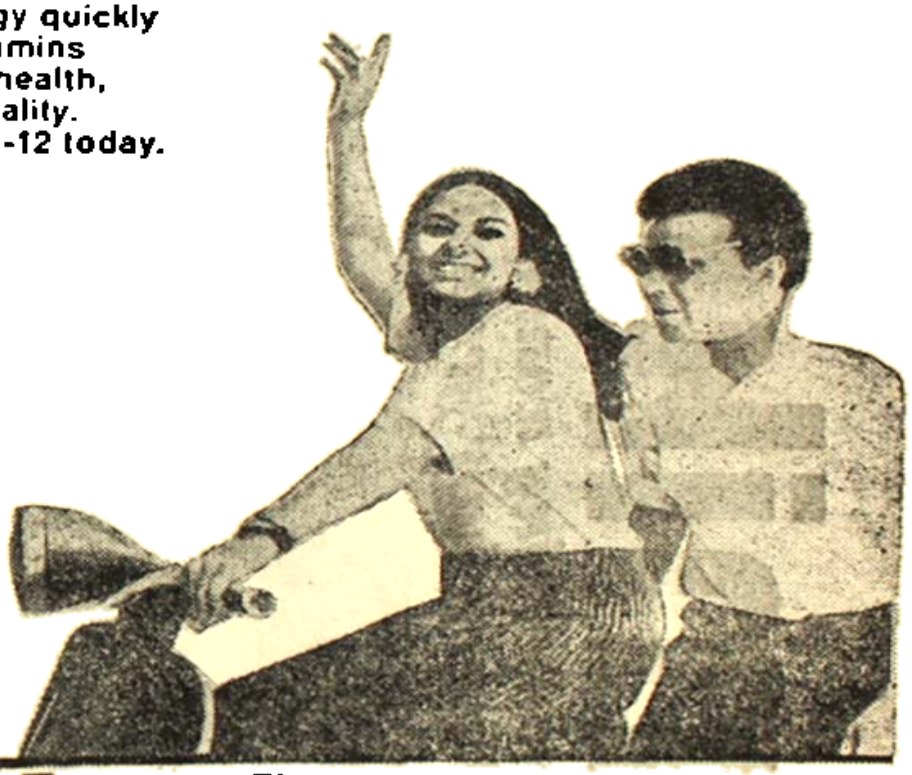

vinkola-12

THE DELICIOUS VITAMIN-MINERAL TONIC

STANDARD PHARMACEUTICALS LTD. CALCUTTA-14

mikreme

does something wonderful to ordinary hair grooming

it's non-greasy-

-it's smart grooming

Dabur (DR. S. K. BURMAN) PRIVATE LTD., CALCUTTA-29

কেন ঠকছেন !

কেনাকাটার ব্যাপারে
আর একটু সতর্ক হলে
আপনি অনেক টাকা
বাঁচাতে পারবেন

দাম সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মান
সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে

দেখে নিন ক্রীত বস্তুর গায়ে পশ্চিমবঙ্গ
শিল্পাধিকারের মানসূচক চিহ্ন আছে কিনা

Quality Marking
Section,
Directorate of
Cottage & Small
Scale Industries,
West Bengal
Phone : 23-9677

W.B.GOVT

এই চিহ্নের অর্থ জিনিষটি

- টেঁকসই
- সুন্দর

নির্খুঁত
উচ্চমান সম্পন্ন

14 Hare Street (2nd floor), Calcutta 1

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

'মানুষের এমন অসহায় অবস্থা ; সত্যকে ধরবার জন্যে সে হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষা নির্মাণ করেছে, তারপর সেই যন্ত্র এখন বিরাট রাক্ষস হয়ে সত্যকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে।' জীবনের সর্বস্তরে, রাজনীতিতে, প্রেমে, কিংবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় শব্দের এই অসহনীয় আধিপত্য থেকে আবেগের শুদ্ধতা বাঁচানোর চেষ্টাই অসীম রায়ের সাম্প্রতিক দীর্ঘ উপন্যাস 'শব্দের খাঁচায়'-এ রূপায়িত।

মূল্য ছয় টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ১২

VISVA-BHARATI RESEARCH PUBLICATIONS

1. Four Essays on the Poetry of Yeats
   S. C. Sen, Rs. 12·00
2. The Sakas in India
   S. Chatterjee, Rs. 8·00
3. A Chronicle of Buddhism in China during 581-960 A. D.
   Jan-Yun Hua, Rs. 20·00

   Religious Movements in Modern Bengal
   Benoy Gopal Ray, Rs. 10·50

   Agriculture, Famine & Rehabilitation in South Asia
   Karunamoy Mukherjee, Rs. 10·00
6. The Philosophy of the Srimad Bhagavata, Volume I & II
   Siddheswar Bhattacharya, Rs. 21·00 each
7. Sastramulak Bharatiya Sakti Sadhana
   U. K. Das, Rs. 50·00
8. Rabindra Rachana Kosh, Vol. I, Pt. 3
   C. Dev & B. Maity, Rs. 8·00
9. Madhava Sangit
   A. Chowdhury, Rs. 15·00
10. Mahabharater Samaj
    S. Bhattacharya, Rs. 12·00
11. Shoitya Prakasika, Vol. V (Dvadas Mangal)
    P. Mondal, Rs. 12·00
12. Sahitya Prakasika, Vol. VI (Gopal Vijaya)
    Durgesh Chandra Banerjee, Rs 20·00
13. Adhunik Oriya Kavya Dhara : Adiyuga
    N. Misra, Rs. 12·00

VISVA-BHARATI
Santiniketan, West Bengal

পরিচয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা : শারদীয় ১৩৭৪

সূ চি প ত্র

ঐতিহ্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সত্যজিৎ চৌধুরী ১
মণ্ডলাকার, গালিলিও, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা ঃ পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ১৭
টমাস মানের সঙ্গে ঃ অসীম রায় ৩০
শিল্পীর সংকট : দুটি চিঠি ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮
কিংবদন্তির সূর্য ঃ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬
আন্দ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি-র কবিতা ঃ অসীম রায় ১২৫
একটি পত্রিকার কথা ঃ অশোক মিত্র ১৩১
কিছু তো দাও ঃ যুবনাশ্ব ১৩৯
মন ঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৪০
ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৪১
জীবন বিষয়ক ঃ প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ১৪২
হয়তো আরেক দিন ঃ সুধেন্দু মল্লিক ১৪২
পালিয়ে যেতেও ঃ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৪৩
নিঃসঙ্গ হরিণী ঃ কাজল ঘোষ ১৪৪
কখনো কখনো অন্ধ ঃ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ১৪৫
আনন্দ ঃ কালীকৃষ্ণ গুহ ১৪৬
বিপ্লবের প্রশ্ন ঃ হার্বার্ট মার্কিউস ১৪৭
পরিবর্তনশীল জগৎ ও বিবর্তমান নৈতিকতা ঃ হাওয়ার্ড সেলসাম ১৪৩
পত্রিকার কথা ১৬৬

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়
সম্পাদক : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ঃ নির্মালা আচার্য

কার্যালয় ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

প্রকাশিত হল

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালী মনীষীদের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন নিয়ে বাংলায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। ইতিপূর্বে এ জাতীয় কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। অসামান্য নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে লেখক একটি দীর্ঘকালীন অভাব মোচন করলেন। রাজনৈতিক কর্মী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের ছাত্র, এবং সচেতন নাগরিকের পক্ষেও বইখানি একান্ত অপরিহার্য। মূল্য ১৮·০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

বিজ্ঞপ্তি

এক্ষণ দ্বিমাসিক পত্রিকা

পত্রিকা নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই ভালো

বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য সাত টাকা

প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম এক টাকা

বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত

দাম দিতে হয় না

যে-কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

বছরের শেষে নতুন চাঁদা পাঠালে

পত্রিকা পাঠানো অব্যাহত থাকে

পত্রিকা সাধারণ ডাকে পাঠানো হয়

রেজিস্ট্রি ডাকে পেতে হলে রেজিস্ট্রেশন ফি অতিরিক্ত পাঠানো প্রয়োজন

এক্ষণ কার্যালয়

৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলকাতা ৯

EKSHAN [Vol. VI No.-1] Re. 1·00
Regn. No. 5308/01 April 1968

এক্ষণ

কার্ল মার্কসের জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে

কার্ল মার্কস্

বিশেষ সংখ্যা

সমকালীন লেখকবৃন্দের বহু চিন্তাশীল রচনা অনুবাদ চিত্র ও নানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই স্মারক সংকলনটি কার্ল মার্কসের প্রতিভার সম্যক মূল্যায়নের একটি নির্ভরযোগ্য প্রয়াস

দর্শন অর্থনীতি শিল্পসাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে মার্কস্‌বাদের যথার্থ পর্যালোচনা

দান্তে সংখ্যার পর এক্ষণের আর একটি মূল্যবান বিশেষ সংখ্যা

•

তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি এক্ষণের পরবর্তী সংখ্যা রূপে পাওয়া যাবে

প্রত্যেক সচেতন পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য

আনুমানিক মূল্য পাঁচ টাকা

•

নিশ্চিত পেতে হলে অবিলম্বে নাম তালিকাভুক্ত করুন

যোগাযোগের ঠিকানা

এক্ষণ কার্যালয় ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা ৯

Ekshan : 73 Mahatma Gandhi Road Calcutta 9

CENTRAL LIBRARY JADAVPUR UNIVERSITY

17 MAY 1968

সত্যজিৎ চৌধুরী

ঐতিহ্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense ; This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time what makes a writer most acutely conscious of his place in time, of his own contemporaneity···I mean this as a principle of aesthetic, not merely historical, criticism.

T. S. ELIOT

ক্ষীরের পুতুল বা শাজাহানের মৃত্যু কিংবা শেষজীবনের তৈরি খেলনা কাটুম-কাটম – এক অর্থে সবই রূপ রচনা, রূপসৃষ্টির নিহিত প্রেরণার নানামুখী প্রকাশ। কখনো সংচিত্রিত ভাষায়, কখনো সপ্রাণিত রেখায় ও বর্ণে, কখনো-বা শুধুই প্রাকৃত বস্তু রূপান্তরের দক্ষতায়। তাঁর রূপসৃষ্টিতে যে-সিদ্ধির পরিচয় ধরা আছে তাকে মনে হতেও পারে অনায়াসলব্ধ, স্বভাবগত দক্ষতায় রচিত। কিন্তু জীবনব্যাপী নিজেকে

নিয়ে ভাঙাগড়ার অন্তহীন পরীক্ষা বিষয়ে অবহিত থাকলে কোনো রচনাকেই অনায়াস সিদ্ধির দৃষ্টান্ত মনে করা চলে না আর। 'বিফলতার পর বিফলতা।··· দেখা, ও কি সহজ জিনিস? কী কষ্ট করে যে আমি ছবি আঁকা শিখেছি[১]।' কিছুই সহজে আসে নি, না মাতৃভাষার প্রাণময় ছন্দে অনায়াস অধিকার, না রেখা ও রঙের রহস্যভেদে দক্ষতা। তাঁর শিল্পীজীবনের পরতে-পরতে প্রচ্ছন্ন আছে সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যের স্বাভাবিক দায়ে নিজেকেই জানার ক্লান্তিহীন প্রয়াস। সেই পুরুষার্থের, যুযুধান মনোবৃত্তির, আর-এক পরিচয় ফুটেছে কান্তিবিদ্যা বিষয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধাবলিতে। নিছক তত্ত্ব গড়ার শৌখিনতা বা পাণ্ডিত্যাভিমান নয়, এসব রচনার মূলে আছে আপন শিল্পীস্বভাবে নিহিত প্রখর আত্মান্বেষণ এবং সেই সূত্রেই দেশের আবহমান শিল্প-ঐতিহ্যকে আধুনিকতার দিকে বাঁক ফেরানোর দায়িত্ববোধ। শিল্পক্রিয়ার কর্মিষ্ঠ আবেগই সংক্রামিত হয় তত্ত্বভাবনার স্তরে। তাই ঐতিহ্যস্মৃতির মর্ম, বর্তমানের সত্তাধর্ম ও ভবিষ্যৎ উত্তরণের পথ বিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগে। তাই অবনীন্দ্রনাথের ভাবনা শিকড় ছড়ায় দেশের আন্তীর্ণ ঐতিহ্যের মর্মের দিকে। নিজেকে জানার গরজেই শিল্পশাস্ত্র বা সৃজিত মহিমান্বিত শিল্প-কীর্তিগুলির মূল্যায়নে তাঁকে নিয়োজিত দেখি, দেখি ব্রাত্যবাঙলার মর্মসন্ধানে নিবিষ্ট হতে। শুধু প্রাচীনকে পাঠ করা নয়, বর্তমানের দায়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে মিলে অখণ্ড শিল্পপ্রবাহের বোধ ধারণায় আনবার পদ্ধতি বিষয়েও ভাবনা আসে। স্ব-দেশ বা স্ব-কালের দায় এড়িয়ে শিল্পী কখনো উল্লম্ফনবত্তায় মহাকালের আশ্রয়ে পৌছাবেন—এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

> 'পৃথিবীর সেকালের ভিত্তির উপরে একালের প্রতিষ্ঠা হল স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা'[২], 'সেকাল ছেড়ে কোনো শিল্প নেই এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোনো শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে এটা একেবারেই ঠিক[৩]।'
>
> 'শিল্প···সেকাল, একাল ও ভবিষ্যকালের যোগাযোগে বর্ধিত হয়ে চললো, কোনো এককালের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাকে ধরে রাখবার উপায় রইলো না[৪]।'

প্রত্যেক শিল্পীর কাছে তাঁর বর্তমানই তরঙ্গচূড়া,—ঢেউ ওঠা-পড়ার, অতীত-ভবিষ্যতের সংঘাত এই বর্তমানকেই দিচ্ছে উত্তত মহিমা। বর্তমানেই তিনি সংবদ্ধ, কিন্তু বর্তমানের দায়েই অতীত-ভবিষ্যতের চেতনা তাঁর শিল্পীমানসের জলবায়ুতে মেশে রাসায়নিক মিশ্রণে। বর্তমানের বোধ তাৎপর্য পায় অতীত-ভবিষ্যতের আতত পটে। বা অতীত ভবিষ্যতই তাৎপর্যে মণ্ডিত হয় বর্তমানের আলোকে। শিল্পক্রিয়াতে যেমন মুখ্য হয়ে ওঠে প্রকরণের প্রশ্ন, টেক্‌নিকেরই সাধনা শিল্পমুক্তির জন্য; স্বাবলম্বী কোনো তত্ত্বভাবনাতেও তেমনই পদ্ধতির প্রশ্নটি মুখ্য। পদ্ধতির অভ্রান্তিতেই ভাবনা কেলাসিত হয়, সংহতি আসে, গড়ে ওঠে সমর্থ কোনো প্রস্থান। বলার কথা অবনীন্দ্রনাথ মজলিশি চালেই বলতে

অভ্যস্ত ছিলেন। বলার ঢঙ্ ভাই কথকতার আমেজে রম্য, তবুও ভাবনাক্রম শিথিলিত নয়। নয় যে, তার কারণ তাঁর চিন্তাপদ্ধতির বিজ্ঞাননিষ্ঠ চারিত্র, অনাবিল বুদ্ধির সক্ষম ব্যবহার।

অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যভাবনার মূলে ছিল শিল্পীধর্মের অপরিহার্য স্বাত্মোপলব্ধির গরজ। কিন্তু ব্যাপারটা কোনো অর্থেই বিচ্ছিন্ন একক প্রয়াস নয়। শিল্পকর্মে অবনীন্দ্রনাথের সাবালকত্ব বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলনের সমসাময়িক। সাহিত্যে অন্তত ততদিনে আমাদের আত্মানুসন্ধানী রেনেসাঁস-এর সংকট ও শক্তি নানা কীর্তিতে প্রাঞ্জলভাবে মূর্ত। মাইকেলের প্রাথমিক বিভ্রান্তি ও শিল্পসিদ্ধির বৃত্তান্ত ততদিনে বিদিত, ইয়োরোপের প্রবল আকর্ষণে কেন্দ্রাতিগ বাবুসমাজের বিকার বিকৃতির মধ্যেও অনাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পাশ্চাত্ত্যের মূল্যায়নের স্বকীয়তায় বিদ্যাসাগর চরিত্র ধ্রুবতারার মর্যাদায় ভূষিত, বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র ততদিনে আত্মসামর্থ্যের দৃঢ় বনিয়াদ রচনা করেছেন মাতৃভাষায়। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পতিসর-শিলাইদহর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিল্পীমানসের একাগ্র অভ্রান্ত সাধনায় ঔপনিবেশিক শাসন-জনিত সংকটের মধ্যেও সাহিত্যসংস্কৃতির নব্যস্তরটিকে অগ্রসর ক'রে নিচ্ছেন পূর্ণতার অভিমুখে। সাহিত্যে অন্তত বিভ্রান্তির যুগ অনেক আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, জাতীয় মানস ইংরেজির সমান্তরালে অঙ্গলিপি রচনার মারাত্মক ভ্রান্তি বিষয়ে প্রখরভাবে সচেতন। চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের অগ্রসর মানস খাতে প্রবাহিত সংস্কৃতির এই নব্যধারা আপন তটসীমার বাইরের বৃহৎ জনচিত্তভূমির সঙ্গে সংযোগরচনায় ব্যাকুল হয় নি এমনও নয়। স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি স্থাপিত হয়েছে বৈশ্যরাজতন্ত্রে ঔপনিবেশিক কৃষিব্যবস্থার অর্থনৈতিক সংকটে বিদ্ধ মানুষের পরাক্রান্ত সংগ্রামের ও বেদনার আলেখ্য – নীলদর্পণে। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বন্ধুতার সূত্রে ব্রাত্য বাঙলার শুদ্ধ বিবেক অঙ্গীকারে উৎসুক। অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, বঙ্গদর্শন প্রকাশ ও ন্যাশানল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগের বৎসরে। বাল্য-কৈশোরের শিক্ষাদীক্ষা দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির পাঁচ আর ছয় নম্বর বাড়ির আবহে, যেখানে ততদিনে নব্য বাঙলার মানস কুসুমগুলি প্রস্ফুট, তাঁর আত্মীয়-পরিজনদের প্রতিভায়। স্বাদেশিকতার বাণী ঠাকুরপরিবারের প্রযত্নে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে সেই কালে। এমন পরিবেশের প্রভাবে স্বতই অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি খুলেছিল স্বদেশের পট ও ব্যক্তি-প্রতিভার সম্পর্ক সন্নিপাত বিষয়ে। তাঁর সম্পর্কে অন্তত দৃষ্টিবিভ্রমে আর-এক রবিবর্মা হবার চোরাবালিতে পদপাতের আশঙ্কা ছিল না। শিক্ষানবিশির যুগ শেষ না হতেই শিল্পমুক্তির পূচ্ছনা জাগে তাঁর মনে, ধাপে ধাপে নানা পরীক্ষায় আয়ত্তে আনেন স্বয়ম্ভর টেকনিক, নিজের কাজে সম্ভব করেন চিত্রকলায় রেনেসাঁস। শিল্পচৈতন্যের অনাচ্ছন্ন আলোকে বর্তমানের শিল্পভাষার প্রকৃত স্বরূপ ধরা দিয়েছে অবনীন্দ্রনাথের তুলিকায়, সেই অভিজ্ঞতারই তাত্ত্বিক বিবৃতি মেলে কান্তিবিদ্যা

বিষয়ক রচনাবলির নানা প্রবন্ধে। সেই বিক্ষিপ্ত বক্তব্যগুলি গেঁথে তুলে ঐতিহ্য ও বর্তমান বিষয়ে তাঁর ভাবনার স্বরূপটি তুলে ধরতে ইচ্ছা করি।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার মূলে আছে শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ে নানামুখী জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার সূত্রেই ঐতিহ্য অনুসৃতি বা প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন ওঠে। দুটি বাঁধা পথ নবীন ভারতের শিল্পীসমাজের সামনে। এক শাস্ত্রবিহিত প্রাচীন ঐতিহ্যের পথ, অপরটি পাশ্চাত্ত্য রীতির আনুগত্য। কিন্তু শিল্পীচৈতন্যের যে আত্মনির্ভরতা তাঁর অন্বিষ্ট, প্রস্তুত এই সমাধান দুটি সেই সিদ্ধির পক্ষে সহায় নয়, প্রবল বাধা। পথই নয়; বিপথ, কুহক মাত্র। তিনি বুঝেছিলেন, ওই বাঁধা পথ শিল্প-মুক্তির পূর্ণিমায় উপনীত করে না, নিয়ে যায় ঘোর বিভ্রান্তির অমাবস্যায়। ঐতিহ্য অনুসৃতি বলতে তিনি স্বদেশীয় নির্বিচার পরিগ্রহ বোঝেন নি কখনো। ইংরেজিয়ানার বাঁধা সড়কের প্রগতি যেমন বর্জন করেছেন তেমনি প্রাচীনের নির্বিচার আনুগত্যও প্রকারান্তরে যে কুহকী মায়া—অবনীন্দ্রনাথে এ-জ্ঞান অনাচ্ছন্ন প্রথমাবধি। ঐতিহ্য ও দেশকালের দায় বিষয়ে এ-প্রমিতি সম্ভবত তাঁর শিল্পপ্রতিভারই আর এক লক্ষণ। ১৩২২ সালে এক প্রবন্ধে লেখেন:

> 'আমরা যখন চলতে চাচ্ছি, পথ চাচ্ছি, তখন গোড়াতেই প্রাচীনের এই ভয়ংকর বোঝাটাকে আমাদের কাঁধ থেকে নামাতে হবেই, গণ্ডূষের কুক্ষি ভেদ ক'রে আমাদের আর একবার সেইখানে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে যেখানে আমরা শিল্পী সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে আমাদের পুরাতনটা আমাদের বাধা দেবে না, অন্যের নতুনটাও আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবে না; এক কথায় প্রাচ্য প্রবীণতার তৈলকটাহ এবং পাশ্চাত্ত্য নূতনতার অগ্নিকুণ্ড এ দুই থেকেই দূরে এমন একমুখে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে, যে মুখে আমাদের চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত[৫]।'

চোখের দৃষ্টি মনের প্রসার আনন্দের প্রবাহ অপ্রতিহত রাখা চাই—শিল্পক্রিয়ার এ প্রাথমিক শর্ত। এ-জন্য ঘুরে দাঁড়াতে হবে প্রাচীন প্রাচ্য আর সদ্যজাত পাশ্চাত্ত্যের দিক থেকে। কোন্ দিকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে তবে? প্রবীণের শাসন শুধুই তৈলকটাহ? পাশ্চাত্ত্য নূতনতা কেবলই অগ্নিকুণ্ড? আমরা জানি প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রপাঠ এবং তার মর্মোদ্ধারে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। আর ইয়োরোপীয় শিল্পপদ্ধতির শিক্ষা তাঁর কোনোই কাজে আসে নি এ-কথাও সত্য নয়। কোন্ বিচারে তবে এমন সিদ্ধান্তে আসেন খুঁটিয়ে দেখা কর্তব্য আমাদের। ঘুরে দাঁড়াবার কথা ওঠে, কারণ:

> 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিতধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন ক'রে শিল্প আমাদের হয় না।···বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না[৬]।'

শিল্পীর উত্তরাধিকার নিজেরই সামর্থ্যে অর্জনীয়, এই অর্জনে আত্মজ্ঞান তার একমাত্র সহায়। বর্তমানের পটে নিজের ক্রিয়াকর্মের দায়িত্ববোধ থেকেই আসে এই আত্মজ্ঞান এবং এই আত্মোপলব্ধির দিক থেকে প্রবেশ করতে হয় ঐতিহ্যের মর্মে। ঐতিহ্যের ধারা অতীত থেকে বর্তমানের বুকের উপর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে স্বচ্ছন্দে বয়ে যায় না। এমন অনায়াস স্বচ্ছন্দ প্রবাহ শিল্প জগতের সত্য নয়। শিল্পসংস্কৃতির বিশিষ্ট কাঠামোর ভিত্ অতীতের গর্ভেই প্রোথিত। তারই উপরে যুগে যুগে রচিত হয়েছে এক-একটা নতুন মহল। ছকটা সম্পূর্ণ গড়নে রূপ পেয়ে সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠছে কালে কালে। ভিত্ গড়া হয়েছে যে-আদর্শে তার রূপকল্প নতুন যোজনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেই। আবার যা সংযোজিত হচ্ছে তার স্বকীয়তায় সেই মূল আদর্শটাকেই কালে কালে শিল্পীরা অন্তঃসংগতি রেখেও নবনবায়মান করে তোলেন। ঐতিহ্যে-বর্তমানে এ যোগ যান্ত্রিক নয়, জলধারার আদ্যন্ত প্রবাহের মতোও নয়। প্রত্যেক যুগে শিল্পীকে নিজের দিক থেকে অতীতের সঙ্গে সংযোগের সূত্রটি উদ্ভাবন করতে হয় নতুন ক'রে। শিল্পক্রিয়ায় শিল্পীকে তাই প্রথমেই ঘুরে দাঁড়াতে হয় নিজের দিকে। নির্মোহ হতে হয়। পূর্বপুরুষের বাঁধা পথে সিদ্ধিতে পৌঁছে যাবার যে মোহ টানে, তার প্রভাবসীমার বাইরে আসতে হয়। এই মোহ শিল্পীর পক্ষে মারাত্মক, নব্য ভারতীয় শিল্পী-সমাজের উদ্দেশে তাই অবনীন্দ্রনাথ সাবধানতার কথা তোলেন

> 'সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাতকাণ্ড, অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছাঁচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের কারিগরি কি কারদানিটাকে হিন্দু বা মোগল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের ও জাতির ছাঁচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্জীবন লাভ ক'রে কলাবৌটি সেজে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াবে এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে সব শিল্পীর যাত্রাপথের আরম্ভে একটুখানি অথচ অতি ভয়ানক, অতি পুরাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমৎকার চকচকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম Tradition বা প্রথা। অনন্তকালের সঞ্চিত ধনের মতো এর মোহ, একে অতিক্রম ক'রে যাবার কৌশল জানা হলে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে, ডোববার আর ভয় থাকে না[৭]।'

এ মোহ অতিক্রম করতে হয় অনন্যপরতন্ত্র শিল্পীধর্মের স্বয়ম্ভরতায়। ভারত-শিল্পে রেনেসাঁস ঘটানোর দায়িত্বে স্বেচ্ছাকৃত অবনীন্দ্রনাথ বর্তমানের দায়েই ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। অতীত যে-মূর্তি ধরে আছে তাকে একদিক থেকে বলা যায় অপরিবর্তনীয়, সুচিরপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানের দিক থেকে সেই অতীতের সম্মুখীন যখন হন কোনো শিল্পী—তিনি নিজের সাময়িকতার সমস্যার সূত্রে অতীতের চেহারাটাকেও আপন বোধের ভেতরে ভাঙেন গড়েন

নানা প্রকারে। অতীতের স্থাণুতা ঘুচে যায় ক্রিয়াবান শিল্পীর সজীব শিল্পীমানসের জগতে। অনেক গৌণ জিনিস মুখ্য হয়ে ওঠে, প্রখ্যাত কোনো শিল্পকীর্তি তার প্রথিত মহিমা সত্ত্বেও মনে হয় অবান্তর। দৃষ্টি পড়ে আনাচে-কানাচে, একদা উপেক্ষিত পুনরাবিষ্কৃত হয় নতুন তাৎপর্যে। এই তো শিল্পীর ইতিহাসচেতনার বৈশিষ্ট্য। এই শিল্পচেতনাপ্রবুদ্ধ ইতিহাসবোধ নিয়েই অবনীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের বিচার করেন। একাল-সেকালে সেতুবন্ধ রচনা শুদ্ধ শিল্পচৈতন্যেই সম্ভব, শিল্পীর প্রাতিভজ্ঞানের দ্বারা। ইতিহাস আলোচনায় এইটিই অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ঐতিহাসিকের নয়, অতীত-বর্তমানের দুই কোটি জ্যাবদ্ধ ক'রে শিল্পে তাৎক্ষণিক সমস্যার রহস্যভেদ যাঁর লক্ষ, সেই শিল্পীর।

এবারে দেখা যেতে পারে প্রাচ্য শিল্পের ঐতিহ্যবিচারে তিনি কীভাবে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন।

'প্রাচ্য প্রবীণতার তৈল কটাহ' কথাটা একটা তীব্র আঘাতের মতো বাজে। ভারত শিল্পের নবজন্ম যাঁর হাতে তাঁরই লেখনী থেকে নিঃসৃত এমন উক্তি! ভারতের প্রাচীন শিল্পকীর্তি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের গর্ববোধ ও মমত্ব সর্বজন-বিদিত। পুরীতীর্থে জগন্নাথের মাসি বাড়ি (গুণ্ডিচা) সংস্কারের ভয়ানক আয়োজন প্রসঙ্গে তাঁর যন্ত্রণার বিবরণে সেই দরদ ব্যক্তিগত ক্ষতির বোধে মিশে প্রকাশ পায়। ইংরেজি শিক্ষাজনিত বিকারে আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম বিষয়ে কঠিন সমালোচনা করেন 'স্পষ্টকথা' (ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৫), 'ভাবসাধন' (ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩১৭) প্রভৃতি প্রবন্ধে। দেশের ঐতিহ্যের প্রতি মমত্বের আকর্ষণ জাগানোর আবেগ এসব রচনার ছত্রে-ছত্রে। 'ভারতশিল্প' হবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ছায়ায়—এ মোহের প্রতি ধিক্কার এমন স্পষ্ট ভাষায় অবনীন্দ্রনাথই প্রথম উচ্চারণ করেছেন বাঙলায়, হ্যাভেলের উপদেশ অনুসরণ ক'রেই অবশ্য। 'পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া সূর্যোদয় দেখিবার প্রত্যাশা' তিনি করেন নি কখনো। কিন্তু এ দরদ মোহ নয়, বরং প্রকৃত মমত্বের বলেই তিনি মোহ অতিক্রম ক'রে দৃষ্টির শুদ্ধতা অর্জন করেন। লক্ষ করতে হবে, ভারত শিল্পে রেনেসাঁসের জনক অবনীন্দ্রনাথ—প্রাচ্য শিল্প বলতে শুধু ভারতীয় শিল্প বোঝেন নি, চীন-জাপান সহ প্রায় গোটা এশিয়ার শিল্পধারার তাৎপর্য বুঝতে চেয়েছেন। আর দেশের ঐতিহ্য বিচার করেছেন শাস্ত্রীয় শিল্প ও লোকশিল্প—এই দুই স্তরে। প্রথমেই অবশ্য শাস্ত্রীয় শিল্পধারার শক্তি ও দুর্বলতার কথা ওঠে।

প্রাচীন ভারতে দক্ষ শিল্পী বা সমজদারের অভাব ছিল না, কিন্তু সব আয়োজন সত্ত্বেও শিল্পের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে নি সম্পূর্ণ বাইরের থেকে আরোপিত চাপের ফলে। সেই বাইরের শক্তি, শাস্ত্রবিহিত প্রথার শাসন। ভারতে শাস্ত্রবিৎ কুলপুত্রেরা 'দুকূল থেকে আনা শ্রীরত্নের মতো' কলালক্ষ্মীকে জাতে না তুললে শুধুই নিজের রূপগুণে তার মর্যাদা পাবার উপায় ছিল না। ভারতশিল্পের

সীমাবদ্ধতার কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর অনেক লেখায়। এই বিশ্লেষণে তিনি ধরতে চেয়েছেন, ভারতে শিল্পশাস্ত্রের শাসনে শিল্পীর স্বাধীন ক্রিয়াকর্মের পঙ্গুত্ব ও খর্বতার দিক।—

'পণ্ডিতেরা লিখেছেন দেবতার ধ্যান, আর পণ্ডিতদের চেয়ে জাত্যংশে খাটো শিল্পীগুলো সেই ধ্যানমূর্তিসকল ফুটিয়ে তুলছে পাষাণের অক্ষরে— এমন কি, লেখার ছাঁদটুকুর সম্বন্ধেও শিল্পীর স্বাধীনতা নেই, পণ্ডিতের দেওয়া মান-পরিমাণের নাগপাশে শিল্পীর সমস্ত শক্তি এবং স্ফূর্তি মূর্ছাহত। প্রাচীন ভারতের লক্ষ কোটি শিল্পী, যাদের প্রাণের অভাব ছিল না, পণ্ডিতের অপেক্ষা সুকুমার মনোবৃত্তি সকলেরও অভাব ছিল না, তারা একাসনে একমনে বসে শুক্রনীতি ও মানসারের পুঁথির রেখাগণিত ও অগণিত সম্পাদ্য প্রতিজ্ঞা-সকল পূর্ণ করেছে এবং তারি ফলগুলি স্তূপাকার ক'রে সাজিয়ে যাচ্ছে — কখনো রাজমন্দিরের মতো, কখনো বা তেত্রিশ কোটি মূর্তির বত্রিশ সিংহাসনের মতো। এই মন্দিরে এই সিংহাসনে ভারতশিল্পীরা তাদের প্রতিভাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছে বললে ভুল হয়, কেননা, সিংহাসন কি মন্দির, যা কিছু তারা গড়েছে, সে তাদের হৃদয়দেবতার জন্যে নিজের মনোমত ক'রে গড়তে তাদের অনুমতি ছিল না। গড়েছে তারা অনুশাসন এবং হুকুমের চাকর, দেশের বিক্রমাদিত্য সকলের অন্তে যারা প্রাচীনের ছদ্মবেশে আজও সমান বিক্রমে রাজত্ব করছে — আমাদের ধর্মে কর্মে শিক্ষা দীক্ষায়[৮]।'

ফলে শিল্পের বিকাশ হয়েছে খর্বিত। 'যথাসুখে নিজের বাঞ্ছিত পথে চলার অধিকারে বঞ্চিত শিল্পীকুল যা গড়েছেন, অবনীন্দ্রনাথের উপমায়, তা মঞ্চে বাঁধা পঞ্চবটীর মতো। তার থেকে অনেকখানি ছায়া পাবার আশা নেই, দেশের অন্তরেও সে শিকড় মেলতে পারে নি। এ শিল্প থেকে আচার্যদের বিদ্যাবত্তার পরিচয় মেলে, আর মেলে 'শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে শিল্পাচার্যগণের হস্তক্ষেপ করার আদ্যন্ত একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস।' পণ্ডিতের মত ধরে, আচার্যের পরিচালন-দক্ষতায় এই যা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, শিল্পীদের পক্ষ থেকে অবনীন্দ্রনাথ তার সবটুকু নিজস্ব বলে মানতে পারেন নি। শাস্ত্র-অনুমোদিত বলেই যার গুরুত্ব, সেই শিল্পের গর্বে জাত্যভিমানী স্ফীত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু স্বাধীনতা বঞ্চিত শিল্পীর বেদনা ঘোচে না সেই গর্বে। আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতাহীনতায় ব্যথিত সেই প্রাচীন শিল্পীকুলের বেদনাই ভাষা পায় অবনীন্দ্রনাথের উক্তিতে :

'পণ্ডিতেরা খুব উচ্চজাতি হতে পারেন এবং তাঁদের অভিমত শিল্পটাও খুব বড়ো দরেরও হতে পারে কিন্তু সে বা সে জাতির শিল্প এত বড়ো নয় যে আমাদের বলে, শিল্পীর নিজস্ব বলে পরিচয় দেওয়া চলে। প্রাচীন ভারতে পণ্ডিতেরা আচার্যেরা ছিলেন সর্বেসর্বা এবং তাঁদের বচনই ছিল সব। শিল্পটাও তাঁদেরই বচনগুলির তেত্রিশ কোটি পাষাণমূর্তি — দুই পায়ে শিল্পীর

হৃদ্‌পদ্ম দলিত ক'রে বরাভয়ের অভিনয় করছে। প্রাচীন ভারতশিল্পে এই রূপ রসটুকুই সত্যকার, কেননা এইটুকুর সঙ্গেই শিল্পীর প্রাণের যোগ ছিল ; আর যে রসগুলো পাষাণের ভানে ধরা যাচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে শাস্ত্রবচনের যোগ, শাস্ত্রীগণের যোগ ; যথার্থ রসের উৎপত্তির যোগাযোগ সেখানে নাই[৯]।'

এ বিচারে স্পষ্টতই অবনীন্দ্রনাথ একটা ভেদরেখা টানছেন। শাস্ত্রবিহিত শুষ্ক শিল্পপ্রথা সে-রেখার একদিকে ; অপর দিকে রাখেন তিনি, শাসনের চাপে দলিত-হৃদয় শিল্পীদের, যে শিল্পী হৃদয়ের একূল-ওকূল দুকূল জুড়ে অনুর্বরতার অভিশাপ পুঞ্জিত। দেখা যাচ্ছে, ঐতিহ্যের আনুগত্যে অবনীন্দ্রনাথ নির্বিচারে প্রাচীন মাত্রেরই সালোক্য বোঝেন নি। শিল্প-ইতিহাসের তথ্যস্তূপের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি ধারণায় আনতে চাইছেন ভারতশিল্পের মর্মগত ধারাটির স্বরূপ—যা বয়ে এসেছে শিল্পীর স্বকীয় ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতাকে ধরে। তাঁর উদ্দেশ্য সেকালের শিল্পীর হৃদয়ের সঙ্গে, তাঁদের কল্পনাবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যোগ-সাধন, ভাবসাধন। প্রথার প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও, রাজদ্বারে বা দেবতার দ্বারে মুজরা খাটতে গিয়েও আত্মনিষ্ঠ শিল্পীদের প্রকাশবেদনা কোথায় কতটুকু রূপ পেয়েছে তাই তাঁর অন্বিষ্ট। প্রাচীন শিল্পক্রিয়ায় শিল্পীর শুষ্ক শিল্পচৈতন্য যেখানে অনাচ্ছন্ন—তারই অঙ্গীকারে একালের প্রয়োজনের দিক থেকে সেকালের শিল্পভাবনার সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনায় তাঁর আগ্রহ। একেই তিনি নিজের পরিভাষায় বলেন 'ভাব-সাধন[১০]।' পূর্বপুরুষের ভাব সঞ্জীবিত শিল্পের সঙ্গে একালের শিল্পের সঞ্জীব যোগ সম্ভব আত্মসচেতন শিল্পীমানসের নির্মোহ অনুসন্ধিৎসায়। ঐতিহ্যের সেই নিহিত মর্ম—যা যুগে যুগে নানা সংঘাতের মধ্যেও 'ভৃগুপদচিহ্নের মতো' চিরদিন ভারতের বুকে শোভা পাবে—তাকে একালের সঙ্গে মিলিয়ে জানা নব্য ভারতের শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব। এই বসন্তে যে মুকুল আসছে, সম্ভাবনার দিক থেকে তার একটা যোগ অতীতের বীজটির সঙ্গে। একালের শিল্পীকে সেই যোগ-যোগের রহস্য ধরতে হয় অতীতের সঙ্গে ভাবসাধনে, কারণ শিল্পে যা ফুটে ওঠে সে তো শিল্পীরই মানসকুসুম। তার মনই শিল্পের আশ্রয় এবং আধার। শাস্ত্রীয় শাসনের চাপ সত্ত্বেও প্রাচীন শিল্পে শিল্পমুক্তির দৃষ্টান্ত অবিরল। শিল্পে দেবলোকের আদর্শ ফলিয়ে তোলা শাস্ত্রীয় বিধি, মর্তের দিকে দৃষ্টি যদি দেন শিল্পী, তবে তিনি মহাপাতকী হবেন। অন্ধত্ব, বংশলোপ প্রভৃতি ভয় দেখিয়ে এমন অনাচাররোধের আয়োজন করা হল শিল্পশাস্ত্রে। তবুও ভারতশিল্প থেকে ইহলোক মুছে যায় নি। শিল্পীর শিল্পবৃত্তি বার বার তাকে নিয়ে গেছে শাস্ত্রনির্দিষ্ট মান-পরিমাণ-লক্ষণাদির বাঁধা নিয়মের বাইরে। প্রাচীন প্রতিমাশিল্প পূজার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রের নিয়ম ধরে গড়া হলেও—তার গড়নে এবং সাজসজ্জায় নিয়মের ব্যতিক্রম রোধ করা সম্ভব হয় নি। এই ব্যতিক্রম ধরেই প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর স্বাধীন রুচি। অবনীন্দ্র-

নাথের দৃষ্টি পড়ে এই সব ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তে, এখানেই তিনি বন্ধনমুক্ত শিল্পীর শুদ্ধ আত্মপ্রকাশ দেখেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রাচীন শিল্পক্রিয়ায় বন্ধনমুক্তির ক্ষেত্রগুলি নজরে আসে তাঁর –

'ছবি modelling, plaster cast এমনি অনেক জিনিশ এবং স্ফটিক ও নানা রত্নভূষা এবং ছোটখাট শিল্পদ্রব্য সমস্তই বাঁধনের বাইরে পড়লো, কেবল পাষাণ ও ধাতুজ পূজার জন্য যে মূর্তি তাই রইলো শাস্ত্রের মধ্যে বাঁধা, কিন্তু এখানেও গোল বাধলো। ঠিক-ঠিক শাস্ত্রমতো গড়ন কে জানে কেন শিল্পীর হাতে এলো না, এদিক-ওদিক হতেই থাকলো কিছু-কিছু দেশভেদে কাল-ভেদে শিল্পীর কল্পনাভেদে পূজকের অন্তর্দৃষ্টিভেদে···[১১]।

শাস্ত্রের বাঁধন দৃঢ় হতে পারে নি, পঙ্গু করে দেয় নি শিল্পীদের। এ স্বাধীনতার মূলে আছে শিল্পীর স্বাভাবিক অনন্যপরতন্ত্র শিল্পজ্ঞান। প্রতিভার আদিম প্রেরণা। শাস্ত্রীয় সংস্কার যে এই ভারতীয় শিল্পীদের মনে দৃঢ়মূল হতে পারে নি – এর একটি বাস্তব কারণ তাদের নিরক্ষরতা। শাস্ত্রীয় প্রথার শাসন রয়ে গেছে বাইরে থেকে আরোপিত বিধিবিধান, ভাবনা-চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য আড়ষ্ট ক'রে আনবার মতো সংস্কার রূপে মজ্জাগত হতে পারে নি। শিল্পশাস্ত্রের পুঁথিপত্র জমা হয়েছে রাজার বা মন্দিরের সংগ্রহশালায়, ক্রিয়াবান শিল্পীদের ঘরে যদি বা মেলে – সে-পুঁথির সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক শিল্পক্রিয়ার কোনো যোগ প্রমাণ করা যায় না। পুঁথি তাঁরা পুজো করেছেন সিঁদুর চন্দনে, চর্চা করবার উপায় ছিলো না পাঠের উপায় না জানায়।

'শাস্ত্রে অপণ্ডিত কিন্তু শিল্পক্রিয়াতে সম্পূর্ণ পারগ শিল্পীদের পুঁথি ক্বচিৎ পাওয়া যাচ্ছে।···শাস্ত্রের চাপ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে নি, তা থেকে বেঁচে গেছে এদেশের শিল্পীরা কাজের দিক দিয়ে শুধু তারা নিরক্ষর ছিল বলে[১২]।'

একালের অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পীদের পক্ষে প্রাচীন শাস্ত্রচর্চার ফল অন্যভাবে ফলবে। শাস্ত্রচর্চায় পাকা হয়ে শিল্পক্রিয়ায় যাঁরা অগ্রসর হবেন – শাস্ত্রের বিধি-বিধান তাঁদের ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতায় একটা রাসের মতো কাজ করবে যদি নিজের আদর্শ স্থির ক'রে নেবার সামর্থ্য তাঁর না থাকে। প্রাচীন মাত্রেরই প্রতি মোহ যেমন শিল্পীর পক্ষে বৈনাশিক, শাস্ত্রের বচনের প্রতি মোহও তেমনি। শাস্ত্র-বচন ধরে ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা বার বার অবনীন্দ্রনাথের বিদ্রূপের লক্ষ হয়েছে। 'ভারতশিল্পে মূর্তি' পুস্তিকার ভূমিকায় শাস্ত্রীয় বিধির মোহ বিষয়ে শিল্পি ও সতীর্থদের সতর্ক করেছেন। শিল্পচৈতন্যের আলোক শিখাটি যদি পূর্ণ-শক্তিতে জ্বলে ওঠে, নিজেকে যদি চেনেন দেশকালের নানামুখী দায়-দায়িত্বের টানা পোড়েনে জীবনেরই সঙ্গে সংলগ্ন সমর্থ ও ক্রিয়াবান শিল্পীরূপে, তবেই শাস্ত্রও হয়ে ওঠে তাঁর কাজের সহায়। সেকালের বিধিবিধানের সঙ্গে একালের স্বাভাবিক যোগ সম্ভব একালের জীবনরসে তাকে জারিত ক'রে, একালের 'শিল্পমতি'র দিক থেকে। কারণ –

'সেকাল এগিয়ে চলবে একালের ক্রিয়ার ছন্দ ধরে ভবিষ্যৎ কালের সফলতার দিকে···। শিল্পের গতি কালে কালে নতুন-নতুন শিল্পীর মতি ধরে চলেছে, কোনো এক কালের বা এক শাস্ত্রের মত ধরে চলে নি, চলতে পারেও না[১৩]।'

'শিল্পীর intention বা ধ্যান, তারি অনুপাতে' চলে শিল্পক্রিয়া কালে কালে। শিল্পবিধি জোর ক'রে আরোপ করার অবশ্যম্ভাবী ফল শিল্পক্রিয়ার পঙ্গুত্ব। সেকালের শিল্পাকুল শাস্ত্রীয় শাসনের বাইরে আসবার সামর্থ্যেই সীমিতভাবেও শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত একালের শিল্পীদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। ইংরেজিয়ানার প্রতিক্রিয়ায় শুদ্ধ হিন্দু আদর্শের পুনরাবৃত্তির প্রবণতা আমাদের চিন্তায় একটা বিপরীত সংকট সৃষ্টি করেছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রামের একটা পর্ব গেছে। শিল্পীচিন্তায় শুদ্ধতার নামে শাস্ত্রবিধির শেকল পরানোর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে। সেকালের সঞ্চয়ের সীমা মেনে নিতে বলার অর্থ একালের শিল্পক্রিয়াকে ভবিষ্যৎ নয়, অতীতের দিকেই বইয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ। 'ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি' যে একালের পক্ষে আত্মহননের নামান্তর— অবনীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক শিল্পপ্রত্যয়ে এ সত্য বোঝেন। 'বর্তমান ধরে তবে বর্তে থাকে শিল্পকলা, অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয় কিন্তু অতীতমুখীও নয় শিল্প[১৪]।' ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়, ঐতিহ্যকে ব্যবহার বর্তমানের ধর্মের দিক থেকে— একালের শিল্পীর পক্ষে অবশ্যমান্য এ দায়। একালের সকল উদ্যোগ এই লক্ষে নিবিষ্ট হয়েই তাৎপর্য পায়, না হলে সমূহ বিফলতা। অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য ভাবনা স্থিরনিবদ্ধ এই লক্ষে :

'একটা জায়গায় এসে সমস্ত ব্যাপারটা ঠেকে—সেটি হচ্ছে একাল। প্রাচীন জাতির কুলানুগত আচার ব্যবহার আজকের কালানুযায়ী হল কিনা সেইটেই দেখবার বিষয়।···কালসূত্রে ধরা রইলো কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সঙ্গীতকলা শিল্পকলা জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনি কালসূত্রে গাঁথা রইলো—বেজোর মুক্তা। আমাদের জাতির উপরে 'সবচেয়ে যে বড় দায়িত্ব তা হচ্ছে এই অতীতকালের মালায় যে বেজোর মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর একটি কালসূত্রে গেঁথে যাওয়া[১৫]।'

নিজেরই রচনা দিয়ে সেই জোড় মেলাতে হয়, পুরাতন সঞ্চয়ের পাশে একালের সৃষ্টিটিকে ধরে দিয়ে। জোড় মেলানোর প্রশ্ন আছে, একালের সৃষ্টির সঙ্গে ঐতিহ্যের সেই নিহিত সাদৃশ্য ফুটে উঠবে, ফুটিয়ে তুলতে হবে। একাল ত্রিশঙ্কু তো নয়, ঐতিহ্যের ভিতের উপরেই গড়ে-ওঠা একটা নতুন মহল। তবুও নতুন। আপনকালের মুদ্রাঙ্কনে তার নতুনত্ব। শাস্ত্রের সীমার বাইরে এসে যে শিল্পীকুল নিজেদের স্বাধীন রুচির পরিচয়চিহ্ন ধরে দিয়ে গেছেন ভারতীয় শিল্পধারায়,

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সেই শিল্পের স্বরূপ জানা এবং আপনকালের দায় মেনে নতুন সৃষ্টি-লোকে উত্তরণের পথনির্দেশ — অবনীন্দ্রনাথের এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

ঐতিহ্যের কথায় তিনি ভারতীয় শিল্পবৃত্তের বাইরে — গোটা প্রাচ্যের শিল্পরুচির বিচারও আবশ্যক বিবেচনা করেন। প্রাসঙ্গিক তুলনা আসে চীন জাপানের সঙ্গে ভারতের, আসে ভারতের শিল্পকলা এশিয়ার বৃহত্তর পটে ছড়িয়ে যাবার কথা। ভারতের সীমার মধ্যে শাস্ত্রীয় শাসনের চাপে রুদ্ধশ্বাস শিল্পের পর্বতার পাশে — ভারতশিল্পেরই বহির্মুখী ধারা কেমন সজীব হয়ে বয়ে গেছে দেশের বাইরে, শিল্প-মুক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে — তার উল্লেখ এবং এ সজীবতার হেতু নির্ণয় করেন। বৌদ্ধ-যুগে ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় শিল্প গেছে বিদেশে। ভিক্ষু শিল্পীদের হাতে সেইসব উপনিবেশে ভারতশিল্প পুষ্ট হয়েছে স্থানীয় আবহাওয়ায়, স্থানীয় প্রবণতার মিশ্রণে।

> 'অভারতীয় অন্তরের' মধ্যে রয়ে গেছে ভারতশিল্পের নিহিত প্রাণ সম্পদ। বিদেশে ধর্ম প্রচারের সঙ্গে শিল্পপ্রচারের দায়িত্ব যাঁরা বহণ করেছেন তাঁরা ধর্মের অনুশাসন অন্যব্রতদের ওপরে খুব কঠিনভাবে প্রয়োগ করলেও শিল্পশাস্ত্রের নিয়মগুলো ঢিলে করে দিয়েছেন দেশে দেশে। শিল্পের দেশীয়তার সঙ্গে শাস্ত্রমতো বিশুদ্ধ শিল্পের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন — কোনো বাধা দেন নি সে পথে।···কালে কালে দেশে দেশে একই শিল্পের পুনরাবৃত্তি যে একেবারেই দোষ, বিচিত্রতাই যে শিল্পের মূল কথা, সেটা তাঁরা ভালো করেই জানতেন[১৬]।'

এ-দৃষ্টান্তে দৃঢ়তর হয় সেই যুক্তি, শিল্পে মুক্তি আসে প্রগতি সম্ভব হয় শিল্প-ক্রিয়ার স্বাধীনতার পথে। 'শিল্পীর মতি' বা তার অভিপ্রায়টিকে মেরে দিয়ে পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ ক'রে দিয়ে শিল্পকে বাঁচানো যায় না। কোনো বিধিব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না শুদ্ধ শিল্প। এই দৃষ্টি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ আবার অবেক্ষণ করেন ভারতীয় শিল্পধারায় নানা পদ্ধতি ও প্রকরণ মিশ্রণের তাৎপর্য। শিল্প-শাস্ত্রীকেও মানতে হয়েছে, শিল্পীর হাত সবসময়ে শুদ্ধ। সঙ্করত্বে সৃষ্টির জাত যায় না। শুদ্ধি আসে সমর্থ শিল্পীর ধ্যানের শুদ্ধতা থেকে —

> 'পণ্ডিতের ব্যবস্থা মতো গোবর গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে শাস্ত্রের মন্ত্র পড়ে ধ্যান করে গড়লেই বিশুদ্ধি আসে না, অন্তরের পূতধারা তারি স্রোত যখন শিল্পীর হাতের কাজ ধুয়ে দেয় তখনই সে হয় বিশুদ্ধ, ভারতশিল্প বা আর কোনো বিশুদ্ধ শিল্প। হিন্দুশাস্ত্রমতে গড়া হলেই ভারতশিল্প হবে একথা বলা চলতো যদি ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুরই হত — গ্রীক মোগল চীন নেপাল, কত কি নিয়ে যে ভারতশিল্প হয়েছে তা কে জানে। সুতরাং ভারতবর্ষে যেমন একটি মাত্র ধর্ম নেই তেমনি ভারতশিল্পে কৌলীন্য বলে পদার্থ একেবারেই নেই। কেননা ভারতবর্ষ যেমন প্রকাণ্ড বিস্তার নিয়েছে সেই রকম তার আর্টও বিস্তার পেয়েছে শাস্ত্রগত পদ্ধতি ছেড়েই[১৭]।'

শিল্পলাক্ষ্যের বিচার-বিশ্লেষণের পথেই অবনীন্দ্রনাথের ভারতজিজ্ঞাসা অনার্য,

হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান – ইত্যাকার গণ্ডিবদ্ধ ধারণার ভ্রান্তি এড়িয়ে যায়। উপনীত হয়, নানা ধারার সম্মিলনে, আত্মীকরণে প্রাণবান ভারতশিল্পের উদারতর পটে। ভারতশিল্পের ধারায় কালে কালে বিমিশ্রিত হয়েছে নানা প্রকরণ-পদ্ধতি। 'আর্য শিল্পের ক্রম' (বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী) প্রবন্ধে দেখান আর্যকল্পনার রূপান্তর বৌদ্ধশিল্পে, বিশ্লেষণ করেন আর্যেতর জাতির শিল্পচেষ্টার সঙ্গে উৎকৃষ্ট আর্য কল্পনার পরিণয়বন্ধনের তাৎপর্য। বিশ্লেষণ করেন, কীভাবে তুর্কি ধারা ধরেছে ভারতীয় ছন্দ, হিন্দুরীতি মিলিত হয়েছে মোগল রীতিতে। এ মিলন জোর ক'রে সম্ভব হয় নি, শিল্পীর স্বাধীন শিল্পক্রিয়ায় সামরস্য ফুটে উঠেছে। বিদেশী প্রভাব আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত পান আজমীঢ়ের মসজিদে, কুতবমিনারে, আল্‌তমাসের, আলাউদ্দিন বা তোগলকশাহের সমাধিতে। তাজমহলকে গ্রহণ করেন সেই সার্থক সম্মিলনেরই তুলনারহিত দৃষ্টান্ত রূপে। তরঙ্গের উত্থান পতনের মতো ভারতশিল্পের ধারায় এক একটি স্তর,পারম্পর্যে গ্রথিত এই স্তরগুলি নিয়ে সমগ্রতার ছবি ফোটে। সেই সমগ্রের পরিচয়ে ভারতশিল্পের প্রকৃত পরিচয়। তাকে হিন্দু বা তুর্কি বা মোগল – কোনো একটা পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না কখনো। অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে অক্ষুণ্ণ যে ভারতীয়তা – তাকে অনুভব করার দৃষ্টিই মূল্যবান ভারতশিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনায়। অনিবার্যভাবে এখানে মনে আসে ভারতীয় ইতিহাসের মর্মবিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মিলের কথা। শিল্পের দৃষ্টান্ত ধরে অবনীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতীয়তার বোধে উত্তীর্ণ হন। ঠিক এই অখণ্ড ঐক্যের, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যসাধনের এই ভারতীয় প্রতিভার কথাই রবীন্দ্রনাথও বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রখ্যাত 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে। ভারতবর্ষময় ছড়ানো শিল্পনিদর্শনগুলির বৈসাদৃশ্যের চেয়ে রূপ ও রীতির গভীরতর সাদৃশ্যের প্রতিই অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কারণ শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি – শিল্পের প্রাণছন্দের মর্মটিকে আবিষ্কার করা। পুরাতত্ত্বের পদ্ধতি পরিহার করে তিনি শিল্পদৃষ্টির উপরেই নির্ভর করেন। প্রকরণ-পদ্ধতির দিক থেকে ভারতশিল্পের এক একটা পর্বকে চিহ্নিত করা যায় ভিন্ন ভিন্ন নামে, পুরাতাত্ত্বিকের উৎসাহ সেই শ্রেণীবিন্যাসে, জাতগোত্রের প্রভাব পরিমাপের বিচারে। কিন্তু এই সব গণ্ডিকে জেনে, গণ্ডিকে পেরিয়ে শিল্পধারার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের সমগ্রতাটুকু অবনীন্দ্রনাথ ধরে দিতে চেয়েছেন আমাদের বোধে। সেই সপ্রাণিত শিল্পধারার প্রসঙ্গেই বলেন :

> 'হিন্দু ভারতবর্ষের চেয়ে যে বড় ভারতবর্ষ, হিন্দু ভারতশিল্পের চেয়ে যে বড় ভারতশিল্প, তাই গড়ে তোলার প্রকরণ অর্জনের যে আনন্দ তারি মধ্যে ভারতবর্ষ এবং ভারতশিল্পের মূল যুক্ত রয়েছে বলেই···সে নতুন থেকে নতুনতর অর্জনের মধ্যে চলে বলে বেঁচে রইলো। যুগ যুগান্তরের অর্জন প্রথা প্রকরণ

তাকে চেপে মারতে পারলো না, সে আনন্দের সঙ্গে ভাঙতে লাগলো গড়তে লাগলো সৃষ্টির জিনিশ। ভারত সভ্যতার এই বড় দিক,—এই দিক দিয়েই ভারতশিল্পের মর্যাদা ও মহিমা।[১৮]'

প্রথা-প্রকরণ বাইরে থেকে আরোপিত হলেই শিল্পক্রিয়ায় খর্বতা ঘটে। শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের শাসন বা যে-কোনো বাঁধন সম্পর্কেই সেই একই কথা অবনীন্দ্রনাথের। শিল্পীর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা চাই। তাঁর স্বাধীন শিল্পরুচি প্রথা-প্রকরণ গ্রহণে-বর্জনে স্বভাবের পথে আপন প্রতিভাকে ফলবান করে তুলবে। স্বদেশের ঐতিহ্যে সেই শিল্পমুক্তির সাক্ষ্য তিনি সন্ধান ক'রে ফিরেছেন। সন্ধানের গরজ আসে একালের শিল্পমুক্তির পথনির্দেশের, আধুনিক শিল্প আন্দোলনে নায়কত্বের দায়িত্ব-বোধ থেকে। শিল্পে নবযুগ আনতে চেয়েই শিল্পক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হতে গিয়ে এ-বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হল। কারণ, প্রবল পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অভিঘাতে বিভ্রান্ত এই যুগে নিজেকে চেনাই শিল্পীর সবচেয়ে বড়ো দায়। স্বদেশের ঐতিহ্যের পটপ্রেক্ষায় সংস্থিত শিল্পজ্ঞান নিয়েই একালে শিল্পীর স্বকীয় কৃত্য বিষয়ে সংকল্প সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যভাবনার মূল নিহিত আপনকালের শিল্পক্রিয়ায় চরিতার্থতার পথটি ধারণায় আনবার দায়িত্ববোধে। এবং এই কারণেই তাঁর সুবিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ নিরালম্ব তাত্ত্বিক আলোচনায় পর্যবসিত হয় না কখনো। আলোচনার সমগ্রে সঞ্চারিত হয় সেই কর্মিষ্ঠ আবেগ, যে আবেগে তিনি অন্তহীন পরীক্ষায় নিজেরই শিল্পকীর্তিতে সম্ভব করে তোলেন আধুনিকতার সূচনা।

রীতিমতো চিত্রবিদ্যা চর্চার শুরুতে তখনকার রেওয়াজ অনুসারে অবনীন্দ্রনাথ-কেও কাজ করতে হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য শিল্প-শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। গিলার্দি ও পামার তাঁকে বিদেশি পদ্ধতি শেখান। কিন্তু সে-শিক্ষা ছিল যান্ত্রিক, নিজের অভিমতে কাজ ক'রে যাবার সুযোগ ছিল না সেখানে। দ্রুত নানা পদ্ধতি আয়ত্ত করার পাট চুকিয়ে দিলেন। ইচ্ছাসুখে কাজ করবার সুযোগ এলো বৈষ্ণব পদাবলির বিষয় নিয়ে চিত্ররচনায়, রবীন্দ্রনাথের উপদেশেই অবশ্য। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা শুরু সেই থেকে। দেখা দিল দেশি রীতি শেখার গরজ। বিষয়ের দিক থেকে দেশীয়তা শুধু নয়, গোটা ছবিটাকেই রীতি-পদ্ধতিতে এদেশের শিল্প-ধারার মর্মের সঙ্গে ঐক্যসূত্রে মিলিয়ে দেওয়ার উপায় সন্ধান। ভারতশিল্পের নবজাগরণের পথ নিজের কাজে ধাপে ধাপে প্রস্তুত ক'রে তোলার সেই সুদীর্ঘ প্রয়াসে মোগল রাজপুত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্পরীতি আয়ত্তে আনতে হয় তাঁকে। শিল্পশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থাগুলির মূল্যবিচার করতে হয় একালের ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হয় ভারতশিল্পের এই নবপ্রবর্তনা বাঙলার মাটি থেকেই শুরু করছেন। শিল্পস্বভাবের স্বাভাবিক টানে তাঁকে নামতে হয় দেশের, বিশেষ ক'রে বাঙলা দেশেরই লোকজীবনের

আশ্রয়ে ধরা আছে যে লোকশিল্প—তারও মর্মানুসন্ধানে। পণ্ডিতের মত বা শাস্ত্রের মতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তবুও 'হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে', সেই লোকশিল্প। এ শিল্পের ভাষা মেলে 'পট পাটা গহনাগাটি ঘটি বাটি কাপড় চোপড় এমনি যে সব art', ধর্মকর্ম চাষবাস নিয়ে বাঙলার দিনানুদৈনিক জীবনযাত্রার ধারার সঙ্গে বয়ে আসা শিল্পক্রিয়ার সচল ধারায়। এখানেই, এই দেশের মাটিতে নানা অনুষ্ঠানে পালপার্বণে বাঙালি হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ফোটে যে ব্রত-কথায় ব্রতের আলপনায় পটচিত্রে লক্ষ্মীমনসার সরায়—আধুনিক শিল্পীর শিক্ষায় তারও উপযোগিতার কথা একালে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম বলেন। উচ্চমার্গের ভারতীয় শিল্পধারার মর্মগ্রহণেই ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হয় না। দেশের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের পথ সন্ধানেই জিজ্ঞাসু শিল্পীকে তাই সুবিস্তৃত অনুশীলন করতে হয় 'বাঙলার ব্রত' নিয়ে। পুরাতত্ত্বের দৃষ্টি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান নয়, লোকজীবনের সজীব আশা আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ পাবার প্রত্যাশায় অবনীন্দ্রনাথ ব্রতকথার ভাবসম্পদ আর আলপনা-শিল্পের রূপ-শুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ করেন। লোক-হৃদয়-পুটে লালিত এই শিল্পকলায় মানুষের সুস্থ কামনা-বাসনার রসে পুষ্ট অঙ্কন ও মণ্ডন রীতিতে শিল্পগত শুদ্ধতার দিকটিই তাঁকে টানে। শিল্পসৃষ্টির মৌলিক আবেগ কীভাবে আলপনাতেও কাজ করে দেখিয়ে দেন। আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিটি কল্পনায় চরিতার্থতার পূর্ণ মূর্তি ধরে ওঠে যখন, শিল্পী তাকে বাইরে আনেন রেখায় বর্ণে প্রস্ফুট ক'রে। সেই কামনার আবেগ থেকেই আসছে ব্রতানুষ্ঠান। যা নেই, যে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থই হবে না হয়তো—ব্রতের কথায় আলপনায় তাকেই প্রমূর্ত করে তোলা হয়। কল্পনা কাজ করবার অবসর পায় এখানে। তাই আলপনা সৃষ্টির পর্যায়ে আসে। লোকশিল্পের বিচারেও দেখি সেই একই পদ্ধতি তাঁর, শিল্পচেতনা-প্রবুদ্ধ ইতিহাসবোধ নিয়ে ঐতিহ্যের মর্মগ্রহণ। সজাগ শিল্পদৃষ্টিই তাঁর সহায়। রূপসৃষ্টিতে রেখার ব্যবহারের নিতান্ত টেক্‌নিক্যাল আলোচনাতে বাঙলার পটুয়াদের কাজের দৃষ্টান্ত আনেন। রেখা দিয়ে রূপকে বাঁধেন না প্রকৃত শিল্পী, রেখা হয়ে ওঠে রূপমুক্তির উপায়। কালীঘাটের পটে অজটিল অলংকারহীন সাবলীল রেখায় রূপমুক্তির দৃষ্টান্ত তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিশ্চিত ভিত্তি জোগায়। রসসৃষ্টির উপায় নিয়মে বেঁধে যে দেওয়া যায় না কখনো, এই উক্তিরই সমর্থন খোঁজেন পুতুল শিল্পের গড়ন ও রঙ ব্যবহারে শাস্ত্রীয় বিধির কিছুই না মেনেও রসের অনির্বচনীয়তা ধরে দেবার অনায়াস দক্ষতায়। আলপনা, পট-পাটা, মাটি বা কাঠের পুতুল; ফুলকারি কাঁথা সুজনি, দুর্গাঠাকুরের ডাকের সাজ, নৌকোর গলুই—লোক-শিল্পীদের হাতের কাজের এমন অজস্র দৃষ্টান্ত—সবই তাঁর কাজে আসে শিল্পে স্বদেশজিজ্ঞাসার সূত্রে। দেশের মাটির উপরে দাঁড়াতে চান বলেই কাজে আসে।

অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথ আর একজন কালীঘাটের পটুয়া হবার সাধনা করেন নি। লোকশিল্পের পুনরাবৃত্তি একালের শিল্পমুক্তির পথ নয়, যেমন নয় শাস্ত্রীয় শিল্পের পুনরাবৃত্তি। আধুনিক বাঙলায় বা ভারতে গ্রাম্য লোকচিত্তের উপরে যে আর একটি স্তর রচিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের সঙ্গে আদান প্রদানে, দেশের চিত্তের সেই স্তরটিই একালের শিল্প ক্রিয়ার ভিত্তি। এই আধুনিক চিত্তস্তরের ঘনতা যতোটাই হোক—এখানেই আধুনিক শিল্পীর আশ্রয়। এখানেই বিশ্বের আলো হাওয়া খেলা করে। গড়ে ওঠে রুচির বিশ্বগত মান। শাস্ত্রীয় বা লোকশিল্পের ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি নয়, একালের প্রয়োজনের দিক থেকেই সেই ঐতিহ্যকে ব্যবহার আধুনিক শিল্পীর কৃত্য।

কান্তিবিদ্যায় অবনীন্দ্রনাথ এক পূর্ণাঙ্গ প্রস্থান গড়েছেন তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে। তারই এক গুরুত্বপূর্ণ দিক এই ঐতিহ্য ও আধুনিক শিল্পের দায়দায়িত্ব বিষয়ক আলোচনা। ভারতশিল্পে নবজাগরণের নায়কত্বে স্বেচ্ছাকৃত অবনীন্দ্রনাথ তত্ত্বগত ভাবে যা বলেন সেই তত্ত্ব শিল্পক্রিয়ায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতারই নির্যাসিত সূত্র। নিজের কাজের অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিখিয়েছিল আধুনিক শিল্পীর পক্ষে মুক্তির পথ কী। ইংরেজ শিক্ষক পামার এবং ইতালীয় গিলার্দির কাছে তিনি পাঠ নিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিল্পরীতির। ড্রয়িং-এ দক্ষতা, পারস্পেক্টিভের বোধ, প্যাস্টেলের কাজ, তেলরঙের ব্যবহার ও প্রতিকৃতি আঁকার প্রকরণ—এই শিক্ষার স্তরে তাঁর আয়ত্তে আসে। শিক্ষালব্ধ এই দক্ষতায় পাশ্চাত্ত্য রীতির একজন ভারতীয় চিত্রী হিসেবে খ্যাতি অর্জন তাঁর পক্ষে অনায়াসেই সম্ভব হতো। কিন্তু দেশকালের হাওয়ায় ছিল তখন জাগরণের নতুন বাণী, অবনীন্দ্রনাথেও জেগেছিল শিল্পীচৈতন্যের আত্মনির্ভরতার গরজ। সেই গরজেই ঘরের দিকে মুখ ফেরাতে হল। নিশ্চয়ই হ্যাভেলের সৎ পরামর্শ তাঁর আত্মানুসন্ধানে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু প্রতিভার প্রেরণায় তিনি প্রতিষ্ঠার পথ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজতে চোখ মেলেছিলেন যে যুগে যে পরিবেশে—সেই প্রেরণা এবং পরিবেশের প্রভাবই কি তাঁকে চালনা করে নি ভারতশিল্পে নবযুগ নির্মাণে দুরভিসম্ভব পথে। বর্তমানের সত্তাধর্ম মেনে তাঁকে একালের শিল্পক্রিয়ার প্রয়োজনের দিক থেকে ঐতিহ্য-স্মৃতির মর্মানুসন্ধানে নিয়োজিত হতে হল। শিল্প-ঐতিহ্যের সংস্কারসাধন মাত্র তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি জানতেন প্রাচীনের বেশ পরিবর্তন করলেই সে-শিল্প একালের হয়ে ওঠে না। 'আমিই বর্তমান' বা 'আমাতেই বর্তমান' শিল্পী তো এই বোধই ফুটিয়ে তোলেন তাঁর কাজে। এই বর্তমানের শিল্পীতেই, অবনীন্দ্রনাথের নিজেরই কাজে মেলে ইয়োরোপীয় শিক্ষা আর শাস্ত্রীয় জ্ঞান, মোগল-রাজস্থানী রীতি বা লোকশিল্পের প্রাণময় ধারার অভিজ্ঞতা অন্তরঙ্গ সামঞ্জস্যে। সৃষ্টিময় প্রতিভার সামর্থ্যেই এ মিলন সম্ভব। আপন কালের দায়দায়িত্ব বোধের ভিতের উপরেই গড়ে ওঠা সম্ভব ব্যক্তিপ্রতিভার অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞান ও সংকল্প। সমর্থ

প্রতিভার অধিকারে অবনীন্দ্রনাথ একালের দাবি পূরণ করে গেছেন সারা জীবনের কাজে। আর তাত্ত্বিক আলোচনায় বিচার-বিশ্লেষণে সেই সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যের অভ্রান্ত উপলব্ধিগুলি ধরে দিয়ে গেছেন নবীন ভারতের শিল্পীসমাজের উদ্দেশে।

নির্দেশিকা

১. জোড়াসাঁকোর ধারে, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ১২৫।
২. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, 'শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড'। কলিকাতা ১৩৬৯। পৃ ১২৫।
৩. ঐ। পৃ ১২৫।
৪. ঐ। পৃ ১১৭।
৫. 'পথে পথে', ভারতী, জ্যৈষ্ঠ. ১৩২২ বঙ্গাব্দ।
৬. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, 'শিল্পে অনধিকার'। পৃ ১১।
৭. ঐ। পৃ ৪-৫।
৮. 'পথে পথে', ভারতী। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।
৯. ঐ।
১০. 'ভাবসাধন', ভারতী। অগ্রহায়ণ. ১৩১৭।
১১. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, 'শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড'। পৃ ১৪০।
১২. ঐ। পৃ ১৪০।
১৩. ঐ। পৃ ১৪১।
১৪. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, 'জাতি ও শিল্প'। পৃ ১৯১।
১৫. ঐ। পৃ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮।
১৬. ঐ, 'শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড'। পৃ ১৪০।
১৭. ঐ, 'শিল্পের ক্রিয়া প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ'। পৃ ১৫২, ১৫৩।
১৮. ঐ। পৃ ১৫৪।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

মণ্ডলাকার, গালিলিও, ব্যক্তিনিরপেক্ষতা

সেই অসামান্য বিজ্ঞানী গালিলিও গালিলি-র পক্ষেও স্ববিরোধমুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। পিসা-র প্রাক্‌শিরোমণি অদ্ভুত তথ্যনিষ্ঠা ও বিচার-নৈপুণ্যে গতিবিদ্যার যে-সূত্র আবিষ্কার ক'রে পূর্ববর্তী অচৈতন্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, স্বয়ং তার বিপরীত এক বিশ্বাসকে সুখে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন আজীবন, এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হতে পারে? জীবনীকার এবং ঐতিহাসিকরাও এ-প্রসঙ্গে কি আশ্চর্য উপেক্ষায় নীরব। আইনস্টাইন কিন্তু প্রায় আর্তনাদ করেছেন, ইনার্শিয়া যে তাঁর কাছে পরম মূল্যবান এক ধারণা। কারণা-ভাবাৎ কার্যাভাবঃ, গতিবিষয়ক পরিবর্তনকে যদি কার্য আখ্যা দেওয়া যায়, অপ্রভাবিত গতি এবং স্থৈর্য, উভয়েই নিত্য এবং পরিবর্তনরহিত, যদি কারণের একান্ত অভাব ঘটে। গতির এই স্বাচ্ছন্দ্য, ভূত-পদার্থের এই জাড্য, তথাকথিত 'গতিবিদ্যার প্রথম বিধান', এ যে গালিলিওরই আবিষ্কার, সন্দেহ কি। নোদনাদ্যমিযোঃ কর্ম তৎকর্ম-কারিতাচ্চ সংস্কারাদূর্ধ্বং তথোত্তরঞ্চ—নোদনসংযোগে উৎপন্ন কর্ম অর্থাৎ গতি উত্তরকালে সংস্কারচালিত, এই বৈশেষিক সূত্রে সংস্কার আদৌ নিত্য পদার্থ নয়। উপরন্তু সংস্কারের লয় হতে পারে, যার কারণে, বৈশেষিককারের মতে, প্রক্ষিপ্ত যন্ত্রের পতন প্রত্যক্ষ হয়,

সংস্কারাভাবাৎ গুরুত্বাৎ পতনম্। গালিলিও-র পূর্ববর্তী ইয়োরোপীয়দের ধারণাও মোটামুটি এই রকম, হয়তো আরো অপরিষ্কার। তাছাড়া গালিলিও-ই প্রথম পরীক্ষা-পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণপদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যা ছিল ঐ আবিষ্কারের পক্ষে অপরিহার্য। এবং এই আবিষ্কার গতিবিদ্যার পক্ষে কতখানি মূল্যবান, সে-সম্পর্কে আলোচনায় অজস্র বাক্যব্যয়েও তৃপ্তি হয় না। বিশুদ্ধ গতির ধারণা এই সূত্রেই নিহিত, যথাতিরেকে গতিশাস্ত্র অসম্ভব।

বস্তুত গালিলিও আধুনিক বিজ্ঞানের স্রষ্টা, কেননা তিনিই প্রথম শিখিয়েছিলেন অভিজ্ঞতার বিবিধ অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে বর্জন ক'রে চিন্তার বিষয়বস্তুকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করতে। কোনো বস্তুর গতি প্রত্যক্ষ করার কালে ঐ বস্তুর নানা গুণাগুণ, যেমন বর্ণ, গন্ধ, তাপ ইত্যাদিও একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গোচর হয় বটে, কিন্তু গতির উপর কোনোরকম প্রভাব না থাকার দরুন ঐসব গুণাগুণ গতিশাস্ত্রের বিবেচ্য নয় এবং গতিশাস্ত্রের কোনো সূত্রে বা সিদ্ধান্তে এদের নামোল্লেখ অবধি দোষাবহ। এই মূল্যবান শিক্ষা গালিলিও-র কাছ থেকেই পাওয়া। পরবর্তীকালে দেখি, রসায়নে সত্যকার অগ্রগতি শুরু হল যখন বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ চিনে নেওয়া গেল এবং ঐসব পদার্থই রাসায়নিক পরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বিশুদ্ধ অন্তর্ভুক্তি-সম্পর্ক বিষয়ে সমাহার তত্ত্ব গণিতে নতুন চেতনা এনেছে। জীববিদ্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জটিলতা বর্জন ক'রে একটিমাত্র কোষে জীবনের বিশুদ্ধতম রূপ-সম্পর্কিত গবেষণাই মূল। থার্মোডিনামিক্স-এ দেখি তাপশক্তি আদানপ্রদানের মূলসূত্রসমূহ পেতে হলে কল্পনা করতে হয় এমন সব অবস্থা যা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা হয়তো অসম্ভব। কিন্তু এ-সব আজ আর কাউকে বিচলিত করে না, কেননা অভিজ্ঞতার পরিশুদ্ধি এবং সরলীকরণই তো বিজ্ঞান। অবান্তর সবকিছু উপেক্ষা ক'রে শুদ্ধ সারাংশেই উদ্ঘাটিত হতে পারে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে পরীক্ষা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। 'এই কথাই বলেছিলাম আমি, আর দেখতেই পাচ্ছেন সার্সি আপনাকে কিরকম ভুল বুঝিয়েছেন। আলোচনাকালে উপস্থিত কেউ হয়তো পরীক্ষাগুলোয় মুগ্ধ হয়ে আমার মধ্যে কিছু ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে-ক্ষমতার ফলে আমি কঠিন কঠিন বিষয়কে সরল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারি। সার্সি অবশ্য-একথা বলেছেন ওর পরেই। আমার প্রশংসা উনি করেছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় সে কেবল সৌজন্যবশত ; নচেৎ যতদূর দেখি, আমার কোনো গুণই তাঁকে সহজে উৎসাহিত করে না' (ইল সাগিয়াতোরে)। পরীক্ষা-পরিকল্পনায় গালিলিও অদ্বিতীয় তাঁর অ্যাবস্ট্রাকশনের কারণেই।

অপ্রভাবিত গতির স্থায়িত্ব শুধু গতিবেগের অপরিবর্তন নয়, গতির দিকেরও অপরিবর্তন সূচিত করে। গতিবিদ্যার দিক ও গতিপথের গুরুত্ব গালিলিও ভালই বুঝতেন। সুতরাং অপ্রভাবিত গতির গতিপথ, দিক পরিবর্তনের অভাব-

হেতু, ঋজু সরলরেখা, এ-সত্য গালিলিও জানতেন না, এমন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বস্তুত তাঁর পরীক্ষায় যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসের বাটির মধ্যে বলগুলো গড়িয়ে যেত তখন তিনিই তো লক্ষ করতেন যে, বলের গতি দীর্ঘস্থায়ী হয় সেই বাটিতে যার ব্যাস দীর্ঘতম, অর্থাৎ অপ্রতিহত গতির গতিপথ, বর্তুলাকার হয় যদি বা, অনন্ত ব্যাসযুক্ত। এমন বৃত্তচাপকেই সরলরেখা বলে। অথচ কেন গালিলিও তাঁর বিশ্বদর্শন-সম্পর্কিত সংলাপে বারংবার বৃত্তকে বস্তুর স্বাভাবিক গতিপথ হিসাবে উল্লেখ করেছেন? ঋজুগতি সম্পর্কে গালিলিও-র ধারণা কি রকম স্বচ্ছ, নব্যবিজ্ঞান-সম্পর্কিত সংলাপে তার অজস্র প্রমাণ মেলে, বিশ্বদর্শন-সম্পর্কিত সংলাপেও বটে। তবুও তিনিই আবার পতনশীল বস্তুর গতিপথ বিশ্লেষণকালে বৃত্তাকার গতির স্থায়িত্ব ও স্বাভাবিকত্ব স্পষ্টভাষায় কল্পনা করেছেন।

সালভিয়াতি: দাঁড়ান সাগ্রেদো; আপনার জন্য আরো তিনটে সিদ্ধান্ত রাখা আছে, সেগুলো শুনলে হয়তো আপনি অখুশি হবেন না। প্রথমত, যদি ভালভাবে ব্যাপারটা চিন্তা করি, পতনশীল বস্তুর গতিপথ আসলে বিশুদ্ধ একটি বৃত্ত, মিনারের চূড়ায় অবস্থানকালীন ওটার গতিপথ ঠিক যেমনটি ছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত আরো চমৎকার; চূড়ায় অবস্থানকালে বস্তুটা যতখানি পথ অতিক্রম করত, পড়ার সময়ও তার একচুল বেশি বা কম পথ অতিক্রম করবে না; ···সুতরাং, তৃতীয়ত, বস্তুর সত্যিকার গতিবেগের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, সর্বদাই সমান। ···এক্ষেত্রে গতিবেগ হ্রাসবৃদ্ধির কোনো কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই, কেননা, চূড়ায় অবস্থানকারী ও পতনশীল উভয়প্রকার বস্তুরই গতিপথ বৃত্তাকার, গতিবেগ সমান এবং স্বচ্ছন্দ। কেমন লাগল বলুন।

প্রসঙ্গটা ছিল পৃথিবীর আহ্নিক গতি থাকা সত্ত্বেও পতনশীল বস্তুকে আমরা সোজা পড়তে দেখি কেন? এই রকম কয়েকটা যুক্তি তৎকালীন ভদ্রজনেরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি কল্পনার বিরুদ্ধে রাখতেন এবং গালিলিও সংলাপের একটা বিরাট অংশ ব্যয় করেছেন এই যুক্তিগুলোকে খণ্ডন করার করুণ চেষ্টায়। এমন হতে পারত যে, প্রয়োজনের খাতিরে গালিলিও জাতসারেই কুযুক্তির আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি। গালিলিও একজন জটিল মানুষ, সে-যুগের পক্ষে অভাবনীয় রকমের জটিল। নতুন তারা আবিষ্কার ক'রে বৈজ্ঞানিক সুলভ আনন্দ পেয়েছেন যেমন, তেমনি আবার ব্যবসায়ী বুদ্ধি জেগে উঠেছে, তারার নাম বিক্রি করার চেষ্টা করছেন ধনী ব্যক্তিদের কাছে। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। এই সত্যকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সেই সঙ্গে ব্যাবহারিক কূটবুদ্ধির আধিক্য গালিলিও-কে অনায়াসেই উক্তরূপ বদমাইশিতে প্ররোচিত করতে পারত। কিন্তু সংলাপে বারংবার যখন বৃত্তাকার গতির স্বাভাবিকত্ব মেনে নেওয়া হতে থাকে, তখন আর একে

বদমাইশি বলে দাবি করা যায় না। আবার মাঝে-মাঝেই যখন স্পষ্টতর ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতির ঋজুত্ব সবিস্তারে প্রমাণ করা হচ্ছে, তখন স্বীকার করতেই হয় এ এক স্ববিরোধ গালিলিও-র জীবনে, এত গভীর যে স্বয়ং এ-সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নন, গালিলিও-র তুল্য আত্মসচেতন ব্যক্তি।

সালভিয়াতি কিছুক্ষণের জন্য আমরা আরিস্টট্‌ল্-এর কথা বাদ দিচ্ছি। অবশ্য যথাকালে আবার এ নিয়ে বিশদ আলোচনা শুরু করব। তবে এটুকু বলে রাখি, এ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত এবং স্বীকার করি, সর্ব-প্রকার মাত্রাযুক্ত এই বিশ্বলোক একটা নিখুঁত ত্রুটিহীন ব্যাপার। শুধু তাই নয়, অবশ্যই চূড়ান্ত নিখুঁত, প্রত্যেকটি অংশ অবধি ত্রুটিহীনভাবে বিরাজ করে। যেটা, আমার বিশ্বাস, আপনারা বা অন্য কেউই অস্বীকার করেন না।

সিম্‌প্লিচিও : একথা আর কে অস্বীকার করবে? প্রথমত এ সব আরিস্টট্‌ল্-এরইকথা, এবং যে ত্রুটিহীনতার কথা বলা হচ্ছে, সম্পূর্ণরূপে সেটা তাঁরই বক্তব্যের অন্তর্গত।

সালভিয়াতি : এই কথা মেনে নেওয়ার পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই এই সিদ্ধান্তে পৌছাই, যদি সর্বপ্রকার অখণ্ড বস্তুর গতি স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব হয়, তাহলে ঋজুগতি অসম্ভব, বৃত্তাকার গতি ছাড়া অন্য গতি অসম্ভব। কারণ খুবই পরিষ্কার। ঋজু গতিতে যে কোনো জিনিস অবিরল স্থান পরিবর্তন করে, প্রথম অবস্থান এবং পরবর্তী অবস্থান থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যায়। এটাই যদি স্বাভাবিক হতে হয়, প্রথম জায়গায় অবস্থান নিশ্চয় অস্বাভাবিক ছিল। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন অংশ যথাযথ স্থানে বিরাজ করে না। কিন্তু আমাদের স্বীকার করা ছিল ঠিক উল্টো ব্যাপারটা। সুতরাং অবিরল স্থান পরিবর্তন, অর্থাৎ ঋজুগতি মোটেই স্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া ঋজু গতি যেহেতু স্বভাবত অন্তহীন (কারণ সরলরেখা অনন্ত, অসীম), কোনো বস্তুর পক্ষে ঋজুগতি স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব। ঋজুগতির লক্ষ এমন একটি স্থান, যা রয়েছে অন্তহীন দূরত্বে, কোনোদিন পৌছানো যাবে না। আরিস্টট্‌ল স্বয়ং বলেছেন ভালই, প্রকৃতি কখনো সেই কাজে প্রবৃত্ত হয় না, যা তার পক্ষে অসম্ভব। সেই স্থানের প্রতি ধাবিত হয় না, যে স্থানে পৌছানো অসম্ভব।

অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, যদিও ঋজুরেখা, ফলত ঋজুগতি, অন্তহীন, তবুও প্রকৃতি খুশিমতো তাকে ছিন্ন করতে পারে এবং প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর ঐ জাতীয় গতির প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক থাকতে পারে। এবং এর উত্তরে আমি বলব, সম্ভবত সৃষ্টির আদিতে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল তখন এ-রকম ঘটে থাকতে পারে। তখন হয়তো অপরিচিত সব বস্তুপিণ্ডের বিশৃঙ্খল গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি ঋজুগতি ব্যবহার করেছিল। ঋজুগতির ফলে

> শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তুসমূহ যেমন বিশৃঙ্খল দশা প্রাপ্ত হতে পারে, তেমনি বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণও ঋজুগতির সাহায্যেই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু একবার সুশৃঙ্খল অবস্থায় পৌঁছে গেলে, বস্তুগুলোর ঋজুগতির দিকে আর কোনো ঝোঁক থাকা সম্ভব নয়। কেননা এর পরে ঋজুগতি চালিয়ে গেলে আবার বিশৃঙ্খলায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

মানহাইম-এর একটা কথা স্বীকার করতেই হয়। ম্যাজিক এবং ধর্মভিত্তিক বিশ্বদর্শন যতই মিথ্যা হোক না কেন, কার্যত সেই দর্শন ব্যক্তিমনের আভ্যন্তরীণ সত্যের সঙ্গে ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রত্যক্ষের সৌসাদৃশ্য নিরূপণের কাজটা ভালই চালাতে পেরেছিল। ব্যক্তিনিরপেক্ষতার অবলম্বন সেইসব শব্দ, যেগুলোর অর্থ নির্দিষ্ট হয় কোনো বিশেষ সমাজ বা গোষ্ঠীর ধারণায় এবং সে ধারণা সত্য অথবা মিথ্যা, এ-রকম প্রশ্ন অবান্তর হয়ে যায় মনস্তাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক কার্য প্রসঙ্গে। ব্যক্তির মাধ্যমে যে ধারণা প্রকাশিত হয় তার পেছনে কাজ করে সমগ্র গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, কেননা গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিজ্ঞতারই অংশীদার। রেনেসাঁসের মানুষও এই বিধানের ব্যতিক্রম নয়, মধ্যযুগের উত্তরাধিকার তার পক্ষে অনস্বীকার্য। মানুষ মাত্রের শব্দ ব্যবহারের শিক্ষা তো গোষ্ঠীর কাছ থেকেই পাওয়া। গালিলিও-র এই আশ্চর্য স্ববিরোধের রহস্য উদ্ঘাটিত হয় প্রকৃতপক্ষে 'স্বাভাবিক' শব্দের প্রয়োগবিচারে। স্বাভাবিকত্বের যে-ধারণা গালিলিও পেয়েছিলেন রেনেসাঁস ও প্রাক্-রেনেসাঁস ইয়োরোপের কাছ থেকে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণেই কেবলমাত্র ব্যাখ্যা করা যায়, কেন ঋজুগতির স্বাচ্ছন্দ্য আবিষ্কার করেও গালিলিও বৃত্তাবদ্ধ গতির স্বাভাবিক স্থায়িত্বে এমন নিশ্চিন্তে বিশ্বাসী। গালিলিও-র কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতা, উভয়ের মূলেই ইয়োরোপ। আপাত-অভিজ্ঞতার সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিকগতি কল্পনার বিবাদভঞ্জনে তাঁর যে-ধস্তাধস্তি আজকের পাঠকের মনে একই সঙ্গে শ্রদ্ধা ও করুণার উদ্রেক করে, রেনেসাঁসের যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে সেটাই অনিবার্য ছিল। গালিলিও-র আভ্যন্তরীণ জগতে মধ্যযুগ যতখানি পৌঁছাতে পারে, ঠিক ততখানিই পৌঁছেছিল। আরিস্টটলবাদকে উৎখাত করার প্রচেষ্টায়ও গালিলিও শতকরা একশো ভাগ যুগোচিত কাজ করেছেন।

এসব কথা অবশ্য মার্কসবাদ বা অনুরূপ বস্তুবাদে বিশ্বাসী যে-কোনো ব্যক্তির কাছে নিতান্তই সাধারণ প্রাথমিক সত্য। কিন্তু অবাক লাগে যখন আলেকসাণ্ডার কয়রে-র মতো পণ্ডিতও গালিলিও-র প্রতিভাচ্ছটায় দিশেহারা হয়ে গালিলিওকেই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের একমাত্র কারণ বলে দাবি করতে থাকেন। তার চেয়েও তাজ্জব মনে হয় যখন শ্রদ্ধাভাজনেরা, ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব না ঘটার কারণ স্বরূপ গালিলিও-নিউটনের অনুপস্থিতি আবিষ্কার ক'রে উল্লসিত হন। ভারতবর্ষে বা চীনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব কেন ঘটল না, আপাতদৃষ্টিতে বহু অনুকূল

আয়োজন থাকা সত্ত্বেও, এ-প্রশ্নের সঙ্গে যে ভারতবর্ষে কেন গালিলিও জন্মালেন না, এ-রকম প্রশ্নের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই, বরং প্রথম প্রশ্নটিই এ-প্রসঙ্গে অনেক পরিষ্কার অর্থ বহন করে, এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু থেকে কে তাঁদের বঞ্চিত করল ? তুলনায় আইনস্টাইনের ইতিহাসদৃষ্টি কত স্বচ্ছ। গালিলিও যে রেনেসাঁস ইয়োরোপের অধিবাসী, ফলত তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অংশীদার, একথাটা তিনি সর্বদাই সামনে রেখেছেন। তাছাড়া ব্রুঁ এবং ক্রুথি আরিস্টট্‌লবাদের প্রতিপক্ষ-দের সন্ধান পেয়েছেন ইয়োরোপের অন্যত্র, যাঁরা গালিলিও-র পূর্বেই নানাভাবে নব্যগতিবিদ্যার অন্তত কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন নিঃসন্দেহে। এ-সকল প্রচেষ্টা ও সচেতনতার চূড়ান্ত পরিণতি অবশ্যই গালিলিও গালিলি, এবং কোপার্নিকাস ও কেপলার সহ গালিলিও থেকেই ব্যক্তিনিরপেক্ষতার এক নতুন পর্যায় শুরু, এ-ব্যাপারেও দ্বিতীয় মত নেই। তাই বলে রাতারাতি গালিলিও-র মানসিকতা পারিপার্শ্বিককে অগ্রাহ্য ক'রে সমষ্টিনির্জ্ঞানের ঊর্ধ্বে ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় স্বচ্ছন্দ বিহারে সমর্থ হবে, এ-রকম প্রত্যাশা অন্যায়।

সমষ্টি-নির্জ্ঞান ব্যক্তিমনে কিছু আকৃতি, কিছু ইমেজের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে, যে-সব ইমেজ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় গোষ্ঠী বা সমাজের কাছ থেকে। এই আর্কেটাইপেরই প্রসঙ্গ গালিলিও-র বৃত্তাকার গতিসম্পর্কিত সংস্কার। বৃত্তসংস্কার নিয়ে যোহান কেপলারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এক চমৎকার বৃত্তান্ত। কেপলারের গবেষণার বিষয় ছিল টাইকো কর্তৃক লিপিবদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রের বিভিন্ন সময়ে অবস্থান। টাইকো তাঁর টেলিস্কোপের সাহায্যে পুঙ্খা-নুপুঙ্খভাবে গ্রহগুলোর গতিপথ নির্ণয়ের কাজ ক'রে গেছেন। কেপলার বিশ্বাস করতেন কোপার্নিকাস-এর সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ টাইকোর তথ্যাবলিতেই পাওয়া সম্ভব। প্রমাণ বলতে কেপলার বুঝতেন পূর্ণজ্ঞান, অর্থাৎ গণিতের দৃষ্টিতে প্রকারগত পরিমাণগত উভয়তই। কোপার্নিকাস-এর বিশ্বদর্শনে পরিমাণগত ব্যাপার যা ছিল, তার উপর ভিত্তি ক'রে কেপলার গোড়াতেই কল্পনা ক'রে নিয়েছিলেন যে টাইকোর তথ্যাবলি গ্রহগুলোর বৃত্তাকার কক্ষপথের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। কেন বৃত্তাকার ? পাউলির মতে আর্কেটাইপ। মণ্ডলাকারের আদিম ইমেজ। এই বৃত্তের লোভেই গালিলিও ও কেপলার কোপার্নিকাস-তত্ত্বকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। কেপলার দীর্ঘকাল টাইকোর তথ্যাবলি বৃত্তাকার কক্ষে সাজাবার চেষ্টা করেছেন এবং এ-ব্যাপারে তিনি প্রায় সফলও হয়েছিলেন। যেটুকু খুঁত ছিল, কেপলারের পরিবর্তে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি অনুরূপ অবস্থায় সেটাকে নিশ্চয় তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। কিন্তু কেপলার অস্থির হয়ে উঠে-ছিলেন। একদিকে বৃত্তসম্পর্কিত সুগভীর সংস্কার, অপর দিকে টাইকো ব্রাহে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো সম্পর্কে অটল বিশ্বাস। টেলিস্কোপ ব্যবহারে টাইকো অতুলনীয় অভ্রান্ত, কেপলার এ-বিশ্বাস ছাড়তে পারেন নি। দীর্ঘকাল যন্ত্রণাভোগের পর

কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন উপবৃত্তাকার কক্ষপথ টাইকোর সংখ্যাগুলোর সঙ্গে মিলে যায় আশ্চর্য নিখুঁতভাবে, যার পরে আর সন্দেহ থাকে না, গ্রহগুলোর গতি উপবৃত্তপথে, বৃত্তপথে নয়। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব উত্তরকালে অভিকর্ষের পরিমাণগত গবেষণায়। যাই হোক, আর্কেটাইপের সঙ্গে প্রত্যক্ষের বিরোধ মহান কেপলারকে ছিন্নভিন্ন করেছিল অতি নিষ্ঠুরভাবে। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষতার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। কেপলারের সৌভাগ্য এই যে, যদিও পবিত্র ট্রিনিটির প্রতিচ্ছবি হিসাবেই বিশ্বলোককে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, উক্ত বিরোধ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং কেপলারেই ঐ বিরোধের মীমাংসা হয়ে যাওয়ার দরুন এর পরবর্তীযুগে দেখি আকস্মিকভাবে সকল উত্তেজনার অন্তর্ধান। এমনকি দেকার্তেই সুস্পষ্ট, আর নিউটনের টেনশনবিহীন প্রসন্নতায় লাজানো-গোছানো কাজ। গালিলিও-র ক্ষেত্রে আর্কেটাইপ ও প্রত্যক্ষের বিরোধই পুনরায় আলোচ্য স্ববিরোধের স্বরূপ, অথচ তফাৎ এই যে, গালিলিও-র সচেতনতায় সেটা বিশেষ ধরা পড়ে নি এবং টেনশন-টুকু আড়ালেই ছিল। অর্থাৎ গালিলিও ও কেপলার একই ডায়ালেক্‌টিকের দুই পর্যায়। একই সঙ্গে বলা যায় ব্যক্তিনিরপেক্ষতার দুই পর্যায়। এক পর্যায়কে চিহ্নিত করে মধ্যযুগ, যার সমাপ্তি গালিলিও-তে, আরেক পর্যায় চিহ্নিত করে নব্যবিজ্ঞান, বুর্জোয়াতন্ত্র, যার শুরু কেপলার-এ। সমসাময়িক এবং কোপার্নিকাস-তত্ত্বে সমবিশ্বাসী দুই বিজ্ঞানীর এই প্রভেদকে ব্যাখ্যা করতে হয় সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌বর্তিতার সাহায্যে, ব্যক্তি ও অঞ্চলগত অসাম্যে যার প্রতিফলন।

মণ্ডলাকার প্রতীক ইয়োরোপের ইতিহাসকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। বৃত্তের প্রধান ধর্ম সাম্য ; কেন্দ্র থেকে পরিধির যে-কোনো বিন্দুর দূরত্ব সমান, ধ্রুব। এই বৃত্তাকার সম্মিতির (ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে বর্তুলাকার, গোলক) অনন্যতায় গ্রীক দার্শনিকরা মুগ্ধ ছিলেন এবং আরিস্টট্‌ল-টলেমির বিশ্বদর্শনে বৃত্তাকার সম্মিতিযুক্ত গ্রহমণ্ডলের ধারণাই প্রধান হয়ে ওঠে। বৃত্তের আকর্ষণ এই যে, আপাত-প্রত্যক্ষের বিবিধ দোষত্রুটি, সম্মিতির অভাব সেই সময়ে আকৃতিগত ত্রুটি, অন্য দিক থেকে প্রকৃতির খামখেয়ালে মানুষের অহরহ বিপর্যয়, এ-সবের ক্ষতিপূরণ হয়তো পাওয়া যেতে পারে অমোঘ নিয়মশৃঙ্খলার সান্ত্বনায়। এই বৃত্তাকার শৃঙ্খলা একদিকে যেমন ইয়োরোপের মধ্যযুগকে বেঁধে রেখেছে, মানহাইম-এর বাচনে অন্তর্লোক-প্রত্যক্ষের যোগাযোগসাধনে, অন্যদিকে এই বৃত্তের চোরাপথে আধুনিক বিজ্ঞান তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সুযোগ পরিপূর্ণ গ্রহণ করেছে মধ্যযুগের অবসানকল্পে।

কেপলারের পূর্বে বৃত্তকে অস্বীকার করা ইয়োরোপে রীতিমত কঠিন ব্যাপার ছিল, অসম্ভবই বলা উচিত। কখনো কেউ অস্বীকার করার চেষ্টা করলেও শীঘ্রই ভুল সংশোধনের আবশ্যকতা স্বয়ং বুঝে যেতেন। বিংগেল-এর অসাধারণ মহিলা

হিলডেগার্ড দ্বাদশ শতকে এ-রকম একটা ব্যাপার ঘটিয়েছিলেন। তিনি গোড়ায় এক বিশ্বদর্শন কল্পনা করেছিলেন, স্বাভাবিক স্তরভেদ ছিল, কিন্তু অনেকটা আমাদের পুলির মতো দেখতে। পরে সংশোধন করেছেন। 'আটাশ বছর আগে ডিম্বাকৃতি এক বস্তুর স্বপ্নদর্শনের কথা আমার স্কিভিয়াস গ্রন্থের তৃতীয় দর্শনে লিখেছি। প্রায় সে-রকমই একটা চাকৃতি এবারেও দেখলাম। চাকৃতির পরিধি বরাবর ছিল লুসিডুস ইগনিস (স্বচ্ছ অগ্নি), তার নিচেই ছিল ইগনিস নিগের (কৃষ্ণ অগ্নি) বৃত্ত। ঐ বৃত্তের মধ্যে পিউরাস এথের-সদৃশ বৃত্ত, চওড়ায় প্রায় বাইরের বৃত্ত দুটোর সমান। আবার এই বৃত্তের নিচে অকোওস বৃত্ত, চওড়ায় লুসিডুস ইগনিসের সমান। তার নিচে ফর্টিস এট আলবুস লুসিডুস্ এর বৃত্ত, যার প্রস্থ প্রায় ইগনিস নিগের-এর সমান এবং এই দুই বৃত্তের মিলিত প্রস্থ বাইরের বৃত্ত দুটোর সমান। আবার, শেষোক্ত বৃত্তের নিচে এর টেন্থইস বৃত্তটিও দেখা যাচ্ছিল, যেটা মেঘ হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে হাল্কা হয়ে অনেক উঁচুতে, কখনো কখনো ঘন হয়ে ঈষৎ নিচের দিকে। সেই মেঘ যেন সমস্ত চাকৃতি জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল' (লিবের ডিভিনোরুম ওপেরুম)। এর পর হিলডেগার্ড পৃথিবী গোলকের কথা বলেছেন, যেটা ঐ চাকৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়ালো হিলডেগার্ড তাঁর ডিম্বাকৃতি বিশ্বকল্পনায় নিজেই অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বৃত্তাকার ক'রে নিলেন, বাকি বিবরণ মোটামুটি এক রেখে। এর কারণ, তিনি বুঝেছিলেন বৃত্তাকার বিশ্বই কেবলমাত্র প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খেতে পারে, ডিম্বাকৃতি বিশ্ব নয়।

অথবা কোপার্নিকাসের কথাই ধরা যাক, অ্যারিস্টট্‌লীয় মণ্ডলের ধারণায় তাঁর কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, যদিও অ্যারিস্টট্‌লপন্থীরা তাঁর বিশ্বকল্পনা সম্পর্কে কি পরিমাণ বিরক্ত হয়েছিলেন, ঐতিহাসিক মাত্রেই জানেন। বৃত্তসম্পর্কিত দুর্বলতা এরাটোস্থেনিসের গোলাকার পৃথিবীর ধারণায়, প্লিনি যার প্রচারে পঞ্চমুখ। এবং তারও বহু পূর্বে গ্রীকরা গ্রহ-নক্ষত্রের বৃত্তাকার কক্ষপথ সম্পর্কে নিঃসংশয়। মেমিনাস-কৃত আলেকসান্দ্রিয়ার এক জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থে পিথাগোরিয়ান বিশ্ব-তত্ত্বের এইরকমই পরিচয় পাওয়া যায়। 'সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের মূলে আছে একটা অনুমান : সূর্য এবং চন্দ্র এবং গ্রহসমূহ সমান গতিবেগে নিখুঁত বৃত্তপথে ব্রহ্মাণ্ডের বিপরীত দিকে ভ্রাম্যমাণ। এইসব ব্যাপারে প্রথম আলোচনার কৃতিত্ব পিথাগোরিয়ানদের যাঁরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ প্রভৃতির সমান বেগযুক্ত বৃত্তাকার গতি কল্পনা করেছিলেন। তাঁদের মতে, দেবতা এবং অমরবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধাবশত এটা স্বীকার করা যায় না যে, সূর্যাদির গতি এমন বিশৃঙ্খল, কখনো দ্রুত, কখনো মন্থর কখনো বা স্তব্ধ ইত্যাদি। মনুষ্যসমাজেও ভ্রমণের ব্যাপারে এরকম বিশৃঙ্খলা ভদ্রজনের অনুপযুক্ত। যদিও বা মানুষের জীবনে নানারকম বাস্তব প্রয়োজনে অনেক সময় ক্ষিপ্রতা ও মন্থরতা আসতে বাধ্য, গ্রহ-নক্ষত্রের চিরন্তন জগতে নিশ্চয়

সে-রকম কিছু হতে পারে না।' কোপার্নিকাস তো প্রায় সিসেরোর উপরই নির্ভর করেছিলেন। গ্রীকদের মণ্ডলতত্ত্বই মধ্যযুগে বিভিন্ন হাতে ঘুরেছে। সেণ্ট ভিক্টরের হিউ থেকে শুরু করে সিলভেস্ট্রিস্, পঙ্গু হেরমান, হিলডেগার্ড হয়ে অবশেষে দান্তে আলিঘিয়েরির তিনলোকে পৌঁছেছে। দান্তের মতোই কোপার্নিকাসও স্ফেরা ইমোবিলিসে নক্ষত্রসমূহের স্থান ক'রে দিয়েছিলেন। বস্তুত দান্তের পরিকল্পনায় সূর্য ও পৃথিবীর স্থান-বিনিময় ব্যতীত আর কিছু করা কোপার্নিকাসের অভিপ্রেত ছিল না। চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ও গ্রহগুলোর বিপ্রতীপ অবস্থান সম্পর্কে পূর্ববর্তীদের মতভেদ তাঁকে যে-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল তার মধ্যে মূল প্রচেষ্টা ছিল মণ্ডলতত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করার। বস্তুত পৃথিবীকে স্থির কল্পনা করলে অন্যান্য গ্রহের গতিগুলো এমন এলোমেলো হয়ে যায়, প্লেটো অসন্তুষ্ট হয়েছেন পঞ্চগ্রহের অভদ্র ব্যবহারে ; সেই তুলনায় সূর্যের চারিদিকে অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীও নিয়ত ভ্রাম্যমাণ, এ-রকম কল্পনা ক'রে নিলে বৃত্তের সারল্য আবার সুন্দরভাবে ফিরে আসে। কোপার্নিকাসের পক্ষে সৌরকেন্দ্রিক সিদ্ধান্তে প্রসন্নতার উৎস ছিল এই। ব্রুনো, গালিলিও, কেপলার, এঁরা সকলেই কোপার্নিকাসের বিশ্বকল্পনাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন একই কারণে।

প্রকৃতপক্ষে কোপার্নিকাস অবধি সংরক্ষিত হয়েছে আর্কেটাইপ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্কের এক বিশেষ রূপ, যার বৈপরীত্যে দেখি গালিলিও-র স্ববিরোধ, কেপলারের প্রকাশ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আধুনিক বিজ্ঞান। জেমিনাস পিথাগোরিয়ানদের ব্যাপারটা ঠিকই বুঝেছিলেন। মণ্ডলাকারে নিহিত আছে আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মানুবর্তী শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকৃতির ধারণা, বৃহত্তর শক্তির সম্মুখে নতিস্বীকার। এবং এর সঙ্গে সে-যুগের অর্থনৈতিক চরিত্রের সম্পর্কও সুস্পষ্ট। বস্তুত জ্যামিতিক সম্মিতিযুক্ত প্রতীকের ভূমিকা এইরকম। যে-কথা হাউসের বারংবার তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকলা, বিশেষত চিত্রকলা প্রসঙ্গে। নব্যপ্রস্তর যুগের অভিব্যক্তিবাদ এবং জ্যামিতিক অলঙ্করণের নিরাপত্তায় আশ্রয়গ্রহণ, ঈশ্বরের ধারণা ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার অধীনতা স্বীকার ক'রে নেওয়ার সঙ্গেই যুক্ত, যে-ঘটনার ব্যাখ্যা পুনরায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিণতি ও উৎপাদনকৌশলের বিবর্তনের দ্বারাই সম্ভব। এর প্রতিতুলনা হিসেবে আসে পুরাতন প্রস্তরযুগের গুহাচিত্র, আলটামিরার সেই অসাধারণ মহিষগুলো। এইসব স্বভাববাদী শিল্পকর্মের প্রাথমিক লক্ষ্য যে আভিচারিক, প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করার বাসনায় সংগ্রাম, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের ভ্রূণাবস্থাও তো আভিচারিক ক্রিয়াকলাপেই অনুসন্ধান করতে হয়। আয়োনিয়ানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে পিথাগোরিয়ানদের আবির্ভাব তেমনি কৃষিনির্ভর সুশৃঙ্খল সমাজের অধ্যাত্মমুখিনতার নির্দেশক। সমাজের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে সুগভীর শ্রদ্ধাও সেইসঙ্গে, যার উত্তরাধিকারে মধ্যযুগের যা কিছু স্থায়িত্ব। ক্যারিংটন ভালই স্মরণ

করিয়েছেন জেমিনাস প্রসঙ্গে, মনেপ্রাণে পিথাগোরিয়ান প্লেটোর সমাজ-পরিকল্পনায় ভদ্রশ্রেণীর সঙ্গে 'উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরেদের' শ্রেণীবিরোধের অস্তিত্ব কিরকম স্পষ্ট। এই সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে পাই ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্য —একদিকে ধর্মীয় সংস্থায় সমাজের অগাধ আস্থা, অন্যদিকে গ্রীক প্রতীকের উত্তরাধিকার, সমষ্টি-নির্জ্ঞানের পথে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিনিরপেক্ষতার ইতিহাসকে এইভাবেই বুঝে নিতে হবে। সেইজন্যই মধ্যযুগের বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রদর্শনের কিছু নেই, যতই কুসংস্কারজর্জরিত হোক না কেন মধ্যযুগের প্রতিটি গ্রন্থের প্রতিটি ছত্র। অন্তত ক্রম্বি এবং সিঙ্গার যথেষ্টই প্রমাণ করেছেন, মধ্যযুগের পণ্ডিতরা কখনো-কখনো ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যে পৌছাতে পেরেছেন। নানাপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যেও। একে আধুনিক বিজ্ঞান বলা হবে না বিবিধ কারণে। সেণ্ট অগাস্টাইন অবশ্যই মধ্যযুগের এবং কেপলার ও গালিলিও অবশ্যই আধুনিক যুগের। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, সমষ্টি-নির্জ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিনিরপেক্ষতার এই পর্যায়ের কোনো প্রকাশ্য বিরোধ ছিল না। এমনকি ব্যক্তিনিরপেক্ষতার ইতিহাসে যা চিরস্মরণীয়, কোপার্নিকাসের আবিষ্কারে ভূকেন্দ্রিকতার অহমিকা চূর্ণ হওয়ার ঘটনা, সেও তো ঘটেছিল মণ্ডলাকারের আশীর্বাদ নিয়েই।

অবশ্য কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপখণ্ডে এহেন অবস্থা ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শুধু ইয়োরোপখণ্ডেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কারণ সামন্ততান্ত্রিক অশান্তির অভাব ছিল ভারতবর্ষে বা চীনে। এই দুই দেশে বিরাজ করছিল এমন এক স্থায়িত্বসম্পন্ন রাজধর্ম যা জনকল্যাণ প্রজারক্ষা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মহিমায় দীর্ঘকাল ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ। অন্যপক্ষে ইয়োরোপের মধ্যযুগ বিবিধ অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হয়ে ধনতন্ত্রের আগমন ত্বরান্বিত করেছিল বলেই গালিলিও বা কেপলারের জন্ম অনিবার্য হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামন্ততন্ত্রের এই চরিত্রগত তফাৎ দৃষ্টিগোচর না হওয়ার দরুন বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনাকালে ঐতিহাসিকরা সযত্নে ভারতবর্ষ বা চীনের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, ইতিহাস ব্যাখ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় পাছে। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত জোসেফ নীডহ্যাম।

ব্যক্তিনিরপেক্ষতার দুই পর্যায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর আহ্নিক গতি প্রমাণ করাটাই গালিলিও-র কাছে পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। আর্কে-টাইপের সঙ্গে ব্যক্তিনিরপেক্ষতার বিরোধ এসে গেছে, কিন্তু তখনো অপ্রকাশ্যে। এর ফলে একদিকে যেমন বৃত্তাকার গতিকেই স্বাভাবিক গতি হিসেবে মেনে নিতে হয়েছে, তেমনি জোয়ার-ভাঁটার এক উদ্ভট তত্ত্ব খাড়া ক'রে তার সপক্ষে জটিল সব যুক্তি তৈরি করে গালিলিও প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন। শুধু তাই নয়, কেপলারকে অন্যায়ভাবে গালাগালি দিয়েছেন বিকল্পতত্ত্বের সমর্থক হিসেবে।

সালভিয়াতি : তেমনি এরকম বলাও অর্থহীন (জনৈক প্রাচীন গাণিতিক নাকি

বলেছিলেন) যে, পৃথিবীর গতি ও চন্দ্রের গতির বৈপরীত্যেই জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তি। কারণ, এটা শুধু যে অপ্রত্যক্ষ এবং দুর্বোধ্য তাই নয়, পৃথিবী এবং চন্দ্রের গতির বৈপরীত্য ব্যাপারটাই একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা। এ-পর্যন্ত যতরকম তত্ত্ব এ-প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রস্তাব করেছেন তার প্রত্যেকটাই আমার কাছে মূল্যহীন ঠেকে। কিন্তু এই অদ্ভুত প্রসঙ্গে যত মহাপুরুষ চিন্তাভাবনা ক'রে গেছেন তাঁদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি কেপলারের ব্যাপারে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট উদার এবং পৃথিবীর গতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপার তাঁর নখদর্পণে। অথচ তিনি সমর্থন করেছেন সমুদ্রের উপর চন্দ্রের প্রভাব জাতীয় বিভিন্ন প্রকার আধিভৌতিক-আধিদৈবিক কল্পনাকে।

কেপলার যে অভিকর্ষ ব্যাপারটা ভালই বুঝতেন সে-সম্পর্কে কোনো ভুল নেই। সমুদ্রের উপর চন্দ্রের প্রভাব কেপলার অভিকর্ষ হিসেবেই কল্পনা করেছিলেন। কেপলার বহুরকম আধিদৈবিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কার নিয়ে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু সে-সবের সঙ্গে তাঁর জোয়ার-ভাঁটার তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অন্যপক্ষে গালিলিও-র পক্ষেই স্বাভাবিক ছিল কেপলারের সমর্থন। কেননা, তিনিই প্রথম মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিশ্বব্যাপী অভিকর্ষে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানেও ছিল সূর্য চন্দ্র ও গ্রহসমূহের গোলকাকৃতি ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা। টলেমির বিশ্বকল্পনায় বস্তুমাত্রই বিশ্বের কেন্দ্রাভিমুখে, অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলেই পৃথিবী গোল। গালিলিও শুক্রগ্রহের কলা পরিবর্তন, সৌরকলঙ্কের চলাফেরা ইত্যাদি লক্ষ ক'রে বুঝেছিলেন যে আকাশের যাবতীয় বস্তুপিণ্ড গোলকাকার এবং টলেমির অনুরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব যদি সমস্ত বস্তুপিণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুর প্রতি বস্তুমাত্রই আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সাধারণ অভিকর্ষ। এর আবিষ্কর্তা গালিলিও নিঃসন্দেহে। আকাশের অন্যান্য বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো মৌল প্রভেদ নেই, অন্তত আকর্ষণ-ক্ষমতার ব্যাপারে, ব্যক্তিনিরপেক্ষতার এই ধাপ। এই বোধটুকু অতএব গালিলিও-র কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল যে, কেপলার-কল্পিত পার্থিব বস্তুর উপর চন্দ্রপ্রভাব সম্পূর্ণ উদ্ভট না-ও হতে পারে। নিজস্ব তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গালিলিও-কে যে-পরিমাণ অনর্থক পরিশ্রম করতে হয়েছে তদপেক্ষা অনেক সহজ ছিল কেপলারের প্রস্তাবকে সামান্য যত্নসহকারে চিন্তা করা। আসলে গালিলিও-র লক্ষ একদিকেই নিবদ্ধ ছিল। পৃথিবীর গতি যেন-তেন প্রকারেন প্রমাণ করতে হবে। এই দায়িত্বপালন করতে গিয়েই গালিলিও-র বিভিন্ন প্রকার গোলমাল। এই দায়িত্ব বস্তুত গালিলিও-র জীবনে অভিশাপরূপে কাজ করেছে। কোপার্নিকাসের বিশ্বকল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে অবশ্য তৎকালে এ-ছাড়া উপায় ছিল না। গালিলিও-র কাছে এর গুরুত্ব আর্কেটাইপের সংগতির দিক থেকে যেমন, ব্যক্তিনিরপেক্ষতার দিক থেকে তার চেয়ে কিছুমাত্র

কম নয়। পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি বস্তুজগতের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছে, এ-রকম ধারণা তাঁর পক্ষে অসহ্য ছিল। আবার তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সরাসরি অস্বীকার করার বিপদও গালিলিও-র চেয়ে আর অধিক কে জানত? তিনিই তো প্রচার করেছিলেন প্রত্যক্ষের সঙ্গে বিরোধ ঘটলে ঋষিবাক্যও নিমেষে অর্থহীন হয়ে যায়; সংলাপে সিম্‌প্লিচিও-কে সালভিয়াতি বারংবার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, যখনই সিম্‌প্লিচিও আরিস্টট্‌ল-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন। অন্যপক্ষে সিম্‌প্লিচিও বহুবার সালভিয়াতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর সংশয়ের কথা, যেহেতু শত সহস্র বিরুদ্ধ যুক্তির অবতারণাতেও পরীক্ষালব্ধ সত্যের কেশাগ্র স্পর্শ করা অসম্ভব। তা ছাড়া গালিলিও-ই তো টলেমি-পন্থীদের নিরন্তর আহ্বান জানিয়েছেন দূরবীক্ষণের সাহায্যে নভোলোকের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করার জন্য। তর্কশাস্ত্রে পারংগম হলেই যে বস্তুজগতের সকল বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রকাশের অধিকার জন্মায় না, আরিস্টট্‌ল-এরও না, একথা গালিলিও-ই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে ইয়োরোপের মোহভঙ্গ করেছিলেন। সুতরাং আশ্চর্য কি যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি কেন আপাতপ্রত্যক্ষ নয়, কিভাবেই বা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব, এইসব প্রশ্নের সমাধান অন্বেষণে তিনি জীবনপাত করেছিলেন।

এই পরিশ্রমের মাধ্যমে যে-শিক্ষা তিনি দান করতে চেয়েছিলেন তা হল ব্যক্তিপ্রত্যক্ষ সত্যের সঙ্গে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যের যোগাযোগস্থাপনেই যুক্তি-তর্কের প্রকৃত সার্থকতা। ব্যক্তিপ্রত্যক্ষ মাত্রই ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, আবার এ-দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত বিরোধও অনুপস্থিত। শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির পরিশোধন প্রয়োজন যুক্তি ও অ্যাবস্ট্রাকশনের সাহায্যে।

সাগ্রেদো। হায় নিকোলাস কোপার্নিকাস। তোমার তত্ত্বের এই দিকটা এমন পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষীভূত হতে দেখলে তুমি কতই না আনন্দিত হতে।

সালভিয়াতি: হ্যাঁ, কিন্তু পণ্ডিতবর্গের কাছে তৎসত্ত্বেও তাঁর সূক্ষ্ম মননের সমাদর কত অকিঞ্চিৎকর হতো। কেননা, আমি পূর্বেও যা বলেছি, যুক্তির পথ-নির্দেশে তিনি জোরের সঙ্গে যা বলে গেছেন, সেটা যে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার বিপরীত।

বস্তুত এপিস্টেমোলজির এই প্রাথমিক সমস্যার নিরসনে মানবজাতিকে বহুদিন সাধনা করতে হয়েছে—অধ্যাস-প্রতিভাসের সম্ভাবনার দ্বারা আক্রান্ত ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার থেকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য চিনে নেওয়ার কলাকৌশল প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধ, এ-সম্পর্কে চেতনা, ইয়োরোপীয় দর্শনে গালিলিও-র দান। পদার্থতত্ত্বে এরই প্রতিফলন গালিলিয়ান আপেক্ষিকতাবাদে। একই বিষয়ে পরীক্ষা বিভিন্ন অবস্থায়, বিশেষত ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গতিবেগসম্পন্ন পরীক্ষকের বা দর্শকের কাছে একই সত্যের প্রমাণ উপস্থিত করবে। তেমনি কোন দর্শক বিশ্বের কোন বিন্দুতে অবস্থান করে, তার উপর পদার্থতত্ত্বের সত্যগুলো নির্ভর

করে না। বিশ্বের সর্বত্রই একই সত্য সকল দর্শকের কাছে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। কোপার্নিকাসের বিশ্বকল্পনার যে-ব্যাখ্যা গালিলিও গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু থেকে পৃথিবীকে স্থানচ্যুত করাই শুধু নয়, কেন্দ্রবিন্দুর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ রয়েছে। যদি কেন্দ্রবিন্দু কল্পনা করতেই হয়, তা হলে সেই কেন্দ্রে সূর্যের অবস্থান বরং বাঞ্ছনীয়, পৃথিবীর অবস্থান কদাচ নয়।

সালভিয়াতি : বেশ বলেছেন। নিঃসন্দেহে, কেউ যদি বলতে চান যে, পৃথিবী একটা বৃত্তের পরিধি বরাবর ঘুরছে, তা হলে তাঁকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে, পৃথিবী সেই বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। তা হলে, আমাদের আগে দেখতে হবে যে, পৃথিবী সেই বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত কিনা। আপনি বলছেন অবস্থিত, আমি বলছি পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে। কিন্তু সর্বপ্রথম আমাদের বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, এই কেন্দ্র বলতে আমি আর আপনি একই বিন্দুর কথা বলছি কিনা। সুতরাং বলুন আপনার এই কেন্দ্র কী এবং কোথায়।

সিম্‌প্লিচিও : আমি কেন্দ্র বলতে বিশ্বের কেন্দ্রের কথাই বলছি। চরাচরের কেন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলের কেন্দ্র, নভোলোকের কেন্দ্র।

সালভিয়াতি : আমি সংগতভাবেই প্রশ্ন করতে পারি সত্যিই এ-রকম কোনো কেন্দ্র আছে কিনা। কেননা আপনি অথবা কেউই এ যাবৎ প্রমাণ করতে পারেন নি চরাচর সসীম, তার কোনো আকৃতি আছে, অথবা চরাচর অসীম, অনন্ত।

এখানে লক্ষণীয় গালিলিও অজ্ঞাতসারে মণ্ডলাকারের প্রভাব ছাড়িয়ে আকারহীন চরাচরের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। বিশেষত কোনো কেন্দ্রবিন্দুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর সন্দেহ। আর এ-রকম কোনো কেন্দ্রবিন্দুর কথা স্বীকার ক'রে নেওয়ার অর্থ সম্ভাব্য এক দর্শকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ব্যক্তিনিরপেক্ষতার হানি।

অসীম রায়

টমাস মানের সঙ্গে

'একালের কথা, গোপাল দেব, দ্বিতীয় জন্ম – এই তিনটি উপন্যাসেই তোর একটি বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ ঝোঁক ক্রমে প্রকট হয়েছে এবং 'দ্বিতীয় জন্মে' তা একটি সর্বাত্মক শিল্পগত ব্যর্থতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। সে-ত্রুটি হল অনেক সময় (সব সময় নয়) আশে পাশের যেখানে যে জ্যোতি রায়, শোভা দত্ত, বিষ্ণু দে, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, রাম বসু, মুরলী ঘোষ ও আরো অনেক হতভাগ্য, কোনো একজনের মা, তার বোন, তার ভুরু, তার ভাগ্নে, তার নাক চোখ রক্ত, তার মা-র অর্থলোলুপতা, তার বাঁচা কাঁদা মরা, তার জীবনের কমা-দাঁড়ি, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম (তা না হলে তুই খুকু ও বাঘার নাম বদলে রাখতে পারতিস) আছে, সব কিছুকে উপন্যাসের কাঁচামাল হিসেবে তুই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিস। কিন্তু মুশকিল হল, তোর শিল্পে তাদের আমদানি হয়েছে প্রায় সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তির মতো।'

১৯৫৬ সালে 'দ্বিতীয় জন্ম' প্রকাশের পরই এ-চিঠির অভিযোগ এমন প্রচণ্ড ও মর্মান্তিক যে তা জবাবের অপেক্ষা রাখে না। এ-জবাব সহজলভ্য চাতুরির উপর নির্ভর ক'রে দেওয়া মানে আত্মবঞ্চনা, বিশেষ ক'রে অভিযোগকারীর বছরের পর বছর সান্নিধ্য লেখকের গভীর

পরিতৃপ্তির কারণ ঘটানো ছাড়াও এ-অভিযোগের উত্তরের সঙ্গে তার নিজের শিল্পপ্রক্রিয়াও যুক্ত। লেখকের সামনে এমন-এমন বক্তব্য আসে যা আসলে বক্তব্যের মুখোস-পরা শূন্যতা, কখনো তা কথার পিঠে কথা বলার অভ্যাস-দোষ-সঞ্জাত, কখনো বা সংক্রামক চালাকির ব্যাধিতে রুগ্ন ; কিন্তু লেখকের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দেবার ক্ষমতাও বয়ে আনে কোনো বক্তব্য, যখন সে-বক্তব্যের সঙ্গে মিশে থাকে শিল্পকর্ম সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা।

বারো বছর পরেও এ-চিঠির নৈর্ব্যক্তিক কোনো উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করার মধ্যে বক্তব্যের মর্মান্তিকতা ও প্রচণ্ডতা হারায় না। কারণ চিঠিতে যে-সব নামোল্লেখ আছে সে-সব নামধারী নরনারী লেখক তাঁর উপন্যাসে কাঁচামাল রূপে ব্যবহার করেছেন কিনা সে-সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ যথেষ্ট থাকলেও চারপাশের প্রত্যক্ষ যে-জগতে লেখক হাঁটেন ফেরেন কথা বলেন সেই জগতটাই যে তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে ও আসবে এ-অভিযোগ তিনি যে শুধু মাথা পেতে নেবেনই না বরং একথা বলবার চেষ্টা করবেন যে এই প্রত্যক্ষ জগতকে মানসলোকের সঙ্গে যুক্ত করাই তাঁর লেখার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রেরণা।

অনেক সময়ই আলোচনায় রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম দুই অভিন্নসত্তা বস্তু রূপে দেখানোর চেষ্টায় ভুল ঘটা স্বাভাবিক। মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রির মতো, নিউ ইউর্ক ও শিয়ালদার মতো, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মতো দুই নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও পরিবেশে চিহ্নিত হয়ে সত্যের চেহারা আসে না লেখকের কাছে। এ-রকম অভিন্নসত্তা, এরকম নির্দিষ্ট সংজ্ঞা সাহিত্যের মানদণ্ড স্থাপনে হাতের-পাঁচ হয়ে দাঁড়ালেও শিল্পকর্মের প্রক্রিয়াটা তলিয়ে দেখতে তা বিঘ্ন ঘটায়। রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত কবিতার লাইন 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে' ঘটনা নিশ্চয় বাদ দিয়ে নয়। আর এই ঘটনা কারোর জীবন্ত মঙ্গোলীয় চোখ, নিচু খাদে কারো বা গলার স্বর, কোনো মহিলার ঠোঁটের ভাঁজে কৌকড়ানো গোলাপের ইঙ্গিত, কথার যথার্থতা প্রতিষ্ঠার অভিলাষে হাত নাচানো, মেকী বিষাদে পরিপূর্ণ জনৈক ব্যক্তির আয়ত চোখ, কারোর বা গলায় লাল স্কার্ফ, এমন কি কোনো নাম যা পাল্টাবার যান্ত্রিকতা অতিস্থূল কারণ তা সেই মানুষটা ও তার পরিবেশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। এই নাক চোখ মুখ বলার ভঙ্গি এগুলো হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিয়ে আবিষ্কারের বস্তু না। এগুলো প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাস্তব যা জলের মতো আমাদের চারপাশে, আমরা সাঁতরাচ্ছি সেই মুখচোখ নাক কথা জামা-র জগতে। তাদের বাদ দিয়ে ডুব দিলে রত্নাকরও রত্নহীন।

তার মানে ন্যাচারলিজম, সাংবাদিকতা, ফটোগ্রাফি কিংবা মাছিমারা কেরানির পেশাই শিল্পকর্ম ? এ-প্রশ্নের ধাক্কা অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ কোটি কোটি চোখ, কোটি কোটি হাত নাচানো, কোটি কোটি গলার উঁচু নিচু স্বর আমাদের আগে গিয়েছে, পরে আসছে, কয়েকশো কোটি জামা জুতো চোখ

মুখ গলার আওয়াজের ফিরিস্তিই আমাদের শিল্পকর্মে আকর্ষণ? তাহলে নিশ্চয় উপন্যাস নামধেয় শিল্পকর্ম বেশ স্থূল ব্যাপার, চারপাশের যত রসালে চটকদার ঘটনা জমিয়ে লিখতে পারলেই তা দাঁড়িয়ে যাবে উপন্যাসে, এবং তা যতই চটুল চাকল্যকর হোক কিংবা লেখক কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে জীবন দেখেছেন তার পাতার পর পাতা বর্ণনা থাক, বয়স্ক মানুষের পক্ষে তা নিঃসন্দেহে বাহ্য।

এ-কথা সর্বজনবিদিত যে হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দেবার ব্যাপারটা না থাকলে কাহিনী কাহিনী মাত্র, উপন্যাস নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করা দরকার, প্রত্যেক উপন্যাস এক গভীর আত্মমুখিনতা ও প্রবল বহির্মুখিনতা এক সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা। বারো বছর আগের চিঠির জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-কথা বলা যেতে পারে যে দুটো আলাদা এবং অনেক সময় সমান্তরাল জগত এক সঙ্গে অনেকদিনের ধীর অভিনিবেশে ধরবার চেষ্টাই উপন্যাস লেখার একমাত্র সাফাই। যে-জগত সেই বিশেষ বইটির (দ্বিতীয় জন্ম) প্রসঙ্গে উল্লিখিত সে-জগতে লেখকের বাস বেশ কিছুকালের। এ-ক্ষেত্রে চেষ্টা ক'রে জীবন দেখবার জন্যে বার হবার কোনো দরকার ছিল না। এ-জগতের চেহারাটা এসেছে নিঃশ্বাস নেবার মতো স্বাভাবিকতায়। কাজেই একটা চমৎকার তৈরি বাগানকে আবার উপড়ে নষ্ট ক'রে সেই জায়গায় নতুন বাগান সৃষ্টি না ক'রে শুধু নতুনভাবে সাজিয়ে দেবার প্রয়াস ছিল লেখকের। আর সেই সাজানোর ছকটা-র জন্যে যেমন তাঁকে ভাবতে হয়েছে তেমনি তাঁর কাছে মূল্যবান ঠেকেছে সেই সত্যের অনুভূতিতে স্পন্দমান জগতখানা তুলে ধরবার প্রয়াস।

কিন্তু উপন্যাস প্রক্রিয়ার এই তত্ত্ব ডিশ সাজিয়ে দেবার মতো পাঠকের সামনে গুছিয়ে রাখলেই অভিযোগকারীর যুক্তি খণ্ডায় না। বস্তুত অভিযোগ অভিযোগই থেকে যায়, জবাব জবাবই থাকে। আহত মানসের কাছে এ-প্রক্রিয়া অসামাজিক, চৌর্যবৃত্তি, সাম্রাজ্যবাদী জবরদস্তি, প্রায় ছ্যাঁচড়ামি। যদি পাল্টাপাল্টি বলা যায় তবে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের কাছে এ-বক্তব্যের যথার্থতা অনস্বীকার্য। আবার লেখক হিসেবে এ-ছাড়া কোনো রাস্তা নেই, মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়া বিমূর্ত রূপের ধ্যান অসম্ভব।

এ-বক্তব্যের সঙ্গে আর-একটি বক্তব্যের সহ-অবস্থান অনস্বীকার্য। উপন্যাস তা একটাই হোক বা সারা জীবনব্যাপী লেখার মালাই হোক, তা লেখকের এক অবিচ্ছিন্ন আত্মজীবনী। অর্থাৎ লেখক তাঁর জগতে যেভাবে হাঁটেন চলেন ফেরেন, তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর বিশেষ মেজাজের ছায়াপথ সমস্ত লেখাতেই প্রতিভাত। তা যদি না হয়, যদি সাহিত্যের জগত এবং লেখকের মানসিকতার মধ্যে ব্যবধান থাকে অনড়, ভিতর ও বাহিরের যোগাযোগ অনুপস্থিত, তাহলে আবার পুরনো কথায় ফিরে আসা যায়, কাহিনী কাহিনী মাত্র, উপন্যাস নয়। এই বিশেষ কারণেই ভাল লেখকের কোনো একটি বিশেষ লেখা নিয়ে চেঁচামেচি

অর্থহীন ; মাস্টারপিস-মৃগয়া একেবারে অচল। কারণ লেখকের মানসিকতায় নতুনের আবির্ভাব হাঁচকায় না, বয়ে নিয়ে চলে, বিস্তারিত করে। প্রত্যক্ষের ধাক্কায় উৎসাহিত, ক্ষুব্ধ কিংবা আলোড়িত হয়ে তিনি আবার ফিরে যান তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্বে। অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে তাঁকে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকখানি ভাবতে হয় তাঁর বিষয়টা বিষয় কিনা। তারপর লিখতে লিখতে সমস্ত বিষয় এক নতুন নক্সায় ধরা পড়ে, যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত এবং একেবারে বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের কাঁচা মাল। এই দুই পৃথক বস্তুর দুই সুতোয় বুনোটের কাজ চলে। এই নক্সা বোনার উৎসাহে ভরা পালে কাজ এগোতে থাকে, তখন দুটো সুতোর চেহারা আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না, ভিতর ও বাইরের ব্যবধান কমে আসে।

একেবারেই ব্যবধান থাকে না ? গোটা উপন্যাসটাই অখণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে ? এ-প্রসঙ্গে কোনো পার্ফেকশানিজমের অবকাশ আছে কিনা সে-বিষয় সন্দেহ কাটানো মুশকিল। দুশো-তিনশো কিংবা চার-পাঁচশো পাতার পরিক্রমায় বা দুদিন কি দু-দশ বছরের যাত্রায় কোনো ঘটনা কিংবা চরিত্র না-ও জুড়তে পারে, তাতে কি গোটা উপন্যাসটার শিল্পকর্ম ব্যর্থ ? সেখানে কি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ওথেলো নাটকের রুমাল-কাহিনীর অনিবার্যতা মাত্র স্মরণীয় ? বরং এ-প্রসঙ্গে লেখকের সমস্ত উপন্যাসব্যাপী পরিক্রমা বিচার্য। সে-ক্ষেত্রে দেখা যাবে কোনো-কোনো আকাঁড়া কাঁচামালের স্বাদ অনাস্বাদিত, জোড়ে নি এমন সুতোও সুন্দর নক্সার পরিচায়ক।

তাছাড়া কাহিনী যখন অনেক সময় ধরে অনেক রকম মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বয়ে চলে তখন সমস্ত চরিত্র কটিতেই বইটির অন্তর্লীন ভাব বা 'লেইট মোটিফ' থাকবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক সময় পার্শ্বচরিত্র জমে, তা অনেকটা গ্রীক কোরাসের মতো অবিচ্ছিন্ন হয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ, মূল ঘটনার সঙ্গে তাদের বৈপরীত্যেই তারা প্রাসঙ্গিক। তাদের ছেঁটে ফেলে কাহিনীকে এক সম্পূর্ণ নিটোল রূপ দেবার চেষ্টা শিল্পচর্চায় বিশুদ্ধবাদীদের সন্তোষের কারণ ঘটালেও তা শিল্পের দিগন্ত সংকুচিত করারই নামান্তর। যেমন প্রেমের প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ দুই নরনারীর পরিবেশ হতেই পারে এমন যেখানে স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, বাক-সর্বস্বতা ইত্যাদি মানুষের ক্ষুদ্রতার খেলা চলেছে। অর্থাৎ কোনো পর্বতশিখর যেমন ধাপে ধাপে সমতল থেকে উঠেছে, যার উপর পর্বত-অভিযানকারী দল অনেকটা কম পরিশ্রম ও কষ্টে আরোহণের গৌরব অর্জন করেন তেমনি এমন শিখরও আছে যেখানে ধাপগুলো কম, যেখানে খাড়া চড়াই। প্রকৃতির এই দুই ধরনের সৌন্দর্যের মতো অনেকটা বাস্তবের চেহারা। সেখানে একটা নিটোল মসৃণ, শিল্পসম্ভাবনাপূর্ণ এবং আর একটা কর্কশ স্থূল ভাববার কারণ নেই।

'দ্বিতীয় জন্ম' প্রকাশের পাঁচ বছর পর ইংরেজিতে প্রথম প্রকাশিত টমাস

মানের 'আমার জীবনের স্কেচ' বইখানা পাওয়া অনেকটা হাতে চাঁদ পাওয়ার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর আবিশ্ব ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে একজন অকিঞ্চিৎকর জর্মনভাষা-অনভিজ্ঞ ভক্তের কাছে এই ছিয়াত্তর পাতার ছোট্ট বইখানা এক আত্মিক সংকটের আশ্রয়। কারণ যে-আসামী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচারপতির বিরুদ্ধ রায় শুনেও ভাবছে সে নির্দোষ এবং জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে আবার তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে, তার মানসিক অবস্থা নিশ্চয় আত্মিক সংকটের সমতুল্য। মান অবশ্য অনেক জায়গাতেই শিল্পপ্রক্রিয়ার অপরূপ বর্ণনার মারফত শিল্পের অসাধারণ গুরুত্বে পাঠকের প্রত্যয় এনেছেন, কিন্তু এমন খোলা-খুলি সাদামাটা ভাষায় নিজের লেখার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন নি। মান বলছেন

> 'টৈনিাও ক্রোয়গার'-এর অন্তর্নিহিত প্রতীক এবং বাস্তবের নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তুলে ধরবার প্রসঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, আমার যৌবনের সেই কাহিনীতে লাইব্রেরি-ঘরে পুলিশ অফিসারটির সঙ্গে যে-সব দৃশ্য তা আমি তৈরি করেছি আমার বক্তব্যের সপক্ষে। কিন্তু তা মোটেই নয়; স্রেফ যা ঘটেছে তা থেকে তুলে ধরা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে 'ভিনিসে মৃত্যু' কাহিনীতেও কোনো-কিছুই উদ্ভাবিত হয় নি। উত্তুরে কবরখানার তীর্থযাত্রী, ধড়ধড়ে নৌকো, সেই শুভ্রকেশ বাউণ্ডুলে আর অনামুখো গণ্ডোলা-মাঝি, তাজিও আর তার পরিবার, মালপত্তরের গণ্ডগোলে যাত্রার সাময়িক বিঘ্ন, কলেরা, ট্র্যাভেল ন্যুরোর ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কেরানি আর বজ্জাত কবিয়াল – এই সব কিছু এবং আরও যা আছে তা সব সেখানে ছিল। আমাকে খালি সেগুলো সাজাতে হয়েছে, কারণ অদ্ভুতভাবে হলেও তারা যে একই কম্পোজিশানের অঙ্গ তা আমার কাছে দপ্ ক'রে মনে পড়েছে।'

১৯২৪ সালে প্রকাশিত 'ইন্দ্রজাল পর্বত' পাঁচ বছর পর মান-কে দেয় নোবেল পুরস্কার, কিন্তু সংগতভাবেই মানপত্রে লেখা ছিল যে প্রধানত ল্যুবেক সহরের ব্যবসায়ী পরিবারের জীবনকাহিনী, বুড্ডেনব্রুক বইখানার দরুন উত্তর ইয়োরোপের বাসিন্দাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এ পুরস্কার। এ-সহরেই মানের জন্ম ও বাল্যকাল অতিবাহিত; তাঁর বাবাও শস্যের ব্যাপারী এবং সহরের জনৈক ব্যবসায়ীর জীবন-কাহিনী লেখাই ছিল তাঁর বইয়ের প্ল্যান। অর্থাৎ আমাদের মূল প্রতিপাদ্য, নাক-চোখ-মুখ, গলার আওয়াজের জগত থেকেই লেখকের যাত্রা। মূর্ত প্রত্যক্ষ রূপ ছাড়া বিমূর্ত রূপের ধ্যান অসম্ভব।

এই মূর্ত ও বিমূর্তের মাঝখানে সেতু বাঁধবার যে বিচিত্র প্রয়াস তা টমাস মানের ছেলে গোলো মানের 'পিতৃস্মৃতি'-তে সম্প্রতি চমৎকার প্রকাশিত। বস্তুত এ-প্রয়াস স্যাচারালিজম ও রিয়ালিজমের বহু-আলোচিত বাঁধা সড়ক থেকে আলাদা এবং আরও সম্ভাবনাপূর্ণ। এ-প্রয়াসে অন্তর ও বাহির এ-দুই জগত গুরুত্বপূর্ণ, লেখকের

উন্নত মানসিকতা ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেমন গোড়ার কথা তেমনি প্রাথমিক এই চার পাশের জগত—মানুষের মুখচোখ নাককান গলার আওয়াজ, লেখক যে-রাস্তায় হাটেন চলেন ফেরেন। এবং এই আত্তীকরণের পেছনে কোনো প্রবল তাড়া নেই, নেই নাটকীয়তা বা উদ্‌ভ্রান্তি।

'একবার যখন আমি গ্রামার স্কুলের ছাত্র বাবা আমার কোনো বন্ধুর কিছু ফটো চাইলেন। সে ছেলেটি নজরে এসেছিল তাঁর স্কুলে আসার সময়। সেই স্পেনীয় তরুণ আজ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী এবং জর্মন ও স্পেনীয় বাণিজ্যের অন্যতম সংযোজক। প্রথমে এ-অনুরোধ আমার কাছে ছিল দুর্বোধ্য; পরে দেখা গেল এই ফটোগুলোর প্রয়োজনীয়তা তাঁর সেই মহৎ উপন্যাসে ঘোসেফের গড়নের জন্যে; যে মুখখানা তিনি আলগোছে দেখেছেন স্কুলে তা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার বাসনা। সচরাচর তাঁর স্মৃতিচারণে দরকার ছিল না এ-রকম নোট বইয়ের। একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে তিনি সাধারণত ছিলেন না চরিত্র-উদ্ভাবনকারী, ছিলেন আবিষ্কারক; এবং জীবন থেকেই আঁকতেন চরিত্র। ক্রুল পরিবার কীভাবে এমন দুর্দান্ত জীবন্ত ক'রে আঁকলেন—জনৈক রাইনল্যাণ্ড-অভিজ্ঞ ব্যক্তির এ-প্রশ্নে তাঁর জবাব, 'আরে আমি একবারমাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে রাইন নদীতে এক জাহাজে তাদের দেখেছিলাম।' তাঁর মডেলের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্থলে অনেকসময় নামটাও বাদ দিতে তিনি ছিলেন অপারক অর্থাৎ তিনি সেইসব নাম রাখতেন যা অবিকল যে-সব লোকদের 'ব্যবহার' করছেন তাদের নামের মতো, কারণ তাঁর এ বোধ ছিল যে ব্যক্তির সঙ্গে তার নামের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। উদাহরণস্বরূপ 'ইন্দ্রজাল পর্বতে' প্রিভি-কাউন্সিলারের বা 'পূর্ব বিষাদ' ছোট উপন্যাসে অভিনেতার নাম তাদের আসল নামের প্রতিধ্বনি। এ-জন্যে মডেল ও চরিত্রের সম্পর্ক তাঁর পক্ষে অস্বীকার করা মুস্কিল হতো; যাঁরা ব্যাপারটা জানতেন তাঁরা মুচকি হাসতেন। আর প্রায়শ তিনি এই সম্পর্ক প্রবলভাবে মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার করতেন, কারণ রিয়ালিস্ট বা ন্যাচারালিস্ট কোনোটাই তিনি নন, এ-বিষয়ে ছিলেন সচেতন।...তাঁর প্রথম উপন্যাস বুড্‌ডেনব্রুকে একমাত্র প্যারামানেন্ডার ছাড়া কোনো চরিত্রই বানানো নয়। একমাত্র বানোনো ছিল বইটার নাম।'

'তাঁর শেষের দিকের কাজে বানানো বস্তুর ব্যবহার অনেক বেশি; এক্ষেত্রে জীবন থেকে তিনি ক্রমশ কম এঁকেছেন। তাছাড়া বহির্জগতের প্রয়োজনীয়তা এক্ষেত্রে ছিল কম; যা দরকার তার উপর ছিল আসল ব্যাপার, অর্থাৎ কল্পনা। খনি-শ্রমিকদের জীবনকাহিনী লিখবেন বলে তিনি জোলার মতো খনিসংলগ্ন গাঁয়ে বাস করেন নি কয়েক মাস, অথবা হোটেলের মানুষ লিখবার উদ্দেশ্যে ভিকি বামের মতো তাঁকে কয়েক মাসের জন্যে হোটেলের

পরিচারিকা হতে হয় নি। এ-রকম ব্যাপার আমার বাবার কাছে নিশ্চয় জ্যাবড়া লাগত। তিনি মোটেই ন্যাচারালিস্ট ছিলেন না। তাঁর পদ্ধতি ছিল কিছু সময় ধরে দূর থেকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখা, তারপর ফের নিজের অন্তরের দিক থেকে বাইরে তাকানো।'

কোনো একটি বিশেষ লেখার প্রসঙ্গে টমাস মান-কে টেনে আনা কেন, পাঠকের এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপন্যাসরচনার পদ্ধতি প্রসঙ্গেই এ-আলোচনা। সঙ্গে সঙ্গে মানের গুরুদেব গয়টের এক বিশেষ উক্তি, যার উল্লেখ বারে বারে ঘটেছে মানের লেখায়, সে-উক্তিও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সম্ভবত 'একারমানের সঙ্গে আলাপ' গ্রন্থে গয়টে বলেছিলেন, 'কিছু করতে গেলে কিছু হতে হবে।' কথাটা গয়টের উপর তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে এবং অন্যত্র মান বার বার উল্লেখ করেছেন। কারণ লেখকের কাজের অসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন বরাবর সচেতন। তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে লেখক একজন 'অসুস্থ দেবদূত' নন, মানুষের সভ্যতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দায়। এ-জন্যে তাঁর নিজের উন্নত মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই উন্নত মানসিকতাই বলতে গেলে অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বের অনেকখানি সমাধান ঘটায়, কাহিনীকে রূপান্তরিত করে উপন্যাসে। এ-জন্যে লেখকের যে সমৃদ্ধ জীবনবোধ তার পেছনে কাঠ-খড় পোড়ানোর ব্যাপার থাকে।

এ-জীবনবোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব তা আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজের ক্ষমতা ও স্বভাব অনুযায়ী ব্যক্তিগত বাছ-বিচারের কথা বলেছেন মান। যেমন তাঁদের গড়ে ওঠার সময় নীটশের এবং কিছু পরবর্তীকালে শোপেন-হাওয়ারের অপরিসীম প্রভাব শুধু উল্লেখই করেন নি 'বুড্‌ডেনব্রুক্' উপন্যাসের নায়ক টমাস বুড্‌ডেনব্রুকের মৃত্যুর দৃশ্যের আগে শোপেনহাওয়ারের প্রভাব তিনি স্বীকারও করেছেন। ইয়োরোপীয় সংগীতের গড়নে সাজানো বিস্তৃতকাল-ব্যাপী দীর্ঘ উপন্যাসের গঠনপ্রক্রিয়া প্রসঙ্গেও তিনি সংগীত ঐতিহ্যের ঋণ ভোলেন নি। তাছাড়া নীটশের পাঠ তাঁর লেখা কিভাবে প্রভাবিত করেছে, কিভাবে তন্ময় এষণায় নীটশে-পাঠের রূপান্তর ঘটালেন তিনি, শৌখিন নীটশেবাদীদের অতিমানবতা ও আত্মিক নৈরাজ্যের অন্ধকার গ্রহণ করলেন কঠিন আত্মানু-সন্ধানের তীর্থযাত্রারূপে, তা টমাস মানের যে-কোনো আলোচনার অঙ্গাঙ্গী। কারণ গয়টের কর্ম ও অস্তিত্বের অখণ্ডতা বোধের প্রয়োজনীয়তা মান প্রসারিত করেছেন পাঠ্য নির্বাচন ও অনুধাবনে। যা পাঠ্য, যা মনীষা-আলোড়িত তা কিভাবে লেখক গ্রহণ করেছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে ও অভিজ্ঞতায় তা অনেকখানি জীবনবোধ গঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিল্প যেহেতু মনীষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য তাই শিল্পীর কাছে পড়ে পাওয়া জিনিস বলে কিছু নেই। প্রথম জীবনে কিছু লেখায় নীটশের প্রভাব থেকে শুরু ক'রে তাঁর 'শেষ রচনায়', তাঁর অবিস্মরণীয় 'সাম্প্রতিক ইতিহাসের

আলোয় নীটশে দর্শন'-এর মতো লেখার পরিক্রমায় ঐতিহ্য আত্তীকরণে লেখকের যে অসামান্য দায় সে-কথাই স্মরণীয়। কারণ লেখক দুটো স্পষ্ট বিপরীতমুখী স্রোতের দোটানায় পড়েন, একদিকে অতি-উৎসাহে অতিরঞ্জনের নেশায় মনীষার ক্ষেত্রে প্রায় অবতারবাদ প্রতিষ্ঠার সংক্রামক চেষ্টা, অন্যদিকে নকলনবিশি যান্ত্রিকতার বশে রক্ষণশীলতার দাসত্ব বা ঐতিহ্যের নামে নড়বড়ে ধড়ধড়ে বাড়ির দারোয়ানি। ঐতিহ্যকে স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মানুসন্ধানের আলোয় কিভাবে নতুন রূপে আবিষ্কার করা যায় টমাস মান-ছাত্রের তাই প্রথম পাঠ।

মান যেভাবে বলেছেন ইয়োরোপীয় মনীষার ক্ষেত্রে শেষ অংশে ঊনবিংশ শতাব্দী বস্তুত নীটশের শতাব্দী, তেমনি বলা যায় বিংশ শতাব্দী মার্কস শতাব্দী। অবশ্য মার্কসের ক্ষেত্রে একটা প্রধান অসুবিধে মার্কসবাদ জীবনবোধরূপে দাঁড়ালেও সংস্কৃতি ও শিল্প প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলসের প্রাসঙ্গিক লেখা প্রায় অনুপস্থিত। কাজেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক মূল্যায়নের অঙ্গাঙ্গী হলেও সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান অনেকখানি নির্ভর করছে লেখক ও শিল্পীদের হাতে ; এক্ষেত্রে নতুন পাঠের প্রয়োজন তর্কাতীত। তাছাড়া শিল্প ও সমাজের রূপ বর্ণনায় এঙ্গেলসের স্ট্রাক্চার ও সুপারস্ট্রাকচারের তুলনার মতো কতগুলো এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ছাড়া এ-বিষয়ে লেখা বিরল। এই সব বিরল লেখাগুলো নাড়াচাড়া ক'রে মাঝে মাঝে যে-সব লেখা দাঁড় করানো হয় তা বাস্তবিক পাতে দেওয়ার মতো নয়। একদিকে আর্থিক-সামাজিক চিন্তায় সংগতভাবেই উদ্বুদ্ধ এবং দায়িত্বশীল লেখার সঙ্গে মিশে থাকে একেবারে সাংস্কৃতিক দায়শূন্যতা ও বাকসর্বস্বতা, যা লেখক ও শিল্পীর পক্ষে শুধু বাহুই নয়, যার অনুসরণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রায় আত্মিক মৃত্যুর সমান। আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনে নতুন মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে-স্বপ্ন তা বিংশ শতাব্দীর মানুষেরই স্বপ্ন। এ-স্বপ্ন ও তা বাস্তবে রূপান্তরের আজ আবিশ্ব চেষ্টা। কিন্তু এ-যাত্রার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করছে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিরলস ও নির্ভীক প্রয়াসে। নীটশে নানা রূপে ফিরে আসে, আপ্তবাক্য ব্যবহারে জবরদস্ত দখলই মানুষের মুক্তির সোপান নয়। মানুষের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিবিচ্যুত হঠকরিতার নামান্তর নয়। টমাস মান বলেছেন তিনি নীটশেকে প্রকৃত বুর্জোয়া বানিয়েছেন, এ-রূপান্তর প্রতিষ্ঠা করার মতো ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতিকর্মীদের আসুক। তাঁরা বলুন নতুন মানবতাবোধের প্রতিষ্ঠায় তাঁদের দায়ের কথা। মার্কসবাদী সাহিত্য আলোচনার পৌথিন যান্ত্রিকতা ত্যাগ ক'রে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লেখকদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মানুসন্ধানে নতুন আবেগ সঞ্চারিত হোক। এইখানেই টমাস মানের চ্যালেঞ্জ আমাদের জীবনে।

আগস্ট, ১৯৬৮

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পীর সংকট দুটি চিঠি

এখন অত্যন্ত পুরনো ও বাঁধাধরা তর্কে পর্যবসিত হয়েছে, কিন্তু তবু গত কয়েক বছরের বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আমার বারে-বারেই মনে হয়েছে যে একেকটা সময় আসে যখন পুরনো প্রশ্নও নতুন উত্তর দাবি করে। শিল্পীর দায়িত্ব কী, প্রশ্নটা এতই ছোটো ও সামান্য— কিন্তু সর্বগ্রাসী। শিল্পের—এবং আরো জরুরি : শিল্পীর—সঙ্গে কী সম্বন্ধ রাজনীতির? নিশ্চয়ই কোনো সদুত্তর নেই। কারণ কোনো স্পর্শাতুর ব্যক্তিই কি এ-সম্বন্ধে সত্যি ক'রে মনঃস্থির করতে পারবেন? আমার, অন্তত, মনে হয় না। জানি, এখনো যাঁরা উনিশশতকি কলাকৈবল্যবাদের স্তাবক, তাঁদের মুখে এর উত্তর উঁচিয়ে আছে। তাঁদের একটা মস্ত সুবিধে এই যে তাঁরা যেভাবেই হোক একটা স্থির উত্তর পেয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা, যারা কস্মিনকালেও এই অস্থিরতা কাটাতে পারব বলে বোধ হয় না, আমরা কী করব? আগেকার মতো তেমন-কোনো মূল্যবোধ আমাদের নেই যেটা আঁকড়ে ধরে স্বস্তি পেতে পারি; একের পর এক স্তম্ভপাত হয়েছে—কোনো বিশেষ মতবাদ, কোনো বিশেষ ঈশ্বরে আমরা অনেকেই আর বিশ্বাস করি না। অথচ দেশ যখন আগুনে পোড়ে, জগৎ যখন অধঃপাতে

যায়, তখন নিশ্চিন্ত ও নির্বিকারভাবে শিল্পসাহিত্যের চর্চা করতেও বিবেকে বাধে। এই হাৎড়ানিটা সেই জন্যেই।

এই হাৎড়াতে গিয়েই প্রথমে চিঠি দুটো চোখে পড়ে। প্রথম চিঠির লেখক গোটফ্রীড বেন, কবি ও চিকিৎসক, রচনাকাল ১৯৩৩, রচনাস্থল নাৎসি-অধ্যুষিত জার্মানি। দ্বিতীয় চিঠির লেখক টমাস মান, ঔপন্যাসিক, রচনাকাল ১৯৪৫, জার্মানির পতনের পর, রচনাস্থল ক্যালিফর্নিয়ার উপকূল। অন্তর্বর্তী বারো বছরের ইতিহাস ভাবলেই আজ আমাদের গায়ে জ্বর আসে। অথচ সেই সময়ে, হিটলারের রাজত্বকালে ও তার অব্যবহিত পরে, প্রত্যেক জর্মন মনীষা নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটা নিয়েই ব্যাকুল ও বিপন্ন বোধ করেছিলেন—অন্তত যে-দুটি চিঠি আমরা এখানে পড়তে চাচ্ছি, তাতে তারই ইঙ্গিত আছে।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে জর্মন মনীষার যাবতীয় নিদর্শন আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। ছিল কড়া সেনসরশিপ, সব শৃগালের মুখে এক রব, অপপ্রচার···ইত্যাদি। সেই সময়ে তৎকালীন জার্মানির অনেকেই স্বদেশ ত্যাগ ক'রে বিদেশে পুনর্বাসন চাচ্ছিলেন—এই শরণার্থীদের মধ্যে ছিলেন হাইনরিখ ও টমাস মান, হেরমান হেসসে, বেরটোল্ট ব্রেখ্‌ট, লেওনার্ড ফ্রাঙ্ক, ফ্রিৎজ ফোন উনরু প্রমুখ। কিন্তু কেউ-কেউ স্বদেশ ত্যাগ ক'রে যেতে রাজি হন নি, গোটফ্রীড বেন তাঁদের অন্যতম। ক্লাউস মান[১] তখন ফরাসি রিভিয়েরার একটি ধীবরপল্লী থেকে গোটফ্রীড বেনকে একটি চিঠি লেখেন, বেন-এর খোলা চিঠি ছিল তারই উত্তর। ক্লাউস মান-এর পত্রটির অন্তত অংশবিশেষ এখানে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে বোধ হয়।

প্রিয় ডাক্তার বেন,

আপনার চিৎ-বৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত বলে, আপনার লেখার কোনো বিশ্বস্ত ও অকৃত্রিম অনুরাগী একটি কথা জিগেস করতে পারে কি?··· 'জর্মন ঘটনাবলি' সম্বন্ধে আপনার কী মনোভাব—এ-সম্বন্ধে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি এমন সব গুজব শুনেছি যা নিজেকে বিশ্বাস করাতে পারলে আমি একটা মোক্ষম নাড়া খেতুম। এ-সব জনরবকে আমি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে পারি নি; অথচ এখন আমি এটা অতি সত্যি-কথা বলেই জেনেছি যে আপনি—আমরা যাঁদের উপর আস্থা রেখেছিলুম, আপনিই তাঁদের মধ্যে 'একমাত্র' জর্মন লেখক, যিনি—এখনো আকাডেমিতে ইস্তফা দেন নি।···ওখানে আপনার সঙ্গী কারা? আপনার নাম আমাদের কাছে ছিল উচ্চমানের সমার্থক—তা মোটেই অন্ধতামস্র শুচিবাতিকের দৃষ্টান্ত ছিল না; সেই আপনি কিসের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে নিজেকে তাদের হাতেই সঁপে দিলেন, ভালো-মন্দ বিচার করার অক্ষমতা যাদের ইয়োরোপের ইতিহাসে অতুলনীয়, আর যাদের নৈতিক কদর্যতা দেখে সারা

জগৎ শঙ্কায় গুটিয়ে যাচ্ছে।···এর গর্হিত ও অসংগত একটি দলে কাকে আপনি বন্ধু পাবেন? ওখানে আপনাকে বোঝে কে? আমি জানি, আপনার তরুণ ভক্তরা আজ সকলেই পারি, ৎজুরিখ, আর প্রাহার সস্তা হোটেলে দিন কাটাচ্ছে – আর আপনি, যিনি তাদের আদর্শমূর্তি, ওই রাষ্ট্রের আকাডেমি সদস্যপদে দিব্যি বাহাল আছেন! না-হয় আপনি আপনার ভক্তদের সম্পর্কে নির্লিপ্তই থাকলেন, কিন্তু আপনার স্পর্শময় আগ্রহ-উদ্দীপনা যে-সব বস্তুর উপর পড়তো, তাদের অবস্থাটা একবার লক্ষ ক'রে দেখুন। হাইনরিখ মান[২], আপনি যাঁকে প্রায় পুজো করতেন, যে-সংগঠন থেকে ধিক্কারজনকভাবে বিতাড়িত হয়েছেন, আপনি স্বয়ং তাতে থেকে গেছেন। এই নতুন প্রভুরা দেশটাকে যে-পরিমাণে উচ্ছন্নে দিতে চাচ্ছেন, অনুপাতে ততটা না-হলেও আমার পিতা এ-দেশের জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠা কিঞ্চিৎ বাড়িয়েছিলেন, আর তাঁর কথা আপনি কথায়-কথায় উদ্ধার করতে ভালো-বাসতেন – সেই তিনি আজ যুযুৎসুদের একটি চাঁদমারি ভিন্ন আর-কিছুই নন। আপনার কাছে যাঁরা মূল্যবান বলে গণ্য হতেন, অন্যান্য দেশের সেই শ্রেষ্ঠ মনীষারাও এখন প্রতিবাদে প্রতিবাদে সোচ্চার। আঁদ্রে জিদ-এর কথাই ভাবুন – তিনি নিশ্চয়ই সেই অন্তঃসারশূন্য 'মার্কসবাদী'দের একজন নন, যারা আপনাকে অমন ক্ষুব্ধ করতো।

আর এখানেই বোধহয় আমরা বিনিশ্চায়ক প্রশ্নটায় এসে পড়লুম। জর্মন 'মার্কসবাদী' লেখকদের সম্বন্ধে আপনার বিরাগ আমি সব সময় কত ভালো ক'রে বুঝেছি – কতবার যে আপনার সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিরাগবোধের শরিকও হয়েছি।···এ-সব লোকের হাতে আমার মতো নির্যাতিতও আর-কেউই হয় নি। অথচ তবু, বহু বছর ধরে এটাই আমাকে এখন উৎকণ্ঠিত করছে যে এই সব স্থূলমুণ্ড জরদ্গবদের প্রতি অনীহাই আপনাকে – গোট-ফ্রীড বেনকে – তীব্রতর ও ক্রমবর্ধমান কোনো ভয়ংকর যুক্তিহীনতায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গেছে শুধুমাত্র বুদ্ধিজাত – আর, স্বীকার করি, এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাকেও প্রলুব্ধ করে – কিন্তু এর বিষম বিপদ-গুলো আন্দাজ ক'রে নিতে আমাকে বেগ পেতে হয় নি।···কেউ যদি শয়তানের মতো সজাগ না থাকে, তাহলে আজকাল প্রবল, যুক্তিবর্জিত সহমর্মিতা যে শেষটায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, এটা প্রায় প্রাকৃতিক বিধানে পরিণত হয়েছে। প্রথমে আসে 'সভ্যতা'র বিরুদ্ধে একটা মহান প্রতীকী হাতনাড়া – এই হাতনাড়া যে বুদ্ধিজীবীদের কাছে কত চিত্তাকর্ষক তা আমি জানি; তারপরে দেখা গেল আচম্বিতে পৌঁছে গেছেন শক্তিমদমত্ততায়, আর তারপরের ধাপই আডোলফ হিটলার।···আমার স্থান যে সত্যি কোথায়, তা আমি এখন জানি – আগের

চেয়ে আরো স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে জানি। কোনো মার্কসবাদী অশালীনতা আমাকে আর উত্ত্যক্ত করতে পারবে না। আমি জানি যে কোনো লোককে কাণ্ডজ্ঞানসম্বল হবার জন্য বা আত্মপীড়িত পশুত্বাচরণকে ঘৃণা করবার জন্য স্থূল 'জড়বাদী' হতে হয় না।

আমি যে কোনো ঢাকা না-রেখেই কথা বলেছি—এটা অশোভন; আবারও আপনার ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু আমি চাই যে আপনি জানুন আপনি সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তির একজন যাকে 'অপর পক্ষে' হারালে আমি—এবং আরো অনেকে—ভীষণ কষ্ট পাবো। আর এই মুহূর্তে যিনিই 'অপর পক্ষে'র সঙ্গে নিজের সমীকরণ করবেন, তিনিই চিরকালের জন্য আমাদের মধ্য থেকে সরে যাবেন। আপনি, বলাই বাহুল্য, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমাদের বদলে ও-দলে কী পাবেন—এবং ওখানে কী বিপুল বিনিময় আপনাকে নিবেদন করা হবে; আমি যদি অত্যন্ত বাজে প্রবক্তা না-হই, তাহলে তা পরিণামে অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্রূপ হতে বাধ্য। কারণ এখনো যদি কোনো-কোনো মহান মানবাত্মা না-জানেন তাঁদের সত্যিকার স্থান কোথায়, ওখানে ওরা ভালো করেই এটা জানে যে কে ওদের দলের নয়: মানবাত্মা।

যে-কোনো উত্তর পেলেই আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো।

ভবদীয়
ক্লাউস মান

ক্লাউস মান-এর এই স্পষ্টভাষী চিঠি কতগুলো ব্যাপারকে যে সোজাসুজি তুলে ধরেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যেমন, কোনো রাজনৈতিক সাহিত্যের যুক্তিহীন কুশ্রীতার উলটো জের হিসেবেই কি কারও পক্ষে বিপরীত দলে গিয়ে যোগ দেয়া উচিত? বা দলাদলি সাহিত্যের ও চিৎবৃত্তির অনুশীলনের পক্ষে অমঙ্গলকর, কিন্তু এই বোধ থেকে কি কারও একেবারে উলটো দলের সঙ্গে গিয়ে হাত মেলানো উচিত? বাংলাদেশে যে এ-রকম দুঃখজনক ডিগবাজি কখনো হয় নি, তা নয়। আজকের পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা কেবল বাক্‌ছল ছাড়া আর কিছুই নয়, এটা আমরা বুঝতে শিখেছি। অথচ ব্যক্তি হিসেবে, কেউ যদি নামগোত্রহীন হয়ে গিয়ে সমষ্টির একজন হয়ে পড়তে না-চান, কিংবা কারও যদি উলটো-সোজা কোনো বিশ্বাসও না-থাকে, তখন?

গোটফ্রীড বেন তাঁর খোলা চিঠি রচনার কালে ভেবেছিলেন যে তিনি রাজনৈতিক নোংরামির মধ্যে কোনোদিন নামবেন না, যেহেতু সেটা তাঁর সত্যি-কার স্থান নয়; সেই জন্যেই খোলাখুলি তিনি বলেছেন যে তিনি কোনো পার্টির সদস্য নন—হতেও চান না। কিন্তু নাৎসি-হিস্টিরিয়া থেকে বেরুবার চেষ্টা করেন নি বলে তাঁর পরিণাম হল মনস্তাপে ভরা। আর তাঁর খোলা

চিঠি থেকেই তাঁর ভুলগুলো আমাদের চোখে পড়ে যায়—অথচ তাঁর শুদ্ধতা থাকে তর্কাতীত। যাবতীয় জাগতিক সমস্যাকে, মানবিক সমস্যাকে কেবল আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করেছিলেন বলেই বোধহয় এটা ঘটেছিল। তাঁর চিঠিটির বয়ান এখানে তুলে দেয়াই ভালো—পাঠক নিজেই কতগুলো জিনিস স্পষ্টভাবে সেখানে দেখতে পাবেন।

গোটফ্রীড বেন-এর খোলা চিঠি (১৯৩৩)

মার্সেঈর আশপাশে কোথাও থেকে আপনি আমাকে লিখেছেন। লিয় উপসাগরের ছোটো-ছোটো বসতি, ৎজুরিখ, প্রাহা, আর পারির হোটেলগুলোয়—আপনি লিখেছেন—তরুণ জর্মনরা—যারা একদিন আমার ও আমার বইয়ের ভক্ত ছিল, আজ তারা উদ্বাস্তু; আপনি লিখেছেন, খবর-কাগজ পড়ে আপনাদের দেখতে হয় যে আমি নতুন রাষ্ট্রের ভাবে আছে বলে ঘোষণা করেছি, দেখতে হয় যে একে আমি সর্বসমক্ষে সমর্থন করি ও বাঁচাবার চেষ্টা করি, দেখতে হয় যে আকাডেমি সদস্য হিসেবে আমি এর সাংস্কৃতিক পরিকল্পনাগুলোয় কোনো প্রতিবাদ করি না। আপনি—সুহৃদ্ হিসেবে—তার কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন এবং বেশ কড়া ভাষায়। আপনি লিখছেন 'আপনার নাম আমাদের কাছে ছিল উচ্চমানের সমার্থক—তা মোটেই অন্ধতামিস্র শুচিবাতিকের দৃষ্টান্ত ছিল না—অথচ কীসের প্ররোচনায় আপনি আপনার নাম তাদের ব্যবহার করতে দিলেন, বাকি ইয়োরোপ যাদের একেবারে ত্যাগ করেছে? যে পুরনো বন্ধুদের আপনি হারাচ্ছেন তাদের বদলে আপনি কাদের পাবেন ওখানে? আপনাকে ওখানে কে বুঝতে পারবে? আপনি হলেন বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ সন্দেহভাজন—কেউ আপনাকে ওখানে স্বাগত জানাবে না।' আপনি আমাকে সাবধান করেছেন, হুঁশিশ চেয়েছেন সব-কিছুর, দাবি করেছেন সদুত্তর, বাক্‌ছল নয়: 'এই মুহূর্তে যিনি 'অপর পক্ষে' থেকে যাবেন, তিনি চিরকালের মতো আমাদের হারাবেন', এই কথা বলেছেন আপনি। তাহলে দয়া ক'রে আমার উত্তর শুনুন; বলাই বাহুল্য, এটা স্বার্থহীন, স্পষ্ট-ভাষণ।

এক, প্রথমেই আপনাকে বলা উচিত যে গত কয়েক সপ্তাহের অসংখ্য অভিজ্ঞতা আমাকে নিঃসংশয় করেছে যে জার্মানির ঘটনাগুলোকে যারা জার্মানিতে থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, কেবল তাঁদের সঙ্গেই কোনোরকম আলোচনা সম্ভব। যাঁরা এই মাসগুলোর অস্থিরতা ও উত্তেজনার মধ্যে সারাক্ষণ কাটিয়েছেন, যাঁরা একেবারে কাছে থেকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এই অস্থিরতা ও উত্তেজনা প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেছেন, কুচকাওয়াজ থেকে কুচকাওয়াজ, বেতার প্রচার থেকে বেতার প্রচারে, খবরের টুকরো থেকে খবরের টুকরোর মধ্য দিয়ে যাঁরা এই অস্থিরতা বোধ করেছেন,—এমন কি যাঁরা এ-সবকে পরমাহ্লাদে অভিনন্দন

জানান নি, বরং যা খেতে-খেতে সয়েছেন, কিন্তু কাছে ছিলেন – কেবল তাঁদের কাছেই সব কথা খুলে বলা যায় – কিন্তু যে-সব বাস্তুত্যাগী বিদেশে পালিয়ে গেছেন তাঁদের সঙ্গে নৈব নৈব চ। কারণ তাঁরা কাকে জনগণ বলে, এটা বোঝবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন জনগণের সব বোধ ও চেতনা থেকে তাঁরা আমূল বিচ্ছিন্ন – ধীরে-ধীরে জীবন্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে লোকের মধ্যে এই বোধ গজিয়েছে – চিন্তা হিসেবে নয়, নির্বস্তুক ভাবনা হিসেবে নয় – গজিয়েছে সংহত প্রাকৃতিক শক্তি হিসেবে। কাকে জাতীয়তাবাদ বলে তাকে দেখার সুযোগ তাঁরা হারিয়েছেন। যে-জাতীয়তাবাদকে আপনিও আপনার চিঠিতে তাকে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণ্যভাবে ব্যবহার করেছেন সেই জাতীয়তাবাদ তার নিজস্ব ধারার একটি অকৃত্রিম প্রাকৃতিক অবস্থা। অবয়বময়, মূর্তিময়, ইতিহাস কী ক'রে একটা ট্রাজিক কিন্তু নিয়তিনির্দিষ্ট রূপ নেয়, তার প্রক্রিয়াকে দেখবার সুযোগ হারিয়েছেন তাঁরা। এবং এখানে আমি ঘটনাগুলোর ক্রমকালো ও রমরমে দিকগুলোর কথা বলছি না, মশাল ও গানের বিশ্বধর্মী মোহসৃজনক্ষমতা সম্বন্ধে বলছি না – বলছি তার গভীর ও আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার কথা, তার সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতার কথা, যা এমনকি এই প্রাথমিক ও অস্থির পর্যবেক্ষকের কাছেও উদ্দীপক মানবিক রূপান্তর ঘটাতে চাচ্ছে।

একমাত্র এই কারণেই বোধহয় আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারবো না। কিন্তু আরেকটা সমস্যাতেও এসে এই অনুধাবনচেষ্টা হোঁচট খাবে – আপনাদের গোষ্ঠীর সঙ্গে অনেক বছর ধরেই একটা তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে মতভেদ ছিল, যেটা হঠাৎ এখন এমন হৃদয়হীনভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেকের কাছ থেকেই সোজাসুজি ও স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর চাচ্ছে। আমাদের আলোচনার সব চেয়ে ভালো দৃষ্টিকোণ হল 'বর্বরতা' কথাটাকে বিবেচনা ক'রে দেখা – যে-কথাটা আপনার চিঠিতে – ও আমার-কাছে-আসা আরো অনেক চিঠিতে – বারে-বারে ব্যবহৃত হয়েছে। আপনি ব্যাপারটাকে এমনভাবে দেখিয়েছেন যে জার্মানিতে এখন যা ঘটছে তা যেন সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ করতে চাচ্ছে, চাচ্ছে সভ্যতারই সর্বনাশ, যেন এক দঙ্গল বর্বর জমায়েৎ হয়ে মানবতার আদর্শকে প্রচণ্ড ও উপর্যুপরি আঘাত ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু উলটে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে দিন : ইতিহাসের প্রবাহকে আপনারা কীভাবে ন্যাখেন? তাকে কি ফরাসি দেশের সমুদ্রতীরের স্নানার্থীদের মতোই বিশেষভাবে সক্রিয় বলে ভাবেন? যেমন ধরুন, আপনারা দ্বাদশ শতাব্দীকে কী চোখে ন্যাখেন – রোমানেস্ক থেকে গথিক ধরনের জীবনে এসে পৌঁছাবার সেই জলন্ত দিনগুলোকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করেন আপনারা – এই রূপান্তর কি আলোচনানির্ভর ছিল? আপনি কি ভাবছেন যে যে-দেশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে আপনি চিঠি লিখছেন তার উত্তর ভাগে কেউ-একটা নতুন স্থাপত্যরীতি ভেবে ফেলেছে, বা গম্বুজ সম্বন্ধে 'মনস্থির' ক'রে ফেলেছে তা

বর্তুল হবে, না বহুভুজসম্বল হবে, না কি লোকে ভোট দিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছে যে এর পর থেকে সব খিলেন গোল বা ছুঁচলোভাবে বানানো হবে? আমার মনে হয় ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি উপন্যাসপ্রতিম ভাবনাগুলো ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসকে একেবারে আদিম ও আবেগতাড়িত একটা অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক বিকাশ বলে ভাবলে ভালো করবেন। তোষাখানায় দাখিল-করা একটি হিসেব খাতা—এইভাবে উনিশশতকি বুর্জোয়া মস্তিষ্কপ্রসূত সৃষ্টিরূপে ইতিহাসকে দেখা ছেড়ে দিলে আপনি জর্মন ঘটনাগুলোর কাছাকাছি আসতে পারবেন বলে মনে হয়—আপনার কাছে সে-চিন্তাধারার কোনো ঋণ নেই, কিন্তু আপনারা তো তার কাছে বিকিয়ে বসে আছেন। ইতিহাস ভারি অদ্ভুত বস্তু—সে না জানে আপনাদের গণতন্ত্র, না জানে আপনাদের কষ্ট ক'রে টিকিয়ে-রাখা যুক্তিবাদ; তার না আছে কোনো পূর্বকল্পিত পদ্ধতি, না আছে কোনো বিশেষ শৈলী—কেবল তার মোড়-ফেরার মুহূর্ত ও বাঁকগুলোয় জাতির অনবসাদ গর্ভ থেকে প্রসব ক'রে এক নতুন মানব জাতিরূপ নিজের পথ যাকে নিজেকেই লড়াই ক'রে নিতে হয়, যাকে উপার্জন ক'রে নিতে হয় তার নিজের যুগের ভাবনাকে, নিজেকে প্রবিষ্ট করাতে হয় সময়ের গ্রন্থনার মধ্যে—জীবনের বিধান যা দাবি করে সেই অটল কর্মোদ্যোগ, ও যন্ত্রণাই তার সর্বস্ব। এটা আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি—এবং মানুষকে আমি যেভাবে দেখি তাতে তা হয়তো আরো বেশি আধিবিদ্যক। আর সেখানেই আমরা আমাদের পুরনো বিরোধের একেবারে অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট হলুম—যখন আমি যুক্তি-হীনতার জন্য লড়াই করছি বলে আপনি আমাকে সোপর্দ করেছেন।

আপনার চিঠি অনুযায়ী ধাপগুলো এই রকম: 'প্রথমে কেউ যুক্তিহীনতার গুণগান করে, তারপরে বর্বরতার, আর তারপরেই ছ্যাখে যে আডোলফ হিটলারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।' এ-কথা আপনি এমন একটা সময়ে লিখেছেন যখন মানুষ সম্বন্ধে আপনাদের সুবিধাবাদী প্রগতিশীল ভাবনা দূরে-কাছে সবখানেই প্রকাশ্য দিবালোকে দেউলে হয়ে গিয়েছে; যখন এটা চারদিকেই স্বতঃপ্রমাণ হয়ে উঠেছে যে এটা একটা অন্তঃসারশূন্য, চপল, প্রমোদবিলাসী চিন্তাধারা, যখন এটা নিঃসংশয় যে মানব-ইতিহাসের কোনো সত্যিকার মহাযুগই কখনো মানবিক সারাৎসারকে যুক্তিহীনতা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে নি—কারণ যুক্তিহীনতা মানেই হল সৃষ্টিমুহূর্তের নিকটবর্তী ও সৃজনক্ষম। আপনাদের ওই লাতিন বেলাভূমিতে বসে আপনারা কি শেষ মুহূর্তেও অনুধাবন করবেন না যে জার্মানির ঘটনাগুলো মোটেই রাজনীতির হাতসাফাই নয়, যাকে হুমড়ে-মুচড়ে কথা বলে সুপরিজ্ঞাত দ্বন্দ্বমূলক ধরনে মেরে ফেলা যাবে—বরং জার্মানির ঘটনাগুলো হল নতুন এক জীববিদ্যা-সম্ভব জাতিরূপের উদ্ভব-ক্ষণ, ইতিহাসের একটা সম্ভাবনার স্ফূর্তি, নিজেকে উৎপন্ন করার জন্য জনগণের একটি উৎকাঙ্ক্ষা! এটা সত্যি যে এই প্রজননচিন্তার মধ্যকার

মানবরূপ তাকেই গণ্য করে যা যুক্তিবাদী হলেও, যেমন পৌরাণিক, তেমনি গভীর। এটাও সত্যি যে তার ভবিষ্যৎ ভাবা হচ্ছে প্রায় গুঁড়িশুদ্ধ ছেঁটে দিয়ে কলম ক'রে ফেলবার মতো ক'রে – কারণ মানুষ ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও প্রাচীন আর আলোকপ্রাপ্ত, যা বিশ্বাস করেছিল তার চেয়েও শ্রেণীবিমুক্ত। সত্যি যে তাকে প্রধানত প্রকৃতি হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে, সৃজনক্ষণের নিকটবর্তী বলে অনুভব করা হচ্ছে – কারণ এটা তো মানতেই হবে যে যতটা ভেবেছিলুম মানুষকে তার চেয়েও কম স্বাধীন বলে প্রত্যক্ষ করছি – অন্তত তথ্য ও সত্যের ২০০০ বছরের পুরনো দ্বন্দ্ব মনে রেখে তাকালে যা দেখাতো তার চেয়েও বেদনা-দায়কভাবে সে অস্তিত্বের মূলের সঙ্গে জড়ানো। আসলে সে হল শাশ্বত চতুর্থৌজী (quaternary) এমনকি অন্তিম তুষারযুগেও সে সুরম্যভাবে বয়ন ক'রে রেখেছিল দলবদ্ধভাবে ঘূর্ণ্যমান, মানবগোষ্ঠীর ইন্দ্রজাল, বিশ্বপ্লাবনকালীন চেতনার একটি গ্রন্থনা, 'টারশিয়ারি' যুগের টুকিটাকির সমষ্টি ; বস্তুত সে হল চিরকালীন আদি পরাদৃষ্টি : জাগরণ, জাগরজীবন, সত্তা – সংগোপন সৃষ্টিশীল উন্মাদনার শিথিলগ্রথিত ছন্দ। আপনারা যারা সভ্যতার শৌখিন বাবুমশাই, প্রতীচী প্রগতির চারণকবি, আপনারা কি শেষমুহূর্তেও এটা অনুধাবন করবেন না যে এখানে যা বিপন্ন সেটা কোনো সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র নয় – বরং মানুষজন্মের এক নতুন পরাদৃষ্টি – হয়তো তা প্রাচীনস্ত প্রাচীন, হয়তো তা শ্বেত জাতির শেষ 'জমকালো' চেতনা – সম্ভবত মহাজাগতিক ঐক্যচেতনার এটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুভূতি, গ্যেটের নিসর্গস্তোত্রে যার পূর্বাভাস ছিল ! এবং আপনারা কি এটাও মানবেন না যে কোনো সাফল্য, কোনো সাময়িক বা শিল্প সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া এই পরাদৃষ্টির কী নিয়তি তা স্থির করতে পারবে না। যদি প্রাচী ও প্রতীচী থেকে এই জর্মন জাতিকে চূর্ণ করার জন্য দশ-দশটা যুদ্ধ বেধে যায়, যদি তার শীলমোহর ভেঙে ফেলে জলেস্থলে আপকালিপসও আসন্ন হয়, তবু মানুষের এই পরাদৃষ্টি আমাদের থেকেই যাবে – এবং যিনি তা সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের স্তরে উন্নীত করাতে চাইবেন না তাঁকেই এর প্রজন্মিতা হতে হবে ; এবং এত বড় বিধিসংগত ঐতিহাসিক অস্তিত্বের কাছে সভ্যতা ও বর্বরতা সম্বন্ধে আপনার ভাষাতাত্ত্বিক তদন্ত শেষপর্যন্ত হাস্যকর হয়ে ওঠে।

কিন্তু দর্শন ছেড়ে দিয়ে আমরা বরং রাজনীতির দিকেই তাকাই পরাদৃষ্টি ত্যাগ ক'রে, বরং অভিজ্ঞতা ও বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াই। তথ্য হল আপনারা সৈকতে বসে আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ চাচ্ছেন কেন আমরা একটি রাষ্ট্র নির্মানের জন্য সহযোগিতা করছি, যে রাষ্ট্র তার বিশ্বাসে অটল, যার নিষ্ঠা অনুপ্রাণিত করে ; এবং যার আভ্যন্তরীণ ও বহির্পরিস্থিতি এতই ভীষণ যে তার নিয়তির কথা বর্ণনা করতে ঈলিয়াড-এর পর ঈলিয়াড, ঈনিদ-এর পর ঈনিদ লেগে যাবে। সব বৈদেশিক রাষ্ট্রের আগে আপনারা এই রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য যুদ্ধ,

ধ্বংস, বিনাশ ও সর্বনাশ চাচ্ছেন। যে-জাতির ভাষা আপনাদের মুখে, যার বিদ্যালয়ে আপনারা লেখাপড়া করেছেন, যার জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্পসাহিত্যের চর্চায় দ্বারা আপনাদের মনকে সমৃদ্ধ করেছেন, যার মুদ্রাযন্ত্র আপনাদের গ্রন্থ মুদ্রণ করেছে, যার মঞ্চ উপস্থাপিত করেছে আপনাদের নাট্যসৃষ্টি, যে-জাতি আপনাদের খ্যাতি ও সম্মান দিয়েছে, যে-দেশের লোক সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আপনাদের রচনাবলি পড়ুক বলে আপনারা কামনা করেন, সে-দেশে ও সে-জাতির মধ্যে আপনারা যদি থেকে যেতেন তবে এই সময়েও সে-দেশ আপনাদের বিশেষ ক্ষতি-সাধন করতো বলে মনে হয় না। কাজেই আপনারা তাকিয়ে আছেন সেই সমুদ্রের দিকে, যার ঢেউ আর জল আফ্রিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে—হয়তো কোনো মানোয়ারি জাহাজ নিগ্রো সেনাবাহিনী নিয়ে সেই সমুদ্রের কোথাও এখন বিচরণ করছে, কুখ্যাত ফরাসি *forces d'outremer* ৬০০০০০ ঔপনিবেশিক পলটনেরই হয়তো এক অংশ রয়েছে সেই জাহাজে যারা জার্মানির বিরুদ্ধে অভিযানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অন্যরা হয়তো তাকিয়ে আছেন আর্চ অভ ট্রায়াম্ফ বা ট্রাডকানি কাস্‌ল-এর দিকে, এ-দেশের উপর প্রতিহিংসা নেবে বলে বদ্ধ-পরিকর; কেন—না, যাকে একযোগে এই বিপুল বিদেশ আত্মিকভাবে কেবল শোষণ করেই এসেছে এই জার্মানি তার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করা ছাড়া যেহেতু আর-কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য গ্রহণ করে নি।

চিঠিতে আপনি লিখেছেন যে এখনই আপনি 'প্রকৃত মার্কসিস্ট' হয়েছেন—কিন্তু এখন 'অশালীন মার্কসবাদ' বা বস্তুবাদের কোনো নালিশ বা নিগ্রহই আপনাকে আমাদের 'স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণের' বিরুদ্ধে লড়াই করা থেকে বিরত করতে পারবে না; আরো: যে এখন আপনি পুরোপুরি 'মানবাত্মা'র পক্ষে এবং 'রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই কথাগুলোর দ্বারা আপনি যে কী বোঝাতে চাচ্ছেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—মনে হচ্ছে যেন ভূবিদ্যায় উল্লিখিত কোনো বহুপ্রাচীন যুগের কথা শুনছি; হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারি আপনাদের যে-দেশে মার্কসবাদ জিতে গেছে, আপনি সে-দেশের ২০০০০০০ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণের কথা বলছেন কি না। কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি আপনি সমাজবাদের কথা বলছেন, এবং, সত্যিই, গত কয়েক বছরে জর্মন শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ বর্তমানে প্রবাসী অগ্রণী জার্মানির চিন্তানায়কদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে—সবচেয়ে অকৃত্রিম ও স্পষ্টভাবে এবং বারে-বারে টমাস মান দ্বারা। এ-সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে জার্মানির শ্রমিকরা আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। আপনি জানেন চিকিৎসক হিসেবে আমাকে নানাস্তরের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়, সামাজিক বীমা চিকিৎসক হিসেবে বহু শ্রমিকের সঙ্গেও আমার চেনা আছে—প্রাক্তন কমিউনিস্ট ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরাও আমার পরিচিত। সন্দেহ নেই—যেহেতু

এদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই আমি নিজে শুনেছি – তারা আগেকার চেয়ে অনেক ভালো আছে। কারখানায় আগের চেয়ে ঢের ভালো ব্যবহার পায় তারা, সুপারভাইজাররা আরো সতর্ক, কর্তৃপক্ষ অনেক ভদ্র ; শ্রমিকদের ক্ষমতা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি, আগের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি সম্মান পায়, কাজ করে অনেক ভালো মেজাজে – সুনাগরিকের ভঙ্গিতে – এবং সোস্যালিস্ট পার্টি তাদের যা দিতে পারে নি এই জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ তাদের তা-ই দিয়েছে ; দিয়েছে জীবনের একটা অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্যময় চালনশক্তির বোধ। এটাও নিশ্চিত জানবেন এই নবীন শক্তি দ্বারা শ্রমবিজয়ের অভিযান চলবেই, কারণ জর্মন জাতীয়তাবাদী সংঘ কোনো ক্ষণস্থায়ী, আগুনশ্বাসী অর্ধসিংহ অর্ধছাগ কল্পনা নয়, আর পয়লা মে তারিখটা পুঁজিবাদীদের কোনো ছদ্মবেশী ধূর্তকৌশল বা ধাপ্পা নয়। জানেন না এটা কত বড় দাগ কেটেছে, কী বিপুল এর অকৃত্রিমতা, হঠাৎ কাঁধের জোয়াল সরিয়ে ফেলেছে শ্রমিক, গত দশকগুলোয় সর্বহারাদের দুঃখযন্ত্রণার যে শান্তিমূলক বৈশিষ্ট্য ছিল – আচম্বিতে তা সরে গেছে এখন। তার বদলে বরং এই নতুন চেতনা দাঁড়িয়ে আছে একটি নবগঠিত শ্রেণীবিলোপকারী গোষ্ঠীর একেবারে বুনিয়াদের উপর। কয়েক দশক ধরে ইয়োরোপে সমাজবাদের যে-হাওয়া উঠেছিল, এই ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ সেই চেতনার একটা স্পষ্ট, নবীন ও সতেজ চেহারা নিয়েছে। মানবাধিকারের অন্তত একটি অংশকে এই বছর নতুনভাবে ঘোষণা করেছে ; আর আপনার 'রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া' কথাটার অর্থ যদি কোনোভাবে এই হয় যে আপনি শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থের জন্য লড়তে চাচ্ছেন, তাহলে আপনার উচিত এই নতুন রাষ্ট্রে এসে যোগ দেয়া – একে অবমানিত করা নয়।

সব শেষে অবিশ্যি আপনি ব্যক্তি হিসেবে আমাকেও সম্বোধন করেছেন। আমাকে প্রশ্ন করেছেন, সাবধান করেছেন, ভাষা সম্বন্ধে আমার মৌলিক ধারণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্ধানী জিজ্ঞাসা উপস্থিত করেছেন – যে-মৌল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অপর পক্ষের ঠাট্টা-টিটকিরি আর-কিছুই জুটবে না ; এবং আরো জিজ্ঞেস করেছেন যে এই মুহূর্তে 'আপনাদের দলে' আছেন এ-রকম ক-জন সাহিত্যস্রষ্টা সম্বন্ধে আমার কতটুকু শ্রদ্ধা আছে। এই আমার উত্তর : আলেমান ভাষায় যাঁকেই আমার আদর্শ ও শিক্ষণীয় বলে বোধ হয়েছে, তাঁকেই আমি চিরকাল শ্রদ্ধা ক'রে যাবো ; এমনকি লুগানো ও লিগুরিয়ান সমুদ্রের জলে ডুবতে ডুবতেও তাঁকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করবো। কিন্তু আমি, ব্যক্তিগতভাবে, এই নতুন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজেকে যুক্ত করেছি, কেননা যেহেতু আমারই দেশের মানুষ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি কে, যে নিজেকে তাদের ভাগ্য থেকে আলাদা ক'রে নেব ? আমি কি বেশি জানি তাদের চেয়ে ? না। আমি কেবল আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করতে পারি, কোন পথে

গেলে ভালো হয় বলে দিতে পারি ; আমি যদি হেরেও যাই, আমার সব চেষ্টাই যদি ব্যর্থ হয়, তবুও এরা আমারই দেশের মানুষ থেকে যাবে। আর দেশের মানুষ মানে অনেকখানি। আমার মেধা ও আর্থনীতিক অস্তিত্ব, আমার ভাষা, আমার জীবন, আমার যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক, আমার মস্তিষ্কের সমস্ত যোগ-ফল—সব আমি দেশের মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি। এই জনগণেই খুঁজে পাই আমাদের পুর্বপুরুষদের ; জনগণের মধ্যেই ফিরে যায় আমাদের শিশুরা। আর আমি গ্রামাঞ্চলে প্রকৃতির কোলে বড় হতে হতে জেনেছি—এবং এখনো জানি—'স্বদেশ' বলতে সত্যি কী বোঝায়। বড় নগর, শিল্পায়ন, বুদ্ধির চর্চা—সময় আমার চিন্তার উপর যত ছায়াই ফ্যালে, আমার কাজের মধ্য দিয়ে শতাব্দীর যত শক্তির সঙ্গে আমাকে মুখোমুখি হতে হয়েছে—সব সত্ত্বেও তেমন মুহূর্ত মাঝে-মাঝে আসে যখন এই যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবন কোথায় মিলিয়ে যায়, শুধু থাকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ক্ষতুর দল, মাটি পৃথিবী, সরল শাদাশিধে কথার টুকরো : মানুষ, জনগণ। আপনার মতে সারা পৃথিবী যাকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না, তারই সেবায় সেই জন্যই আমি নিজেকে নিয়োগ করেছি। আর, এই ইয়োরোপ ! তার বড়-বড় অনেক মূল্যবোধ থাকতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে সে উৎকোচ দিতে পারে না বা গুলি মেরে চুপ করিয়ে দিতে পারে না, সেখানে তার চেহারা, সত্যিই, করুণা জাগায়। এখন সে আপনাদের কানে মন্ত্র দিচ্ছে যে হিটলার-এর পিছনে জনগণ নেই, আছে কেবল তার 'ভেড়ার পাল'—এই সেদিনও নিউজ ক্রনিক্‌ল-এ লেডি অক্সফর্ড যে-কথা লিখেছেন। মস্ত ভুল ! জনগণই এরা ! হিটলার আর নাপোলিয়ঁ—এই দুই বিরাট ব্যক্তিত্বকে একবার তুলনা ক'রে দেখুন। সন্দেহ নেই নাপোলিয়ঁ ছিলেন একটি অসামান্য প্রতিভা—ফরাসিরা দেশসুদ্ধ জনগণসুদ্ধু পিরামিড জয় করতে বেরোয় নি, তারা যে পলটনে পলটনে সারা ইওরোপ ছেয়ে ফেলেছিলো, তার কারণ অন্য কিছু নয়, কেবল সেই বিশাল সামরিক প্রতিভাই তাদের চালিত করেছিলেন। কিন্তু এখানে আজ আপনি বারে-বারে প্রশ্নটা মাথা চুলকে দেখতে পাবেন : হিটলারই আন্দোলনের স্রষ্টা, না কি তিনি আন্দোলনের সৃষ্টি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন—কারণ এই থেকেই বোঝা যায় উভয়কে মোটেই ভিন্ন ক'রে দেখা যায় না—তারা অভেদ্য। এখানেই আমরা সত্যি ক'রে পাই ব্যক্তি আর সমষ্টির সেই ঐন্দ্রজালিক সমাপতন, বুর্খার্ট তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের নিরীক্ষায় বিশ্ব-ইতিহাসের প্রবাহের মধ্যে জগতের বিপুল ব্যক্তিত্বগুলির উপর যেটা আরোপ করেছেন। জগতের বিপুল ব্যক্তিত্ব—সব এখানে দেখা যাবে : জন্মমুহূর্তের ঝড়-ঝাপটা, কেবল ভীষণ সময়েই প্রায় সর্বদা তাঁদের আবির্ভাব ; সেই প্রচণ্ড সহ্যশক্তি ; এমনকি জৈব দিকগুলি সব বৃত্তিরই এক অন্যভাবী উপযোগিতা ; কিন্তু শুধু তা-ই নয়, এখানকার তাবৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির এই ধারণা যে এখানেই কেবল সেই ব্যক্তি আছেন, যিনি সমস্ত আবশ্যিককেই পূরণ করতে পারবেন এবং যা কিনা

শুধু তাঁরই দ্বারা সম্ভব। আমি যা বলছি, শুনে রাখুন : আপনি এবং সব চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে চিন্তাশক্তিকেই আমি সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিই। 'চিন্তার দ্বারা যা স্বীকার্য নয়, তাকে তত্ত্বগত সম্মতি দিতে অস্বীকার করা একটা প্রচণ্ড ও প্রশংসনীয় জেদের পরিচায়ক' — হেগেল-এর এই কথাগুলো দিয়েই আমি সব সময় আমার রাজনৈতিক আবেগকে যাচাই ক'রে দেখেছি। সেইজন্যই, নিজেকে প্রতারিত না-ক'রে, বিশ্বাস করুন যে ইয়োরোপ আপনার কানে-কানে যা-ই বলুক, এই আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানুষ, যারা শান্তি ভালোবাসে, কাজ করতে উৎসুক, এবং দরকার হলে ধ্বংস হয়ে যেতেও প্রস্তুত।

এমন-কিছু দিয়ে আমার কথা শেষ করছি যা আপনি দেশান্তরে — যদি এতদূর অবধি পড়ে থাকেন — নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন আমি পার্টিতে নাম লেখাই নি, পার্টির নেতাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, এবং নতুন বন্ধুদের উপর আমি মোটেই নির্ভর করি না। আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে আমারই অন্ধতামস শুচিবাতিক, আমারই চিন্তা ও অনুভূতির শুষ্কতা, যার কথা আপনার পত্রে উল্লেখ ক'রে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। যাঁরাই ইতিহাস নিয়ে ভেবেছেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই আপনি এরই বনিয়াদ দেখতে পাবেন। একজন বলেছেন, 'বিশ্ব-ইতিহাস মোটেই সুখের ক্ষেত্র নয়' (ফিশ্‌টে); আরেকজন : 'ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা সর্বাধিকসম্ভব গোষ্ঠীসুখের কথা চিন্তা না-করেই সব জাতি যেন কতগুলো অলঙ্ঘ্যনীয় প্রবণতাকে সামনে তুলে ধরে' (বুর্খার্ট); তৃতীয় একজন : 'মানুষের ক্রমবর্ধমান ব্যক্তীকরণই তাকে বলিষ্ঠতম কোনো জাতির প্রজননবিষয়ে ভাবাচ্ছে।' এবং : 'কোনো শ্রেষ্ঠ জাতির উদ্ভব হতে পারে কেবল ভীষণ ও সংক্ষুব্ধ সূচনা থেকেই। সমস্যা : বিংশ শতাব্দীর সেই বর্বরেরা কোথায়' (নিট্‌শে)। ব্যক্তিবাদী ও উদারনৈতিক যুগ এ-সব কথা সযত্নে তুলে রেখেছিল; তা ছাড়া ধীশক্তি ও মেধা দিয়ে একে দাবি হিসেবে [illegible] করা ও এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রত্যক্ষ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিপত্তি জেগে ওঠে আচম্বিতে, অতর্কিতে আঁটো হয়ে ওঠে সংঘ ও সম্প্রদায়, আর সবাইকেই, সাহিত্যিকদের সুদ্ধ, ঠায় দাঁড়িয়ে বেছে নিতে হয় কী তিনি নেবেন — ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি, নাকি রাষ্ট্রাভিমুখী গতিপথ। আমি বেছে নিয়েছি শেষেরটাই — এবং এই রাষ্ট্রের জন্যই যদি আপনি আপনার সিন্ধু-তীর থেকে বিদায় জানান, তাহলে তা আমি গ্রহণ করতে বাধ্য।

বেন-এর এই চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ক্লাউস মান-এর কতগুলো কথা তিনি সঠিক ধরতে পারেন নি। কারণ ক্লাউস মান লিখেছিলেন : 'জর্মন লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 'মার্কসবাদী' শ্রেণীর প্রতি আপনার ঘৃণা কত ভালো ক'রে আমি বুঝতে পেরেছিলুম — কতবার আমি নিজেই তা আপনার সঙ্গে-সঙ্গে ভাগ ক'রে

নিয়ে বোধ করেছি ! কী দুর্বুদ্ধিপূর্ণ নির্বুদ্ধিতা এঁদের···সমাজতন্ত্রঘটিত উপকরণ দিয়ে এঁরা কিনা কবিতাকে বিচার করতে চান ! কাউকে পীড়িত করার পক্ষে তা-ই ছিল যথেষ্ট—আর এঁদের হাতে আমার মতো নির্যাতিত ও নিপীড়িত আর-কেউই হন নি··· ।' ক্লাউস মান কেবল বলতে চেয়েছিলেন যে নাৎসিবাদকে আলিঙ্গন করার জন্য সেটা কোনো কারণই নয় 'আগে জানতুম না, কিন্তু এখন স্পষ্ট ক'রে জানি আমার সত্যিকার স্থান কোথায়। কোনো মার্কসবাদী অশ্লীলতাই আর আমাকে উদ্ভ্রান্ত করতে পারবে না। কারণ আমি জানি যে কাণ্ডজ্ঞান যাকে সমর্থন করে তাকে আকাঙ্ক্ষা করার জন্য আর মনপ্রাণ দিয়ে কোনো স্নায়ুতাড়িত পশুত্বাচরণকে ঘৃণা করবার জন্য কাউকে কোনো স্থূল 'জড়বাদী' হতে হয় না।' এই কথাগুলো সত্ত্বেও বেন ভেবেছিলেন ক্লাউস মান বুঝি কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। কিন্তু ক্লাউস মান যার উপর জোর দিয়েছিলেন সেটা কাণ্ডজ্ঞান, যুক্তিবোধ—কোনো মতবাদের প্রতি অন্ধ ও জড় আনুগত্য নয়।

আরো কতগুলো দিক লক্ষ করা যেতে পারে। মনে করার কোনো কারণ সেই যে বেন ছিলেন অপোগণ্ড নিঃসাড় মানুষ—তাঁর কবিতা ও রচনাবলি তার উলটো সাক্ষী দেয়। এই তীব্র চিঠি থেকেই বোঝা যাবে হিটলারকে তাঁর মনে হয়েছিল জর্মন জাতির ত্রাণকর্তা। শুধু তাঁর নয়, তৎকালীন অনেক শিল্পীর। ভিলহেল্ম ফুর্টভ্যাঙলার, যিনি ছিলেন জার্মানির সিমফনি-আর্কেস্ট্রার সবচেয়ে বড় নির্দেশক, তিনি নাৎসিবাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ-কালের সেরা 'কমপোজার' বা সংগীত-রচয়িতা রিখার্ড ষ্ট্রাউস নাৎসি-বর্বরতার সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। গেরার্ট হাউপ্টমান, আধুনিক নাটকের স্রষ্টাদের মধ্যে যিনি শীর্ষস্থানীয়, তিনিও তৎকালে জর্মন শাসকদের তাঁবেদারি করেছিলেন। জার্মানির সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা ও পরিচালক গুস্টাফ গ্রয়ণ্ডগেন্স, 'ম্যাটিনি-আইডল' হেরনের ক্রাউস, সবচেয়ে প্রিয় নক্ষত্র এমিল ইয়ানিঙস্—এঁরা প্রত্যেকে তা-ই করেছিলেন। হাউপ্টমান নিজে তো একদা ছিলেন মার্কসবাদেরই সমর্থক—তাঁর এই ডিগবাজি সবচেয়ে বিস্ময়কর। সবাই ধাপ্পায় ভুলেছিলেন ? কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সোজা ? তাহলে বেন-এর এই মন্ত্রমুগ্ধ, স্বার্থহীন, আবেগপ্লুত ও তীব্র চিঠিটিকেও আমাদের ধাপ্পা বলে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ইতিহাস অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে এটা মোটেই ধাপ্পা ছিল না—বা তাঁরা ধাপ্পায় ভোলেন নি। বরং, সত্যি ক'রে বলা ভালো, তাঁরা ভুল করেছিলেন। বেন-এর আত্মচরিত 'দুই জীবন'-এ তারই স্বীকৃতি লক্ষণীয়। বেন নাৎসি ছিলেন না। কোনোদিন পার্টিতে নাম লেখান নি, যতদূর জানা যায় স্বপ্নেও পার্টিতে যোগদান করার কথা ভাবেন নি, ১৯৩৩-এ যখন প্রতিটি জর্মন দশ মিনিট অন্তর নিজেদের নাৎসি বলে ঘোষণা করতো, তখনও না—তবে কেন এই 'নতুন রাষ্ট্রের' জন্য তাঁর ঐকান্তিক ঘোষণা। তাঁর বন্ধুরা বলেন বামপন্থী সাহিত্যিকদের সাফল্য ও প্রভাবের

সেটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বেন চিরকালই, জার্মানির চরম দুঃখের দিনেও, সাফল্য ও অবস্থিতির দিকে ফিরে তাকান নি। খানিকটা মারটিন লুথারের ভঙ্গি বোধ হয় 'ইখ্ কান্ নিখ্ট আনডেরস'—'আমি অন্য রকম করতে পারতুম না' ছিলেন লুথারীয় পাদ্রির ছেলে, লুথারেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় না কি তাঁর কথায়, যখন ক্লাউস মানকে তিনি বলেন : 'আমারই দেশের মানুষ এই অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন আমি কে, যে নিজেকে তাদের ভাগ্য থেকে আলাদা ক'রে নেবো? আমি কি বেশি জানি তাদের চেয়ে? না। আমি কেবল আমার সর্বশক্তি দিয়ে তাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করতে পারি, কোন পথে গেলে ভালো হয় বলে দিতে পারি···দেশের মানুষ মানে অনেকখানি···ইয়োরোপ আপনার কানে কানে বলে দিয়ে যাচ্ছে জনগণ হিটলারের পিছনে নেই···মস্ত ভুল!···এই আন্দোলনের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে সমগ্র মানুষ—এমনকি পিষে মরার জন্যও তারা প্রস্তুত···।' আর এই জন্যই, দেশের চরমতম দুর্দিনে, বেন সম্ভবত স্বদেশ ত্যাগ করতে পারেন নি।

এই চিঠি গোব্বেল নানাভাবে সম্প্রচার করলেন, বারে-বারে বেতারে তা শোনানো হল—এমনকি বেন যখন শিল্পীসত্তার জন্য নাৎসিদের হাতে নির্যাতিতও হচ্ছেন, তখনও।

এবং এইভাবেই কেটে গেলো বারো বছর।

বেরলিনের পতনের পর জর্মন কবিতা-আকাডেমির প্রাক্তন সভাপতি হ্বালটের ফোন মোলো—তিনি নিজে একজন মাঝারি পর্যায়ের কবি—ক্যালিফর্নিয়ার উপকূলে পত্রযোগে টমাস মানকে স্বদেশে ফেরবার জন্য আবেদন জানালেন। উত্তরে মান যা লিখেছিলেন, এই দ্বিতীয় ঐতিহাসিক চিঠিটি তাই। নিচে তার সম্পূর্ণ বয়ান প্রকাশ করা হল।

টমাস মান-এর খোলা চিঠি (১৯৪৫)

প্রিয় হের ফোন মোলো,

আমার জন্মদিনে আপনি যে প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, তার জন্য—এবং জার্মানির খবর-কাগজে প্রকাশিত আমার উদ্দেশ্যে লেখা খোলা চিঠির জন্যও—আপনাকে ধন্যবাদ জানাই; আপনার সেই খোলা চিঠি মারকিন কাগজগুলোতেও অংশত পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ওই খোলা চিঠিতে আপনি অত্যন্ত জোরালো ও জরুরিভাবে এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যে আমি যেন আবার জার্মানিতে ফিরে গিয়ে বসবাস করি, যেন 'বুদ্ধি পরামর্শ দিই ও কাজ করি'—প্রায় যেন একটা আনুষ্ঠানিক দাবিই করেছেন আপনি এই মর্মে। আপনি যে একাই আমাকে এই আবেদন করেছেন, তা নয়, শুনেছি, রুশ-নিয়ন্ত্রিত বেরলিন-বেতার ও জার্মানির সংযুক্ত গণতান্ত্রিক দলগুলির সরকারি মুখপত্রও নাকি সেই আবেদনই

জানিয়েছে ; 'জার্মানিতে আমার নাকি একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পন্ন করার আছে'—এ-রকম একটি বেশ অতিরঞ্জিত মস্ত উদ্দেশ্য চাপিয়ে তাঁরা যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কেবল আমার বইগুলোই নয়, ব্যক্তি ও মানুষ হিসেবে আমাকেও যে জার্মানি ফিরে চাচ্ছে এতে আমার সত্যি খুশি হওয়া উচিত। অথচ আমার যেন মনে হয় এ-সব আবেদনের মধ্যে কেমন একটা অস্থির-করা অস্বস্তিকর দিকও আছে—কী-একটা আছে যা যুক্তিহীন, অসংগত ও কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। প্রিয় হের ফোন মোলো, আপনি তো খুব ভালো করেই জানেন যে আমার দুর্ভাগা দেশের মানুষ নিজেদের উপর যে-আশাভরসাহীন দুর্বিপাক ডেকে এনেছে, তাতে ওই 'বুদ্ধিদান ও কর্মোদ্যোগ' ব্যাপারটার দাম আজ খুব চড়া। এই বিপন্ন সময়ে যার বুকের পেশি অবশেষে এই বুড়ো হাড়ে দাবি জানিয়েছে, তার পক্ষে সশরীরে ও ব্যক্তিগতভাবে আপনার দ্বারা স্পর্শাতুরভাবে বর্ণিত, ওই অসাড় ও পঙ্গু মানবতার মধ্যে, উপস্থিত থেকে তার কিছু করতে পারবেন কি না সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সেটা মূল কথা নয়। আমার ধারণা, আমার ফিরে যাবার পথে বাস্তব, সামাজিক ও নৈতিক বাধাগুলির কথা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিচার ক'রে দেখা হয় নি।

এই বারো বছর, ও তার বিষময় পরিণামকে কি শ্লেটের গা থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়? যেন কোনো উৎপাতই ঘটে নি, এই ভঙ্গি ক'রে সত্যি কোনো কাজ আমরা করতে পারবো কি? আমার অভ্যস্ত জীবনযাত্রা ১৯৩৩-এ যে-ধাক্কা খেয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও শ্বাসরোধকারী—সব কদর্য ঘটনা, সব নির্বাসন ও বিতাড়ন, সব বহিষ্কারের মধ্যেও আমার বাড়িঘর, দেশ, বই, স্মারক-চিহ্ন, সম্পত্তি সব আমার সঙ্গেই থেকে গিয়েছে। আমার হ্বাগনার প্রবন্ধের বিরুদ্ধে ম্যানখেন-এ বেতারে ও খবর-কাগজে সুপরিকল্পিতভাবে যে-অশিক্ষিত, অশ্লীল ও জিঘাংসাপ্রণোদিত প্রচার চালানো হয়েছিল, তা আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আর সেটাই আমাকে প্রথম বুঝতে বাধ্য করেছিল যে ফেরার পথ রুদ্ধ ; আত্মপ্রকাশের জন্য আমার সংগ্রাম, আমার লেখার চেষ্টা, উত্তর দেবার চেষ্টা, নিজেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা—সব ব্যর্থ হয়েছিল ; আমার হারানো বন্ধুদের একজন—রেনে শিকেল—এই কণ্ঠরোধী একা বাণীগুলোকে 'তিমিরাচ্ছন্ন পত্রগুচ্ছ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তার পরে যা ঘটেছিল, তাও ছিল বেশ কঠিন ; দেশ-দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণ ভবঘুরে জীবনে, ছাড়পত্র ও কাগজ-পত্রের উদ্বেগ, হোটেলে-হোটেলে যাযাবর অস্তিত্ব, আর এরই মধ্যে রোজ, সারাক্ষণ, লজ্জা ও ধিক্কারের একের পর এক কাহিনী কানে এসে পৌঁছাতো—বর্বরযুগে ফিরে গেল আমার স্বদেশ, হারিয়ে গেল, একেবারে অচেনা হয়ে গেল। আপনারা যাঁরা তখন গোয়েবেলসের নির্দেশে 'দৈবের দান ফ্যুরের'-এর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য

প্রকাশ করছিলেন (জঘন্য, জঘন্য এই বিহ্বল প্রচার) – তাঁরা কেউ এ-সবের মধ্য দিয়ে যান নি। আমি ভুলি নি যে আপনারা আরো ভয়ংকর-কিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, আমি যার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলুম ; কিন্তু আপনি তো নির্বাসনের এই শ্বাসকষ্ট টের পান নি, আপনি তো টের পান নি সেই শিকড়-ওপড়ানো স্নায়ু-কাঁপানো ভয়, বাড়ি না-থাকার ভয়।

মাঝে-মাঝে আমার মন বিদ্রোহ করেছে, বিশেষত যখন ভাবতুম আপনারা কী-সব সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন। এর ভিতর আমি দেখেছিলুম ঐক্যবোধের প্রত্যাখ্যান। যদি সেই সময় জার্মানির বুদ্ধিজীবী – যাঁদের নাম আছে, যাঁরা ছিলেন জগৎবিখ্যাত – প্রতিটি চিকিৎসক, গায়ক, শিক্ষক, লেখক ও শিল্পী এই পরম অবমাননার বিরুদ্ধে একটি আর্ত মানুষের মতো উঠে দাঁড়াতেন, যদি ঘোষণা করতেন এক সাধারণ ধর্মঘট – তবে হয়তো ঘটনার স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতো। কিন্তু যিহুদি না-হলেই ব্যক্তিমানুষ সব সময়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে প্রলুব্ধ হতেন 'কেন ? অন্য-সবাই তো সহযোগিতা করছে। নিশ্চয়ই যতটা মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ততটা খারাপ নয়।'

বলেছি যে আমি মাঝে-মাঝে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ বোধ করতুম। কিন্তু, জানবেন, কোনোদিনই আমি আপনাদের ঈর্ষা করি নি – আপনারা যাঁরা জার্মানিতে থেকে গিয়েছিলেন, আপনাদের চরম সাফল্যের দিনেও আপনাদের আমি ঈর্ষা করি নি। কারণ আমি খুব ভালো করেই জানতুম যে এই তথাকথিত মহান দিনগুলো কেবল রক্তের বুদ্বুদ ছাড়া আর-কিছু নয়, এবং এই বুদ্বুদও যে অচিরেই ফেটে যাবে, তাও আমার জানা ছিল। আমি ঈর্ষা করতুম হেরমান হেসসেকে – যাঁর সঙ্গে প্রথম সপ্তাহ ও মাসগুলোয় আমি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলুম, যাঁর সঙ্গে থাকলে আমি সাহস ও সান্ত্বনা পেতুম। আমি তাঁকে ঈর্ষা করতুম, কারণ তিনি অনেকদিন স্বাধীন ছিলেন। এমন-এক ভিত্তিতে তিনি অনেক আগেই নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন, যা ছিল সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত : 'জর্মনরা যে মহান ও প্রতিপত্তিশালী জাতি, তা কে অস্বীকার করছে ? পৃথিবীর অভিজাতদের দেশ ? হবেও বা, কিন্তু রাজনৈতিক জাতি হিসেবে তারা একেবারেই অসম্ভব। সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে আমি কস্মিনকালেও কোনো সম্বন্ধ রাখতে চাই না।' দিব্যি নিরাপদে তিনি থাকতেন তাঁর মোনটাগনোলার বাড়িতে আর তাঁর অন্যমনস্ক অতিথিদের নিয়ে বাগানের মধ্যে 'বোচ্চিয়া' খেলতেন।

ধীরে-ধীরে, আবার আমার জীবনে সুস্থিরতা এলো। আমি গুছিয়ে বসলুম। প্রথমে বাসা বাঁধলুম ফরাসিদেশে, পরে সুইটজারলাণ্ডে – ছিলুম সর্বস্বান্ত ও সম্পূর্ণ বিমূঢ়, ক্রমে ফিরে এলো কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্থিতাবস্থা, ফিরে এলো কোথাও যে 'আছি' তার বোধ, বসবাসের প্রশান্তি। আবার হাতে তুলে নিলুম পরিত্যক্ত কাজ, এক সময়ে ভেবেছিলুম এ-সব কাজের কোনো মানেই নেই, পৃথিবীতে তাদের

অস্তিত্ব আছে কিনা তাই সন্দেহ হয়েছিল একসময়। স্যুইটজারলাণ্ড ঐতিহ্যগত-ভাবেই অতিথিবৎসল, কিন্তু প্রবলতর প্রতিবেশিদের ভীতিপ্রদ চাপে সবসময় মার খায়, আর তাদের নিরপেক্ষতার বন্ধন প্রায় যেন নৈতিক বন্ধনে পৌঁছেছিল। ফলে এটা বেশ সুবোধ্য কেন সে সবসময় সংকুচিত লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন ছিল— কারণ কাগজপত্রহীন অতিথিটি তার নিজের দেশের সরকারের সঙ্গে এমন এক জঘন্য সম্পর্ক পাতিয়ে বসে আছে সেক্ষেত্রে সতর্ক ব্যবহার ছিল অত্যাবশ্যক। তারপরেই অবিশ্যি মারকিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ এলো, আর আচম্বিতে এই বিপুল মুক্ত দেশ— যেখানে আর সন্তর্পণ ব্যবহারের প্রশ্ন নেই, সেখানে— সব কিছু মুক্ত, নির্বাধ ও প্রাণখোলা বন্ধুতায় ভরা। সেখানে মূলমন্ত্র ছিল : 'ধন্যবাদ হিটলার সাহেব।' প্রিয় হের ফোন মোলো, এই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে আমার এবং সেই সঙ্গে দায়িত্ব আছে সেই কৃতজ্ঞতা প্রমাণ করার।

আর আমি মারকিন নাগরিক জার্মানির ভীষণ পতন হবার অনেক আগেই আমি প্রকাশ্যে ও অন্তরঙ্গভাবে ঘোষণা করেছিলুম যে কোনোকালেই আমার মারকিন মুলুক ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে নেই। আমার ছেলেমেয়েরা— আমার দুই ছেলে এখন মারকিন পলটনে আছে— এই দেশের মাটিতে আত্মস্থ। আমার নাতি-নাতনিরা আমার আশপাশে ইংরেজি ভাষাতেই মানুষ হচ্ছে। আমিও নানাভাবে এ-দেশে নোঙরবদ্ধ, এবং এদিকে-ওদিকে আমার কতগুলো অবৈতনিক দায়িত্বও আছে— ওয়াশিংটনের প্রতি আছে, এ-দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি আছে— তাঁরা আমাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছেন। আমার বাড়ি বানিয়েছি এই সুন্দর সমুদ্রতীরের দিকে— যে-তীর তাকিয়ে আছে দূর-কালের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে— আর শক্তি, সুবুদ্ধি, প্রাচুর্য আর শান্তির এই আবহাওয়ার মধ্যে তারই একটি অংশ হিসেবে এই আশ্রয়ের মধ্যে আমার জীবনের সাধনায় ছেদ পড়ুক, এটাই আমি চাই। খোলাখুলি বলি আপনাকে : নিয়তির চক্রে আমি যেটুকু সুযোগসুবিধে পেয়েছি, সেগুলি আমি কেন গ্রহণ করবো না? বিশেষত যখন এত তিক্ততা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে? আমি বুঝতেই পারি না জর্মন জাতির কোন সেবা আমি করতে পারবো, যা এই ক্যালিফরনিয়ার উপকূল থেকে করা সম্ভব নয়।

যা-কিছু ঘটেছে, যেমনভাবে ঘটেছে, তা নিশ্চয়ই আমার কৃতকর্ম নয়। জর্মন চরিত্রেরই অনিবার্য ফল ওটা— জর্মন জাতির নিয়তি— এত বৈচিত্র্যময় যে-জাতি, যে-জাতি প্রায় ট্রাজেডির মতো রহস্যময়, তার আরো-বেশি সহিষ্ণুতা থাকা উচিত। এটা মেনে নিয়েই সবকিছুর ফলাফল নির্ণয় করতে হবে আমাদের, সবকিছুকেই সাধারণ বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না : 'ফিরে এসো, সব ক্ষমা করা হয়ে গেছে,' এ-রকম একটা কথা বলে সব ঝেড়ে ফেলা যায় না। ধর্মকথা বলা

আমার ধাত নয়। বাইরে, বিদেশে বসে, ধর্মের পথ অনুসরণ করা আর হিটলার সম্বন্ধে সব বলে ফেলা খুবই সহজ ছিল আমাদের পক্ষে। আমি কারু উদ্দেশেই ঢিল ছুঁড়তে চাই না। আমি লোকটা এমনিতে একটু চাপা, লাজুক, ছোটদের মতোই 'অচেনাকে ভয়' পাই। হ্যাঁ – জার্মানি এতদিনে আমার কাছে একেবারে বিদেশ হয়ে গেছে। ও একটা ভয়ংকর দেশ, মানতেই হবে। সত্যি ক'রে বলি, আমি জার্মানির ধ্বংসস্তূপকে ভয় পাই – ধ্বংসস্তূপ – পাথরের আর মানুষের, সবকিছুর। আর আমার ভয় : যে-লোক স্যাবাথ-এর ভাইনিদের দিকে বাইরে থেকে তাকিয়েছে আর আপনারা যাঁরা ভাইনিদের সঙ্গে নৃত্য করেছেন এবং প্রভু যুবিয়ানের ধামা ধরেছেন – এ-দুয়ের মধ্যে মেলবার সূত্র কিছুই নেই। আমি যে নাড়া খাই নি, তা নয় – জার্মানি থেকে রোজ যে-সব লম্বা-লম্বা চিঠি আছে, দীর্ঘদিন-চাপা-দিয়ে-রাখা-প্রীতিতে ভরা একেকটা চিঠি, তখন নাড়া না-খেয়ে পারি কীভাবে? হৃদয়ের এই টানাপোড়েন খাঁটি এবং মর্মস্পর্শী, সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আনন্দ অনেকটাই কমে যায় যখন ভাবি যে হিটলার জিতে গেলে এরা কেউই আমাকে চিঠি লিখতেন না। অধিকন্তু, এ-সব চিঠির লেখকরা বড়ই ভোঁতা আর সরল – এই জন্যই তাঁরা অমন চট ক'রে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলেন, যেন এই বারো বছরের (নাৎসি-শাসনের এই এক যুগের) কোনো অস্তিত্বই ছিল না। বইও পাঠানো হয় আমাকে। সত্যি বলবো? তাদের দিকে তাকাতেই আমার ইচ্ছে করে না, প্রায় তক্ষুনি আমি তাদের পাশে সরিয়ে রাখি। হয়তো এটা কুসংস্কার, কিন্তু আমার মতে, ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে জার্মানিতে যে-সব বই ছাপা হয়েছিল, সে-সব অপাঠ্য জঞ্জাল স্পর্শেরও অযোগ্য। রক্তের ছিটে আর লজ্জার গন্ধ লেগে আছে তাদের গায়ে ; এ-সব ধ্বংস ক'রে ফেলা উচিত।

জার্মানিতে তখন যা ঘটছিল, তার মধ্যে বসে সংস্কৃতি 'ফলানো' নিষিদ্ধ ও অসম্ভব ছিল। তার মানে ছিল একটাই : সব কুকর্ম ও অপজন্মকে প্রশ্রয়দান। যে-সব যন্ত্রণা অনবরত ও অবিশ্রাম সহ্য করেছি, তার একটা এই বোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছিল যে চূড়ান্ত অধঃপাত ও দুরাচারিতার বর্ম ও রক্ষাকর্তা হিসেবেই জর্মন আত্মা ও শিল্প তখন নিজেকে উপস্থাপিত করছিল। এটা একেবারে কল্পনাতীত ঠেকে যে হিটলারের Bayreuth-এর জন্য জাগনার মুকসজ্জার সৃষ্টি করা ছাড়া আর-কোনো সম্মানজনক সৃষ্টিকর্ম খুঁজে পাওয়া যায় নি। এটাকে চরম অনুভূতিহীনতা বলে মনে হয়। জর্মন রাইখ-এর জন্য চতুর সব বক্তৃতা মুখস্থ ক'রে গোব্‌বেলসের অনুমতি নিয়ে হাওয়ানা বা অন্য-কোনো ইয়োরোপীয় দেশে গিয়ে 'কুলটুরপ্রপাগাণ্ডা'র উন্নতিসাধন করা – আমি বলি না যে এ না-ক'রে কোনো উপায় ছিল, হয়তো না-করলে তিরস্কার ও শাস্তিও পেতে হতো ; আমি শুধু বলতে চাই যে আমি তা মোটেই বুঝতে পারি না।

আর সেইসব লোকদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে ভাবতেই আমার গায়ে জ্বর আসে।

বেটোফেন বাজাবার জন্ম হিটলার-কর্তৃক ৎজুরিখ, পারি বা বুডাপেস্ট-এ প্রেরিত কোনো সংগীতনির্দেশক সেইজন্যই এই অশ্লীল ও জঘন্য মিথ্যাচারের জন্য দায়ী, যেহেতু তাঁর ছল ছিল তিনি একজন সংগীতশিল্পী এবং শুধু সংগীতই তাঁর বিবেচ্য বিষয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, স্বদেশেই তখন তাঁর সংগীত মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। বেটোফেনের 'ফিডেলিয়ো' – যে-অপেরা ছিল জার্মানির মুক্তি উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত – যে কী ক'রে ওই বারো বছরে জার্মানিতে নিষিদ্ধ হয় নি, তাই এক তাজ্জব কাণ্ড! এটা যে নিষিদ্ধ হয় নি, তা-ই ছিল ধিক্কারজনক ও কেলেঙ্কারির একশেষ – তার উপর তার যে অতি পরিমার্জিত অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল, এবং তাতে গলা মেলাবার জন্য গায়ক পাওয়া গিয়েছিল, বাজাবার জন্য মিলেছিল যন্ত্রশিল্পী, আর লোক জুটেছিল শোনবার জন্য – এ-সব তথ্য আমার মধ্যে একটা ভয়ংকরজনক অনুভূতি জাগায়। কারণ হিমলারের জার্মানিতে বসে-বসে – দু-হাতে মুখ ঢেকে হল থেকে বেরিয়ে না-গিয়েও – 'ফিডেলিয়ো' শোনবার মতো চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

আমার বিদেশ-হয়ে-যাওয়া, অচেনা-হয়ে যাওয়া মাতৃভূমি থেকে মারকিন সার্জেন্ট আর লিউটেনান্টরা কত চিঠিই এনে দিয়েছেন আমাকে; কেবল যে নামজাদা লোকের চিঠি তা নয়, পাদাশিধে মানুষ, তরুণ যুবক সকলেই আমাকে লিখেছেন – আর, আশ্চর্য, এদের কোনোটাতেই আমাকে এক্ষুনি জার্মানিতে ফিরে যাবার জন্য উপরোধ করা হয় নি। 'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন,' সে-সব চিঠির সোজা বয়ান, 'বাকি জীবনটা আপনার নবার্জিত সুখী স্বদেশেই কাটিয়ে দিন! এখানে জীবন দুঃখে ভরা···' শুধু দুঃখে ভরা? হায়রে, যদি তা-ই হতো! কিন্তু আছে অপরিহার্য পাপ ও শত্রুতার অবিরাম প্রবাহ। একজন উচ্চপদস্থ নাৎসি অধ্যাপক এবং 'ডক্টর অনরিস কজা' দ্বারা প্রকাশিত একটা কাগজের পুরনো সংখ্যা (ফোল্‌ক্ ইম ভেরডেন, মার্চ ১৯৩৭, হানজেয়াটিশে ফেরলাগসান-স্টান্‌ট্. হামবুর্গ) পুরস্কার হিসেবে একজন মারকিন আমাকে পাঠিয়েছেন। অধ্যাপকটির নাম KRIEG নয়, Krieck – বানানে 'CK' আছে। পড়তে গিয়ে আতঙ্ক হচ্ছিল। বারো বছর ধরে এই ঝাঁঝালো আরক যাদের গেলানো হয়েছে, তাদের জীবন কিছুতেই আর সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারে না। 'সন্দেহ নেই, সেখানে তোমার অনেক নবীন-প্রবীন সৎ ও বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন,' আমি মনে-মনে বলি, 'কিন্তু ঝোপে-ঝোপে নেকড়েও তো আছে কত – গুপ্ত শত্রু; ছেয়ে গেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু অথম বলেই আরো ভয়ংকর ও বিষঢালা!'

এবং তবু, তৎসত্ত্বেও, প্রিয় হের ফোন মোলো, আপনি জানবেন এ-সবই হল কেবল একদিক। আরেকটা দিকও শোনা দরকার। যে-গভীর কৌতূহল ও

উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাওয়া জার্মানির বার্তার জন্য আমি অপেক্ষা করি এবং আমার কাছে তার যে-বৃহত্তর আবশ্যিকতা আছে বলে অনুভব করি, জার্মানির শোচনীয় ও অপ্রয়োজনীয় নিয়তি সম্বন্ধে উদাসীন বিশ্বের আর-কোনো অঞ্চলের বার্তার জন্যই আমার সে-অপেক্ষা বা আকুলতা নেই। আর এই উৎকণ্ঠা ও কৌতূহলই রোজ আমাকে নতুন ক'রে বোঝায় যে সব সত্ত্বেও এক অবর্ণনীয় বন্ধনসূত্রে আমি সেই দেশের সঙ্গে যুক্ত, যে-দেশ একদিন আমার নাগরিকতা হরণ করেছিল। একজন মারকিন বিশ্বনাগরিক? ভালো কথা। কিন্তু এই সত্য আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না যে এই বৈদেশিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে আমার সার্থক অনুরাগ সত্ত্বেও আমার শিকড় রয়েছে সেখানে—সব সত্ত্বেও আমি বেঁচে আছি ও সৃষ্টি করি জর্মন ঐতিহ্যেই, যদিও সমকাল আমাকে বহু ক্ষেত্রেই যা-কিছু জর্মন তার একটা দূরবর্তী প্রতিধ্বনি ও অসুস্থ প্যারডি ছাড়া আর-কিছুই রচনা করতে দেয় নি।

জর্মন লেখক ছাড়া আর-কোনোভাবেই আমি নিজেকে ভাবতে পারি না—কোনদিনই পারবো না; এমনকি আমার রচনা যখন কেবল ইংরেজি তরজমাতেই টিকে ছিল, তখনও আমি আলেমান ভাষার প্রতি বিশ্বস্ত ও বলংবদ ছিলুম—তার কারণ শুধু এটাই নয় যে তখন ভাষা পাল্টাবার পক্ষে আমি বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছিলুম, তার প্রধান কারণ এটাই ছিল যে আমার রচনার সামান্য যা-কিছু মূল্য ও স্থান, তা আছে শুধু জর্মন সাহিত্যেরই ইতিহাসে। জার্মানির নিবিড়তম তমসায় বসে আমি রচনা করেছিলুম গোটের উপর একটি উপন্যাস[৩], যার কয়েক কপি লুকিয়ে-চুরিয়ে চোরাই পথে জার্মানিতে গিয়ে পৌঁছেছিল—সেটা কেবলমাত্র বিস্মৃতি, বর্জন বা আমাকে তাড়িয়ে দেবার দলিল নয়। এবং আপনাকে বোধহয় বলার দরকার নেই: দেখুন, আমি আমার শান্তির দিনগুলোর জন্য বড্ড অনুতপ্ত—আপনাদের সঙ্গে থেকে সব যন্ত্রণা ও মনস্তাপ সহ্য করা আমার পক্ষে ঢের মূল্যবান হতো!' জার্মানি আমাকে কোনো দিনই শান্তিতে থাকতে দেয় নি। আমি 'আপনাদের সঙ্গেই যন্ত্রণা ও মনস্তাপ সয়েছি।' এটা জানবেন যে বোন-এর চিঠিতে আমি যখন উৎকণ্ঠায় ছিঁড়ে যাবার কথা লিখেছিলুম, যখন যন্ত্রণা, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার কথা লিখেছিলুম, তখন এক বর্ণও বাড়িয়ে বলি নি—'যা থেকে, চার বছর ধরে, এক ঘণ্টার জন্যও আমার জীবন মুক্ত ছিল না এবং যার বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল কাজ চালাবার জন্য রোজ আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে!' মাঝে-মাঝে এমনকি কোনো দোটানাও ছিল না। জার্মানির উদ্দেশে কাকুতিমিনতিতে ভরা যে-পঞ্চাশ বা ততোধিক বেতার ভাষণ প্রচার করেছিলুম—যা এখন সুইডেনে ছাপা হচ্ছে—তারাই সাক্ষী দেবে যে সবসময়েই 'শিল্পকলা' বা আর্ট ছাড়াও অন্য-কিছু আমার কাছে অত্যন্ত জরুরি ও অব্যবহিত বলে মনে হয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে 'জার্মানি' ও জর্মন জাতি' সম্বন্ধে একটা ভাষণ দিয়েছিলুম। লিখেছিলুম আলেমান ভাষাতেই, লেখাটা 'নয়ে রুণ্ডশাউ'-র ('৪৫-এর জুন মাসে যার পুনর্জন্ম হয়েছে) আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এ-সব জার্মানিতে ঘটলো কেন ও কীভাবে সম্ভব হল—ভাষণটায় মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষিত মারকিনদের শুধু তা-ই দেখবার চেষ্টা ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যেভাবে তাঁরা আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন, তাতে তাঁদের নীরব ঔৎসুক্যের প্রশংসা না-করে আমি পারি না। দৃষ্টিকটু ক্ষমাপ্রার্থনা ও ততোধিক দৃষ্টিকটু দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা—এই দুয়ের মধ্যে আমার পথ খুঁজে পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু কোনোক্রমে ব্যাপারটা সামলেছিলুম। প্রায়ই যে পৃথিবীতে অমঙ্গলের মধ্যে থেকে মঙ্গল বেরিয়ে আসে, এই দিবা তথ্যের সঙ্গে-সঙ্গে এই শয়তানি-তথ্যের কথাও আমি বলেছিলুম যে মাঝে-মাঝে শুভবোধের মধ্যে থেকেও গজিয়ে ওঠে পাপ। আমি সংক্ষেপে জর্মন আত্মার কাহিনী শুনিয়েছিলুম তাঁদের। 'আসলে জার্মানি দুটো আছে, একটা সৎ আর অপরটি অসৎ'—এই তত্ত্বের আমি প্রতিবাদ করেছিলুম। অসৎ জার্মানি হচ্ছে—আমি বলেছিলুম—সেই সৎ জার্মানি যে ব্যর্থ হয়েছে, যে পাপবোধে পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত; অসৎ জার্মানি হচ্ছে সৎ জার্মানিরই অমঙ্গলদীর্ণ অধঃপতিত রূপ। বলেছিলুম যে, আমি আত্মশ্লাঘা করার জন্য এ-কথা বলছি না—আত্মপ্রশংসার জঘন্য রীতি অনুযায়ী সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, মহান ও শুভ্রবসন জার্মানির প্রতিনিধি হিসেবে এ-কথা বলছি না। শ্রোতাদের যা বলতে চাচ্ছিলুম, তার কিছুই বহিরাগত কোনো ঠাণ্ডা হিম নিরপেক্ষ প্রজ্ঞা থেকে উত্থিত হয় নি। তার প্রতিটি কথা ছিল আমারই কথা—আমারই অস্তিত্বের মর্মমূল থেকে উত্থিত—এ-সবই ছিল আমার নিজের অভিজ্ঞতার অংশ।

হয়তো যাকে বলে নিশ্ছিদ্র ঐক্যের ঘোষণা, এটা তাই: কিন্তু এই মুহূর্তে এই ঘোষণা করা ছিল সবচেয়ে কঠিন। জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের সঙ্গে আমি একাত্মবোধ করি নি, আমি নিজেকে এক ক'রে দেখিয়েছিলুম সেই জার্মানির সঙ্গে যে-প্রলুব্ধ জার্মানি শেষপর্যন্ত শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করেছিল। জার্মানির ঐতিহ্যের মধ্যেই শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করার একটা গভীর প্রলোভন রয়ে গেছে, এবং গত কয়েক বছরের যন্ত্রণার উপর গড়ে-ওঠা কোনো আলেমান উপন্যাসে[৪] এই ভীষণ চুক্তিকেই বিষয় করে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু আমাদের মহত্তম কাব্যবাণীতে[৫] শয়তান শেষপর্যন্ত ঠকে গিয়েছিল—এমনকি ফাউস্টের ব্যক্তিসত্তাকেও সে হারিয়ে বসেছিল; এবং আমরা এই ভাবনাকে যেন সজোরে প্রত্যাখ্যান করি যে এবারই শেষবারের মতো জার্মানি শয়তানের কবলিত হল, ঐশী করুণা আরো-উঁচু বিধান—পৃথিবীর যে-কোনো রক্তে-লেখা

চুক্তির চেয়েও মহান। আমি ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস করি, আমি আস্থা রাখি জার্মানির ভবিষ্যতের উপর বর্তমান মুহূর্তকে যত হতাশ মরীয়া ও অসহায়ই ঠেকুক না কেন, ধ্বংসস্তূপকে যত হতাশ্বাসই মনে হোক না কেন, আমরা যেন কিছুতেই না বলি যে জর্মন ইতিহাসের শেষ হয়ে গেছে। জার্মানি যেন কিছুতেই সেই ক্ষুদ্র ও তামসকাহিনীর সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে না-দেখে যার নাম আডোলফ হিটলার। প্রুশো-জর্মন রাইখ-এর বিসমার্কীয় যুগের সঙ্গে যেন তাকে এক ক'রে না দেখা হয়, যার নিজের আয়ুষ্কাল ছিল অতি অল্প। এবং মহান হেভেরিকের যুগের দুই শতাব্দীর সঙ্গেও যেন তাকে একীভূত ক'রে না-দেখা হয়। জার্মানি কেবল নতুন আকার, নতুন অবয়ব নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে এখন, যার করতে চাচ্ছে জীবনের একটা নবীন ভঙ্গি – যা হয়তো রূপান্তর ও সন্ধিক্ষণের প্রথম দুর্দশা কেটে গেলে প্রকৃত সুখসম্মানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, হয়ত জাতির গভীরতম প্রবণতা ও প্রয়োজনের সঙ্গে আগের চেয়েও সৃষ্টিশীল-ভাবে সাধিত হবে তার সংগতি।

এখানেই কি বিশ্ব-ইতিহাসের শেষ হয়ে গেল বলে ভাবছেন? আমরা এখন বিশ্ব-ইতিহাসের সবচেয়ে সক্রিয় যুগে আছি – আর জার্মানির ভবিষ্যৎও তারই সঙ্গে জড়ানো। অনবচ্ছিন্ন চলেছে ক্ষমতার লড়াই, আর তা-ই আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছে যে আমরা যেন অতিরিক্ত-কিছু প্রত্যাশা না-করি। কিন্তু তার মধ্যে এই আশাও কি নেই যে সব বেদনা মনস্তাপ ও বাধ্যতা – অনিশ্চিত-ভাবে হলেও – এমন-এক বিশ্বপরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হবে যেখানে উনিশ শতকি জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ কালক্রমে একদিন সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবে? একটি বিশ্ব-আর্থনীতিক ব্যবস্থা, জাতীয় ভেদ-চালিত সীমার ক্রমক্ষীণতা, রাষ্ট্র হিসেবে প্রত্যেকটির কিয়ৎপরিমাণ 'রাজনীতিদাসত্ব অস্বীকার,' ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এক অকপট ঐক্যচেতনায় মানবজাতির জাগরণ – একটিমাত্র বিশ্বরাষ্ট্রের চেতনার পশ্চাদ্বর্তী যে প্রথম মানবিক চিন্তাধারা – বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেতনার চেয়ে বহু অগ্রবর্তী এতসব 'সমাজবাদী মানবতা' এবং আমাদের কালের যা মহত্তম চিন্তাসূত্র – তা কী ক'রে জর্মন আত্মার কাছে বৈদেশিক ও বিসংগত, এবং সেইজন্যই প্রতিবাদযোগ্য, ঠেকতে পারে? জার্মানির বহির্বিশ্ব বিষয়ে আতঙ্কের মধ্যেই ছিল বড্ড বেশি বিশ্ববোধ। কে একে অস্বীকার করতে পারবেন যে এই একাকিত্বের পিছনে – যে-একাকিত্বের জন্য দায়ী তার সব দুষ্ক্রিয়া – আছে ভালো-বাসবার ও ভালোবাসা পাবার উৎকাঙ্ক্ষা। জার্মানিকে মিথ্যাগর্ব, বিদ্বেষবোধ ও অহংবোধ ত্যাগ করতে দাও, আবার সে ফিরে পাক তার ভালোবাসা, তখন সবাই তাকে ভালবাসবে। কারণ, সব সত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে জার্মান জাতির প্রাচুর্য ও মূল্যবোধ অসামান্য – জার্মানি এমন এক দেশ যে তার জনগণের ক্ষমতায় ও জগতের সাহায্যের উপর আস্থা রাখতে পারে, এবং যার কাছে এই

সাম্প্রতিক দুঃসময় কেটে গেলেই সফল কীর্তি ও বিপুল সম্মানে ভরা এক নবজন্ম আসবে।

প্রিয় হের ফোন মোলো, এই চিঠিতে আমি অনেকটা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছি। অবশ্য জার্মানির উদ্দেশে লেখা কোনো চিঠিতে অনেক কথা না-পেড়েও কোনো উপায় নেই। আমি কেবল আরেকটা কথা বলতে চাই। মারকিনদেশে আমার আরামে-ভরা অলসজীবন সত্ত্বেও এ-স্বপ্ন আমার দিনরাত্রির সর্বক্ষণের, যে পায়ের তলায় অনুভব করছি পুরনো মহাদেশের মাটি। যখন সময় হবে—যদি আমি বেঁচে থাকি এবং যাতায়াতব্যবস্থার ও কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র মেলে—আমি ফিরে যাবার আশা রাখি। একবার ফিরে গেলে—বহিরাগত বোধ করার ভয় ও অনুভূতি, যা এই বারো বছরে গড়ে উঠেছে—বোধহয় সেই টানকে ঠেকাতে পারবে না যার পিছনে আছে হাজার বছরের স্মৃতি। সেইজন্যই, যদি ঈশ্বর করেন, 'আউফ্ ভিডের জেহেন'—পুনর্দর্শনায় চ।

এই চিঠিকে ভুল বোঝার অনেক কারণ ছিল জার্মানির—এবং তৎকালীন জার্মানিতে একটি বিপুল জনমত মান-এর প্রতি কটূক্তি ও ধিক্কারে ভরে গিয়েছিল। কেননা যে-বারো বছরের বিভীষিকা জার্মানি তখন ভুলে যেতে চাচ্ছিলো, মান কেবল তাকেই খুঁচিয়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু এ-ছাড়াও এখানে কতগুলো ব্যর্থহীন কথা আছে, যা কলাকৈবল্যবাদী বা শুচিবাতিকগ্রস্তদের মনঃপুত হবার কথা নয়। যেমন মান কল্পনাই করতে পারেন নি কী ক'রে তখন জার্মানিতে বেটোফেনের মুক্তিপিপাসু অপেরা 'ফিডেলিয়ো'র অত্যন্ত 'সফিস্টিকেটেড' অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল ও শ্রোতা জুটেছিল। তার কাছে পুরো শিল্পচর্চার প্রহসনটাই ঠেকেছিল ধিক্কারজনক। মান যে বারে-বারে বেতারভাষণে জর্মন জনগণকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন, 'জার্মানি, শোন' গ্রন্থে যে-ভাষণগুলো পরে সংকলিত হয়েছিল, তা, মান বলেছেন, তাঁর সেই বোধেরই সাক্ষী যা বোঝাবে যে আর্টের চেয়েও জরুরি ও অব্যবহিত কোনো-কিছু পৃথিবীতে আছে বলে তিনি ভাবতেন। জানি, এই কথা অনেকের পক্ষেই অরুচিকর ঠেকবে—বরং মানুষের দুর্দশার সঙ্গে শিল্পের ও শিল্পীর কোনো সংস্রবই নেই, এই কথা বললেই অনেকের পক্ষেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচার কারণ হয়, তবু তাঁরা যেহেতু কথায়-কথায় বহুবার মান-এর নামে কলা-কৈবল্যবাদের প্রচারকর্ম চালিয়েছেন সেইজন্য এখানে এই চিঠি আদ্যোপান্ত উদ্ধার করা জরুরি বলে মনে হল। এই চিঠির জন্য অনবরত মান-এর বিরুদ্ধে যখন আরেক দফা অপপ্রচার চলেছিল, তখন বাধ্য হয়ে মান-কে বেতার মারফৎ নিজের বক্তব্য আরো আঁটো ক'রে ও সোজাসুজি প্রকাশ করতে হয়। মান-এর সেই বেতারভাষণও এখানে শোনা যাক—এই জন্যই শোনা যাক যে মান এই

শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ মণীষা, যিনি বহুবার ব্যক্তি ও সভ্যতার ভাঙনকে নিজের রচনার বিষয় করেছেন।

টমাস মানের বেতার ভাষণ (১৯৪৫)

…ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত এবং উত্তরকালই বলবে যে তা যুক্তিযুক্ত ছিল।

দেখে মনে হচ্ছে, জার্মানিতে থেকে যেমন, না-থেকেও তেমনি কেউ সোহংবাদের পরিচয় দিতে পারে। মারকিন সাংবাদিকদের কাছে সাক্ষাৎকারে জগতের প্রমোদ বিতরণের জন্য রিখার্ড স্ট্রাউস যে-পর্বতপ্রতিম নিঃসাড়তার পরিচয় দিয়েছেন, আমি তা থেকে অনেক দূরে বাস করি। শয়তানের বরপুত্র যে জাতীয়তাবাদী সমাজবাদ, তা আমাকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে – জীবনে এই প্রথমবার আমি ঘৃণা করতে শিখলুম – অকৃত্রিম, গভীর, অকথ্য ও মারাত্মক এক ঘৃণা – এমন এক ঘৃণা যা আমি আধিদৈবিকভাবে অনুভব করি, এবং তা যে ঘটনাস্রোতের উপর কোনো প্রভাব ফেলে নি, তা নয়। একেবারে প্রথম দিন থেকেই আমি এই অমঙ্গলের পতন ঘটাবার জন্য চেষ্টা ক'রে এসেছি – কেবল যে জার্মানির উদ্দেশে প্রচারিত আমার বেতারভাষণের মধ্য দিয়ে, তা নয়; আর এই আপদের হাত থেকে জর্মন জাতি যাতে নিজেরাই নিজেদেরই উদ্ধার করে, আমার ভাষণগুলির মধ্যে ছিল তারই একমাত্র অকপট আবেদন। কিন্তু, অন্য-সবকিছুর সঙ্গে-সঙ্গে আমার সেই ভাষণের পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেন আপনারা? যে আমাকে বলবামাত্র আমি ফিরে আসবো? আর কখন বলা হচ্ছে? যখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরা! কীভাবে যে বছরের পর বছর সুইট্‌জারল্যাণ্ডের অতিথি হিসেবে কাটাতে কাটাতে আমি তার স্বপ্ন দেখেছি, বাড়ি ফেরার প্রত্যাশা করেছি – কী গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমি প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি চিহ্ন গ্রহণ করেছি, আর ভেবেছি বুঝি অবশেষে জার্মানির অধঃপাত ও ভিমরতি কেটে গেল! নিজেকে মুক্ত করবার ভার যদি জার্মানিরই থাকতো, তাহলে সবকিছু কেমন ভিন্নরকম হতো! যদি ১৯৩৩ থেকে '৩৯-এর মধ্যে আপনাদের মধ্যে মুক্তিবিপ্লব ফেটে পড়ত, আপনারা কি ভাবছেন যে আমি তক্ষুনি প্রথম স্বদেশগামী ট্রেনে চেপে বসতুম না!

তা হয়নি, হতে পারেনি! অসম্ভব ছিল – প্রতিটি জর্মন বলছেন এ-কথা – আর আমার নিশ্চয়ই সে-কথা বিশ্বাস করা উচিত। এটা হতেই পারে যে সাত কোটি অতি সুসভ্য ব্যক্তি, কতগুলো পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে, ছ-বছরের জন্য একটা রক্তাপ্লুত বর্বরতার রাজত্বকালকে মেনে না নিয়ে পারে নি – হতেই পারে যে যেটা আত্মার অন্তঃস্তলে অরুচিকর ঠেকছিল এবং যাকে চূড়ান্ত উন্মত্ততা

বলে জেনেছিল, সেই যুদ্ধে সেই বর্বরতাকে অনুসরণ না ক'রে কোনো উপায় ছিল না! এবং এই একই মানুষ—সেই সাত কোটি মানুষই—আরো ছ-বছর ধরে তার চূড়ান্ত করেছে, কাজে খাটিয়েছে তার উদ্ভাবনীশক্তি, সাহস, বুদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ, সামরিক ক্ষমতা—তার সমস্ত, যাতে সেই বর্বর রাজত্বকাল জিতে যায় এবং অমরত্বকে স্পর্শ করে। তা-ই ছিল নিয়তিনির্দিষ্ট, আর আমার মতো লোকের কাকুতিমিনতি তাই একেবারে নিষ্ফল হয়েছিল। 'আভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের' একজন সদস্য, ফ্র্যাঙ্ক টিস বলে একজন লেখক বলছেন, 'অন্ধরা শুনতে চাচ্ছিল না, আর জ্ঞানবৃদ্ধরা মুখের কথা খসাবার আগেই সব সময় এক পা এগিয়ে যাচ্ছিলেন'—বলেছেন অবশ্যি একেবারে শেষের দিকে। এই ছিল জার্মানির অবস্থা। সারা ইয়োরোপকে সে নির্যাতিত করেছে, আর অবশিষ্ট পৃথিবীর একাধিক ছিন্নভিন্ন হৃদয় সেই সময় আমার এই অকেজো ভাষণায় সান্ত্বনা পেয়েছে—কাজেই আমার কোনো খেদ নেই। কিন্তু, জার্মানির কাছে আমার এই সব আবেদন-নিবেদন যতই অর্থহীন ঠেকুক না কেন, তা নিশ্চয়ই আমার জার্মানিতে ফিরে যাবার বাধ্যতামূলক কারণ হতে পারে না। 'আপনি, মশাই, ভান করছেন যেন জর্মন জাতির আধ্যাত্মিক নেতা,' এই তো বলা হচ্ছে ওখানে, 'তা বেশ, আসুন, এই জনগণের মধ্যে বাস করুন, বাঁচুন। কেবল মুখে তাদের যন্ত্রণার শরিক হয়ে কী করবেন, এই যন্ত্রণার হাত থেকে তাদের মুক্তি দিন, আর যে-বিদেশীরা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান।'

কিন্তু কোথায় জার্মানি, কোনখানে? কোথায় পাবো তাকে—কেবল ভূগোলের মধ্যে, মানচিত্রে? কোনো একক হিসেবেই যার অস্তিত্ব নেই, সেই পিতৃভূমিতে কেউ ফেরে কী করে? ছিন্নভিন্ন একটা দেশ, ভিন্ন-ভিন্ন দখলীকৃত এলাকায় ভাগ-করা, যার একটার খবর আরেকটা অংশ রাখে না। রুশদের কাছে যাবো, না কি ফরাসিদের কাছে? না কি ইংরেজদের কাছে? না কি আমার সহ-নাগরিক মার্কিনদের কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইব তাদের বেয়নেটের আশ্রয় যেন আমাকে জাতীয়তাবাদী সমাজবাদের হাত থেকে বাঁচায়—যে নাৎসিবাদ এখন গোর দেয়া দূরে থাক আমাদের সৈন্যদের মৃতদেহ নষ্ট করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে? আমি কি—নানা ক্ষেত্রে যেরকম ঔদ্ধত্য ও বিবেচনাহীনতা দেখানো ও তারিফ করা হচ্ছে সে-রকমভাবে—জার্মানির দুঃখযন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করব, দখলকারী শক্তিদের আঙুল দিয়ে দেখাবো যে জার্মানির সঙ্গে ব্যবহারে ও শাসনব্যবস্থায় তারা একের পর এক ভুল করছে? কেবল এই কর্মই আমার দ্বারা হবে না। জর্মন হিসেবে একজন জর্মনকে কিছু বলবার দাবি ও সামর্থ্য ছিল আমার, জার্মানির আসন্ন বিনাশ সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দেবার ক্ষমতা ছিল। যা-কিছু জর্মন তা এক বিষম জাতীয় পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে আছে, জর্মন হিসেবে এ-কথা আমি গভীরভাবে বোধ করি বলেই আমি বিজেতাদের নীতির

সমালোচনা করার স্বাধীনতা রাখি না, কারণ আমার সমালোচনাকে সব সময়েই আত্মকেন্দ্রিক স্বাদেশিকতার নজির বলে অপরাখ্যাত করা হবে আর অন্য জাতিদের উপর জার্মানি বছরের পর বছর যে বিপুল দুর্দশা চাপিয়েছে, তার প্রতি নিঃসাড় বলে চিহ্নিত করা হবে। জার্মানির সর্বত্র এক পর্বতপ্রমাণ ঘৃণার প্রতিষ্ঠা দেখে যে একবার বিভীষিকা দেখেছিল, এবং যে অনেক আগেই এই বিনিদ্র যামিনীগুলি আন্দাজ ক'রে কল্পনা করবার চেষ্টা করেছে নাৎসি বাহিনীর অমানুষিক অত্যাচার কী ভীষণভাবে জার্মানির উপরেই ডিগবাজি খেয়ে ফিরে আসবে, সে এখন রুশ চেক ও পোল জাতির বৈরী নির্যাতনের নমুনা দেখে স্বদেশপ্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে হাত মোচড়াতে পারে না! জার্মানি নিজে যে-দুষ্কর্মের হোতা ছিল, এটা তারই এক যান্ত্রিক ও অপ্রতিরোধ্য প্রতিক্রিয়া—যার জন্য এখন একটা গোটা জাতি শাস্তি পাচ্ছে, এবং যেখানে এখন একেকটা প্রাতিস্বিক ন্যায়বিচার বা ব্যক্তিগত অপরাধ বা নির্দোষিতা—দুর্ভাগ্যবশত—মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এখন থেকে ইয়োরোপকে সাহায্য করা, অনাহার মৃত্যু থেকে জর্মন শিশুকে বাঁচাবার চেষ্টা, জর্মন-ভাগ্যকে নমনীয় করার উত্তেজিত চেষ্টার চেয়ে অনেক ভাল—হয়ত ওই উত্তেজনা থেকে আবার নিবোধভাবে জর্মন জাতীয়তাবাদ গজিয়ে উঠবে। কারণ, আমি নিজে জাতীয়তাবাদী নই। আপনারা তা ক্ষমাই করুন আর না-ই করুন, জার্মানি যখন অন্যান্য দেশকে নিপীড়ন করছিল তখনও আমি কষ্ট পেয়েছি—উল্টোদিকে এখনো কষ্ট পাচ্ছি জার্মানির দুর্দশায়। আর আমার বিদেশে বাস-করা সম্বন্ধে বলি: আমাকে পরদেশী ক'রে তোলবার জন্য আমার দেশ আমাকে যত সময় দিয়েছে তাতে কেবল সমর্পণের ভঙ্গিতে আমি যে নিজেকে অভ্যস্তই ক'রে নিয়েছি তা নয়—অকপটভাবে এটাও মেনে নিয়েছি যে এই ভবিতব্য বিধানই বুঝি সবচেয়ে ভালো হল। অতীতে আমি অধীরভাবে বাড়ি ফেরার জন্য প্রতীক্ষা করতুম। সেদিন হঠাৎ একটা পুরনো চিঠি চোখে পড়ে গেল—সেই ১৯৪১-এ আমার এক হাঙ্গারীয় বন্ধুকে লেখা সে-চিঠিতে আমি বলেছিলুম: 'নির্বাসন ক্রমেই অতীতের চেয়ে ভিন্ন রূপ নিচ্ছে—এখন আর প্রত্যাশার অবস্থায় বসে নেই আমি, আর ফিরে যাবার উপায় মনপ্রাণ সঁপে বসে নেই—বরং এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি জাতিগুলোর সীমা ভেঙে যাচ্ছে, আর বিশ্ব-ঐক্যের সম্ভাবনা জেগে উঠছে।' সত্যি কথাই লিখেছিলুম। যা-কিছু জাতীয় তা অনেক আগেই প্রাদেশিক ও গ্রাম্য হয়ে গেছে—এবং পিতৃভূমির আবহাওয়ায় আর যা-ই থাক খোলাবাতাস নেই, আছে বন্দীশালার হাওয়া।

'জার্মানি, জার্মানির—জার্মানিকে ছেড়ে দিলেই অবক্ষয়!' এই ছিল তাঁদের আহ্বান যাঁরা সর্বনাশ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী জেনেও একবারও সাবধান ক'রে

দেবার জন্য মুখ খোলেন নি, আর সেইজন্যই ১৯৩৩-এর জার্মানিতে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটাই ছিল পর্বতপ্রতিম ভুল! প্রবাসজীবন আমার পক্ষে ভালই হয়েছে। আমি আমার সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি আমার জর্মন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার; গত কয়েক বছরে প্রতিটি জর্মন যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কিছুই আমাকে এড়িয়ে যায় নি—যদিও আমার বাড়ি যখন ধ্বংস হয়ে গেল তখন আমি মুনখেন-এ ছিলুম না। আমাকে আমার বিশ্ব-জর্মনিকতাই দিল—দেশে থাকতেই সেটা আমার কাছে সহজে ও স্বাভাবিক-ভাবে এসেছিল—এবং আমাকে দয়া ক'রে জর্মন সংস্কৃতির সীমাবহির্ভূত শিবিরটিই দিন, যার সম্মান—আমি আশা করি—অবশিষ্ট জীবন বজায় রাখতে পারব।

বেন-এর কাছে জার্মানিতে থাকার লুথারীয় তাগিদ আর টমাস মান-এর জার্মানিতে না-ফেরার অতিনৈতিক কৈফিয়ৎ দুটোই যেহেতু সমান অকপট বলে ঠেকে, তখনই আমাদের পক্ষে সংকট আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বোধহয় লুপ্ত বিবেকের পুনরুজ্জীবন বা সদসৎ জ্ঞানের পুনর্জাগরণই এখন একমাত্র করণীয়। দেশ-বিদেশের ফাসিস্তরা অপপ্রচার চালাবে, শীলতালঙ্ঘন করবে, এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে নানাভাবে নিপীড়িত করবে—কিন্তু তবু বিপন্ন শিল্পীরা জানবেন যে যেখানে জীবনের অসম্মান হয়, সেখানে শিল্পেরও সমাধি; আর শিল্পের পক্ষে বলেই জীবনের পক্ষে দাঁড়ান তাঁদের পক্ষে জরুরি ও আবশ্যিক। জীবনানন্দ দাশ মৃত্যুর আগে এ-কথা অনুভব করেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন:

> 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
> যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে স্যাখে তারা;
> যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
> পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
> যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
> এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
> মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
> শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।'

নিশ্চয়ই এখন অনেকের কাছে 'মহৎ সত্য বা রীতি' কিংবা শিল্প অথবা সাধনা' 'শকুন ও শেয়াল' সত্ত্বেও 'স্বাভাবিক বলে বোধ হয়'[৬]।

নির্দেশিকা

১. টমাস মান-এর জ্যেষ্ঠপুত্র ; হিটলারের জার্মানি থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। তাঁর সম্বন্ধে পরে গোট্‌ফ্রীড বেন তাঁর আত্মজীবনী 'দুই জীবন' (১৯৫০)-এ লিখেছেন : 'একদিক থেকে ক্লাউস মান আমার অন্তরঙ্গ ছিলেন, নানা সূত্রে প্রায়ই আমার কাছে তিনি আসতেন ; তীক্ষ্ণধী, বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন, ভালোভাবে প্রতিপালিত ও শিষ্টাচারী, এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলবার সময় সম্মান প্রদর্শন করার অধুনালুপ্ত গুণটিও তাঁর ছিল।'

২. টমাস মান-এর ভ্রাতা ; ঔপন্যাসিক ; প্রধানত ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস রচনার জন্য বিখ্যাত। জার্মানিতে তৎকালে তাঁর জনপ্রিয়তা কোনো-কোনো দিক থেকে, এমনকি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক ভ্রাতার চেয়েও বেশি ছিল।

৩. 'লোট্‌টে ইন ভ্যাইমার' (১৯৩৯) উপন্যাসের কথা বলছেন টমাস মান, যাতে গোটে ও শারলোট্‌টের প্রণয়কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

৪. এখানে মান তাঁর বৃহত্তর উপন্যাস 'ডক্টর ফাউস্ট্‌স' (১৯৪৭)-এর কথা বলছেন, যার বিষয় ছিল হিটলারের জার্মানি, বা স্বাপনারের সংগীত, বা শিল্প ও ব্যাধি ইত্যাদি – অর্থাৎ ফাউস্ট-পুরাণ, অর্থাৎ যার অর্থ অনেক-কিছুই হতে পারে। 'একটি উপন্যাসের জন্মকথা' গ্রন্থে মান তাঁর এই উপন্যাস কীভাবে লেখা হল তার একটি উদ্দীপক ও মনোজ্ঞ কাহিনী রচনা করেছেন।

৫. বলাই বাহুল্য, গোটের 'ফাউস্ট'-এর কথা বলা হচ্ছে – কিন্তু বলা হচ্ছে 'অখণ্ড' ফাউস্ট-এর কথা, অর্থাৎ মাত্র তার প্রথম খণ্ডের কথা নয়। আজকাল যে দান্তের পুরো কাব্যের মধ্যে কেবল 'ইনফের্নো' বা গোটের 'ফাউস্ট'-এর প্রথম খণ্ডই বারংবার উদ্ধৃত হচ্ছে, তার পিছনে হয়তো কেবল যুগচেতনাই নিহিত নেই – কোনো গভীর উদ্দেশ্যও বিদ্যমান।

৬. গোট্‌ফ্রীড বেন ও টমাস মান-এর চিঠি দুটি তরজমা করার সময় যে অবিরলভাবে শ্রীসুবীর রায়চৌধুরীর পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা উপকৃত হয়েছি, এখানে এ-তথ্য কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করা জরুরি মনে করি।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কিংবদন্তির সূর্য

ফেলু শেখ দাওয়ায় বসে গজরাচ্ছিল। বাঁ হাতে এখনও শক্তি পাচ্ছে না। সেই এক হাতি, কবে এক মুড়াপাড়ার হাতি এসে ওর হাত ভেঙে দিয়েছিল, কবে এক পাগল ঠাকুর জেহাদ ঘোষণা ক'রে সব মজলিস ভেঙে তাঁবু ভেঙে দিয়েছিল হাতি দিয়ে – এখন আর তা যেন মনে আসছে না। কিন্তু হাতটার দিকে তাকালেই ভয়ংকর এক আক্রোশ গলা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে – তুমি ঠাকুর, পাগল ঠাকুর, তোমার পাগলামি ভাইঙ্গা দিমু। হাতটা ওর বাঁ হাত, কব্জিতে জোর নেই, কালো পোড়া বিশীর্ণ রঙ ধরে আছে কব্জির চামড়াতে এবং মাংসটা এখনও ফুলে ফেঁপে আছে। একটা কড়ি কালো তারে তন্ত্রমন্ত্র ক'রে জোটনের ফকির-সাব বেঁধে দিয়ে গেছে, সেও এক পীরের কড়ি। কড়ির গলায় ফুটো ক'রে হাতে বাঁধা সুতো নিয়ে ফেলু কেবল গজরাচ্ছিল। কিছু কাক উড়ছিল উঠোনে, কিছু শালিখ পড়ছিল মাচানে, আর শীতের ভোরে বিবি গেছে পশ্চিম পাড়াতে এক শিশি তেল ধার করতে। ফেলু খুব কষ্টেশিষ্টে মাছ পাহারা দিচ্ছিল। সামনে উঠানের উপর শীতের রোদ কোনো রকমে পিটকিলা গাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এসে নিচে নেমেছে, এই সামান্য রোদেই ফেলু মাছ রোদে দিয়ে বসে আছে – তারপর আরও সামনে খানা-

ডোবা এবং জমি, জমিতে কোনো ফসল হয় না, ছোট্ট একখণ্ড জমি ফেলুর। বাড়ির উত্তরে এই জমি, শাল গাছের ছায়া জমিটাকে বড় অনুর্বর ক'রে রেখেছে।

ফেলু শেখের গলায় কালো তার বাঁধা। চৌকো রুপোর চাকতি গলায়, সব সময় পালোয়ানের মতো চেহারা ক'রে রাখার সখ ফেলুর। ফেলুর যৌবন নেই, কিন্তু এখনও শক্ত ঘাড় দেখলে, ঘাড় গলা হাত দেখলে, তাজ্জব বনে যেতে হয়। মানুষটা কুৎসিত। ভয়ংকর কুৎসিত মুখ। বসন্ত রোগ ওর একটি চোখকে ফসল-হীন মাঠের মতো ক'রে রেখেছে, ফলে অন্য চোখটা রাগে বিদ্বেষে কেবল জ্বলে। মুখের উপর চাপ দাড়ি আছে বলে আর কাঁধে সব সময় গামছা ফেলে রাখে বলে কালো গেঞ্জির উপর ওর বুকের ছাতিটা কাছিমের মতো, কত প্রশস্ত ধরা যায় না। যখন ওর যৌবন ছিল তখন এই তল্লাটে দুই আদমি ফেলু আর সাবু—দুই বড় খেলোয়ার, হাডুডু খেলোয়ার। তখন এই তল্লাটে, বিশ্বাস পাড়া নয়াপাড়া এমন কি দশ-বিশ ক্রোশ দূরে অথবা গোপালদির মাঠ এবং নদী পার হয়ে সেই মেঘনার চরে ওদের খেলা দেখার জন্য কাতারে কাতারে লোক—ফ্যালু হা···রে···রে ডু···ডু···ডু বলে যখন দাগের ওপারে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ত, যখন ফাইনাল খেলার দামামা বাজত, ব্যাগপাইপ বাজত, তখন ফেলুর মুখ দেখলে মনে হতো ফেলু বড় কুশলী খেলোয়াড়। তখন কত মেডেল গলায় ঝুলত তার, কত কাপ এনে দিয়েছে সে তার দলের হয়ে। দিন নাই রাত নাই ফেলু বিশ-পচিশ ক্রোশ পথ হেঁটে খেলতে চলে গেছে। একবার বড় সহরে খেলতে গিয়েছিল, ফেরার পথে পাল্‌কিতে। জয় জয়কার ফেলুর। পাল্‌কির দু-পাশে দু-মানুষের মাথায় দুই বড় কাপ, ডে-লাইট জ্বালিয়ে দামামা বাজিয়ে ওরা সহর থেকে গ্রামে ফিরেছিল। নাঙলবন্দের মাঠ এবং নদী পার হলে গ্রামের মানুষেরা, বৌ বিবিরা, সেই যে দাঁড়িয়ে গেল দেখতে তার আর শেষ নেই। গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ, তবু যেন মানুষের শেষ নেই। ওরা ফেলুকে দেখছিল, দুই বড় কাপ দেখছিল, দলের কালো তার গলায় হাডুডু খেলোয়ারদের দেখছিল—যেন ঢাকার ঝুলন যাত্রা যায়। তখন ফেলুর দুই হাতের উপর শত্রুপক্ষের কি আক্রোশ! ঐ হাত যেভাবে পারো ভেঙে দাও। থাবা দিলে ফেলু সকলে বাঘের ভয় পায়। চত্বরে খেলা হচ্ছে। গোপালদির বাবুদের দল খেলছে—হাজার টাকা আগাম, আরও হাজার ফেলুর ঐ বাঘের মতো থাবা মচকে দিতে পারলে। কিন্তু হায়, কে কার থাবা মচকায়। ফেলু ছুটছে। একবার এ-মাথায় আবার ও-মাথায়। সে খুব দ্রুত ছুটতে ভালবাসে। দাগের উপরে পড়েই সে এমন একটা লাফ দেয় যেন সে আসমান ছুঁতে চায়। ঐ ওর কায়দা। শক্ত হাত পা পেশিতে সূর্যের আলো ঝলমল করত। কালো খাটো প্যান্ট, কালো গেঞ্জি আর রুপোর তাগা গলায় যেমন লম্বা ফেলু তেমনি কুৎসিত মুখ শরীর—মনে হয় তখন ফেলু জয় মা বলে অথবা আল্লা আল্লা বলে—হা মা ঈশ্বরী বলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুই পায়ে কাইচি

চালাও—ফেলু যে ফেলু সে পর্যন্ত সামনে দিকে পাহাড়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। তখন ফেলুর কোমরে বসে উল্টোডাবে এমন এক মোচর দিতে হবে যেন বাঘের থাবা বেড়ালের হয়ে যায়। বাবুদের বায়নার মুখে ছাই দিয়ে যে ফেলু সেই ফেলু। খেলার শেষে টেরটি পাওয়া যায় না কোথাও লেগেছে ফেলুর। সেই ফেলু এখন ঘরের দাওয়ায় বসে কাক তাড়াচ্ছে। ভাঙা হাতের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় ক'রে বড় ঠাকুরকে উদ্দেশ্য ক'রে গাল পাড়ছিল—পাগলামির আর জায়গা পাও না। তোমায় পীরগিরি ভাইঙ্গা দিমু ঠাকুর। তারপর সে হুস্ করল। একটা কাক ফের এসে ঘরের চালে বসেছে। কাকটা সেই থেকে জ্বালাতন করছে। একটা কাক নয়, অনেকগুলো কাক। কিন্তু এ-কাকটা যেন ধরে ফেলেছে এখন ফেলুর হাতে কোনো শক্তি নেই। ফেলু ব্যারামি নাচারি মানুষ। ফেলু ক্রমশ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। গিটে গিটে বেদনা। হাতির শুঁড়ে ওর সব শরীরের শক্তি পাচার হয়ে গেছে। কিন্তু ফেলুর জলন্ত দুই চোখ, বিশেষ ক'রে পোকায় খাওয়া চোখটা এখন বড় বেশি ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। কাকটা বোধ হয় সেই চোখটা দেখতে পায় নি। সে প্রায় উঠোনে এসে এবার দাঁড়াল। তারপর চোখ মেলে তাকাতেই মনে হল কাকটা এবার ওর মাথায় এসে বসবে। তুমি আমারে পাগল ঠাকুর পাইছ। বলেই সে ডান হাতটা উঁচু করতে গিয়ে দেখল হাতটা পুরোপুরি নিরাময় হয় নি। বাঁ হাতটা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা এখন নিরাময় হচ্ছে না, বিবি গেছে এক শিশি তেল ধার করতে আর সে ঘরের মাগের মতো বসে আছে মাছের পাহারায়। বিবি গতকাল বিল থেকে মাছ ধরে এনেছে, শীতের দিন বলে কিছু মাছ খেয়েছে, কিছু মাছ রোদে দিয়ে শুকিয়ে রাখছে। বিবি ওকে একটা পাটকাঠি দিয়ে বসিয়ে রেখে গেছে পাহারায়। বিবির উপর রাগটা বাড়ছিল। একটা কাঠি দিয়ে পঙ্গু হাতে কত আর শালিখ তাড়ানো যায়—কাক শালিখ অথবা বাজপাখি পর্যন্ত উড়ে আসতে পারে। বাজ পাখির কথা মনে আসবেই গৌর সরকারের কথা মনে এসে গেল অথবা প্রতাপ মাঝির নাভিতে তেল মাখার অভ্যাসটার কথা মনে পড়ে গেল। ফেলুর মনে হল ওরা কাক চিল নয়, ওরা বাজপাখি নয়, ওরা লাল নদীর ঈগল, বড় মাছ বাদে ওরা খায় না। সব জমি-জিরাত ওদের। সুদিনে-দুর্দিনে কামলা খাটলে পয়সা। ফেলুকে গৌর সরকার বড় ভয় পায়। সে ফেলুকে ভয় পায় ওর গতর দেখে নয়, এমন গতরের কামলা ওর ঘরে কত বাঁধা আছে, ভয় ফেলু নাকি যৌবনে অথবা সেদিনও রাতে, বিরাতে কোথায় চলে যেত, দরকার পড়লে সে দশটা টাকার বিনিময়ে দশটা মাথা এনে দিতে পারে—সেই ফেলু, কি তাজ্জব একটা কাক তাড়িয়ে দিতে পারছে না। ফেলু রাগে হতাশায় মুঠিটা ডান হাতে ঝাড়তে থাকল বার বার।

রোদে মাছ শুকানো হচ্ছে। ছোট একটা উঠোন নিয়ে ফেলুর ঘর, একটা পেয়ারা গাছ, বিবি নতুন এসেছে ঘরে। তিন বছর হল সে বিবিকে, বয়স আর

কত বিবির, এক কুড়ি হবে কি, দু-এক বছর বেশি হতে পারে। কাঁচা যৌবনের ঢল বিবির বড় বেশি ছিল। পাড়াময় রসিকতা কত – বিবিটা তলিমুদ্দিন সাহেবের। কে কবে, কে কখন তলিমুদ্দিন সাহেবের লাসটা আবিষ্কার করেছিল কেউ জানে না। তারপর বছর আর পার হয় নি, ফেলু তলিমুদ্দিন সাহেবের খুবসুরত বিবিকে ঘরে তুলে এনেছে। কেউ রা-টি করে নি। ফেলু বড় দাঙ্গাবাজ মানুষ, ভয়ে-বিস্ময়ে কেউ ফেলুকে ঘাঁটাতে চায় না। সেই ফেলু এখন এক কাক, সামান্য কাকের সঙ্গে পেরে উঠছে না। কাকটা মাথার উপর উড়ছিল। উঠোনের ছোট চাটাইয়ে পুঁটিমাছ ছড়ানো। এখনও পচা গন্ধটা ওঠে নি। শীতের দিনের মাছ, একটু বেশি সময় লাগে পচে উঠতে। বিকেল তক মাছগুলোর শরীরে পচা গন্ধ ভাসবে। কিন্তু কি তাজ্জব, এখন এই শীতের সকালেই কাকেরা এসে ঘুরছে ফিরছে, বড় দাঁড় কাকটা ওর মাথার উপরে এসে পাখা ঝাপটাল। এবং এক ফাঁকে অন্য একটা কাক মাছ নিয়ে উড়াল দিল। রাগে দুঃখে হতাশায় ফেলু কাকটাকে তেড়ে গেল, কোমর থেকে লুঙিটা খুলে গেছে, সে প্রায় উলঙ্গ হয়ে কাকটার পিছনে ছুটতে গিয়ে দেখল, প্রায় সব কাকগুলি এবার উঠানের উপর নেমে এসেছে। এবং একটা-দুটো মাছ যে যেভাবে পারল নিয়ে উড়াল দিল। রাগে দুঃখে ফেলু এবার ছেঁড়া তফনটা তুলে আর পারল না। প্রায় হামাগুড়ি দেবার মতো হেঁটে গিয়ে দেখল – কাক যে সামান্য কাক সেও বোঝে ফেলুর আর শক্তিসামর্থ্য নেই। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত পড়ে থাকা মরা মাছগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে নড়তে পারছে না। নড়লে বাকি কয়টা মাছও আর থাকবে না। ওর ডান হাত সম্বল – বিবির উপর সংসার। মাছের এ-অবস্থা দেখলে বিবি তাকে কুপিয়ে কাটবে। সে চাটাইয়ের পাশে বসে মাছগুলোকে ছড়িয়ে রাখল। যেন সে এসেই ধরতে না পারে, কাকে মাছ নিয়ে উড়াল দিয়েছে। সামসুদ্দিন কবে ঢাকা গেছে – এখনও ফিরছে না। সামসুদ্দিনের মা-র কাছ থেকে এক কাঠা ধান এনেছে ধার ক'রে, সেও কি দিয়ে শোধ হবে, কবে, কিভাবে কাজ করতে পারলে সব শোধ হবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। একমাত্র যুবতী বিবি আম্মু সব দেখেশুনে করছে। আম্মুর উপর এ-সময় তার কেমন মায়া হতে থাকল। সে লুঙিটা তুলে এবার পরল। আম্মু বেগম বড় মনোরম নাম। কিন্তু আম্মুটার শরীরে এত বেশি তেজ, প্রায় সরকারদের ঘোড়ার মতো, কেবল লম্বা মাঠ পেলেই দৌড়াতে চায়। বড় মাঠে ফেলু এখন আর ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে পারে না। শীতের রোদ উঠোনে এসে নেমেছে, আম্মুটা এত দেরি ক'রে ফিরছে, ফিরতে দেরি করলে ভিতরে ভিতরে সন্দেহের এক কোড়াপাখি ফেলুকে কুড়ে কুড়ে খায়। সে এবার ডেকে উঠল : অঃ আম্মু, আম্মুরে পাগল ঠাকুর আমারে কানা কইরা দিছে।

ছোট গ্রাম। কয়েকঘর মুসলমান। হাজি সাহেবের বাড়িতে চারটা চার

দুধারী নতুন টিনের ঘর উঠেছে। কিছু গাই-গরু আছে, বড় দুটো মেলার গরু আছে। তারপর সামুদের—কিছু জমি, নয়াপাড়ার মাঠে ওদের কিছু জমি আছে, সমবৎসর সামুদের ঐ ফসলে চলে যায়। ভাল দুবিঘা পাটের জমি থাকলে আর কি লাগে! সামুর মিঞাজানেরা বড় গেরস্থ। সুতরাং অভাবে অনটনে ধান, খৈ, মুড়ি সবই চলে আসে। তারপর আর যারা আছে প্রায় সবাই আল্লার বান্দা। গতরের উপর নির্ভর। আবেদালির জমি নেই, মনজুর ভাগচাষ ক'রে কোনো রকমে দিন গুজরান করছে। ঈশমত শালা! বলে ফেলু একটা গিস্তি করল। পঙ্কু বিবি ঈমসের, সামুদের আতা বেড়া পার হলে হাজি সাহেবের গোয়ালবাড়ি এবং পরে একটা বেত ঝোপ আর আতাফলের একটা বড় গাছ, গাছের নিচে ভাঙা কুঁড়ে ঘর—কোন আদ্যিকাল থেকে বিবিটা সেখানে পড়ে গোঙাচ্ছে। কি যেন এক ব্যাধি। বিবিটাকে সে কোনোদিন ভালবাসতে পারে নি। ওর একমাত্র যেন সম্বল এক তরমুজ খেত। সেই খেতে বসে থাকে মানুষটা। এখন শীতের দিন, এইসব দিন পার হলে গ্রীষ্মের দিন আসবে, তখন যেন ঈশম সদাগরের মতো। ঠাকুর বাড়ির বান্দা ঈশম তরমুজ বিক্রি করবে আর সব টাকা তুলে দেবে ছোট ঠাকুরের হাতে। ওর গর্ব সে জমি থেকে ছোট ঠাকুরকে কত টাকা তুলে দিতে পারল। পরপর গ্রামের পর গ্রাম অথবা বিস্তীর্ণ মাঠ। মুসলমান গ্রামগুলোতে হাহাকার যেন। কোনো কোনো গ্রামে হাজি সাহেবের মত ধনী আছেন, তাঁদের সুখ অন্য ধরনের। ওরা, ওদের ছেলেরা উজানে যায়, পাটের ব্যবসা করে কেউ, মসজিদে ইন্দারা দিয়ে ওরা সিন্নি চড়ায়। এইসব দেখে অজ ফেলুর বড় ইচ্ছা একবার বড় একটা নাও বানায়। সেই নাও নিয়ে পাটের ব্যবসা করার সখ। পাটের দালাল অথবা ফরে হতে পারলে বড় সুখের। যা ক'রে হাজি সাহেব হজ ক'রে আসলেন পর্যন্ত। আর হিন্দু গ্রামগুলোর দিকে তাকাও—পুবের বাড়ির নরেন দাস—তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে, দীনবন্ধুর দুই তাঁত দুই বউ। সুখে আছে লোকটা। আর ঠাকুর বাড়ির মানুষেরা শোনা যায় তল্লাটের বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষ। বড় ঠাকুর পাগল মানুষ, মেজ ঠাকুর সেজ ঠাকুর দু-দশ ক্রোশ হেঁটে গেলে মুড়াপাড়ার কাছারির মোমস্তা এবং নায়েব। জমিদারদের বড় বিশ্বাসভাজন লোক। ওদের স্বচ্ছল সংসার। তারপর পাল বাড়ি—জমি আছে ওদের, মিলের কাজ আছে, তারপর মাঝিরা—ওদের বড় বড় মেলায় গরু, ইচ্ছা করলে ওরা প্রায় মেলায় বাজি জিতে আসতে পারে। ক্বচিৎ দু-একবার নয়াপাড়ায় মিঞাজানেরা বাজিতে জিতে ফেলে, সে যেন মাঝিদের বদান্যতা। ওরা মেলার গরু দৌড়ের মাঠে নিয়ে গেল না বলে মিঞাজানেরা দৌড়ে জিতে গেল। শেষে পড়বে কবিরাজ বাড়ি। প্রতাপ মাঝি ধনী লোক, বিশ্বাস পাড়ার মাঠে, কাওসার মাঠে এবং সুলতানসাদির মাঠের সব সেরা জমি-গুলো ওর। শেষে আর আছে গৌর সরকার—শালীর সনে পীরিত যার, যে ছল

ছাইতে গেলে জলপান করতে দেয় না, যে মানুষে সুদে এবং লালসায় বড় হচ্ছে— অপরের সুখদুঃখের বোধগম্যি কম, কেবল টাকা টাকা, টাকা পেলে সে তার নিজের কলিজা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারে। ফেলু ভাবতে ভাবতে দাঁত শক্ত ক'রে ফেলল—তোমাগ মশাইরা জবাই করতে পারলে আমার শান্তি। সে চিৎকার ক'রে বলল, ঠাকুর পাগল তুমি! তোমার পাগলামি···সে আর বলতে পারল না, কাকগুলো ওকে অন্যমনস্ক দেখে ফের উঠোনে নেমে এসেছে। সে হস্ হস্ করতে থাকল। কিন্তু দুঃখে দুর্দশায়—বিবিটা এখনও ফিরছে না, কি করছে এতক্ষণ। হাজি সাহেবের ছোট ছেলে ইমাম কি ওর···। সে চিৎকার করে উঠল, হালার কাওয়ায় আমারে ডড়ায় না। হালার বিবি আমারে ডড়ায় না! সে কি খুন করবে ভেবে কেমন পাগলের মত হেসে উঠল। সে হাত দুটোয় তাকিয়ে বলল, পোড়া হাত আর কি ভাল হৈব না আল্লা! সে বাঁ হাতটা কোনো রকমে ডান হাতে চোখের সামনে তুলে আনল। দেখল কব্জির চামড়া কুঁচকে গেছে, ফোলা কব্জি, কব্জিতে কানাকড়ি বাঁধা কালো তার ঝুলছে। মনে হয় এই ফেলু ঈশমের বিবির মত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। সে উঠোন থেকেই চিৎকার ক'রে ডাকল—আমুরে! আমু।

তখন আবেদালির বিবি জালালি যাচ্ছিল বাড়ির নিচ দিয়ে। বাঁশ ঝাড়ের ভেতর শীর্ণ জালালিকে দেখে মনে হল বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। এখন গরীব গরবাদের শালুক তোলার সময়। আশ্বিন-কার্তিকে সামনের সব মাঠে আর অঘ্রান-পৌষে বিলেন জমিতে কট ক'রে ধানের ছড়া শামুকের মুখে কেটে কৌচর ভরা যায়। শীতকাল বলে মাঠে শুধু কলাই, অথবা কিছুই নেই, এখন শুধু বিলে নেমে যাওয়া শালুকের জন্য। জালালি শালুক তুলতে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে জালালিকে দেখে বলল, ভাবি আমুরে স্যাখছেন নি!

জালালি গামছাটা বগলে রেখেছে। মাথায় ওর একটা পাতিল ছিল। পাতিলটার জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না। এবং পাতিলটা মাথায় ছিল বলেই হয়ত ফেলুর কথা ওর কানে যায় নি। অথবা গেলেও অস্পষ্ট। খুব অস্পষ্ট। সুতরাং জালালি পাতিলটা মুখ থেকে নামিয়ে এনে বলল, কি কও মিঞা! আমারে কিছু কও নাকি!

—আর কি কমুগ। বলে ফেলু যে ফেলু সে পর্যন্ত গাই গরুর মতো নির্বোধের হাসি নিয়ে তাকাল।

—কিছু কইতে চাও।

—আমু গ্যাছে এক শিশি ত্যাল আনতে। আইতাছে না।

জালালি বলল, আইবনে। বলে, জালালি দাঁড়াল না। সে ফের পাতিলটা মাথায় দিয়ে মাঠে নেমে গেল। বড় মাঠ সামনে, সেই সোনালি বালির নদীর চর। চর ডাইনে ফেলে উত্তরের দিকে নেমে গেলে সেই বিল। ফাওসার বিল।

বিলে একবার ঈশমকে কানাওলায় ধরেছিল—এত বড় বিল এ-অঞ্চলে আর নেই। একবার বিলের জলে কুমির ভেসে এসেছিল, একবার বিলের জলে এক অজগর সাপ ভেসে উঠেছিল। আর যেবার নরেন দাসের বোন মালতির বিয়ে হয় সেবারে এক কুমির মারা পড়েছিল। তারপর এই বিলের নানা রকমের কাছিমের গল্প, গজার মাছের গল্প এবং রাতে সপ্তভিঙ্গা মধুকরের গল্প কিংবদন্তির মতো অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সেই বিলে জালালি যাচ্ছে শালুক তুলতে, শুধু জালালি নয়, অনেক এমন—কি হাজার হবে এখন, শালুক তুলে আনতে যাবে। ওরা ভোরে ভোরে বের হয়ে যাবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে আসবে। দুঃখী মানুষেরা শীতের ভোরে শালুক তুলতে বের হয়ে যাচ্ছে। ফেলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। আবেদালি এ-সময় দেশে চলে আসবে, বর্ষা শরৎ হেমন্তে সে গয়না নৌকায় মাঝি, আর সারা গ্রীষ্মের দিনে অথবা বসন্তের দিনে গামছা কাঁধে ফেলে হিন্দুপাড়া কাজের জন্য ঘুর ঘুর করবে। এই তো গ্রাম—গ্রামে মাত্র সামু মাতব্বর মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারছে। যত সামু মাতব্বর মানুষ হয়ে যাচ্ছে, যত হিন্দু যুবকেরা সামুর সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে কথা বলছে তত ফেলু সামুর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। যেন এক মানুষ মিলে গেছে সমাজে, মাত্র এক মানুষ যে এইসব ভদ্র হিন্দু পরিবারের মানুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না। সামু এলেই ফেলুর সামুর কাছে ঘুর ঘুর করা বেড়ে যায়। সে ওর ভাঙা হাত সম্পর্কে নালিশ দিতে গিয়ে রাগে দুঃখে হতাশায় ভেঙে পড়ে। ভিতরে ভিতরে সুখী মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। তখন একমাত্র সামু যেন কিছুটা মোল্লা মৌলভির মতো আসানের কথা বলতে পারে। সামুর লীগ পার্টি জিন্দাবাদ—আমাদের জন্য একটা দেশ চাই, অথবা এই দেশে আমাদের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য জায়গা চাই। তারপর যে কথা শুনলে চোখে আরামে প্রায় ফেলুর ঘুম চলে আসে—এ দেশটা দুঃখী মানুষদের হয়ে যাবে। ফেলু দুঃখী মানুষ ভাবতে প্রায় তার গোটা স্বজাতিকে ভেবে ফেলেছিল। তার জন্য কত রকমের জেহাদ—ধর্মযুদ্ধ চাই। তার জন্য কত রকমের বিপ্লব চাই। সামু পর্যন্ত বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। আমাদের জন্য দেশ, এই দেশ, মাটি ফসল সব আমাদের জন্য হবে। আমাদের সুখের জন্য হবে। অধিকাংশ মানুষ যখন আমরাই এ-দেশে বসবাস করছি তখন এই দেশ আমাদের। সামু যখন টেনে টেনে বইয়ের ভাষায় কথা বলতে থাকে তখন মনে হয় ফেলুর সব ফেলে ঐ এক মানুষের পিছনে থেকে জাতির সেবা করলে কাজটা মোল্লা মৌলভির চেয়ে কম ধর্মীয় হবে না। কিন্তু হাত ভেঙে কি হয়ে গেল! কত আশা ছিল ফেলুর যে আজীবন সামুর পাশে থেকে তার জাতের জন্য কাজ করবে। কিন্তু এই হাত, পঙ্গু হাত ওকে চির-দিনের মত যেন আকর্মণ্য ক'রে দিচ্ছে। পাগল ঠাকুর হাতি দিয়ে ওর হাত ভেঙে দিল। আর কাকগুলি যত মাথার উপর উড়ছিল—ঠিক যেন পরবে কোরবানি

হয়েছে, কাকগুলি কোরবানির লোভে মাথার উপরে উড়ছে। সে ফের হেস্ করল। কাকগুলো এতটুকু ভয় পেল না। ওর পঙ্গু হাতের দিকে তাকিয়ে শব্দ করল – কা কা। ওরা নিচে নেমে অথবা উড়ে উড়ে সামনে পিছনে লাফিয়ে ফেলুকে তামাসা দেখাতে থাকল।

ফেলু বলল, আমার নাম ফেলু শেখ। হালার কাওয়া। সে মাথার উপরে ডান হাত দিয়ে কাঠিটা ঘোরাতে লাগল।

আর তখনই গোয়ালের গরুটা ভ্যা করে ডাকল। গরু ঠিক বলা যায় না– বাছুর। হাড় বের করা বাছুরটার মুখ দিয়ে ঠাণ্ডায় লালা পড়ছে। বাছুরটার ঠাণ্ডা লেগেছে। রোদে নিয়ে গেলে বাছুরটার ফুলে থাকা ভাবটা কেটে যাবে। তা ছাড়া একটা কাজ পাওয়া গেল। এত বেলায় এখনও আব্বু ফিরে এল না, বাছুরটা খিদায় ডাকছে – ওকে নিয়ে মাঠে নেমে যেতে হয়। খোঁটাতে বেঁধে দিলে, কিছু ঘাস পাতা খেলে শক্তি পাবে। আব্বু আসছে না – কি করা যায়, কাকগুলো বিরক্ত করছে, সে তাড়াতাড়ি ডান হাতে মাছগুলো তুলে ফেলল, ঘরের ভিতর রেখে ঝাঁপ বন্ধ ক'রে সে বাছুরটা গোপাটে নিয়ে গেল। খোঁটা পুঁতে দেখল কাতারে লোক বিলের দিকে শালুক তুলতে নেমে যাচ্ছে। সব মুসলমান বিবি, বেওয়া। অঞ্চলের সব মুসলমান গ্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। আর এই তো সামনে বিশাল বিলেন মাঠ, হাইজাদির সরকাররা পুকুরপাড়ে বাস্তুপূজা করছে, ভেড়া বলি হচ্ছে, ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, বাস্তুপূজার জন্য ঠাকুরবাড়ির ছোট ঠাকুর বের হয়ে পড়েছেন মাঠে। তিনি হিন্দু গ্রামে উঠে সব হিন্দু গেরস্থ বাড়িতে বাস্তুপূজায় তিল তুলসি দেবেন। বাস্তুপূজায় ঢাক বাজছে – তিনি পূজা পার্বণে ঘুরে বেড়াবেন এখন, ঈশম যবে না সঙ্গে, ঈশম কাল যাবে, চাল কলা এবং অন্য তৈজস মাত্র সব বেঁধে আনবে। সরকারদের বাস্তুপূজায় কত লোক এসেছে। নূতন শাড়ি পরে – কপালে সিঁদুরের টিপ, হাতে সোনার গহনা, পরনে গরদের শাড়ি আর কেমন মিষ্টি চেহারা – কি সুন্দর মুখ! একেবারে ঘ্যান বর্ষার সোনালি বালির নদীর চর। পূজা হচ্ছে, পার্বণ হচ্ছে। নায়রীর মতো ঠাকুর বাড়ির বড় বৌ, ছোট বৌ পুকুর পাড়ে নেমে এল। জমির বুকে ছোট এক কলাগাছ, নিচে ছোট ঘট, ঘটের উপর নারকেল, আর চারধারে সব নৈবেদ্য, যেন ভোজ্যদ্রব্যের অভাব নেই, তিল কদমা শীতের যত খাদ্যদ্রব্য সব ওদের আয়ত্তে। আর কি জ্বালা! এ জ্বালা কি ক'রে নিবারণ হয়! বাছুরটা, কঙ্কালসার বাছুরটা ঘাসে মুখ দিচ্ছে না, শীতের ঘাস – শিশিরে ভিজে আছে ঘাস – যতক্ষণ রোদ ভালভাবে না উঠবে, যতক্ষণ শিশির ঘাসের উপর থেকে ভালভাবে মরে না যাবে ততক্ষণ বাছুরটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সে রাগে দুঃখে বাছুরটা ঘাস খাচ্ছে না বলে পেটে লাথি বসিয়ে দিল। কারণ ওর মনে হচ্ছিল ঘাস না খেলে, হাজি সাহেবের বড় ষাঁড়টা অথবা গৌর সরকারের বড় দামড়া গরুটা টের পেলে এই তাজা ঘাস সব চেটে-

পুটে খেয়ে ফেলবে। এই ঘাস সে যেন প্রায় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে মাঠে। তাড়াতাড়ি বাছুরটা ঘাস খেয়ে ফেললে আর কেউ এসে ভাগ বসাবে না—কিন্তু বলিহারি যাই হালায় এমন এক বাছুর আন্‌ মাগী এনেছে! এমন এক মরা বাছুর যার কপালে সুখ নাই, গায়ে বল নাই, আছে কেবল ছড়ানো-ছিটানো অথবা ধ্যাবড়ানো ঘরময়, পাড়াময়—আন্নুর কথা মনে হতেই সে সব ফেলে গাঁয়ের দিকে উঠে যাবে ভাবল। এক শিশি তেল আনতে এত দেরি!

দূরে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। ওর কানে বড় বেঢপ লাগছে শব্দটা। জালালিকে দেখা যাচ্ছে। শীর্ণ কন্যা জালালি এখন ফাওসার বিলে নেমে যাবার জন্য প্রতাপ চন্দের ঘাট ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। সে সামনে যেসব জমি আছে ভাওড়াগাছের বন আছে তা অতিক্রম ক'রে বেনেদের পুকুর পাড় ধরে হাঁটছে, সেই এক বিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের সব জমি প্রতাপ চন্দের। সেই জমি পার হলে ফাওসার খাল, খালের পাড়ে পাড়ে যত জমি পড়বে—পাটের, আখের এমন কি কলার জমি, জমি সব গৌর সরকারের। তারপর আবার যেতে যেতে জমি পড়বে, কোনো জমি ঠাকুর বাড়ির, কোনো জমি নরেন দাসের ফাঁকে-ফোকড়ে কিছু জমি মনজুর অথবা আবেদালির ভাই জয়নাল ভাগ চাষ করে। তারপর যত জমি—সব হাজি সাহেবের তিন বিবি, ছোট বিবির বয়স আর কত, এই এক কুড়ি চার পাঁচ হবে। হাজি সাহেব ঈদের দিনে তিন বিবি নিয়ে মসজিদে যাবার সময় চারিদিকে নজর রাখেন। সতর্ক নজর। কেউ কিছু গিলে ফেলল কিনা দেখেন—অন্তরালে কিছু দেখা যায় কিনা, হেই হেইজা কি হৈছে, বলে হয়তো তিনি তার মাইজলা বিবিকে একটা পাঁচনের খোঁচা দিয়া কন—বিবিরে, অঃ সোনার বিবি পথ দেইখা হাঁট। তখন কেবল কেন জানি মনে হয় ফেলুর, পাঁচনটা নিয়ে একবাড়ি হাজি সাহেবের মাথায়। ভাবতে ভাবতে এসব কেবল খুন চড়ে যায়, ফেলু স্থির থাকতে পারে না—কেবল কি সব মনে হয় ফেলুর। ফেলু, যে ফেলু কোনো মাতব্বর মানুষ নয়, জলে জঙ্গলে যে ফেলু মানুষ হয়েছে, যে ফেলুকে উজান থেকে হাজি সাহেব ধরে এনেছিল, উজানি নৌকাতে ধান কাটা সারা হলে ফেলু হাজি সাহেবের পেটে পিঠে পায়ে রসুন গোটার তেল গরম ক'রে মেখে দিত, সেই ফেলুর কেন জানি বড় সখ মাঝে মাঝে হাজি সাহেবের মাইজলা বিবিরে একবার বোরখার অন্তরালে উঁকিডাক দিয়ে ছাখে। সে গোপাটে দাঁড়িয়েছিল। বড় সেই অশ্বত্থ গাছটার নিচে বিচিত্র সব সিটকিলা গাছের ঝোপ, পাতাবাহারের জঙ্গল, শীতকাল বলে ঝোপের ভিতরটা খুব শুকনো মনে হচ্ছিল। ভিতরে ঢুকে গোসাপের মতো ঝোপের ভিতর পড়ে থাকলে হয়তো মাইজলা বিবিরে দেখা যাবে—কারণ ও-পাশটায় হাজি সাহেবের অন্দরের পুকুর। ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দেবার আগে সে চারপাশটা দেখে নিল। বাঁ দিকে আবেদালির ঘর, কেউ নেই ঘরে। আমগাছটার নিচে ভাঙা ঘরটা এখন খালি, দক্ষিণ দুয়ারী ঘরে

সেই কবে জোটন বসবাস করত, এখন জোটন নেই বলে বর্ষার বৃষ্টিতে ঝড়ে এবং কয়েক বছরের কালবৈশাখী হাওয়ায় ঘরটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিছু ঝোপজঙ্গল, বেতগাছ আবেদালির বাড়িটাকে সব সময় অন্ধকার ক'রে রাখে। কোনো রকমেই শীতের সূর্য আবেদালির উঠোনে নামতে চায় না। আর এইসব ঘর-উঠোন এবং ঝোপজঙ্গল পার হলেই – খুব নজর করলে, ঝোপ – জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নজর করলে টের পাওয়া যায় – হাজি সাহেবের আতা বেড়ার এপাশে তিন বিবির গলা কাঁচের চুড়ির মতো জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলছে। কি হাসে! হাসতে হাসতে মনে হয় আল্লার দুনিয়া গিলে ফেলবে। সিঁথিতে বড় লম্বা টান ধানক্ষেতের সাদা আলের মতো আর ডুরে শাড়ি হাঁটুর নিচে বোধহয় নামতে চায় না। ফেলু প্রায় মরীয়া হয়ে উঁকি দিয়ে থাকল ঝোপের ভিতর। হাত পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, ডান হাতটা কোনো রকমে কাজে লাগছে এখনও, কবে এই হাত পর্যন্ত পঙ্গু হয়ে যাবে – সে প্রায় একটা মরা সাপের মতো ঝোপের ভিতর পড়ে থাকল। ঝোপের পাশ দিয়ে ঘাটের পথ, হাজি সাহেবের অন্দরের পুকুরে পানি কি কালো! কালো পানির টানে মাইজলা বিবি নেমে আসে ঘাটে। বার বার, ঘাটে ঐ এক ব্যাপার বিবি বৌদের, পানি দ্যাখলেই শির শির করতে থাকে তলপেট। পানী দেখলেই বিবি বৌদের বড় জ্বালা ধরে প্রাণে। ঝোপেজঙ্গলে একটা মানুষ মরা সাপের মতো অথবা শিকার ধরার মতো শুয়ে আছে – কার টের পাবার কথা – ফেলু সেই এক জ্বালা নিবারণের জন্য, কি এক যে জ্বালা, উজানে যেতে হাজি সাহেব ভোলা অঞ্চলের পাশে কোন এক সাগরের কূল থেকে এই মাইজলা বিবিরে তুলে এনেছিল। আর সঙ্গে ছিল ফেলু। ফেলু ফুসলে-ফাসলে টাকার লোভ দেখিয়ে হাজি সাহেবের নৌকায় এনে তুলেছিল মাইজলা বিবিকে। তখন হাজি সাহেব হাজি নন, তখন ফেলুর যৌবন কত বড়, ফেলুর কত নামডাক, যোয়ান মরদ ফেলু পীরিত করার ভান করেছিল মাইজলা বিবির সনে। বোধহয় এখনও সংগোপনে গানটা গায় মাইজলা বিবি। যখন কলিমুদ্দি সাবেব হজ করতে গেলেন এবং যখন হাজি হয়ে ফিরে এলেন তখন মাইজলা বিবির সেই গান গলায়। একা একা আতা বেড়ার পাশে বসে গাইত। উঠোনে ফেলু বসে থাকত, সে ওদের বড় নৌকায় তখন মাঝি, কায় কারবারে তাকে হাটে বাজারে যেতে হয়, সওদা ক'রে আনতে হয়। তার মাইজলা বিবির সনে পীরিত, রঙ্গ রস করার উছিলাতে ঘাটের মাঝি হয়ে সে বসে থাকত। কিন্তু কলিমুদ্দি হজ ক'রে এসে সবই প্রায় টের পেয়ে গেল। সে বলল, মিঞা তোমার এই আছিল মনে! তারপর হাজি সাহেব ঘাট থেকে তাড়িয়ে দিল ফেলুকে। সে কবেকার কথা। এখনও মাঝে মাঝে চুপচাপ বসে থাকলে সব মনে হয়। সেই থেকে ফেলু আর হাজি সাহেবের বাড়ি যেতে পারে না। মাঝে মাঝে মাইজলা বিবির মুখ ওর পরানে দরিয়ার বান ডেকে আনে –

তখন একা একা প্রায় পাগল ঠাকুরের সামিল সে এই গোপাটে এবং অশ্বত্থের নিচে চুপচাপ বসে থাকে। বিবি আম্মু আজকাল যায় হাজি সাহেবের বাড়িতে। ছোট বিবির সাথে আম্মুর খুব ভাব। সেই বিবি ওকে লুকিয়ে চুরিয়ে তেল স্নায়, ডাল স্নায়, মাষকলাইর বড়ি স্নায়। আম্মু বলে ছোট বিবি স্নায়, কিন্তু ওর মন বলে সব মাইজলা বিবির কাজ। আম্মু দেখায় ছোট বিবির সঙ্গে তার বড় ভাব— সখী সখী গলায় দড়ি ও লো সখী ভাব যেন। যখনই ভাবের কথা মনে হয় তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করতে পারে না ফেলু। সুতরাং সে এই ঝোপের অন্তরালে মাইজলা বিবির মুখ মন শরীর দেখার বাসনাতে বসে থাকে— কি যাদু বিবির চোখে আর কি যাদু আছে এই মনের ভিতরে। এই মন কি যেন চায় সব সময়। ফেলু কি যেন চায় সব সময়। তার ঘরে যুবতী বিবি আম্মু, ফেলুর বয়স দুই কুড়ির উপরে হয়ে গেছে, তবু মনটা কি যেন কেবল চায়। এত অভাব অনটনের ভিতরও ভিতরটাতে কি পেতে কেবল ইসছা ইসছা করে। কিসে যে সুখ—এই আম্মুর জন্য সে কি কাণ্ডটা করেছে। তলিমুদ্দিন সাহেবের গলাটা সে ছ্যাৎ ক'রে কেটে ফেলেছে। পাট ক্ষেতের ভিতর তলিমুদ্দিন সাহেবে বাছ-পাট কেমন কাটা হয়েছে দেখতে এসেছিল। বুড়ো তলিমুদ্দিন সাহেবের শেষ পক্ষের বিবিকে সে ঈদের পার্বণে পীরের দরগায় দেখে প্রায় পাগলের মতো—কি করে, কি করে! কি করবে ফেলু ভেবে উঠতে পারল না। ফেলুর যৌবনকালে তল্লাটের ফেলু। সুতরাং সে ঈদের আর এক পার্বণে মেমান সেজে চলে গেল তলিমুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে। ওকে পাটের ব্যবসা করতে বলল—য্যান ফেলু কত বড় মহাজন। সে দাড়িতে আতর মাখত তখন, ভাল তামাক কিনে আনত বাবুর হাট থেকে, ও মেডেল গলায় ঝুলাত মাঝে মাঝে। বুড়ো তলিমুদ্দিন খেলার বড় উৎসাহদাতা ছিল। ফেলুর সঙ্গে জান পহচান বিবিরা বেটারা দেখুক। খেলোয়ার ফেলুকে সে অন্দর বাড়িতে একদিন ঢুকিয়ে দিল। ফেলুর পীরিতের ছলা কলা সব যেন জানা। ফুলের কুঁড়ির মত ছোট বিবিকে কাছিমের মতো বুকের ছাতি দেখাল একদিন। আম্মু দেখল সেই বুকের ছাতিতে মেডেলগুলো ঝক ঝক করছে। আর আম্মুর মনে পড়ছিল খুব ছোট বয়সের কথা। বালিকা আম্মু খেলা দেখতে গেছে—হাডুডু খেলা। ফেলু এসেছে খেলতে পরাপরদির হাটে। সেদিন হাটবার ছিল না, তবু কি লোক কি লোক! দু-দশ মাইলের ভিতর কোনো যুবা পুরুষ আর সেদিন ঘরে ছিল না। মেলার মতো প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে নিশান উড়ছিল—য্যান ঈদ মুবারক। ফেলু সেই মেলার প্রাণ ছিল। খেলা শেষ হলে ফেলুর জয় জয়কার। আম্মু, বালিকা আম্মু কেমন ফেলুর ভালবাসায় পড়ে গেল। সেই ফেলু এসেছে মেমান সেজে—তলিমুদ্দিন সাহেবের বিবি নিজেকেই যেন শুধাল, এই আছিল তর মনে। তারপর সময় বুঝে ছ্যাৎ ক'রে গলাটা কেটে ফেলল ফেলু। পাট ক্ষেতের ভিতর ছ্যাৎ ক'রে কেটে ফেলল গলার নালিটা।

যেমন সে কোরবানের দিনে দশটা-পাঁচটা কোরবানিতে চাকু চালায় বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে, তেমনি সে বিসমিল্লা রহমানে রহিম বলে হ্যাৎ ক'রে নালিটা তলিনুদ্দিন সাহেবের কেটে ফেলল। যেদিন সে বিবিকে বোরখা পরিয়ে নিয়ে আসে, সেদিন প্রথম কথাটা জানাল বিবিকে। আন্নু শুনে বলল, এই আছিল তর মনে! বলে সেই বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর হা হা ক'রে হেসে উঠল। আন্নুকে দেখলে মনেই হবে না ফেলুর জন্য সে এতবড় হত্যাকাণ্ড হজম ক'রে গেছে।

যখন মন খুশিতে উজান বায় না তখন ডাকে আন্নু, আর যখন উজানে উজানে মন নদীর মতো মাতাল তখন ডাকে আন্নু বেগম। কখনও ডাকে বেগম সাহেবা। ফেলু বেগম সাহেবার জন্য পাগল, আর পাগল এই মাইজলা বিবির দুই সুর্মাটানা চোখের জন্য। ঘাট থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই অশ্বত্থের ঝোপ ওর মতো নিরালম্ব মানুষের সামান্য আশ্রয়। সে ঝোপের ভিতর একটা মরা গোসাপের মতো উপুর হয়ে পড়ে থাকল। অথবা এখন শীতের দিন, এখন শিশিরের জন্য ঘাসে ঘাসে প্রজাপতি বসতে পারছে না, আর এখন জমি থেকে সব ফসল উঠে গেল বলে প্রায় মাঠ ফাঁকা। কেবল নরেন দাস অথবা মাঝি বাড়ির শ্রীশ চন্দ, প্রতাপ চন্দ বড় বাড়ির মুনিষ নিয়ে নিচু জমিতে তামাকের চাষ করছে, আর সব উর্বরা জমি থাকলে সেখানে পেঁয়াজ রসুন এবং চীনাবাদামের গাছ দেখা যাচ্ছে। ক্ষেতের চারপাশে বেড়া, মাঠে এখন ফসল নেই বলে গরু বাছুর সব প্রায় আল্গা ক'রে দিয়েছে চাষীরা। এই পথে এখন বড় কেউ আসবে না, সুতরাং নিরিবিলি উপুর হয়ে পড়ে থাকা চলে ঝোপের ভিতর। সে শিকারী বেড়ালের মতো উপুর হয়ে পড়ে থাকল — আন্নুর কথা মনে থাকল না। জালালির শরীরটা এখন মাঠের শেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুবের বাড়ির মালতি গরু নিয়ে এসেছে গোপাটে, সে গোপাটে গরুর খোঁটা পুঁতে চলে যাচ্ছে। মাঠের ভিতর আর দেখা গেল রঞ্জিতকে। সঙ্গে ভুজঙ্গ কবিরাজ, আর গোপাল। আরও দু-একজন রয়েছে, ফেলু এত দূর থেকে তাদের চিনতে পারল না। ওরা নিশ্চয়ই বাস্তুপূজার প্রসাদ নিতে যাচ্ছে। সরকারদের ঘাটপাড় তেমনি ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে, মাঠে মাঠে বাস্তুপূজার নিশান উড়ছে। ঠাকুর বাড়ি, পালবাড়ি এবং বিশ্বাসপাড়া যেদিকে তাকানো যাচ্ছিল সব দিকে সেই ঢাক ঢোলের বাজনা আর মেষ অথবা মোষের আর্ত ডাক। মোষ বলির সময় হলে সরকারদের পঞ্চাশ জন ঢাকি এক-সঙ্গে ছড়রা ছোটাবে। সে এবার একটু কাৎ হয়ে গলাটা কচ্ছপের মতো বাড়িয়ে দিল। মনে হল মাইজলা বিবির মুখ শরীর ঝোপের অন্তপাশে — ঠিক ঘাটের পথে উঠতে ছোট কামরাঙা গাছটার নিচে, আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন হাইজাদির সরকারেরা করজোড়ে গামছা গলায় দাঁড়িয়ে আছে। মোষের চামড়া এবং মাংস নিতে যারা শীতলক্ষার পার থেকে হেঁটে এসেছে তারা ঘাটের

অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে। মাঠে মাঠে উৎসব। আর ঝোপের ভিতরে ফেলু। সে মাইজলা বিবিকে দেখার জন্য কচ্ছপের মতো ঝোপের ভিতর গলা তুলে রাখল।

মালতি গোপাটে গরুর খোঁটা পুতে তাড়াতাড়ি লোডা আবুকে নিয়ে ঘাটে স্নান করতে চলে গেল। বাস্তুপুজা বলে সকাল সকাল আভারানী স্নান করেছে। মাঠে অমূল্য কলাগাছ পুঁতে এসেছে এবং দূর্বাঘাস চেঁচে চারিদিকটা পরিচ্ছন্ন ক'রে শুকনো আমের ডাল, বেলপাতা সব পেড়ে এনে বারকোষে রেখে দিয়েছে। গোটা তিনেক জমি পার হলে ঠাকুরবাড়ির ভিটা জমি। সেখানে বড় বৌ, ধনবৌ সকাল সকাল স্নান ক'রে চলে এসেছে। সোনা ঠাকুরঘর থেকে কাঁসি নিয়ে ছুটছে। আর সোনা কাঁসিটা জোরে জোরে বাজাচ্ছিল। পুকুরের জলে কচুরি পানা, কলমিলতা এবং এখন শীতের সময় বলে গাছে কোনো ফল নেই, ফুল বলতে কিছু শীতের ফুল, ঝুমকো লতা, শ্বেত জবা, রাঙা জবা। বাস্তুপুজায় রাঙা জবা দিতে নেই, শ্বেত জবা গাছ থেকে কে ভোর না হতেই তুলে সব নিয়ে গেছে। বড় বৌ সাজিতে সামান্য ফুল তুলতে পেরেছেন মাত্র। খুঁজে পেতে কিছু শ্বেত জবা, কিছু অতসী ফুল আর ঝুমকো লতা, বেলফুল কিছু আছে, শীতের জন্য ফুলগুলি তেমন ফোটে না ভাল, ফুলগুলি কুঁকড়ে আছে – অসময়ের ফুল বড় হতে চায় না। তবু তিনি খুব যত্ন ক'রে সব গাছ থেকে প্রায় ফুল তুলে ফেলেছেন।

তখন জালালি সকল গরীব দুঃখী মানুষদের সঙ্গে সেই বড় বিলে, প্রকাণ্ড বিলে – এ-পারে দাঁড়ালে যার ও-পার দেখা যায় না, যে বিলে ভিন্ন ভিন্ন সব কিংবদন্তি রয়েছে, বিলের চারপাশে নলখাগড়ার বন, মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙা, আবার দু-দশ একর নিয়ে গভীর জল, আবার কোথাও শুধুই জল, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না, কালো জল, জলে মুখ দেখা যায় – কালো জল বড় গভীর – সেখানে মানুষ যেতে নৌকা বাইতে ভয়, তেমন বিলে নেমে যাচ্ছে জালালি। জলের ভিতর কি এক দৈত্য থাকে বুঝি, কিংবদন্তির দৈত্য। ওর পেট পিঠ জোৎস্না রাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকার মতো। নৌকা ঘ্যান এক জলে ভাসে, জলে ভেসে নৌকা যায়, হাতির দাঁতের মতো সাদা ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায় তারপর মানুষের সাড়া পেলে টুপ ক'রে জলের নিচে ডুবে যায় – হায়, মানুষের অগম্য বুদ্ধি। অজ্ঞ মানুষের বিশ্বাস অলৌকিক ঘটনার মতো ঘটনা নেই। দুপুর রাতে চরাচরে যখন মানুষ জেগে থাকে না, যখন সারা বিলটা পাঁচ-দশ ক্রোশ জুড়ে জলের ভিতর ডুবে থাকে, যখন জ্যোৎস্নায় ফসলের মাঠ ভরে থাকে তখন জলে এক ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসে – ভিতরে রাজকন্যা এক, চাঁদ বেনের পুত্রবধূ হবে হয়তো, বেহুলা লখীন্দরের গল্প মানুষের প্রাণে কেবল বিহ্বলতা জাগায়। নৌকা বিলের জলে ভেসে উঠলে আলোতে আলোময়, যেন মাঝ-বিলে আগুন ধরে গেছে। তেমন বিলে নেমে যাবার আগে জালালি জলটা প্রথম মাথায় দিল, পরে মুখে জল দিল, তারপর

গোসাপের মতো জলে ভেসে গেল। শীতে কন্ কন্ করছে দাঁতগুলি, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না কিছুতে। কবে আবেদালি গেছে, মাস হয়ে যাবে প্রায়, ঘুরে এল না এখনও। এলে দু-চার সপ্তাহ পেট পুরে খাওয়া, তারপর ফের উপোস। জালালি জলে ভাসতে থাকল। ফুৎ করে জল মুখে নিয়ে হাওয়ার ভিতর জল ছুঁড়ে দিতে থাকল। সব মানুষগুলো সাঁতার কেটে যেখানে শাপলা শালুকের পাতা ভেসে আছে সেদিকটায় চলে যেতে থাকল ক্রমশ। বড় শালুকের জন্য সকলের বেশি লোভ। এই জলে কি আছে, কি নেই, কেউ বড় জানে না। বরং কি নেই, কি থাকতে না পারে এই বিস্ময়। এক সালে এই বিলে বড় কুমির ধরা পড়েছিল, কি এক সালে দুই অজগর সাপ ভেসে এসেছিল, আর কি এক সালে যেন হাজার হাজার মানুষ পুরীপুজার মেলা থেকে ফিরে আসায় সময় বিস্ময়ে দেখেছিল – বিলের ঠিক মাঝখানে কালো রঙের এক মঠ ভেসে উঠছে। ভেসে উঠতে উঠতে কিছু উপরে উঠে থেমে গেল, তারপর ফের নিচে নেমে জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় স্বপ্নের মতো ব্যাপারটা। যারা দেখেছে তারা মন্ত্রের মতো বিশ্বাস করেছে, যারা দেখে নি তারা আজগুবি গল্প মনে করেছে, আর যাদের অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস আছে তারা খবরটাকে নিয়ে নতুন কিংবদন্তি সৃষ্টি করেছে। মনে হয় বুঝি ঈশাখাঁ সোনাই বিবিকে নিয়ে এ-বিলে লুকিয়ে রয়েছে। সেই জাহাজের মতো ময়ূরপঙ্খীর হালের দাঁড় কালো রঙের মঠের মতো জলের উপর ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। শুধু একটু দেখিয়েই যেন ডুব দ্যায়। যেন বলে দেখো দেখো আমি এখনও বুড়া বয়সে সোনাইরে নিয়ে বড় সুখে আছি বিলের ভিতর। তোমরা আমার অনিষ্ট করলে আমিও তোমাদের অনিষ্ট করব। সেই ভয়ে ভরা ভাদরে বিলের মাঝ বরাবর কেউ নৌকা ছাড়ে না। এ-বিল বড় ভয়ংকর – বিলের তল নেই, জলের নিচে মাটি নেই, শুধু অন্ধকার আর প্রাচীন সব লতাগুল্ম নিয়ে চুপচাপ জলের ভিতর ডুবে আছে। ভয়ে কেউ এ-বিলে নৌকা ছেড়ে বাদাম দেয় না, বড় নিভৃতে যেতে হয়, যেন ঈশাখাঁর কালঘুম ভেঙে না যায়। অঞ্চলের মানুষেরা এ-বিলকে দানবের মতো ভয় পায়। ঈশম যে ঈশম সে পর্যন্ত এ-বিলের পাড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। কি এক জিন্ পরী পিছু লেগে ওকে রাতের বেলায় অজ্ঞান ক'রে দিয়েছিল। সেই বিলে গরীব দুঃখী মানুষেরা পেটের জ্বালা নিবারণের জন্য জলে নেমে গেল।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা মরে না জলে। জলের ভিতর ভেসে ছিল জালালি, যেন জলে নেমে গেলেই পেটের জ্বালা নিবারণ হবে। কিন্তু হায় জলের ভিতর, কাদার ভিতর, কোথাও প্রায় শালুকের গন্ধ নেই। সব রোজ রোজ তুলে নিয়ে গেলে কি থাকে! কিছু মরা শাপলা পাতা এখনও জলের উপর উল্টে আছে। শীতের দিনে শাপলা ফুল আর ফোটে না। শাপলা ফুলে কালো কালো ফল হয়েছে। সে শাপলা ফুলের দুটো ফল সংগ্রহ ক'রে ফেলল এবং জলের ভিতরই

জালালি ভাসতে ভাসতে খেতে থাকল। ভিতরে কালো কালো বীচি, এক ধরনের সোঁদা সোঁদা গন্ধ, স্বাদ বলতে মরি মরি কিছু না, খেতে হয় বলে খাওয়া। পেটের ভিতর জ্বালা থাকলে কি খেতে না সখ যায়! লাল আলুর মতো সেদ্ধ ক'রে খেতে হয় শালুকের ভিতরটা, একটু নুন দিয়ে, কোনো কোনো সময় তেঁতুলের অম্ল গোলা ফেলে দিলে প্রায় অমৃতের মতো স্বাদ। লোভে সাঁতার দিতে থাকল জালালি। সামনে ছুটো শালুক পাতা জলের ভিতর ডুবে আছে। লতা ছুটো ধরার জন্য সে জলের ভিতরে ডুব দিল। জলের নিচে নেমে গেল। অনেক নিচে লতা ধরে ধরে, আলগোছে লতা ধরে ধরে, জোরে টান দিলে লতাটা ছিঁড়ে যাবে, লতা ছিঁড়ে গেলে সব গেল, যাদুর ঘরে যাবার সিঁড়িটা তুলে নেবার মতো হবে। সুতরাং খুব সন্তর্পণে নিচের মাটিতে হাত রাখার জন্য চোখ বুঁজে, ডুবুরির মতো বুড়বুড়ি তুলে প্রায় হারিয়ে গেল। জলের নিচে বড় ভয়। ভয়ে চোখ খুলছে না জালালি। চোখ খুললেই মনে হয় কোন যাদুকরের দেশে সে এসে পৌছে গেছে, জলের নিচে সব জলজ ঘাসেরা ওকে নেচে নেচে ভয় দেখায়। নীল অথবা সবুজ মনে হয় চারিদিকটা। অন্ধকার অন্ধকার ভাব। সে এক শ্বাসে মাটির ভিতর থেকে শালুকটা তুলে প্রায় এক নিমিষে জল কেটে উপরে ভেসে উঠল। তারপর কত দীর্ঘকাল পর যেন আকাশ মাটি এবং সূর্য দেখতে পেয়েছে এমন নিশ্চিন্তে শ্বাস নেবার সময় মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল – সোনার চেয়েও দামী একটা বড় শালুক ওর হাতে।

পাতিলটা ঢেউ খেয়ে খেয়ে একটু দূরে সরে গেছে। কে পাতিলটাকে টেনে এনে শালুকের শেকড়গুলি প্রথম কামড়ে ছিঁড়ে দেখল শালুকটা যত বড় ভেবেছিল ঠিক তত বড় নয়। শালুকটা বোধহয় রক্ত শাপলার। পেত্তি শাপলার শালুকে বেশি মিষ্টি, সাদা শাপলার শালুকে কষ বেশি। রক্ত শাপলার শালুকে অল্প তিতা ভাব থাকে। তবু শালুকটাকে পরিচ্ছন্ন ক'রে খুব যত্নের সঙ্গে পাতিলের ভিতর রেখে পাড়ের দিকে তাকাল। কেউ আর এখন পাড়ে দাঁড়িয়ে নেই। যে যার মতো জলে ভেসে দূরে চলে যাচ্ছে। আবেদালি আসে না, কতকাল আসে না, কতকাল সে গয়না নৌকা বাইতে চলে গেল। সে আসে না, সে জব্বর আসে না, সে বাবুর হাটে তাঁতের কাজ নিয়ে চলে গেছে। জোটন এসেছিল একটা মুরগি নিয়ে আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, মুরগিটা উড়াল দিয়ে সেই যে হাজি সাহেবের বাড়িতে চলে গেল আর এল না। হাজি সাহেবের ছোট বিবি কোতল ক'রে ফেলল মুরগির গলাটা।

বিলের জলে দুঃখী মানুষেরা শালুকের খোঁজে ভেসে বেড়াচ্ছিল। চার পাশের গ্রাম থেকে দুঃখী মানুষেরা হেঁটে এসে নেমে গেল জলে। বেলা বেলিতে সকলে জল ছেড়ে উঠে যাবে। এই শীতের শেষে আর যখন শালুক থাকবে না, যখন জলের উপর আর কোনো শালুক পাতা ভাসবে না, অথবা এই বিলের জল শাস্ত,

নিরিবিলি, তখন ঝোপে জঙ্গলে অথবা জলের উপর বালিহাঁস ডাকবে, নানা-রকমের পাখি, লাল-নীল পালকের পাখি, চন্দনা পাখি, জলপিপি, এবং ভিন্ন ভিন্ন সব বক, ছোট বড় চকাচকিতে প্রায় বিলটা ছেয়ে যাবে। তখন মুড়াপাড়ার জমিদারবাবুর ছেলেরা হাতিতে চড়ে চলে আসবেন, তাঁবু ফেলবেন বিলের ধারে, এবং ভোরে অথবা জ্যোৎস্নায় পাখি শিকার ক'রে তাঁবুতে পাখির মাংস, ওরা শীতের শেষে মাসাধিক কাল পাখির মাংসে বনমহোৎসব চালাবে।

গ্রীষ্মকালটাই জালালির বড় দুঃসময়। প্রায় মাটিতে পেট দিয়ে পড়ে থাকতে হয়। বর্ষা এলে ধানের জমিতে পাটের জমিতে আবেদালির কাজের অন্ত থাকে না, বর্ষা শেষ হলে, জল কমতে থাকলে, শাপলা ফুল ফুটতে থাকলে মাটির নিচে অন্নের মতো প্রিয় এই শালুক, দুঃখী মানুষদের নিরন্ন মানুষদের একমাত্র সম্বল এই শালুক, সারা মাঠময়, জলের নিচে মাটির ভিতরে জন্ম নিতে থাকে। এই জল, জমি আর মাটির অন্তরে শালুক আপনার প্রিয় ধন—যেন ফেলতে নেই, অবজ্ঞা করতে নেই। বসে থাকলে পাপ—জালালি কাছে কাছে পাতিলটা রাখছিল। ডুব দিলে তখন অন্য কেউ হাত বাড়িয়ে শালুক তুলে নিতে পারে। সামনে শুধু জল, প্রায় অনন্ত জলরাশি, শালুকের লোভে খুব দূরে চলে এসেছে। বোধহয় এর পর আর শালুক নেই। ডান দিকে পদ্মফুলের বন। বাঁ দিকে স্ফটিক জল, সামনের জলে কি যেন সব ভেসে বেড়াচ্ছে। কি হবে আর—বড় গজার মাছ হবে হয়তো, বড় বড় গজার মাছ, থামের মতো লম্বা গজার মাছ, কালো কুচ কুচে, মাথায় লাল সিঁদুর গোলা রঙ, গায়ে অজগর সাপের মতো চক্র, ওর ভয় লাগছিল। তবু এই জায়গাটাতে কেউ আর আসে নি, এতদূর কেউ আসে নি বলেই বোধহয় কিছু ইতস্তত শালুক এখনও পড়ে আছে। সে লোভের জন্য এবং ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্য চোখ বুঁজে জলের নিচে ডুবে গেল। কিন্তু নিচে মনে হল, চোখ খুলতেই মনে হল—বড় একটা গজার মাছ ওর দিকে তাকিয়ে আছে, লেজ নাড়ছে। স্থির। আক্রমণ করার আগে বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে আছে। গজার মাছটা জালালিকে দেখছে, জলের নিচে আজব একটা জীব, বোধহয় মনুষ্যকুলের কেউ হবে প্রায় ব্যাঙের মতো নিচে নেমে আসছে। প্রাচীন সব জলজ ঘাস এবং গুল্মলতা—লতার ভিতরে মাছটা মুখ বার ক'রে রেখেছে। জালালি চোখ খুললেই শুধু মাছটার মুখ দেখতে পাচ্ছে, কালো ভয়ংকর মুখ একবার হাঁ করছে, আবার জল গিলে মুখ বন্ধ করছে। জালালিকে মাছটা এতটুকু ভয় পাচ্ছে না। বরং জালালিকেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু হায় পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, জ্বালা সহে না প্রাণে। ভয়ে বিস্ময়ে জালালি এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। তবু এত বড় লোভ সামলাতে পারল না জালালি। আর একটু নিচে গেলেই মাটিতে হাত লেগে যাবে এবং শালুকটা আয়ত্তে চলে আসবে। দমে আসছিল না। সে তাড়াতাড়ি জল কেটে ভেসে উঠল। দম নিল, একটু সময় ভেসে থেকে বিশ্রাম

নিল, ফের ডুবে জলের নিচে, সবুজ এক দেশ, নীল জলের গালিচা পাতা, অন্ধকারে মনে হয় কেউ সবুজ আলো জ্বালিয়ে রেখেছে, যত নিচে যাচ্ছে তত ক্রমশ অন্ধকার, অন্ধকার হতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আর তখনই হাতটা মাটিতে লতার গোড়ায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু অন্ধকারেও টের পাচ্ছিল জালালি, মাছের মুখটা হাঁ ক'রে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সন্তর্পণে। একটা মাছ, সামান্য মাছ— তুমি মাছ যত বড়ই হও—আমি মনুষ্যকুলে জন্মে তোমাকে ভয় পাব! বোধ হয় এমন কিছু ভাবতে ভাবতে সে শালুকের গোড়াটা চেপে ধরল। তারপর ও দেখল নীল সবুজ রঙের ঘাসের ভিতর মুখটা নড়ছে। খুব সন্তর্পণে নড়ছে। সে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করল না আর। অন্ধকারে একটা মাছের মুখ দেখে ভয় পাবে! সে একটু এগিয়ে গেল, মাছটা পিছু হটে যাচ্ছে, সে এবার আর দেরি করল না। শালুকটা তুলে জলের উপর ভেসে উঠল—সেই কবে একবার জালালি জলের নিচে হাঁস চুরি ক'রে গলা টিপে ধরেছিল, কবে একবার ঝড়ের রাতে সে হাঁসটা পুড়িয়ে নরম মাংস এবং ঠ্যাঙ চিবিয়ে আল্লার দুনিয়া বড় সুখের ভেবে বড় একটা ঢেকুর তুলেছিল—তার কথা মনে আসছে। সেই মৃত হাঁসটার মতো মাছ, সে-চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে চোখের সামনে। জালালি ওটা মনের ভয় ভাবল এবং ডুব দিল জলে। সবুজ নীল রঙের কদম ফুলের মতো এক প্রকট অন্ধকারে জালালি বুঝতে পারে নি কি তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বেশ সুখে একটার পর একটা ডুব দিয়ে গভীর জলের ভিতর চলে যেতে থাকল। ঠিক ডুবুরির মতো জলের নিচে নেমে যাচ্ছে, জলের ভিতর ভেসে উঠছে। তেমন অসংখ্য মানুষ এখন পাড়ে দাঁড়ালে দেখা যাবে। জলের ভিতর তারা ডুবে যাচ্ছে, জলের উপর ভেসে উঠছে। কখনও শালুক পাচ্ছে, কখনও পাচ্ছে না। আর ঠিক কখন পাবে কেউ বলতে পারছে না। সব লতার গোড়ায় শালুক থাকে না। ক্রমশ দলটা ছড়িয়ে পড়ছিল বিলের কিনারে কিনারে। সূর্য উপরে উঠে গেছে। দূরে চোখ মেলে তাকালে, শুধু গভীর জল, শান্ত এবং কালো। সেখানে এক শীতল ঠাণ্ডা হিমের ঘরে রয়েছে যেন। ওপার দেখা যাচ্ছে না। অনন্ত জলরাশি কত প্রাচীন কাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তি নিয়ে বিলের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে। শীতের সময়ে জলের রঙটা আরো কালো হয়ে ওঠে। শীতের সময়ে চারপাশের নল-খাগড়ায় ঝোপ থেকে পাখিরা অন্যত্র উড়ে যায় এবং ঝোপের ভিতর যেখানে জল থেকে জমি ভেসে উঠেছে সেখানে বিষাক্ত সাপেরা গর্তের ভিতর মরার মতো শীতের ঠাণ্ডায় পড়ে আছে। গ্রীষ্মের জন্য, বর্ষার জন্য ওদের প্রতীক্ষা। বর্ষা জলে পড়লেই অথবা বসন্তকালে যখন সূর্য মাঠের উপর কিরণ দেয় তখন বিষাক্ত সাপ সব মাঠ থেকে জলে নেমে যায়, জলের উপর ভেসে বেড়ায়। দূরের গজারি বন থেকে তখন কিছু ময়াল সাপ পর্যন্ত এই জলে এসে নামে। জালালি জলের ভিতর দেখছিল লাল চোখ দুটো ওর দিকে সারাক্ষণ তাকিয়ে থাকছে। কিছুই

স্পষ্ট নয়। কারণ অন্ধকার বড় প্রকট জলের গভীরে, নীল অথবা সবুজ রঙের ঝোপে যদি আর দুটো শালুক খুঁজে পাওয়া যায়। প্রলোভনে জালালি একটা পাতিহাঁস হয়ে গেল। আর জলের ভিতর ডুবে ডুবে লাল চোখ দুটোকে মরণ খেলা দেখাতে থাকল।

তখনও ফেলু ঝোপের ভিতর শুয়ে ছিল। নেমে আসছে, আসছে না। কামরাঙা গাছের ছায়ায় দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে না। রোদ মাথার উপরে উঠে এল, অথচ বিবির মুখ দেখা গেল না, অঙ্গ দেখা গেল না। মাঠের ভিতর বাস্তুপূজার ঢাক ঢোলের বাজনা থেমে গেছে। ঠাকুর বাড়ির পারেই বড় বৌ বাড়িতে উঠে গেছে। সোনা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই কাঁসি বাজাচ্ছে ট্যাঙ ট্যাঙ। কাঁসি বাজছিল ট্যাঙ ট্যাঙ। পূজা পার্বণ শেষ। এখন সব তিল তুলসি, বারকোষ, নৈবেদ্য এবং তিলা কদমা আর অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া। বড় সাদা পাথরে পায়েস। ধনবৌ সাদা পাথরে পায়েস বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। ফল ফুল, নূতন গামছা, ঘট আর নারকেল নিয়ে যাচ্ছে রঞ্জিত। মাঠের ভিতরই প্রসাদ বিতরণ হয়েছে। গ্রামের যুবা পুরুষেরা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধারা প্রসাদ নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর হ্যাজাকের আলো জলবে রাতে। সরকাররা পুকুরের চার পাড়ে চারটা হ্যাজাক জ্বালাবে, পথের উপর ডে-লাইট জলবে, মাঠে কত হ্যাজাকের আলো, আলোতে এই মাঠ এবং গ্রামসকল এক সময় মাত্র এক রাত্রির জন্য ডুবে থাকবে। আর ভেড়ার মাংস এবং আতপ চালের সুগন্ধ মাঠময় আলোর সঙ্গে ভেসে বেড়াবে। রঞ্জিত হাত কাটা গেঞ্জি গায়ে অন্য জমিতে মালতিকে দেখছিল। মালতি বড় ব্যস্ত। সে কিছু লোককে বসিয়ে খিচুরি পায়েস খাওয়াচ্ছে। শীতের রোদে বেশ আমেজ আসছিল। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ শীত শীত ভাব, সকলে পেট পুরে খেয়ে রোদের ভিতর ঘাসের উপরে যেন প্রায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

আর তখন সোনা কাঁসি ফেলে ছুটছিল গোপাট ধরে। ফতিমা মাঠে ছাগল দিতে এসে কেন জানি সোনাকে ইশারাতে ডাকছে। ফতিমা একটা চারা গাছে দড়িটা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সোনা ভিটা জমিতে কাঁসি ফেলে গোপাটের উপর দিয়ে ছুটছে। ফতিমার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুই আমারে ডাকলি ?

ফতিমা মুখে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ সোনাবাবু।

এবার ফতিমা পা টিপে টিপে হাঁটছে। সোনা ও ফতিমার দেখা দেখি পা টিপে টিপে হাঁটতে থাকল। যেন ফতিমা বড় একটা কচ্ছপ দেখে ফেলেছে। কচ্ছপটাকে ধরার জন্য সে সোনাকে নিয়ে যাচ্ছে। কারণ এখন শীতকাল, শীতের জন্য কচ্ছপেরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারে না, পাড়ে উঠে রোদ পোহায়। অথবা জমির ভিতর কচ্ছপেরা লুকিয়ে থাকে, লাঙলের ফালে মাটির ভিতর থেকে

কচ্ছপ উঠে আসতে পারে। কিন্তু ফতিমা সে-সবের কিছুই দেখাল না। অশ্বত্থ গাছটার নিচে সোনাকে টেনে নিয়ে গেল। ঝোপ জঙ্গলের ভিতর দুটো কেবল পা দেখা যাচ্ছে। মানুষ হবে, পাগল ঠাকুর হবে, বোধ হয় পাগল ঠাকুরই ঝোপের ভিতর লুকিয়ে আছে। ফতিমা অন্তত তাই ভেবেছিল। সোনাবাবুর পাগল জ্যাঠামশাই যিনি রাতে বিরাতে, কোনোদিন খুব ভোরবেলা উঠে মাঠ পার হয়ে, সোনালি বালির নদী পার হয়ে নিরুদ্দেশে চলে যান সেই মানুষই হয়তো আজ আর বেশি দূরে হেঁটে না গিয়ে এই অশ্বত্থের নিচে সিটকিলা-ঝোপের ভিতর শুয়ে থেকে পাখির সঙ্গে গল্প করছেন। তিনি সারাজীবনভর কি সব গল্প বিড় বিড় ক'রে বলে যাচ্ছেন—কাকে যেন, কি যেন তিনি এই সব মাঠ ঘাট এবং মানুষের উদ্দেশ্যে বলে যাচ্ছেন। ছোট মানুষ ফতিমা, সামুর একমাত্র মেয়ে ফতিমা জানে না—এই মানুষ পাগল মানুষ নয়, এ-অন্য মানুষ ফেলু শেখ। ফেলু শেখ চুপচাপ এখনও ঘাটে সেই পরানের চেয়ে প্রিয়, মরনে যার স্মৃতি ভোলা দায়—সেই এক পরম আশ্চর্য যুবতীকে দেখার জন্য শিকারী বেড়ালের মতো শুয়েছিল। সোনা ঝোপের বাইরে থেকে ডাকল, জ্যাঠামশায়। কারণ যখন পা দেখা যাচ্ছে তখন পাগল মানুষ ব্যতীত আর কে হবে! এই অঞ্চলে তিনিই তো একমাত্র মানুষ যাঁর কাছে এই মাঠ, গাছ-গাছালি এবং পরবের দিনে উৎসব সব সমান।

ফেলু এত নিবিষ্ট ছিল যে, সে কতক্ষণ শুয়ে আছে খেয়াল করতে পারে নি। সোনাবাবুর গলা পেয়ে পেছন তাকাতেই দেখল, সোনা ফতিমাকে নিয়ে গুঁড়ি মেরে ঝোপের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ধর ফর করে উঠে বসল। ঝোপ থেকে পাগলের মতো বের হয়ে বাড়ির দিকে ছুটবে ভাবল—কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে ধরা পড়বে, সে ঝোপের ভিতর কি হাতড়াতে থাকল।

সোনা এবং ফতিমা বুঝতেই পারে নি, এমন একটা নীরস মানুষ ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকতে পারে। সোনা বলল, আপনে ঝোপের ভিতর?

ফেলুর কি হারিয়ে গেছে এমন চোখে মুখে বলল, ঝোপের ভিতরে শিকড় বাকর খুঁজতাছি।

—কি হৈব!

—হাতটা ভাইঙ্গা গ্যাছে। বলে বাঁ হাতটা সোনার দিকে তুলে ধরে দেখাল। শিকড়ের রস দিলে জোড়া লাগতে পারে।

সোনা বলল, পাইলেন নি।

না রে করতা পাইলাম না। কৈ যে সব লুকাইয়া থাকে। বলে ফেলু ফতিমার দিকে কটমট করে তাকাল। ঝোপের ভিতর ফতিমা এবং সোনা। এক এক ঝোপের ভিতর, পাশে ঠাকুরদের ছোট পোলা সোনা। সে সোনা বাবুকে কিছু বলল না। সামু মাইয়াটারে বড় আসকারা দ্যায়। মাইয়াটারে ইংরাজি শিখায়, এত অধম্ম ভাল নয় মনে হল ফেলুর। সঙ্গে সঙ্গে পাগল ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে,

মুখ ভেসে উঠলেই ভিতরের সেই অধর্মটা জেগে ওঠে। হাতের দিকে তাকালে দুঃখের সীমা থাকে না। ফেলুর প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। সেই যে বিবি আম্মু বেগম, সে পর্যন্ত তেলের নাম ক'রে হাজি সাহেবের ছোট বিবির কাছে চলে গেল। সে এখনও ফিরেছে কিনা কে জানে! ফেলু তাই ভাবল, একটু তাড়াতাড়ি করা যাক। বিবির কথা মনে হতেই সে পা চালিয়ে হাঁটল। তাড়াতাড়ি করতে গেলে বড় বাগের ভিতর দিয়ে সোজা উঠে যেতে হয়। পথ নেই, শুধু বাঁশের জঙ্গল, কিছু বেতগাছ এবং চারপাশটা বড় অন্ধকার। দিনের বেলায় হেঁটে যেতে পর্যন্ত গা ছম ছম করে। পাশেই গ্রামের কবরখানা। ফেলু হন হন করে হাঁটছিল। বাঁ হাতে একেবারেই শক্তি নেই। কব্জিতে মন্ত্রপড়া কড়ি ঝুলছে। যদি বিবি এখনও সঙ ক'রে বেড়ায় সে বিবির পেটে একটা লাথি মারবে। তার শরীর এবং দাঁত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর তক্ষুনি দেখল বিবি তার বাগের অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসছে। কিন্তু হাতটা, হায় হাতটা! সে বিবিকে বাগের অন্ধকার থেকে বের হতেই চিৎকার করে উঠল, তুই আম্মু···!

আম্মু দাঁড়াল না। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, তুমি মানুষটা ক্যামনতর! কৈলাম হস্ করতে কাওয়া আর তুমি বাগের ভিতর···!

—তুই এহানে কি করতাছস?

—আমি তোমারে খোঁজতাছি।

—অঃ। ফেলু নিজের পেটেই এবার একটা লাথি মারতে চাইল। বিবিটা পর্যন্ত ধরে ফেলেছে ফেলু পঙ্গু হয়ে গেছে। কে কার পেটে এখন লাথি মারে! আম্মু পরম কুলিন এক যুবতী কন্যার মতো বাগের ভিতরে ডুব দিয়ে জল খাচ্ছে, একাদশীর বাপও টের পাচ্ছে না। ফেলু বলল, তুই মনে করস আমি কিছু বুঝি না!

—আর তুই মনে করস আমি-অ কিছু বুঝি না। ঠিক ফেলুর মতো গলায় রাগ এবং বিদ্বেষ ঢেলে কথাটা বলল আম্মু।

—তুই যুবতী মাইয়া তর বোঝনের না আছে কি ক'। বলে ফেলু কথা আর বাড়াল না। দূরে ফতিমা এবং সোনাবাবু দাঁড়িয়ে আছে। সোনাবাবু কাঁঠাল গাছ থেকে ফতিমাকে ডাল ভেঙে দিচ্ছে। গোলমাল বাধালে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি করলে এখানে ওরা ছুটে আসতে পারে! ছুটে এলেই সব কথা ফাঁস হয়ে যাবে—অশ্বত্থের ঝোপে সে শুয়েছিল, গাছে তখন কাক উড়ছিল না, মেলার গরু খাচ্ছে, গলায় ঘণ্টা বাজছিল, আর ঘাসের ভিতর পড়ে থেকে মাইজলা বিবির সনে সঙ—সব টের পাবে যুবতী মেয়ে আম্মু। সে চুপচাপ আম্মুর শরীরের আঁশটে গন্ধটা এবারের মতো হজম ক'রে গেল। সে শুধু চিৎকার ক'রে বলল, গোসল কইরা বাড়িতে ঢুকবি। না হয় তর একদিন কি আমার একদিন! আর এই হজমের ফলে সব রাগ গিয়ে পড়ল পাগল ঠাকুরের উপর, যে এক হাতিতে চড়ে

ওর দুই হাত ভেঙে এখন মাঠে ময়দানে পাখি উড়াচ্ছে। এবং বাতাসে ফু দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই মানুষকে বাগে পেলে পীর না বানিয়ে ছাড়ছে না ফেলু। রাগ এবং বিদ্বেষ ওকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। বিবি আম্মু এই ঝোপ জঙ্গলের ভিতর কি করছিল যেন সব ওর জানা। কিন্তু অসহায় ফেলু দুহাত উপরে তুলতে গিয়ে দেখল, সে নাচারি বেরামি মানুষ। এমন জবরদস্ত বিবির সঙ্গে বুঝি সে আর ইহজীবনে লড়তে পারবে না। লড়তে পারলে বোধহয় এই অন্ধকার বাগের ভিতর এখন এক প্রলয়ের মতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেত। অগত্যা ফেলু ভালমানুষের মতো আম্মুর পিছনে পিছনে, যেন সে এবং আম্মু মেমান বাড়ি থেকে বাগের ভিতর দিয়ে ফিরছে—কোনো তফকতা নেই, পরস্পর তেমনভাবে হাঁটছে। মাঠে তখনও ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। তখনও মালতি প্রসাদ বিতরণ করছে মাঠে। কাগজের লাল নীল পতাকা উড়ছে বাতাসে। মাঠের ভিতর সাদা ধবধবে গরদ পরে মালতি, নিষ্ঠাবতী, ধর্মাধর্ম যার একমাত্র সম্বল, যে সকলের মতো হাস পুষে বড় করছে, পুরুষ হাঁসটার জন্য যার মমতা, আর বর্ষায় যে চুপ চাপ নিঃশব্দে বৃষ্টি ভিজে সারারাত ধরে সেই যুবতী মালতি, বিধবা মালতি এখন বাস্তুপূজার পায়েস খাওয়াচ্ছে সকল মানুষকে।

গাছের ডালে সোনাবাবু। ফতিমা দুষ্টু প্রজাপতির মতো চারা কাঁঠাল গাছটার চারপাশে ঘুরছে এবং লাফাচ্ছে। ডালপাতা ছাগলটার জন্য সংগ্রহ করছে। সোনা ছাগলটার জন্য ডাল ভেঙে দিচ্ছিল গাছের। কাঁঠাল পাতা খাবার জন্য ছাগলটা ছোট এক বাচ্চা ছাগল দু-পায়ে ভর ক'রে লাফ দিচ্ছিল। সোনা ছাগলটার পাতা খাবার আনন্দ দেখে গাছের সব কচি কাঁচা পাতা টেনে আনছে এবং ছাগলটার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ছাগলটার পাশে এখন পাতার ডাঁই। সোনা লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়ল। ফতিমা কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল যাইবেন ?

—কোনখানে ?

—বকুল ফল আনতে যাইবেন।

—কত দূর !

—বেশি দূর না। বলে আঙুল তুলে বলল, ঐ যে ত্যাখছেন না হাসান পীরের দরগা, দরগার ডাইনে ট্যাবার পুসকনি, আমরা যামু পুসকনির পারে।

—ছোট কাকায় বকব।

—যামু আর আমু। এক দৌড়ে যামু, এক দৌড়ে আমু।

সোনা চারিদিকে তাকাল। পূজা পার্বণের দিনে কারো লক্ষ নেই—বাস্তু পূজার দিন লাল্টু পল্টু ছোট কাকার সঙ্গে গেছে। গ্রামে গ্রামে বড় বড় গেরস্থ ঘরে আজ বাস্তুপূজা। কাকার সঙ্গে ওরা চরু রান্নার জন্য গেছে। মামা গেছে সরকারদের পূজাতে। শোভা আবু কিরনি সবাই বাস্তুপূজার প্রসাদ খেয়ে

বেড়াচ্ছে। পূজা পার্বণের দিনে কে কোথায় যায়—কে কার পবর রাখে! পাগল জ্যাঠামশাই ভোরে কোনদিকে বের হয়ে গেলেন, কেউ টের করতে পারে নি। সোনা মনে মনে ভেবে নিল, বেশি দেরি হলে সকলে ভাববে, সোনা গেছে পাগল ঠাকুরের সঙ্গে। সুতরাং সোনা বো বে শব্দ করতে থাকল মুখে। তারপর ওরা মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে থাকল। বড় মাঠ, উত্তরে গেলে হাসান পীরের দরগা, দরগার পথ ধরে সাইকেলে গোপাল ডাক্তার ফিরছে, গোপাল ডাক্তার দেখে ফেলবে ভয়ে ওরা দালান বাড়ির পুকুর পাড়ে যে পালটা আছে তার ভিতর নেমে গেল এবং দুজনে চুপচাপ মাথা গুঁজে বসে থাকল, কারণ এই মাঠের ভিতর, এত বড় মাঠের ভিতর সোনা এবং ফতিমাকে একা একা ঘুরতে দেখলে আশঙ্কার কথা! তুমি ছেলে সোনা, সেদিনের সোনা, একা একা এত বড় বিশাল বিলেন মাঠে নেমে এসেছ—কি সাহস তোমাদের! চল চল বাড়ি চল! অথবা কিছু তিরস্কার, কিংবা বাড়িতে পবরটা পৌছে দিলে ঈশম ছুটবে, ঈশম তার প্রিয় তরমুজ ক্ষেত ফেলে ছুটে আসবে। আর মাঠের ভিতর দাঁড়িয়ে অথবা বিলেন মাঠে নেমে গিয়ে ডাকবে, সোনাবাবু কৈ গ্যালেন! অঃ সোনাবাবু।

কবে একবার সোনা একা একা তরমুজ খেতে নেমে গিয়েছিল, কবে—সেই কতকাল আগে—সোনা প্রথম গ্রামের বাইরে বের হয়ে দক্ষিণের মাঠে—সোনালি বালির নদীর চরে তরমুজ ক্ষেতের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিল সঠিক মনে নেই, কিন্তু সেই তরমুজ ক্ষেত, মালিনি, মাছ এবং বড় মিঞার দুই বিবি—দুর্গা ঠাকুরের মতো মুখ—নাকে নথ দুলছিল—কি এক রোমাঞ্চ জীবনে, সোনা সেই এক রোমাঞ্চের লোভে ছুটছে। ফতিমা কাপড়টা গামছার মতো ক'রে প্যাচ দিয়ে পরেছে। শরীরে ফতিমার জামা নেই। কোনো ব্রুক নেই। খালি গা, নাকে নথ দুলছে ফতিমার, কানে পেতলের মাকরি আর নাকের বাঁসিতে সোনার নাকচাবির মুখটা চ্যাপ্টা চাঁদের মতো। কথা নেই বার্তা নেই, সোনা ফতিমার নাকটা চ্যাপ্টা ক'রে ধরে নাকের ভিতরে সেই চ্যাপ্টা চাঁদ কি ক'রে বাঁসিতে আটকে আছে দেখল। ফতিমার খুব লাগছিল নাকে—কিন্তু সোনাবাবু, ছোট্ট সোনাবাবু—শরীরে যার চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে আর মাথায় কি সুমধুর গন্ধ, সোনাবাবু নাক উল্টে দেখছে।

ফতিমার শরীর শির শির ক'রে আনন্দে কাঁপছিল। সে বলল, সোনাবাবু চলেন, গোপাল ডাক্তার গ্যাছে গিয়া। দূরে আলের উপর গোপাল ডাক্তারের ঘন্টি বাজছিল, আর প্রান্তরে যখন শস্য নেই, যখন মাঠ ফাঁকা, শুধু মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ জঙ্গল দাঁড়িয়ে আছে তখন ছুটে যাওয়া ভাল। ওরা ছোটার সময়ই দেখল, ট্যাবার পুকুরের নিচে যে মাঠ আছে সেখানে পাগল জ্যাঠামশাই। তিনি হন হন ক'রে বিলের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। সোনা আর মুহূর্ত দেরি করল না। সে যেন জ্যাঠামশাইকে মাঠের ভিতর আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে তেমন বিস্ময়

গলায় নিয়ে ডাকল, জ্যাঠামশায় ! কিন্তু মানুষটা হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। ঢাক ঢোল বাজছে তো বাজছেই। বাস্তুপুজায় মোষ বলির খাঁড়াতে রক্ত লাগছে তো লাগছেই। আর সোনা ফতিমা মাঠের উপর দিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। ওরা ছুটছিল আর ডাকছিল, ওরা টিবির উপর উঠে ডাকল, জ্যাঠামশায় ! কে কার কথা শোনে ! জ্যাঠামশাই পুকুরটার পাড়ে পাড়ে যে বন আছে তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সংসারে কত কিছু ঘটে, কত কিছু ঘটে না। ফসল ফলে না সব সময় মাঠে। এখন কোথাও রুক্ষ মাঠ, কোথাও জমিতে তামাকের পাতা দেখা যাচ্ছে, পেঁয়াজ রসুন আলু বাঁধাকপি উঁচু জমিতে—পুকুর থেকে জল তুলে পেঁয়াজ আলু বাঁধাকপির চাষ করছে বড় গেরস্থ প্রতাপ চন্দ। আলে আলে দুই বালক বালিকা ছুটছে, টিবি থেকে নেমে মাঝিদের বড় জমি পার হয়ে ছুটছে। অকালের ফল বকুল ফল বনের ভিতর, ওরা বকুল ফলের অন্বেষণে ছুটে যাচ্ছে। ফতিমা ফল কুড়াবে, সঙ্গে সোনাবাবু আছে, ভর দুপুরের রোদ রয়েছে, আর শীতের সূর্য মাথার উপর বলে ওদের এতটুকু শীত করছিল না। খালি গায়ে খালি পায়ে ছুটছে যেন দুটো খরগোশ তাড়া খেয়ে বনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সহসা মনে হল সোনার ওরা বড় বেশি দূর একা একা চলে এসেছে। দূরে প্রতাপ চন্দের তিন তলা দালানের চিলে কোঠা দেখা যাচ্ছে। জায়গাটা বড় নির্জন। পুকুরটা প্রাচীন, মজা দিঘির মতো দাম এবং কচুরিপানায় ঠাসা। পাড়ে পাড়ে কত বিচিত্র গাছগাছালি গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। ছোট বড় লতার ঝোপ—পায়ে হাঁটা পথ সামান্য। ঘাস পাতা শুকনো। মাটিতে মরা ডাল, পাখির পালক। পাখিদের রাতের আস্তানা বোধহয় মাথার উপরে প্রাচীন এক অর্জুনের ডালে। তার নিচে কত যুগ ধরে, মাছের এবং মানুষের হাড়, গরু বাছুরের হাড়। পাশেই এক জরদ্‌গবের মতো কদুই গাছ, বহু বছরের গাছটার ভিতরে কত বিচিত্র খোঁদল, অনেক উঁচুতে উঠে গেছে ডালপালা নিয়ে—প্রায় অনেকটা জায়গা জুড়ে গাছটা অন্ধকার সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, একপাশে সব মৃত ডাল গাছের, ডালে প্রায় হাজার হবে শকুন সার সার বসে রয়েছে। ওরা গাছটার নিচে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু এইটুকু পথ পার না হতে পারলে ওরা অকালের ফল বকুল ফল খুঁজে পাবে না। বকুল গাছটা বড় নয়, ছোট, ঝোপে জঙ্গলে গাছটাকে খুঁজে বের করা কঠিন। গাছটার খোঁজ খবর ফতিমাকে জোটন দিয়ে গেছে। আবেদালির দিদি জোটন আবেদালির জন্য একটা মুরগি এনেছিল, মুরগিটা উড়াল দিয়ে চলে গেল হাজি সাহেবের আতা বেড়াতে, আতা বেড়ার পাশে ছোট বিবির সঙ্গে দেখা, সে বলল, মুরগিটা মাঠের দিকে নেমে গেছে আর মাঠে নামলেই মনে হল দূরে কি একটা কেবল ছুটছে। বুঝি কুকুর হবে। বেড়াল হতে পারে। মাঠের উপর দিয়ে কোনো কারণে ছুটে

পালাচ্ছিল। মাঠে নামতেই হাজি সাহেবের ছোট বেটার সঙ্গে দেখা। ঐ যায়, যায়। দেখা যায়। মুরগি উড়ে যায়। সব সলা পরামর্শ যেন ঠিক ছিল। দূরের মাঠে কি ছুটতে দেখে সেও ছুটছিল। জোটন মুরগিটা চুরি ক'রে এনেছিল আবেদালিকে খাওয়াবে বলে। জোটনের ধারণা এখন সেই মুরগি ফাঁক বুঝে তার গ্রামের দিকে পালাচ্ছে। পোষা মুরগি, বড় সোহাগের মুরগি মৌলভি সাবের। আদরের মুরগি মাঠের উপর দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। সে কি ভেবে তাড়াতাড়ি মুরগি ধরার জন্য ছুটতে থাকল। যদি এ-মুরগি চলে যায় আর যদি টের পায় মৌলভি সাব, মুরগি যাবার পথে জোটন চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তবে রক্ষা থাকবে না। সেই মুরগি যখন মনে হল ট্যাবার পুকুর পাড়ে বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে তখন জোটনও না ছুটে পারল না। এত সপ করে, এত কুরনিস ক'রে মুরগিটা ধরে এনেছে আবেদালিকে খাওয়াবে বলে, এখন হায় সেই মুরগির চৈতন্য উদয়—কি হবে কি হবে! সুতরাং ছোটা ভাল। মুরগি ধরার জন্য জোটন কাপড় হাঁটুর উপর তুলে ছুটতে থাকল। ছুটতে ছুটতে ট্যাবার পুকুর পাড়ে, ভিতরের জঙ্গলে, কিন্তু শেষে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। মুরগিটা যদি গাছের ডালে চুপচাপ বসে থাকে, উঁকি দিয়ে দেখতে থাকল। তখন মুরগির গলা টিপে ধরছে ছোট বিবি। হাজি সাহেবের ছোট বিবি মুরগির কণ্ঠনালী কেটে হাতের ভিতর গলাটা শক্ত ক'রে ধরে টিপে রেখেছে। হায় মুরগি তুই কোথায় গেলি! ঝোপে জঙ্গলে জোটন মুরগি খুঁজতে এসে কপাল থাপরাতে থাকল। তখন মনে হল ঝুঁটিতে লাল রঙ মুরগি; ঝোপের ভিতর লাল রঙের কি যেন দেখা যায়! সে লোভে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল, কিন্তু হায় ঢুকে দেখল গাছের ডালে লাল লাল বকুল ফল। অকালে বকুল ফল ধরেছে গাছটাতে। পাকা ফল দুটো চারটা নিচে পড়ে আছে। একটা বেড়াল কি একটা নেড়ি কুকুর এই বাগের ভিতর ঢুকে গেল। আবছা অস্পষ্ট শীতের রোদে দূর থেকে বিড়াল কুকুর না অন্য কোন জীব ধরা যাচ্ছিল না। জোটন ভেবেছিল ওর মুরগি পালাচ্ছে। নাকের বদলে নরুণ পাবার মতো জোটন মুরগির বদলে বকুল ফল তুলে নিল। সেই ফল এনে ফতিমার হাতে দিয়েছে, আর বলেছে সেই আশ্চর্য বকুল ফলের গাছটা বনের ভেতরে লুকিয়ে আছে।

গাছটার অনুসন্ধানে এসে সোনার ভয় ধরে গেল। সে বলল, আমার ভয় করতাসে ফতিমা।

—ভয় কিয়ের! আইয়েন আপনে। বলে ফতিমা সোনার হাত ধরে কড়ুই গাছটার দিকে তাকাল। বড় বড় শকুন, ওরা নিবিষ্ট মনে বসে আছে। কড়ুই গাছটার দিকে তাকালেই সোনার ভয়টা বাড়ছে। ওরা শকুনের রাজা গৃধিনীকে দেখতে পেল। মগ ডালে বসে রাজার মতো তাবৎ পৃথিবীর কোথায় কোন মৃত জীব পড়ে আছে বাতাস শুঁকে টের পাবার চেষ্টা করছে। অন্য শকুনগুলি ঠোঁট

গুঁজে বোধ হয় ঘুমাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো ঘাড় নিচু ক'রে একবার দেখে ফেলল, ছোট ছুটো কাঠের পুতুলের মত ছুই মনুষ্যকুলের জীব নিচে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শকুনের রাজা সব সময় জেগে। সে ক্ষুধার জন্ম শিকারের খবর দেবে। সেই মাত্র উঁচু মুখে আকাশের অন্ত প্রান্তে কি উড়ে যাচ্ছে, কারা উড়ে যাচ্ছে, কত হবে··· আর যদি মৃত জীবের গন্ধ ভেসে আসে সে প্রথমে ছ পাখা বাতাসে ছড়িয়ে দেবে, তারপর উড়তে থাকবে আকাশে—প্রায় মনে হয় তখন নির্বাণ লাভের মতো এই সব বড় বড় পাখিরা কোন এক অদৃশ্য জগতের সন্ধানে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজা শকুনটা উড়ার বদলে কেবল উঁকি দিয়ে ওদের দেখছে। ফতিমা যে ফতিমা, যে একা গোপাটে ছাগল নিয়ে আসে, যে মাথায় ক'রে সান্‌কিতে নাস্তা নিয়ে ঘাস জমিতে, যার ভয়ডর একেবারে কম, পাট ক্ষেত বড় হলে অথবা নির্জন মাঠের ভিতরে যখন বড় বড় পাট গাছগুলি ফতিমার মাথা পার হয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায়, যখন সামনের আল পথ সিঁথির মতো, ছুধারে পাটের গাছ ঘন বনের সৃষ্টি ক'রে রাখে তেমন পথে কতবার ফতিমা একা একা চলে এসেছে ছাগলটার দড়ি ধরে, ধরে আর সেই ফতিমা কেমন ভয় পেয়ে গেল শকুনটা নিচের দিকে তাকাতেই। সে লাফ দিয়ে ছুটতে চাইল সোনাবাবুর হাত ধরে—যেন এই গাছটা গল্পের সেই সদর দেউড়ি। গাছটা রাক্ষস খোক্কসের মতো সদর দেউড়িতে পাহারা দিচ্ছে। দেউড়ি পার হতে পারলেই ফুল ফল রাজকন্যা সব মিলে যাবে। ফতিমা সাহসে ভর ক'রে ফুল ফল রাজকন্যা এবং সেই অত্যাশ্চর্য জগতের জন্ম সোনাবাবুকে ঠেলে ঠুলে পাখির পালক, মাছের হাড়, মানুষের হাড় এবং এইসব পাখিদের মলমূত্র অতিক্রম ক'রে বনের ভিতর ঢুকে গেল। ভিতরে বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল, পাখিরা ডাকছিল, প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, একটা গিরগিটি ক্লপ ক্লপ শব্দ ক'রে ডাল থেকে পাতায় উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল। বড় নির্জন মনে হচ্ছিল জায়গাটা—কোথাও কোনো মানুষের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দূরে কে যেন কেবল কাঠ কেটে চলেছে—তার শব্দ ভেসে আসছিল। কান পাতলে ঢাক ঢোলের শব্দ শোনা যায়। ওরা এমন একটা জায়গায় চলে এসে পরস্পর এই প্রথম ভাল ক'রে তাকাল।

ফতিমা বলল, সোনাবাবু আপনেরে ছুঁইয়া দিলাম। বাড়ি গ্যালে সান করতে হৈব।

সোনা ভয়ে ভয়ে বলল, তুই ছুঁইলে ক্যান আমারে ?

—আমি ছুঁইলাম, না আপনে ছুঁইলেন! নাকের নাকচাবিটা আপনে উল্টাইয়া ছাখলেন না ?

—মায় জানতে পারলে আমারে মারব। সোনার চোখের উপর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। যদি কোনো কারণে এই খবর বাড়ির ভিতর রটে যায়, সেই বর্ষার

মতো. ফতিমা বাপের সঙ্গে নৌকায় এসেছিল, পাগল জ্যাঠামশাই ফুলের বাগানে ঘাসের উপর শুয়ে দোপাটি ফুলে প্রজাপতি দেখছিলেন—ফতিমা ফুল গাছের ছায়ায় সোনাবাবু আর পাগল ঠাকুরকে দেখে ছুটে গিয়েছিল, সোনা ফতিমাকে প্রজাপতি ধরে দিয়েছিল কচুর পাতায়, সোনা ফতিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছিল—তারপর কথাটা রটনা হতেই, বড়রা মেজরা পল্টু লাল্টু খবরটা ঠাকুরমাকে জানাতেই কি অনর্থ—মা ওকে খুব মেরেছিলেন, মুখের ভাত কেড়ে চুল ধরে টেনে এনে রান্নাঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে বড় ঘটিতে দু-ঘটি জল ঢেলে, কি সব কু-বাক্য উচ্চারণ—এখন আর মনে পড়ছে না সব। ফতিমার কথায় সোনার যথার্থই ভয় ধরে গেছে। সোনা আস্তে আস্তে বলল, তুই কিন্তু কৈয়া দিস না।

—আমি কৈতে যামু ক্যান।

—কৈলে ঠিক আমারে মায় মারব।

—কোনো দিন কমুনা।

—তিন সত্য।

—তিন সত্য।

—কালীর কিরা।

—কালীর কিরা।

সোনা যেন এবার একটু স্বস্তি অনুভব করল। ফতিমা না বললে এ-কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

চারিদিকে বড় বড় গাছ, অপরিচিত গাছ। ঝোপ জঙ্গলে লতায় পাতায় প্রায় কোথাও কোথাও নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে। ওরা সেই অরণ্যের ভিতর বকুল গাছটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন ওরা বলতে চাইছে, বৃক্ষ তুমি এতদিন কার ছিলে? বৃক্ষ উত্তর দিল, রাক্ষসের।

—এখন কার?

—এখন তোমাদের।

—তবে তুমি আমাদের ফল দাও, বকুল ফল।

ওরা পায়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। দ্রুত হাঁটতে পারছে না। পুকুরের চার পাশটায় এবং কিছু জমি নিয়ে জঙ্গলটার যেন শেষ নেই—কতদূর হেঁটে যাওয়া যায় যেন এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, শুকনো ঘাস পাতা পায়ের নিচে, কত দীর্ঘ দিনের মানুষ বিবর্জিত জায়গা—ওরা হামাগুড়ি দিয়ে অথবা সন্তর্পণে কাটাগাছ পার হবার জন্য ছোট ছোট লাফ দিচ্ছিল। আর মনে মনে সেই গল্পের মতো বলা, বৃক্ষ তুমি কার ছিলে? রাজার ছিলাম। এখন কার? এখন তোমার। তবে ফল দাও, বকুল ফল। বৃক্ষ কখনও রাজার, কখনও রাক্ষসের। বৃক্ষ, অঃ বৃক্ষ। ওরা প্রায় চেঁচাতে থাকল। কোথায় গেলে তুমি বৃক্ষ। ওরা বনের ভিতরে

হেঁকে ডেকে বেড়াতে থাকল। ওরা কেবল গাছটার অন্বেষণে আছে। মগডালে বসে শকুনেরা চিৎকার করছিল, বনের ভিতর নানা রকমের ঘন ঘন শব্দ উঠছে, ডালে ডালে পাখিদের কলরব ছিল, আর ছিল দুই বালক বালিকা। ওরা ভয়ে ভয়ে বকুল গাছটার উদ্দেশ্যে হাঁটছে।

আর ঠিক তখন ওদের মনে হল বনের ভিতর কে বা কারা যেন দুম দুম শব্দ ক'রে ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঠাকুমার কাছে শোনা গল্পের সেই ভূত প্রেত অথবা ডাকিনি যোগিনির মতো। ফতিমা ফিস ফিস ক'রে বলল, সোনা-বাবু ঐ শোনেন।

সোনা একটা মরা গাছের গুঁড়িতে বসেছিল। ও আর হাঁটতে পারছিল না। জঙ্গলের ভিতর হেঁটে হেঁটে পায়ে হাঁটতে লাগছে, পায়ের নিচে কাঁটা ফুটেছে। ওর মনে হল এখন এইসব ফেলে পোলা মাঠের ভিতর নেমে যেতে পারলে বেশ হয়। কিন্তু মনে মনে বড় শখ অকালের সেই বকুল ফলের। নিতে পারলে বড়দা মেজদা লাল্টু পল্টু পর্যন্ত ট্যারা হয়ে যাবে। আমারে একটা দ্যা, সোনা বড় ভাল পোলা, দ্যা দ্যা একটা দ্যা বলে বড়দা মেজদা ওর চারপাশে ঘুর ঘুর করবে। ফতিমাও বড় শখ ক'রে এই বনের ভিতর পালিয়ে এসেছে ফল নেবে বলে, কিন্তু হায় সেই দুম দুম শব্দটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল কানে।

বনের ভিতর ওরা চুপচাপ বসেছিল। শব্দটা শুনেই কেমন আতঙ্ক উভয়ের মনে। সূর্যের উত্তাপ ওদের শরীরে লাগছিল না। ঘন গাছপালার ভিতর ওরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল যেন। বনটা যে ভিতরে ভিতরে এত বড় ওদের বোধহয় জানা ছিল না। বনের ভিতর ঢুকে গেলেই গাছটা সদর দেউড়ির সেপাইর মতো সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, এবং ওদের অঞ্জলিতে বকুল ফল ভরে দেবে এমন একটা ধারণা ছিল। কিন্তু হায় এখন ওরা এত ভিতরে ঢুকে গেছে যে কোনদিকে গেলে মাঠ এবং পরিচিত পথ মিলে যাবে বুঝতে পারছে না। ফতিমার মুখ চোপ শুকনো দেখোচ্ছে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল এই সব জঙ্গলের ভিতর কে বা কারা সহসা সহসা অট্টহাস্য করছিল। ঠাকুমার গল্পের মতো যেন কে বা কারা বলছে হাঁউ মাউ কাউ মানুষের গন্ধ পাউ। ওরা ভয়ে, মৃত্যুভয়ে চোপ মুখ বন্ধ ক'রে সামনের ঘাস, শুকনো পাতা, জঙ্গল যা কিছু সামনে পড়ছে সব মাড়িয়ে ছুটছে। অথচ বাইরের খোলা মাঠ এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওরা শুকনো ডাল, পাখির পালক, মাছ এবং মানুষের হাড় অতিক্রম ক'রে কেবল ছুটতে থাকল। কিন্তু সামনে আর কোনো পথ নেই, ফের পেছনের দিকে ছোটা। সেই এক অট্টহাসি ডালপালার ঝোপজঙ্গল অতিক্রম ক'রে ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে। দু-হাত তুলে ঝোপজঙ্গলের ভিতর পথ ক'রে বের হয়ে আসছে। সূর্যের অমিত তেজের মতো বনের ভিতর সেই এক অট্টহাসি গাছপালা ভেঙে দুম দাম শব্দ ক'রে তোলপাড় ক'রে বেড়াচ্ছে, তখন মাঠের ভিতর দুম দুম – রাজ রাজেশ্বর কি জয়, জয় যজ্ঞেশ্বর

কি ভয়। কারা যেন মাঠ ভেঙে কোথায় চলে যাচ্ছে। সোনা ভয়ে পাতার আড়ালে শুয়ে পড়ল, ফতিমাও জঙ্গলের ভিতর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল, আর দেখল, ডালপালা ঝোপের ভিতর দিয়ে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জনের দল খোলা মাঠের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। ষোলজন লোক বাঁশের ভিতর কাটা মোষটা ঝুলিয়ে নিয়েছে। চার পা বাঁধা কাটা মোষটা বাঁশে ঝুলছে। ঠিক পেটের উপর বসান কাটা মোষের মাথাটা। দড়ি দিয়ে মাথাটাকে পেটের উপর বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথাটা চোখ খুলে রেখেছে, কান ঝুলিয়ে রেখেছে এবং শস্তবিহীন মাঠ দেখতে দেখতে চলে যাচ্ছে। লোকগুলো ভয় যজ্ঞেশ্বর কি জয়, রাজ রাজেশ্বর কি জয় বলতে বলতে নেমে যাচ্ছে। ওরা ঝোপের ভিতর চুপচাপ শুঁড়ি দিয়ে পড়ে থাকল। ভয়ংকর দৃশ্য শুধু এখন চোখের উপর ভাসছে। ওরা ভয়ে ঝোপের ভিতর থেকে ওদের ডাকতে পারল না পর্যন্ত। বলতে পারল না, আমরা ঝোপের ভিতরে আটকা পড়েছি, কোনোদিকে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না, আর কিছুক্ষণ এ-ভাবে থাকলে ভয়ে মরে যাব। কিছুই ওরা বলতে পারছে না। বরং ভয়ংকর দৃশ্যটা ওদের চোখের উপর নৃশংসতার ছবি ঝুলিয়ে চলে যাচ্ছে। লোকগুলি চলে যাচ্ছে, পেছনে যারা আসছে মাথায় চাল ডাল, একটা মোষের মাংস খাবার মতো মানুষের জন্য চাল ডাল তেল। ওরা শীতলক্ষার পার থেকে এসেছে। পুজার প্রসাদ মোষের মাংস ফেলতে নেই, তাই এইসব মানুষেরা এসেছে শীতলক্ষার পার থেকে এই কাটা মোষ নিয়ে যেতে। ওরা মোষটা নিয়ে যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা যায়—হুঁ হোমনা, যেন বরের সঙ্গে বধূ যায় হুঁ মনা, যেন মোষের পেটে কাটা মাথা যায় হুঁ হোমনা। বড় কুৎসিৎ এই দৃশ্য। মুণ্ডবিহীন মোষ পেটে মাথা নিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে। বনের ভিতরে তখন ডালপালা ভেঙে বেড়াচ্ছে কে! অট্টহাস্য, অট্টহাস্য! মগডালে শকুনের আর্তনাদ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক এবং সেই দ্রুত ডালপালা ভাঙার শব্দ—ওরা ভয়ে এবার চোখ বুঁজে ফেলল। কারণ পথ ক'রে সেই অট্টহাস্য ওদের দিকেই ছুটে আসছে। চোখ বুঁজে ওরা টের করতে পারল প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। এবং ওদের শক্ত দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরেছে। মাটি থেকে টেনে উপরে তুলে নিচ্ছে, দুই—দুই পুতুল, সোনা রুপোর পুতুল। দৈত্যটা দুই কাঁধে পুতুল নিয়ে ফের ডালপালা ভেঙে ছুটতে চাইলে, সোনা চোখ বুঁজেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল, ফতিমাও কেঁদে ফেলল। দৈত্যটা ভয়ংকর বিরক্ত ওদের কান্নায়। চিৎকার ক'রে উঠল, গ্যাৎ চোরৎশালা।

তখনও মাঠে ঢাক বাজছে, ঢোল বাজছে। বাস্তুপুজা শেষ হলেই পুরিপুজার মেলা। মেলায় দোকানপত্র যাচ্ছে গোপাট ধরে। বাঁশ কাঁধে মানুষ যাচ্ছে, ত্রিপাল মাথায় মানুষ যাচ্ছে। সোনালি বালির নদীর জলে এখন কত সওদাগর নৌকা ভাসাল। বাদাম তুলে খাড়ি ধরে ব্রহ্মপুত্রে পড়বে, তারপর ফের বাঁক নিলে ডাইনে

সেই প্রকাণ্ড বিল, দশক্রোশের মতো বিল রয়েছে। খালের জল বিলে পড়েছে। বিল পার হলেই মেলার প্রাঙ্গণ। বড় কাঠের পুল পার হলে যজ্ঞেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে।

সেই বিলের কথা মনে পড়ছিল পাগল ঠাকুরের। তিনি সোনা এবং ফতিমাকে মাঠে এনে ছেড়ে দিলেন। সোনার সব ভয় একেবারে উবে গেছে, ফতিমা পর্যন্ত এখন হাসতে পারছে। ওরা বাড়ি ফেরার জন্য দৌড়তে থাকল। বেলা পড়ে আসছে। শীতের বেলা। সামসুদ্দিন ঢাকা গেছে, আজ ঢাকা থেকে ফেরার কথা। ফতিমা দ্রুত ছুটতে থাকল, ঢাকা থেকে বা'জান কাঁচের চুড়ি কিনে আনবে, ফিরে ফতিমাকে বাড়ি না দেখলে খুব রাগ করবে বা'জান। কানের দুল আনবে, নীল ডুরে শাড়ি আনবে মার জন্য। বাজান সময় নেই অসময় নেই ঢাকা চলে যায়, দু-চারদিন পর ফের চলে আসে। সেই ঢাকা শহরে বড় হলে ফতিমা যাবে, যেতে যেতে তেমন গল্পও করল ফতিমা।

সোনা বলল, আমি-অ যামু। বাবার কৈছে বড় হৈলে বাবায় আমারে লৈয়া যাইব।

—বা'জী কইছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব।

—বাবায় কৈছে আমারে সদর ঘাটের কামান দেখাইব, রমনার মাঠে লৈয়া যাইব, বুড়িগঙ্গার জলে সান করাইব।

—বা'জী কৈছে বড় হৈলে আমারে মোটরে চড়াইব।

—বাবায় কৈছে আমারে রেলগাড়ি কৈরা ঢাকায় নিয়া যাইব।

—রেলগাড়ি ছোট। ছোট গাড়িতে আপনে যাইবেন। ফতিমা সোনার উপর কোনো না কোনোভাবে টেক্কা দিতে চাইছে।

—হ কৈছে! মোটরগাড়ি রেলগাড়ির ছোট।

—হ কৈছে! ফতিমা সোনার মুখের কাছে গিয়ে মুখ বাঁকাল।

—কিছু জানস না মাইয়া, দিমু এক থাপ্পর।

—জানত ভাথি। থাপ্পর দিবেন! আপনের মায়রে কৈয়া তবে মাইর খাও-য়ামু না!

—তুই কৈয়া দিবি! সোনা ভয় পেয়ে গেল।—আমি যে তরে ছুঁইয়া দিছি, তুই কৈয়া দিবি।

—তবে মোটর গাড়ি ছোট এই কথা কন ক্যান।

—কমুনা আর।

ফতিমা আর দেরি করল না। কোথায় যেন ছোট এই বাবুটির উপর বিজয়িনী হয়ে উল্লাসে ছুটে চলল। মাথায় চুল উড়ছে মেয়ের। ডুরে শাড়িটা খুলে যাচ্ছে। ছুটতে ছুটতেই কোনোরকমে প্যাচ দিচ্ছে কোমরে। কোনোরকমে কাপড় সামলে মল বাজিয়ে ছুটছিল, পায়ে মল, রুপোর মলের ভিতর ছোট লোহার দানা।

ফতিমা ছুটছিল আর পায়ের মল বাজছিল ঝম ঝম। ছুটতে ছুটতেই দুবার ফিরে তাকাল পিছনে। সোনাবাবু এতটুকু নড়ছে না। সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুঃখে ক্ষোভে হতাশায় ভেঙে পড়ছে। ফতিমা বিজয়িনীর মতো ঘুরে ফিরে লাফ দিল, হাঁটল, দুপা এগিয়ে ফের লাফ দিল, ফের ঘুরে ঘুরে চরকি বাজির মতো মাঠের ভিতর যেন এক চঞ্চল খরগোশ কচি ঘাসের থেকে এক কামড় খাচ্ছে, দু কামড় নষ্ট করছে—ফতিমা মাঠের উপর দিয়ে চঞ্চল খরগোশের মতো ছুটছিল, কিন্তু মনে মনে সোনা, যে সোনার শরীরে সব সময় চন্দনের গন্ধ লেগে থাকে, যে সোনাবাবুর মুখ ঘাসের মতো নরম, কচি কলাপাতার মতো যে লাজুক তেমন মানুষকে মাঠে একা ফেলে যেতে কেমন কষ্ট হচ্ছিল ফতিমার। ফতিমা এবার দাঁড়াল। পেছন ফিরে ডাকল, আইয়েন। আমি খাড়ইছি।

সোনা চিৎকার করে বলল, না, আমি যামু না।

ফতিমাও গলা ছেড়ে বলল, না আইলে আমি-অ যামু না।

দুজন দু-জমির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকল। সোনা কিছুতেই নড়ছে না। ফতিমা ছুটে সোনার নাগালে চলে গেল।—চলেন। —না আমি যামু না।

—চলেন, না হয় আপনের রেলগাড়িটাই বড়। তারপর ফতিমা আরও কি যেন বলতে চাইছিল, বলতে পারল না। অথবা মনের ভিতর এমন কথা হয়তো উঁকি মারতে পারে, মেলায় গেলে আমরা রেলগাড়িতে চলে যাব। বড় গাড়ি না হলে আমরা দুজনে যাব কি ক'রে! অথচ ফতিমা কথাটা প্রকাশের ঠিক ভাষা খুঁজে পেল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল কিছু সময়। তারপর সোনার হাত ধরে বলল, আমারে একটা কারতিক পুজার ছিরাঘট দিবেন?

—দিমু।

—আইয়েন ইবারে মাঠের উপর দিয়া ছুটি। ওরা হাত ধরে শীতের রোদে কিছুক্ষণ ছুটে দেখল, পুকুরপাড়ে মালতি। ওরা তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিল। হাত ছেড়ে দিয়ে দুজন দু-দিকে ছুটতে থাকল।

সেই যে ঢাক বাজছিল, ঢোল বাজছিল আর থামছে না। পঞ্চাশটা ঢাকি অনবরত ঘাড় কাৎ ক'রে বাজাচ্ছে তো, বাজাচ্ছেই। সরকারদের বাস্তুপুজা অঞ্চলে বিখ্যাত। লোকজনের সীমা সংখ্যা নেই। আত্মীয় কুটুম, গ্রামের নিবাসীগণ কিছু গরীব প্রজা আর সব মাতব্বর ব্যক্তিরা লাঠি হাতে ঘোরা ফেরা করছিল। পুকুর পাড়ে হাজার মানুষ হবে, দূর দূর গ্রাম থেকে ওরা এসেছে। সব ছোট জাতের মানুষ। ধোপা নাপিত নমশূদ্র, ওরা পাত পেতে খিচুরি খাচ্ছে। আর মাঠের উপর দিয়ে মোষ যাচ্ছে, সেই যেন পাল্কি কাঁধে বেহারা যায়। ওরা মুসলমান গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় শিব ঠাকুর কি জয়, রাজ রাজেশ্বর যজ্ঞেশ্বর কি জয় এইসব বলছিল। পেটে মাথা নিয়ে মোষ চলছে, মাঠের উপর,

ঘাসের উপর বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়ছে, ধর্ম আমাদের সনাতন—এত কচি মোষ তল্লাটে বলি হয় না, এত বড় খাঁড়া তল্লাটে আর কার আছে, আর এই ধর্মের মতো পুত পবিত্র কি আছে—জয় রাজ রাজেশ্বর যজ্ঞেশ্বর কি জয়। বিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষগুলো কাটা মোষ বাঁশে ঝুলিয়ে জয়ধ্বনি করছিল। বিলের গরীব দুঃখী মানুষগুলো যারা শালুক তুলতে এসে জলের ভিতর সাদা হয়ে যাচ্ছে, হাত পা ঠাণ্ডা এবং শীতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে—যারা মাঝে মাঝে পাড়ে বসে রোদ পিঠে নিয়ে উত্তাপ জমা করছিল শরীরে, তারা পাড়ের উপরে দেখল বিন্দু বিন্দু এক ঝাঁক পাখির মতো মানুষগুলো কাঁধে মোষ নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার কাটা মোষের পেটে মাথা, মাথাটা হড়কে নিচে পড়ে গেল। এত খাড়া ছিল বিলের পাড় যে পড়বি তো, পড়বি একেবারে সেই গরীব দুঃখীদের পায়ের কাছে। সহসা এমন কাণ্ড! ধরবিহীন মুণ্ড ওদের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

মোষের কাটা মুণ্ড দেখে ওরা তোবা তোবা বলে উঠল। এক কোপে কাটা মুণ্ড দেখে ওরা কেমন গুনাহ করে ফেলল। এত বড় বিলে ওরা দুঃখী মানুষ সব শালুক তুলতে এসে এমন কুৎসিৎ দৃশ্য দেখে ফেলে চোখে কানে কেমন আঙুল দিল অথবা বুঝি ভয়, এই যে বিল দেখছ, বড় বিল, বিলে কত না কিংবদন্তি, কত না সাপ গোপ অজগর আর কত না জলজ ঘাস জলের ভিতর। লতাপাতা, কীট-পতঙ্গ, বড় বড় জোঁক নাকে কানে ঢুকে গেলে কে কাকে রক্ষা করে! সুতরাং ওরা মুণ্ডটার দিকে আর তাকাল না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এবারে ঘরে ফিরতে হয়।

শীতকাল বলে উত্তরের হাওয়া ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। আকাশ বড় পরিচ্ছন্ন। মনে হয় এবার পৃথিবী উজার ক'রে সব ঠাণ্ডা এই মাটির উপর, এই বিলের উপর নেমে আসবে। এতক্ষণ বিলের জলে প্রায় সহস্র পাতিল ভেসেছিল, এখন একটামাত্র পাতিল জলে ভাসছে। জলে একা এক পাতিল ভাসলে বড় ভয়। সেই পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল। ত্যাথ ত্যাথ পাতিলের মানুষটা কোথায় গেল!

সূর্য তেমনি অস্ত যাচ্ছিল। শালুক ফুল ফোটে না আর। দূরে সব পদ্মপাতা বিলের জলে, যেখানে জল খুব গভীর না, আবার অগভীরও নয়, সেখানে পদ্ম-পাতার জঙ্গল। সকলে কাটামুণ্ড ফেলে হাত পা মুছে উঠে আসার সময়ই দেখল হায় পদ্মপাতার পাশে ছোট এক পাতিল একা একা জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। মানুষটা কোথায় গেল? পাতিলের মানুষটা! জলের সব মানুষ উঠে এসেছে, যে যার পাতিল মাথায় এখন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু একটা পাতিল বিলের জলে উত্তরের হাওয়ায় গভীর জলে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে।

কে তখন হাঁকল, ত্যাথ বিলের জলে পাতিল ভাইস্যা যায়।

কে তখন ফের হাঁকল, ত্যাথ পানির তলে মানুষ ডুইবা যায়।

কিন্তু এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধা, মুখে জরার চিহ্ন, ক্লিষ্ট চেহারা—সে জোর গলায় হাঁকড়াতে থাকল, বিল আবার একটা মানুষ কাইড়া নিল। সেই বৃদ্ধা নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে যেন বলতে চাইল, এটা হবেই। সালের পর সাল বিল ক্ষুধা নিয়ে জেগে থাকে। ফাঁক পেলেই গিলে খায়। কিন্তু মানুষটা কে, কে ডুবে গেল।

জালালি লাল চোখ দুটোর সঙ্গে জলের ভিতরে তামাসা করছিল। বুঝি চোখ দুটো এগুচ্ছে পিছুচ্ছে। জলের নিচে ডুব দিলে ঘন নীল অথবা সবুজ রঙ চারিদিকে স্রোতের মতো ভেসে বেড়ায়। নিচে সূর্যের আলো যতটুকু পৌছায় ততটুকু আবছা দেখা যায়, কিন্তু গভীর জলের ভিতর জালালি আদৌ বুঝতে পারে নি বড় রাক্ষুসে গজার মাছটা ওকে মরণ কামড় দেবার তালে আছে। ফাঁক পেলেই এসে খুবলে মাংস তুলে নেবে। কারণ মাছটার এই আস্তানায় জালালির উপদ্রব সে আদৌ সহ্য করতে পারছে না। জালালি জলের ভিতর ডুবে দেখল মাটি খুব মসৃণ, কোনো মাছের আস্তানা হলেই—বড় মাছ হতে হয়, রুই কাতলা অথবা কালিবাউশ, বড় প্রকাণ্ড হতে হবে, হলেই নিচে, গভীর জলের নিচে মসৃণ বৃত্তাকার মাটি। আশেপাশে ঘন ঝোপজঙ্গলের ভিতর নিকোনো উঠোনের মতো মাছের নিবাস। নিবাসের আশেপাশে যত জালালি শালুকের জন্য ঘুর ঘুর করছিল তত মাছটা ক্ষেপে যাচ্ছিল। তত মাছটার লেজ কাঁপছে জলের নিচে। তত এগুচ্ছে, পিছোচ্ছে। ভয় পাচ্ছে মানুষ দেখে অথবা ভয় পাচ্ছে না মতো ঘোড়ার কদমে পাখনা নাচাচ্ছে। শরীরে বড় বড় চক্র, অজগর সাপের গা, বড় একটা কালো থাম যেন, শরীরে মানুষের চেয়ে কত অধিক শক্তি, সেই শক্তি নিয়ে দুর্বল জালালির বুকে খুবলে মাংস তুলে নেবার জন্য বেগে এসে ধাক্কা মারল। জালালির মাথাটা নিচের দিকে ছিল তখন, জলের নিচে শালুক, মাটিতে শালুক, জালালি দু-ঠ্যাঙ ফাঁক ক'রে প্রায় ব্যাঙের মতো নিচে ক্রমশ নেমে যাচ্ছিল, তখন জালালির বুকে এসে ধাক্কাটা লাগল, জালালির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, জলের ভিতর প্রচণ্ড ঘূর্ণি উঠছে। আর জলের ভিতর ঘাস লতাপাতাগুলি উল্টেপাল্টে ক্ষীণকায় জালালিকে সাপ্টে ধরল। জালালি শেষবারের মতো ঘাস লতাপাতা ফুঁড়ে উপরে ভেসে ওঠার দু-বার চেষ্টা করতে গিয়ে একটা ঢেকুর তুলল, একটা বড় শ্বাস নিতে গিয়ে জল গিলে ফেলল অনেকটা, ফের উঠতে গিয়ে যখন আর পারছিল না তখন জলের ভিতরেই শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হল রাজ্যের সব জল পেটে ঢুকে যাচ্ছে। যত অন্ধকারের ভিতর শালুকের লতা এবং সেইসব পদ্মপাতার শক্ত লতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছিল এবং প্রাণের যাতনায় ছটফট করছিল তত লাল চোখ দুটো বড় হতে হতে একসময় আগুনের গোলা হয়ে গেল, তারপর ফস করে নিভে যাওয়ার মতো, জলের সঙ্গে জল মিশে গেলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আগুনের গোলা দুটো জলের সঙ্গে মিশে

একটা কুসুমের মতো রঙ নিয়ে, খানিকক্ষণ জেগে থাকল। তারপর জালালির প্রাণবায়ুটুকু ফুটকরি তুলে জলের উপর ভেসে উঠলে কুসুমের রঙটাও আর থাকল না, ঘোলা জলটা ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকল। জলজ জঙ্গল, লতাপাতা আর নড়ছে না। লতাপাতার ভিতর একটা মানুষ আটকা পড়েছে, আজব জীব, এখন জালালিকে মনে হচ্ছে। ঘাড়ে গলায় ঘাম লেগে আছে, পায়ের নিচে এবং বুকের পাশে অজস্র কদম ফুলের মতো জলজ দাম লেপ্টে আছে। জালালি উপুর হয়ে আছে। পা দুটো উপরের দিকে, মাথাটা নিচের দিকে হেলানো। একটা ছোট মাছ রুপালি ঝিলিক তুলে জালালির নাকে মুখে এবং স্তনে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল।

গজার মাছটা কিন্তু নড়ছিল না। সে দূরে লেজ খাড়া ক'রে এক দৃষ্টে ঘটনাটা দেখছে। যখন দেখল আজব জীবটা লতায় পাতায় আটকে গিয়ে আর নড়তে পারছে না তখন নিজের আস্তানার চারপাশে বিজয়ীর মতো পাক খেল এবং পাক দিয়ে দক্ষিণমুখী ছুটতে থাকল। সকলকে খবরটা যেন দিতে হয়, ছাখো এসে আমার আস্তানায়, একটা আজব জীবকে আমি ধরে ফেলেছি। মাছটা এত বড় আর রুপালে মনে হয় সিঁদুর দেওয়া, মাছটা কত প্রাচীনকালের কে জানে! মাছটার গায়ে কত মানুষের আজন্মকাল থেকে কোচ অথবা একহলায় শিকার চিহ্ন। মাছটার ডান ঠোঁটে দুটো বোয়ালের বড়শি নোলকের মতো দুলছে। মাছটার গায়ে কোচের ছোট ছোট কালি, খুঁজলে একটা দুটো নয় অনেক কটা যেন মাংসের ভিতর থেকে বের করা যাবে। সেই মাছটা এবার আনন্দে এবং উত্তেজনায় বিলের ভিতর জল মুঁড়ে লাফিয়ে উঠল বাতাসে। তারপর সেই পাড়ের লোক যারা পাতিল একা ভেসে যায় বলে হায় হায় করছিল, তারা দেখল বিশেষ জলে এমন একটা মাছ নয়, যেন হাজার মাছ, সেই প্রাচীন বিলে জল মুঁড়ে আকাশের দিকে উঠে যেতে থাকল। ভয়ে এবং বিস্ময়ে মানুষগুলো দেখল অনন্ত জলরাশির ভিতর বড় বড় রাক্ষুসে সব গজার মাছেরা প্রায় কুমিরের মতো জলের উপর উল্লাসে ভেসে উঠেছে। ওরা যেন সন্তর্পণে সকলকে সাবধান ক'রে দিল—বাপুরা ছাখ, ছাখ আমাদের তামাসা ছাখ। আমরা জলের জীব, তাবৎ সুখ আমাদের জলে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বিলের জলে সূর্যের লাল রঙ এবং আকাশে লাল রঙ। মানুষগুলোর মুখে আগুনের মতো উজ্জ্বল এক রঙ। গরীব দুঃখী মানুষেরা দাঁড়িয়ে ছিল। শীত, প্রচণ্ড শীত। উত্তুরে হাওয়ায় সব শীত এসে এই বিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। জলে ডুবে ডুবে ওদের হাত পা সাদা হয়ে গেছে। আর এই বিলে কুমিরের মতো ঝাঁক ঝাঁক গজার মাছ জলের উপর ভেসে উঠেছে। ওরা ঘোরাফেরা করছে, সূর্যের লাল রঙ ওদের মুখে পিঠে ভাসছে। মনে হয় সূর্য আবির ছড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে শীত। কি প্রচণ্ড শীত! শীতে মানুষগুলো অবশ। এই ভয়ংকর ঘটনা দেখে মানুষগুলো অবশ। ওরা এক সঙ্গে জড় হয়ে বিলের

ভিতর সেই হাজার হাজার রাক্ষুসে গঙ্গার মাছের সাঁতার, ডুব দেওয়া এবং কখনও কখনও জল ছুঁড়ে বাতাসের দিকে উঠে যাওয়া দেখছে। এমন হয়। সেই প্রাচীন বৃদ্ধা, যার শরীরে প্রায় কোনো বাস ছিল না, যে আগুন জ্বালাবার জন্য শুকনো ঘাসপাতা সংগ্রহ করছে এবং যে আগুন জ্বালতে না পারলে, গামছার মতো জ্যালজ্যালে শাড়িটা শুকিয়ে নিতে না পারলে প্রচণ্ড শীতে এই বিলের পাড়েই মরে থাকবে, সে ঘাসপাতায় আগুন জেলে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলছে— কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না, শুধু চোখ মুখ দেখলে ধরা যাচ্ছে, যেন বলার ইচ্ছা, হে তোমরা বাপুরা মনুষ্য জাতি, মনুষ্যজাতিগণ দেখ, মাছেদের খেলা দেখ, এক সঙ্গে আনন্দের দিনে ওরা কেমন ঘোরাফেরা করছে। তোমরা খবর রাখ না মনুষ্যগণ, নোয়া নামক এক মহাপুরুষ জলে নৌকা ভাসিয়েছিলেন, সেই মহা-প্লাবনের দিন স্মরণ কর। এমন সব কথাই ঘুরে ফিরে বলতে চাইছিল বুঝি বৃদ্ধা। কিন্তু এসব বলার অর্থ কি! জালালি, যার স্বামী আবেদালি, যে গয়না নৌকার মাঝি, যার বিবি এখন জলের নিচে দুই ফেরাস্তার আলোর জন্য প্রতীক্ষা করছে, তার আর মহাপ্লাবনের খবর নিয়ে কি হবে! সুতরাং বৃদ্ধার দিকে কেউ আর তাকাল না। সকলে শীতের ভিতর শুধু আগুনটুকুর জন্য লোভী হয়ে উঠল। সকলে জালালি জলে ডুবে যাওয়ার ঘটনাটা পর্যন্ত ভুলে গেল সহসা। বিলের পাড় থেকে ঘাসপাতা এনে, শুকনো সব ঘাসপাতা, খরকুটো এবং ঝোপজঙ্গল থেকে ডালপালা এই অগ্নিকুণ্ডে সকলে নিক্ষেপ করতে থাকল। বিলের ভিতর ক্রমশ সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এ-পাড়ে আগুন মাথার উপরে উঠে গিয়ে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে। কি লেলিহান জিহ্বা! সেই আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ পেয়ে মনে হল সেই সহস্র মাছ, বিলের রাক্ষুসে গঙ্গার মাছগুলি মাঝ বিলের দিকে ভয়ে চলে যাচ্ছে, অথবা সূর্যের সঙ্গে বিলের জলে ডুবে গেল।

পাড়ে দাঁড়িয়ে তখন বিশাল মানুষ পাগল ঠাকুর। তিনি আগুন দেখে শীত নিবারণের জন্য ছুটে গেলেন না। তিনি হাত কচলে শুধু বললেন, গ্যাং চোরের শালা। কারণ বিলে মানুষ ডুবে গেল, দুই পদ্মকলির নিচে মানুষ ডুবে গেল, ডুবে ডুবে শালুক তুলতে গিয়ে মানুষটা আর জলের উপর ভেসে উঠল না।

শীতের জন্য পাড়ের মানুষেরা এককাট্টা। প্রাণের জন্য এককাট্টা। আগুনের চার পাশে মানুষগুলি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিলের সেই পাতিলটা নড়ছে না আর। বাতাস পড়ে গেছে। দূরে পদ্মপাতার ভিতর পাতিলটা ভাসতে ভাসতে আটকে গেল। বিলের জলে সূর্য ডুবে যাচ্ছিল বলে ক্রমশ জলটা গাঢ় রক্তবর্ণ, ফিকে রক্তিম আভা, তারপর ক্রমশ ফিকে হতে হতে একেবারে নীল হয়ে গেল, নীল থেকে সবুজ, এবং পরে কালো জল। এখন এই অনন্ত জলরাশি মনে হচ্ছে স্থির। জলে কোনো ফুটকারি ভাসছে না। শীতের ভয়ে মাছগুলো পর্যন্ত নড়তে সাহস পাচ্ছে না। পাগল ঠাকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে ফের

উচ্চারণ করলেন, গ্যাৎ চোরেৎ শালা। মোষের কাটামুণ্ড তেমনি বিলে পড়ে থাকল। মানুষগুলি যারা কাটা মোষ নিয়ে শীতলক্ষার পারে যাবে তাদের কাছে বুঝি মাথাটা আদৌ লোভনীয় নয়, কারণ মাথা এখানে ওখানে ফেলে দিতেই হয়। মোষের সব মাংস খাওয়া যায় না। তবু মাথা নিতে হয়। প্রসাদ ফেলতে নেই। মাথা নিলে চাল ডালের পরিমাণটা তাতে বাড়ে। সুতরাং এই বিলের ভিতর কাটা মুণ্ড মোষের, আগুনের উত্তাপে কান দুটো খাড়া ক'রে দিল। আহাঃ সেই কখন শীতের ভোরে অবলা কচি মোষটাকে স্নান করানো হয়েছিল, তেল সিঁদুর মাথায় দিয়ে কচি ঘাস খেতে দিয়েছিল। গলায় করবি ফুলের মালা, পায়ে রক্তজবার মালা ঠিক নূপুরের মতো, যেন ধর্মক্ষেত্রে কচি মোষের বাচ্চাটা এবার মরণ নাচন নাচবে। অবলা মোষ শীতের সকালে স্নান ক'রে হাড়কাঠের পাশে শুয়েছিল। শীতে নড়তে পারছিল না। রাজার মতো আপ্যায়ন! ছোট কচিকাঁচা ছেলেরা নূতন জামা কাপড় পরে, কি সুন্দর ফুট ফুটে মেয়েরা নূতন ফ্রক পরে কচি ঘাস রেখে গেছে সামনে—সারা সকালটা ওর কত সোহাগ ছিল, এক বুড়ো বামুন ঠাকুর মাথায় বড় টিকি, টিকিতে রক্তজবা বাঁধা সেই যে সেপাশে এক সের ঘি নিয়ে বসে গেল, আর কিছুতেই ওঠে না। ঘাড়ে গলায় ঘি মেখে মানুষটা পান চিবুচ্ছিল। ঘাড়ে গলায় ঘি মেখে মাংসের ভিতরটা নরম ক'রে দিচ্ছিল। যেন খাঁড়া আটকে না যায়। কি প্রাণান্তকর চেষ্টা সফল বলির জন্য। কিন্তু হলে কি হয়, মোষের প্রাণবায়ু গলায় আটকে আছে। সব খেতে বিস্বাদ। ঢাক ঢোলের বাজনায়, ধূপধুনোর গন্ধে, চন্দনের গন্ধে, ফুল বেলপাতার গন্ধে আর ভয়ংকর শীতে মোষটা বড় নির্জীব ছিল সারাদিন। এখন একটু আগুনের তাপ এসে গায়ে লাগতেই কাটা মুণ্ড কান খাড়া ক'রে দিল। পাগল ঠাকুর এইসব দেখে আবার না হেসে এবং না বলে পারলেন না—গ্যাৎ চোরেৎ শালা!

তখন গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল—এ সালেও বিলের জলে মানুষ ডুবেছে। এমন কোনো সাল নেই, বছর যায় না, মানুষ ডুবে না মরে এই জলে! কিংবদন্তির পাঁচালিকে রক্ষা ক'রে আসছে যেন। সুতরাং খবর সর্বত্র—ফাওসার বিলে, যে বিল বিশাল, যে বিলে পাঁচ-দশ ক্রোশ জুড়ে শুধু জল আর জল, যে বিলের কোথাও কোথাও মাটি খুঁজে পাওয়া যায় না, মানুষ যে বিলে পড়লে পথ হারিয়ে ফেলে, তেমন বিলে এ-সালে আবেদালির বিবি জালালি ডুবে মরল। টোঙার-বাগের আবেদালি বর্ষায় গয়না নৌকা চালাতে চলে গেছে, জব্বর বাবুর হাটে গেছে, সুতরাং মানুষ জন পাঠাতে হয় এবং বিল থেকে লাশ তোলা যাবে না, কোথায় কোন জলে ডুবে আছে, অথবা কিংবদন্তির রাক্ষসটা জালালিকে নিয়ে কোথায় ডুব দিয়েছে কে জানে!

বিলের মানুষগুলি আগুন নিভে গেলে যে যার গাঁয়ের দিকে রওনা হল।

এখন জ্যোৎস্না নামবে বিলের উপর। সমস্ত বিলটা জ্যোৎস্নায় সারারাত ডুবে থাকবে। পাতিলটা ভেসে যেতে যেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হাওয়া উঠলে সেই পাহাড়ের মতো কালো বস্তুটা বিলের ভিতর থেকে ফের ভেসে উঠতে পারে! কি বস্তু, কোন জীব, কোথায় এর নিবাস – দৈত্য-দানো বা অন্য কিছু বোঝা ভার। কেউ কেউ দেখেছে এমনই একটা প্রচলিত ধারণা আছে অঞ্চলের মানুষদের। বিলের পাড় ধরে হাঁটলেই কথাটা মনে হয়। এত বড় বিল এবং কালো জল দেখে অবিশ্বাস করা যায় না যেন। প্রাচীন বিল – কথিত আছে নবাব ঈশাখাঁ এই বিলে সোনাই বিবিকে নিয়ে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় কত রাতের পর রাত কলাগাছিয়ার দুর্গের দিকে মুখ ক'রে বসে থাকতেন। চাঁদ রায় কেদার রায় কলাগাছিয়ার দুর্গ তছনছ ক'রে দিয়েছে। সোনাকে উদ্ধারের জন্য ওরা বুঝি আড়িয়ল খাঁর বিল থেকে মেঘনার জলে নেমে এসেছে। সোনাকে উদ্ধারের জন্য জলে জলে সপ্তডিঙ্গা যায়, সপ্তডিঙ্গা মধুকরের মতো উজানে কদম দিচ্ছে। সোনাকে উদ্ধারের জন্য সাতশো মকরমুখী জাহাজ পাল তুলে দিয়েছে জলে। বৃদ্ধ ঈশাখাঁর মুখ, লম্বা সাদা দাড়ি ঠিক ফকির দরবেশের মতো, মাথায় সোনার ঝালর আর কোমরে অসি আর পিছনে কালো রঙের বোরখার ভিতর প্রতিমার মতো সোনাই, সোনাই বিবি – স্থির অপলক দৃষ্টি সামনে। ওরা এই বিলের ভিতর আত্মগোপন ক'রে ছিল। এই আত্মগোপনের ছবি কিংবদন্তির পাঁচালির মতো বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তামাক খেতে খেতে ফেলু ভাবল, জালালি এখন কিংবদন্তির দেশে বেড়াতে চলে গেছে। নবাব ঈশাখাঁ, সোনাই বিবি, সেই পাহাড়ের মতো দানোটা এবং বিলের হাজার হাজার রাক্ষুসে গজার মাছ ফেরাত্তার অলৌকিক আলোতে জলের নিচে পথ দেখিয়ে নবাব বাড়ির অন্দরে নিয়ে যাচ্ছে জালালিকে।

কেবল পাগল ঠাকুরই পাড়ে এখন একা দাঁড়িয়ে। প্রথম পাতিলটা যে জায়গায় ছিল আর যে জায়গায় জালালি ডুব দিয়েছিল সেই জায়গাটার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। ডান দিকের বাঁশবন পার হলে কিছুটা জলের ভিতর নেমে যেতে হয়। দুটো বড় পদ্মের কলি জল ফুঁড়ে উঠে পড়েছে এবং ঠিক তার পাশেই জালালি শেষবারের মতো ডুব দিয়ে আর উঠতে পারে নি। পাতিলটা ভেসে ভেসে দূরে সরে গেল বলে আর দেখা গেল না। জ্যোৎস্নায় অদৃশ্য সব। ঠিক পায়ের নিচে শুধু সেই কাটা মুণ্ড। কাটা মুণ্ড পাগল ঠাকুরের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে চায় যেন। রক্ত বীজের বংশ। যেখানে এক ফোঁটা রক্ত সেখানে সেই রক্তবীজ দৈত্য – হাজার হাজার লাখে লাখ! রক্তবীজ অসুরের মতো এই মোষের মুণ্ডটা প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর বিস্ময়ে দেখছিলেন, দেখতে দেখতে মনে হল মোষের মুণ্ডটা প্রশ্ন করছে, ঠাকুর তুমি কী দেখছ?

পাগল ঠাকুর বললেন, আমি বিলের জ্যোৎস্না দেখছি।

—ঠাকুর তুমি জ্যোৎস্না ছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছ!

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

—আমি কে?

—তুমি এক অবলা জীব মোষ।

—মোষের বুঝি ঠাকুর প্রাণ থাকে না!

—থাকে।

—তবে তোমরা আমাকে অযথা হত্যা করলে কেন!

—তোমাকে হত্যা করা হয় নি। দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

—দেবতা সে কে?

—দেবতা, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। আলো দিচ্ছেন, ফুল ফোটাচ্ছেন। সংসারের যাবতীয় পাপ মুছে পুণ্য ঘরে তুলে আনছেন।

আর কিছু করছেন না?

—আরও অনেক কিছু করছেন। জীবের পালন, সৃষ্টি স্থিতি লয় সব তাঁরই হাতে।

—তবে আমি নিমিত্ত মাত্র! ভোগের নিমিত্ত।

—নিমিত্ত মাত্র। ভোগের নিমিত্ত।

মোষটা এবার হেসে উঠল।

পাগল ঠাকুর বললেন, তুমি হাসছ কেন?

—ঠাকুর তোমার কথা শুনে।

পাগল ঠাকুরকে এবার খুব বিমর্ষ দেখাল। তিনি মোষটার দিকে তাকাতে পারছেন না। তাকালেই যেন ফের হেসে উঠবে। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি বিলের জ্যোৎস্না এবং দুই পদ্মকলির নিচে জালালি ডুবে আছে দেখতে থাকলেন। সামনে শুধু জলরাশি, হাওয়ার জন্য জলে ঢেউ উঠছে। জলের শব্দ ভেসে আসছিল তীরে। অনেক দূরে ঢাক ঢোলের শব্দ। কেমন গুম গুম শব্দের মতো মনে হয়—ঝড় আসছে, অথবা মনে হয় হাজার বছর ধরে সেই রাক্ষস ছুটে আসছে। রাজপুত্রের হাতে পাখি, পাখির ডানা ছিঁড়ে ফেলেছে রাজপুত্র, পড়ি মরি ক'রে সেই হাজার লক্ষ রাক্ষসের দলটা রাজপুরীর দিকে ছুটে আসছে। কান পাতলে মনে হয় সেই রাক্ষসেরা অনন্ত কালের গর্ভে প্রাণীর রক্ত পানের লোভে ছুটছে। পাখি রাজপুত্রের হাতে, খুশি মতো ডানা, পা এবং মুণ্ড ছিঁড়ে দিলেই শেষ। কিন্তু হায় রাজপুত্র পাথরের, পাখি পাথরের। সুপ্তী রাজপুত্র রীতের বেলায় পাখি হাতে স্বপ্ন দেখতে দেখতে পাথর হয়ে গেছে।

মোষটা বলল, কি ঠাকুর তাকাচ্ছ না কেন?

পাগল ঠাকুর জবাব দিলেন না।

—ঠাকুর তুমি সামান্য কাটা মুণ্ডের হাসি সহ্য করতে পার না, আমি কি ক'রে খাঁড়ার ঘা সহ্য করেছি বল !

পাগল ঠাকুর বললেন, ছ্যাপ তোমাকে বাপু আমি কিছু বলছি না। তুমি আমার পেছনে লাগবে না।

—ঠিক আছে। তবে আমি উড়াল দিলাম। বলে মুণ্ডটা দুপাশে পলকে দুটো ডানা গজিয়ে নিল, তারপর বিলের উপর উড়তে থাকল।

—আরে কর কি, কর কি ! পাগল ঠাকুর ধরতে গেলেন।

—কেন আমাকে তোমার ভগবানের চেয়ে খারাপ দেখাচ্ছে এখন ! বাদুরের মতো দেখাচ্ছে না ? অতিকায় বাদুরের মতো। বলে, মোষের মাথাটা পাগল ঠাকুরের সামনে উড়ে বেড়াতে লাগল। একবার উপরে উঠে গেল, একবার নিচে। একবার সোঁ ক'রে বিলের মাঝে চলে গেল, আবার উড়ে এসে পাগল ঠাকুরের চোখের সামনে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে বলল, কেমন লাগে দেখতে ! বাদুরের মতো লাগছে না ! লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে এমন সব বাদুর ছিল। এখন আর তারা নেই। একদল আরও বড় সরীসৃপ এসে ওদের খেয়ে ফেলল। কিন্তু তারা তোমাদের মতো আর যাই করুক, ধর্মের নামে ভণ্ডামি করে নি। ঈশ্বরের নামে সব অপকর্ম চালায় নি।

কাটা মুণ্ডটার কাণ্ড কারখানা দেখে পাগল ঠাকুর বড় বেশি বিরক্ত হচ্ছিলেন। বড্ড জ্বালাতন করছে মুণ্ডটা। ভালমানুষ পেলে যা হয়। তিনি পাড় ধরে হাঁটতে থাকলেন—কিন্তু কি আশ্চর্য, সব সময় সেই মোষের মুণ্ডটা দুটো বড় পাখা নিয়ে ওর চোখের সামনে ঠিক পেণ্ডুলামের মতো ঝুলছে তো ঝুলছেই। কেউ যেন অদৃশ্য এক সুতো দিয়ে মোষের মুণ্ডটাকে আকাশ থেকে ছেড়ে দিয়েছে। পাগল ঠাকুর হাঁটছেন সামনে, মোষের মুণ্ডটা ক্রমশ পিছনে সরে যাচ্ছে। পাগল ঠাকুর পিছনে হাঁটছেন, মোষের মুণ্ডটা এবার এগুচ্ছে। এ তো বিষম জ্বালাতন হল ! তিনি এই ভয়ংকর দৃশ্য থেকে মুক্ত হবার জন্য ছুটতে থাকলেন। একবার সামনে, একবার পিছনে। একবার উত্তর আবার দক্ষিণে। পশ্চিমে পুবে যেদিকে গেছেন মোষের মাথাটা ওর চোখের উপর একটা অতিকায় বাদুর হয়ে ঝুলে আছে। কখনও হাসছে, কখনও কাঁদছে। কখনও বলছে, শালা মনুষ্যজাতির মতো ইতর জাতি দেখি নি বাপু। খুশিমতো ঈশ্বরের নামে আমাকে দু-টুকরো ক'রে বিলের পাশে ফেলে চলে গেল।

পাগল ঠাকুর যে পাগল ঠাকুর তাঁর পর্যন্ত এবার ভয় ধরে গেল। তিনি সব ভুলে মাঠময় ছুটে বেড়াতে থাকলেন। এবং সেই এক চিৎকার অতিকায় বাদুরকে উদ্দেশ্য ক'রে : গ্যাৎ চোরেৎ শালা।

সামসুদ্দিন ঢাকা থেকে ফিরেই শুনল জালালি ডুবে গেছে জলে। গ্রামের

কেউ একবার খোঁজ করতে যায় নি পর্যন্ত। সে তাড়াতাড়ি দলবল নিয়ে মাঠে বের হয়ে পড়ল। দু-জন লোককে দু-জায়গায় পাঠিয়ে দিল—একজন আবেদালি এবং অন্যজন জব্বরকে খবর দিতে চলে গেল। সে তার দলবল নিয়ে বিলের পাড়ে পৌঁছাতে বেশ রাত ক'রে ফেলল। ওরা পাড়ে পৌঁছেই দেখল জ্যোৎস্নার ভিতর মাঠময় কে যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। দেখলে মনে হবে ঘটনাটা আধিভৌতিক। মনে হবে কোনো জিন্ পরী, ঈশ্বরের ভয়ে পাগলের মতো ছুটছে। সামসুদ্দিন পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। দলের লোকেরা বলল, ভাই সামু চলি রে। কার কপালে কি আছে কওয়ন যায় না।

সামু এবার চিৎকার ক'রে উঠল, মাঠের ভিতর কে জাগে কও!

উত্তরে খুব পরিচিত শব্দ: গ্যাৎ চোরেৎ শালা। মাঠের ভিতর মনুষ্য জাগে। সকলের প্রাণে জল এসে গেল। পাগল ঠাকুর এই মাঠের ভিতর ছুটাছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে। ভূত প্রেত, দৈত্য দানোর ভয় ওদের থাকল না। সামু চিৎকার ক'রে প্রতিধ্বনি তুলল, বড় কর্তা আমি সামু। আবেদালির বিবি জলে ডুইবা গ্যাছে। তারে আমরা তুলতে আইছি।

সুতরাং কিংবদন্তির ভয়টা ওদের মুহূর্তে উবে গেল। ওরা এবার অলস অথবা মন্থর পায়ে জলের কাছে নেমে গেল। যারা বিলে শালুক তুলতে এসেছিল তাদের ভিতর দু-একজন আছে। সামসুদ্দিন তাদের একজনকে নিয়ে জলের ধারে ঘুরতে থাকল। কোথায় শেষবার ওরা জালালিকে দেখেছে এবং তখন বেলা ক'টা তার একটা আন্দাজ করতে চাইল সামু। কয়েকজন লোক চলে গেছে হাসিমদের বড় নৌকাটা জল থেকে তুলে আনতে। নৌকা এলেই জলের ভিতর অন্বেষণে নেমে যাবে। জালালির কাপড় জলে ভেসে থাকতে পারে, ফুলে ফেঁপে জালালি জলের উপর ভেসে উঠতে পারে।

কিন্তু নৌকা ভাসিয়ে মনজুর যখন এল, যখন জয়নাল গলুইতে দাঁড়িয়ে লগি বাইছে এবং নৌকার উপর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন লোক, জ্যোৎস্না রাতে বিলের জলে ঢেউ উঠছে—পদ্মপাতার উপর কোনো গাঙ ফরিঙের শব্দ, রাত নিশুতি হচ্ছে অথচ জালালির কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না তখন মনে হল দূরে কি ভেসে যায়। ওরা বিলের ভিতরে ঢুকে দেখল সেই পাতিল, পাতিলে কিছু শালুক, শালুকের উপর চাঁদের আলো মায়াময়। গোটা আট-দশ শালুক সারাদিনে জালালি সংগ্রহ করেছিল। শালুকের উপরে একটা ঝিনুকও আছে। ঝিনুকটা বেশ বড়, বড় ঝিনুক হলেই মুক্তো হয়, ঝিনুকে মুক্তোর স্বপ্ন দেখেছিল জালালি। এত অভাবেও জালালির বেগম হবার স্বপ্নটা মরে যায় নি। সামসুদ্দিন ছুঁয়ে পাতিলটা পাটাতনে তোলার সময় কাতর গলায় হাঁকল, চাচী তর রাজ্যে এখন কারা জাগে!

জল থেকে কোনো উত্তর উঠে এল না। সে এবার চারিদিকে তাকাল। বিলের

পাড়ে পাড়ে একের পর এক ছোট ছোট গ্রাম। গরীব দুঃখীদের নিবাস। গ্রামে যারা মোল্লা মৌলভি মানুষ, হাটে তাদের সুতোর অথবা পাটের কারবার আছে। আর আছে হিন্দু মহাজন। এবং হক সাহেবের ঋণ সালিশি বোর্ডও আছে। মানুষগুলো আত্মরক্ষার কৌশল ধীরে ধীরে জেনে ফেলছে। সে অন্যান্য সকলকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, তবে ছাখছি পাওয়া গ্যাল না।

কেউ কোনো শব্দ করছে না। করলেই সামু জলের নিচে ওদের ডুব দিতে বলবে। এই শীতে জলে নামলে হিমে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ওরা কেমন ইতস্তত করতে থাকলে সামু বলল, ঠিক আছে আপনেরা নৌকায় থাকেন, ডুব দিয়া আমিই ছ্যাখি। বলে সেই দলের মানুষটা যেখানে শেষবার জালালিকে দেখেছে সেখানে গামছা পরে ডুব দিল সামু।

বিলে এত মানুষজন দেখেই বুঝি মোষের মুণ্ডটা চোখের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাগল ঠাকুর সামান্য সময় পেলেন ভাববার। তিনি ভাবলেন, এমন কেন হল! সামান্য এক অবলা জীবের এত রোষ। তিনি তাড়াতাড়ি সেই রোষ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সামুদের নৌকার দিকে হাঁটতে থাকলেন। নৌকাটা এখন জলের উপর এক জায়গায় থেমে আছে এবং একজন মানুষ একা জলে সাঁতার কাটছে, জলে ডুব দিচ্ছে। ভয় বিস্ময় তার কিছু নেই। এতগুলো মানুষ নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। আর একটা মানুষ দামের ভিতর শীতের রাতে আটকা পড়বে। কে এমন অবিবেচক। পাগল ঠাকুর প্রায় জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জালালি যেখানে ডুবেছে তার চেয়ে অনেক দূরে ওরা খোঁজাখুঁজি করছে। এই অনর্থক পরিশ্রমের জন্য পাগল ঠাকুরের কেমন কষ্ট হচ্ছিল। তা ছাড়া একা একা পায়ে হাঁটলে সেই মোষের কবলে পড়ে থাকবেন ভাবতেই নৌকায় ওঠার জন্য দু হাত উপরে তুলে তালি বাজালেন।

মনজুর পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাঁকল, তালি বাজায় কোন মাইন্‌সে?

উত্তর নেই। কেবল কে অনবরত তালি বাজাচ্ছে। সুতরাং ওর বুঝতে আদৌ কষ্ট হল না, ঠাকুর বাড়ির পাগল ঠাকুর তালি বাজাচ্ছে। নৌকায় ওঠার জন্য তালি বাজাচ্ছে। মনজুর চিৎকার ক'রে বলল, আইতাছি করতা। খাড়ন।

নৌকা পাড়ের কাছে গেলে কোথায় পাগল ঠাকুর নৌকায় উঠে আসবেন তা না, জলে ঝাঁপ দিয়ে সেই দুই পদ্মকলির দিকে ছুটে যেতে থাকলেন। পাগল মানুষের শীত গ্রীষ্ম সব সমান। মানুষটা বুঝি পুরোপুরি ক্ষেপে গেছে। তিনি সকলকে পিছনে ফেলে দুই পদ্মকলির উদ্দেশ্যে একটা বড় সাদা রাজহাঁসের বেগে চলে যেতে থাকলেন। দশাসই মানুষ, তল্লাটে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। যেমন লম্বা তেমনি অসীম শক্তির ধারক মানুষটি সকল কিংবদন্তির দৈত্য-দানোকে কলা দেখিয়ে দুই পদ্মকলির ভিতরে ডুবে গেলেন। দাম, লতাপাতা, পদ্মের লতা ছিঁড়ে ফুঁড়ে জালালির জীর্ণ লাশটাকে টেনে বের ক'রে

ফেললেন, তারপর চুল ধরে জলের উপরে ভেসে সাঁতরাতে থাকলেন। তীরের বেগে সাঁতার কাটছেন। মানুষগুলো ভয়ে বিস্ময়ে রা করতে পারছে না। ঠিক এক পীর, দরগার পীর এই পাগল মানুষ যেন। সকলকে বিস্মিত ক'রে জালালির শরীরটা কাঁধে ফেলে জল ভেঙে উপরে উঠে গেলেন তিনি। কোনো দিকে তাকালেন না। কাঁধে মৃতদেহ, সামনে ফসলবিহীন মাঠ। আকাশে কিছু নক্ষত্র জ্বলছিল। আর দূরে ঢাকের বাদ্যি। পাগল ঠাকুরের সহসা মনে হল তিনি জালালিকে নিয়ে হাঁটছেন না। কাঁধে তার ভালবাসার যুবতী পলিন। পলিনকে নিয়ে হাঁটছেন। এটা ফসলবিহীন মাঠ নয়, এটা সেই রেমপার্ট। সামনে ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ। একদল ইংরেজ সৈন্যের কুচকাওয়াজের শব্দ, ওরা পিছন থেকে পলিনকে কেড়ে নেবার জন্য ছুটে আসছে। পাগল ঠাকুর ছুটতে থাকলেন।

ওরা দেখল তিনি প্রায় ছুটে যাচ্ছেন। পাগল মানুষ তিনি, কোনদিকে চলে যাবে জালালিকে নিয়ে কে জানে! তা ছাড়া তিনি বিধর্মী মানুষ। সেই মানুষের কাঁধে মৃত জালালি। ওরা ছুটতে থাকল। পাগল ঠাকুরকে ধরবার জন্য ছুটতে থাকল। এই মৃত জালালিকে নিয়ে অন্য কোনো মাঠে অথবা নদীর ওপারে চলে গেলে ইসলামের গুনাহগার হতে তবে আর বাকি থাকবে না। এখন জালালিকে ধর্মমতে আবেদালি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। আর এই মানুষ, পাগল মানুষ, ঠাকুর বাড়ির পাগল ঠাকুর সব পিছনে ফেলে মাঠ ধরে ছুটছেন। ওরা একসময় ঠিক ম্যাঠের মাঝখানে পাগল ঠাকুরকে ঘিরে ফেলল। ধীরে ধীরে ওরা পাগল ঠাকুরের নিকটবর্তী হতে থাকল। ওরা বুঝতে দিচ্ছে না জালালিকে কাঁধ থেকে তুলে নেবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের কৌশল ধরে ফেললে তিনি ছুটবেন — যেমন তিনি হেমন্তের এক বিকেলে মুড়াপাড়ার হাতি নিয়ে মাঠে ঘাটে বের হয়ে পড়েছিলেন। সামসুদ্দিনের ধর্মসভা ভেঙে দিয়েছিলেন, হাতি শুঁড়ে তুলে নিয়েছিল ফেলুকে, অনেক কষ্টে ফেলুকে বাঁচান গেছে, কিন্তু বাঁ হাতটা পঙ্গু, বাঁ হাত ভেঙে নিয়ে ফেলুকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছেন।

সামসুদ্দিন কাছে গিয়ে বলল, চাচিরে স্থান।

খুব বিবেচক পুরুষের মতো পাগল ঠাকুর জালালিকে মাঠে শুইয়ে দিল। শুইয়ে দেবার সময় গল গল ক'রে ভিতর থেকে জল উগলে দিল জালালি। শরীরটা সাদা ফ্যাকাসে। চোখের মণি দুটো স্থির। অপলক তাকিয়ে সকলকে দেখছে। ডুরে শাড়িটা আলগা হয়ে গেছে। সামু কাপড়টা তুলে জল চিপে ফের শাড়িটা দিয়ে লাশটা ঢেকে দিল। তারপর জালালির সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, কে এই লাশ বহন ক'রে নেবার অধিকারী — যারা পুত্রবৎ অথবা পিতৃবৎ তারাই শুধু লাশ বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারবে। এইসব ভেবে সে চার পাঁচজন মানুষকে লাশটা বেঁধে ফেলতে বলল। একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে যেমন মোষ নিয়ে মানুষেরা গিয়েছিল,

ভক্ত যজ্ঞেশ্বর কি জয় বলে জয়ধ্বনি করছিল তেমনি ওরা আল্লা রহমানে রহিম বলে চলে যাচ্ছিল মাঠ পার হয়ে।

আবেদালির বিবি শালুক তুলতে এসে জলে ডুবে মরে গেল। কিংবদন্তির দেশে জালালি শহিদ হয়ে গেল। এই নিয়ে ফের একটা সাল উত্তেজনা থাকবে—যেমন রস এবং বুড়ি সেই কোন এক সালে জলে ডুবে মরেছিল—কেউ টের পায় নি, হেমন্তর কোনো অপরাহ্নে কঙ্কাল আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত হয়েছে অঞ্চলের মানুষেরা। তারপর সব গালগল্প। অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষেরা, যখন রাত হয়, যখন কেউ জেগে থাকে না তখন অঞ্চলের খাল বিল, শ্মশান কবরখানা অলৌকিক ঘটনা নিয়ে ডুবে থাকে, এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে।

ওরা যত এগুচ্ছিল ততই ঢাক এবং ঢোলের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সারারাত ঢাকঢোল বাজবে! হ্যাজাকের আলো এখন মাঠময় আর মাঝে মাঝে বাজি পুড়ছে। হাউই উড়ছে আকাশে। মালতির চোখে ঘুম আসছিল না। পার্বণের খাওয়া চালকলা, তিলাকদমা এবং ফুল ফলে ভরা। তারপর পিচুরি পায়েস। বড় বৌ ভিন্ন ডেকে একবার পায়েস খেতে দিয়েছে মালতিকে।

মালতি লেপ কাঁথার ভিতর শুয়ে জানালা দিয়ে মাঠের জ্যোৎস্না দেখছিল। বাস্তুপূজার দিনে জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। ঠিক যেন কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা। বাজি, আতসবাজি আর নাড়ু, মোয়া। খেতে খেতে আকণ্ঠ। এই জ্যোৎস্নায় বিলের জলে জালালি ডুবে আছে। কথাটা ভাবতেই মালতির কেমন দম বন্ধ ভাব হচ্ছে। সে উঠে বসল। ওরা এখনও আসে নি। এলে গোপাটে ওদের দেখা যেত। এবং ওদের কথাবার্তা থেকে টের পাওয়া যেত জালালিকে খুঁজে পাওয়া গেছে কি না।

মালতি অনেক চেষ্টা করেও ঘুমতে পারল না। লেপ কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কেমন চুপচাপ উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকল। সারাদিন শরীরে ভীষণ ধকল গেছে। সেই কোন ভোরে উঠে মালতি পূজার জন্য ফুল তুলেছে। তুলসিপাতা এবং কাঠের বারকোস মাঠে নিয়ে গেছে। নৈবেদ্য সাজাবার জন্য পেতলের থালা বের ক'রে মেজেছে। সেই কোন ভোর থেকে দুধের বাসন, পেতলের হাড়ি মেজে সাফসোফ করেছে। তারপর দিনমান মাঠ আর বাড়ি। বাস্তুপূজা মাঠে হয়। মাঠে সব টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। আবার মাঠ থেকে সব টেনে বাড়িতে তুলতে হয়েছে। প্রায় একহাতে সব কাজ, শোভা আবু সামান্য সাহায্য করেছে। অমূল্য দুপুর পর্যন্ত ছিল, বাস্তুপূজার জন্য তাঁতের কাজ বন্ধ—অমূল্য ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। ফলে মালতি সন্ধ্যা পর্যন্ত শ্বাস ফেলার সময় পায় নি এবং তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়েছিল খুব ঘুমবে বলে। কিন্তু হায় কপাল—ঘুম আসে না চোখে। কিসের আশায় কি কেবল বাজে যেন বুকে। মনে হয়

এই জ্যোৎস্নার রাতে মাঠের ভিতর একা দাঁড়িয়ে থাকতে। পাশে এক ভালবাসার মানুষ থাকবে শুধু। ওর প্রিয় স্বার্থপর দৈত্যটির কথা মনে হল। স্বার্থপর দৈত্যটি সারাদিন মাঠে মাঠে প্রসাদ খেয়ে বেড়িয়েছে—একবার মালতির পুজা দেখতে এল না। রঞ্জিত দলবল নিয়ে সরকারদের বাস্তুপুজায় চলে গেল অথচ একবার ওর এমন নিষ্ঠা নিয়মের পুজার পাশে এসে দাঁড়াল না। ভিতরে ভিতরে একধরনের ক্ষোভ এবং রাগের বশে মালতি একটানা কাজ করেছে। ক্ষোভের জ্বালা ভয়ংকর। সে ভেতরে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। মানুষটার বড় বেশি গরিমা মনে মনে। দেশের কাজ ক'রে বেড়ায় বলে অহঙ্কারে পা পড়ে না। জ্যোৎস্নায় মাঠ ভেসে যাচ্ছে, গাছগাছালি সব সাদা হয়ে গেছে। এতটুকু অন্ধকার নেই কোথাও। এমন জ্যোৎস্না যেন কতকাল ওঠে নি। এমন জ্যোৎস্নায় ঘুম আসে না চোখে। অন্য এক যুবকের হাত ধরে ফসলবিহীন মাঠের ভিতর ডুবে যেতে ইচ্ছা হয়। মালতি জানালার পাশে চুপচাপ বসে থাকল। ঘরের ও-পাশটায় অন্য চৌকিতে শোভা আবু ঘুমোচ্ছে। উত্তরের ঘরে নরেন দাস এবং আভারানী। ওদের কোনো কথাবার্তা আর শোনা যাচ্ছে না। বোধহয় ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মালতির প্রথম মনে হয়েছিল বেশি খাওয়ার জন্য ভিতরটা হাসফাঁস করছিল এবং ঘুম আসছে না চোখে। ক্ষোভে অভিমানে ঘুম আসছে না অথবা মানুষটাকে খুব কাছে পেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফলে জ্বালা ভিতরে। বুকের ভিতর কি ভীষণ জ্বালা। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরটা ধরাস করে উঠছে। বুঝি এল, কেউ বুঝি চুপি চুপি ওর জানালার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু না, কেউ এল না। কেউ আসবে না। শুধু এই বসে থাকা এই জেগে থাকা। মালতি ফের শুয়ে পড়ল। জ্যোৎস্নায় মাঠ আদিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। ওর মুখে জ্যোৎস্নার লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে—মালতি জোর করে স্বামীর স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করল। স্বামীর সঙ্গে সহবাসের ছবি মনে করার চেষ্টা করল। কত পুরনো সেইসব ছবি বার বার এক ছবি নিয়ে, স্মৃতির ছবি, এবং একঘেয়ে সহবাসের ছবি নিয়ে বেশি-দিন বেঁচে থাকা যায় না। এই ছবি শরীরে আর কোনো উত্তেজনার উদ্রেক করে না। সে মনে মনে ভাবল কোথাও আর জ্যোৎস্না নেই। সে লেপটা গোটা মাথায় মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ভিতরটা অন্ধকার করে দিল। জ্যোৎস্না নেই, অন্ধকার চারি-দিকে। জীবনের সব স্বপ্ন সহবের দাঙ্গা নিঃশেষ ক'রে দিয়েছে। নূতন ক'রে স্বপ্ন দেখলে পাপ। মালতি এই পাপের ভয়ে লেপের নিচে মুখ লুকিয়ে রাখল। ফলে অন্ধকার চারিদিকে। অন্ধকারে পাপ ক'রে বেড়ালে কে আর টের পাবে। স্বামীর মুখ যখন কিছুতেই আর মনে করতে পারছে না, পুরানো সহবাসের ছবি যখন চোখের উপর ক্যালেণ্ডারের পাতার মতো নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে গেছে তখন অন্ধকারে পাপটুকু শরীরে রোমাঞ্চ এনে দিচ্ছিল, আবেশ এনে দিচ্ছিল। সতী-সাবিত্রীর গল্পগাথার মতো পুণ্যবতী না হয়ে মনে মনে অন্ধকারের ভিতর রঞ্জিত

নামক এক যুবকের স্মৃতিভারে আপন শরীরের ভিতর পাপকে অন্বেষণ ক'রে বেড়ালো – এই পাপকার্য বড় ভাল লাগে – প্রাণের চেয়েও আপন মনে হয়। আহত সাপ মরে যাবার আগে শরীর যেমন গুটিয়ে আনে আবার সবটা ছেড়ে দেয় এবং শেষে এক সময় সোজা লম্বা হয়ে পড়ে থাকে তেমনি মালতি শরীর ক্রমশ গুটিয়ে আনছে। অসহায় আর্তনাদ এই সারা শরীরের ভিতর। কে যেন নেই পৃথিবীতে, কি যেন হারিয়ে গেছে। সারা শরীরময় তার ভালবাসার অনুসন্ধান চলছে। কত আপন আর কত প্রিয় এই অনুসন্ধান। হায়, মানুষের অন্তরে এই ভালবাসার ইচ্ছা কি ক'রে হয়। কোন অন্ধকার থেকে সে উঁকি মারে, কখন সে সব পাপপুণ্য বিসর্জন দিয়ে মরমিয়া সন্ন্যাসীর মতো পাগলপারা হয় কেউ বলতে পারে না। এখন আর জ্যোৎস্না ভাল লাগছে না, অন্ধকারে চুপচাপ চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে শরীরে কাপড় টেনে শুয়ে পড়বে এবং ঘুমোবে বলে জানালাটা বন্ধ করতে গেল – কিন্তু এ কি! গোপাটে কারা এখন ছুটোছুটি করছে। কে যেন আকাশ ফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ছে। গলাটা চিনতে কষ্ট হল না। জব্বর কাঁদছে। ওর মা শালুক তুলতে গিয়ে জলে ডুবে মরেছে। জব্বর এমনভাবে কবে কাঁদতে শিখল! ঠিক শিশুর মতো যেন আকাশ বিদীর্ণ ক'রে কেঁদে উঠছে – মা মা!

গোপাটের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই জেগে গেল। তাছাড়া সন্ধ্যার পর থেকে পাড়ার বৌ ঝিরা কুয়োতলায় অথবা পুকুর পাড়ে, কখনও আতাবেড়ার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি মেরেছে। এই বুঝি এল। সামসুদ্দিন তার দলবল নিয়ে যখন গেছে তখন লাস তুলে আনতে কতক্ষণ! কিন্তু যারা বয়সে প্রাচীন, যারা বিলের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে এটা সামুর পণ্ডশ্রমের সামিল। ওরা বৈঠকখানায় অথবা উঠোনে এবং গোয়ালের পাশে বসে তামাক খাচ্ছিল এবং বিলের সব অলৌকিক গল্পের ফোয়ারা ছুটাচ্ছিল। প্রতিবেশীদের ছোট ছোট শিশুরা, নাবালকেরা সেইসব প্রাচীন পুরুষদের পাশে বসে দলেদলে গল্প শুনছিল।

ঈশম সোনাকে সেই কিংবদন্তির গল্প শোনাচ্ছিল।

হেমন্তের এক বিকালে সোনাবাবু জন্মালেন। ঈশম তরমুজ খেতে তরমুজের লতা পাহারা দিচ্ছিল। তখন সোনালি বালির নদীর চরে ফুল ফুটে থাকার কথা, ধান কাটা হয়ে গেছে তখন। সোনাবাবু ম্যাঁও ম্যাঁও ক'রে বেড়ালের মতো অনুজ ঘরে কাঁদছেন। সোনা ঈশমের কাছে সেই ম্যাঁও ম্যাঁও কান্নার কথা শুনে বলল, যান! আপনে মিছা কথা কন।

– না গ কর্তা মিছা কথা কই না। সংসারে এমনটা হয় কত। মাথায় পাগড়ি বাইন্দা রওনা দিলাম ধনকরতারে খবর দিতে। তারপর বোঝলেন নি কর্তা,

রাইত, কি ঘুট ঘুইটা আনধাইর। মনে হৈল বামুন্দির মাঠের বড় শিমুল গাছটা মাথায় একটা হ্যাজাগের আলো জ্বালাইয়া আমার দিকে হাঁইটা আইতাছে। কি ডর! কি ডর! দিলাম ছুট। কিন্তু কি জানেন করতা—বান্দার কপালে কষ্ট! বিলের পানিতে মনে হৈল কে যান আমাকে ডুবাইয়া মারতে চায়।

—মারতে চায়! সোনা প্রায় চোখ কপালে তুলে কথাটা বলল ঈশমকে।

—হ! কি কমু করতা। বিলের সেই লক্ষিরে ত আমরা দেখি নাই কোনো দিন। রূপবতী কন্যা—সোনার নাও পবনের বৈঠার জল যাইকা ফুস কৈরা ভাইসা ওঠে। আনধাইর রাইতে ভাসে না, রাইত ফরসা হৈলে ভাসে। চান্দের আলো থাকলে ভাসে। পুণিমার দিনে সেই নাও স্যাথলে তাজ্জব। কি সাদা কি সাদা! সেই জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে। বলে গান ধরে দিল ঈশম।

সোনার এই গল্প কেন জানি ভাল লাগছিল না। কেমন ভিতরে ভয় ধরে যাচ্ছে। সেই জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে। এখন বার বার মার কথা মনে আসছিল সোনার। মা বিকালে বকাবকি করেছেন, তুমি কোন খানে যাও সোনা, কোনখানে থাক, ঠিক থাকে না। কোনদিন তুমি জলে ডুইবা মরবা

সোনার মনে হল মা ঠিকই বলেছেন। বনবাদারে ঘুরে বেড়ানর সখ বড় বেশি ওর। কবে থেকে এমন অভ্যাস গড়ে উঠেছে সোনা নিজেও জানে না। ছোট মানুষের যা হয় সোনার তাই হল। ভয় ধরে গেল প্রাণে। কোনদিন না বলে না কয়ে চলে যাবে আর ঐ সর্বনাশা বিলে পড়ে গেলে ডুবে যাবে। সেইজন্য সে ঈশমের পাশে বসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল—না আর না, আর কোনোদিন সে বনবাদারে ঘুরে বেড়াবে না। সে একা অথবা পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে চলে যাবে না। গেলে সেই যে গল্প অথবা কিংবদন্তির পাঁচালি—জলে ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে—সেই জলে অথবা ডাঙ্গায় যেখানেই হোক সে আর যাবে না। মা সারাদিন চিন্তা করেন। মার ক্লিষ্ট মুখ এবং চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে সে কেমন মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, অথবা সদা সত্যকথা বলিবে, যেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্প—মায়ের জন্য ঝড়জলের ভিতর অবলীলাক্রমে দামোদর নদী পার হয়ে যাচ্ছেন। সোনা মায়ের অবাধ্য কোনোদিন হবে না। সেও মায়ের জন্য সব করবে। মার যা অপছন্দ তা করবে না। যা পছন্দ তা করবে। ঈশম গান করছে, ডুইবা গ্যালে আর ভাসে না জলে। বড় ঘরে ঠাকুরদা কাসছেন, শীতের সময় হলে তিনি সারারাত কাসেন। ঈশম একসময় গান থামিয়ে বলল, বোঝলেন নি করতা, সাঁজ লাগলেই রাজকন্যা বিলের পানিতে সূর্য হাতে ডুব দ্যায়।

—আর ভাসে না জলে!

—ভাসে। সারা রাইত পানির তলে দুই হাতে সূর্যরে লইয়া সাঁতার কাটে।

কাটতে কাটতে নদী বইয়া সাগরে যায়। সাগরে সাগরে মহাসাগরে। ভোর হৈতে না হৈতে পুবের আকাশে ভাইসা ওঠে। আকাশে সূর্যটারে টানাইয়া স্যায় রাজকন্যা। তারপর পলকে তিনি অন্তরধান করেন!

– কোনখানে তিনি অন্তরধান করেন।

– বিলের পানিতে।

– আপনে স্যাপছেন।

– আমি স্যাপ্‌মুকিগ করতা। আপনের মায়রে জিগাইয়েন। পাগল করতারে জিগাইতে পারেন।

সোনা ভাবল হয়ত হবে। এত বড় যখন বিল আর সোনার নাও পবনের বৈঠা যখন রাজকন্যার জিম্মায় তখন তার নদী ধরে সাগরে পড়তে কতক্ষণ। সাগরে সাগরে কতদূর চলে যায় রাজকন্যা। এখন রাজকন্যা তবে কোন সাগরে আছে, দক্ষিণের না উত্তরের! ওর প্রশ্ন করার ইচ্ছা হল। কোন সাগর ধরে রাজকন্যা জলের নিচে এখন সাঁতার কাটছে? সূর্য হাতে রাজকন্যা নীল জলের ভিতর, সোনালি মাছের মতো রূপালি সূর্য মুখে নিয়ে সাঁতার কাটছে। ঠিক ভোর হতে না হতেই টুপ করে সাগরের জলে ভেসে উঠে পুবের আকাশে সূর্যটাকে টানিয়ে আবার জলের নিচে ডুবে যাবে। সোনা যেন কতকাল পর সৃষি ঠাকুরের চালাকিটা ধরে ফেলেছে। ওর বারবার প্রশ্ন ছিল, সূর্য তুমি যাও কোথা? বাবা বলেছেন, বড় হলে সে জানতে পারবে। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্য যায় মামার বাড়ি। বিলের নিচে মামা মামীদের ঘরে যায়।

সোনা চুপচাপ বসেছিল; ঈশম চলে যেতেই ওর ভয়টা বাড়ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠোন পার হয়ে বড়ঘরে ঢুকে গেল। সেখানে ঠাকুমা আছেন, ঠাকুর্দা তক্তপোষের উপর কাঁথাবালিশ চারিদিকে রেখে বসে আছেন। বড় বড় বালিশ দিয়ে ঠাকুর্দাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। বালিশগুলি প্রায় অবলম্বনের মতো কাজ করছিল। সোনা একবার ভাল করে তাকাল – ঠাকুমা সন্ধ্যাহ্নিকে বসবেন এবার। তিনি ঠাকুর ঘরে চলে যাবেন। সোনা যতক্ষণ ঠাকুমা ঘরে না যাচ্ছে প্রায় ততক্ষণ পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করতে থাকল। ঘুর ঘুর করার সময়ই ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইর কথা মনে হল। দামোদর নদীর কথা যেন মনে হল। সে আবার ভাবল মায়ের জন্য সে সব করবে। মার যা অপছন্দ তা করবে না, যা পছন্দ তা করবে। আর ঘুরে ফিরে সেই কথা মনে হল – বিলে রাজকন্যা, মাঠে ফতিমা। ফতিমা ওকে ছুঁয়ে দিয়েছে। সে স্নান করে নি। এ সব শুনলে মা রাগ করবেন। মার কঠিন মুখের কথা ভাবতেই ওর প্রায় কান্না পেতে থাকল। মা আজ গরদের শাড়ি পরেছেন। পূজাপার্বণের দিন থাকলে মা সারাদিন গরদের শাড়ি পরে থাকেন। মাকে কেমন ভালমানুষের ঝি মনে হয়। মাকে জলের মতো নির্মল মনে হয়, সাদা শাপলা ফুলের মতো পবিত্র মনে হয়। সুতরাং সেই পবিত্র এবং নির্মল জলের পাশে অশুচি

শরীর নিয়ে থাকলে পাপ। সোনা এখন কি করবে ভাবতে পারছিল না। বলবে কি বলবে না, না ফতিমা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে বলবে, না কিছুই বলবে না, চুপ-চাপ থেকে যাবে স্থির করতে পারছিল না। ওর ভিতর থেকে ভয়ে কেমন শীত উঠে আসছিল। সে আর দাঁড়াল না। এক দৌড়ে পশ্চিমের ঘরে ঢুকে গেল। কি শীত কি শীত! কি ঠাণ্ডা! এই ঠাণ্ডায় স্নান করা বড় কষ্ট। সোনা চাদরটা আরও ভালভাবে জড়িয়ে মায়ের পাশে বসে গেল। ওর স্নান করার কথা মনে থাকল না। এখন কেবল বিলের সেই রাজকন্যার কথা মনে আসছিল। রাজকন্যার মুখে রুপালি সূর্য। সূর্য মুখে রাজকন্যা একটা মাছের মতো জলের নিচে সাঁতার কাটছে।

উৎসবের দিনের ছুটোছুটি সোনাকে ক্লান্ত করেছিল খুব। সে রাতে খেল না পর্যন্ত, তক্তপোষে উঠে সকলের অলক্ষে শুয়ে পড়ল: ওর আজ পড়া নেই। উৎসবের জন্য ছুটি। আজ উঠোনে লাঠিখেলা ছোরাখেলা বন্ধ। এবং লাল্টু পল্টু সেই যে ছোটকাকার সঙ্গে পুজার চরু রান্না করতে গেছে এখনও ফেরে নি। সারা বিকাল সে প্রায় একা ছিল। বড় জেঠিমা এখনও রান্নাঘরে। রাত্রে আজ রান্না নেই। শুধু ঠাকুর্দা সামান্য ফল সেদ্ধ খাবেন। ঠাকুমা গরম দুধ খাবেন। তাদের করণীয় কাজটুকু ক'রে দিতে পারলে মা জেঠিমার ছুটি। মা এখন ঘরে থেকে বের হয়ে গেলেন। সে একা একা ঘরে। ছোট বোন মিঠু পাশে ঘুমচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোটা বড় নিষ্প্রভ। টিনের চাল। চালে কুয়াশা জমেছে। ফোঁটা ফোঁটা জল জমে নিচে পড়ছে। টপ টপ শব্দ হচ্ছিল। কান পেতে রয়েছে সোনা। যেন কারা উপরের কাঠের পাটাতনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সোনা মাকে ডাকতে পারত। তার ভয়ের কথা বলতে পারত। ওর অন্যদিন কোনো ভয় থাকে না, আজ ভয়ের কথা বললে মা বিরক্ত হবেন। সে মাকে ডাকতে সাহস পেল না। একটা মানুষ জলে ডুবে মরে গেছে, এবং সেই কাটা মুণ্ডু পেটে নিয়ে মোষ যায় মাঠে—দৃশ্যটা মনে পড়তেই সে লেপ দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে দিল। মনে হল শরীরটা অশুচি। সে ফতিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে কিন্তু স্নান করে নি। শরীর অপবিত্র হলে ভূতপ্রেত ঘাড়ে চাপতে সময় নেয় না। সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ লেপ দিয়ে গোটা শরীর ঢেকে দিতে চাইল। ছোট মানুষের মনে কত রকমের কল্পনা—ওর বারবারই মনে হচ্ছিল, ফাঁক পেলেই বিলের সেই অপদেবতা ওর লেপের ভিতর ঢুকে যাবে। ওকে সুড়সুড়ি দেবে, ওকে হাসিয়ে মেরে ফেলবে অথবা ওর নাকে মুখে কল্পিত এক ঘ্রাণ দেবে মেখে, মেখে দিলেই সে দাসানুদাস, সেই অপদেবতা তাকে বিলের জলে হেঁটে যেতে বলবে, সে সেই অপদেবতার মতো জলের উপর দিয়ে হাঁটতে গেলে ডুবে যাবে। ওর ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মা বাবার জন্য কষ্ট হচ্ছে। সে ক্রমশ লেপের নিচে গুটিয়ে আসছে। মনে হচ্ছিল কেবল ঘরটার চারপাশে কারা যেন ফিস

ফিস করে কথা বলছে। ঈশ্বরের নাম নিচ্ছিল। সে আর কোনোদিন ফতিমাকে ছুঁয়ে দেবে না। সে কোনোদিন ফতিমাকে ছুঁয়ে নিজেকে অপবিত্র করবে না। ওর কেবল এখন ফতিমার উপর রাগ হচ্ছিল। নচ্ছার মেয়েটা ওকে একদিন এই ক'রে মেরে ফেলবে। ফতিমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। সে স্নান করে নি। স্নান না করলে ঘাড়ে অপদেবতা ভর করেন, মা তাকে এমন বলেছেন। মার কথা সত্য না হয়ে যায় না। সে দেখল লেপের নিচে কেমন আলো জ্বলে উঠল। কিসের আলো, সোনা চোখ বুজে থেকে কিসের আলো লেপের নিচে দেখতে পেল! হ্যারিকেনের আলোটা নিষ্প্রভ ছিল, নিভে যাবার আগে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে একেবারে নিভে গেল। তারপর অন্ধকার। সোনা চোখ মেলে দেখল আলো নেই, লেপের ভিতরে আলোটা মরে গেছে, সে লেপ থেকে মুখ বার করতেই দেখল ঘরটা অন্ধকার এবং জানালায় সাদা জ্যোৎস্না! ওপাশে ছোট কাঁঠাল গাছের গুঁড়িটা কেমন জীবন্ত হয়ে গেছে এবং ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সোনা এবার ধরফর ক'রে উঠে বসল। ডাকল, মা! মা!! ভয়ের চিৎকার। মা ছুটে এসেছেন। তিনি দেখলেন সোনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। চোখে মুখে ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের দৃশ্য যেন। সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নেমে জানালার দিকে হাত তুলে কি দেখাতে চাইল মাকে। মা বললেন, কৈ কিছুত গ্যাখতে পাইতাছানি।

সোনার কেমন ঘাম দিয়ে জ্বরটা সেরে গেল। সে এবার কেঁদে ফেলল। বলল, মা ফতিমা আমারে ছুঁইয়া দিছে।

—আবার সেই মাইয়াটা!

—মা আমি কিছু করি নাই।

—ধনবৌ সোনাকে কিছু বললেন না। তিনি ঠাকুর ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। এখনও পরনে গরদের শাড়ি, ফুল বেলপাতার গন্ধ, চন্দনের গন্ধ শরীরে। মাকে পবিত্র ফুলকুমারী মনে হচ্ছে সোনার। সে মায়ের পিছনে আত্মা হয়ে হাঁটছে। অন্ধকার ছিল না। জ্যোৎস্নায় মাঠ ঘাট ভেসে যাচ্ছে। বড় বৌ রান্নাঘরে বুড়ো ঠাকুরের জন্য ফল সেদ্ধ করছেন। খেজুর দুধে সেদ্ধ ক'রে দিচ্ছেন। কিছু মনাক্কা ফেলে দিয়েছেন দুধে। ঠাকুমা রান্নাঘরে বসে দুধ কলা খৈ খাচ্ছেন। ঠাকুমার বড় প্রিয় খাবার। একটা কুপি জ্বলছিল বড়ঘরের দাওয়ায়। ঈশম বোধ হয় এতক্ষণে তরমুজ ক্ষেতে পৌঁছে গেছে। রঞ্জিত বৈঠকখানা ঘরে বসে কি লিখছিল মনোযোগ দিয়ে। সে ক্রমাগত লিখে যাচ্ছে। আর ধনবৌ উঠোন পার হয়ে যাচ্ছেন। সোনা প্রথম ভেবেছিল মার যা রাগ—তিনি নিশ্চয়ই ওকে পুকুরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে হিমের মতো জল, জলে ডুব দিতে বলবেন। সে ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিল। অথচ মা ক্রমাগত উঠোনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। ওর মনেই হয় নি ওদের উঠোনটা এত বড়। এই প্রথম যেন মনে হল এত বড় উঠোন সে কোনোদিন এক দৌড়ে পার হতে পারবে না।

মা আজ বড় কোমল গলায় ঠিক শেফালি গাছটা পার হলে ডাকলেন, সোনা।

সোনা উত্তর করল, মা।

—তুমি এখানে থাকও।

সোনা দাঁড়াল।

মা ঠাকুর ঘরের ভিতরে ঢুকে তামার পাত্র থেকে তুলসিপাতা সামান্য চরণামৃতের জল তুলে সোনার শরীরে মাথায় মুখে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর হাঁ করতে বললেন। হাঁ করলে তুলসিপাতাটা সোনার মুখে আল্গা ক'রে ছেড়ে দিয়ে বললেন, খাও। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সোনার, শরীর থেকে সমস্ত ভয় মন্ত্রের মতো উবে গেছে। সে মাকে জড়িয়ে ধরল, মা আমি আর মাঠে একা যামু না।

ধনবৌ সোনার কথার জবাব দিলেন না, তামার পাত্র থেকে গণ্ডুষ করে জল নিলেন এবং দ্রুত ছুটে গেলেন ঘরে। সব ঘরে সেই জল ছিটিয়ে দেবার সময়ই শুনলেন, গোপাটে হৈ চৈ। জব্বর কাঁদছে। শিশুর মতো গলা ছেড়ে মায়ের জন্য শোকবিহ্বল হয়ে পড়ছে।

বড়বৌ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। রক্তিত সব ফেলে উঠোনে নেমে এল। ধনবৌ দরজার শেকল তুলে নেমে এলেন। দক্ষিণের পুকুর পার হলে গোপাট। গোপাট ধরে সামসুদ্দিনের দলটা উঠে আসছে। সোনা মায়ের পিছনে ছিল। ধনবৌ লক্ষ করেন নি সোনা কখন পিছু পিছু ওদের সঙ্গে চলে এসেছে।

মালতি আভারানী উঠে এসেছে। নরেন দাস পেয়ারা তলায় দাঁড়িয়ে দেখল দলটা গোপাট ধরে উঠে আসছে।

দীনবন্ধু ওর দুই বউ সুখী আর দুঃখী এসে দাঁড়াল বকুলতলায়। প্রতাপ চন্দ্র দাঁড়াল এসে চিলেকোঠার পাশে। ওর তিন স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি অনেক। ওরা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে জালালিকে দেখার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। শ্রীষ চন্দ, নাপিত বাড়ির কবিরাজ এবং গৌর সরকারের ছেলেমেয়ে বাঁশ ঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়েছিল – দলটা আসছে। হায় হায় চিৎকার শোনা যাচ্ছে জব্বরের। আবেদালি বুঝি এখনও এসে পৌছায় নি। জলে ভোবা মানুষ উঠে আসছে। এই ভয়াবহ মৃত্যুতে জ্যোৎস্না পর্যন্ত সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এমন কি একটা পাতা নড়লে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। কেমন ভৌতিক মনে হচ্ছে সব কিছু। চুপচাপ। নিঃশব্দ। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। সাদা মেঘ থাকলে, হাওয়া থাকলে এবং ঝোপেজঙ্গলে কোনো কীটপতঙ্গ শব্দ করলে বোধহয় ব্যাপারটা এত বেশি ভৌতিক মনে হতো না। এমন কি এখন ঢাক ঢোলের বাজনা থেমে গেছে। চুপ চাপ গাছের ছায়ায় মানুষেরা দাঁড়িয়ে। ভয়ঙ্কর সাদা জ্যোৎস্নায় জালালিকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে আসা হচ্ছে। সোনা জালালির মৃতদেহ বাঁশে ঝুলতে দেখেই ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। মা টের পেয়ে ধমক দিতে

পারলেন না। বরং ওকে কোলে তুলে নিলেন।

লাশটা বাঁশে বাঁধা। রঞ্জিত ভাবল একবার ডেকে সামসুদ্দিনের সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু মাঠের দিকে তাকাতেই মনে হল এখনও উৎসবের ছবি জেগে আছে। একটু পরেই সরকারদের পুকুরপাড়ে বাজি পোড়ান হবে। তখন সব হিন্দু গ্রামগুলিতে ফের উৎসবের আলো জেগে উঠবে। বাজি পুড়বে। রঞ্জিত ডাকতে সংকোচ বোধ করল।

আর সোনার মনে হল দুপুরের ছবি যায়। কাটা মোষ পেটে মাথা নিয়ে যায়। সব স্পষ্ট নয়, তবু মনে হয় জালালির মাথাটা ঝুলে আছে। চুলগুলি সনের মতো খাড়া হয়ে আছে। সোনা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। কি ভয়! কি ভয়! জলে ডোবা লাশ ওর চোখের উপর ভাসছে। সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মায়ের কাঁধে মাথা রেখে সে জোর ক'রে দৃশ্যটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বড় উৎকট দৃশ্য। কিছুতেই চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে না। মানুষ মরে গেলে এমন হয়! চোখ দুটো এমন স্থির থাকে! এই লাশ দেখে সোনার কেন জানি মনে হল সেও একদিন জলে ডুবে মরে যাবে। মরে গেলে ওকেও সকলে বাঁশে বেঁধে নিয়ে যাবে। সে কিছুতেই আর মায়ের কাঁধ থেকে মুখ তুলল না। ওর এই প্রথম মনে হল সে মরে যাবে, ঠাকুর্দা মরে যাবে। পাগল জ্যাঠামশাই, মা বা কেউ বাঁচবে না। মা মরে গেলে সোনার আর কি থাকল। সব নিঃশেষ, সব হাহাকারের দৃশ্য চারিদিকে। সে মাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। মা আমি আর দুষ্টুমি করব না, বন বাদারে ঘুরব না, যেন এ-সবও বলার ইচ্ছা হল। সে কাঁধ থেকে মুখ তুলে বলতে যাবে ভেবে একেবারে বিস্মিত—মার চোখে জল। বিলের জলে ডোবা লাশ দেখে মা কাঁদছেন।

সোনা ডাকল, মা।

সাধারণত এমনি হয় মানুষের। দুঃখের ছবি দেখলে কষ্ট নামক একটা বোধ সংক্রামিত হতে থাকে ভিতরে। মনে হয় একদিন না একদিন সকলকে সবকিছু ছেড়ে যেতে হবে। ভুবনময় সাদা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। বড় বৌ অর্জুন গাছটার নিচে। জালালির লাশ নিয়ে ওরা মাঠ পার হয়ে চলে গেল। ওরা তখন দেখল পেছনে অন্য একজন মানুষ উঠে আসছেন। কে তিনি। বড়বৌ দেখলেন—পাগল ঠাকুর, তিনি সকলের পেছনে উঠে আসছেন।

ধনবৌ দেখল সাদা জ্যোৎস্নায় পাগল ঠাকুরকে সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে। খালি গা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভিতর তিনি খালি গায়ে হাঁটছেন।

সোনা দেখল, জ্যাঠামশাই কোনোদিকে তাকাচ্ছেন না। সোজা হেঁটে উঠে আসছেন। তিনি সামনে এসে পড়তেই বড়বৌ ছুটে গোপাটে নেমে গেলেন। রঞ্জিতও নেমে গেল। জ্যাঠামশাইকে দেখে সোনার সব ভয় উবে গেল। সেও ছুটে গিয়ে গোপাটে নেমে ডাকল, জ্যাঠামশায়।

বড়বৌ পথ আগলে দাঁড়ালেন। মানুষটা বাড়ির দিকে না গিয়ে সোজা মাঠের দিকে নেমে যেতে পারে। বড়বৌ এবার পাগল মানুষের হাত ধরে ফেলল। এই হাতের স্পর্শ পেলেই দশাসই মানুষ পাগল মানুষ কেমন একেবারে সরল বালক বনে যান। তিনি শরীরে হাত দিতেই বুঝলেন পাগল মানুষের পরনের কাপড়টা ভিজা। সর্দি কাসি মানুষটার জীবনে হয় না। এ মুহূর্তে মনে হল যদি মানুষটার অন্য কোনো কঠিন অসুখ হতো, সেই অসুখের জন্য বড়বৌর প্রার্থনা। আর তিনি পারছেন না। মানুষটার দিন দুপুর নেই, কখন কোথায় চলে যান, কখন আসেন ঠিক থাকে না। এত বড় উৎসবের দিনে মানুষটাকে তিনি সামান্য আহার করাতে পারেন নি। আলাদা ক'রে সব রেখে দিয়েছেন তিনি—যদি মানুষটা রাতে ফিরে আসে, যদি মানুষটা ভোরের দিকে ফিরে আসে—সেই আশায় বড় বৌ শ্বেত পাথরের বাটিতে সবকিছু ভিন্ন আলাদা ক'রে রেখেছেন।

এখন আর জালালির লাশ অথবা দলটাকে দেখা যাচ্ছে না। জ্যোৎস্না ফের নির্মল হয়ে উঠেছে। সোনা জ্যাঠামশাইকে ডান হাত ধরে টানতে থাকল। রঞ্জিত বাঁ হাত ধরে। বড়বৌ সামনের পথ আগলে আছেন।

সোনা বলল, চলেন জ্যাঠামশয়।

পাগল ঠাকুর শক্ত হয়ে থাকতে পারলেন না। বড়বৌর চোখে বিষণ্ণতা। বড়বৌ অপলক মানুষটাকে চুপচাপ দেখছেন। তিনি সোনার হাত ধরে ঘরমুখো উঠে যেতে থাকলেন। সরল সহজ বালকের মতো উঠে যেতে থাকলেন। চারি-দিকে চোখ মেলে তাকালেন, কেন যে বের হয়ে পড়েছিলেন মনে করতে পারছেন না। কিসের উদ্দেশ্যে এই বের হওয়া, কার স্মৃতির জন্য এমন উদ্‌বিগ্ন হওয়া। কে এমন কোথায় ওর জীবনের সোনার হরিণটি বেঁধে রেখেছে, কোথায় এমন হেমলক গাছ আছে, যার নিচে এক সোনার হরিণ বাঁধা—কল্পিত সেই সোনার হরিণটি কোন মাঠে—পাগল ঠাকুর ভাবতে ভাবতে বিচলিত বোধ করছেন। কার সেই মুখ এবং অবয়বে তীক্ষ্ণ ভালবাসা ছিল—কে সে, যুবতী পলিন কি চাঁদের বুড়ির মতো, অপলক কি তার চোখ, সে কি কোনো ঝরনার পাশে খরগোশের ঘরে বাস করছে, অথবা প্রতিদিন ঝরনার জলে স্নান, যুবতী পলিন হায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের, দুর্গের মাথায় জালালি কবুতর এবং সামনে কত জাহাজ, জাহাজে ক'রে যুবতী এসেছিল এ-দেশে বাপের কাছে—যেন কিছু কিছু স্মৃতি ফের মনে পড়ছে। স্পষ্ট নয়—ভাসা ভাসা। যুবতীর মুখে কি অপরূপ লাবণ্য, নীল চোখ আর ভালবাসার মানুষটিকে প্রতিদিন দুর্গের রেমপার্টে নিয়ে বসাত। মনে হলেই উদ্বিগ্ন হওয়া, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মাথার ভিতর। আবার স্মৃতি-ভ্রষ্ট, যুবতীর চোখ মুখ এবং শরীরের লাবণ্য কেবল পাগলপ্রায় মাঠে মাঠে ঘুরিয়ে মারছে তাঁকে। তিনি কিছুতেই সেই নীল চোখ, লাবণ্য ভরা মুখ স্মরণ করতে পারলেন না। প্রিয়জনের মুখ এবং স্মৃতি স্মরণ করতে না পারলে যা হয়—

রাগে দুঃখে বেদনায় এবং হতাশায় ক্রমশ আস্থর হয়ে ওঠেন, ফলে সেই এক আক্রোশের চিৎকার গ্যাৎ চোরেৎশালা।

রঞ্জিত দেখল এখন মাঠে সে একা। দূরে দূরে ইতস্তত এখনও মাঠের ভিতর হ্যাজাকের আলো জ্বলছে। মাঠ, বিশাল বিলেন মাঠ, মাঠে আলো, বিশ্বাস-পাড়াতে হ্যাজাকের আলো, সরকারদের পুকুরপাড়ে হ্যাজাকের আলো এবং দু-একজন মানুষ এখনও প্রসাদ পাবার লোভে মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে। রঞ্জিত একা একা কিছুক্ষণ ঠাণ্ডার ভিতর পায়চারি করল। ওকে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। বোধহয় মনের ভিতরে আখড়ার কাজকর্মগুলি সম্পর্কে সে সমস্যাপীড়িত। সে সকলের অলক্ষে প্রায় গোপনে কাজটা চালাচ্ছে—সমিতির এই নির্দেশ। কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে ওর লাঠিখেলা ছোরাখেলার আখড়া সম্পর্কে সামসুদ্দিন এবং তার দলবল ভালভাবেই জেনে গেছে। ওরা অর্থাৎ এইসব হিন্দুরা নিজেদের সাহসী এবং শক্তিশালী ক'রে তুলছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত এইসব হচ্ছে। পরস্পর অবিশ্বাস ক্রমশ সংক্রামিত হচ্ছে। হিন্দুরা জনসংখ্যায় কম। ওরা কমবেশি সব মধ্যবিত্ত। এবং নিচু জাতি যারা, যেমন নমশূদ্র সম্প্রদায়ের ভিতর এই ছোরাখেলা লাঠিখেলার একটা হুজুগ এসে গেছে। এইসব কারণে পরস্পর নির্ভরতা ক্রমশ কমে আসছিল। ভিন্ন দুই জাতি ফলে ক্রমশ দুই দিকে ধাবিত হচ্ছে। বোধহয় দীর্ঘ এক চিঠিতে এইসব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল রঞ্জিত। এবং এই মৃত্যু, জালালির জলে ডুবে মরা প্রায় জীবন সংগ্রামের জন্য বলা যায়। শালুক তুলতে গিয়ে জালালি পদ্মলতায় আটকে মরে গেল। জালালি খেতে পেত না। জব্বর কোথায় কাজ নিয়ে কিছুদিন হল চলে গেছে। আবেদালি মাস শেষে যা কিছু সামান্য পায় সব দুর্দিনের জন্য জমা রাখার অভ্যাস। যখন জমিতে শস্য থাকে না, যখন গৃহস্থের বাড়িতে কাজ থাকে না, আর যখন জলের নিচে শালুক থাকে না তখন এই সঞ্চয়ের দ্বারা আবেদালি মিষ্টি আলু কিনে আনে এবং দুর্দিনের সময় এই খেয়ে প্রাণধারণ। বোধহয় রঞ্জিতকে মানুষে মানুষে এই প্রকট আর্থিক বৈষম্যও পীড়িত ক'রে তুলছে। সে সমিতিকে এইসব লিখেও জানাবে ভাবল। ঠিক তখন নরেন দাসের জমিতে সাদা কাপড়ে কে এক বিধবা যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জিত বুঝতে পারল মালতি এখন একা এবং নিঃসঙ্গ। মালতির এমন উৎসবের দিনে ঘুম আসছে না। সে অর্জুন গাছটার পাশে এসে নিজেকে অদৃশ্য ক'রে দিল। কিন্তু হায়, কে কাকে লুকায়, কে কাকে অদৃশ্য করে। মালতির চোখ বড় প্রখর এবং বুকের ভিতর সেই সুখের জ্বালা ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলছে। এমন দিনে কার না ইচ্ছা হয় সামনের দিগন্ত প্রসারিত মাঠে যখন জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎসংসার ডুবে ছিল, তখন কার না ইচ্ছা করে অগাধ সলিলে ডুবে যেতে।

আর কার না ইচ্ছা হয় এমন সুপুরুষ দেখলে ভালবাসতে। বড় বৌ প্রথমেই তুলসিপাতার জল ছিটিয়ে দিলেন পাগল ঠাকুরের শরীরে। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। ঘরের টেবিলের উপর হ্যারিকেনটা জলছে। পাগল মানুষ এখন প্রায় নগ্ন। বড় বৌ ভিজা কাপড়টা শরীর থেকে খুলে ফেললেন। শ্বেত পাথরের মত শক্ত অবয়ব, বুকের পেশি এত প্রবল যে মনে হয় একটা বড় হাতিকে তিনি অনায়াসে বুকের উপর তুলে নাচাতে পারেন। পেটে চর্বি নেই। পাতলা মাংসের উপর সাদা চামড়া – ঠিক যেন নদীরেখার মতো কোমল লোমশ বুকের পেশি থেকে একটা রেখা নাভি বরাবর নেমে নিচে এক আদিম অরণ্য সৃষ্টি করেছে। বড় বৌ সাদা তোয়ালে দিয়ে শরীরের সব বিন্দু বিন্দু জলকণা খুব যত্নের সঙ্গে শুষে নিলেন। পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ ঠিক একটা বড় কাঠের পুতুল ; কল লাগান কাঠের পুতুল। এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু অন্য মনস্ক হচ্ছে না। কেবল বড় বৌর সেই বড় বড় চোখ, ভালবাসার চোখ অপলক দেখছেন। হাত তুলে দিতে বললে, হাত তুলে দিচ্ছেন। বসতে বললে বসে পড়ছেন। উৎসবের দিন। বড় বৌ সব খাদ্যবস্তু ভিন্ন ভিন্ন থালাতে সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি কিছু খাবেন, কিছু খাবেন না, আবার হয়তো সবটাই খেয়ে ফেলতে পারেন। তারপর আরও খাবার জন্য বড় বৌর হাতটা কামড়ে ধরতে পারেন। সবই প্রায় অত্যাচারের সামিল এবং এই অত্যাচারটুকুর জন্য বড় বৌ সারা দিনমান অপেক্ষা করেন, দিনের শেষে তিনি ফিরে না এলে জানালা দিয়ে তিনি দূরের মাঠ দেখেন। সেই মাঠ দেখতে দেখতে কত রাত নিঃশেষ হয়ে যায়, তবু পাগল ঠাকুর ফিরে আসেন না। বড় বৌকে ভুলে, বাড়ি ঘরের কথা ভুলে, এক সোনার হরিণের লোভে মাঠে ঘাটে ঘুরে ক্লান্ত মানুষ কোন গাছের তলায় মাথার নিচে হাত রেখে আকাশের নক্ষত্র দেখেন – বিড় বিড় ক'রে কোনো কবিতার পঙক্তি উচ্চারণ। বড় বৌ প্রথমে বুঝতে পারত না, এখন সেই কবিতার চরণ প্রায় তাঁর ঠোঁটে থাকে। রোজ রোজ সেই পঙক্তি সব বড় বৌকে এক নীল চোখ এবং সোনালি চুলের কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর ঠাকুরের উদ্দেশে আবেগে বলার ইচ্ছা, আপনি কেন মানুষটাকে পাগল ক'রে দিলেন বাবা। আপনার ধর্মাধর্ম মানুষটার চেয়ে বড় কেন ভাবলেন ! চোখে জল এসে গেল বড় বৌর। কাপড় পরাবার সময় চোখের জলটা আচ্ছন্ন ক'রে দিল সবকিছু। মণীন্দ্রনাথকে বড় আপসা দেখাচ্ছে এখন। কুঁচি দেওয়া পাট ভাঙা কাপড় পরাবার সময় বড় বৌ কিছুক্ষণ বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে রাখলেন। কাঠের পুতুলটা এতটুকু নড়ছে না। যদি সেই সামান্য অত্যাচার আরম্ভ হয়, যদি তিনি ঘাড় গলা বড় বৌর কামড়ে ধরেন। কিন্তু আজ পাগল ঠাকুর এতটুকু উত্তেজিত হলেন না। তিনি সন্ন্যাসীর মতো ফলদানের জন্য যেন প্রতীক্ষা করছেন। হাতে দণ্ডি দিলে

তাই হতো। উৎসবের দিন বলে মটকার জামা গায়ে দেওয়া হল, কোঁকরান চুলে চিরুনি দেওয়া হল। ঠিক যেন বরের সাজে পাগল মানুষ এখন দাঁড়িয়ে আছেন। এমন দৃশ্য বড় বৌ দেখে আবেগে গলে পড়লেন—এমন সুপুরুষ হয়না গ বলতে বলতে তিনি প্রায় কেঁদে ফেললেন। তিনি হাত ধরে এনে আসনে বসিয়ে দিলেন। তারপর এক এক ক'রে উৎসবের ফুল ফল তিল। কদমা পায়েস এবং খিঁচুরি—কত রকমারি খাবার থালার পাশে। বাটিতে বাটিতে কত রকমের ঝাল ঝোল। বড় বৌ বসে থাকলেন পাশে। বড় বৌ মাঝে মাঝে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু আজ পাগল মানুষ মনীন্দ্রনাথের খাবার কোনো স্পৃহা দেখা গেল না। তিনি সব নেড়ে চেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর নরম বিছানাতে সুন্দর এক রাজপুত্র যেমন শুয়ে থাকে, রূপোর কাঠি সোনার কাঠি যেমন মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে, ঠিক তেমনি শুয়ে থাকলেন মণীন্দ্রনাথ। এতটুকু পাট ভাঙে নি কাপড়ের। গোড়ালি পর্যন্ত টানা কাপড়, কোঁচা সোজা পায়ের কাছে নেমে এসেছে। দু-হাত বুকের উপর, তিনি বুকের উপর হাত রেখে ঘরের কড়িকাঠ যেন গুনছেন। স্থির অপলক দৃষ্টি। পাশে বড় বৌ। বসে আছেন তো আছেনই। চোখে ঘুম আসছে না। বার বার দুগালে চুমু খাচ্ছেন। মানুষটা নির্বিকার। বোতাম খুলে লোমশ বুকে হাত রাখলেন। কোনো উত্তেজনা নেই দেখে লেপ গায়ে দিয়ে কাঠের পুতুল বুকে নিয়ে শুয়ে থাকলেন সারারাত। কাঠের পুতুলটা ঘুমায় না, কিন্তু কি যে কালঘুম বড় বৌর—কখন ঘুমে দু-চোখ জড়িয়ে আসে, কখন মণীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সব ফেলে খোলশ ছেড়ে হাঁটু কাপড়ে বের হয়ে যান, বড় বৌ টের পায় না। কালঘুম বড় বৌর সবকিছু হরণ ক'রে নিয়েছে।

তাবুদের ভিতর ততক্ষণে জালালিকে রাখা হয়ে গেছে। মালতি অর্জুন গাছটার উদ্দেশ্যে পা টিপে টিপে হাঁটছে। আর তখন ফেলু পাড়ে দাঁড়িয়ে জালালির কবর ঠিক মতো খোঁড়া হল কিনা দেখছে।

বিলে তখন গজার মাছটা আপন আস্তানায় ফিরে এসেছে এবং সন্তর্পণে পদ্ম-লতার ভিতর আজব জীবটাকে দেখতে না পেয়ে বিস্ময়ে লেজ নাড়ছে। কে চুরি ক'রে নিয়ে গেল। কোথায় কোন জলে এখন আজব জীবটা ভেসে বেড়াচ্ছে। অনুসন্ধানের জন্য গজার মাছটা জলের উপর পাখনা ভাসিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল।

তাবুদের ভিতর জালালির মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। নতুন কাপড়ের কাফন দিয়েছে হাজি সাহেব। হাজি সাহেবের তিন বিবি উষ্ণ জলে গোসল করিয়েছে। সব কাজকর্ম ওরাই দেখে শুনে করছে। চুলে বেণি বেঁধে দিয়েছে, আতর দিয়েছে, চন্দনের গন্ধ দিয়েছে—এখন আর কে বলবে জালালি সারাটা জীবন হা অন্ন ক'রে গেছে, কে বলবে সামান্য গয়না নৌকার মাঝি আবেদালির বিবি জালালি!

তাবুদে জালালি মসজিদে ইমাম। আল্লার কাছে জালালির জন্য দোয়া চাইছে সবে। তিন সারিতে গ্রামের প্রায় সব পুরুষগণ মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে কান স্পর্শ করে—হে আল্লা এমন বিরাট বিশ্বময় তোমার অপার মহিমা—আমরা সামান্য মানুষ, আমাদের আর কি করণীয় আছে, বিশ্বময় সৌরজগতের অপার লীলা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ, হে আল্লা এই যে ঘাস মাঠ ফসল এবং পাখিদের সব কলরব শুনছি, তোমার করুণার কথা কে না জানে—তুমি সকলকে আশ্রয় দাও, তুমি আমাদের এই দুঃখী জালালিকে তোমার অপার মহিমার আশ্রয়ে তুলে নাও—ওরা বোধহয় ওদের দোয়া ভিক্ষার ভিতর এমন কিছুই বলতে চাইছিল। জ্যোৎস্না রাত, ঢাক ঢোল বাজছে, ইতস্তত হ্যাজাকের আলো মাঠে ঘাটে এবং তাবুদের ভিতর জালালি মুখ ফিরে শুয়ে আছে। সামসুদ্দিন ইমামের কাজ করছিল। মসজিদের পাশে আতাফলের একটা গাছ, গাছে রাজ্যের সব পাখির নিবাস, অসময়ে এত লোক দেখে ওরা সকলেই জেগে গেল, কলরব করতে থাকল, গাছটাতে উড়তে থাকল এবং কিছু আতাফলের পাতা প্রায় ফুলের মতো তাবুদের উপর ঝড়ে পড়তে থাকল।

সামসুদ্দিনের কিন্তু কিছুই মনে আসছে না। সে প্রায় কলের মতো নামাজে উঠছে বসছে। সামসুদ্দিনের সেই মহারাত্রির কথা মনে আসছিল শুধু। বৃষ্টি। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। মালতি ওর পুরুষ হাঁসটা ধানক্ষেতে খুঁজছে। সে ওর হাঁসটা পাচ্ছিল না বলে ধানক্ষেতে বসে কাঁদছিল। বর্ষাকাল, নৌকায় ফেরার মুখে ধানক্ষেতে লণ্ঠন জলতে দেখেই কাছে গেল। দেখল, মালতি নৌকায় বসে কাঁদছে। ওর পুরুষ হাঁসটা হারিয়ে গেছে। অমূল্য নৌকা বাইছিল আর তৈ তৈ—আয় তৈ তৈ করছিল। সামুর মনে হল জালালির কথা। সে গ্রাম থেকে বের হবার মুখে জালালিকে দেখেছে জলের নিচে কি ধরে রেখেছে, সন্দেহটা ক্রমশ বাড়ছিল। জালালি তবে চুরি ক'রে হাঁসের গলা টিপে ধরেছে জলে। সে কিছু বলল না মালতিকে, শুধু ফিরে যেতে বলে জালালির উদ্দেশে নৌকা বাইতে বলল মাঝিকে। তারপর সেই ঝড়ের রাত, ভাঙা বেড়ার ফাঁকে এক উলঙ্গ মেয়েমানুষের ক্ষুধার রাজ্য আবিষ্কার ক'রে সে কেমন লজ্জিত হয়ে পড়ল। এবং ক্ষুধার পর জালালি যখন হাঁসের পোড়া হাড় কড়মড় করে চিবুচ্ছিল আর চোখে সেই লালসা, জীবন যাপনের লালসা—সামু এই মসজিদের পরম ইমামদার হয়েও ভুলতে পারল না। সামুকে কেবল এখন সেই লালসার মুখটাই উল্লাসে বিদ্রূপ করছে। সে দু-হাত মুখের কাছে এনে নামাজ পড়ছিল, সেই সুখ মনে হতেই সকলের অলক্ষে প্রায় নিজের মুখটা ঢেকে দিল। এই দুঃখী এবং দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য ভিতর থেকে ওর কান্না উঠে আসছিল।

তারপর সকলে মিলে লাই লেহে ইল্লেলা মহম্মদের রসুলল্লা—তাবুদ কাঁধে নিয়ে মানুষগুলি মাঠে যাবার সময় আল্লা এক, মহম্মদ তার রসুল এইসব বলছে।

ওরা সার বেঁধে যাচ্ছিল এবং এইসব বলছিল। তখনও সরকারদের পুকুরপাড়ে ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। তখনও মাঠময় জ্যোৎস্না। ওরা লণ্ঠন হাতে, কেউ কুপি হাতে, বোরখা পরে বিবিরা মাঠে এসে নেমেছে। ওরা কবরটার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। হাজি সাহেব অসুস্থ, তিনি আসতে পারেন নি। অন্যান্য প্রায় গ্রামের সকলে এখন কবরটার চার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তাবুদ থেকে জালালিকে বের করা হল। আব্দু, হাজি সাহেবের তিন বিবি, জালালিকে তুলে নিল তাবুদ থেকে। একপাশে সামু এবং জব্বর অন্য পাশে। ওরা চারজন নিচে নেমে গেল। ফেলু সেই দুপুরে কচ্ছপের মতো গলা বাড়িয়েছিল যার জন্য, যে বিবির সনে তার এত পিরিত, সেই বিবি বোরখার ভিতর থেকে ফেলুকে দেখছে। ফেলুর বুকে ধুক ধুক শব্দটা হচ্ছে। সে ডান হাত দিয়ে কাটা বাঁশগুলো আব্দু কবর থেকে উঠে এলেই সাজিয়ে দেবে। তিন বিবি হাজি সাহেবের চাদর ধরলেন কবরের উপর। সামু নিচে নেমে গেল। জব্বর নিচে নেমে গেল। উত্তর দিকে মাথা এবং দক্ষিণে গা রেখে জালালিকে শুইয়ে দেওয়া হল। ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল—মক্কা মদিনা দেখুক জালালি—এই ক'রে ওরা উপরে উঠে এলে ফেলু এক হাতে বাঁশগুলো কবরের হাত খানেক উপরে বিছিয়ে দিল—কিছু খড় বিছিয়ে উপরে দুই ইস্তাহার বিছিয়ে দিল—তাতে কি লেখা? লেখা আছে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান, লেখা আছে—নারানে তকদির। যেন কবরে সাক্ষ্য হিসাবে ওরা ওদের শপথপত্র রেখে দিল। এই শপথপত্র কবরে মাটি ঝুড় ঝুড় ক'রে পড়ে না যাবার জন্য এবং গরীব মুসলমানদের বেঁচে থাকবার উত্তরাধিকারের দৌলতকে কেউ যেন অস্বীকার করতে না পারে। অথবা যেন সামুর বলার ইচ্ছা—চাষী আমরা, এই ফসল এবং মাঠ তার উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যাব, আমরা এইসব সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। ধর্ম আমাদের সকলের উপরে—রসুল আমাদের মহম্মদ, আল্লা এক, তাঁর কোন শরিক নেই।

ফেলু নুয়ে ইস্তাহার দুটো ভাল ক'রে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ওর, হায় আমার হাত ভাঙা, আমি কি করব, কোথায় যাব, না হলে এত বেশি সে ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল যে সে যেন ইচ্ছা করলে এখুনি দশটা মাথা এনে সামুর পায়ের কাছে ফেলে দিতে পারে এবং বলতে পারে—এই লাও দিলাম তোমারে মিঞা। স্যাশটারে ইবার ভাগ কৈরা ফ্যাল।

সকলেই একটু একটু মাটি কবরে দিল। তারপর সব মাটি কবরের উপর তুলে দেওয়া হল। চেপে চেপে মাটি দিল, মাটির উপরে গোসলের জল ঢেলে দিল জব্বর। তিনটা জীয়ন গাছ পুঁতে ওরা আর পেছনের দিকে তাকাল না। ওরা গ্রামের দিকে উঠে যেতে থাকল। ঠিক আড়াই পা গিয়েছে, তক্ষুনি এক অলৌকিক আলো ভিতরে ঢুকে গেল। ফতিমা বাপের পাশে পাশে হাঁটছিল। সেও সেই কিংবদন্তির গল্পের মতো শুনছে—বেহেস্তের এক সিঁড়ি পড়ে গেল আলোয়।

কবরের ভিতর অলৌকিক আলোর প্রভায় জালালি জেগে উঠেছে।

দুই ফেরাস্তা প্রশ্ন করল, তুমি কে?

জালালি বলল, আমি জামিলা খাতুন।

—তোমার ধর্ম কি?

—ধর্ম ইসলাম।

—আল্লা কে?

—আল্লা এক, তার কোন শরিক নেই।

—রসুলের নাম?

—হজরত মহম্মদ।

—এ ছবি চেন? বলেই দুই ফেরাস্তা আলো ফেলল মুখে।—কে তিনি?

—হজরত মহম্মদ।

জালালিকে দুই ফেরাস্তা কোলে তুলে নিলেন। অলৌকিক আলোয় যেন জালালির শরীর লীন হয়ে গেল। ঠিক সেই যেন এক কিংবদন্তির সূর্য—ঘায় ঘায়, বিলের জলে ডুবে যায়। রাজকন্যা ঘায় ঘায়—বিলের জলে ডুবে যায়। বিল থেকে নদীতে, নদী থেকে সাগরে, তারপর মহাসাগরে—শেষে এক সময় রাজকন্যা টুপ ক'রে জলে ভেসে উঠে দুই ডানা মেলে দেয় আকাশে, পুবের আকাশে সূর্য লটকে দিয়ে আবার সাগরের জলে ডুবে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন সোনা মায়ের পাশে শুয়ে একটা ঘোড়ার স্বপ্ন দেখল। একটা ঘোড়ার দুটো মুখ। ঘোড়াটা অন্ধ। সারকাসের তাঁবু থেকে ঘোড়াটাকে একটা ক্লাউন টেনে বের ক'রে এনেছে, তারপর ফাঁকা মাঠে ছেড়ে দিল। ঘোড়াটা একবার পুবে আবার পশ্চিমে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে এক হতভাগ্য মানুষ—সে একবার পুবে আবার পশ্চিমে ডিগবাজি খাচ্ছে। প্রায় সারকাসের খেলার মতো। দর্শক মাত্র দুজন। সোনা এবং ফতিমা। সোনা এবং ফতিমা এমন মজার খেলা দেখে হাততালি দিতে থাকল। পিছনে পাগল জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি ওদের মাঠে সারকাসের খেলা দেখাতে এনেছেন।

জ্যোৎস্না মরে আসছে, ভোর হতে আর দেরি নেই—গ্রামের সকলে জালালিকে কবর দিয়ে উঠে যাচ্ছে। বাগের পথে ফেলু দাঁড়াল। সারা মাঠময় কুয়াশার জন্য দৃষ্টি এগুচ্ছে না। ক্রমশ কুয়াশা এত ঘন হয়ে জমছিল যে ফেলু প্রায় নিজেকেই দেখতে পাচ্ছিল না। ভোর রাতের ঠাণ্ডা, হাত-পা সব বরফ হয়ে যাচ্ছে। আবু সকলের আগে উঠে গেছে, ঘুমের বাতিক বড় বেশি বিবির। মনজুর উঠে গেল, হাজি সাহেবের বড় বিবি উঠে গেল, জব্বরকে সামু ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সামসুদ্দিনের বিবি গেল এবার। বোরখা দেখে চেনা যাচ্ছিল সব, শুধু সেই বোরখাটার চোখে সাদা গুটি সুতার কাজ করা, জ্যোৎস্নায় সহসা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে প্রায় ভূত বলে বিভ্রম হতে পারে। সেই বোরখার নিচে যুবতী মাইজলা

বিবি – তোর মনে পীরিত আমার ওলো সই ললিতে, ফেলু মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠছিল। ওর বুক ধুক্ ধুক্ করছে। কাজটা খুব নিমেষে ক'রে ফেলতে হবে। যেন অন্য মানুষ টের না পায়। কুয়াশা এত ঘন যে এক হাত সামনের মানুষটাকে স্পষ্ট দেখা যায় না। অস্পষ্ট কুয়াশার ভিতরই সেই লোকটাকে না চিনতে পারলে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যাবে! সে শীতে হি হি ক'রে কাঁপছিল। মাত্র একটা হাত সম্বল, সে হাতটা চাদর থেকে বের ক'রে রেখেছে। এবং যে পর্দার উপরে মাইজলা বিবি ভেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ ক'রে টেনে নিল ফেলু। ওর ভিতরে প্রায় যেন অযুত হস্তির বল, সে মুখে ডান হাতটা চেপে ঠেলতে ঠেলতে ঝোপের ভিতরে ফেলে বলল, রা করবি না বিবি। আমি ফেলু।

সকলের শেষে ঈশমও গ্রামে উঠে যাচ্ছে। উঠে যাবার পথে মনে হল ঝোপের ভিতর এক প্রলয়ংকর কাণ্ড। প্রায় সাপে সাপে খেলা হচ্ছে যেন। ঝোপের ভিতরে কারা ধস্তাধস্তি করছে। বোধহয় কোনো গোসাপের ঝগড়া। প্রায় কুমিরের মতো বড় এক একটা গো-সাপ বিলে খালে ভেসে থাকে। শীতের সময় ঝোপের ভিতর উঠে এসেছে। ঈশম দ্রুত গ্রামের ভিতর ঢুকে গেল।

ভোরের স্বপ্ন, যেমন তাজা তেমনি মিষ্টি। আর বোধহয় প্রথম স্বপ্ন দেখতে শিখল সোনা। স্বপ্ন দেখার পরই ঘুম ভেঙে গেল, সে শুনতে পেল বড়ঘরে ঠাকুর্দা ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করছেন। বড় জেঠিমা ছোট কাকা এই শীতের ভোরে ঠাকুর্দাকে উঠোনের উপর এনে দাঁড় করিয়েছেন।

বৃদ্ধ দীর্ঘদিন পর বায়না ধরেছেন – তিনি আজ সূর্যোদয় দেখবেন। তাঁর শতবর্ষ পূর্ণ হবে আজ। তিনি সেই কবে অন্ধ হয়ে গেছেন – দীর্ঘদিন ঘরের বার হন নি তিনি ঘরে বসেই প্রতিদিন ভোর রাতের দিকে ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ করেন, গুণগান করেন – হে ঈশ্বর তোমার করুণা ফুলে ফলে, ফসলের মাঠে, তুমি করুণাময়।

বৃদ্ধের কথা না রাখলে বড় অনর্থ ঘটবে। সুতরাং ওরা বৃদ্ধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক কামরাঙা গাছটার নিচে দাঁড়ালে পুবের আকাশ স্পষ্ট। সূর্য উঠবে। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। মসজিদে আজান দিচ্ছে সামসুদ্দিন। মোরগেরা ডাকছে। বড় বৌ পুজার ফুল তুলতে চলে গেছেন। বৃদ্ধ মানুষটি সূর্যোদয় দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কতকাল, যেন কত দীর্ঘকাল তিনি সূর্যোদয় দেখেন নি, কতকাল যেন তিনি এমন পাখির কলরব শুনতে পান নি। কামরাঙা গাছটার নিচে তিনি তিন নাতি সোনা, লাল্টু, পল্টুকে নিয়ে এবং ছোট ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সূর্য উঠলেই বলতে হবে, সূর্যোদয় হচ্ছে। তিনি এই যে সূর্য, আলোর দেবতা, ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর জনে জনে ফুলে ফলে বিরাজমান – সর্বত্র তিনি, তিনি এক এবং বহু, তিনি সীমা সংখ্যার অতীত, মহাবিশ্বের তিনিই সব – তাঁর সেই আলোর দূতকে এখন স্বাগত জানাবেন।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার সূর্যোদয়ের কথা তাঁকে আর বলতে হল না। তিনি নিজেই যেন টের পাচ্ছেন সূর্য আকাশে উঠে আসছে। কুয়াশার জল কামরাঙা গাছ থেকে টুপ টাপ ঝরছিল। নীল লাল পাখির পালক উড়ছিল। কম্বল গায়ে খড়ম পায়ে বৃদ্ধ মানুষটি সূর্য উঠতেই দুহাত তুলে প্রণাম করলেন। মহাবিশ্বের আমরা সামান্য মানুষ, তুমি মানুষের সব জরাজীর্ণ জীবনকে আলোকিত কর। রোগ শোক সব হরণ ক'রে নাও।

সূর্যোদয়ে এত রহস্য রয়েছে সোনার জানা ছিল না। সেও ঠাকুর্দার দেখাদেখি সূর্যকে প্রণাম করল এবং ঠাকুর্দার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যস্তব পাঠ করল।

সহসা মনে হল সোনার পাশে কে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ। তিনি সেই মাঠের বুকে সূর্যোদয় দেখছিলেন। সোনার স্বপ্নের কথা মনে হল। আকাশে রাজকন্যা কিংবদন্তির সূর্য লটকে দিয়ে সাগরে ডুবে গেল। সে পাগল জ্যাঠামশাইকে স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে ঘোড়াটার কথা বলল। একটা ঘোড়ার দুটো মুখ। নীল রঙের ঘোড়াটাকে পাগল মানুষ মণীন্দ্রনাথ এখন মাঠের ভিতর ছুটতে দেখলেন। বিকেলের সূর্যটা ভেগে উঠল, জালালি সূর্য নিয়ে বিলের জলে ডুবে গেল। সারারাত মনে হয়েছে জালালি সূর্য বগলে নিয়ে জলের নিচে সাঁতার কেটেছে। বিল থেকে নদীতে, নদী থেকে সাগরে, তারপর মহাসাগরে, মনে হল জালালি সেই রাজকন্যার মতো সূর্য আকাশে লটকে দিয়ে আবার সাগরের জলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। জালালি এখন কিংবদন্তির মতো। এইসব মনে হতেই পাগল মানুষ যেন বলতে চাইলেন—ঘোড়াটা ইচ্ছা করলে তিনটা মুখ বানাতে পারে। ঘোড়াটা ধর্মের ঘোড়া। মানুষ পিঠে ঘোড়াটা কেবল ছুটছে। একবার পুবে আবার পশ্চিমে। সারকাসের খেলার মতো। এবার বৃদ্ধের দিকে তিনি সোজা তাকালেন এবং বৃদ্ধকে দেখেই প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো—তিনি সোনা এবং অন্যান্য সকলকে পিছনে ফেলে ছুটছেন মাঠের দিকে। মনে হল তিনি নীল রঙের ঘোড়াটাকে ধরতে যাচ্ছেন। তারপর তিনি যেন ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটার লাগাম ধরে ফেললেন, ঘোড়াটার পেটে দুই লাথি মারলেন। ঘোড়াটা কেমন চোখের উপর ভোজভাজির মতো সারকাসের ক্লাউন হয়ে গেল এবং আদাব দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে মাঠের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন আবার ফাঁকা মাঠ, কোনো ঘোড়া নেই। সূর্য ক্রমশ উপরে উঠে যাচ্ছে। পাগল জ্যাঠামশাই মাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছেন। আর কিছু ছিল না। কেবল ছোট বিবি আতা বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেন দেখল জালালির কবরের উপর গত কালের হালাল করা মোরগটা একপায়ের উপর দাঁড়িয়ে কক্ কর অ ক ডাকছে।

অসীম রায় -অনূদিত

আঁদ্রেই ভজ্‌নেসেন্‌স্কি-র কবিতা

ভজ্‌নেসেন্‌স্কি কিংবা ইয়েভতুশেংকোকে নিয়ে পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে-উৎসাহ তা সে-দেশগুলির চারিত্রিক রুশবিদ্বেষপ্রসূত নয় একথা মনে করবার কারণ উভয় কবিরই কবিত্বশক্তি ও দেশপ্রেম। এঁরা খোলা চোখে দুই শিবিরে দুই পা দিয়ে দাঁড়াতে পারেন বণিকের জগতে অর্থের সীমাহীন আধিপত্য ও সমাজতান্ত্রিক আওতায় যান্ত্রিক প্রয়োগবাদ ভ্রূক্ষেপ না ক'রে। স্থূলতার বিরুদ্ধে, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রকম মনুষ্যত্বহীনতার বিরুদ্ধে লেখক, শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের যে-সংগ্রাম তা লণ্ডন নিউইয়র্কে, মস্কো পিকিং-এ, দিল্লি কলকাতায়। যাঁরা কবিতায় নৈর্ব্যক্তিক সুর খোঁজেন তাঁদের কাছে মায়াকভ্‌স্কির 'আমি'-র মতো ভজ্‌নেসেন্‌স্কির নবোন্মেষিত 'আমি' কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক। কিন্তু যাঁচোয়া এ 'আমি' যে চৈতন্যের কলরব তারই প্রতিমূর্তি। এ-কবিতাগুলির অনুবাদ হার্বার্ট মার্শালের ইংরেজি থেকে। অনুবাদক।

প্যারাবোলা

ভবিতব্য রকেট সদৃশ, শূন্যে ছোটে প্যারাবোলা-গতি,
প্রায় তমিস্রায় ধায়, কদাচিৎ রামধনু সাথী।

একদা ছিলেন এক জীবন্ত জলন্ত শিল্পী গর্গা
বোহেমিয়, কালের গতিতে ক্রমে শেয়ার দালাল,
রাজকীয় লুভ্‌র্‌ লক্ষ ছেড়ে তাই মর্মান্তর
ঘুরপাক খেয়ে এলেন জাভা ও সুমাত্রা!
ঊর্ধ্বাকাশে উড়লেন, ভুললেন অর্থের প্রলাপ,
হাঁসের গলার মতো স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ,
গুমোটে গরম একাডেমি,
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, আসক্তি সব ছেড়ে ছেড়ে···

হাতে বিয়ারের মগ, ওস্তাদেরা বলে মাথা নেড়ে—
'সরল রেখাই খাটো, প্যারাবোলা বক্র, এ তো বহুদিন জানা,
আকাশের তাঁবু দেখে কিছুমাত্র চৈতন্য হল না'?

কিন্তু তিনি ছুটলেন, হাওয়া কেটে ছুটেছে রকেট
ঝোলাকোট ফুঁড়ে ফুঁড়ে কান কামড়ে ঊর্ধ্বে দৌড়লেন,
অবশেষে লুভ্‌র্‌ কিন্তু সামনের সিংহদ্বার দিয়ে মোটে নয়—
ক্রুদ্ধ এক প্যারাবোলা ছপ্পর ফুঁড়েই ঢুকলেন।

হিম্মত যার তার ভিন্ন ভিন্ন পথে সত্যে চলা,
কীট খোঁজে গর্ত কিন্তু মানুষের পক্ষে প্যারাবোলা॥

২

কোনো বসতি স্থাপন কেন্দ্রে

তারা ধম্‌কায়—আমি নাকি আঙ্গিক-পিয়াসী,
হায় রাজা! তোমরা যে বাস্তব থেকে কতদূরে থাকো!
নাক পোড়া বীজাণুনাশক পাউডার
ধূপধুনো খেয়ে পেট ভর্তি ক'রে রাখো।

হয়তো বা তোমাদের মধ্যে আছে উর্বরা মাটির উঁকিঝুঁকি,
কিন্তু সঞ্জীবনী বীজ কিছুমাত্র নেই।

শিল্প তো মুমূর্ষু, যদি না ওঠে জলজলে,
খুব একটা ঐশ্বরিক কিছু নয় মানবত্তাবান,
যেমন দুর্গম এক আঁধার কান্তার
তন্ময় হৃদয়ে শোনে বুল্‌ডোজার ড্রাইভারের গান।

সত্যিই জানকবুল কাম ছিল তাদের
কিন্তু এম্‌নি দাঁড়ানো যেমন এখন রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে—
দাড়ি না-কামানো শূর্ষ, গুল্মগাঢ় পাইনের সারি—
বেরিয়েছে তারা সব খোলস ছাড়িয়ে।

মুছে ফেলে নীল অশ্রুকণা
গোলগাল চুডাস কুমারী,
শুচি কিন্তু নোংরা সে মুখে
অশ্রুকণা উড়ন্ত জোনাকি ;
আকাশে আকাশে তার বাজে হাততালি।

তারই জন্যে অসহ্য লাগলেও
সহ্য করব সব গালাগালি,
এমনকি গরু-পেটানোও॥

চুডাস – তোল্‌গার ধারে চুডাস রিপাবলিক

৩

আমি ? আমি গোইয়া !

আমি ? আমি গোইয়া !
পোড়ামাঠে উপ্‌ড়ানো আমার চোখের গর্ত।
আমি ? আমি বিষাদ।

আমি ? আমি যুদ্ধের গর্জন
শহরের ভস্মশেষ একচল্লিশের সাদা মাঠে।
আমি ? আমি ক্ষুধা।

আমি ? আমি তার কণ্ঠনালী
গলাটেপা যে মেয়েটা ঘণ্টার মতন দুলেছিল
জনশূন্য পার্কের মাথায়।
আমি ? আমি গোইয়া !

হায় এই ক্রোধের আঙুর,
গরলে অমৃত !
কামানের গোলায় গোলায় দূর পশ্চিমের দিকে ধাবমান
অনাহূত আগন্তুক, তারও ভস্মশেষ,
জোরাল নক্ষত্রে আমি ক্রুশবিদ্ধ শোকার্ত আকাশে
পেরেকের মতো।
আমি ? আমি গোইয়া !

৪

প্যারিসে মায়াকভ্‌স্কি

লিলি ব্রিক ফুটপাতে শুয়ে চিৎপাত
মোটর গাড়ির নিচে চিড়ে চ্যাপ্টা,

খুচরো পয়সা যেন দুচোখের মণি ঝল্‌কায়
গোড়ালিতে গোড়ালিতে যত ঝাপ্টা।

ছুঁড়ে দেয় ভিক্ষে পথিক
দগ্‌দগে ক্ষতস্থান মায়াকভ্‌স্কি
তরুণ করুণ মুখে চেয়ে থাকে ঠিক
ব্রিজে আঁটা আঁকা তাস, দেহরক্ষী।

কি রকম আছো আজকাল
তুমি ও প্রেমাস্পদা প্রেমে উদ্ভাসিত ?
ভবিতব্যের সঙ্গে খেলবে খেলা কেউ
হিরোশিমা হয়ে থাকবে ফুটপাতে চিত্রিত।

বুকের উপর দিয়ে লোকজন ছোটে হুড়দাড়,
মেরুদণ্ডের নিচে বহে সেন্‌,
বাদামি পোকার মতো বাসগুলো গুঁড়ি মেরে হাঁটে,
থম্‌কায় চম্‌কায় রাতদিন।

কি বিহ্বল তোমার হৃদয়,
ব্রিজটাও স্পন্দিত মন্ত্রিত,
এস্‌ফাল্ট-মসৃণ প্যারিস্‌
রাত্রি যেন লাইলাকে বিধৃত !

বাউণ্ডুলে ! বোতামে গাজর-আঁটা ফিউচারিস্ট,
ব্রিজরুদ্ধ প্রতিভা অনন্ত,
যদিও জগদীশ্বর নির্দ্বন্দ্বে
তোমার প্রদর্শনী ছিল জনহীন,
মায়াকভ্‌স্কি, কি জঘন্য !

আমরা ঠিক আসতাম, ভোলোডিয়া,
আমরা বলতাম, পড়ো পড়ো,
মর্মান্তিক তোমায় হারানো !

ভাদ্র - আশ্বিন ১৩৭৫

শবরী বাঁধে ওষ্ঠ দুটি
ধাতব সংঘাত হয় হেতু,
বাঁশি কি বাজে না মেরুদণ্ডে,
তুমি কি এলুমিনিয়ামের সেতু ?

মায়াকভ্স্কি, তুমি এক ব্রিজ
কালের উপর দিয়ে, মস্ত পালোয়ান,
রস্টার প্রান্ত ঠেকে পায়ে
হাত দেয় আমাদের টান।

এখানে যেমন ব্রিজ ওখানে তেমন ডাকে হোয়ার,
মায়াকভ্স্কির নিচে গাড়ি শার সার,
মায়াকভ্স্কি যাবে ? চল যাই হেঁটে,
মায়াকভ্স্কি না মস্কো ? একাকার।

বস্ত্রে বস্ত্রে দাহ করে যত বর্বরতা
মায়াকভ্স্কীয় শুদ্ধতা।
লক্ষ লক্ষ স্টেডিয়াম হাকে —
কি রকম বেঁচেবর্তে থাকা
কমরেড ব্রিজ, নববেশ বিভূষিত,
ব্রিজ, প্যারিস, উড়ন্ত তারকা ?

সূর্যাস্তের নম্র উকিঝুঁকি,
জেট প্লেন শূন্য ছিঁড়ে ফেলে,
পিছনেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী —
চলন্ত ক্ষুরের দাগ গালে।

প্যারিসে বেড়ানোর সময় সেন্ নদীর এক ব্রিজে ফুটপাতে মায়াকভ্স্কি ও তাঁর প্রেয়সী লিলি ব্রিকের ফটোগ্রাফ আঁকা একটি ছবি নজরে আসে কবির। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ও পরবর্তীকালে পরিমার্জিত মায়াকভ্স্কির প্রেমের কবিতার গ্রন্থে সংলগ্ন ছিল এ ছবি।

১৯১৪ সালে ফিউচারিষ্ট মায়াকভ্স্কি কোটের বোতামে গাজর এঁটে বেড়াতেন। ১৯২০ সালে 'মায়াকভ্স্কির কুড়ি বছরের কাজ' প্রদর্শনীতে কেউ বিশেষ আসেন নি।

রস্টা – তাস্ সংবাদ এজেন্সি-র আদি সংস্থা, এখানে কাজ করতেন মায়াকভ্স্কি।

অশোক মিত্র

একটি পত্রিকার কথা

সমর সেন যখন বিখ্যাত, আমি তখনো স্কুলের ছাত্র। বাংলাদেশের মফস্বল, রাস্তায় ধুলো-কাদা কিন্তু সেই সঙ্গে আকাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝলক, কিন্তু রাজনীতির আলোড়ন – কিছু সাহিত্যকবিতা-গানের মর্মর, শান্তশ্রীমণ্ডিত ছোটো একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঘোড়াগাড়ি-সাইকেলরিক্সা-মুখর মফস্বল। কলকাতা, উজ্জ্বল কলকাতা, 'কবিতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকা যেখান থেকে বেরোয় সেই মায়াবী কলকাতা, সেই কলকাতার একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, মফস্বলের হাবা ছেলে আমরা, তাই দিয়ে মনে-মনে ফাল্গুনী-বৈশাখী-শ্রাবণী সবকিছু রচনা করি। রাজনীতি নিয়ে তর্ক, কবিতা নিয়ে জটলা। রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে পরস্পরকে আবৃত্তি ক'রে শোনাই : 'রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, পার হয়ে এলাম মন্বর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর'। অথবা কালীঘাট ব্রিজের উপর লম্পটের পদধ্বনি নিয়ে উচ্ছলিত হই, গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরি যাওয়ার প্রসঙ্গে কৌতুক খুঁজি। স্কুল থেকে আমাদের কলেজে উন্নতি হল – মফস্বলেরই কলেজ – সমর সেন দিল্লিতে, হয়তো সে-রাজধানী থেকেই পাঠানো কিছু ক্লান্ত – কিছু গম্ভীর – কিছু প্রত্যয় – কিছু হয়তো বা বিদ্রূপ-মেশানো সব পঙ্‌ক্তি : জোসেফ

স্টালিন কোথায় ট্রাক্টরের দিন আনলেন, ভুলে-ভ্রান্তিতে-উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ আমাদের চেতনায় পড়ল, দেশে স্বাধীনতা আনবেন ভদ্রলোক নন্দদুলাল সুতরাং কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধরো, যে সরায় ময়লা-দুধ দেয় যে গয়লা তাদের দোস্তি ছাড়া কোনো গতি নেই, আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না যে-সব লবেজান সামুরাই – নানা প্রসঙ্গ অধ্যুষিত ঐতিহাসিক সব পঙ্‌ক্তি। এরই মধ্যে, হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিকিমিকি-ছড়ানো আশ্চর্য পদসংযোজন 'ভড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা এখনো তোমাকে ডাকে রঙিন গলিতে'।

সমর সেন কবিতা লেখা বন্ধ করলেন, আমার মফস্বলশৈশব কাটলো। তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা, মিছিল-বোমা-ধর্মঘট, রোজেনবর্গদের ফাঁসি, পিকাসোর পায়ি-আঁকা বিশ্বশান্তি আন্দোলন, নেতাদের কেমন বুড়িয়ে যাওয়া, পুরনো বক্তৃতার চর্বিতচর্বণ। বাংলাদেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম আমি। সমর সেন আর কবিতা লেখেন না, কোথায় যেন গুজব শুনলাম বুদ্ধদেব বসু-কে বলেছেন, 'কবিতা এবং 'কাঠবন্ধতা দুটো থেকেই মুক্ত হয়েছি,' আমাদের সুতরাং পুরনো পঙ্‌ক্তি-গুলিকেই সখেদে চেখে বেড়ানো। বছরের পর বছর আরো গড়ালো, দেশে – এমনকি বাংলাদেশেও – কমিউনিস্ট পার্টি ভদ্দরলোক হল, যারা গণনাট্যসংঘে গান গাইতেন, নাটক করতেন, তাঁরা আস্তে-ধীরে সচ্ছলতার মুখ দেখলেন, সমর সেন ফের গুজবেই জানলাম দিল্লির রেডিয়ো ছেড়ে কলকাতায় খবরকাগজে – খবরকাগজ ছেড়ে মস্কোতে বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনাগারে। আমি বিদেশে, শচীন চৌধুরীর ইকনমিক উইকলি-তে মাঝে-মাঝে সমর সেনের মস্কো থেকে লেখা চিঠি। সমর সেনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই জেনে শচীনদার কৌতুকমেশানো বিস্ময়। চকিত হয়ে লক্ষ করতাম, এমনকি সমর সেনের ইংরিজি গদ্যেও সেই শাণিত নাস্তিকতার-আভাস-আসা সুর।

আলাপ হল পনেরো বছর বাদে ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশে ফিরে, কলকাতায় চাকরি করতে এসে। চীনেদের সঙ্গে সরকারি হামলা, কমিউনিস্ট পার্টির বড়ো শরিক ফের কারাগৃহে কিংবা আত্মগোপন ক'রে, চটকদার দেশপ্রেমের অশ্লীলতায় ক্লেদাক্ত হাওয়া, সবাই যেন প্রহর গুণছিল এর পর কী হয়। কার সঙ্গে দেখা করতে যেন আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের দপ্তরে গিয়েছিলাম, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনিই সমর সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রায় পনেরো বছর আগে যে-কবিতা লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন, সে-সব কবিতার মতোই মিতভাষী। দেশপ্রেমের উদ্গারে-ম'ম'-করা সুটারকিন স্ট্রীটের সেই দপ্তর, নিশ্বাস ফেলেন কী ক'রে তা নিয়ে আমার ঈষৎ বিস্ময়, 'ছমাস-আগে-অবস্থা আরো-ঢের-খারাপ-ছিল', এরকম একটা-দুটো উক্তি, আলাপ আর-বেশি এগোলো না, হয়তো ওঁর অন্যত্র যাওয়ার তাড়া ছিল, নয়তো আমার।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে তিন-চার বার আরো দেখা হয়েছে সমর সেনের সঙ্গে, এর-ওর-তার বাড়িতে, নয়তো কফিহাউসে। কোনোবারই কথা বিশেষ-কিছু হয় নি, শুধু বোঝা যেত ভদ্রলোক কবিতার স্ন্যাকামি থেকে দূরে থাকতে চান। ১৯৬৪ সাল, কলকাতায় নতুন ক'রে দাঙ্গা, বস্তিতে-বস্তিতে গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি পুড়োনো, 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজগুলির বীভৎস ইন্ধন জোগানো। শুনলাম সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা বেশির ভাগ লোক আদর্শ জিনিসটাকে জীবিকানির্বাহের হিসেবনিকেশের বাইরে ফেলে রেখে সন্তর্পণে কালাতিপাত করি, সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন শুনে লজ্জায় বিবেক আরো-একটু কুঁকড়ে এলো।

আরো কয়েক সপ্তাহ যেতে শুনতে পেলাম কলকাতা থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোচ্ছে — 'নাউ' — সমর সেনকে সম্পাদক হবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, এবং ভদ্রলোক রাজি হয়েছেন। পত্রিকা বেরোতে-বেরোতে অবশ্য অক্টোবর মাস পড়ে গেল, আস্তে আস্তে আমিও যেন কোন্ কোন্ ঘটনা-পরম্পরায় 'নাউ'-র অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হলাম।

সব-মিলিয়ে তিন বছরের কিছু বেশি সময় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম : পরি-কল্পনা, প্রকাশ, উন্মেষ, প্রসার, এ-বছরের শুরু পর্যন্ত — যখন সমর সেন বিতাড়িত হলেন। এই পুরোটা সময় বিখ্যাত সমর সেন-কে সম্পাদক হিসেবে খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম, আমার কৈশোরকে খুব একটা একহাত নেওয়ার মস্ত সুযোগ ছিল সেটা, এবং যার আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করেছিলাম। 'নাউ'-র বোধহয় কোনো বিশিষ্ট আড্ডা ছিল না। সমর সেনের নিজের যে-আড্ডা, তার সঙ্গে পত্রিকাটির চরিত্রের প্রতীপ সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; ভদ্রলোক এখন যে-পত্রিকা বের করছেন, তা-ও বোধহয় তাঁর আড্ডার আবহাওয়াকে দীর্ণ করেই। যিনি একদা অম্লান কবুলতিতে লিখতে পেরেছিলেন 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়,' তিনি কী ক'রে নিজের পরিপার্শ্বকে এভাবে অতিক্রম ক'রে চিন্তার অবৈকল্যে স্থিত থাকতে পারেন, তা নিয়ে প্রায়ই আমি ভেবেছি। আসলে আমাদের বাঙালিদের আড্ডাগুলি বোধহয় নির্মোকের মতো, অভ্যাসের বশে আমরা প্রবেশ করি, বেরিয়ে আসি, অন্তর্গত ভাবনাবোধআবেগাদির সূত্রের সঙ্গে তাদের কোনো সাযুজ্য নেই।

সমর সেন-কে সম্পাদকরূপে দেখে যা আমাকে অবাক করেছিল : ভদ্রলোকের স্থূলে ভুল নেই। একটা জীবনদর্শন চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে, ট্রামে-বাসে বহুতর শ্রেণীর-প্রকৃতির-সমাজের লোকের সঙ্গে স্মিত হেসে কথা বলছেন, রূঢ়তার প্রসঙ্গ কাছাকাছি আসছে না, বিমিশ্র আড্ডায় সন্ধি অভিসন্ধিসম্পন্ন ক-খ-গ-র বিচিত্রবাণী শুনছেন, কিন্তু বুধবার সন্ধ্যাবেলা পত্রিকা যখন বেরোলো, অভীষ্টে সামান্যতম বিচ্যুতি নেই, প্রথাগত চক্ষুলজ্জার জালে জড়িয়ে শাক দিয়ে

মাছ ঢাকা নেই। যা বলা দরকার, তা স্পষ্ট ক'রে বলে দেওয়া হচ্ছে ধাপ্পা-বুজরুকি-ফ্যাকামি নির্দয়তার সঙ্গে উন্মোচিত করা হচ্ছে যে-সমাজশত্রুদের চাবুকানো দরকার তাদের চাবুকানো হচ্ছে।

আমার নিজের মনে হয়, বাংলাদেশের ষাটের শতকের সামাজিক ইতিহাসে সমর সেন-সম্পাদিত 'নাউ'-র উল্লেখ না-থাকা ঘোর অসম্পূর্ণতা হবে। এই দাবিঘোষণায় হয়তো কেউ-কেউ উচ্চস্বরে হেসে উঠবেন। একে সাপ্তাহিক, তায় ইংরেজিতে, পরম কাট্‌তির সময়েও বাজারে বিক্রি দশ হাজার ছাপিয়ে যায় নি, এমনধারা পত্রিকার প্রভাব আদৌ সর্বব্যাপী হবার নয়, সুতরাং, পত্রিকাটির কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কিংবা লেখা থাকা উচিত এটা বলা, অনেকেই মনে হয় বলবেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারা পড়তো নাউ? দু-চারজন কেরানি, দু-চারজন স্কুলমাস্টার, কিছু সংখ্যক অপোগণ্ড ছাত্র, সদাগরি দপ্তরের একজন-দুজন মাঝারি সায়েব, তাছাড়া কয়েকটি রাজনৈতিক দলভুক্ত পেশাদার কর্মীরা। প্রতি সপ্তাহে নেহাৎই এঁদের জন্য কলম মক্সো করা, ইংরেজিতে শব্দের-পর-শব্দ বসিয়ে যাওয়া, এঁদেরই জন্য আবেগে উদ্গত হওয়া, বিদ্রূপে তির্যক হওয়া, এঁদেরই লক্ষ ক'রে তত্ত্বের সরলীকরণ, তথ্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান। দেশে ইংরেজনবিশের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, চায়ের কফির পেয়ালায় গরম-হতে-চাওয়া মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত হাড়গিলেদের জন্য কেন তাহলে প্রতি সপ্তাহে কথার-উপর-কথা-বসানো? বিদেশে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন অবশ্য 'নাউ'-র ইংরেজি বাচনের তারিফ করতেন, রচনাশৈলীতে প্রতিভার দর্শন পেতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাতেই বা কী সব? বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অলিগলিতে তার কতটুকু প্রশ্বাসপ্রবাহ?

আমার যা বক্তব্য ভেবেচিন্তেই বলছি এবং যতটা সম্ভব আবেগনিরপেক্ষ হয়ে। কৃষিকর্মী মজুরশ্রেণী নিয়ে যতই বক্তৃতাকণ্ডূয়ন করি, এখনো বাঙালি জীবন-যাত্রায় সামাজিক উপপ্লবে মধ্যবিত্ত মানসতা প্রধান কর্তৃপুরুষ। মধ্যবিত্ত, নাগরিক, কলকাতাসমাচ্ছন্ন বাঙালি চেতনা: লিন পিয়াও আপাতত পরাহত, এমনকি নক্সলবাড়ির প্রসঙ্গেও যদি আমাদের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাহলেও, সেখানেও, জঙ্গল সাঁওতালের নাম ছাপিয়ে কানু সান্যালের উল্লেখ। এই অবস্থা চলবে আরো দীর্ঘ সময় ধরে, হয়তো আরো কুড়ি বছর, হয়তো তিরিশ বছর, যতদিন না নাগরিক প্রভাব বাঙালির জীবনকলায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে, যতদিন না কৃষককুল নিজেদের স্বভাবজ চিন্তায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে উপনীত হতে পারেন, যতদিন না কারখানার মজুর কেম্‌ব্রিজে-পাশ শ্রমিক নেতাকে রদ্দা মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়ে নিজে সে-চেয়ারে বসে কেম্‌ব্রিজে-পাশ-কারখানা-মালিকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁতখিঁচুনি দিতে পারেন। এই অন্তর্বর্তী সময়ে সামান্য কয়েক হাজারের জন্যই কাগজে কালি বুলোনো, রাগে বিস্ফারিত হওয়া, ঘৃণায়-

ব্যঙ্গে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ভরে পাতা ভরানো, ভাবী সমাজের কাঠামো নিয়ে কথার-পিঠে-কথা সাজিয়ে স্বপ্নবুনন। ইচ্ছে থাকলেও আরো স্থানকালনির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে পারি না, সুতরাং গণ্ডিকে মেনে নিয়ে যতটুকু বিবেকের দায় মেটানো সম্ভব, ততটুকুই তৃপ্তিদায়ক। তাছাড়া, আরো কতগুলি গণ্ডির অনুশাসনও আপাতত মেনে নিতে হয় : সাধ্যের গণ্ডি, এই বৈশ্ব পৃথিবীতে সামর্থ্যের গণ্ডি। সুতরাং যদি কোনো ইংরেজি পত্রিকার সুযোগই ব্যবহার করতে হয়, বাধ্য হয়ে তা-ই।

আরোপিত শৃঙ্খল মেনে নিয়েছিলেন সমর সেন। কিন্তু সেই শৃঙ্খল সত্ত্বেও ঐ তিন বছরের মধ্যে বাঙালি সমাজের জন্য যতটুকু করতে পেরেছিলেন তিনি তার তুলনা নেই। ১৯৬৩-৬৪ সালের স্তিমিত বাংলাদেশের, নির্বাপিত কলকাতার কথা একবার ভাবুন। ভয়ংকর তমিস্রার দিন গেছে তখন কেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে, প্রতিদিন খবর কাগজে কুপমণ্ডূক আস্ফালন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'চীন'-এর সঙ্গে 'রে হীন' মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদছেন, যুদ্ধের জিগির তুলে কতিপয় তস্কর সাধারণ মানুষের সর্বস্ব নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটুকু বলবার সাহস কারো নেই, নতুন দিল্লি থেকে অদ্ভুতকিম্ভূত যা-যা অশ্লীল মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে এমনকি এই বাংলাদেশেও তাদের ভয়াবিষ্ট পুনরাবৃত্তি, যাঁরা একদা 'প্রগতিশীল' খেতাব এঁটে শৌখিন রাজনীতি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা করতেন, তাঁরা হীনমন্যতার কম্বলে মাথা জড়িয়ে খাটের তলায় ঘুপ্‌টি মেরে অবস্থান করছেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সমস্ত বাসনা-প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে সর্বত্র এক ধিক্কারউদ্রেককারী আর্যাবর্তপ্রীতি। হয়তো ভুল বললাম, বলা উচিত ছিল আর্যাবর্তভীতি। সেই যে তৃতীয় শ্রেণীর গোট্টা কবি একদা গান বেঁধেছিলেন, 'জাগে নবভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা,' সেই জাগৃতির অশ্লীলতায় পৌঁছুতেই খুব-একটা বাকি ছিল না যেন তখন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস থেকে যে-নবভারত নতুন দিল্লির কলকাঠি-নাড়ানোওয়ালারা বাস্তবে পরিণত করতে চাইছেন, তা বড়োই বীভৎস ব্যাপার সেই ভারতবর্ষে হিন্দুয়ানির প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামি, অন্ধতা, হিন্দিভাষার সার্বভৌমত্ব, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে গভীর অনীহা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, গোমাতার আরাধনা, যে-কোনো সাম্যভাবনা সম্বন্ধে উৎকীর্ণ সন্দেহ, মধ্যযুগে পুনঃপ্রস্থানের লালায়িত আগ্রহ। বর্বরতার প্রচ্ছায়ায় আমাদের জোর ক'রে হাত-পা বেঁধে একজাতি একপ্রাণ বানাবার এক মত্ত চেষ্টা চলছে। এমন নয় যে যাঁরা শাসনযন্ত্রের হাল ধরে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে এ-ধরনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন, এমন কেউ কেউও নিশ্চয়ই আছেন যাঁদের মানসিকতার অনুরাগ সম্পূর্ণ অন্য, কিন্তু তাহলেও মনে হয় প্রয়াসের মুখ্য প্রবণতা এই বলাৎকার সাধনের দিকে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা হয় চুপ, নয় শেয়ালের দলে নাম লিখিয়েছেন, অনেকেরই

প্রাক্তন রাজনৈতিক সংসাহস স্তিমিত অথবা মৃত, পাঁচ বছর আগে সত্যিই ভয় ঢুকেছিল বুঝি বা আমরা অচিরে অশ্লীলতার বন্যায় ডুবে যাবো, সত্তাপরিচয়হীন হয়ে যাবো। বাংলাদেশ, এমনকি-এই-দু'টুকরো-হওয়া বাংলাদেশও, আর থাকবে না, ভারতের এক সামান্য খণ্ডে পরিণত হবে। হয়তো পঁচিশ বছর, হয়তো পঞ্চাশ বছর কোনোক্রমে ভাষার আলাদা রূপটা বজায় থাকবে, তারপর তা-ও হিন্দির অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়ে মিলিয়ে যাবে রবীন্দ্রনাথের গানের হিন্দি অনুবাদ আমরা গাইব। জনসংঘের নেতারা রাজা হবেন; মার্কিনরা আমাদের সভ্যতা শেখাবে; কুচকাওয়াজ করবো।

এরকম আতঙ্ক ১৯৬৩ সালে হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। এমনকি বাংলাদেশেও পণ্ডিত-অধ্যাপকরা ভয়ে নীল হয়ে আছেন, নয়তো 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজগুলির পূজা-আরাধনা ক'রে দু'পয়সার ব্যবস্থা করছেন, যা চিরাচরিত মধ্যবিত্ত প্রস্থান। সমর সেন 'নাউ' পত্রিকা মারফৎ মানসিকতার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, নপুংসকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো। কিছুটা বিদ্রূপে, কিছুটা ব্যঙ্গে, কিছুটা তাচ্ছিল্যে, কিছুটা ঘৃণায় আর্যাবর্তমন্যতাকে দু'দিনেই নাজেহাল-নাস্তানাবুদ করলেন; যে-সাহসে আমাদের জন্মগত অধিকার, তাকে ফিরিয়ে আনলেন। সমাজতন্ত্রের যে-স্বপ্ন বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থার বিন্যাস অসম্ভব, সেই স্বপ্ন তার উজ্জ্বলতা নিয়ে ফিরে এলো। মোহ্যমান ঘোর থেকে মুক্ত এই বাংলাদেশে গত তিন-চার বছরে তারপর অনেক কিছুই ঘটেছে: অনেক দৃপ্ত ভঙ্গির কথাকলি, অনেক বিপ্লবী বিভঙ্গের তরবারি ঘুরোনো। কিন্তু নতুন ক'রে সাহসের সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন সেই সমর সেন, যে-সমর সেন তিরিশ বছর আগে আরেক ধরনের সাহস দেখিয়েছিলেন, সেই কবিতার রাজ্যে।

এখনো অভিযোগ হবে, অতিকথন করছি। ব্যক্তি তথা বস্তু ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র, যে-সাহস সমর সেন তখন জুগিয়েছিলেন তা ঘটনাচক্র একটু অন্য রকম হ'লে হয়তো অন্য-কেউ জোগাতেন, সে-সাহসের ধারক 'নাউ' নব হয়ে অন্য-কোনো পত্রিকা হতো। কিন্তু ইতিহাসে প্রত্যয় এবং ভবিতব্য-ভক্তি আলাদা ব্যাপার। পালাবার পথে ধুলো ওড়ানোর দঙ্গলে ভিড়ের অভাব হয় না, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ততায় সংহত বাংলাদেশে হয় না। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে তেমন লাভ নেই, লোক-পরিবাদে নেমেও নেই। ঠিক ঐ মুহূর্তে সমর সেন এগিয়ে না-এলে শ্রীযুক্ত অমুক কিংবা শ্রীমতী তমুক এগিয়ে আসতেন কিনা তা নিয়ে এখন তর্ক বৃথা, তাঁদের অন্তত সে-মুহূর্তে দেখা পাওয়া যায় নি। গবুচন্দ্রমন্ত্রীপ্রতিম হয়ে অনেকেই হয়তো এখন বলতে পারেন, তাঁদের মনেও বরাবরই সাহস দেখাবার সংকল্পটা ছিল, সমর সেন কী ক'রে টের পেয়ে আগে-ভাগে বাজার জমিয়ে বসেছিলেন, আসল কৃতিত্বটা কিন্তু তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁদের তৃপ্তিরোমন্থনে আমি ব্যাঘাত ঘটাবো না।

অবশ্য অন্য একটি কথা বলতে হয়। বাঙালি সাহসের উত্তরাধিকার একা সমর সেনে নিশ্চয়ই বর্তায় নি, সে-রকম অন্যায় দাবি করার অভিপ্রায়ও আমার নেই, এইমাত্র উপরে যা লিখেছি তা সত্ত্বেও নেই। কিন্তু 'নাউ'-তে সাহসের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের অন্বয় ঘটেছিল : রচনার উজ্জ্বলতা। সমাজশত্রুদের গাল পাড়তে গেলেও যে লেখায় একটা ঝাঁধুনি দরকার, চিন্তার মূল সূত্রটি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে গেলে ব্যাখ্যার মধ্যে যে সংহতি-প্রাঞ্জলতা-ঘনপিনদ্ধতা দরকার, অনেকেই তা ভুলে থাকেন। ফলে অনেক মহৎ ভাবনা অসংলগ্ন আবেগের আড়ালে ঢাকা পড়ে, যা স্থির অবীক্ষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন ভাষার বিমুক্তিতে তা অনুক্ত থাকে। বামতাত্ত্বিকরা ভাষা তথা কলাকুশলতার এ-দিকটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে চান না, তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমনকি বাচনভঙ্গির ব্যাবহারিক উপযোগিতা পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে যাবেন। এ-ব্যাপারে সমর সেন পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন : ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও এটা অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও, স্বীকার করেছেন 'নাউ' পত্রিকার মতো সংস্কৃত, বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা গোটা ভারতবর্ষে এর আগে চোখে পড়ে নি, নিহিত বক্তব্য প্রবল ভয়ংকরী হওয়া সত্ত্বেও সমর সেনের সম্পাদনা-উৎকর্ষের তুলনা নেই।

তিন বছরের একটু বেশি সময় 'নাউ' পত্রিকায় আমরা আসর জমিয়েছিলাম, পত্রিকার শুরু থেকে যে-তারিখে মালিকরা সমর সেন-কে তাড়িয়ে দিলেন সেদিন পর্যন্ত। অবিমিশ্র সুখের সময় গেছে সেটা, অবিমিশ্র সাহসে বিস্ফোটিত হবার সুখ। কিন্তু আমরা নিয়তিকে অত্যন্ত বেশি প্রলুব্ধ করছিলাম, সুতরাং যা হবার তা-ই হল ; যে-পত্রিকার নিশ্বাসওংকার কোনো-কিছুই তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না, সমর সেন-কে সেই পত্রিকা থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করা হল। এক হিসেবে অবশ্য আমি খুশিই হয়েছি শ্রেণীসংঘাতের মৌল লক্ষণগুলি আস্তে-আস্তে বিকশিত হচ্ছে, সমর সেন-কে 'নাউ' থেকে তাড়ানো তার স্পষ্ট প্রমাণ। আপনার শ্রেণীস্বার্থকে লোকটা দিনের-পর-দিন ব্যাঘাত ক'রে যাচ্ছে, অথচ আপনি মুখচোরা বিনয়ে সেটা সহ্য ক'রে যাচ্ছেন, এরকম হওয়াটাই প্রকৃতি-বহির্ভূত। আমাদেরও অন্দরমহলে, আমরা তৈরি কি অসংবৃত তা বাহ্য, শ্রেণী-যুদ্ধে দামামা বাজিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে মস্ত শুভসংবাদ সেটা।

না, 'নাউ' থেকে সমর সেনের অপসারণে আমার বিন্দুমাত্র বিস্ময় সঞ্চার হয় নি, আমাকে যা ঈষৎ অবাক করেছে তা এই বিতাড়নের ব্যাপারে এই ভূখণ্ডের শুদোমঠাসা প্রগতিওয়ালা-বিপ্লবওয়ালাদের নিরুত্তেজ ভাব। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি স্বীয় অবৈকল্য-নিষ্ঠা দিয়ে সাংবাদিকতার মান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহু উর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেছেন, সেই সম্মানীয় ব্যক্তিকে বলাকওয়া নেই, এরকম পত্রপাঠ বিদায়ের প্রসঙ্গে যেন তাঁদের কোনো সামাজিক কর্তব্য নেই ; এক আশ্চর্য-অদ্ভুত আসক্তিহীনতা, যেন পৃথিবীতে যথার্থই কোনো

ব্যথা নেই, সমর সেন-ই শুধু অথথা মৃত্যু খোঁজেন। লোকসভা-রাজ্যসভায় যাঁরা টেবিল চাপড়ে প্রত্যহ দাপাদাপি করেন, তাঁদেরও মুখ দিয়ে রা'টি বেরোয় নি ; ময়দানের পাটাতনে যাঁরা গোধূলি সন্ধ্যায় বিপ্লবের রক্তবন্যা বইয়ে দেন, তাঁরাও চুপ বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকদের যে-সংকুল, সম্প্রদায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় সব গেলো সব গেলো বলে খবরকাগজে সুদীর্ঘ বিবৃতি সাতশো আশি স্বাক্ষর অলংকৃত ক'রে পাঠান, সমর সেনের ব্যাপারে তাঁরা নীরব, এবং সে-নীরবতায় রবীন্দ্রনাথ-কথিত পূর্ণিমানিশীথিনীর কোনো দ্যোতনা নেই।

হয়তো এই বিস্ময়েরও কোনো মানে নেই। আরো কিছুদিন হয়তো এরকমই হবে। মধ্যবিত্তমদির বাংলাদেশ ভদ্দরলোকের ভয়, ভদ্দরলোকের ঈর্ষা, ভদ্দরলোকের লোভ, ভদ্দরলোকের পরশ্রীকাতরতা, ভদ্দরলোকের নিজের-বুঝ-আগে বোঝার প্রবণতা। এই সমাজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমর সেন দৃপ্ত সাহস দেখিয়েছেন, সাহস দেখিয়েছেন বলে এখন জবাই হয়েছেন, কিন্তু তাতে আমার-আপনার কী : আমরা কলেজে-কি-অফিসে যাবো, পান চিবোবো, একে-ওকে খোশামোদ ক'রে বাড়তি দু-পয়সার ব্যবস্থা করবো, আখেরে সুবিধে হলে দুটি-তিনটি সৌখিন বক্তৃতা দেবো, রাত্রিতে আমাদের ঘুম খুব নিটোল হবে, পড়ে মরুকগে সমর সেন।

কবিতা

কিছু তো দাও

যুবনাশ্ব

হ্যাংলা বেহায়ার মতো
কানকাটা নির্লজ্জের মতো
হাত পেতে শুধু পেয়েই গেলে
এবারে
কিছু ত দাও।

পুঁদে পেয়ে পটকে যেতে পারতে
মা'র বুকের দুধ না পেতে পারতে
না মাটির বুকের ধান।
বাছুর ঠকিয়ে ভাঁড় ভাঁড় দুধ
না-ও সাবড়াতে পারতে
না পাখপাখালি ঠকিয়ে
গাছের ফল খেতে।

ঠকবাজিতে ট্যাঁকে রেস্ত না ভরতে পারতে
না মেহন্নতি মানুষ ঠকিয়ে
তাদের রক্ত শুষে
নাতি নাতকুড়ের জন্যে পয়সা জমাতে।

এক ফোঁটা মাথার ঘাম পায়ে না ফেলে
তাবৎ দুনিয়ার রক্তে
জোঁকের মতো পেট ফোলাতে
না-ও পারতে।

ভাদ্র - আশ্বিন ১৩৭৫

সব ফক্কিকার আর মামদোবাজি
আর ভানুমতির খেল, বাবা,
আর লাগসই তীর ছোঁড়ার মুনসিয়ানা !

ফোকটে খেলে ঢের খেলে ঢের
খেলে ঢের, এবারে
কিছু ত দাও ॥

মন্ন

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অনেকটা আকাশ দেখা যেত এই জানালা দিয়ে,
ধনী বাড়িওয়ালা ঐ ফাঁকা জমিতে তাঁর
মাল্টিস্টোরিড ব্যবসা-গৃহ গড়ার জন্যে
জানালাটা ঢেকে দিয়ে স্কাইস্ক্র্যাপার তুলেছেন।
আকাশের নীল দেখি না আর, শুধু কংক্রিটের ধূসরতা,
কার্বণ কাগজের লেখার মতো
অস্পষ্ট ঝাপসা হয়ে গেছে ফাঁকা জায়গাটা।
হে ঈশ্বর, আলো দিয়েছো, আকাশ দিয়েছো,
কিন্তু ভোগ করবার অধিকার দাও নি কেন ?

পথ দিয়ে মিছিল যাচ্ছে ;—
'আমাদের বাঁচতে হবে'
'এ লড়াই বাঁচার লড়াই।'

ধীরে ধীরে, যেভাবেই হোক

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদ্‌লে নেবো
বদ্‌লে বদ্‌লে নেবো
মানুষ মানুষে গাছে গাছ
শিংদরজা আনাচ কানাচ
বদ্‌লে নেবো
বদ্‌লে বদ্‌লে নেবো
ধীরে ধীরে
যেভাবেই হোক
বদ্‌লে নেবো

ছেঁড়াখোঁড়া ইজেরের ফুটো
কনুই পর্যন্ত ভাঙা মুঠো
বদ্‌লে নেবো
সহজ পোষাকে
আকর্ণবিস্তৃত মুখ তাকে
ঠায়সন্ধ্যা পিছল গলির
চলি

চলি, দেখে আসি
বেজেছে আঘাটা-ছাড়া বাঁশি
কিনা
কোন্ রাজ্যে বয়েসে নবীনা
বিপ্লব
যেভাবে হোক
বদ্‌লে নেবো
বদ্‌লে বদ্‌লে নেবো ॥

জীবন বিষয়ক

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যাই বলো, তাতেই কি রাজি ? রাজি নই।
আমাদের যেতে হয় আরো দীর্ঘ পাড়ির বিবেকে,
মানুষজন্ম নিয়ে আর কোনো ছেলেখেলা নয়, একে ওকে
ঘৃণা ভালোবাসা, কিংবা স্রেফ্ আলিংগন দিয়ে নেয়া ভালো।

মূঢ়তা অনেক হলো (আপেক্ষিক শব্দ ?) ; বেলা যায়—
উজান টানের মতো সরে যাই, চঞ্চল মাছের
সূচিকর্মে গড়ে-ওঠা জলের নক্সার কাছে যাই দিয়ে উঠি ;
এই তো জীবন—এই থেমে-থাকতে-না-পারা ভুবনে
অনিন্দ্য আড়াল তবু ভরে ওঠে শস্য ও শিমূলে, অবেলায়।

এখনো সবার পায়ে বসতে পারি না, কারো কাছে
নতজানু হতে পারি—হয়ে যাই—মানুষজনের অবিরল
দায়-দায়িত্বের কথা তুমি আমি সবাই তো বুঝি। তবে কেন

আমি কোন দিকে আছি, এই নিয়ে কানাঘুঁষো রটে ?

হয়তো আরেক দিন

সুধেন্দু মল্লিক

হয়তো আরেকদিন গলার স্বর শুনতে পাবো।
যেমন ঘুমের মধ্যে মানুষ
মোমবাতি জ্বলা ভালোবাসায়
ছোঁয়া পায়। হয়তো যে একটা পাখি

বাগানে বর্ষায় উটকো আগাছা
দুরাশায় সবুজ হয়ে উঠেছে।

এর চেয়ে খুব একটা বড়ো দুঃখের
কথা ভাবি না,
উড়ে যাওয়া পাখির বাসা পড়ে আছে স্বপ্নের মতো।

বারবার জানলা খোলা হলো। গোধূলিবেলায়
মেঘ চলে গেল ছায়া পথের কাছে।
ঘাসের উপর ভাঙা ঝিনুক – তার উপর শিশির।
হয়তো আরেক দিন গলার স্বর শুনতে পাবো।

পালিয়ে গেলেও

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ভেবেছিলে, দরজা জানালা
বাকুড়ার শিল্পঘোড়া, রঙীন কার্পেট
আর তোমাকে চিনতে পারবে না ?
আকাশের অবকাশে দাঁড়ানো মানেই
সূর্যকে স্বাধীন হতে দেওয়া !
কিন্তু আজকাল বনে গেলেও জামাকাপড় ;
অর্থাৎ জন্মদিনের পোশাকে কোথাও যাওয়া চলবে না,
ঠোঁট ব্যবহারের আগেই দেখতে হবে
দরজা জানালা ঠিকঠাক বন্ধ কিনা।
সুতরাং আবার সেই দরজা জানালার কথাই এসে গেল
যা কিনা অনতিঅতীতের কাঠ, আরে আগে প্রকৃতিপ্রদত্ত বৃক্ষ দূরান্ত অরণ্যে।
কিন্তু সে সব সবুজ এমন আমূল বদলে নেওয়া হলো
যে আর চেনাই গেল না এসব টিপটপ

ক্ষুরিত ফ্যাশান আর চকচকে পালিশ কি করে
কবিতায় নৈসর্গিক জড়ো হয়ে তীর্থ হয়ে উঠতো ! অধুনা
ঘড়িতেও আর সত্যবাদী সময় নেই যে জিজ্ঞাসা করলেই স্বভাবে সে
উল্টোদিকে কাঁটা ঘুরিয়ে প্রবল বেজে উঠবে, যখন তুমি
দর্পণের কাছে ফিরে গিয়ে আরো-একবার নিজের মুখকে
ভিক্ষা চাইতে পারো ; কেননা এখন
তৃষ্ণার প্রত্যেক রেখা জলের সমান পাল্টে যায়।
কিংবা সূর্যের দৈনিক দীপ্তি নিভিয়ে ঘরের মধ্যে
নীলাভ আলোয় পরীক্ষা করতে পারো প্রত্নতাত্ত্বিকের পরিশ্রমের পরেও
কিছুই নির্ণীত হলো কিনা, এমন কি শরীরও, যার প্রতিটি পর্বেরই
ভিন্ন ভিন্ন ভাষা—একদিন মনে হয়েছিল। এখন শরীর
ভালবাসার সমাপ্তিপর্ব বাথরুমের ভিতর নিয়ে যায়।
গঙ্গাজল করপোরেশনশুদ্ধ হয়ে ত্বক স্পর্শ করে, বুঝি
শেষ জেনে নিতে চায় কোথাও আত্মার
মর্যাদাবোধের শব পড়ে আছে কিনা ? যেহেতু শ্মশানে
স্বাভাবিক ভাগীরথী ভীষণ ঘোলাটে।
তা ছাড়া যে বুকে নিশ্বাসের যাওয়া-আসা নেই, কিংবা
দরজা জানালা থেকে বের হতে গিয়ে ব্যর্থ চোখ বুজে শুয়ে আছে চিৎ ;
তাকে বৃক্ষসমাজের খণ্ডখণ্ড হাহাকারের উপর রেখে, চন্দনচর্চিত শেষ ইহকাল
জেলে, অগ্নি কেন ক্রমবর্ধমান মদনভস্মেও প্রশ্ন করে যাবে
'দরজা জানালা থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেও
মৃত্যু কি সভ্যতা হাতড়ে তোমাকে কখনো খুঁজে বের করতে পারবে না
ভেবেছিলে ?'

নিঃসঙ্গ হরিণী

কাজল ঘোষ

কে আগন্তুক তুমিই বল না ;
এসেছো হাজার পথ খুঁজে,
কোন চোখে তৃষ্ণা আর কোন চোখে
ঐশ্বর্যের মালঞ্চ সম্ভার।

সে সন্ধ্যায় তুমি বলেছিলে
অনেক অজ্ঞাত কথা,
হীরার খনির থেকে তুলেছিলে
হীরা থরে থরে।

কি যে পেয়ে ছুটে গেছি
আজিও জানি না,
তপ্তচোখ হরিণীর আলোহিত বুকে
যে ছবি অংকিত ছিলো
এখনও অজানা এক সম্পদ আমার।

তবু জানি এ সমস্তই নিষ্ফল বাসনা,
ভালোবাসা মৃতচক্ষু জাগাতে পারে না।

কখনো কখনো অন্ধ হতে হয়

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কখনো কখনো অন্ধ হতে হয় হওয়া প্রয়োজন
ঈশ্বর অথবা তুমি অন্ধেরই নিজস্ব হতে পারো
কবিতার জন্য আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে চাই
সব খোয়াবার মন্ত্র লাভালাভ
জানে অন্ধ শিশুর জলন্ত চোখ জানে
কখনো কখনো অন্ধ হতে চাই
আমার নিজস্ব প্রয়োজনে

তোর বুক ছুঁতে হলে
দ্রবীভূত হতে হয় তোরই তো শরীরে
শিশুই দ্রবণ জানে অতএব শিশু হতে চাই
দ্রবীভূত হলে সত্তা ছড়াবে সর্বত্র জল এবং তুষার
তোর দেহে রক্ত হবো ফুসফুসের অনিবার্য হাওয়া
দ্রবীভূত হলে আমি
লবণের মতো ওই সমুদ্রে ঘুমাবো

কখনো কখনো অন্ধ হতে হয় হওয়া প্রয়োজন
ঈশ্বর অথবা তুমি অন্ধেরই নিজস্ব হতে পারো
কবিতার জন্য আমি কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে চাই
মাংসাসে শায়িত দেহ পচে গলে না গেলে
ঈশ্বরী !
তোমাকে পাবো না তাই পচে গলে মরা প্রয়োজন
সব খোয়াবার মন্ত্র শিশু বা অন্ধই জানে
...সর্বস্ব খোয়ায়
পরিবর্তে বুকে তার
বেড়ে ওঠে বোধিবৃক্ষ শিল্পের জরায়ু

আনন্দ

কালীকৃষ্ণ গুহ

শেষ বৈশাখের আলো এসে পড়েছিলো তোমার মুখে।

আমি তোমার হাতে একগুচ্ছ রক্তকিংশুক তুলে দিতে গিয়ে দেখি
অশ্রুধারা, আনন্দ –
বৈশাখ মাসের আলোর মতো আনন্দ, যেন
পাপ ছুঁয়ে থাকে, মৃত্যু ছুঁয়ে স্পর্শ করে শরীর।

তোমার মুখে আমি জীবন-মৃত্যুর এক উদাসীন খেলা দেখেছি, যখন
আমাদের চারপাশে পাতা উড়ে যায়, উড়ে আসে –
ধুলোয়-পাতায় মাখামাখি প্রকৃতি, শৈশব, যেন
সমস্ত মাঠের উপর তার চুল ছড়ানো রয়েছে, বলা হয়েছে :
'আমাদের কুয়াশা-পরিচয় ছিন্ন হোক, আলো লাগুক, বিশ্বাসে আঘাত
লাগুক', যখন

অবসানের আলোয় ছবি ভেসে উঠেছে, শৈশব, আনন্দিত প্রকৃতি।

হার্বার্ট মার্কিউস

বিপ্লবের প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন বলা হয়, মার্কসের বিপ্লব-প্রত্যয় শিল্প-সমাজের (industrial society) নতুন তথ্যাবলির মোকাবিলা করতে পারবে না ; সে-প্রত্যয় কাল-অনৌচিত্য-দোষে দুষ্ট, এবং তার আর কোনোই কেন্দ্রভূমি নেই। মার্কসের কল্পনায় ভাবী সামাজিক সংক্ষোভের নায়ক যে শ্রমিকশ্রেণী, সে আজ 'শ্রেণী' হিসেবে নিজেকে অবলুপ্ত করেছে ; গুণগতভাবে পৃথক একটি সমাজবিন্যাস প্রবর্তনের আকাঙ্ক্ষার স্থলে দেখা দিয়েছে কর্মের উন্নততর অবস্থা, অধিকতর অবকাশকাল ও পার্থিব দ্রব্যাদির প্রয়োজন। এমতাবস্থায় পূর্বতন বিপ্লব-তত্ত্ব, যা শ্রেণীবিশেষের আর্থিক দুর্দশাকে রূপ দিয়েছিল এবং নির্যাতিতকে কথা বলতে শিখিয়েছিল, বর্তমানে অর্থহীন ও অবাস্তব হয়ে পড়েছে, সত্যের দিকে পিছন ফিরেছে। ইদানীং যারা বিপ্লবের কথা বলেন তাঁরা স্পষ্টতই একটা রহস্যসৃষ্টিতেই সাহায্য করেন না কি ?

মার্কিউস : বিপ্লবের ধারণা কার্যত কখনোই একটা 'রহস্যসৃষ্টি' (mystification) নয়। মোটের উপর চলতি অবস্থাটা সব সময়েই খারাপ থেকেছে : তা দুর্দশা ও নৃশংসতা দূর করার প্রকৃত সম্ভাবনাকে বাধা দেবারই একটা শক্তি। বিপ্লবের এখন আর কোনো সুনির্দেশিত 'কেন্দ্র' (constituency) নেই এবং

নির্ভরযোগ্য কোনো সংগঠিত আন্দোলন নেই – এ-তথ্য তার প্রয়োজনকে বাতিল করে না। কিন্তু সত্যিই কি বর্তমানে বিপ্লবের কোনো 'কেন্দ্র' নেই ? বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের ভাবাদর্শগত গোলস বা অমিত উৎপাদনের বাস্তব গোলসটি এই তথ্যকে উল্টে দিতে পারে না যে উন্নত পুঁজিবাদের রাজত্বে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শোষণের হিংস্র ও সম্প্রসারণশীল সাজসরঞ্জাম (apparatus) ও তৎসম্পর্কিত রীতিনীতির দ্বারা। এই প্রভুত্বতন্ত্রে স্বীকৃত ও প্রদত্ত নাগরিক অধিকারসমূহ নিপীড়নের তীব্রতাকে লঘু করে না, যে-নিপীড়ন পৃথিবীকে একটা নরক বানিয়েছে। এই মুহূর্তে নারকীয়তা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে ভিয়েতনামের রণক্ষেত্রে ও বলির জন্য নির্দিষ্ট নয়া-উপনিবেশগুলোতে। অবশ্য মানবতাও সেখানে সংহত রূপ পাচ্ছে : ঠিক প্রত্যক্ষত গেরিলা যুদ্ধেই নয় – যা বিজয়ীর বিভীষিকা রুখছে প্রতিরোধের বিভীষিকায় – কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক মধ্যস্থতার মাধ্যমে, ঐ সমাজব্যবস্থার অন্তঃসীমানির্ধারণের সুযোগ পেয়ে, চূড়ান্ত দারিদ্র্য ও দুর্বলতার মধ্যেই দীর্ঘ কয়েকবছর যন্ত্রকৌশল ও ধনসম্পদে সর্বকালের সেরা সংহারযন্ত্রটিকে রুখে রেখেছে। আমি 'অন্তঃসীমা' বলছি, কারণ উন্নত পুঁজিবাদের বিশ্বগ্রাসী ব্যবস্থার আর কোনো বহিঃসীমা নেই ; উৎপাদনসম্পর্কের পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও যেহেতু এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিকাশ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার চাপ ও সহাবস্থানের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণ নিয়ে যে-কোনো রোমান্টিক ধারণাই ভুল। নিছক গেরিলা যুদ্ধ এ-ব্যবস্থার পক্ষে কিছু মর্মান্তিক ভয়ের নয় শেষপর্যন্ত তা প্রযুক্তিবিদ্যাজাত 'শেষ সমাধান' প্রতিহত করতে পারে না। সবকিছু বিষিয়ে ও পুড়িয়ে দিয়ে কোনোদিন, কিংবা আদৌ 'জয়' অর্জিত হবে কিনা – এ-প্রশ্নের উত্তর এ-ব্যবস্থার নিজের হাতেই রয়েছে। ভিয়েতনামে 'শেষ সমাধান' হবে মূলধনী শক্তির শেষ সংবদ্ধতা final (consolidation of the power of capital), যা সামরিক ও বিত্তবানের এক-নায়কতন্ত্রের সাহায্যে আপন স্বার্থ আরো প্রসারিত করবে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিকে ক্রমক্ষীয়মাণ আত্মরক্ষা (বা অক্ষম নিরপেক্ষতা)-র দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

এই প্রবণতা তখনই ভাঙা সম্ভব যদি নয়া-ঔপনিবেশিকতার শিকারদের প্রতিরোধ স্বয়ং 'সমৃদ্ধ সমাজে', উন্নত পুঁজিবাদের মহানগরে (metropolis) ও মহানগরের চাপে স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে এমন দুর্বল পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সমর্থন পায়। (৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে মহানগরগুলির মধ্যে বিরোধের কথায় ফিরে আসছি)। যাই হোক, ইয়োরোপীয় মহাদেশের পুঁজিবাদী দেশগুলোতে প্রতিরোধের কার্যকারিতার পূর্ব-শর্ত হল আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন (political revitalization)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আমাদের কালের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পুঁজিবাদ ও

সমাজতন্ত্রবাদের শনৈঃ শনৈঃ পারস্পরিক এক-কেন্দ্রাভিমুখী গতি। উভয় ব্যবস্থাতেই উন্নত শিল্পায়ন সমাজধারা ও উৎপাদনপদ্ধতিকে পাল্টে ফেলেছে—এমন মাত্রায় যে, মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও ঘটনাপ্রবাহকে প্রযুক্তিবিদ্যা (technology) নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এখনো প্রভুত্বের সম্পর্ককে সংজ্ঞা দেওয়া যায় প্রযুক্তিতত্ত্বের ভাষায়। যে-যন্ত্র সামাজিক শ্রমের যোগান ও সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করে ক্ষমতা তারই কর্তৃত্ব যখন স্বার্থসাধনে নিযুক্ত তখন তাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হিসেবে আর চেনা যায় না। প্রচলিত দায়িত্বের চাপে সাড়া দিয়েই প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় ও সহজ বিশ্বাসে কাজ ক'রে যায়। স্বাধীনতার যে-ধারণা বিপ্লব ও বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করত, মনে হয়, আধুনিক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে তা তুলে ফেলা হয়েছে। স্বাধীনতার প্রত্যয়টি কি অবশেষে 'নিয়ন্ত্রিত জনতার সমাজে' (managed mass society) তার বৈপ্লবিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে?

মার্কিউস 'পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের শনৈঃ শনৈঃ পারস্পরিক এক-কেন্দ্রাভিমুখী গতি' রূপ পাচ্ছে গতানুগতিক সব বাঁধা বুলিতে, যেমন 'প্রযুক্তিতান্ত্রিক সমাজ' বা 'উন্নত শিল্পের সমাজ' ইত্যাদিতে। এই প্রত্যয়ের প্রচলিত ক্রুদ্ধ সমালোচনাও আসলে শ্রেণীসত্য-জারিত (বা ভাবাদর্শগত)। জোর দিয়ে বলার দরকার নেই যে প্রকরণ (technique) নয়, উৎপাদক শক্তিগুলির সামাজিক বিন্যাসই বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। কিন্তু এ-কথার পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন যে উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ-সাধন এবং তার সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণই এই প্রভেদের চূড়ান্ত রূপ নয়, বিশেষত যখন এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এমন এক শ্রেণীর হাতে যাদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্ধারিত হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাজাত প্রয়োজনের অনুকরণে ও অভিযোজনে। উন্নত পুঁজিবাদের সঙ্গে সহাবস্থান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে জীবন-মরণের প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছে—যে-প্রতিযোগিতায় সামাজিক চাহিদা ও উৎপাদক শক্তিগুলির বিকাশ বিরাটভাবে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক ও সামরিক প্রয়োজনীয়তার অনুগত। ফলে, এখানে ও ওখানে কলাকৌশল (technique) উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় গড়ে-ওঠা একটি নিপীড়নের যন্ত্র হয়ে উঠছে। তাই যে-কলাকৌশল এখনো পর্যন্ত মুক্তির উপায়ে পরিণত হয় নি, তা প্রভুত্ব-যন্ত্রের মধ্যে ও তৎসম্পর্কিত বিশেষ একটি আচরণ-বিধি ছকে দিচ্ছে—এখানে ও ওখানে। তথাপি, যেখানে উৎপাদনব্যবস্থার সমাজীকরণ হয়ে গেছে (socialized) সেখানে এখনো মুক্তির সম্ভাবনা থাকছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির প্রয়োজন শান্তি, আগ্রাসী সম্প্রসারণ নয়।

কিন্তু উৎপাদনশক্তির বিকাশে প্রযুক্তিতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আরো একটি প্রবণতার জন্ম দিচ্ছে যা ভবিষ্যতের পক্ষে অনেক বেশি মারাত্মক।

বর্তমান আন্তর্জাতিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একদিকে 'প্রাচীন' দৃষ্টান্তিত, উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যার অধিকারী ও শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো এবং অপরদিকে 'নবীন' দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ তৈরি করছে। প্রথমোক্তরা সম্পন্ন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্ছে ; সীমারেখার ওপারের দরিদ্র দেশগুলোর বিপ্লবী সাম্যবাদ তাদের কাছে মনে হচ্ছে 'নিচু তলা থেকে উঠে-আসা বিপ্লব' এবং তাই বিপদ বিশেষ। বিপদ শুধু তাদের কাছেই নয় নিশ্চয়ই, 'সমৃদ্ধ সমাজ'ও এখানে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে বহুদিন যাবৎ আমেরিকার 'সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম' প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র দেশগুলির সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই পর্যবসিত হয়েছে।

এটাই যদি সত্য হয় যে 'স্বাধীনতার প্রত্যয়, যা বিপ্লব ও বিপ্লবীদের প্রেরণা যোগাতো,' সমৃদ্ধ শিল্পায়িত দেশগুলোতে তাকে দমন করা হয়েছে জীবনযাত্রার মান উন্নত ক'রে, তবে নিপীড়িতরা যেখানে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, সেখানেই তা অনেক বেশি তীব্র ও উন্মুক্ত। সেখানেই স্বাধীনতার বিপ্লবী প্রত্যয়টির সঙ্গে নিছক অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনের মিল ঘটেছে : যেমন ভিয়েতনামে, তেমনি ধনী দেশগুলোর বস্তি ও ঘেটো-তে।

তৃতীয় প্রশ্ন সমকালীন শিল্প-সমাজে আর অর্থনীতি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত-গুলির ভিত্তি হয় না, বরং অর্থনীতি নিজেই রাজনীতির একটি কৃত্য (function)। আর্থনীতিক প্রক্রিয়া পঞ্চাশ বছর আগের চাইতে এখন আরো স্পষ্টত রাষ্ট্রনীতির নিয়ন্ত্রণাধীন। এর মধ্যে এক নতুন ও বহুদিন যাবৎ অপরিচিত সর্বনিয়ামকতন্ত্রের (totalitarianism) আবির্ভাব ঘটছে। সামাজিক তত্ত্ব সম্ভবত এই ঘটনাবলির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি : অঙ্কের মতো তথ্যকে ছেড়ে তা নিজের বক্তব্যকেই আঁকড়ে আছে। মনে হয় তত্ত্ব থেকে প্রয়োগের বিচ্ছেদ ঘটেছে। 'বিষণ্ণীভবন' (alienation), 'বস্তুসত্তারোপ' (reification), 'শোষণ,' 'ন্যূনতম জীবিকামান' ও 'ক্রমনিঃস্বতা' (pauperization) ইত্যাদি প্রত্যয় দ্বারা কি সমাজের সমসাময়িক উদ্‌বর্তনকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ?

মার্কিউস এটা বলা ঠিক হবে না যে 'বর্তমান শিল্পনৈতিক সমাজে অর্থনীতি 'আর' রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি নয়, বরং নিজেই রাজনীতির একটি কৃত্য মাত্র'। সংকীর্ণ 'আর্থনীতিক' অর্থে, অর্থনীতি কখনোই ভিত্তি ছিল না। এমন কি আজও পর্যন্ত তা 'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি' (political economy) : উৎপাদন ও বণ্টন-পদ্ধতি সাধারণত রাজনীতি দিয়েই নির্ধারিত হয় এবং তা নিজেই এমন এক রাষ্ট্র-নীতির নির্ধারক যা বিরাট 'ওলিগোপলি'-র স্বার্থের (কোনো মতেই তাদের মধ্যে সর্বদা সংগতি থাকে না) অধীন। উৎপাদক ও ভোক্তাদের রাজনৈতিক মতামত ও অবস্থা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি একটি অর্থনৈতিক বিবেচ্য (factor) : এটি হচ্ছে বিনিময়প্রক্রিয়ার, শ্রমশক্তি ক্রয় ও বিক্রয়ের এবং পণ্যকে

বাজারজাত করার মধ্যগত একটি উপাদান। অফিসে, কারখানায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা করতে রাজনীতিতে অবশ্যই 'ঠিক থাকা' দরকার। রাজনৈতিক প্রচার ও সওদাগরি বিজ্ঞাপনে একটা জাতীয় মিল দেখা যায়। পুঁজিবাদের রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি 'মনস্তাত্ত্বিক অর্থনীতি'ও বটে : তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রয়োজন, এমন কি প্রবৃত্তিগত প্রয়োজনও, সৃষ্টি করে ও মেটায়। প্রয়োজনের ক্রমবর্ধিত পরিতৃপ্তির সঙ্গে মিলে প্রভুত্বের এই অন্তর্ভুক্তিই (introjection) বিষয়ীভবন, বস্তুসত্তারোপ ও শোষণ ইত্যাদি প্রত্যয়ের উপর সন্দেহের ছায়া ফেলছে। 'সমৃদ্ধ সমাজে'র সুবিধাভোগী কি নিজের বিষয়ীকৃত সত্তায় প্রকৃতপক্ষে নিজেকে 'পূরণ' করছে না? সে কি কার্যত আবার তার বিভিন্ন 'গ্যাজেট', মোটরগাড়ি ও টেলিভিশন সেটের মধ্যে নিজেকে পাচ্ছে না? অন্য পক্ষে, ভ্রান্ত আত্মময়তা কি বাস্তব অবস্থাকে হটিয়ে দিচ্ছে?

চতুর্থ প্রশ্ন : ১৯৬৫ সালের একটি নিবন্ধে আপনি এমন প্রতিপাদ্য রেখেছিলেন যে পুঁজিবাদ তার বিরোধকে (contradiction) 'নিয়ন্ত্রণযোগ্য অবস্থা'য় আনতে সক্ষম হয়েছে ; তা 'বিপ্লবী সম্ভাব্যতা'কে আত্মস্থ করেছে। এর অর্থ কি এই যে, নির্দিষ্ট অবস্থায় রাজনৈতিক ব্যবহার ও সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বকে মেলানো সম্ভব নয়? অর্থাৎ, যে-সমাজ জবরদস্তি ছাড়াই বিপ্লবের চিন্তা ও তার প্রয়োজনকে দমন করতে পেরেছে সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 'বৈপ্লবিক' শব্দটির অর্থ কী?

মার্কিউস : উন্নত পুঁজিবাদে বিরোধ নিয়ন্ত্রণের নিজস্ব একটা চলৎ-প্রক্রিয়া (dynamic) আছে, যার বিস্ফোরক শক্তি ভিয়েতনামে যুদ্ধপ্রসারে এবং ইয়োরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়ায় মার্কিন পুঁজির বিস্তারে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই প্রবণতার মধ্যে পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাতের বীজ দেখতে পাওয়া অর্থহীন সমস্বার্থের পাশাপাশি সমশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মিলিত হতে বাধ্য করে। তবে বিভিন্ন জাতির বিশেষ-বিশেষ স্বার্থ মার্কিন পুঁজির বিরোধিতায় ঝুঁকছে ; জাতীয় স্বাধীনতা আবার প্রগতিশীল কারণ হয়ে উঠছে। ক্রমবর্ধিত 'অটোমেশন'-সৃষ্ট বেকারির সঙ্গে মিলে মার্কিন পুঁজির পশ্চাদপসরণ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে পারে ; তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরোধী শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধতা নষ্ট করতে পারে। এটাও সম্ভব হতে পারে যে নব্য-ফ্যাসিবাদী ঝোঁক তখন জিতে যাবে এবং সংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান অংশটা তাদের অনুসরণ করবে বা নিরপেক্ষ থাকবে ; অবশ্য এমনও হতে পারে যে প্রতিপক্ষ বাড়বে ও নিজেদের সংগঠিত ক'রে তুলবে।

এ অবস্থায় মার্কিন যুবকদের বিরোধিতার রাজনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে। এই বিরোধিতা ভাবাদর্শের (ideology) ধার ধারে না, বা যে-কোনো ভাবাদর্শ (এমন কি সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শও) সম্পর্কেই তাদের তীব্র অবিশ্বাস ; তা

একাধারে যৌন, নৈতিক, রাজনৈতিক ও চিন্তাগত বিদ্রোহ। এই অর্থে তা সর্বাত্মক এবং সমগ্র সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই পরিচালিত ; তা 'সমৃদ্ধ সমাজে'র প্রতি বিতৃষ্ণা, প্রবঞ্চনায় ভরা ; এবং রক্তক্ষয়ী এক খেলার নিয়মকানুন ভাঙাই প্রধান প্রয়োজন—আর কোনো সহযোগিতা নয়। প্রচলিত প্রয়োজনের পদ্ধতি ও ক্রমবর্ধমান বস্তুসম্ভারকে যদি তরুণরা ঘৃণা করে তাহলে তার কারণ তারা দেখছে ও জানে, কী বিপুল বলি, কী নিষ্ঠুরতা ও নির্বুদ্ধিতা এই ব্যবস্থাকে প্রতিদিন জিইয়ে রাখছে। এই তরুণরা আর প্রভুত্বের আশীর্বাদ ও নিরাপত্তার অবদমিত প্রয়োজনের অংশভাক্ হচ্ছে না—তাদের মধ্যে সম্ভবত এক নতুন চেতনা জেগে উঠছে ; জীবন, সুখ ও বাস্তবের প্রতি আর এক সংস্কার নিয়ে এক নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে ; এমন এক স্বাধীনতার প্রতি তাদের মমতা যার সঙ্গে জড়গ্রস্ত সমাজে ব্যবহৃত স্বাধীনতার কোনো যোগ নেই, বা তারা চায় না তাদের কোনো যোগ থাক। সংক্ষেপে, এখানেই আছে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'স্থির নেতি' ('determinate negation'), যদিও তার কার্যকর সংগঠন নেই এবং মোক্ষম রাজনৈতিক চাপ তৈরি করতে তা অক্ষম। যে-শক্তি এই ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করছে, 'বাইরে থেকে' তার সঙ্গে মিলেই একমাত্র এমন বিরোধিতা নতুন অগ্রপথিক (*avant-garde*) হতে পারে ; বিচ্ছিন্ন থাকলে আপন প্রতিষেধকের (inoculation), ও ফলে, এই ব্যবস্থারই শিকার হবার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে।

DR. HERBERT MARCUSE-এর এই রচনাটির নাম *The Question of Revolution*। বলা বাহুল্য, এটি অনেক সাংবাদিকের চারটি প্রশ্নের জবাব। মূল জর্মন রচনার ইংরেজি অনুবাদ বেরিয়েছিল *The New Left Review* পত্রিকায়। অধ্যাপক মার্কিউস রচনাটির একটি 'কোটোস্ট্যাট্ কপি' এক্ষণের জন্য পাঠিয়েছেন। বঙ্গানুবাদ : অরুণ গুপ্ত।

হাওয়ার্ড সেলসাম

পরিবর্তনশীল জগৎ ও বিবর্তমান নৈতিকতা

আমাদের কালে পৃথিবীব্যাপী আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এক নৈতিক বিপ্লবও দেখা দিচ্ছে। ঔপনিবেশিক ও একদা-ঔপনিবেশিক জনসাধারণের বা অনগ্রসর ও বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত জাতি-সমূহের চাহিদার এটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ; কারণ, তারা শিল্পবিপ্লবের শিকার হয়েছে, কোনো সুফল ভোগ করে নি। পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ দেশে ধনতন্ত্রের অধীনে কখনও কোনো শিল্পবিপ্লব হয় নি ; আর, ঐ বাকি পঞ্চমাংশ বৈদ্যুতিক পরিগণক (computers) ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদি প্রচলনে গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব সমস্যার সম্মুখীন। পূর্বে কোনো নজির মেলে না এ-রকম হারে যন্ত্র মানুষের স্থান অধিকার করছে, অসংখ্য শ্রমিক কর্মহীন, অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। প্রথম শিল্পবিপ্লব সর্বোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কোথাও তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নি। এ-বিপ্লব উৎপাদনে এমন বিস্ময় সম্পাদন করেছে যা পূর্ববর্তী কোনো সমাজ কখনই দেখে নি, এবং মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সুন্দরভাবে তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। আবার এই দেশগুলিতেই শিল্পবিপ্লব দারিদ্র্য এবং স্থায়ী বা

পর্যায়ক্রমিক বেকারসমস্যা ও জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা এনে দিয়েছে। মানব জাতির অধিক অংশ খুব কমই উপকার পেয়েছে, যদি আদৌ পেয়ে থাকে ; এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও আমেরিকার কলকারখানার জন্য কাঁচামালের উৎপাদক হিসাবে নিত্য নতুন শোষণের বলি হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষের দিকে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস তাঁর *The Wonderful Century* গ্রন্থে লিখেছেন যে, মানব জাতির অগ্রগতির ইতিহাসে এই শতক যেমন এক অভূতপূর্ব জাগতিক ও মানসিক উন্নতি দেখেছে, তেমনি আগামী শতকও সেই অগ্রগতির ফল ভোগ করবে এক সমপরিমাণে নতুন ও অভূতপূর্ব নৈতিক এবং সামাজিক উত্থানে। ওয়ালেসের বিশ্বাস, উনিশ শতকের বিজ্ঞান ও শিল্পবিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব দেখা দেবে, যার ফলে মানুষের সামাজিক সম্পর্কে রূপান্তর দেখা দেবে, আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিস্তর উন্নতির ফলে উৎপাদকরাও লাভ করতে পারবে।

ধনতান্ত্রিক শিল্পবিপ্লব পশ্চিম ইয়োরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কিয়দংশে সীমাবদ্ধ ছিল। এ-বিপ্লব চায়ও নি যে পৃথিবীর অন্যত্র শিল্পোন্নয়ন বিস্তার লাভ করুক। এ ক্ষেত্রে, সামন্ততন্ত্র বেশ প্রয়োজনীয় ছিল, এবং উন্নত শিল্পজগৎ নানা রূপে তা গ্রহণ করে ও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে তা ব্যবহার করে। কিন্তু সমাজ-ও শিল্প-বিপ্লব মার্কসীয় তত্ত্বের ফল ও দুটি বিশ্বযুদ্ধের উপজাত হিসাবেই দেখা দেয় ; এবং দানিয়ুব থেকে চীন সাগর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এ-বিপ্লব এক সামাজিক আর্থনীতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তার ফলে, সামাজিক সম্পর্কের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায়, মানুষের আনুগত্যের প্রশ্নে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। আর, পৃথিবীর তৃতীয় এক অংশ ধনতন্ত্রে সমবর্তী না হয়ে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি বিভিন্ন রূপ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকে।

এ-লড়াইয়ে নানা নৈতিক মানের উদ্ভব হয় ও সেগুলি পরস্পরবিরোধী খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশই ধনতান্ত্রিকও নয়, সমাজবাদীও নয় ; তার বিস্তার ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরে যে-অর্থনীতি তার মাধ্যমে এক বা অন্য রূপের উপজাতি বা সম্প্রদায়বাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদ-প্রধান সামন্ততন্ত্রের মধ্যেই। তাছাড়া, পার্থক্য কেবল ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেই নয়, সমাজবাদী দুনিয়ার ভিতরেও ক্রমবিকাশের বেশ বড় রকমের পার্থক্য দেখা যায়। এই পরবর্তী পার্থক্যগুলি অবশ্য যে সব দেশ ও জনসাধারণ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত অধিকাংশ মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ও অবসরের ক্ষেত্রে উন্নতি করেছে এবং যে সব দেশে মুষ্টিমেয় লোক আলস্য ও বিলাসিতায় আর জনসাধারণ হীন দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতায় জীবন কাটায় তদনুপাতে যথেষ্ট কম।

বিবর্তমান নৈতিক ধারণা

এই বিবাদে নৈতিক মূল্যের গভীর পরিবর্তন হচ্ছে। নতুন নতুন নৈতিক দাবি উঠছে, পুরনো নৈতিক ধারণাগুলির নতুন সংজ্ঞা লেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো ও অন্যান্য জায়গায় রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ ছাড়াও সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকা জুড়ে সাধারণ মানুষ নতুন নতুন নৈতিক দাবি তুলছে, নতুন নৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করছে। বাস্তব ঘটনা যা হওয়া উচিত তা নয়, এ-কথা তারা কর্মে ও চিন্তায় প্রকাশ করছে। সমস্ত মানুষের জন্য তারা সমান অধিকার ও সুযোগ দাবি করছে; তারা চায় স্বাস্থ্য, ভদ্র বাসস্থান ও সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। তারা নিজেদের সংস্কৃতির উন্নয়ন দাবি করে; বিশ্বের সংস্কৃতি-সম্পদের অধিকারী হতে চায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম বিপুল জনসাধারণের মুখে নৈতিক অধিকার—মানব জাতির নৈতিক ঐতিহ্য—হিসাবে উন্নততর জীবনের দাবি শোনা যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের হারলেম কিংবা মিসিসিপিতে, অথবা ব্রাজিল, চিলি, কিউবা কিংবা সমগ্র আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যেখানেই হোক, সমস্ত সুযোগ-বঞ্চিত মানুষ আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দৌলতে মানবজাতি যে-সম্পদের অধিকারী তার অংশীদার হবার দাবি তুলেছে। 'স্বর্গে কোম্পানির কাগজ মিলবে' (হাইনরিখ হাইনে)—এ কথা বলে তাদের আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না; পৃথিবীর যা কিছু ভাল জিনিস তা ইহজীবনেই পাওয়ার জন্য তারা সক্রিয় ও কর্কশভাবে দাবি জানাচ্ছে। সারা পৃথিবীর মানুষ লোকায়ত বা অতিপ্রাকৃত যে-কোনো ধরনের নৈতিক ভণ্ডামির অবসান ঘটাচ্ছে। কোনো কিছুকে ভাল বলে বিশ্বাস করা মানেই তো তা চাওয়া, আর পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। আব্রাহাম লিংকন দাসত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'এমন কোনো ভাল জিনিসের কথা ভাবতে পার, যা কোনো মানুষ নিজের জন্য চায় না।' চাকরির অধিকার এবং জীবনে যা-কিছু কল্যাণকর তা সম্পাদন করা ও তাতে অংশগ্রহণ করার অধিকার আজ অসংখ্য মানুষের নৈতিক দাবি।

এঙ্গেলস বলেছিলেন, মানুষের উৎপাদনক্ষমতায় যা পাওয়া যায় নীতিশাস্ত্র কখনই তার চেয়ে উচ্চমার্গের কিছু হতে পারে না। উৎপাদনক্ষমতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যেমন প্রকৃতিকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করার এবং ক্রমাগত প্রয়োজনীয় ও বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ে, নীতিশাস্ত্রও তেমনি জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র, এবং বহুতর মানুষের জীবন জুড়ে উন্নতি লাভ করে। সতের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে ধনতন্ত্রের উত্থান ও তার অনুষঙ্গী শিল্পবিপ্লবে এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মেলে। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে এই পরিবর্তন আমাদের যুগের আগের পৃথিবীতে বৃহত্তম নৈতিক বিপ্লব নিয়ে এসেছে। সমসাময়িক

বিশ্বের নৈতিক অবস্থা বিচারের আগে এই বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করা দরকার। সে-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নৈতিক মূল্য সমাজের উৎপাদনক্ষমতা ও আর্থনীতিক সম্পর্ক অনুসারে পরিবর্তিত হয়, এবং এ-পরিবর্তন কখনও কখনও মৌলিক ও নাটকীয়ভাবে আসে। আমরা আরও দেখতে পাই যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে-সব নৈতিক মূল্য প্রাধান্য লাভ করে তা আর্থনীতিক শাসক-শ্রেণীই নির্ধারণ করে ; আর যে-শ্রেণী ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম ক'রে চলেছে তাদের মধ্যে বিকশিত মূল্যসমূহ থেকে এই নৈতিক মূল্যগুলি পরিষ্কারভাবে আলাদা।

সামন্ততান্ত্রিক নৈতিকতা থেকে ধনতান্ত্রিক নৈতিকতা

বস্তুত এক বদ্ধ কৃষি-অর্থনীতি ইয়োরোপীয় সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি। তালুকদারি ও ধর্মমঠের আর্থনীতিক সংগঠনও ছিল একই রকম, আর তার উপর নির্ভর ক'রে বহু লোকের অন্নসংস্থান হতো। তাদের প্রয়োজনীয় পোষাক, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি সব এখান থেকেই উৎপন্ন হতো। এই আর্থনীতিক কাঠামো জমিদার বা মঠাধ্যক্ষ থেকে শুরু ক'রে কৃষকপ্রজা (villein) ও ভূমিদাস (serf) পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে, শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই শ্রেণীগত সম্পর্ক থেকেই প্রচলিত উৎপাদনপদ্ধতি বোঝা যেত। ক্রীতদাস না হলেও কৃষকপ্রজা বা ভূমিদাস শ্রম ও বিভিন্ন প্রকার শর্তের বিনিময়ে জমি ভোগ করত। এইভাবে, নিম্নতম শ্রেণীর শ্রমিকের উপর ভিত্তি ক'রে এক শোষণের পিরামিড গড়ে ওঠে। নির্দিষ্ট কয়েকদিনের (এমন কি সপ্তাহে পাঁচ দিনের পর্যন্ত) শ্রম ও উৎপন্ন ফসলের এক নির্দিষ্ট অংশ জমিদারকে দিতে হতো ; এ-ছাড়া ছিল জমিদারের বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতাভোগের অধিকার—এইভাবেই শোষণের চেহারাটি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পেত। 'কৃষকপ্রজা' (villein) থেকে ব্যুৎপন্ন 'দুর্বৃত্ত' (villain) শব্দটি আজও সেদিনের স্মৃতি বহন করছে। এরা কোথাও কোথাও ভূমিদাসের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের হলেও ভূমি-নির্ভরই ছিল। যাই হোক, সামাজিক-আর্থনীতিক সম্পর্ক নির্দেশক একটি শব্দের এক অপমানসূচক অভিধায় পরিণতি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, অন্তত কিছু-কিছু পাপপুণ্যের সারার্থ ও উৎস শ্রেণীগত।

ধর্মের অনুশাসনমুক্ত বিষয়ী এবং ধর্মবিধি-অনুগত যাজক, এই উভয় শ্রেণীর শোষকই ভূমিদাসের শ্রমের উপর কর্তৃত্ব করার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। অবশ্য, ভূমিদাস যখনই নিজের মুক্তির জন্য বা অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতো, এরা তখনই সংঘবদ্ধ হতো। গির্জাগুলি সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ জমিদারদের উপর সার্বভৌমত্ব প্রচার করত। গির্জার অন্য-এক সম্প্রদায় একই পদ্ধতিতে কৃষকদের শোষণ করত। বস্তুত, সম্ভ্রান্ত যাজক ও অভিজাত ব্যক্তিরা প্রায়শই একই বংশের লোক হতো—জ্যেষ্ঠ পুত্রের ছিল ভূসম্পত্তি পরিচালনা ও পিতার উপাধি রক্ষা

করা, আর ক্ষমতা ও মর্যাদার আশায় তার অনুজের স্থান ঠিক করা ছিল গির্জায়।

সামন্ত শোষণের এই দ্বৈত-প্রণালী নৈতিকতার এক যুগল-প্রথায় প্রতিফলিত হয়েছে : গির্জার সরকারি নৈতিকতা ও ব্যারনদের প্রবর্তিত সাধারণ নৈতিকতা। 'বীরধর্ম' (chivalry) হল শেষোক্ত নৈতিকতার সারাংশ ; আর, অশ্বের এক প্রতিশব্দ থেকে এই শব্দের উৎপত্তি। যে একটি অশ্বের মালিক এবং আশা করা যায় যে সে অশ্বারোহী গোষ্ঠীর আচরণবিধি অনুযায়ী কাজ করবে, সে-ই তো বীরপুরুষ (chivalrous man)। এটি পরিষ্কার একটি শ্রেণীবিধি—যার ফলে উচ্চ 'অশ্বাসক্ত' শ্রেণীর প্রতি ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ, যারা পায়ে হেঁটে চলে (পদাতিক সৈন্য) তাদের প্রতি কর্তব্যবোধ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুলীন ব্যক্তিদের প্রতি ভদ্র আচরণ ও ইতর জনসাধারণের প্রতি রূঢ় ব্যবহার, রমণীদের রক্ষা করা ও কুমারীদের সঙ্গে 'ফুলশয্যার অধিকার' ভোগ করা ছিল নাইটদের কর্তব্য। সামন্ত রোমান্স কাহিনী ও মধ্যযুগের গীতিকবিতায় বর্বর, বিষয়ী, প্রণয়াভিলাষী, ধনলোভী, অমিতব্যয়ী ও মুক্ত-হস্ত (কারণ এদের অধিকৃত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই) মান্যগণ্য সামন্ত ভূমিদার ও তাদের প্রবর্তিত নীতি-সংহিতার মূল তথ্যগুলির সন্ধান মেলে।

অগাস্টিন থেকে এ্যাকুইনাসের সময় পর্যন্ত গির্জা-প্রবর্তিত নৈতিকতার খুব কমই পরিবর্তন হয়েছে। সে-যুগের নৈতিক অনুশাসন পড়লে খুব সামান্যই ধারণা করা যায় যে সেকালের মানুষ কী রকম ছিল, কী ধরনের সমাজেই বা তারা বাস করত। এক শ্রেণীর প্রাথমিক ব্যবসায়ীর আবির্ভাব নিশ্চিতভাবে তেজারতি নিষিদ্ধকরণে প্রতিফলিত হয়, যা জমি ও ভূমিদাসের মালিক অথচ নগদ রোজগার-হীন ভূসম্পত্তি-অধিকারী অভিজাতবর্গের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রচলিত ঈশ্বরতত্ত্বে দেবকুলের এক পর্যায়ক্রমিক জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে সমস্ত গুণাবলি পদমর্যাদা অনুসারে উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। এ-জাতীয় বিশ্বদৃষ্টিতে সামাজিক স্তরবিভাগ, পরাধীনতা ও সামন্ত কৃষকপ্রথার এক কুশলী সমর্থন মেলে। ব্যারনদের মতো, যাজকদের নীতিশাস্ত্রও ছিল এক প্রভাব-শালী শ্রেণী-নৈতিকতা। ভূমিদাসের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বলা আছে সরকারি-ভাবে গ্রাহ্য এ-রকম কোনো সংহিতা খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। ভূমিদাসের একটিমাত্র গুণ ছিল : কাজ করা, আর উপরওয়ালার বা মনিবের হুকুম তামিল করা। তার প্রয়োজন ও ইচ্ছার কোনো মূল্যই ছিল না, থাকতেও পারে না, কারণ, তার জীবনেরই বা মূল্য কতটুকু ছিল।

সে-সব দিনের পর মানুষ দীর্ঘ বিবর্তনের যুগ ও অনেক বিপ্লব পেরিয়ে এসেছে। আধুনিক যুগের শুরুতে ধর্মীয় সংস্কারসাধন ও রাজনৈতিক বিপ্লবের রক্তাক্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সামন্তব্যবস্থা ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এতে নতুন

শাসকশ্রেণীর স্বাধীনতা অনেক বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারি ও বণিকশ্রেণীর এবং ক্রমে উৎপাদকদের স্বাধীনতা বাড়ে ; জমিদার ও যাজকদের স্বাধীনতা খর্ব হয়। তারা উপশুল্ক, বিনামূল্যে শ্রম আদায়, ন্যায়বিচারকে পণ্যে পরিণত করা, 'ফুলশয্যার অধিকার' ভোগ ইত্যাদি পবিত্র অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ভূমিদাসদের উপর উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর এইসব নতুন নতুন স্বাধীনতা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কেউ কেউ, বিশেষ ক'রে হল্যাণ্ডে, স্বনির্ভর চাষীতে রূপান্তরিত হয়। অন্যেরা রায়ত চাষী হিসাবে থেকে যায়। কিন্তু, যে-জমিটুকু অন্তত সামন্ততন্ত্রের শেষ অবদান হিসাবে কৃষকরা পেয়েছিল, ধনতন্ত্রে রূপান্তরের ফলে সেটুকু থেকেও তাদের অনেকে বঞ্চিত হয়। এইসব ভবঘুরে কৃষকরা ধরা পড়লেই মার্কামারা হয়ে যেত, নয়তো ফাঁসিকাঠে ঝুলত ; আর ধরা না পড়লে তাদের না খেয়ে মরতে হতো।

এইসব বিধিসম্মত ও আর্থনীতিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির স্থান বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থাৎ সমাজের নতুন প্রভাবশালী শ্রেণীর নৈতিকতাও যায় বদলে। যে-আনুগত্যবোধে সামন্ত উৎপাদনপদ্ধতির সংগঠন ও সামন্ত বাধ্য-বাধকতার প্রকাশ, ঈশ্বরভীতিজনিত সততা ও আইন-নিষ্ঠা তার স্থান দখল করে। সাহস ও বীরত্বের স্থান নেয় যথানুবর্তিতা (exactness), সঞ্চয়, কূটনীতি ইত্যাদি গুণাবলি। সামন্ত আইন ও ঈশ্বরতত্ত্বে যে তেজারতিব্যবস্থা নিষিদ্ধ ছিল, বণিক সভ্যতায় তা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধিগত অনুসন্ধিৎসা ও আত্মবিশ্বাস আর মহাপাপ নয়, প্রশংসনীয় গুণে পরিণত হয়। দ্রুত সম্প্রসারী বাণিজ্যিক ও উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতির প্রয়োজনে, বিজ্ঞান নতুন অর্থনীতির কাছ থেকে প্রকৃতির উপর তার প্রভুত্ব করার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এক সম্পূর্ণ নতুন ও অভূতপূর্ব প্রেরণা পায়।

এই নতুন সমাজে এক নতুন ধরনের মানুষেরও প্রয়োজন ছিল ; একজন শিক্ষানবিশ বা কারখানার শ্রমিক হিসাবে ভূমিদাস যা করতে পারত, ব্যবসায়ী হিসাবে একজন সার গালাহাড্ বা একজন পার্সিফাল তার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে-ধরনের চরিত্রের প্রয়োজন ছিল, নতুন উৎপাদনপদ্ধতির ভিত্তিতে রচিত নতুন নীতিবিদ্যা অনুসারে তার সংজ্ঞা নির্ধারিত হতো। নৈতিকতার ভিত্তিটি তত্ত্বগতভাবে অন্য জগতে হলেও ইহজগতেই নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া মানুষের কর্তব্য ছিল। অন্যজগত-সম্পর্কিত ধারণায়ও এক গভীর পরিবর্তন আসে – পর্যায়ক্রমিক দেবদূতকুলের পরিবর্তে এক সর্বোচ্চ পরম-শাসক ও আইনকর্তা আছেন, (এ-পরিবর্তন সমাজ ও বিজ্ঞান উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক) যাঁর সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের কোনো মধ্যস্থ ছাড়াই সরাসরি যোগাযোগ। এই স্বর্গীয় দেবদূতকুলের অবসান, বণিক-মহাজন ও উৎপাদক গোষ্ঠীর পার্থিব যাজককুলের – সামন্তব্যবস্থার বদ্ধ-অর্থনীতিভিত্তিক

সম্পত্তি-সম্পর্কের মধ্যে যার মূল নিহিত—বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক প্রতিফলন মাত্র। মানুষের স্বাধীনতার কাছে—ধর্মে, চিন্তায় ও বাণিজ্যে স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা—আবেদন ক'রে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের লক্ষ পরিশুদ্ধ ক'রে নেয়। এবং প্রকৃতপক্ষে এরা মানব জাতির এক বৃহত্তর গোষ্ঠীর কাছে বাস্তব হিত ও ব্যক্তিগত সুযোগ এনে দেয়, যা সামন্তপ্রথা কখনও পারে নি। অগ্রগতির পথে কখনও কখনও সাংঘাতিকভাবে জীবনের বিনিময়ে হলেও, এই বুর্জোয়াশ্রেণী জীবন-বিষয়ে প্রকৃত উন্নতিসাধন করে বলেই এ-উন্নয়ন সম্ভব হয় জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে সমাজে এরা অনেক যোগ্য সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরনো প্রথার সমর্থকরা নতুন নীতিশাস্ত্রকে আত্মকেন্দ্রিক ও নৈরাজ্যতন্ত্রী বলে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করলেও তা প্রাধান্য লাভ করে, কারণ সমাজে নতুন আর্থ-নীতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃত্ব করতে থাকে। ক্রমে এক নতুন ধরনের মানুষের আবির্ভাব হয়, নতুন নতুন কথা ও নৈতিকতার মান প্রচলিত হয়, যা আজও বেশ প্রভাবশালী ধারণা হিসাবে থেকে গেছে। এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই, এগুলি এক উদীয়মান ক্ষমতাশালী শ্রেণীর ভাবাদর্শ হিসাবে প্রকাশিত হয় নি, হয়েছে সর্বত্র সর্ব-মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এক সঠিক ও চিরন্তন সত্য হিসাবে, বিশ্বজনীন মান হিসাবে।

বুর্জোয়াশ্রেণী 'স্বাধীনতা'র জিগির তোলে আর, বিপ্লবের সুদিনে এর দ্বারা বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের কথাই বোঝায় ইচ্ছামতো জমি ও মাল কেনাবেচার স্বাধীনতা, গ্রামে অথবা শহরে বাস করার স্বাধীনতা, শ্রমিকের পছন্দমতো জায়গায় কাজ করার স্বাধীনতা, এবং কেবলমাত্র ক্রেতা ও বিক্রেতা-নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সর্বত্র বা যেখানে খুশি ব্যবসা করার স্বাধীনতা। সর্বোপরি, ইচ্ছা অনুসারে সম্পত্তি অর্জন, ব্যবহার বা হস্তান্তর করার স্বাধীনতা। যেমন, মার্কিন ঔপনিবেশিক জেম্‌স ওটিস মনে করেন যে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির বিধান এবং ব্রিটিশ সংবিধানের ভিত্তিতেই 'যে কোনো মানুষ নির্বিবাদে স্বীয় সম্পত্তি ভোগ করবে, এবং নিষ্পত্তির একাধিকারী হয়ে থাকবে।' প্রতিনিধিমূলক সরকারের দ্বারাই সম্পত্তি সংরক্ষণ সবচেয়ে নিরাপদ মনে করা হয়; এবং এইভাবেই ব্যক্তি-সম্পত্তির অবাধ বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে, ও প্রয়োজন অনুসারে, গণতান্ত্রিক অধিকার বিকাশ লাভ করে।

ধনতান্ত্রিক নৈতিকতা

মধ্যযুগের যাজক-শাসনে খর্বিত, অতি-সংযত জীবনধারার বিপরীত, এই প্রথায় ব্যক্তিমানুষের যে 'স্বাধীনতা' তার একটি নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। এ-কাজ সম্পাদনে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের উৎকর্ষ এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

লুথার ও অন্যান্য সংস্কারকরা আবিষ্কার করলেন যে যাজক সম্প্রদায়ের মুক্তির প্রয়োজন নেই, কেননা ব্যক্তিমানুষের নিজের যুক্তি ও বিবেক অনুসারে তার ইহজগতের নৈতিক জীবন ও পরলোকে মুক্তির উপায় জানা আছে। এইভাবে ব্যক্তিমানুষের বিবেক-নির্ভর বুর্জোয়া ধর্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে, আর নীতিবাদীরা আশ্বাস দেন যে আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজেদের 'অন্তরের আলো' অনুসরণ ক'রে চলি তাহলেই সমাজের কল্যাণ হবে। বিশেষ ক'রে কোএকারররা এই মতের সমর্থক ছিলেন। ইমানুয়েল কাণ্ট এই মতের দার্শনিক রূপ-ব্যাখ্যা ক'রে বললেন যে, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষেরই একটি অন্তরাত্মার নৈতিক অনুশাসন আছে, যার প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে প্রধান কর্তব্য, আর বস্তুত, এটিই যে-কোনো ধরনের আনুগত্যের ভিত্তি। এইভাবে বুর্জোয়া নীতিবাদীরা তাদের শ্রমলব্ধ-স্বাধীনতা সমর্থনের এবং একমাত্র এটিই যে সর্বোচ্চ সমাজকল্যাণের সহায়ক, বিরোধীদের অভিযোগ অনুযায়ী নৈরাজ্যতন্ত্রী বা প্রকৃত ধর্মের পক্ষে ধ্বংসাত্মক নয়, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

এইভাবেই, শত শত বছর ধরে, নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন নৈতিকতার উদ্ভব হয়, এবং সেই ব্যবস্থার সমর্থনে চিরন্তন সত্যের উপর এক অধিকার স্থাপিত হয়। আমাদের অনুকূল অবস্থা থেকে এটি সহজেই বোঝা যায় যে, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ—আইনগত অধিকার-সম্বলিত দলিলের গণ্ডির মধ্যে বিচ্ছিন্ন, এবং সামাজিক দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত, যা সামন্ত জমিদার ও ভূ-সম্পত্তিবিশিষ্ট ভদ্রলোকদের স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল—ও তার সম্পত্তির ভিত্তিতেই এই নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। এইসব বিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যশালী লোকেরা বুর্জোয়া স্বাধীনতায় সমৃদ্ধ হয় : তেজারতি, অবাধ চলাফেরা ও বাণিজ্য, এবং চুক্তিনামা তৈরি ও তা কার্যকর করার স্বাধীনতা।

সেকালে বুর্জোয়া আদর্শ-নীতির ভিত্তিস্থাপনে কাণ্টের প্রয়াস অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিল। পরবর্তী যুগে বেনজামিন ফ্রাংকলিন এই নীতির পূর্ণতর বাস্তব বিকাশ সাধন করলেন। এবং তিনিই এই নীতির প্রধান জননেতা হয়ে উঠলেন। ফ্রাংকলিনের ভিতর বুর্জোয়া মানুষের প্রয়াস ও মনোবৃত্তির বৃহত্তর সমন্বয় ঘটেছিল। ব্যক্তিমানুষের আত্মবিশ্বাস, বাস্তব কূটনীতি, প্রকাশ্য সহৃদয়তা, অবাধ বাণিজ্য-বিধির উদার অনুশীলন, এবং তার সর্বাত্মক সাফল্যের আদর্শ প্রভৃতির সমন্বয়ে চিন্তায় ও কর্মে তিনিই হলেন এই নীতির পূর্ণবিকাশ।

ফ্রাংকলিন দেখেছিলেন যে মানবকল্যাণের জন্য এই পৃথিবী সুপরিকল্পিতভাবে গঠিত, এবং মানুষ শুধু কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চললেই সে-সাফল্য লাভ করতে পারে। চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনে মিতব্যয়িতা, শ্রম, সততা ও যথানুবর্তিতাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, যা অনুসরণ করলে যে-কোনো দরিদ্র যুবকও পৃথিবীতে তার সংগতি ক'রে নিতে পারে। এই নিয়ম পালনে বিচ্যুতি ঘটলেই দারিদ্র্য, বাণিজ্যে

ব্যর্থতা ইত্যাদি অশুভ বিষয়ের উৎপত্তি হয়, আবার তার প্রতিবিধানও হয় কেবল এইসব গুণাবলির ব্যাপক অনুশীলনেই। ফ্রাংকলিন-প্রবর্তিত ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর কিন্তু মিতব্যয়িতা, যেহেতু মিতব্যয়িতা মানেই অর্থসঞ্চয়। আর এই অর্থের দুটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে। অল্প টাকা ধার নিলে মহাজনকে তার মূলধনের অনেকগুণ বেশি সুদ দিতে হয় (যার ফলে সে আরও টাকার মালিক হতে পারে) অথবা মোটা টাকা সুদে বসালেও সে প্রভূত টাকা আয় করতে পারে। ধার দেওয়া বা নেওয়ায়, যেভাবেই হোক, ফ্রাংকলিনের মতে, অর্থের 'উৎপাদিকা শক্তি অপরিমেয়'। অর্থ থেকেই অর্থের উৎপত্তি, এবং তার উপস্বত্ব থেকে মহাগৌরবে এক অবাধ প্রক্রিয়ায় আরও অর্থাগম হয়। 'যার আছে তাকেই দেওয়া হবে'—এই প্রবচনই ফ্রাংকলিনের কাছে একাধারে মূল নৈতিক সত্য এবং স্বাভাবিক আর্থনীতিক নিয়ম।

ধনতন্ত্রের তত্ত্ববিদ্ হিসাবে অন্যেরা হয়তো অনেক বড় হতে পারে, কিন্তু এত উদ্যমের সঙ্গে তার সারমর্ম উদ্‌ঘাটন করার ব্যাপারে ফ্রাংকলিনের মতো দ্বিতীয় কোনো লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই অবাধ চলাফেরা ও ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসায়ের জগৎ এক সম্পূর্ণ নতুন, মহান ব্যাপার। এখানে শ্রেণী-নির্বিশেষে যে কোনো সক্ষম ছেলে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ ক'রে চললেই সফল হতে পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ফ্রাংকলিন ও আরও কয়েকজন এটিকে এক বিচক্ষণ দূরদর্শিতা ও তত্ত্বাবধানের ফল হিসাবে দেখেন ও এর নিয়মাবলিকে চিরন্তন নৈতিক নিয়ম বলে মনে করেন।

ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার সম্পদের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের বিরোধ, শিল্পকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান দুঃখকষ্টের মধ্যে সীমাহীন উৎপাদন বৃদ্ধির বিরোধ, সমাজ সম্পর্কে সংবেদনশীল মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তবুও ধনতন্ত্রের যথেষ্ট প্রাণ ছিল, এবং যদিও ফ্রাংকলিনের মতবাদ খুব দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না (a god with the feet of clay), পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু লোক তাঁর চিন্তাধারা থেকে প্রেরণা পায়। কারণ, ধনতন্ত্র তখনও উৎপাদন-শক্তি উন্নয়ন করতে পারত, আর পূর্বতন যে-কোনো সমাজব্যবস্থায় যে-সব যুবকদের ভাগ্য পূর্বপুরুষদের মতো বদ্ধ জীবনের সংকীর্ণ চক্রে আবর্তিত হতো, তাদের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার রাস্তা খুলে দিতে পারত। ধনতান্ত্রিক অর্থ-নীতির অগ্রগতির এই পর্ব সম্ভবত অন্য জায়গার চেয়ে আমেরিকায় বেশিদিন স্থায়ী ছিল, কিন্তু আজ তা এক অপসৃয়মান স্বপ্ন মাত্র। আর ফ্রাংকলিনের কথাগুলিও মনে হয় ভণ্ডামি, অথবা—ফ্রাংকলিনের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে যা সংগতি-পূর্ণ—দৃঢ়তর ভিত্তির উপর এক নতুন সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন, ভালভাবে বেঁচে থাকার এক নতুন আদর্শ ও নতুন আচরণবিধি-সম্বলিত নতুন নীতিশাস্ত্র।

ধনতান্ত্রিক নৈতিকতার অবসান

উদীয়মান ধনতন্ত্রের নৈতিকতা প্রতিশ্রুতি মতো যদি কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়েও থাকে, আজ তা অবসিত। শতাধিক বছর আগে আমেরিকান লেখক হেনরি ডেভিড থ্রোকে মাসাচুসেট্স-এর এক জেলার একটি মেলায় মস্ত মেদবহুল, পুরস্কারপ্রাপ্ত এক শূকর দেখান হয়। তিনি সেই জন্তুটির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : 'তুমি বলতে পার না যে মিতব্যয়িতা ও শ্রমের বলেই তুমি এই অবস্থায় পৌঁছেছ।' সততা ও নিষ্ঠার কথা বলাই বাহুল্য, মিতব্যয়িতা ও শ্রম আর সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত করতে পারে না। উলওঅর্থ 'ফাইভ এণ্ড টেন'-এ খ্রীস্টের জন্মের সময় থেকে একটি মেয়ে উলওঅর্থ-নির্ধারিত মজুরিতে বছরের প্রতিদিন কাজ করত এবং যা আয় করত তার প্রতিটি পাই সঞ্চয় করত ; যদিও কোনো সুদ পেত না। তবু সে বারবার হাটনের – যে জীবনে একদিনের জন্যও কোনো কাজ করে নি – দোকানদার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সামান্য, তুচ্ছ এক অংশের অধিকারী হতে পারত।

'অবাধ বাণিজ্য' একদা এক প্রেরণাসঞ্চারী ও প্রগতিশীল আদর্শ ছিল, কিন্তু এখন মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী লক্ষপতি বা কোটিপতির ব্যাপারিক সংভারে (stock-in-trade) পরিণত ; এবং আর্থনীতিক পদ্ধতির, ও সেই কারণেই সমগ্র 'মুক্ত পৃথিবী'র জীবনের, উপর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার এটি তাদের এক আদর্শগত অস্ত্র। এখন এক নতুন নীতিশাস্ত্র ও নতুন নৈতিকতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কারণ পুরনো নীতির অর্থ ও উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের রীতি ও ঐতিহ্য থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা এইসব ধনতান্ত্রিক নীতিসমূহ এখন মৃদু-মজিরধ্বনির মতো শোনায়, জনজীবনে এগুলির আর কোনো প্রভাবই নেই। শুধু মালিকদের লাভের অঙ্ক বাড়ানোর জন্য যে-সব মানুষকে কাজে নিযুক্ত করা হয়, সেইসব ভাড়াটে মানুষদের আর এ-সব নীতি কিছুই দিতে পারে না। পূর্ণ বোধ-কল্যাণের প্রচেষ্টায় সমস্ত মানুষকে সংহত করার পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক নৈতিকতা আজ 'মুক্ত পৃথিবী'র এক দলগত সংকেত-শব্দ মাত্র।

নৈতিকতার দ্বন্দ্ব

দুই পৃথিবীর ও দুই নৈতিকতার মধ্যে এখন দ্বন্দ্ব চলছে, যেমন চলেছিল সামন্ত-তন্ত্রের অবসানের সময়। কর্তব্যপরায়ণতার কথা বলে ও নরককুণ্ডের ভয় দেখিয়ে (তার সঙ্গে ছিল রোমান ক্যাথলিক যাজকদের বিচারসভার অত্যাচার) প্রতিক্রিয়া তখন ভয়ঙ্কর রোধ করে। আর আজ 'ব্যক্তিমানুষের পবিত্রতা'র সঙ্গে যুদ্ধ ও পারমাণবিক বোমার ভয় দেখিয়ে ধনতন্ত্র প্রগতিশীল পৃথিবীর সামনে এক চ্যালেন্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জীবনের শাদতিত্তি (roost) আর ধনতন্ত্রের

শাসনাধীন নয়। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথবা হচ্ছে। ধনতন্ত্রের মতো সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বও গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের মাধ্যমে, এবং, যেমন ধনতন্ত্রের ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়া-শক্তি এর গতিও রোধ করতে পারে নি। এখন জনসাধারণের আনুগত্যের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ ক'রে 'নিরপেক্ষ' দেশগুলিতে, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি, বিজ্ঞান, নৈতিকতা, সমস্ত বিষয়ে এই দুই তন্ত্রের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা চলছে। প্রধানত এই বিবাদের ফলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নতুন নতুন প্রশ্ন তুলছে আর তার নতুন নতুন উত্তর খুঁজছে। কিন্তু গ্যেটে যেমন একদা বলেছিলেন, 'কাজ দিয়েই তো শুরু', তেমনি এইসব প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্ধানের পশ্চাতে আছে বাস্তব জীবনের অবস্থা-প্রসূত সক্রিয়তা।

আজ সমাজতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণ, ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকরা ও সদ্য-স্বাধীন উপনিবেশের অধিবাসীদের কর্মোদ্যোগের জন্য অধিকার, বিচার, স্বাধীনতা ও কল্যাণের নীতিগত ধারণার নতুন ক'রে সংজ্ঞা নির্ধারিত হচ্ছে। ১৯৬৪ সালের বসন্তকালে প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন যখন যাজকদের এক সভায় বললেন যে 'ন্যায়পরতা ও নৈতিকতার দাবিতে' পৌর অধিকার বিলটিকে 'আইনে পরিণত করা হবে,' তখন, তিনি প্রকৃতই যা বলতে চান, হয় তার চেয়ে বেশি, নয় কিছু কম বলেছিলেন। 'ন্যায়পরতা ও নৈতিকতা' যদি এ-দাবি তুলে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেগুলির মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, না হলে আইন প্রণয়ন বহু বহু আগেই হয়ে যেত। না! আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, নিগ্রো জাতি ও তাদের মণ্টগোমারি-আলাবামা-বাস বয়কট, পাল্টা অবস্থান-ধর্মঘট ও পৃথক বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন থেকে শুরু ক'রে ভোটার তালিকাভুক্তকরণের প্রচারে বীরোচিত সংগ্রামের ফলে এই 'ন্যায়পরতা ও নৈতিকতা'র উৎপত্তি। আর এর জন্যই আমেরিকার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায় এ-রকম যে-কোনো রাজ-নৈতিক দলের পক্ষেই জাতিগত বৈষম্য ও পক্ষপাতের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

'ন্যায়পরতা ও নৈতিকতার' ধারণা সাধারণ মানুষই সৃষ্টি করে; এবং আজ পৃথিবীর পীড়িত ও শোষিত জনসাধারণ এক অভূতপূর্ব হারে তা ক'রে চলেছে। তারা সসম্মানে, ভদ্র জীবনযাপনের সংস্থান চায়, এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলে যে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে সে-বিষয়েও তারা যথেষ্ট সচেতন। পৃথিবীর উৎপন্নের এক ন্যায্য অংশের তারা দাবিদার। স্বাস্থ্য ও পরমাণু, শিক্ষা, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকার তারা দাবি করছে। তারা শোষণ করতে চায় না, শোষিত হতে চায় না; পরশ্রমজীবী হয়ে থাকতে চায় না, অথবা অন্যেরা তাদের শ্রমের উপর বেঁচে থাকবে তা-ও তারা চায় না। যুগ যুগ ধরে উপজাতি সর্দার বা সামন্ত জমিদারের অধীনে শোষিত হয়ে এবং প্রায় একশো বছর সাম্রাজ্যবাদী

শাসনাধীন থেকে মানুষের দ্বারা মানুষের, এক শ্রেণীর দ্বারা আর এক শ্রেণীর, এক জাতির দ্বারা আর এক জাতির বিভিন্ন ধরনের শোষণকে তারা ঘৃণা করতে শিখেছে। আজ পৃথিবী জুড়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলেছে – দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়, আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায় ও বস্তুত সমগ্র লাতিন আমেরিকায় যার পরিচয় পাওয়া যায় – তা থেকে নৈতিক অগ্রগতির নিদর্শন, প্রকৃত সর্ব-মানবিক নৈতিকতার যেন এক গর্ভযন্ত্রণা, স্পষ্ট ফুটে ওঠে। সরকারিভাবে ক্রীতদাসপ্রথা লুপ্ত হওয়ার পরের একশো বছরে পৃথিবী প্রচুর উন্নত হয়েছে। জনসাধারণকে আর ক্রীতদাস না হয়ে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় না ; কিন্তু উচ্চস্তরের ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য তাদের এখনও সংগ্রাম করতেই হবে। তারা এখন সংগ্রাম করছে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, যাদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানের অধিকার আছে, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য আধুনিক উৎপাদন-যন্ত্রাদির ব্যবহার ও সুফল ভোগের অধিকার আছে।

'যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবে ; আর, যার নেই, এমন কি যতটুকু আছে, তার কাছ থেকে সব নিয়ে নেওয়া হবে' (মথি ২৫ ; ২৯-৩০) : ক্রমবর্ধমান নৈতিক চেতনা বাইবেলের প্যারাবল অব্ ট্যালেণ্ট-এর এ-নীতিকথা অস্বীকার করে। সাধারণ মানুষ আর ধর্মপ্রচারকের উপদেশাত্মক ভর্ৎসনা শুনতে রাজি নয় যে, এই রূপক-কাহিনীতে 'জীবনের সবচেয়ে বড় এবং সম্ভবত সবচেয়ে বেদনাদায়ক দাঁধা – ইহজীবন ও মরণোত্তর কালে সর্বজীবের অসমতা'-র ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে। (পল টিলিচ্, ইউনিয়ন থিঅলজিকাল সেমিনারি, মার্চ ১৬, ১৯৫৮)। আজ আমরা মিসিসিপি থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা, বলিভিয়া থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, সর্বত্র এ-জাতীয় অসাম্য-নীতির, বিশেষ ক'রে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এর যে-রূপটি প্রকাশিত, অবসান দেখতে পাচ্ছি। এবং স্বভাবতই, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির চেয়ে উপনিবেশ-জগতেই এটি বেশি তীব্রভাবে চোখে পড়ে।

লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার জনসাধারণ, যারা প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্য-বাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে অথবা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে, 'অবাধ উদ্যোগ', 'প্রয়োজক অর্থনীতি' বা 'জনগণের ধনতন্ত্র' ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক স্লোগানকে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আদর্শ-বহ বলে মানে না। আমাদের ব্যবস্থাকে আমাদের অধিকাংশের চেয়েই তারা অনেক পরিষ্কারভাবে বোঝে। তারা মনে করে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য, সংক্ষিপ্ত জীবন ব্যাপকভাবে মানুষের কল্যাণার্থে তার বিরাট উৎপাদনক্ষমতার ব্যবহারে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

মানব জাতির আয়ত্তাধীন উদারতম নৈতিক আদর্শের জন্য সমস্ত মানুষ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। আর, এটি অবশ্য সম্ভবও হয়েছে শুধু ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের অভাবনীয় উন্নতি ও তার সৃষ্ট এক বিশ্ববাজারের জন্য। নিহিত যোগ্যতাকে বাস্তবে রূপায়িত

করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি অনুসারে, প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি শিশুর, সর্বাধিক সুযোগলাভের স্বাধীনতার এটি হল আদর্শ বা অভিপ্রায়, কল্পনা ও দাবি। এইসব আদর্শ পূর্বতন সমস্ত নৈতিক তত্ত্বকে, কনফুসিয়সের সুবর্ণ শাসন (Golden Rule) থেকে শুরু ক'রে যিশুর 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো ক'রে ভালবাস' – নীতি ও কাণ্টের নির্বিকল্প অনুশাসন (Categorical Imperative) পর্যন্ত, খর্ব ক'রে দেয়।

মার্কিন ও ফরাসি বিপ্লবসমূহের বড় বড় স্লোগানগুলিকে – 'বাঁচার, স্বাধীনতার, ও সুখ-অনুসন্ধানের অধিকার' এবং 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব' – এখন বাস্তব অর্থ দেওয়া হচ্ছে, মানবিক পোষাক পরানো হচ্ছে। বিশ্ব-শান্তি, জাতিগত ও ও জাতীয় সাম্য, সমস্ত জাতির শিল্পায়ন, – কর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভদ্র বাসস্থানের অধিকার – এগুলি আর সুখ-কল্পনার বিষয় নয়। এগুলি দাবি ও লক্ষ, যা না হলে অগ্রগতিও হবে না, মানব জাতির স্থায়ী অস্তিত্বও থাকবে না। নীতিবাদীদের কল্পনা থেকে নয়, জীবনের বাস্তব ঘটনা ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই এগুলির উৎপত্তি।

রবার্ট হেইলব্রোনার তাঁর *The Future as History* গ্রন্থে বলেছেন: 'আমাদের যুগের ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব ও প্রায়শই পাশবিক সংঘাত অগ্রগতির দিক্-নির্দেশ করে। কেবল পাশ্চাত্য [ধনতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ, যা-ই বলুন] আর এইসব শক্তির অগ্রদূত হয়, বরং লক্ষ্যস্থল।' পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে ধ্বংস না ক'রে আর এ-জাতীয় আন্দোলনকে, কিছু বিক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে ছাড়া, ক্ষমতা দিয়ে দমন করা যাবে না। পৃথিবী এমন একটি জায়গায় এসে পৌছেছে যে উন্নততর মানব জীবনের দাবির একমাত্র উত্তর প্রকৃত উন্নততর মানব জীবন।

আলফ্রেড লর্ড টেনিসনের রচনার প্রায়শ-উল্লিখিত ছত্র, 'অতিদূর এক স্বর্গীয় সত্তার দিকে বিশ্ব-নিখিলের গতি', ইতিহাসের প্রভাব এবং মানুষের কর্মের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে নীতিধর্মের সর্বসত্তার এই রূপ পরিগ্রহ করেছে যে: শুধু তা-ই কল্যাণময় যার দ্বারা মানুষ জীবনে উন্নত স্তরে পৌছতে পারে, এবং এমন সম্পদের অধিকারী হয় যা ব্যক্তিবিশেষকে আহুতি না দিয়ে সকলে ভোগ করতে পারে। আজকের মানুষের মনে এই লক্ষ তেমন সুদূর নয়, যেমন টেনিসন মনে করেছিলেন, এবং ঐশ্বরিক তো নয়ই। অসংখ্য মানুষের মনে এখন এই প্রতীতিই জন্মাচ্ছে যে মানুষ স্বয়ং-পূর্ণ (end in himself)। একটি সাধারণ সর্বজনীন বিশ্ব-নৈতিকতা আজ আর্থনীতিকভাবে সংহত হতে বাধ্য এক পৃথিবীর নৈতিক আদর্শে পরিণত হচ্ছে।

MR. HOWARD SELSAM তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ *Ethics and Progress* (International Publishers, New York) এক্ষণের জন্য পাঠিয়ে যে-কোনো অংশ অনুবাদের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর ২০. ৫. ৬৮ তারিখের পত্রে উক্ত গ্রন্থের *Changing Ethics in a Changing World* অধ্যায়টি বিশেষভাবে এক্ষণে অনুবাদের নির্দেশ দেন। অনুবাদ: সোমেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

পত্রিকার কথা

১৩৭৫-এর শারদীয় এক্ষণ প্রকাশিত হল।

এক্ষণের কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যাটির কাজ শেষ হয়ে শারদীয় সংখ্যার প্রস্তুতিতে সময় খুবই সামান্য পাওয়া গেছে। তাই প্রতিশ্রুত সব লেখা এ-সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হল না; আয়তনও গত বছরের তুলনায় ছোট হল।

পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে নভেম্বরে। উক্ত সংখ্যায় অনেকগুলি মূল্যবান রচনা প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাচ্ছে।

এক্ষণের বহুপ্রতীক্ষিত কার্ল মার্কস সংখ্যা এখন নিঃশেষিত। উক্ত বিশেষ সংখ্যাটির একটি বোর্ড-বাঁধাই সংস্করণ অক্টোবরের শেষে প্রকাশিত হবে। যাঁরা সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অবিলম্বে নিকটবর্তী স্টলে অথবা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এক্ষণের সমস্ত সহযোগী ও শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর্গকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই।

—

মুদ্রণে সহায়তা
জার্নাল প্রেস
৫১।১০ রানী হর্ষমুখী রোড, কলকাতা ২

বাঁধাই করেছেন
গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স
৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯

শ্রীপ্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩০ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত।

মনীষার কয়েকটি বই

শব্দের খাঁচায়

অসীম রায়

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের জীবনযন্ত্রণা ও প্রয়াস ধরা পড়েছে শক্তিশালী তরুণ লেখকের এই নতুন উপন্যাসে।

৬·০০

হিরোসিমা

অনুবাদ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

পারমাণবিক যুগের সূচনা যে মর্মান্তিকতায় তার স্পর্শ রয়েছে এই কবিতাগুচ্ছে। মূল জাপানি থেকে তর্জমা। ভূমিকা লিখেছেন বিষ্ণু দে।

২·০০

মরা চাঁদ

বিজন ভট্টাচার্য

'নবান্ন'-লেখকের নতুন বলিষ্ঠ নাটক।

৩·০০

DAVID HARE

HIS LIFE AND WORK

Radharaman Mitra

1·00

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪।৩ বি বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা ॥ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ

বাঙালীর তথা ভারতবাসীর যে কোনো রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা আছে এবং সে-রাষ্ট্রচিন্তার যে কোনো স্বাতন্ত্র্য আছে – এতদিন পর্যন্ত প্রধানত প্রতীচ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠকেরা সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মনন-সাধনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যে-সব স্মরণীয় বাঙালী, তাঁদের চিন্তাধারার এমন বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় এর আগে হয় নি। এই বৃহদায়তন গ্রন্থে লেখক দীর্ঘকালের সশ্রম পরিশ্রমে যাবতীয় দুর্লভ পুথিপত্র ও দলিল অনুসন্ধান ক'রে ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন। যে দ্বাদশ মনীষীর প্রসঙ্গ এতে আলোচিত : রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, মানবেন্দ্রনাথ রায়। সুমুদ্রিত পাঁচশত পৃষ্ঠার গ্রন্থ। মজবুত বাঁধাই ॥ মূল্য ১৮·০০

দেশদ্রোহী অসীম রায়

বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাস নানা কারণেই সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের গোত্রহীনতায় এক দীপ্ত ব্যতিক্রম। বাঙালি সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে প্রায়শই একটি অভিযোগ শোনা যায় – তাঁরা দেশবিভাগের তুল্য বেদনাদায়ক ঘটনার বিষয়েও নাকি উদাসীন থেকেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্যশিল্পী অসীম রায়ের সর্বাধুনিক উপন্যাস 'দেশদ্রোহী' প্রকাশের পর সে-অভিযোগ আর টেকে না। খণ্ডিত বাংলার মথিত চৈতন্যের নির্ভুল প্রতিবিম্ব 'দেশদ্রোহী' ॥ মূল্য ৩·৫০

বিস্ময়কর রাজা ॥ তরু দত্ত

মাত্র একুশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে বিদুষী কবি তরু দত্ত ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় লিখিত তাঁর রচনাবলির জন্য প্রতীচ্য-মনীষীবর্গের কাছে যে বিমুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন – আজকের দিনেও অনেকের কাছে তা ঈর্ষণীয় মনে হতে পারে। স্পেন দেশের বর্ণাঢ্য পট-ভূমিকায় রচিত উক্ত প্রতিভাময়ী লেখিকার 'বিস্ময়কর রাজা' উপন্যাসটির প্রকাশে তাঁর অনুরাগী মাত্রেই খুশি হবেন। ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত ॥ মূল্য ৩·০০

রামকৃষ্ণদেব : জীবন ও বাণী ফ্রিড্‌রিশ্‌ মাক্স মূলার

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন : "মাক্স মূলার ভারতবর্ষকে যে-পরিমাণ ভালোবাসেন, আমি আমার মাতৃভূমিকে তার শতাংশের এক ভাগ ভালোবাসতে পারলেও নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম।...."মৃত্যুর কয়েক বছর আগে মাক্স মূলার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন ও উপদেশাবলি বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা তাঁর সেই প্রবাদপ্রতিম ভারতপ্রেমেরই অন্যতর প্রকাশ। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত উক্ত মূলগ্রন্থের এই সাবলীল বঙ্গানুবাদ সর্বশ্রেণীর বাঙালির পঠনীয় ॥ মূল্য ৫·০০

প্রমথ চৌধুরী

গল্পসংগ্রহ

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁর 'গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে। লেখকের আলোকচিত্র সংবলিত। মূল্য ১০·০০, শোভন সংস্করণ ১২·০০

প্রবন্ধসংগ্রহ

বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ধসংগ্রহের দুই খণ্ডে সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হল। মূল্য ১৬·০০, শোভন সংস্করণ ১৮·০০ টাকা

॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীলীলা মজুমদার

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সাফল্যের পরিচয়।

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার ॥ ফ্রেন্সিস হাবার্ট ব্রেডলি

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক Appearance and Reality-গ্রন্থের প্রাঞ্জল অনুবাদ। ৮·০০

আত্মজীবনী ॥ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহর্ষি-রচিত এই মহামূল্য গ্রন্থখানিতে অনেক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়েছে। ১২·০০

চিত্রলেখা ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবিতা ও 'লিপিকা' ধরনের গদ্য রচনাগুলিতে ছোট কথায় চলতি জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। ২·৫০

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সম্বন্ধ, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল-বিল, বঙ্গনারী—কঃ পন্থা ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ২·৫০

পুরানো কথা ॥ চারুচন্দ্র দত্ত

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক রচনা। গ্রন্থকারের আংশিক আত্মচরিত বা জীবনচরিত বলা যায়। প্রতি খণ্ড ৩·০০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৬৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত। ৫·০০

বাংলার স্ত্রী আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব, বিবাহকালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচারসমূহের মনোহারী বিবরণ। ১·৩০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

'তীর সম্মুখ গতির নিমিত্ত পিছু হটে'

কমলকুমার মজুমদার

'সুবর্ণরেখা'র দুষ্প্রাপ্য পুস্তক বিভাগ আপনার গবেষণায় সাহায্য করার জন্য সর্বদাই সহযোগিতা ক'রে থাকে। ভারততত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বই—ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় পুরাতন পুস্তকের জন্য আমাদের নিকট অনুসন্ধান করুন। নিম্নের পুস্তকগুলির সামান্য কিছু কপি এখনও আমাদের কাছে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ ॥ বেণীমাধব বড়ুয়া
সরস্বতী ॥ অমূল্য বিদ্যাভূষণ
কলিকাতার কথা ॥ প্রমথনাথ মল্লিক (দুই খণ্ড)
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন ॥ মন্মথনাথ ঘোষ
কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র ॥ ঐ
মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র ॥ ঐ
হেমচন্দ্র (দুই খণ্ড) ॥ ঐ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ॥ ঐ
রঙ্গলাল ॥ ঐ
মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ॥ ঐ
গৌড় পাণ্ডুয়া ॥ চারুচন্দ্র মিত্র
Life & Writings of Girish Chandra Ghosh
(Founder & Editor of Hindu
Patriot and Bengalee) ॥

সুবর্ণরেখা ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

Gram :

Phone : 22-8801 (4 Lines)

With best Complements of

ASSOCIATED INDIA AGENCIES

INDIA EXCHANGE

(6th Floor)

INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 1

BALL AND ROLLER BEARINGS – STEEL BALLS

STEEL ROLLERS

Distributors NBC Bearings JESONS Drills & Taps

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার

পরিবারকে সীমিত ক'রে
আপনার জীবনকে
সুন্দরতর, সমৃদ্ধতর ও
পূর্ণতর ক'রে তুলুন।

নিকটবর্তী যে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্রে
যোগাযোগ ক'রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

THE CENTRAL BANK OF INDIA LTD.

India's Largest Bank in the Private Sector
Head Office : MAHATMA GANDHI ROAD, BOMBAY-1

Figures that tell –

Authorised Capital	Rs. 10,00,00,000 -
Subscribed Capital	Rs. 8,96,19,250 -
Paid-up Capital	Rs. 4,77,54,105 -
Reserve Fund & other reserves	Rs. 7,39,06,800 -

Deposits as at 31 12. 1967 Exceed Rs. 395 Crores

With a net work of over 464 Offices in all important Commercial Centres of India

"CENTRAL" offers every kind of banking business.

London Office : Orient House, 42 45. New Broad Street, London E.C. 2.

New York Agents Morgan Guaranty Trust Co. of New York
The Chase Manhattan Bank

Main Office for Assam, West Bengal, Bihar & Orissa
33, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

V. C. Patel, *Chairman.* B. C. Sarbadhikari, *Chief Agent.*

ASK "EMCOS"

for

Polythene Pipe with ISI Mark
Polythene Pipe Fittings Spigot & Screw Type
Award Winning Polythene Taps (Cocks)
Agri-Pipe for Agricultural Application
Bakelite Commode Seats ISI Marked
Melem Brand Melamine Crockery
Emcos Polythene Sanitary Items like, Cistern Balls, Overflows, Wash Basin, Syphons Etc.
Any Industrial Items to Customer's Specifications and Drawings.

Manufacturers

EMCO GENERAL INDUSTRIES

P-16 NEW C. I. T. ROAD
Calcutta 12

Gram NAGADVI Cal. PHONE Electrical Dept. 22-7168
Radio Dept. 22-6307

With best Compliments from

CHATTERJEE BROTHERS

7 POLLOCK STREET

CALCUTTA 1

Regd. Stock Holders No. BEN 134

PHONE : Office : 33-4016
Res : 67-4543

With best Compliments from

PUNCHANON SHOME

IRON HARDWARE & METAL MERCHANT

Stockists of Tisco, Iisco & Hindusthan Steel Ltd.

City Office

9, Maharshi Debendra Road

(Durmahatta Street)

Calcutta

Cable Address : "CUTSIZE"
CALCUTTA

23-7721
(5 Lines)

With Compliments of

Shalimar Industries Private Limited

25 GENESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA 13

Premier Manufacturers and Exporters of

Jute Mill Bobbins, Shuttles, Card Staves, Card/Gill Pins
Wood Lagging/Loom Lay Blocks, Picking Arms and
various wooden stores for Jute and
Cotton Textile Mills

FACTORY
1, Swarnamoyee Road
Shalimar, (Howrah)
Telephone Nos. : 67-4661/2

With best Compliments from

M/s Modern Cardboard Manufacturing Concern

ALL KINDS OF CARDBORD BOX MAKERS,
DESIGNERS, PRINTERS & GENERAL
ORDER SUPPLIERS.

223 Bagmari Road. Calcutta

রোদ বৃষ্টি মাথায় করে সবসময় আমায়
কাজে বেরোতে হয়–কিন্তু চুল আমার
এলোমেলো হলে চলেনা—আর তাই
আমি নিয়মিত কেয়ো-কার্পিন মাখি

কেয়ো-কার্পিন তেল মোটেই চট্‌চটে না, বালিশে
বা জামায় দাগ লাগে না,—আর এর মৃদুমধুর গন্ধ
সারাদিন শরীর মন ঝরঝরে রাখে।

সারাদিন ছোটাছুটির মাঝেও কেয়ো-কার্পিনে আমার
চুল পরিপাটি থাকে।

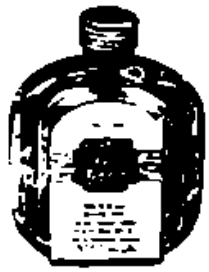

কেয়ো-
কার্পিন
কেশ তৈল—চাহা চুলের জন্য

কে'স মোহিনে কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটী,
পাটনা, মধুপুর, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, ইন্দোর

সতীর্থ প্রোডাক্‌সন্সের প্রথম নিবেদন

সৌমিত্র · তনুজা অভিনীত

সমরেশ বসুর

তিন ভুবনের পারে

চিত্রনাট্য-পরিচালনা · আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত

চিত্রগ্রহণ · রামানন্দ সেনগুপ্ত

●

পরিবেশনা · রুমা ফিল্মস ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৩৮ঃ - সাকুলার রোড - কলিকাতা-৯৩

EKSHAN
Regn. No. 5308/61

Rs. 2·00

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা

কার্ল মার্কস বিশেষ সংখ্যা

১৯৬৮

কার্ল মার্কসের জন্মের দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের ও বিদেশের বহু লেখকের রচনায় সমৃদ্ধ এই সংকলনটি এখন পত্রিকা-স্টলে ও সব সম্ভ্রান্ত বইয়ের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে।

॥ রচনাসূচি ॥

কার্ল হাইনরিখ মার্কস : মুরারি ঘোষ। কার্ল মার্কসের ধর্মচিন্তা : সোমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারত প্রসঙ্গে মার্কস : সুনীল সেন। অপরিচিত মার্কস : জন লুইস। মার্কস ও একালের মানবতাবাদ : আডাম শাফ। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী : শ্যামল চক্রবর্তী। মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান : প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্কস ও সর্বহারা শ্রেণী : পল সুইজি। দাস কাপিটাল ও আমি : ক্রিস্টোফার হিল। মার্কস ও মানবসত্তা গৌতম সান্যাল। কার্ল মার্কস ও অ্যালিয়েনেশন সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে : বারোজ ডানহ্যাম। মার্কসবাদের সমালোচনা : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। মার্কসবাদ ও বিপ্লব : অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী। মার্কস ও আধুনিক অর্থনীতি অমিয় দাশগুপ্ত। 'বুর্জোয়া' অর্থশাস্ত্রে মার্কসীয় প্রভাব : মার্টিন ব্রনফেনব্রেনার। মার্কসের ক্যাপিটাল মরিস ডব। কার্ল মার্কস ও নির্গমতত্ত্ব : অমলেন্দু গুহ। সুন্দর ও কার্ল মার্কস : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। কার্ল মার্কসের কবিতা : সমর সেন-অনূদিত। মার্কসবাদ ও সার্ধ শতাব্দী : রজনী পাম দত্ত। 'এশিয়াটিক ব্যবস্থা' প্রসঙ্গে : দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞান ও সমাজ : যোসেফ নীডহ্যাম।

এবং

কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি। মার্কসের রচনাবলি
বাংলায় মার্কসচর্চার দিক্‌নির্ণয়।

সুমুদ্রিত। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা

দাম সাড়ে তিন টাকা মাত্র

বোর্ড বাঁধাই : সাড়ে পাঁচ টাকা

এক্ষণ কার্যালয় / ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড কলকাতা ৯